ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ডি. টি. এম্.
সঙ্কলিত

প্রকাশক
দি বুক কোম্পানী লিমিটেড্
৪।৩বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য ৬৲ টাকা

প্রকাশক
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র
৪।৩বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
৭১।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৫১৪।৩৫

উৎসর্গ

আমার পূজনীয় মাতামহ
৺ দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী রায় সাহেব,
যিনি আমাকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার
প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন,
তাঁহার পরলোকগত
আত্মাকে
এই গ্রন্থ
অর্ঘ্য
প্রদান করা হইল।

ন দেশো মনুজৈর্হীনো ন মনুষ্যা নিরাময়াঃ
ততঃ সর্ব্বত্র বৈদ্যানাং সুসিদ্ধা এব বৃত্তয়ঃ।

মানুষ ছাড়া দেশ নাই, রোগ ছাড়া মানুষ নাই। সুতরাং বৈদ্যের বৃত্তি সর্ব্বত্রই সুসিদ্ধ।

ভাবপ্রকাশ।

মুখপত্র

বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা অল্প। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতায় ও ঢাকাতে বাঙ্গালা শ্রেণীর চিকিৎসা-বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইত। তৎকালে অনেকগুলি সুন্দর ও সুপাঠ্য চিকিৎসাগ্রন্থ আমাদের মাতৃভাষায় রচিত হইয়াছিল। অধুনা চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যের ভাষা ইংরেজী, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যারও হ্রাস হইয়াছে। আমার বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত পশুপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। ইহা প্রায় দশ বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর গবেষণার ফল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় নানাপ্রকার ব্যাধির মধ্যে এখন ভারতবর্ষে যেগুলির প্রকোপ দেখা যায়, ঐ সকল রোগের উৎপত্তি, নিদান ও নির্ণয়তত্ত্ব, নিবারণ এবং প্রতিষেধ প্রণালী ও চিকিৎসা বিচার এই পুস্তকে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর শ্রেণীর রোগগুলির বর্ণনা লেখকের বিশেষ চিন্তা, গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল। আমার বিশেষ আশা এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে ছাত্র কিংবা শিক্ষক কিংবা ভিষক,—চিকিৎসা জগতের সকল পাঠকই গ্রন্থকারের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের সুফল ভোগ করিবেন। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে আমাদের দেশীয় বহু কৃতী শ্রমশীল

সুপণ্ডিত ভিষকগণের গবেষণা ও বিচারপূর্ণ গ্রন্থ আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবে; এবং বিদেশীয় সুধীগণ অস্মদ্দেশীয় ব্যাধিগুলির সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানোপার্জ্জনের উপায়-স্বরূপ সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীনীলরতন সরকার

ভূমিকা

ডাক্তারি বইয়ের ভূমিকা কবির চেয়ে কবিরাজকে মানায় ভালো। এ কাজে আমার যদি সত্যকার কোনো তাগিদ থাকে তবে সে রোগীর তরফ থেকে। কিছুকাল থেকে গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছি, দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের। আধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোনো বড় কাজের পত্তন সম্ভব নয়, তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আবার সেই কারণেই প্রাণের দায় দুরূহ হয়ে ওঠে। আমরা অনেক সময়ে দোষ দিই বাহ্য কারণকে—কিন্তু রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস করে—গুরুতর কর্ত্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের ফাটল দিয়ে পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌঁছয়। লোকসানের হিসাব বিচারের সময় আমরা নানা নেতার নানা মত, নানা প্রণালী নিয়ে বকাবকি, এমন কি, হাতাহাতি করে থাকি, এদিকে রোগে আমাদের শক্তিকে যে চালুনীর মতো শতছিদ্রময় করে দিয়েচে এই কথাটা যথেষ্ট পরিমাণে আমলের মধ্যে আনিনে। যখন দেখি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ধন উৎপন্ন হয়না তখন বলি চরখা চালাও, তাঁত বোনো, চাষ করো,—কিন্তু যে হাতে এই সব কাজ চলবে সেই হাতে চেপে বসেচে যমের পেয়াদারা। পাঁচজন লোকে বহু কষ্টে দেড়জন লোকের মতো কাজ করে অথচ পাঁচ মুখেই তারা খায় এবং পাঁচখানা দেহকেই কাপড় পরাতে হয়। একে গরম দেশে মানুষের উদ্যম সহজেই শিথিল হয় তার উপরে এই উৎপাত।

বিবিধ উপায়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে এদেশের লোককে

বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কি করে রোগ ঠেকানো যায়। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক সভার অঙ্গীভূত একটি আরোগ্য বিভাগ থাকা উচিত, আরোগ্যরীতির বহুল প্রচারের ভার তার উপরে থাকা চাই। রাশিয়াতে এই প্রচারকার্য্য কি রকম সম্যক-ভাবে ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশ জুড়ে চল্‌চে তা দেখে এসেছি। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন সেখানকার চেয়ে অনেক বেশি, অথচ আয়োজন নেই বললেই হয়।

আমাদের দেশে যে সকল রোগ মানুষের ধন-প্রাণ-মানের গোড়া ঘেঁষে কোপ মারচে শ্রীযুক্ত ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থে তার প্রকৃতি ও প্রতিকার নির্ণয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেচেন। এই লেখাগুলি আমার কাছে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক। তার একটা কারণ, রোগের পরিচয়ে শরীরের পরিচয় পাওয়া যায়। শরীরী মানুষ এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ, যে সমস্ত রোগের সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের ঘর করতে হচ্চে তাদের সঙ্গে পদে পদে কারবার করতে গেলে অসহায় অজ্ঞতা নিয়ে এক মাত্র ডাক্তারের দিকেই পথ তাকিয়ে থাকলে চলেনা— অন্তত কিছু পরিমাণে ডাক্তারের সহযোগিতা না করতে পারলে বাঁচাও নেই। এ দেশে রোগ যত সুলভ ডাক্তার তত সুলভ নয়। চিকিৎসার-উপায়-বিরল এই দেশে আনাড়িরাও বাধ্য হয়ে হোমিয়োপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা সংগ্রহ করে রোগের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে চেষ্টা করে। ব্যবসায়ীরা যাই বলুন, কিছু ফল পায়না এ কথা বলা অত্যুক্তি। মন্দ ফল হয়না তাও বলতে পারিনে। কিন্তু শহরের বাইরে এই যে সব জায়গায় থাকি এখান থেকে ডাক্তার কত দূরে!—সে দূরত্ব কেবল ভৌগোলিক দূরত্ব নয়, আর্থিক দূরত্ব। তা ছাড়া যে সব ডাক্তার এখানে ওখানে বহু দূরে দূরে ছিট্‌কিয়ে আছেন

তাঁদের বিদ্যেতে দ্রুতগতিতে মরচে পড়ে আসচে। ডাক্তার পশুপতির এই বইখানি তাঁদের কাজে লাগবে।

গ্রামে যদি কোথাও একআধজন জনহিতৈষী শিক্ষিত লোক থাকেন তাঁরাও এই রকম বইয়ের সাহায্যে উপস্থিত অনেক উপকার করতে পারবেন,—আর আমার মতো সাহিত্য-ডাক্তার যাকে দায়ে পড়ে হঠাৎ ভিষক্‌-ডাক্তার হতে হয় তার তো কথাই নেই। কিসের দায়? তার দৃষ্টান্ত দিই। সাঁওতাল পাড়ার মা এসে আমার দরজায় কেঁদে পড়ল, তার ছেলেকে ওষুধ দিতে হবে। যতই বলি আমি ডাক্তার নই, তার জিদ্‌ ততই বেড়ে যায়। জানি, যদি তাকে নিতান্তই বিদায় করে দিই, সে তখনি যাবে ভূতের ওঝার কাছে,—তার ঝাড়ার চোটে রোগ ও রোগী দুইই দেবে দৌড়। বই খুলে বসতে হোলো,—বড়াই করতে চাইনে কেননা পসার বাড়াবার ইচ্ছে মোটেই নেই—সে রোগী আজও বেঁচে আছে;—আমার গুণে বা তার ভাগ্যের গুণে সে তর্কের শেষ মীমাংসা কোনো উপায়েই হতে পারে না। বহুকাল পূর্ব্বে রামগড় পাহাড়ে গিয়েছিলুম; সেখানেও রোগীরা আমাকে অসাধ্যরোগের মতোই পেয়ে বসেছিল,—ঝেড়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, শেষকালে তাদেরই হোলো জিৎ। যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোনো চিকিৎসার উপায় নেই তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি এত বড় নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারিনে যে পূরো চিকিৎসক নই বলে কোনো চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা-চিকিৎসকদেরকেও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাঠি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।

তা ছাড়া ঘরের লোক নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুর্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ

এই
ডাক্তারের ব্যবস্থাকে প্রায়ই বিকৃত করে দিয়ে থাকে। তাঁরা
কারণে, একে তো অভিজ্ঞ ডাক্তার বহুমূল্য, তার উপরে একে
প্রায়ই অভিজ্ঞ শুশ্রূষার ব্যবস্থা দাবী করেন। ব্যয় সম্বন্ধে কখনো
বলা যায় ডব্‌ল্ ব্যারেল্ বন্দুক। রোগীরা এই রাস্তা দিয়ে কোনো
ধনে কথনো ধনেপ্রাণে মরে। উপস্থিত বইথানি ঘরের সঙ্গে
কোনো লোক যদি পড়ে রাখেন তবে তাঁদের শুশ্রূষায় হৃদয়ের যাই
জ্ঞানের যোগ হয়ে তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। আর মাঝে
হোক্, ডাক্তার পশুপতিকে আশীর্ব্বাদ করে, আমি মাঝে মাঝে
এই বইখানি পড়ব এবং সেই পড়া নিশ্চয়ই কাজে লাগ্‌বে।

গ্রন্থকারের নিবেদন

আদিযুগের চরক, সুশ্রুত, হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের পাস্তর, লিষ্টার, এর্লিক, রস্, প্রভৃতি যে সকল মনীষী যুগে যুগে পীড়িতের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে স্মরণ করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইতেছে।

ভারতের ব্যাধিগুলির সম্বন্ধে বাংলা ভাষাতে বিজ্ঞানানুমোদিত পুস্তকের প্রয়োজন আছে বুঝিয়া ইহা লিখিত হইল।

আধুনিক কালের চিকিৎসাব্যবসায়ীরা সকলেই ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত এবং তাঁহাদের পাঠের উপযুক্ত ইংরেজী পুস্তকের অপ্রতুল নাই। কিন্তু সেই সকল পুস্তক বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধ হইলেও এবং তাহা বাঙালী পাঠকের নিকট বোধগম্য হইলেও আমাদের প্রয়োজন তাহাতে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না। ঐরূপ পুস্তক বাঙালীর উপযোগী করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাংলা ভাষাতে লিখিত হইলে তাহা আমাদের সকলের পক্ষে যেরূপ সহজবোধ্য এবং উপকারী হইতে পারে, বিদেশী ভাষায় লিখিত পুস্তকের দ্বারা ততটা পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব নয়। পূর্ব্বকালে একদেশের চিকিৎসাবিদ্যা যে অপর দেশে আসিয়া স্থানীয় ভাষায় বহুবার রূপান্তরিত হইয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। বর্ত্তমান কালের চিকিৎসাবিজ্ঞান সর্ব্বত্রই এক, তথাপি বিভিন্ন দেশের জন্য তাহা নিজ নিজ স্বতন্ত্র ভাষায় লিখিত হয়। একই বিদ্যা বিলাতে গিয়া শিখিতে হইলে আমাদিগকে ইংরেজীতে পড়িতে হয়, ফ্রান্সে গিয়া ফরাসী ভাষায় এবং জার্ম্মানিতে গিয়া জার্ম্মান ভাষায় পড়িতে হয়। আমরা তাহা ঐরূপভাবে শিখিলেও দেশস্থ সমধর্ম্মীদের জন্য সেগুলি নিজ ভাষায় লিখি না, যাহা কিছু লিখিত হয় তাহা ইংরেজী ভাষায়। এইরূপ প্রথা প্রচলিত হওয়াতে ঐ বিদ্যা অল্প কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়, এবং অনেক সমব্যবসায়ীদের পক্ষে তাহা অনধিগম্য হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান নিত্যই পরিবর্দ্ধনশীল, কিন্তু তাহার নূতন আবিষ্কারগুলি

কয়েকজন মাত্র জানিতে পারে, সকলের কাছে উহা উপযুক্তরূপ ভাবে পৌছায় না। এইরূপে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, তাহা নিতাই বাড়িতে থাকে। কিন্তু জ্ঞানের এইরূপ ব্যবধান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। মনুষ্যসমাজের মঙ্গলের জন্য যে বিদ্যার সৃষ্টি, সকলের নিকট তাহা অবিলম্বে প্রচারিত হওয়া উচিত। মাতৃভাষায় লিখিতে এবং শিখিতে যদি আমরা লজ্জা না পাই তবে উহাই জ্ঞানপ্রচারের সহজ পন্থা।

ভারতের নানাস্থানে যে সকল বাঙালী চিকিৎসক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেন,—যাঁহারা আপন আপন বিদ্যাকে সময়োপযোগী সমৃদ্ধ করিবার সুযোগ পান না, যাঁহাদের জ্ঞানবর্ত্তিকায় নূতন তৈলপ্রয়োগের আগ্রহ থাকিলেও অবসর নাই, যাঁহারা শিক্ষাকেন্দ্রে আসিয়া উন্নততর চিকিৎসাপদ্ধতি দেখিতে পান না এবং যাঁহাদের ট্রপিক্যাল স্কুল প্রভৃতি আধুনিক প্রতিষ্ঠানে আসিয়া নব নব আবিষ্কার সমূহ ও নবতর প্রেরণা সঞ্চয় করিবার সুবিধা হয় না, যাঁহারা সাময়িক পত্রাদির মারফৎ সংবাদ পাইলেও কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া পড়েন,—তাঁহাদের নিকট ব্যাধিসম্বন্ধীয় পুরাতন এবং আধুনিক তথ্য-সকল একত্র করিয়া যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে ও যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। জগতের সর্ব্ববিধ ব্যাধি লইয়া আলোচনা করা এস্থলে প্রয়োজন নাই, প্রধানতঃ ভারতীয় সাধারণ ব্যাধিগুলি লইয়া আমাদের কারবার, সুতরাং কেবল ঐ সকল ব্যাধি সম্বন্ধেই এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে।

আমরা এই দেশে সাধারণতঃ দুই প্রকারের ব্যাধি দেখিতে পাই। এক প্রকার ব্যাধি আছে যাহা সার্ব্বভৌমিক, অর্থাৎ তাবৎ সকল দেশেই হইয়া থাকে। আর একপ্রকার ব্যাধি আছে যাহা কেবল গ্রীষ্মপ্রধানদেশ-সুলভ, কোনো শীতপ্রধান দেশে দেখা যায় না; এইগুলিকে ট্রপিক্যাল ব্যাধি আখ্যা দেওয়া হয়। এইগুলি আমাদের দেশে অধিক সংখ্যায় হইয়া থাকে, সুতরাং এইগুলির সম্বন্ধে আমাদের বিশেষরূপ শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ব্যাধি সম্বন্ধে এরূপ বৈশিষ্ট্য থাকিবার অনেক কারণ আছে। এ দেশের আবহাওয়া এবং এ দেশের মাটি কতকগুলি রোগের কীটাণু প্রভৃতির অনুকূল, এবং এই দেশের লোকের প্রকৃতিও ঐ সকল

ব্যাধির পক্ষে অনুকূল। শীতপ্রধান দেশের চিকিৎসকদের এই সকল ব্যাধির কথা না জানিলেও চলে, কিন্তু আমাদের পক্ষে এইগুলির কথা বিশেষ করিয়া জানা দরকার। সুতরাং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ব্যাধিগুলিও আমাদের শিখিতে হইবে, এবং শীতপ্রধানদেশের যে সকল ব্যাধি এখানে হইয়া থাকে তাহাও আমাদের শিখিতে হইবে।

পৃথিবীর অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলি হইতে ভারতের রোগের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। কয়েকপ্রকার রোগ গ্রীষ্মদেশীয় হইলেও তাহা ভারতে হয় না, যেমন—স্লীপিং সিক্‌নেস, ইয়েলো ফিবার, টুলারিমিয়া ইত্যাদি। এগুলি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার তেমন আবশ্যক নাই। আবার এমন কতকগুলি রোগ আছে যেগুলি ভারতে থাকিলেও বঙ্গদেশের কাছাকাছি কোথাও নাই, যেমন—আণ্ডুল্যাণ্ট ফিবার, টাইফাস্ ফিবার, পেলাগ্রা ইত্যাদি। উপস্থিত পুস্তকে সে গুলির সম্বন্ধেও আলোচনা করা আপাততঃ প্রয়োজন নাই। অপরপক্ষে কতকগুলি ব্যাধি সার্ব্বভৌমিক হইলেও এ দেশে যথেষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, মেনিঞ্জাইটিস্, যক্ষ্মা ইত্যাদি। এগুলির সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখা প্রয়োজন। এই সকল বিবেচনায় এতদ্দেশীয় এবং সর্ব্বদেশীয় কেবল প্রয়োজনীয় ব্যাধিগুলি লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে যে সকল তথ্য ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য, সুতরাং নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। ইহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিলেও অতিশয়োক্তি নাই। বস্তুতঃ ইহা কেবল চিকিৎসা-পুস্তক হিসাবে রচিত নয়, আধুনিক যুগের ব্যাধি-বিজ্ঞান হিসাবে রচিত। আধুনিক যুগের এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র পাঁচশত বৎসর। তৎপূর্ব্বে চিকিৎসাবিষয় শাস্ত্র মাত্র ছিল কিন্তু বিজ্ঞান ছিল না, অর্থাৎ তাহাতে অভিজ্ঞতামূলক উপদেশ থাকিত কিন্তু পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণমূলক যুক্তিপ্রমাণ বা নজির থাকিত না। যাহা হউক, যে-কোনো জ্ঞান বা বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইবার পক্ষে পাঁচশত বৎসর অতি অল্প সময়, বিশেষতঃ যদি উহা পূর্ব্ববর্ত্তী পথে না চলিয়া নূতন পথে চালিত হয়। অতএব এই নূতন বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ তাহা আশ্চর্য্যের কথা নয়। বৈজ্ঞানিকগণ জীবনব্যাপী সাধনায় যে সকল অবিসম্বাদী সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন,

তাঁহারা কেবল তাহাই সর্ব্বসমীপে প্রমাণ সহকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপে তিলে তিলে ইহার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেও ইহা সম্পূর্ণ হইতে আরো অনেক শতাব্দী লাগিতে পারে। তথাপি যাহা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য। অতএব যাঁহারা ইহার অনুবর্ত্তী হইবেন তাঁহারা ঐরূপ সত্যের আদর্শ লইয়াই কার্য্য করিবেন, এবং সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান-নির্দ্দিষ্ট উপায় সকল অবলম্বন করিবেন। বৈজ্ঞানিক তূণে যে সকল অব্যর্থ বাণ পাওয়া গিয়াছে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারা অনুসারেই তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে।

এই পুস্তকে নানারূপ ল্যাবরেটরি-পরীক্ষার দ্বারা রোগনির্ণয়ের উপায় সকল যথারীতি বর্ণিত হইয়াছে এবং কোন পরীক্ষার দ্বারা কোন রোগ চিনিতে কিরূপ সাহায্য পাওয়া যায় তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। নানা কারণে এখনও অনেক চিকিৎসক ঐ সকল পরীক্ষা আয়ত্ত করিতে বা উহার সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না। যাহাতে তাঁহারা সহজে ঐ সকল উপায়ের দ্বারা যথাযথভাবে রোগ নির্ণয় করিতে পারেন, এই পুস্তকের তাহাও এক উদ্দেশ্য। এখনকার চিকিৎসকমাত্রেই এ কথা উপলব্ধি করিতেছেন যে ল্যাবরেটরি-পরীক্ষা ব্যতীত অনেক রোগই অভ্রান্তরূপে চেনা যায় না, এবং তদ্ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাও প্রয়োগ করা যায় না। রোগের যথার্থ স্বরূপ দেখিতে যে এই সকল পরীক্ষার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, তাহাতে নিন্দনীয় কিছুই নাই। প্রত্যক্ষ না দেখা পর্য্যন্ত কোনো কথাই নিশ্চিতরূপে গ্রহণযোগ্য নয়, ইহাই বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের শিক্ষা। চিকিৎসক মাত্রেই ঐ সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যথাসম্ভব অনুশীলন করিবেন, নতুবা অনেক স্থলেই ঠকিতে হইবে।

বাংলা ভাষায় ডাক্তারি পুস্তক লিখিলে সাধারণের পক্ষ হইতে কিছু বিপদ আছে, এই কথা কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়া থাকেন। চিকিৎসা বিদ্যা সুলভ হইলে সাধারণে তাহার অপব্যবহার করিতে পারে। অবশ্য একখানি বই পড়িয়া কেহ যে ডাক্তারি শিখিয়া ফেলিবে এবং রোগের সময় ডাক্তারকে না ডাকিয়া নিজেই চিকিৎসার ভার লইবে এরূপ আশঙ্কা হইবার কোনো কারণ নাই। তাহা যদি সম্ভব হইত তবে ইউরোপের বা আমেরিকার লোকেরা অনায়াসে তাহা করিতে পারিত। কিন্তু এক বিষয়ে

সত্যই এই আশঙ্কা আছে যে কাহারো কাহারো অল্প বিদ্যা ইহাতে ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতে পারে, এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে নানারূপ বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়া চিকিৎসকের কার্য্যে বাধা দেওয়ার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। অতএব সাধারণের কেহ যদি এই পুস্তক পড়েন তবে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইতেছে যে তিনি ঔষধাদির কথা যথাসম্ভব বাদ দিয়া পড়িবেন। নিতান্ত কয়েকটি প্রাথমিক ও প্রতিষেধক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ব্যতীত রোগের উপর রীতিমত চিকিৎসা প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনো কথা সাধারণের জানিবার আগ্রহ না করাই উচিত। চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করিতে কতকগুলি প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি থাকা আবশ্যক, উহা ব্যতীত যিনিই চিকিৎসার কথা আলোচনা করিবেন তাঁহারই ভুল করিবার সম্ভাবনা। কেবল পুস্তকপাঠে চিকিৎসা শেখা যায় না এবং পুস্তকে উহা সম্পূর্ণরূপে লেখাও যায় না, কারণ এই বিদ্যা মূলতঃ ব্যবহারিক বিদ্যা। যাঁহারা চিকিৎসাকে বৃত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়াছেন এবং দৃষ্টকর্ম্মা হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকারী, অন্য লোকের পক্ষে সে অধিকার জন্মানো দুরূহ।

কিন্তু কেবল ঔষধাদির কথা ব্যতীত রোগবিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্যান্য সকল কথাই জানিতে সাধারণের অধিকার আছে। অনেকে মনে করেন সাধারণের নিকট সকল কথা বিশদ ভাবে বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই, উহাদের জন্য স্বতন্ত্র ও সংক্ষিপ্ত ভাবের পুস্তক লেখা আবশ্যক, কারণ সকল কথা তাহারা বুঝিবে না। কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। অর্দ্ধসত্যের দ্বারা কখনো হৃদয় স্পর্শ করা সম্ভব হয় না। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয় বা পানীয় জলে কলেরার বিষ থাকে, এ কথার বিবৃতিমাত্রে লোকে নিঃসন্দেহে মানিয়া লইতে পারে না, কারণ সকলেরই কিছু বিচারবুদ্ধি আছে, কার্য্যকারণ সম্পর্ক দেখাইয়া না বলিলে লোকে বুঝিতে পারে না ইহার মধ্যে বাস্তবিক সত্য কোথায়। রোগের সম্যক পরিচয় না জানিলে লোকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে না, এবং তদ্ব্যতীত জীবনরক্ষার জন্য সাবধানতার যে মূল্য তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

এই পুস্তক দুই খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। বর্ত্তমান প্রথম খণ্ডে রোগের বীজ, বাহন, ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মূল তথ্যসমূহ যথাসম্ভব সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; তৎপরে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যত প্রকার জ্বর-ব্যাধি এ দেশে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তগুলি ইহাতে পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে আমাশা, ডিস্‌পেপসিয়া, কলেরা, ক্রিমিপীড়া প্রভৃতি পেটসম্পর্কীয় ব্যাধি, এবং এপিডেমিক্ ড্রপসি, যক্ষ্মা প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি ব্যাধির কথা উক্ত হইবে।

এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য আমি অনেকের নিকট ঋণী। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বহুদিন হইতে আমাকে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে প্রথম প্রেরণা তাঁহার নিকটেই পাইয়াছি। কলিকাতার কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এবং বিশেষতঃ চিকিৎসা সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলি সম্বন্ধে নানা উপদেশ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু নিষেধ করায় তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। "স্বচিকিৎসা" পত্রের সম্পাদক ডাক্তার হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পত্রিকায় আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত করেন এবং পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহস দেন। কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের কয়েকজন কর্ম্মীও এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করেন। এই পুস্তকের মুদ্রণকালেও আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। সাহিত্যরসিক বন্ধুদ্বয় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী ইহার আদ্যোপান্ত প্রুফ দেখিয়া ভাষা ও ছাপার অনেক ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শিল্পীপ্রবর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাস ইহার কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চন্দ্র ইহার সূচীপত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকটে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সাবধানতা সত্ত্বেও প্রথম প্রচেষ্টা মাত্রেই নানারূপ ভুল ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা। কেহ যদি উহা দেখাইয়া দেন তবে অনুগৃহীত হইব।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৬।

মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল, কলিকাতা।

বিষয় সূচী

চিত্রসূচী

যে সকল রোগবাহনের দ্বারা এক বা একাধিক রোগ মনুষ্যশরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে উহাদের চিত্রের সহিত এক একটি বৃত্ত স্বতন্ত্রভাবে রচিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগের নাম ও তাহার নির্দ্দিষ্টপ্রকার বীজ বা বীজাণুর চিত্র এবং নাম ঐ বৃত্তগুলির মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(এই চিত্রখানি প্রফেসর এম্. এন্. দে ও কে. ডি. চ্যাটার্জ্জির Bacteriology পুস্তক হইতে অনুমতিক্রমে সংগৃহীত)

রোগের বীজ

জ্ঞান-বিকাশের সময় হইতেই মানুষ অনুসন্ধান করিতেছে রোগের কারণ কোথায়; এখনও সে অনুসন্ধানের শেষ হয় নাই। এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে রোগমাত্রেরই কারণ আছে, এবং সকল রোগের কারণ এক প্রকার নয়; বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন কারণ, বিভিন্নভাবে তাহার উৎপত্তি, এবং জীবের শরীরে বিভিন্নরূপে তাহা প্রকাশ পায়। কিন্তু সব রোগগুলির সঠিক কারণ এখনও প্রকাশ্যরূপে জানা যায় নাই; কতকগুলির কারণ স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, কতকগুলির কারণ আনুমানিক বিচারে বোঝা গেলেও প্রমাণসাপেক্ষ হইয়া আছে, আর কতকগুলির কারণ এখনও ধরা পড়ে নাই—অনুসন্ধান চলিতেছে। এইরূপে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইতে হইতে বর্ত্তমানে আমরা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহার কিছু ধারণা করিয়া রাখা সকলের প্রয়োজন।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে পুরাকালের শাস্ত্রকারেরা রোগ-সকলকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, জীবের শরীরে দুই ভাবে ব্যাধি সৃষ্ট হইতে পারে। দেহের ভিতরকার যন্ত্রসকল কোনোরূপে বিকল হইয়া তজ্জন্য শরীরের ভিতর হইতে কতকগুলি ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে, অথবা সুস্থ শরীর সত্ত্বেও বাহির হইতে হানিকর বা বিষাক্ত কিছু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বারাও কতকগুলি ব্যাধির সৃষ্টি করিতে পারে। অর্থাৎ কতকগুলি ব্যাধি শরীরের ভিতর হইতে উদ্ভূত হয়, আর কতকগুলি ব্যাধি বাহির হইতে শরীরের মধ্যে আসে। যেগুলি ভিতরকার স্বাভাবিক দোষহেতু জন্মায় বলিয়া মনে হইত, সেগুলিকে তাঁহারা বলিতেন

স্বভাবজ ব্যাধি, আর যেগুলি বাহির হইতে আসে বলিয়া মনে হইত, সেগুলিকে বলিতেন **আগন্তুজ** ব্যাধি।

আমরাও অনেকটা এইমতই রোগগুলিকে বিভক্ত করিয়া থাকি। কতকগুলিকে বলি constitutional অর্থাৎ **স্বভাবজ,** আর কতকগুলিকে বলি infectious (বা extraneous) অর্থাৎ **আগন্তুজ**। Infectious কথাটির অর্থ ছোঁয়াচে নয়। উহার প্রকৃত অর্থ সংক্রামক, যাহা বাহির হইতে আসিয়া শরীরের ভিতর সংক্রমিত হয়। 'আগন্তুজ' কথাটিই ইহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ।

রোগের এই দুইপ্রকার নিমিত্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেসকল ধারণা ছিল, এখন অবশ্য তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে অধিকাংশ রোগই স্বভাবজ, কেবল যেগুলি নিতান্ত আকস্মিক দুর্ঘটনার মত উপস্থিত হইত সেইগুলিকে আগন্তুজের পর্য্যায়ভুক্ত করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে জানা যাইতেছে যে স্বভাবজ ব্যাধি খুব কমই হয়,—অধিকাংশ ব্যাধিই আগন্তুজ। এমন কি এখনও যে ব্যাধিগুলি স্বভাবজ বলিয়া ধরা হয়, তাহারো অধিকাংশ হয়তো ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে আগন্তুজ ব্যাধির তালিকায় গিয়া পড়িবে এরূপ অনুমান হইতেছে। বর্ত্তমান-কালের বিচার অনুসারে স্বভাবজ ব্যাধি দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে,—যথা ডায়াবিটিস্ বা বহুমূত্ররোগ, গাউট্ বা একপ্রকার বাতরোগ, ইত্যাদি। এমন উদাহরণ কিন্তু আর দুই-একটি দিতে গেলে চিন্তায় পড়িতে হইবে। অর্থাৎ যতই রোগের মূল কারণ আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে প্রা রোগমাত্রেরই কিছু বীজ আছে এবং এই বীজরূপ কারণ হইতেই রোগের উৎপত্তি হয়। এইরূপে পূর্ব্বে যেগুলিকে মনে হইত স্বভাবজ ব্যাধি, এখন দেখা যাইতেছে তাহার অধিকাংশই আগন্তুজ। ফলে স্বভাবজ ব্যাধির তালিকা সঙ্কীর্ণতর হইতেছে, আগন্তুজের তালিকা বাড়িয়া চলিয়াছে। অধিকাংশ রোগের কারণ এইভাবে আবিষ্কৃত হইয়া যাওয়াতে রো সম্বন্ধে চিকিৎসকের দৃষ্টি একদিক হইতে অন্যদিকে অপসারিত হই গিয়াছে। সে এখন বুঝিয়াছে যে রোগ আপনা হইতে ভিতরে জন্মা না, অধিকাংশই বাহির হইতে আমদানি হয়। সেইজন্য রোগমাত্রে

আগন্তুজ কারণটি কি তাহাই খুঁজিতে সে তৎপর, এবং তাহারই উচ্ছেদ ও নিবারণ করা এখনকার চিকিৎসার আদর্শ।

হইতে পারে যে মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোগেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বের মানুষ এখনকার মত ঘন-সন্নিবদ্ধ ভাবে বাস করিত না, পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানেরও এরূপ সুযোগ ছিল না, নানাকারণে হয়তো তখন আগন্তুজ ব্যাধির সংখ্যাও অনেক কম ছিল। কিন্তু তখনও যে 'জনপদধ্বংসকারী' মহামারী আসিয়া মধ্যে মধ্যে দেশ উজাড় করিয়া দিত ইহা ইতিহাস পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। যে ব্যাধি এইরূপে একসঙ্গে বহু লোককে আক্রমণ করে তাহা যে আগন্তুজ ব্যাধি ব্যতীত আর কিছুই নয় তাহা সকলেই বুঝিতেন। সেইজন্য পীড়িত ব্যক্তির সংস্পর্শ পরিত্যাগ করার প্রথা বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। অবশ্য পীড়া মাত্রেই যে আগন্তুজ তাহা নয়। শরীর পালনের ব্যতিক্রম ঘটিলে, অথবা অনিয়ম, অত্যাচার, অযত্ন, অপঘাত প্রভৃতির দ্বারাও নানারূপ পীড়া হয়। এইগুলি জ্ঞানকৃত ও সাময়িক পীড়া মাত্র। স্বাভাবিক নিয়মেই এগুলি নিবৃত্ত হইতে পারে, অথবা কিছু ঔষধের দ্বারা দোষগুলি দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু যেসকল ব্যাধি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্টরূপ লইয়া আসে এবং আপন চরিত্র অনুসারে নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতে থাকে, অর্থাৎ যেগুলি বিশিষ্টধর্ম্মী ব্যাধি, তাহার অধিকাংশই আগন্তুজ।

আরো এক কথা—যে ভাবে স্বভাবজ ও আগন্তুজ এই দুইভাগে রোগের বিভাগ করা হইল, প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বদা এরূপ ভাগাভাগি করিয়া মানুষের রোগ দেখা দেয় না। আগন্তুজ ব্যাধি হইতেও স্বভাবজ পীড়া আসিতে পারে, আবার স্বভাবজ পীড়া থাকিলেও আগন্তুজ ব্যাধি জন্মিবার সুযোগ হয়। অনেক সময় দুইরূপ অবস্থাই একত্রে জড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু তবু রোগ বিচার ও চিকিৎসা করিবার সময় মূল রোগটিকে ধরিতে হয়, এবং কতটুকু আগন্তুজ ও কতটুকু স্বভাবজ তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয়। সেই হিসাবে রোগের অবস্থাকে ভাগাভাগি করিয়া চিনিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে, এবং রোগী দেখিবার সময় উহা

স্বাভাবিক দোষ হইতে উৎপন্ন অসুস্থতামাত্র, অথবা উহা কোনো নির্দ্দিষ্ট আগন্তুজ ব্যাধি, অথবা দুইই একসঙ্গে মিশ্রিত, তাহা বুঝিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে।

আগন্তুজ ব্যাধি

কিরূপে কোথা হইতে আগন্তুজ ব্যাধি আসে এবং উহার আসল স্বরূপটি কি তাহা লইয়া মানুষ আবহমানকাল চিন্তা করিয়াছে, আজও এ চিন্তার শেষ হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ধারণা ছিল যে, মন্দ হাওয়া লাগিয়া অথবা অমঙ্গলের স্পর্শে এই সকল রোগের উৎপত্তি হয়। যে ব্যাধি আকস্মিকরূপে আসে, অর্থাৎ যাহাতে সম্পূর্ণ সুস্থব্যক্তি দেখিতে দেখিতে বাণবিদ্ধের মত অসহায় ও অশক্ত হইয়া পড়ে, তাহা যে কেবল শরীরের দোষে উৎপন্ন হইতে পারে না, একথা প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন। এই গুলিকেই তাঁহারা আগন্তুজ ব্যাধি বলিতেন, এবং ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেন অভিচার (মারণ প্রক্রিয়া), অভিশাপ (অন্যের দ্বারা অশুভ কামনা), অভিষঙ্গ (অদৃষ্টশক্তির উৎপাত) প্রভৃতি। এই সকল দৈব ও অপ্রাকৃত কারণ ছাড়া তখনকার দিনে অন্য কিছু ধারণা করা যায় নাই। কিন্তু বহুযুগের অনুসন্ধানে মানুষের জ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, নানাপ্রকার যন্ত্রাদির উদ্ভাবনা হইয়াছে, নানারূপ পরীক্ষাপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, ক্রমে এখন আমরা রোগসৃষ্টির মূলসূত্র জানিতে পারিয়াছি। এখন সেইজন্য আমাদের অলৌকিক কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয় না,—এখন আমরা রোগের বীজ স্পষ্ট দেখিতে পাই এবং কিরূপ তাহার প্রকৃতি, কিরূপে তাহা শরীরে প্রবেশ করে ও কিভাবে রোগের সৃষ্টি করে সমস্তই জানিতে পারি। যেহেতু অধিকাংশ আগন্তুজ রোগেরই বীজ আমাদের জানিত, সেইজন্য আমরা এখন জোরের সহিত বলিতে পারি যে নির্দ্দিষ্ট বীজ না থাকিলে অন্য কোনো উপায়ে ঐ সকল ব্যাধি জন্মিতে পারে না।

কিরূপে অতি ধীরে ধীরে রোগ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইতিহাস হইতেই জানা যায়। বীজ হইতে যে রোগের উৎপত্তি

হয়, এ কথার প্রথম স্পষ্টরূপে উল্লেখ দেখা যায় ইটালীয় চিকিৎসক জেরোম ফ্রাকাষ্টরের (Jerome Fracastor, ১৫৪৬ সালে) গ্রন্থে। তিনিই প্রথমে বলেন যে ইন্দ্রিয়শক্তির অগোচর (insensibilis) কোনো জীবিত পদার্থের দ্বারা সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। তিনি এই জীবন্ত বীজের নাম দিয়াছিলেন seminaria, এবং বলিয়াছিলেন যে গাত্র-সংস্পর্শের দ্বারা, আসন-বসনের সংস্পর্শের দ্বারা এবং দূর হইতে বায়ুকর্ত্তৃক নীত হইয়া, এই তিনরূপ উপায়ে ঐ বীজ সংক্রমিত হইয়া থাকে। পঞ্চাশ বৎসর পরে হাউপ্টমান (Hauptmann) আরো স্পষ্টরূপে বলিলেন—"Fevers are caused by invisible worm-like animalcules and their eggs" অর্থাৎ জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মায় কীটের মত ক্ষুদ্র প্রাণী ও তাহাদের ডিমগুলির দ্বারা। কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যাইত না বলিয়া এই সকল তথ্য তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

অতএব রোগের আচরণ এবং বিশিষ্ট রোগের বিশিষ্টরূপ অভিব্যক্তি দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই বুঝা যাইত যে জীবের শরীরে কোনো স্বতন্ত্রপ্রকার জৈবপ্রকৃতি আসিয়া অধিরূঢ় হয়, এবং তাহারই ফলে শরীরের অভ্যন্তরে বিকৃতি ঘটে। কেবল অদৃশ্য থাকায় এগুলি কিরূপ পদার্থ তাহার কোনো সন্ধান মিলিত না। মানুষের নিয়ত চেষ্টা ছিল, কি উপায়ে এই অদৃশ্য শত্রুর সাক্ষাৎ মেলে। তাহার পর কিরূপে মাইক্রস্কোপ যন্ত্রের সৃষ্টি হইল (১৬০০ খৃষ্টাব্দে) ও প্রথম কিরূপে উহার দ্বারা রোগ-বীজাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, এবং কিরূপেই বা প্রমাণিত হইল যে উহারাই রোগের মূল কারণ, সে এক বহুদীর্ঘ বিচিত্র ইতিহাস। পাস্তর (Pasteur), লিষ্টার (Lister) প্রভৃতি মনীষীগণের জীবনী পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। যুগ যুগ সাধনায় যাহা জানা যায় নাই, অতঃপর ক্রমে ক্রমে তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল। পাস্তরই এ বিষয়ে প্রথম জ্ঞানদাতা, তিনিই প্রথম বীজাণুতত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন (১৮৫৭)। তিনি ও তাঁহার পরবর্ত্তীগণ নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিলেন যে জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি, অজৈব পদার্থ হইতে জীব জন্মিতে পারে না,—কিছুতেই না (life can never grow out of non-life)। এই সূত্র

লাগিল। এ কথা এখন স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া বীজাণুবিজ্ঞান অগ্রসর হইতে লাগিল। এ কথা এখন আমাদের কাছে খুবই সহজ, কিন্তু মানুষ যখন একথা প্রথম শুনিয়াছে তখন কতই আশ্চর্য্য হইয়াছে ! যে পদার্থে জীবের কোনো অস্তিত্ব নাই, তাহা যদি জীবের সংস্পর্শমাত্র হইতে বাঁচাইয়া রাখা যায় তবে তাহার মধ্যে আপনাআপনি পোকা-মাকড় বা অন্য কোনো জীবের জন্ম হইতে পারিবে না,—ইহাই বীজাণু-বিজ্ঞানের মূলসূত্র। যেখানে কোনো জীব আছে দেখা যাইতেছে, বুঝিতে হইবে সেখানে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীব আসিয়া তাহার সম্ভাবনা করিয়া গিয়াছে, নতুবা আপনা হইতে সে জন্মে নাই। যতই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হউক—জীবমাত্রেরই একটা ধারাবাহিক বংশপারম্পর্য্য আছে।

অতএব রোগের সৃষ্টিকারী যে সকল বীজাণু ও জীবাণুর আবিষ্কার হইল, বুঝা গেল তাহারা আপনা হইতে জন্মে না, বাহির হইতে কোনোরূপে শরীরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে। সেই জন্যই এই সকল আগন্তুজ ব্যাধিকে infectious বা সংক্রামক নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

উপস্থিত এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে আমাদের যেসকল ব্যাধি হয়, তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় আশীভাগই এই প্রকারের সংক্রামক ব্যাধি, এবং অধিকাংশেরই বীজাণু আমাদের পরিচিত। বাকী কয়েক প্রকার রোগের কোনো বীজাণু আছে কিনা এখনও জানা যায় নাই ; সেইজন্য এখনও সেগুলি অনির্দ্দিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়,—কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো তাহাও ধরা পড়িয়া যাইবে। তখন ঐ রোগগুলিও বিশিষ্টের পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। অতএব বীজাণুতত্ত্বের দিকেই এখন সকলের একাগ্র দৃষ্টি। বহু শতাব্দীর বিচার বিবেচনার পর বিজ্ঞান-জগৎ এখন একরূপ স্বতঃসিদ্ধরূপেই ধার্য্য করিয়া লইয়াছে যে গৌণ কারণ আর যাহাই থাকুক, বীজাণু প্রভৃতির সংক্রমণই আগন্তুজ ব্যাধির একমাত্র মুখ্য এবং অবিসংবাদী কারণ। অবশ্য ইহাই যে রোগের কারণ সম্বন্ধে শেষ কথা তাহা নয়, ভবিষ্যতে আরো অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং বিজ্ঞান সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর মার্গে গিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা সত্যের এই সীমা পর্য্যন্তই পৌঁছিয়াছি, এবং বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উন্নতি যে এই পথ ধরিয়াই হইবে তাহাও বুঝিয়াছি।

অতএব যে-কোনো আগন্তুজ ব্যাধিই হউক, উহা কাহারো ব্যক্তিগত পীড়ামাত্র নয়। উহা একটিমাত্র ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন রোগে যতপ্রকার বৈষম্যই থাকুক, কেবল এই বিষয়টিতে পরস্পরের ব্যবহারের অল্পবিস্তর মিল আছে। যে রোগ একবার একজনের হয় তাহা কাছাকাছি আরো পাঁচজনের হয়, আগন্তুজ রোগ মাত্রেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। নিজস্ব কোনো ব্যক্তিগত দোষ হইতে ইহা ঘটিতে পারে না, কারণ অনেকের একসঙ্গে একই প্রকার দোষ হইতে থাকা সম্ভব নয়। অতএব বাহির হইতেই এ দোষ আসে। যে রোগের সংক্রামকতা খুব অল্প সে রোগে আমরা ইহা ধরিতে পারি না। কিন্তু যে রোগ দ্রুত সংক্রামিত হইতে থাকে তাহা সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারে, তখন উহাকে এপিডেমিক (epidemic) বা মড়ক নামে অভিহিত করা হয়। এই এপিডেমিকের কথা বিচার করিয়া দেখিলেই বীজাণুতত্ত্বের সত্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যাইবে। এপিডেমিকের তত্ত্ব অতি জটিল, তবে মোটামুটি ভাবে তাহার মূল কথাগুলি বলা যাইতে পারে।

এপিডেমিকের কথা

কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি একই রোগে অনেকগুলি লোক একত্রে আক্রান্ত হয়, তাহাকেই আমরা এপিডেমিক বলি। ব্যক্তিগত পীড়াকে যেমন রোগ বলা হয়, ব্যষ্টিগত বা ব্যাপক পীড়াকে তেমনি এপিডেমিক বলা হয়। রোগ একজন মানুষকে ধরে, কিন্তু এপিডেমিক এক-একটি গ্রাম বা শহর বা দেশকে ধরে। এপিডেমিকের নানারূপ বৈচিত্র্য আছে। রোগ এক হইলেও যেমন বিভিন্ন লোকের মধ্যে তাহার লক্ষণের নানারূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়, তেমনি একই এপিডেমিকে দেশ ও সময় অনুসারে নানা প্রকারের বৈচিত্র্য ঘটে। এ বছরের এপিডেমিক অন্য বছরের মত হয় না, ইহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই।

কিন্তু এপিডেমিক আসে কিরূপে ? একজনের রোগ হইতে উহা

পাচজনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই ছড়াইয়া পড়ার পদ্ধতি রোগ-অনুসারে বিভিন্ন। কোনোটি স্পর্শের দ্বারা, কোনোটি শ্বাসপ্রশ্বাসের পথে, কোনোটি মশা-মাছি প্রভৃতি রোগ-বাহনের দ্বারা একজনের শরীর হইতে অন্যের শরীরে নীত হয়। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, এইরূপে নীত না হইলে অন্য কোনো প্রকারে একজনের রোগ অন্যজনে প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পুরাকালের লোকেরা ইহাও বুঝিয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক থুসিডিডিসের গ্রন্থে (খ্রীষ্টজন্মের ৪২০ বৎসর পূর্ব্বে) রোগের আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ কথাই লিখিত আছে শুনা যায়। সেকালের লোক বলিত রোগ সংক্রামিত হয় তিনরূপ উপায়েঃ—রোগীর সহিত সংস্পর্শের দ্বারা, রোগীর সান্নিধ্য-বায়ু সেবনের দ্বারা, বা রোগীর মল-মূত্রাদির স্পর্শের দ্বারা। এরূপ ধারণা বহুকাল হইতে আমাদের দেশেও ছিল। খাদ্য-পানীয়ের দ্বারা অশুচি পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, এবং অশুচি ব্যক্তির হাতে অশুচি খাদ্য খাইলে যে অনিষ্ট হয় এ ধারণা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আছে। সেই ধারণাতেই খাদ্যবিচার সম্বন্ধে তখনকার নানারূপ নিষেধাজ্ঞা এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। তবে কিরূপে কি প্রকার অনিষ্ট হওয়া সম্ভব তাহা অজ্ঞাত থাকায়,—জ্ঞানে যতটুকু মানিয়া চলিলে যথেষ্ট হইত, অজ্ঞানে তদপেক্ষা আমাদের অনেক বেশী করিয়া মানিতে হইয়াছে।

সংস্পর্শের দ্বারা রোগের আদানপ্রদান হয়, এ কথা বোঝা গেলেও রোগের কোন্ বিশিষ্ট পদার্থটি এইরূপে সংক্রামিত হয়, অর্থাৎ রোগের সেই বীজটি যে কি পদার্থ তাহা তখন ধরা পড়ে নাই। কেহ বলিতেন বীজ, কেহ বলিতেন বিষ। কেহ বলিতেন রোগের বীজ আবহাওয়াতেই থাকে, আবহাওয়ার যখন যেমন পরিবর্ত্তন হয় তখন সেইরূপ রোগ জন্মায়। এই সকল অস্পষ্ট ধারণার উপর নির্ভর করিয়া দুই হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানির কিরশের (Kircher) বলিলেন যে, এই বীজ এক প্রকার জীবিত প্রাণী, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ;—কাঁচের লেন্সের সাহায্যে তিনি দেখিয়াছেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আণ্টন লিউভেনহক (Anton Leeuwenhock) আরো উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে আরো স্পষ্টভাবে বীজাণু দেখিতে পান। ইহার

পর মহামতি পাস্তুরই (১৮২২—১৮৯৫) পাকাপাকি ভাবে এই বীজাণুকর্তৃক রোগসৃষ্টির তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু এক এক সময় এক-একটি এপিডেমিক বন্যার মত আসিয়া দেখা দেয়, আবার কিছুদিন পরে অদৃশ্য হইয়া যায় কেন? হিপোক্রেটিস্ শিখাইয়াছিলেন ইহা হাওয়ার দোষে হয়। আমাদের দেশের লোকে বলিত ইহা দেবতার প্রয়োজন অনুসারে ঘটে।

এপিডেমিকসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রথম আলোচনা করেন সিডেনহাম (Sydenham) (১৬৬৬)। তিনি প্রথমে দেখান যে বিভিন্ন এপিডেমিকের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে; পারিপার্শ্বিকের অবস্থা অনুসারে এপিডেমিকের তারতম্য হয়, যথা ঋতুবিপর্য্যয়, মশা-মাছির উৎপাত, খাদ্যের অভাব ইত্যাদি।

এপিডেমিক সম্বন্ধে এখন নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞান (Epidemiology) গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিলে সংক্রামক রোগের রীতি-নীতি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। এই সকল রোগ কখনো বা কচিৎ দুই একস্থানে দুইএকটি মাত্র (sporadic form) দেখিতে পাওয়া যায় কেন, আবার কখনো বা হঠাৎ এপিডেমিকরূপে প্রকাশ পায় কেন,—এক-একটি রোগ কেবল এক দেশেই নিত্য হয় অথচ অন্যদেশে হয় না কেন,—কোনো কোনো এপিডেমিক কয়েক বৎসরের জন্য এক দেশে আধিপত্য করিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়, আবার বহু বৎসর পরে হঠাৎ ফিরিয়া আসে কেন,—কোনো কোনো রোগকে সহজে দেশ হইতে তাড়ানো যায় আবার কোনো রোগকে কিছুতেই তাড়ানো যায়না কেন,—কোনো কোনো রোগ প্রতি বৎসর দেখা দিলেও এক একবার হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়া ওঠে কেন,—ইত্যাদি অনেক তথ্যই এই এপিডেমিওলজির আলোচনায় জানিতে পারা যায়। এপিডেমিকের ক্রিয়াপদ্ধতির ভিতর গভীরভাবে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় যে, ইহার সমস্ত আচরণই নিয়মবদ্ধ ও কার্য্যকারণের সম্বন্ধ অনুসারে সুনিয়ন্ত্রিত; রোগ-সংঘটনের মধ্যে বেআইনি কিছু নাই, মড়কের মধ্যেও আইন-কানুন আছে। সে সকল আলোচনা বিশেষজ্ঞই করিবেন, চিকিৎসকের তাহাতে প্রয়োজন নাই। কিন্তু চিকিৎসকের এইটুকু জানা দরকার যে

রোগ অকারণে হয় না। যে রোগই হউক বা যে এপিডেমিকই হউক, তাহার পশ্চাতে সুনিশ্চিত কারণ আছে, অনুসন্ধান করিলেই তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। আর ইহাও চিকিৎসকের জানা দরকার যে,—যে রোগ নিয়মের বশে আসে, তাহাকে নিয়মের বশেই বাধ্য করা সম্ভব এবং নিবারণ করাও সম্ভব। রোগ অকারণে ঘটে না এবং ইহা অনিবার্য্য নয়,—ইহা নিবার্য্য (অর্থাৎ preventible) দুঃখ। মানুষের এই দুঃখ নিজের চেষ্টায় দূর করাও সম্ভব এবং নিরোধ করাও সম্ভব। কেবল মুখের কথায় নয়, কার্য্যতঃ ইহা প্রমাণিত হইতেছে। ইহার মধ্যে রহস্যময় বা অনিশ্চিত বিশেষ কিছু নাই, যাহা এখনও আছে তাহা কিছুদিন পরে আর থাকিবে না। রোগ-বিজ্ঞান ও এপিডেমিক-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে ইহাই জানিতে পারা যায়।

ছোঁয়াচে রোগ

স্পর্শের দ্বারা যে রোগ সংক্রমিত হয় তাহাকেই আমরা বলি ছোঁয়াচে রোগ। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে রোগীর গাত্রস্পর্শের দ্বারা অথবা ব্যবহৃত বস্ত্রাদির দ্বারা অ্যানথ্রাক্স রোগ (Anthrax) সংক্রমিত হয়। কিন্তু ছোঁয়াচে কথাটি অত্যন্ত ভুল, ইহা প্রয়োগ করাই উচিত নয়। ছুঁইলে যে রোগ হইবে—না ছুঁইলে তাহা হইবে না, এমন কোনই নিয়ম নাই। বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগ সর্ব্বাপেক্ষা ছোঁয়াচে বলা যায়। যদিও এই রোগগুলির বীজ এতই সূক্ষ্ম যে মাইক্রস্কোপেও তাহা দেখা যায় না—কিন্তু আশ্চর্য্য সংক্রামকতার দ্বারা ইহা আপন অস্তিত্ব একেবারে স্থিরসিদ্ধান্তরূপে প্রমাণ করিয়া দেয়। রোগীকে না ছুঁইলেও ইহার বীজ হাওয়ায় ভাসিয়া আসে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়ার বীজও দূর হইতে রোগীর হাঁচি-কাসির মধ্য দিয়া মানুষের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া রোগ জন্মাইতে পারে। অপরপক্ষে বসন্ত-রোগী বা নিউমোনিয়া-রোগী লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াও অনেকে নিষ্কৃতি পাইয়া যায়, ইহা নিত্যই দেখিতে পাই। অবশ্য সাবধানতা যে আমাদিগকে অনেক সময় রক্ষা

করে ইহা নিশ্চয়,—কিন্তু সে সাবধানতা ভিন্ন প্রকারের। রোগীকে না ছুঁইলেই রক্ষা পাইয়া গেলাম, এ-কথা মনে করা নিতান্ত ভুল। রোগের বীজ জানিত বা অজানিত নানা উপায়ে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এবং কতবার যে প্রবেশ করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু বীজ প্রবেশ করিলেই রোগ জন্মায় না,—নানারূপ বাধা বিপত্তি কাটাইয়া যদি উপ্ত হয় তবেই তাহা রোগের সৃষ্টি করিতে পারে।

আমরা জানি রোগ হয় বীজাণু প্রভৃতির দ্বারা। বীজাণু না থাকিলে হয়তো মানুষের সংক্রামক রোগ থাকিত না। কিন্তু বীজাণু নিঃসহায় অবস্থায় পড়িলে কিছুই করিতে পারে না, তাহার সাফল্যলাভের জন্য কতকগুলি অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। মাটিতে বীজ পড়িলেই যেমন গাছ হয় না,—উপযুক্ত বীজ যদি উপযুক্ত মাটিতে পড়ে এবং জলদানাদির দ্বারা যদি সেখানে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবেই যেমন গাছ উৎপন্ন হয়,—মানুষের শরীরে তেমনি রোগের বীজ পড়িয়া যদি অনুকূল অবস্থা পায় তবেই উহা রোগ উৎপন্ন করিতে পারে। বীজাণুর সহিত মানুষের স্বাভাবিক বিরোধ আছে—মানুষ যখন কোনো কারণে নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে এবং সেইসঙ্গে বীজাণুরও সংখ্যা বাড়িয়া যায়, তখনই বীজাণুসকল তথায় অধিকার বিস্তার করে ও রোগের সৃষ্টি করে। তেমনি দেশের আবহাওয়া যখন এককালে মানুষের পক্ষে প্রতিকূল এবং বীজাণুর পক্ষে অনুকূল হইয়া পড়ে, তখনই উহাদের দ্বারা এপিডেমিকের সৃষ্টি হয়। এই প্রতিকূলতা ও অনুকূলতা কিরূপ প্রকৃতির তাহা অন্যত্র আলোচিত হইবে।

বীজ অনুসারে রোগের বিচার

এখন আর আমাদের কেবল রোগের কথাটুকু জানিলেই চলিবে না, বা কোন রোগ কি বীজাণুর দ্বারা হয় তাহা জানিলেও যথেষ্ট হইবে না; বীজাণু প্রভৃতির আচরণের কথা সম্যকভাবেই জানিতে হইবে। পূর্ব্বে আমাদের রোগের নিদান ও চিকিৎসা জানিলেই চলিয়া যাইত। তারপর রোগের বীজ সম্বন্ধে যখন প্রথম জানিতে পারা গেল, তখন বোধ হইল ইহাই

যথেষ্ট। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, আরো অনেক কথা জানা দরকার এবং নিম্নশ্রেণীর জীব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বৃত্তান্ত বিশেষভাবে আয়ত্ত করা দরকার। একদিকে যেমন দেখিতে হয় মানুষের শরীর কি অবস্থায় রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এবং কোনরূপ আবহাওয়া কি প্রকার রোগের পক্ষে অনুকূল,—আর একদিকে তেমনি দেখিতে হয় বীজাণু কোথায় থাকিতে ভালবাসে এবং কোথায় থাকা পছন্দ করে না,—কিরূপে তাহারা শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এবং কি করিলে পারে না,—কিরূপে উহাদের আধিপত্য বাড়ে ও কিরূপে তাহাদের দমন করা যায়, ইত্যাদি অনেক কথা।

যাহারা আমাদের শরীরে নানারূপ ব্যাধি জন্মায় তাহারা একজাতীয় নয়, পরস্পরের মধ্যে বিস্তর ভেদ আছে। কেহবা উদ্ভিদ, কেহবা প্রাণী; কেহবা অতি সূক্ষ্ম প্রাণী, আর কেহবা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও উচ্চস্তরের প্রাণী। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে ইহাদের বিভক্ত করিতে হইয়াছে। যেগুলি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ-জাতীয় **বীজাণু** বা ব্যাক্‌টিরিয়া তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রবিশেষের নাম Bacteriology। যেগুলি সূক্ষ্ম **জীবাণু** বা প্রোটোজোয়া, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রের নাম Protozoology। যেগুলি বৃহৎ বা মেটাজোয়া (যথা ক্রিমি প্রভৃতি) তাহাদের সম্বন্ধে Helminthology। শুধু এই নয়। যেহেতু এই সকল বীজ বা বীজাণু গতিশক্তিহীন, সেইহেতু মানুষের শরীরে নীত হইবার জন্য তাহাদের নানারূপ বাহন (carrier) প্রয়োজন। যেমন মশার দ্বারা ম্যালেরিয়ার জীবাণু, মাছির দ্বারা কলেরার বীজাণু নীত হইয়া থাকে। অতএব এইসকল বাহনদিগের চরিত্রকথাও কিছু কিছু জানা আবশ্যক, নতুবা রোগের উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, নিবারণ করাও সম্ভব নয়।

অনেকে হয়তো বলিতে পারেন, আমাদের এত কথা জানিবার প্রয়োজন নাই, মোটের উপর কোন বীজাণু হইতে কোন রোগের উৎপত্তি এবং তাহার চিকিৎসা কি এইটুকু জানিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এইটুকুতে এখন আর চলিবে না। চিকিৎসাশাস্ত্র বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং আধুনিক চিকিৎসা এই সকল বিদ্যার সঙ্গে এমন

ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে এ বিদ্যা না জানিলে সে-সকল চিকিৎসা প্রয়োগ করাই বিপজ্জনক। বর্ত্তমানে রোগের নানারূপ বিভাগ করা হইতেছে এবং নূতনরূপ পর্য্যায়ের মধ্যে ফেলিয়া তাহার নূতনরূপ নামকরণ হইতেছে—ইহার কারণই এই যে, পুরাতন পদ্ধতিতে লক্ষণানুযায়ী রোগের নাম দিয়া কেবলমাত্র লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা করিলে আর চলিবে না,—উত্তমরূপ চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের গোড়ায় যাইতে হইবে; রোগের লক্ষণ ধরিয়া চিকিৎসা করা, অর্থাৎ যেখানে যেরূপ সাহায্যের দরকার তাহা করা ও যেখানে কষ্টনিবারণের প্রয়োজন সেখানে তাহাই সর্ব্বাগ্রে করা আবশ্যক তো বটেই, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে হইলে কেবল ইহাই যথেষ্ট নয়, বীজাণুগুলিকে বিশিষ্ট উপায়ের দ্বারা দমন করাই প্রধানতঃ আবশ্যক। সুতরাং কোন বীজাণু রোগটির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা জানা দরকার, এবং কেবল লক্ষণ দেখিয়া তাহা অনেক সময় জানা যায় না। বীজাণু আবিষ্কারের পর হইতে ক্রমে এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, একই বীজাণুর দ্বারা নানাপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে এবং তাহার নানা মূর্ত্তি দেখা যাইতে পারে। কেবল মূর্ত্তি দেখিয়া রোগ চিনিতে গেলে অনেক সময় ঠকিতে হয়। সুতরাং নির্ভুল হইতে হইলে বাহিরের মূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়া ভিতরের মূর্ত্তি দেখিতে হইবে। এইজন্য আজকাল রোগের পুরাতন নামগুলি একে একে উঠিয়া যাইতেছে এবং বীজাণু অনুসারে তাহার নামকরণ হইতেছে। ভবিষ্যতে হয়তো পুরাতন নাম কিছুই থাকিবে না, বীজাণুর নামেই সবগুলি পরিচিত হইবে, এবং তাহাই হওয়া উচিত। নতুবা নামের দ্বারাই যে ভ্রান্তি প্রথমে জন্মায় তাহা কিছুতেই দূর করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক নিউমোনিয়া, যাহা নিউমোকক্কাস নামক বীজাণুকর্ত্তৃক উৎপাদিত। নাম শুনিলেই ধারণা জন্মে কেবল বুকে সর্দ্দি জমানোই বুঝি এই বীজাণুর ধর্ম্ম,—অতএব যেখানেই উক্ত বীজাণু প্রবেশ করিবে সেখানেই নিউমোনিয়া হইবে, আর যেখানেই নিউমোনিয়া সেখানে কেবল ঐ বীজাণুই আছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। এই বীজাণু শরীরের নানা স্থানে প্রবেশ করিতে পারে এবং নিউমোনিয়া ছাড়া অন্যান্য প্রকার রোগও জন্মাইতে পারে। ইহার

দ্বারা সামান্য সর্দ্দি-কাসি, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া প্রভৃতি সবই হইতে পারে, রক্তদুষ্টিও (Septicæmia) হইতে পারে, মেনিঞ্জাইটিসও হইতে পারে এবং বাতরোগও হইতে পারে। এমন কি নিউমোকক্কাই বীজাণুর দ্বারা পেরিটোনাইটিস্ (Peritonitis) হইতেও দেখা যায়। (এই প্রকার পেরিটোনাইটিস্ কেবল অল্পবয়স্ক বালিকাদের মধ্যেই প্রায় হয়। এই বীজাণু তাহাদের যোনিপথে প্রবেশ করিয়া পেটের ভিতর পেরিটোনাইটিসের সৃষ্টি করে। বুকে ইহাদের সর্দ্দিকাসির বিশিষ্ট কোনো লক্ষণই থাকেনা,—তবু বীজাণু একই জাতীয় বলিয়া নিউমোনিয়ার চিকিৎসার মতই ইহার চিকিৎসা করিতে হয় এবং তাহাতেই আরোগ্য হয়।) অন্যান্য অনেক বীজাণু সম্বন্ধেই এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কোনো বিশিষ্ট রোগের গণ্ডির মধ্যে যখন বীজাণুসকল আবদ্ধ থাকে না তখন পুরাতন প্রথায় রোগের নামকরণ না হইয়া বীজাণুর নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া রোগগুলির নামকরণ করাই ভাল।

অতএব বর্ত্তমান যুগে পুরাতন ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার, বিজ্ঞান যেরূপ-পথে অগ্রসর হইতেছে, আমাদেরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলা দরকার এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে সকল নূতন নূতন বিভাগের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তাহার কিছু কিছু জানিয়া রাখা দরকার। রোগের সঙ্গে যাহা-কিছুর সম্পর্ক আছে সেগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া যদি কেবল রোগটিকেই চিনিয়া রাখি, তাহা হইলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে,—চিকিৎসা বা পরিচর্য্যা কিছুই বুদ্ধিপূর্ব্বক করা যায় না।

বীজাণু বা ব্যাক্‌টিরিয়ার কথা

বীজাণুবিজ্ঞান (Bacteriology) যে চিকিৎসাজগতে কিরূপ যুগান্তর আনিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হওয়াতেই ভ্যাক্সিন সিরাম প্রভৃতি চিকিৎসার বহু নূতন অস্ত্র মিলিয়াছে এবং তাহার দ্বারা কত প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে। সকলেই এখন এই সকল চিকিৎসা নির্ভয়ে প্রয়োগ করেন, ইহার ক্রিয়াতে অগাধ বিশ্বাস করেন।

কিন্তু এই সম্বন্ধে কতকগুলি কথা আমাদের বিশেষ করিয়া জানা প্রয়োজন,—কারণ বীজাণুতত্ত্ব কিছু জানা থাকিলে উক্তরূপ চিকিৎসা সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারা যায়। সেইজন্য এখানে সংক্ষেপে বীজাণুতত্ত্বের অবতারণা করা হইল।

যে সকল রোগবীজাণুর কথা আমরা জানি, প্রাণীজগতের অতি নিম্নস্তরে তাহাদের স্থান। ইহারা প্রাণবন্ত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জীব ও উদ্ভিদ এই দুইপ্রকার প্রাণস্তরের সীমান্তদেশে ইহারা অবস্থিত। সূক্ষ্মবিচার করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে কতকগুলি উদ্ভিদরাজ্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং কতকগুলি জীবরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। যেগুলি উদ্ভিজ্জাতীয় সেইগুলিকেই বীজাণু বা bacteria বলা হয়। ইহারা তৃণগুল্মজাতীয়, অর্থাৎ বর্ষাকালে ভিজা মাটিতে যেরূপ ছাতা জন্মায়, যাহাকে ইংরেজীতে fungi বলে, ইহারা সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম Schizomycetes। অতি উত্তম মাইক্রস্কোপ ছাড়া ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ যন্ত্রের দ্বারা মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোনো বীজাণুর আয়তন ১/২৫০০০ ইঞ্চির (1 μ) অধিক নয়। খালি চোখে অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টির দ্বারাও ১/২০০ ইঞ্চি আয়তন পর্য্যন্ত দেখা যাইতে পারে, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ সহজ দৃষ্টিতে দেখা যায় না। অতি ক্ষুদ্র একটি ধূলিকণা যদি ১/২০০ ইঞ্চি পরিমাণ হয়, তবে বীজাণু যে তাহা অপেক্ষা কত ছোট এ কথা সহজেই অনুমান করা যাইবে। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই,—কোনো উদ্ভিদেরই নাই। ইহারা আপনা-আপনি এক হইতে দুই, দুই হইতে চার এইভাবে দ্রুতগতিতে বিভক্ত হইয়া সংখ্যায় বাড়িয়া চলে। ইহাদের চেহারায় কিছু কিছু বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু অপাত-দৃষ্টিতে সবগুলিই প্রায় একরকম দেখিতে। মোটামুটি গড়ন দেখিয়া ইহাদের কয়েকটি পর্য্যায় করা হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় বীজাণু বিভিন্ন প্রকারের রং দিয়া রঞ্জিত করা যায়, কে কোন প্রকার রং গ্রহণ করে (staining reactions) তাহা হইতেও ইহাদের চেনা যায়। যেগুলি সোজা দাঁড়ির মত দেখিতে সেগুলিকে **ব্যাসিলাই** (Bacilli) বলা হয়—যেগুলির আঁকা বাঁকা চেহারা সেগুলিকে **স্পিরিলা** (Spirilla)

স্পাইরোকীট (Spirochaetes) ও **ভিব্রিও** (Vibrio) বলা হয়,—আর যেগুলি বিন্দুর মত গোলাকার তাহাদের বলা হয় **কক্কাই** (Cocci)। ইহার মধ্যে স্পিরিলার সংখ্যা কম, কিন্তু ব্যাসিলাই নানাপ্রকার আছে এবং কক্কাইও বহুপ্রকারের আছে। জাতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বীজাণুর বিভিন্নরূপ খাদ্যে আসক্তি, এবং ঐ নির্দ্দিষ্টরূপ খাদ্য পাইলেই ইহাদের পরিপুষ্টি হয়। নির্দ্দিষ্ট বীজাণুকে নির্দ্দিষ্টরূপ খাদ্য দিয়া উহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করাকে কাল্‌চার করা (culture) বা চাষ করা বলে। অনির্দ্দিষ্ট কোনো বীজাণুকে চিনিতে হইলে নানারূপ খাদ্যের মধ্যে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। কোন খাদ্যটিতে তাহার কাল্‌চার বা চাষ প্রচুর হইল, ইহা দেখিয়া তাহা কোন জাতীয় বীজাণু সেই পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহারা অধিকাংশই কিছু উষ্ণতা-প্রিয়, সেইজন্য উষ্ণ ইন্‌কিউবেটরের (incubator) মধ্যে ইহাদের কাল্‌চার করিতে হয়, নতুবা ইহারা স্ফূর্ত্তি পায় না। মানুষের শরীর যতটা উষ্ণ ততটা উষ্ণতাই ইহাদের পক্ষে অনুকূল, সেই উত্তাপের মাপ ৩৭° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (অর্থাৎ সাধারণ থার্ম্মোমিটারের ৯৮·৪)। সেইজন্য মানুষের শরীরে প্রবেশ করিলেও ইহারা স্ফূর্ত্তিলাভ করে। অধিক উত্তাপে ইহারা শুকাইয়া মরিয়া যায়। শুষ্ক অবস্থায় ইহারা ৬৫° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে, কিন্তু জলের মধ্যে থাকিলে ৬০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপেই দশ মিনিটের মধ্যে ঝল্‌সিয়া মরিয়া যায়। কিন্তু ঠাণ্ডার মধ্যে ইহারা মরে না। বরফের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলেও বহুকাল নিষ্ক্রিয় ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বীজাণুদের মধ্যে আবার কতকগুলি বায়ু না পাইলে বাঁচিতে পারে না (aerobes) আর কতকগুলি বায়ুর অভাবেই স্ফূর্ত্তি পায় (anaerobes)।

বীজাণুমাত্রেই রোগ জন্মায় না। কতকগুলি বীজাণু রোগসৃষ্টিকারী আর কতকগুলি নিরীহ, সেই অনুসারে বীজাণুদের দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে,—প্যাথোজেনিক (pathogenic) অর্থাৎ রোগ প্রসবকারী বীজাণু এবং নন্‌-প্যাথোজেনিক (non-pathogenic) অর্থাৎ নিরীহ বীজাণু। ইহার মধ্যে যেগুলি নন্‌-প্যাথোজেনিক বা নিরীহ, তাহাদের সম্বন্ধে

বলিবার কিছু নাই। কিন্তু যেগুলি রোগসৃষ্টিকারী বীজাণু তাহারাও যে সব সময় জীবের ক্ষতিই করিতে থাকে তাহা নয়। ইহারা অনেক সময় মানুষের ও অন্যান্য জীবের চামড়ার উপর বা ঝিল্লিগাত্র আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকে, অথচ ক্ষতি করে না। এইরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিলে ইহাদের commensal বলা হয়। বীজাণুর শরীরে যে একপ্রকার রস থাকে তাহাই কখনো বা বিষাক্ত হইয়া দাঁড়ায় এবং কখনো বা নির্ব্বিষ অবস্থায় থাকে। বীজাণু শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলেই যে নিশ্চয় রোগ হইবে, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। এমন কোনো বীজাণুর নাম আমরা করিতে পারি না, যাহা কোনো প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করাইবামাত্র উহার রোগ নিশ্চয় হইবে। অনেক সময় বীজাণু থাকে অথচ তাহার ক্রিয়া থাকে না। প্রায়ই দেখা যায়, কত মারাত্মক বীজাণু সুস্থ ব্যক্তির শরীরে রহিয়াছে, অথচ তাহাতে রোগ হয় নাই। বস্তুতঃ অনেক সময়েই ইহারা নিরীহ saprophyte রূপে বাস করে, কখনো কখনো বিষাক্ত হইয়া উঠে। বীজাণুবিদ্‌গণ কেহ কেহ বলেন, পৃথিবীর কোনো আদি যুগে বোধ হয় কোনো বীজাণুই বিষাক্ত ছিল না, কালক্রমে বিভিন্ন বীজাণু বিভিন্ন জীবের পক্ষে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা ইহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কোনো নির্দ্দিষ্ট বীজাণু কেবল নির্দ্দিষ্টরূপ প্রাণীর পক্ষেই বিষাক্ত, অন্য জীবের পক্ষে তাহা একেবারে নির্ব্বিষ। মানুষের পক্ষে যে-বীজাণু অতি মারাত্মক, তাহা অনুপযোগী জীবে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলেও কিছু ফল হয় না, কিন্তু উপযোগী প্রাণীতে প্রয়োগ করিলে, যদি অবস্থা অনুকূল হয় তবেই তাহার ক্রিয়া দেখা যায়।

এরূপ স্থলে কোনো বীজাণুকে শরীরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া গেলেই যে বুঝিতে হইবে তাহার দ্বারাই রোগ জন্মিয়াছে, এ কথা বলা চলে না। ঐ নির্দ্দিষ্ট বীজাণু যে ঐ নির্দ্দিষ্ট রোগের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। কতকগুলি প্রামাণ্যের দ্বারা ইহা স্থির করা হয়, সেইগুলির নামককের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বা Koch's Postulates। কক যে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক জগৎ তাহাই মানিয়া চলে। ইহার চারিটি সূত্র আছে—

(১) একই প্রকার রোগে প্রত্যেক রোগীর মলমূত্র বা রক্তাদির মধ্যে একই প্রকার বীজাণু পাওয়া চাই।

(২) ঐ বীজাণুকে ল্যাবরেটরিতে কাল্‌চার করা চাই।

(৩) ঐ বীজাণু কোনো উপযোগী প্রাণীর শরীরে প্রয়োগ করিলে তাহারও অনুরূপ রোগ জন্মানো চাই।

(৪) ঐ পরীক্ষিত প্রাণীর মলমূত্র ও রক্তাদির মধ্যেও ঐ বীজাণু পাওয়া চাই।

এই সূত্র অনুসারে প্রত্যেক রোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের দ্বারা বহুবার পরীক্ষার পর, যখন সকলে একইরূপ ফল পাইয়াছে, তখনই বীজাণু-বিশেষকে রোগ-বিশেষের কারণ বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। এখনও কোনো রোগ সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে, এইরূপ পরীক্ষার দ্বারাই সন্দেহের মীমাংসা করা হয়।

বিষাক্ত বীজাণুর বিষকে টক্সিন্ (toxin) বলা হয়। এই টক্সিন্ দুই প্রকার। যে বিষ বীজাণুর শরীর হইতে বাহিরে নির্গত হয়, তাহার নাম এক্সোটক্সিন (exotoxin)—এবং যে বিষ শরীরের ভিতরে থাকে, বীজাণু মৃত বা পিষ্ট না হইলে নির্গত হয় না, তাহার নাম এণ্ডোটক্সিন (endotoxin)। কোনো জাতীয় বীজাণুর একপ্রকার বিষ থাকে, কাহারও দুই প্রকারই থাকে। এই বিষ অনুসারে রোগও দুইরূপ হয়। যে গুলির শরীর হইতে বিষ বাহির হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হয়, তাহারা প্রায়ই মানুষের শরীরে কোনো স্থানবিশেষে কেন্দ্রস্থ হইয়া বসে, এবং তথা হইতে বিষ সঞ্চারণ করিতে থাকে। এই জাতীয় বীজাণু কর্ত্তৃক ব্যাধিকে টক্সিক্ (toxic) ব্যাধি বলা হয়। যেমন ডিফ্‌থীরিয়া, টেটেনাস্ (ধনুষ্টঙ্কার) প্রভৃতি টক্সিক্ ব্যাধি। আর কতকগুলি বীজাণু শরীরের সর্ব্বত্র রক্তের মধ্যে স্বয়ং সঞ্চারিত হইয়া বেড়ায় এবং নিজের বিষ নিজের মধ্যেই রাখে। এই গুলিকে সেপ্‌টিক্ (septic) বীজাণু বলে। রোগ বিশেষে শরীরের যে কোনো শিরা হইতে রক্ত লইয়া কাল্‌চার করিলেই ইহাদের পাওয়া যায়। নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি সেপ্‌টিক ব্যাধি।

কোনো বিষাক্ত বীজাণু যদি একই সময়ে অনেকগুলি সুস্থ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে, তাহার ফলে দেখা যায় যে কয়েকটি প্রাণী অসুস্থ হয়, কয়েকটি হয় না। যে গুলি অসুস্থ হইল না, আমরা বুঝি যে ঐ সকল প্রাণীর শরীরে

এমন কিছু শক্তি নিহিত আছে, যাহার দ্বারা বীজাণুগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বা নিষ্ক্রিয় হয়। এই বিজয়ী শক্তির নাম দেওয়া হয় ইমিউনিটি (immunity)। এই ইমিউনিটি বা রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা কি করিয়া অর্জ্জিত হয় তাহার তত্ত্ব অতি জটিল, তথাপি সংক্ষেপে ও সাধ্যমত ইহার মর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করা হইল।

প্রতিরোধশক্তি সকল প্রাণীরই আছে। কিন্তু বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে এই শক্তি বিভিন্ন প্রকারের। এই শক্তির জন্য একজাতীয় প্রাণীর যে রোগ হয়, অন্যজাতীয় প্রাণীর তাহা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন জাতীয় রোগের পক্ষে ইমিউন (immune) বা বিজয়ী-শক্তি সম্পন্ন হয়। মানুষের মধ্যেও দেখা যায়, কেহ কেহ কোনো বিশেষ রোগ সম্বন্ধে ইমিউন অর্থাৎ যথেষ্ট সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও তাহার জীবনে কখনও ঐ রোগ হইতে পারে না। এই শক্তি কেবল তাহারই পক্ষে স্বাভাবিক ও মজ্জাগত, ইহার নাম ন্যাচুরাল ইমিউনিটি (natural immunity)। আবার কতকগুলি রোগ এমন আছে, যেগুলি একবার হইয়া গেলে মানুষের ঐ রোগের বিরুদ্ধে চিরকালের জন্য বা কিছু কালের জন্য একটা বিরুদ্ধ শক্তি জন্মিয়া যায়, ততদিন তাহার ঐ রোগ হইতে পারে না। এই অর্জ্জিত শক্তির নাম অ্যাকয়ার্ড ইমিউনিটি (acquired immunity)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বসন্ত, হাম, হুপিংকাসি, টাইফয়েড, মেনিঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি, এই দলের রোগ। কিন্তু এমনও রোগ আছে যাহা একবার হইয়া গেলেও কোনো স্থায়ী বিরুদ্ধশক্তি অর্জ্জিত হয় না, ঐ রোগ পুনরায় শীঘ্রই ধরিতে পারে,—যেমন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। কিন্তু এই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধেই আবার অনেকের স্বাভাবিক শক্তিও থাকিতে দেখা যায়। এই শক্তির আবার তারতম্য ঘটে, অর্থাৎ কয়েক বৎসর যাবৎ যাহার মোটেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইল না, হঠাৎ এক বৎসর কোনো কারণে তাহার উপর্য্যুপরি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতে দেখা যায়। অতএব এই সকল তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বোঝা যায় যে, স্বাভাবিকরূপেই হউক বা অর্জ্জিতরূপেই হউক, বীজাণুর বিরুদ্ধে জীবের শরীরে একরূপ শক্তির অস্তিত্ব আছে। এই শক্তির সন্ধান পাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা খুঁজিতে লাগিলেন এ-শক্তি কি, ইহা কোথায় থাকে, এবং কোনো কৃত্রিম উপায়ে ঐ শক্তির অবতারণা করিয়া রোগ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে কি না।

এই বিষয় লইয়া অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে জানা

গিয়াছে, এই শক্তি একপ্রকার নয় এবং একস্থানে একভাবে ইহা সঞ্চিত হইয়া থাকে না। শরীরের সর্ব্বত্রই ও রক্তের সকল স্থানেই ইহা নানারূপে বর্ত্তমান থাকে এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সকল শক্তি একত্র হইয়াও ক্রিয়া করে। মেচনিকফ্ (Metchnikoff) দেখাইলেন যে, রক্তের শ্বেতকণিকার ও কয়েকপ্রকার আভ্যন্তরিক জৈবকণার এই বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে যে, বীজাণু উপস্থিত হইলেই তাহাদের গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ঐ গ্রাস করিবার প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হইল ফ্যাগোসাইটোসিস্ (phagocytosis)। তাঁহার পরে নাটাল (Nuttall) দেখাইলেন যে, রক্তের সমস্ত কণিকা বাদ দিলেও যে সিরাম বা রক্তলসীকাটুকু থাকে,—তাহারও স্বতন্ত্র বীজাণুনাশী শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করা যাইতেছে। দেখা গেল এই সিরামের মধ্যে কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকে, তাহার দ্বারাও বীজাণু বিনষ্ট হয়। একটির নাম কম্প্লিমেণ্ট (complement), উহা ৬০° ডিগ্রী উত্তাপ লাগিলেই নষ্ট হইয়া যায়। আর একটির নাম অপ্‌সোনিন(opsonin)—ইহা বীজাণু-গুলিকে শ্বেতকণিকাদির গ্রাসোপযোগী করিবার জন্য একরূপ আস্বাদ দান করে এবং এই অপ্‌সোনিন যুক্ত না হইলে বীজাণুকে শ্বেতকণিকা গ্রাস করিতে পারে না। আর একটির নাম ব্যাকটিরিওলাইসিন (bacteriolysin) —যাহা বীজাণুগুলিকে একেবারে দ্রবীভূত করিতে পারে। আর একটির নাম অ্যাগ্লুটিনিন (agglutinin) যাহা বীজাণুগুলিকে একসঙ্গে জড়ীভূত করিয়া তাল পাকাইয়া দেয়, যাহাতে শ্বেতকণিকাদি একসঙ্গে অনেকগুলিকে গিলিয়া ফেলিতে পারে। এই সকল পদার্থ স্বাভাবিক রক্তেই থাকে। কিন্তু অতীতকালে রোগভোগের দ্বারা বা কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা অর্জ্জিত শক্তি যখন জন্মায়, তখন এ ছাড়া আরো কতকগুলি পদার্থ রক্তের মধ্যে আসিয়া যুক্ত হয়। তন্মধ্যে একটির নাম প্রেসিপিটিন (precipitin) যাহা বীজাণুগুলিকে ভাসিয়া থাকিতে দেয় না, স্থানে স্থানে তলাইয়া ফেলিয়া দেয়। আর একটির নাম অ্যালেক্সোফিক্সাজিন (alexofixagin)—যাহা কম্প্লিমেণ্ট-পদার্থের সহিত বীজাণুর রাসায়নিক সংযোগ ঘটাইয়া উহাদের নষ্ট করে।

আরো অনেক প্রকার পদার্থের নাম উল্লিখিত আছে, কিন্তু সে সকল নাম-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। মোটের উপর বুঝিলেই যথেষ্ট যে রক্তের

মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষমতাই কতকটা আছে এবং অবস্থাবিশেষে অন্যান্য অস্বাভাবিক ক্ষমতারও উদ্রেক হয়। রক্তের স্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন পদার্থগুলিকে এককথায় বলা হয় এণ্টিবডি (antibodies) এবং অস্বাভাবিক বা অর্জ্জিত পদার্থগুলিকে বলা হয় ইমিউন্ বডি (immune bodies)—আর এই গুলির সম্পর্কে বীজাণু প্রভৃতি রোগবাহী বীজের উল্লেখ করিতে হইলে এক কথায় সেগুলিকে বলা হয় এণ্টিজেন (antigen)। এই নাম অনুসারে বলা যাইতে পারে এণ্টিজেন উপস্থিত হইলেই এণ্টিবডি জাগিয়া উঠে। এণ্টিজেনের বিরুদ্ধে যদি এণ্টিবডি খুব প্রবল হয় তবে সব এণ্টিজেনই বিনষ্ট হয়, সুতরাং রোগ জন্মিতে পারে না। যখন এণ্টিবডির ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, তখনই রোগের সৃষ্টি হয়। কতবার যে আমাদের শরীরে বীজাণু প্রবেশ করে ও কতবার তাহারা বিনষ্ট হয় তাহা আমরা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারি না। যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ কিছুই জানা যায় না, যখন উহা কমিয়া যায় তখনই দেখি রোগ হইল। বীজাণু ও জীবগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিত্যই চলিয়াছে, তাহার মধ্যে বীজাণুর জয় ও জৈবশক্তির পরাজয় দৈবাৎ হয়,—সুতরাং জীবের ব্যাধি হওয়া একরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা।

বীজাণুকে সর্ব্বদা ভয় করিবার আমাদের বিশেষ কারণ নাই। বীজাণুর কথা শুনিয়া শুনিয়া আমরা এখন উহার নাম শুনিলেই আতঙ্কিত হই, বীজাণু-সংস্পর্শের সন্দেহমাত্রে শুচিবাইগ্রস্তের মত আচরণ করি। কিন্তু বাস্তবিক বীজাণুকে তত ভয় নয় যত ভয় নিজের অক্ষমতাকে। ঘর যাহার সুরক্ষিত, শত্রুকে তাহার ভয় নাই।

রোগ-প্রতিরোধ সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত আছে। মেচ্‌নিকফ্ ও নাটালের পুরাতন থিওরির উপর আরো দুইটি নূতন থিওরি যুক্ত হইয়াছে। একটি বেস্‌রেড্‌কার (Besredka) থিওরি। তিনি বলেন শরীরের সর্ব্বত্রই যে এইরূপ এণ্টিবডি বা এণ্টিভাইরাসের (antivirus) উৎপাদন হয় তাহা নয়, যেখানে প্রয়োজন কেবল সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানবিশেষেই হয়। যে যে বীজাণুর জীবদেহের যে যে বিশিষ্ট অংশের উপর আধিপত্য,—তথাকার স্থানীয় জৈবকণাগুলিই ঐ ক্ষমতা লাভ করিয়া স্বপ্রধান (autonomous) হইয়া পড়ে। যেমন টাইফয়েডের বিরুদ্ধে কেবল অন্ত্রের জৈবকণাগুলিই বিরোধীশক্তি-

সম্পন্ন হয়। ইহাকে তিনি বলেন local immunity অর্থাৎ স্থানীয় প্রতিরোধ-শক্তি। ইহার মতে স্থানীয় জৈবকণাগুলি বীজাণুর আগমনমাত্রে তাহাদের গ্রাস করে এবং তাহাতে তাহার গ্রাসশক্তি ও হজমশক্তি উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে, এইরূপে সমস্ত বীজাণু বিনষ্ট হয়। রক্তের সিরামে যে সকল এন্টিবডি থাকে তাহা এই কার্য্যের সহায়তা করে মাত্র। সেইজন্য তিনি বলেন যেখানকার রোগ সেইখানেই প্রতিরোধের চেষ্টা করা আবশ্যক।

আর এক নূতন আবিষ্কার ডিহেরেলের (D'Herelle) ব্যাক্টিরিওফাজ-থিওরি। কয়েকপ্রকার বীজাণুর কাল্‌চার করিলে দেখা যায় ঐ কাল্‌চারের মধ্যেই সঙ্গে সঙ্গে এমন এক বিপরীত পদার্থ উৎপন্ন হয় যাহার সংস্পর্শমাত্রে বীজাণু মরে। কেবল কাল্‌চারেই নয়, রোগীর মলমূত্রের মধ্যেও বীজাণুর সঙ্গে সঙ্গে এই অজানিত বীজাণু-বিরুদ্ধ পদার্থ পাওয়া যায়। বীজাণু ও এই পদার্থকে সূক্ষ্ম ছাঁকুনির সাহায্যে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়, কারণ যে ছাঁকুনিতে কোনো বীজাণু গলে না, এই পদার্থ তাহার মধ্য দিয়াও গলিয়া যায়। কাল্‌চারের দ্বারা এই পদার্থেরও পরিমাণ ইচ্ছামত বৃদ্ধি করা যায়। তখন এই পদার্থের মধ্যে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী বীজাণু নিক্ষেপ করিলেই তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যদিও ঐ পদার্থের কিছুই মাইক্রস্কোপে দেখা যায় না, তবু উহার মধ্যে বীজাণু দিবামাত্রই তাহা একেবারে গলিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—সুতরাং দেখা না গেলেও উহার মধ্যে কিছু আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। এই অদৃশ্য পদার্থের নামই ব্যাক্টিরিওফাজ। ডিহেরেল্ বলেন এগুলি বীজাণুর অনুবীজাণু—ইহারা অনুবীক্ষণোত্তর বা ultramicroscopic অর্থাৎ এত সূক্ষ্ম যে কোনো মতে গোচর হইবার উপায় নাই। যেখানে যে বীজাণু আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহার উপযুক্ত অনুবীজাণু আছে,—এই অনুবীজাণুর সংখ্যা বেশী হইলেই বীজাণু মরিয়া যাইবে। যেখানে বীজাণু অপেক্ষা ব্যাক্টিরিওফাজের সংখ্যা বেশী সেখানে রোগ হয় না, যেখানে কম সেই খানেই রোগ হয়। এ থিওরি সর্ব্বত্র না খাটিতে পারে, কিন্তু পেটের রোগ সম্বন্ধে খাটে, অন্ততঃ ব্যাক্টিরিওফাজ চিকিৎসায় তাহা প্রমাণ হয়।

এই সকল কথা যদি কেবল অনুমান, কল্পনা বা থিওরিমাত্র হইত তবে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু যখনই কোনো নূতন থিওরি আবিষ্কৃত হয়, তখনই দেখা যায়

যে, তাহা কয়েকটি রোগের জটিল সমস্যার সমাধান করিল এবং চিকিৎসার দুর্গম পথ কিছু সহজ করিয়া দিল। অতএব এই সকল থিওরির মধ্যে কোনটিই ভুল নয়। সকলগুলির মধ্যেই সত্য আছে, তবে আশানুরূপভাবে সর্ব্বত্র কোনোটিই খাটে না, আবার এক এক স্থানে এক একটি থিওরি বেশ খাটে। জৈবপ্রকৃতির রহস্য অনন্ত প্রকার, তন্মধ্যে যতটুকু আমরা জানিতে পারি এবং যতটুকু কাজে লাগিয়া যায় ততটুকুই আমাদের লাভ।

আসল কথা, জৈবপ্রকৃতি সর্ব্বদা এক চালে চলে না, এবং একভাবে সর্ব্বদা কাজ করে না। বিপদ উপস্থিত হইলে যে ভাবে সুবিধা সেই ভাবেই তাহা দমন করিতে চেষ্টা করে, ইহাকেই বলে জীবনীশক্তি। এই শক্তি যখন সতেজ তখন কোনোই আশঙ্কা নাই, যখন নিস্তেজ হয় তখনই তাহাকে সাহায্য করিবার নানারূপ চেষ্টা আবশ্যক। এই চেষ্টা কখন কোন দিক দিয়া চালিত হইলে ও কোন থিওরির সাহায্য লইলে সফল হইবে তাহাই আমাদের বিচার্য্য। আবিষ্কারকেরা নানা সত্যের আবিষ্কার করেন এবং নানা থিওরির- প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই প্রকারে তাঁহারা চিকিৎসকের তূণে নানারূপ অস্ত্র দান করিয়াছেন, সেইগুলি সার্থকরূপে প্রয়োগ করিতে জানাই কেবল আমাদের কর্ত্তব্য। বীজাণুবিদ্যা এখনও অসম্পূর্ণ। তথাপি এ পর্য্যন্ত যাহা জ্ঞানগোচর হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা যে চিকিৎসার পথ পাওয়া গিয়াছে তাহা আয়ত্ত করিবার জন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝা গেল যে নানাভাবে শরীরের স্বাভাবিক বিরোধীশক্তির হ্রাস হইলে বীজাণু বলবান হয় ও তাহাতেই রোগ জন্মায়। অতএব যদি কোনো উপায়ে ঐ শক্তির পুনরায় বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তবে রোগেরও উপশম হইবে,—এই উদ্দেশ্যেই আজকাল ভ্যাক্সিন সিরাম প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু উহা প্রয়োগ করিতে বিশেষ বুদ্ধিবিবেচনার আবশ্যক, কারন ঠিক উপযুক্তক্ষেত্র ছাড়া এ গুলি ব্যবহার করা চলিবে না। যে ভ্যাক্সিন বা সিরাম যে নির্দ্দিষ্ট বীজাণুর প্রতিরোধী, সেই বীজাণু ছাড়া অন্য পক্ষে তাহা একেবারেই নিষ্ফল। সেইজন্যই এই সকল চিকিৎসার ক্রিয়াকে স্পেসিফিক (specific) বা বিশিষ্টক্রিয়া বলা হয়।

অতএব এগুলি দিতে হইলে আগে নিশ্চিতরূপে জানিয়া লইতে হইবে কোন বিশিষ্ট বীজাণুর উপর কি অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বীজাণুদের দুই প্রকার বিষ, একপ্রকার বহির্বিষ বা এক্সোটক্সিন, ও একপ্রকার অন্তর্বিষ বা এণ্ডোটক্সিন;—এবং সেই অনুসারে রোগকে টক্সিক্ অথবা সেপ্‌টিক্ বলা হয়। অতএব বহির্বিষ নষ্ট করিবার জন্য যে চিকিৎসাপ্রণালীর আবশ্যক, অন্তর্বিষ নষ্ট করিবার সে প্রণালী নয়, প্রথমে এই কথাই মনে করিয়া রাখার দরকার। সুতরাং কোন বীজাণু বহির্বিষসম্পন্ন এবং কোনগুলি অন্তর্বিষসম্পন্ন তাহার একটা ধারণা থাকা আবশ্যক।

এই সকল কথা মনে রাখিয়া আমাদের চিকিৎসার উচিতপথ বাছিয়া লইতে হইবে। ঠিক স্থানে ঠিক জিনিষটি প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহার ফল একেবারে অব্যর্থ, সেইজন্যই এ সকল চিকিৎসার এত আদর। প্রমাণ-স্বরূপ বলা যায় ডিফ্‌থীরিয়াতে সিরামের সাফল্য, ষ্ট্রেপ্‌টো বা কোলাই প্রভৃতির রোগে ভ্যাক্সিনের সাফল্য।

বীজাণুবিদ্যার সাহায্যে আজকাল চার রকম উপায়ে আমরা বীজাণুকুলকে আক্রমণের চেষ্টা করি। (১) ভ্যাক্সিন ইনজেক্‌শনের দ্বারা (রাইট্)

(২) মুখ দিয়া ও স্থানীয়রূপে ভ্যাক্সিন পদার্থ প্রয়োগের দ্বারা (বেস্‌রেড্‌কা)

(৩) সিরাম প্রয়োগের দ্বারা (বেরিং)

(৪) ব্যাক্‌টিরিওফাজের দ্বারা (ডিহেরেল্)

চারিজন বিভিন্ন আবিষ্কর্ত্তার আবিষ্কারের ফলে এই চার প্রকার ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রোগের এবং বীজাণুর অবস্থা-অনুসারে ইহার প্রত্যেকটিই সফল।

(১) ভ্যাক্সিন-চিকিৎসা (Vaccine therapy)

এই চিকিৎসার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন রাইট্ (Wright)। মৃত বীজাণু নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় লবণজলে গুলিয়া ভ্যাক্সিন প্রস্তুত হয়। যে সকল বীজাণুর অন্তর্বিষ (endotoxin) আছে কিন্তু বহির্বিষ (exotoxin)

নাই, তাহাদের বিরুদ্ধেই ভ্যাক্সিন প্রযুক্ত হয়। ভ্যাক্সিন প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি এবং কিরূপভাবে তাহা ক্রিয়া করে ইহা বলিতে গেলে বহু জটিল কথার প্রয়োজন,—কেবল সংক্ষেপে তাহা উক্ত হইল। কোনো অন্তর্বিষযুক্ত বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ জন্মাইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে শরীরশক্তি তাহার সহিত সংগ্রামে অপারগ হইয়াছে। বীজাণু বলবান দেখিয়া সে শক্তি এখন নিষ্ক্রিয় এবং বীজাণু ইচ্ছামত ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু নিষ্ক্রিয় হইলেও সে শক্তি এমন অবস্থায় থাকে যে কখনও যদি অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ বীজাণুর সাক্ষাৎ পায়, তবে তাহাকে অনায়াসে দমন করিতে পারে। এ শক্তির বিশেষ ধর্ম্ম এই যে ক্রিয়া করিতে পারিলেই তাহা উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি পায় এবং ক্রিয়াতে বিফল হইলেই তাহা নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে। শক্তির ব্যবহার করিতে করিতেই তাহা তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে, ইহা শক্তিমাত্রেরই ধর্ম্ম। যে সকল শ্বেতকণিকাদি (phagocytes) কোনো তেজস্বী বীজাণুকে গ্রাস করিতে অপারগ থাকে, তাহাদের সম্মুখে যদি প্রথমে নিস্তেজ বীজাণু উপস্থিত করা হয়, তখন ইহাকে গ্রাস করিয়া তাহাদের এমনই ক্ষমতার বৃদ্ধি হয় যে, অতঃপর তেজস্বী বীজাণুকে তাহারা অনায়াসেই গ্রাস করিতে পারে। এইরূপ উপায়ে শক্তিবৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ভ্যাক্সিনের সৃষ্টি। ভ্যাক্সিন প্রস্তুতকালে বীজাণুসকল মৃত হইলেও তাহার আন্তরিক বিষ একেবারে নষ্ট হয় না,—অনেকটা নিস্তেজ হইয়া যায় মাত্র। শরীরের শক্তিকে প্রথমে মৃত বীজাণু মারিতে শিখাইলে, তাহার পর উহা জীবন্ত বীজাণুকে মারিতে সক্ষম হইবে,—এইজন্যই ভ্যাক্সিনের ব্যবহার। যে ব্যক্তি লক্ষ্যভেদ করিতে ভাল পারে না, তাহার হাতে বন্দুক থাকিলেও শিকার পলাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা,—কিন্তু কৃত্রিম শিকার সম্মুখে রাখিয়া যদি তাহাকে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করানো হয়, তখন আর তাহার হাত হইতে শিকার পলাইতে পারে না। ভ্যাক্সিন চিকিৎসার মূল অর্থই তাই,—কৃত্রিম শত্রুকে লক্ষ্যস্বরূপ খাড়া করিয়া জৈবশক্তিকে শিকার করিতে শিখানো। কিন্তু এখানে কিছু কথা আছে। যেখানে শক্তি অল্প কেবল সেখানেই ইহার প্রয়োগের দ্বারা তাহার উৎকর্ষ হইতে পারে,—কিন্তু যেখানে সে শক্তি মোটেই নাই

সেখানে ভ্যাক্সিন দিয়া কোনোই ফল নাই,—বরং তাহা আরো অনিষ্টকর। অতএব রোগীর অবস্থা দেখিয়া যেখানে শক্তি আছে বুঝা যায় কেবল সেখানেই ইহা দিতে পারা যায়। অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থায় বা রোগের অতি প্রবল অবস্থায় ভ্যাক্সিন দিতে নাই। ভ্যাক্সিনের কিছু প্রতিক্রিয়া আছে,—কারণ নিষ্ক্রিয় শক্তিকে ইহা হঠাৎ দ্বন্দ্বে নিযুক্ত করে। রোগী এই হঠাৎ প্রতিক্রিয়া সহ্য করিবে কি না তাহা বুঝিয়া দেখিতে হয়। অপরপক্ষে ভ্যাক্সিন বেশী মাত্রায় ব্যবহার করাও উচিত নয়,—তরুণ রোগে ইহা এত কম মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত যাহাতে প্রতিক্রিয়া বিশেষ টের পাওয়া না যায়,—কেবল পুরাতন রোগে যেখানে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার আবশ্যক সেখানেই ইহা অধিকমাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। বিষাক্ততার মাত্রা হিসাবে বিভিন্ন বীজাণুর ভ্যাক্সিনের বিভিন্নরূপ মাত্রা ধার্য্য করা হয় এবং রোগীর বয়স ও অবস্থা অনুসারে মাত্রার তারতম্য করিতে হয় ও অল্প হইতে ক্রমে ক্রমে বাড়াইতে হয়। কয়েকপ্রকার রোগে ভ্যাক্সিন চিকিৎসায় বেশ উপকার দেখা যায়, যথা—কোলাই জ্বরে, সর্দ্দি কাসি ও ইনফ্লুয়েঞ্জাতে, ঘা-ফোঁড়ায়, ফাইলেরিয়া রোগে, বীজাণুজনিত পুরাতন আমাশা রোগে, বাত রোগে, ও অন্যান্য কয়েকপ্রকার পুরাতন রোগে। আজকাল পুরাতন বাতে (chronic arthritis) প্রোটিন্ শক্ (protein shock) দিয়া আরোগ্য করিবার জন্য কোনো কোনো ভ্যাক্সিন ইন্ট্রাভিনাস ইন্জেক্‌শনরূপেও ব্যবহার হয়।

ভ্যাক্সিনের আর এক প্রধান ব্যবহার বীজাণুঘটিত রোগ সমূহের সম্ভাবনা হইলে পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্য। উদ্দেশ্য ঐ একই, মৃত শত্রুর আস্বাদ দিয়া পূর্ব্ব হইতে অনাগত জীবন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষমতা সঞ্চয় করিয়া রাখা। আজকাল কলেরার বিরুদ্ধে, টাইফয়েডের বিরুদ্ধে, প্লেগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী (preventive) ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করিয়া কিরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে এবং ঐ সকল রোগের কবল হইতে কত লোক রক্ষা পাইতেছে তাহা সাধারণের কাহারো অবিদিত নাই। বসন্ত রোগের টিকাও একপ্রকার ভ্যাক্সিন,—যদিও উহার বীজাণু জানা নাই, রোগীর দেহের অজ্ঞানিত বিষ হইতেই উহা প্রস্তুত হয়। কুকুরে কামড়ানোর যে ইন্জেক্‌শন দেওয়া হয় তাহাও একপ্রকার ভ্যাক্সিন,

ইহারও বীজ অজানিত, ক্ষিপ্ত কুকুরের মস্তিষ্ক হইতে ইহা প্রস্তুত করা হয়। মহামতি পাস্তর (Pasteur) এই চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করিয়াই স্বনামধন্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে ভ্যাক্সিন ইনজেক্‌শন দিয়া প্রত্যাশিত রোগের প্রতিরোধ করা ও মহামারী নিবারণ করা আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণপ্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

(২) রোগের আক্রমণ স্থানে (local) ভ্যাক্সিন প্রয়োগের প্রবর্ত্তক বেস্‌রেড্‌কা যে ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করেন তাহার নাম **বিলিভ্যাক্সিন** (Bilivaccine)। পেটের পীড়ার যে বীজাণু, তাহার ভ্যাক্সিন পেটেই প্রয়োগ করা উচিত, চর্ম্মস্ফোটকের জন্য যে ভ্যাক্সিন তাহা চর্ম্মেই প্রয়োগ করা উচিত, এইরূপ মতের ইনি পক্ষপাতী। মৃতবীজাণুকে শুখাইয়া বড়ির আকারে ইনি বিলিভ্যাক্সিন প্রস্তুত করেন, এবং বিভিন্ন বীজাণুর বড়ি বিভিন্ন পেটের রোগ নিবারণ করিবার জন্য খাইতে উপদেশ দেন। কিন্তু এই ভ্যাক্সিন পিত্ত-উত্তেজক ঔষধের সহায়তা ভিন্ন ক্রিয়া করিতে পারে না। সেইজন্য আগে পিত্তের বড়ি খাওয়াইয়া পরে এই ভ্যাক্সিন খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে। ফরাসী দেশে ইহার যথেষ্ট প্রচলন এবং কলেরা, টাইফয়েড্, ব্যাসিলারি আমাশা প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধের জন্য ইহা সৈনিকদের মধ্যে প্রয়োগ করিয়া এই সকল রোগের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে এই কথা শুনা যায়।

(৩) সিরাম চিকিৎসা (Serum therapy)

সিরাম ব্যবহারের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। যেখানে রোগীর শরীরে এণ্টিবডির অভাব বা অপ্রতুলতা, সেখানেই সিরামের আবশ্যকতা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রক্তের সিরামে যে এণ্টিবডি থাকে তাহা বীজাণুকে গ্রাস করে না কিন্তু ফ্যাগোসাইটগুলিকে সাহায্য করে, এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বীজাণুর বিষকে নষ্ট করে। এই সকল কারণে যে সকল বীজাণুর এক্সোটক্সিন আছে, অর্থাৎ যেগুলি নিজের শরীর হইতে বিষপদার্থ অনবরত বাহিরে নিক্ষেপ করিতে থাকে, বিশেষ করিয়া তাহাদেরই বিরুদ্ধে সিরামের ব্যবহার উপযুক্ত। কারণ বীজাণু

এখানে হয়তো সংখ্যায় অধিক না থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহার বিষ শরীরের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে, এবং কেবলমাত্র রক্তের এন্টিবডিই ইহা নাশ করিতে পারে। এখানে আপাততঃ বীজাণুকে আক্রমণ করিবার আবশ্যক নাই, কারণ উহারা বিনষ্ট হইলেও উদ্গীর্ণ বিষটুকু থাকিয়া যাইবে, অথচ তাহাই আসল অনিষ্টকারী। বিষের তেজে শরীরের এন্টিবডিগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, বিষটুকু নষ্ট হইয়া গেলে এন্টিবডি পুনরুজ্জীবিত হইয়া ফ্যাগোসাইটগুলিকে উত্তেজিত করিবে, তখন তাহারাই অনায়াসে বীজাণুদের ধ্বংস করিতে পারিবে। উপস্থিত বিষই দূর করা প্রয়োজন, এবং সেজন্য উপযুক্ত পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন তাজা এন্টিবডির প্রয়োজন। এই এন্টিবডি রক্তে ছাড়া আর কোথাও থাকে না,—যখন রোগীর শরীরে উহার অভাব তখন অন্য প্রাণীর রক্ত হইতে উহা ধার করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ প্রাণীর শরীরে যথেষ্ট এন্টিবডি থাকে না— যে প্রাণী যে রোগকে জয় করিয়া আরোগ্য লাভ করে, কেবল উহারই শরীরে ঐ নির্দ্দিষ্ট রোগের বিষের বিরুদ্ধে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের এন্টিবডি প্রস্তুত থাকে, কারণ অনতিপূর্ব্বে ঐ সকল এন্টিবডি বিষনাশী ক্ষমতা যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছে। প্রয়োজন মত এইরূপ প্রাণী পাওয়া যায় না বলিয়া কৃত্রিম উপায়ে কোনো প্রাণীর শরীরে রোগের বীজ প্রবেশ করাইতে করাইতে উহাকে ক্রমে ক্রমে উক্ত রোগের বিরুদ্ধে অজেয় শক্তিসম্পন্ন করা হয়। পরে ঐ প্রাণীর রক্ত হইতে সিরাম আহরণ করিয়া রোগীর শরীরে প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে রোগীকে আপন রক্তের দ্বারা আর কোনই চেষ্টা করিতে হয় না, তাহার নিজের রক্ত যে কার্য্য করিতে অক্ষম, পরের রক্তের তৈয়ারী এন্টিবডি-পূর্ণ সিরাম আসিয়া তাহার হইয়া সেই কার্য করিয়া দেয়। ইহার নাম প্যাসিভ ইমিউনিটি (passive immunity)। ঘোড়ার শরীরে যথেষ্ট রক্ত পাওয়া যায় বলিয়া ঘোড়াকেই সাধারণতঃ সিরাম প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা হয়।

মনে করুন কাহারো ডিফ্থীরিয়া হইয়াছে। এখানে বীজাণুগুলি রোগীর গলার ভিতর বাসা বাঁধিয়াছে এবং তাহাদের বিষ ক্ষরিত হইয়া নিত্য শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। রক্তের এন্টিবডিগুলি এ বিষকে দমন করিতে অক্ষম

হইয়াছে নিশ্চয়, নতুবা রোগ দেখা দিত না। এ স্থলে বহুপরিমাণে এন্টিবডি পৌছাইয়া দিতে পারিলেই রোগটি সারে। এখন কৃত্রিম উপায়ে ঘোড়াকে ডিফ্থীরিয়ার বীজ ইন্জেক্শন দিয়া তাহার সিরামে উপযুক্ত এন্টিবডি জন্মাইয়া উহা বিক্রয়ার্থ বাজারে বাহির করা হয়। এই সিরাম রোগীকে ইন্জেক্শন দিলেই উহার এন্টিবডির দ্বারা ডিফ্থীরিয়া আরোগ্য হইবে। এইরূপে যত বহির্বিষ-ক্ষরণকারী রোগবীজাণু তাহাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সিরামও প্রস্তুত করা হয়। ঘোড়াকে ঐ বীজাণু প্রথমে অতি অল্প মাত্রায় ইন্জেক্শন করিতে আরম্ভ করা হয়, যাহাতে উহার জীবনের অনিষ্ট না ঘটে। পরে ক্রমে ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া দিতে দিতে এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন যথেষ্ট পরিমাণ বীজাণু ঐ ঘোড়া অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, যদিও অন্য ঘোড়াকে সে-পরিমাণ দিলে তাহা নিশ্চয়ই মরিয়া যাইত। ইহাতেই বুঝা যায় যে ঘোড়াটির শরীরে এখন যথেষ্ট এন্টিবডি জন্মিয়াছে। কত পরিমাণ এন্টিবডির সৃষ্টি হইল এবং কতটা বিষ উহার দ্বারা নষ্ট হইবে তাহাও মাপিয়া দেখিবার উপায় আছে। সুতরাং ইহাতে আন্দাজ নাই। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে এন্টিবডিযুক্ত সিরাম তখন উহার রক্ত হইতে পৃথক করিয়া কাঁচের আম্পুলের (empoule) মধ্যে ভরিয়া রাখা হয়। এই সিরাম ইনজেক্শন দিবামাত্র উহা রোগীর রক্তের সহিত মিশিয়া তাহাকে এন্টিবডির দ্বারা সমৃদ্ধ করে। এই তৈয়ারী এন্টিবডি-সম্পন্ন সিরাম অতি অক্ষম ও নিস্তেজ রোগীকেও প্রয়োগ করিতে পারা যায়—কারণ ইহাতে তাহাকে কোনরূপে উত্তেজিত করা হয় না, বাহির হইতে কেবল ক্ষমতা জোগান দেওয়া হয় মাত্র। উপযুক্ত রোগে ইহা সকল অবস্থাতেই দেওয়া যায়। চর্ম্মনিম্নে (subcutaneous) ইন্জেক্গন দিলে ইহা ক্রমে রক্তে পৌছিয়া ক্রিয়া করিতে দুই-তিন দিন সময় লাগে। অতএব যেখানে দ্রুত ক্রিয়া আবশ্যক সেখানে তৎপরিবর্ত্তে ইণ্ট্রামাস্কুলার এমন কি ইণ্ট্রাভেনাস ইন্জেক্শনের দ্বারাও একেবারে রক্তের মধ্যে শীঘ্র পৌছাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার মধ্যেই ইহার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। এইরূপ ইন্জেক্শনে বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই।

বহির্বিষ বা এক্সোটক্সিন-সম্পন্ন টক্সিক্-ব্যাধি ছাড়াও অন্যত্র সিরামের
প্রয়োজন আছে। কয়েক প্রকার সেপ্‌টিক্ ব্যাধিতেও ইহার আবশ্যক
হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বীজাণুর বিষ নষ্ট করা ইহার একমাত্র
কাজ নয়,—ফ্যাগোসাইটগুলিকে উত্তেজিত করা এবং বীজাণুগুলিকে
তাহাদের গ্রাসোপযোগী করাও ইহার আর এক কাজ। অতএব যেখানে
বীজাণু বড়ই বলবান, আর হয়তো কিছু বহির্বিষ বা এক্সোটক্সিনও
আছে,—এমন সকল রোগের মৃদু বা সাধারণ অবস্থায় ভ্যাক্সিনই প্রয়োগ
করা হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করিলে
তখন ভ্যাক্সিন দেওয়ার সময় নয়, তখন সিরাম ব্যবহার করাই উচিত।
অর্থাৎ যখন শক্তির মাত্রা অতি কম, তখন তাহাকে উত্তেজিত করিতে
যাওয়া বিপজ্জনক, তখন তাহাকে প্রস্তুত করা কৃত্রিম শক্তি সরবরাহ
করিতে হইবে। কয়েকটি বীজাণুর নাম করা যাইতে পারে, সাধারণতঃ
যাহাদের বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিনই ব্যবহার করা হয় কিন্তু স্থানবিশেষে সিরামও
ব্যবহার হয়। যেমন ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস, ষ্ট্যাফিলোকক্কাস, কোলাই ব্যাসিলাস্,
ইত্যাদি। সেইজন্য এই সকল বীজাণুর বিরুদ্ধেও সিরাম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সিরাম ইন্‌জেক্সনের দ্বারা যেমন অতি শীঘ্র এণ্টিবডির ক্রিয়া পাওয়া
যায়, তেমনি অতি শীঘ্র ইহার ক্রিয়া ফুরাইয়া যায়। যেটুকু এণ্টিবডি
প্রেরণ করা হয়, তাহা উপযুক্ত পরিমাণ বিষকে নষ্ট করিয়া শীঘ্রই
নিঃশেষিত হইয়া যায়,—তখন অবশিষ্ট বিষের জন্য পুনরায় সিরামের
আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভ্যাক্সিন দিলে যেমন শক্তি বাড়ে ও তাহার
ফল অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে, সিরামের পক্ষে সে কথা খাটে না;
সেইজন্য সিরাম যেখানে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা হয়, সেখানে রোগ
আরোগ্য-মুখে না যাওয়া পর্য্যন্ত উহা পুনঃ পুনঃ দিতে হয়। সিরামে
বীজাণুর বিষই নষ্ট হয় কিন্তু বীজাণু মরে না, অতএব দুই এক মাত্রা
সিরাম দিয়া উহা স্থগিত করিলে যেমনি উহার ক্রিয়া ফুরাইয়া যায়,
তেমনি বীজাণুগুলি আবার পূর্ব্বের মত অনিষ্ট করিতে থাকে। সেইজন্য
সিরামে কিছু উপকার দেখিলে না থামিয়া উহা শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে হয়।

সিরাম প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি সাবধানতাও অবলম্বন করা দরকার।

প্রায় সর্ব্বপ্রকার সিরামই ঘোড়ার রক্ত হইতে প্রস্তুত হয়, সুতরাং
বিভিন্ন সময়ে একজন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন রোগের জন্য যতবারই
সিরাম ইন্‌জেক্‌শন দিবার আবশ্যকতা হউক, তাহার শরীরে পুনঃ পুনঃ
কেবল ঘোড়ার রক্তের সিরামই প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ
একই প্রকার বিজাতীয় প্রাণীর রক্ত একবার শরীরের মধ্যে গ্রহণ
করিয়া যদি বহুকাল পরে ঐ প্রাণীর রক্ত আবার কোনো কারণে গ্রহণ
করিতে হয়, তখন তাহা সকলে নিরাপদে সহ্য করিতে পারে না, কাহারও
কাহারও শরীরে এইরূপ দ্বিতীয়বার ইন্‌জেক্‌শন লইয়া হঠাৎ বিপত্তি ঘটিতে
দেখা যায়। এই প্রকার দুর্ঘটনার নাম অ্যানাফিলাক্সিস (Anaphylaxis)।
ইন্‌জেক্‌শন দিবা মাত্র তখন দেখা যায় যে হঠাৎ কাহারো কাহারো মুখ
চোখ ফুলিয়া ওঠে, নাড়ী দমিয়া যায়, শ্বাসরোধের উপক্রম হইতে থাকে।
এইরূপ দুর্ঘটনা বাঁচাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত।
অতএব রোগী যদি কোনো কারণে পূর্ব্বে কখনও সিরাম ইন্‌জেক্‌শন লইয়া থাকে
তবে তাহাকে পুনরায় সিরাম দিতে হইলে প্রথমে অতি অল্প পরিমাণে
(আন্দাজ ৫ ফোঁটা) সিরাম ইন্‌জেক্‌শন দিয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া
দেখিতে হইবে ইহাতে কোনো অ্যানাফিলাক্সিসএর লক্ষণ,—অর্থাৎ
ইন্‌জক্‌শনের স্থানে হঠাৎ ফুলিয়া ওঠার কিছু চিহ্ন দেখা যায় কি না।
যদি তাহা দেখা যায় তবে ঐরূপ অল্প অল্প মাত্রাতেই অনেকবারে তাহাকে
ধীরে ধীরে সিরামটুকু দিতে হইবে। কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে কোনো দুর্লক্ষণ
দেখা না গেলে অর্দ্ধঘণ্টা পরে নির্ভয়ে পূর্ণমাত্রাটুকু দিতে পারা যায়। আর
যদি অসাবধানে এইরূপ অ্যানাফিলাক্সিস ঘটিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ রোগীকে
এড্রেনালিন ৮ ফোঁটা (Adrenaline chlor. $\frac{1}{2}$ c. c.) ও এট্রোপিন্
সাল্‌ফ্ ১/১০০ গ্রেন (Atropine Sulph gr $\frac{1}{100}$) একত্রে ইন্‌জেক্‌সন দিলে ঐ
ভাব কাটিয়া যায়। প্রয়োজন হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ ইন্‌ট্রাভিনাস্ ইন্‌জেক্‌শনও
দেওয়া যাইতে পারে। সিরাম ইন্‌জেক্‌শনের পর কাহারো কাহারো গায়ে
অনবরত চুলকাইতে থাকে ও আমবাত (Urticaria) বাহির হইয়া পড়ে।
তাহাদের গায়ে পিপারমিণ্টের মলম (এক আউন্স ভেসেলিনের সহিত ১ ড্রাম
মেন্থল্ মিলাইয়া) মাখাইয়া দিলে ঐ চুলকানি কমিয়া যায়। সিরামের একটি

দশ দিনের মধ্যে যতই ইন্‌জেক্‌সন
ইন্‌জেক্‌শন দিয়া পুনরায় উহার পরবর্ত্তী **দশ দিনের মধ্যে** যতই ইন্‌জেক্‌সন
ইন্‌জেক্‌শন দিয়া পুনরায় উহার পরবর্ত্তী দশ দিনের মধ্যে অ্যানাফিলাক্সিস হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দশদিন
দেওয়া হউক, এরূপ অ্যানাফিলাক্সিস হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দশদিন
পরে ইন্‌জেক্‌শন দিতে গেলেই উহার সম্ভাবনা আছে। দশ দিন পর্য্যন্ত
নির্ভয়ে উপর্য্যুপরি সিরাম প্রয়োগ করা চলে। আর এক কথা, রোগীর
হাঁপানি রোগ থাকিলে অথবা প্রস্রাবের দোষ থাকিলে কিছু সাবধান হওয়া
আবশ্যক।

সিরাম দিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাল্‌সিয়ম্ (Calcium lactate 30 grs.) খাইবার
ব্যবস্থা করিলে অনেক সময় সিরামের দোষটুকু অনেক কাটিয়া যায়।
পূর্ব্বের অপেক্ষা আজকাল সিরাম দেওয়ার অনেকটা সুবিধা হইয়াছে এই
যে আজকাল সিরাম সংক্ষিপ্ত ঘন-মাত্রায় (concentrated) পাওয়া
যায়,—অর্থাৎ অতি অল্প মাত্রার সিরামের মধ্যেই অনেক অধিক মাত্রার
এণ্টিবডি মিশ্রিত করা থাকে, সুতরাং এখন আর অধিক পরিমাণ সিরাম
প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না এবং অ্যানাফিলাক্সিস এর সম্ভাবনাও যথেষ্ট
কমিয়া যায়।

সিরাম প্রয়োগের সময়—যাহাতে প্রস্রাব সরল ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে
হইতে থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত; নতুবা নানারূপ বিপত্তি উপস্থিত
হইতে পারে। এই জন্য সিরাম দিলেই মূত্রবর্দ্ধক ঔষধ সকল প্রয়োগ করিতে
হয় এবং প্রচুর জল পান করিতে উপদেশ দিতে হয়।

কয়েক প্রকার রোগে সিরাম চিকিৎসায় আশ্চর্য্য উপকার হয়।
ডিফ্‌থীরিয়া রোগে ইহার ক্রিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট। **টিটেনাস্** বা ধনুষ্টঙ্কার
রোগ নিবারণকল্পে সিরামের ব্যবহার সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ; তবে রোগ-লক্ষণ
প্রকাশ পাইলে ইহাতে বিশেষ ফল হয় না। **মেনিঞ্জাইটিস্** রোগের
জন্য বর্ত্তমানে সিরাম প্রয়োগই প্রায় একমাত্র চিকিৎসা। **ব্যাসিলারি
আমাশায়ে** অনেক সময় ইহা মন্ত্রের মত কাজ করে। **নিউমোনিয়াতেও**
ইহা অতি উপকারী, (Felton's serum) যদি রোগের ঠিক 'টাইপ'
চিনিয়া দিতে পারা যায়। **ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস** কর্ত্তৃক রক্তদুষ্টি বা
সেপ্‌টিসিমিয়া হইলে এণ্টিষ্ট্রেপ্‌টো সিরামের দ্বারাও খুব উপকার হয়।
অপর পক্ষে এই বীজাণুর দ্বারা সৃষ্ট **ইরিসিপেলাস্** (Erysipelas) এবং

প্রসূতিদের **বিষাক্ত জ্বরেও** (Puerperal fever) সিরামে যথেষ্ট ফল
পাওয়া যায়। ষ্ট্যাফিলোকক্কাস ও কোলাই বীজাণুর দ্বারা রক্তদুষ্টি হইলে
তাহাতেও সিরামে উপকার দেখা যায়। **অ্যান্থ্রাক্স** (anthrax) নামক রোগেও
সিরাম (Sclavo's Serum) ব্যবহৃত হয়, তবে ইহা ঘোড়ার
রক্ত হইতে প্রস্তুত হয় না,—গাধার রক্ত হইতে প্রস্তুত হয়। আজকাল
অ্যাণ্টি-গ্যাস্-গ্যাংগ্রীন সিরামেরও (anti-gas-gangrene serum)
যথেষ্ট ব্যবহার হইতেছে; গত যুদ্ধের সময় ইহার উপকারিতার অনেক
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ব্যাসিলাস্ ওয়েল্‌চাই (B. welchii) প্রভৃতি
কয়েক প্রকার বায়ুবিরোধী (anaerobic) বীজাণুর বিরুদ্ধে ইহা প্রস্তুত হয়।
পেরিটোনাইটিস্, অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্ (gangrenous), **অন্ত্র-বৈষম্য**
(acute intestinal obstruction), এমন কি কোনো কোনো প্রসূতি-
পীড়াতেও (Puerperal sepsis) ইহা ব্যবহৃত হইতেছে এবং কোথাও
কোথাও তাহাতে আশ্চর্য্য ফল দেখা যাইতেছে।

এইরূপ অনেক রোগেই সিরামের গুণ প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তবে
সিরামের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে বীজাণু-পরিচয়ের উপর। রোগের
নির্দ্দিষ্ট বীজাণুটিকে যদি ঠিক ধরিতে পারা যায় এবং তাহার উপযুক্ত
সিরাম প্রয়োগ করা যায়, তবেই উহার ক্রিয়া হয়,—ভুল স্থানে প্রয়োগ করিলে
উহার কোনই ক্রিয়া হয় না।

সিরাম যত টাট্‌কা হয়, ততই উহা শক্তিসম্পন্ন থাকে, যত পুরাতন হইতে
থাকে, ততই উহার গুণ কমিয়া যায়। যে সিরাম আজ প্রস্তুত হইয়া
আসিয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এক বৎসরের পুরাতন হইলে সে সিরাম
ব্যবহার করা অনর্থক। সিরাম পারতপক্ষে বরফের মধ্যে (refrigerator)
রক্ষা করাই উচিত,—অন্যথা খুব ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা উচিত। আমাদের গরম
দেশের উত্তাপ লাগিয়া উহার গুণ শীঘ্রই নষ্ট হয়। বিলাত হইতে যে সকল
সিরাম আসে উহা জাহাজে আসিতে কিছু সময় লাগে, এবং নানা অবস্থার
মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে উহাব গুণ অনেক সময় নষ্ট হইতে পারে।
সেই জন্য অনেকে বলেন স্থানীয় প্রস্তুত দেশী সিরাম ব্যবহার করাই ভাল।

সিরাম ও ভ্যাক্সিনের দুইপ্রকার ক্রিয়াই যাহাতে একসঙ্গে পাওয়া

যায়, এইরূপ কয়েকপ্রকার ইন্‌জেক্‌শনের ঔষধও আজকাল নানা নামে পাওয়া যাইতেছে। এইগুলিকে কেহ নাম দেয় sensitised vaccine, কেহ বলে serobacterin, কেহ বলে immunogen। ভ্যাক্সিন্‌ ও সিরাম দুইয়ের অভিপ্রায়ই এইগুলিতে কতক সাধিত হয়। সময়ে সময়ে এগুলিতেও বেশ উপকার পাওয়া যায়। তন্মধ্যে Streptococcus serobacterin, Pneumococcus combined immunogen, Van cott immunogen প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৪) ব্যাক্‌টিরিওফাজ্‌ ও অ্যান্টিভাইরাস

ডিহেরেল্‌ (D' Herrelle) কর্তৃক আবিষ্কৃত ব্যাক্‌টিরিওফাজের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। খাইবার ঔষধ হিসাবে কয়েকটি রোগের জন্য ইহা আজকাল যথেষ্ট ব্যবহার হইতেছে। ইহা নূতন আবিষ্কার, ভবিষ্যতে ইহার আরো নানাপ্রকার উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

ব্যাক্‌টিরিওফাজের মত আরো এক পদার্থ বেস্‌রেড্‌কা (Besredka) আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার নাম অ্যান্টিভাইরাস্‌ (antivirus)। তবে বেস্‌রেড্‌কা ইহাকে ব্যাক্‌টিরিওফাজের মত জীবিত পদার্থ বলেন না। বীজাণুর বহুদিন কাল্‌চার করিবার পর কাল্‌চার-পদার্থের সমস্তটুকু ছাঁকুনির মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া আগে বীজাণুগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়া হয়। ইহার পর অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই অ্যান্টিভাইরাস্‌। দেখা যায় যে, এই অবশিষ্ট পদার্থটি আসল বীজাণুর বিরোধী, ইহার সংস্পর্শে আসিলেই বীজাণু মরে। এই অ্যান্টিভাইরাস্‌ বীজাণু-সংক্রামিত বিষাক্ত ঘা ফোঁড়াতে ইনি ব্যবহার করিতে বলেন। আজকাল দেখা যাইতেছে যে ষ্ট্রেপটো, ষ্ট্যাফিলো প্রভৃতির অ্যান্টিভাইরাস ঘায়ের উপর প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

ব্যাক্‌টিরিওফাজ-তত্ত্ব আবিষ্কার হইবার পর আমাদের আর একদিক দিয়া চক্ষু ফুটিয়াছে। আমরা যেরূপ ব্যাক্‌টিরিওফাজের কৃত্রিম কালচার করিয়া তাহা চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করিতেছি, অনুসন্ধান

করিয়া দেখা যাইতেছে যে স্বভাবের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ ব্যাক্‌টিরিওফাজ পাওয়া যায়। নদী-পুষ্করিণীর জলে টাইফয়েডের ও কলেরার ব্যাক্‌টিরিওফাজ থাকে, ঋতু অনুসারে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। গঙ্গার জলে এই প্রকারের ব্যাক্‌টিরিওফাজ যথেষ্ট আছে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, গোবরের মধ্যে যে ব্যাক্‌টিরিওফাজ থাকে তাহা টাইফয়েড্‌-বীজাণুর ও আমাশা-বীজাণুর শত্রু, এবং এই ব্যাক্‌টিরিওফাজ্‌ উক্ত রোগে ব্যবহার করিলে অপ্রত্যাশিত উপকার পাওয়া যায়। অতএব প্রকৃতির মধ্যে ব্যাক্‌টিরিওফাজ্‌ স্বভাবতঃই বর্ত্তমান এবং তাহাই আমাদের রোগের কবল হইতে অনেক সময় রক্ষা করে,—যখন তাহার অভাব ঘটে তখনই রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা। সেইজন্য ডিহেরেল্‌ বলেন যে কলেরা, টাইফয়েড্‌ প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় যে সকল কূপ বা জলাশয়াদি হইতে পানীয় জল আহরণ করা হয় তথায় উপযুক্ত ব্যাক্‌টিরিওফাজ্‌ যথেষ্ট পরিমাণে মিশাইয়া দিলে রোগের বিস্তার শীঘ্রই নিবারিত হইবে।

মাইক্রস্কোপের অগোচর রোগবীজ

বীজাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র কতকগুলি রোগবীজ আছে। কেহ কেহ বলেন ব্যাক্‌টিরিওফাজও যত ক্ষুদ্র ইহারাও তত ক্ষুদ্র। কোনো প্রকার যন্ত্রদ্বারাই ইহারা দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইজন্য ইহাদের আল্ট্রা-মাইক্রস্কোপিক্‌ (ultra-microscopic) বা অণুবীক্ষণাতীত বলা হয়; সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বীজাণু-ছাঁকুনির দ্বারাও ইহারা আটক পড়ে না, সেইজন্য ইহাদের ফিল্টারেবল্‌ (filterable) বলা হয়, এবং ইহা জীব-জগতের কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত তাহা জানিতে না পারায়, এমন কি ইহা কোনো জীবন্ত পদার্থ কি না তাহারও কোনো স্থিরতা না থাকায় (not possible to say whether they are actually living organisms) বীজাণু (bacteria) নাম না দিয়া এগুলিকে কেবল **ভাইরাস্‌** (virus)

বা **বীজ** আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কখনো ইহাদের বলা হয় **আল্ট্রা-মাইক্রস্কোপিক্ ভাইরাস্**, কখনো বলা হয় **ফিল্টারেবল্ ভাইরাস্**। একেতো এই ভাইরাস্ কোনোরূপে দৃষ্টিগোচর হইবার নয়, তাহার উপর কাল্চার করিয়াও ইহার অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, অনুকূল প্রাণীর শরীরের কোষ এবং রস ছাড়া অন্য কোনো কৃত্রিম খাদ্যের মধ্যে (lifeless media) এই বীজ স্ফূর্তি পায় না—সেইজন্য এই ভাইরাসের প্রকৃত পরিচয় এখনও রহস্যাবৃত। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনোই কারণ নাই, নানাপ্রকার অভিব্যক্তির দ্বারা ইহাদের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুইটি প্রমাণ আমরা সকলেই দেখিতে পাই। একটি প্রমাণ এই যে, প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট রোগবীজের নির্দ্দিষ্ট প্রাণীর উপর পক্ষপাত আছে, সেই প্রাণী ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর শরীরে ঐ বীজ স্ফূর্তি পায় না। আর এক প্রমাণ এই যে, যাহার একবার কোনো নির্দ্দিষ্ট ভাইরাস্ কর্ত্তৃক রোগ উৎপন্ন হইয়া তাহা আরোগ্য হইয়া যায়, তাহার দ্বিতীয়বার আর ঐ রোগ হয় না; সুতরাং রোগীর শরীরে অ্যান্টিবডি (antibodies) জন্মাইতে পারে এরূপ কোনো বিশিষ্ট অ্যান্টিজেন্-শক্তি (antigenic specificity) ইহার আছে। বীজাণুদের অপেক্ষাও ভাইরাসের এ শক্তি অধিক দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন এই ভাইরাস্-বীজ কণিকাসদৃশ (particulate), এবং ছাঁকুনির ছিদ্রায়তন হিসাবে ইহার পরিমাপ করিতে পারা যায়। এইরূপে মাপিয়া বোঝা গিয়াছে যে ইহাদের মাপ $5m\mu$ হইতে $200m\mu$এর মধ্যে ($m\mu$ অর্থে 1μএর এক-সহস্রাংশ)।

এই অদৃশ্য বীজের অস্তিত্বের কথা প্রথম সন্দেহ করেন পাস্তর। তিনিই প্রথমে বলেন যে, কুকুরের জলাতঙ্ক রোগ (rabies) সম্ভবতঃ বীজাণুর অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অদৃশ্য বীজ হইতে উৎপন্ন। তৎপরে ইভানভস্কি (Iwanowski) ১৮৯২ সালে গাছের পাতার রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে করিতে প্রমাণ করেন যে, সত্য সত্যই এরূপ অদৃশ্য রোগ-বীজের অস্তিত্ব আছে। ১৮৯৭ সালে লোফ্লার (Loffler) প্রমাণ করেন যে,

গরু-মহিষের ক্ষুরে এবং মুখে যে একপ্রকার সংক্রামক হাজা-রোগ (foot and mouth disease) দেখা যায়, তাহা এক প্রকার অদৃশ্য ফিল্টারেবল্ ভাইরাস্ হইতেই উৎপন্ন। ১৯০৫ সালে জানা গেল যে, কুকুরের ডিস্টেম্পার (distemper) রোগের কারণও একপ্রকার ভাইরাস্। ১৯২০ সাল হইতে ভাইরাস্ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, আমাদের বহুপ্রকার রোগই এই ভাইরাস্ কর্ত্তৃক উৎপন্ন;, তন্মধ্যে কয়েকটি সামান্য ব্যাধিও আছে, কয়েকটি অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধিও আছে। তবে ভাইরাসের রোগ মাত্রই অত্যন্ত সংক্রামক এবং একবার একটি রোগ হইয়া গেলে তাহা আর পুনর্ব্বার প্রায়ই হয় না। নিম্নলিখিত রোগগুলি ভাইরাস্ কর্ত্তৃক উৎপন্ন বলিয়া জানা গিয়াছে ঃ—

বসন্তরোগ (আসল বসন্ত, পানি বসন্ত এবং গো-বসন্ত)
জলাতঙ্ক রোগ (rabies)
হাম, মাম্প্‌স্, ডেঙ্গু
সর্দ্দি (?)
ইয়েলো ফিবার (yellow fever)
পোলিওমায়েলাইটিস্, এন্‌কেফালাইটিস্
হার্পিস্ (জ্বর ঠুঁটো)
আঁচিল (verucca)
ইঙ্গুইন্যাল্ গ্র্যানুলোমা (inguinal granuloma)

প্রোটোজোয়া বা জীবাণুর কথা (Protozoa)

প্রোটোজোয়া অর্থে অতি ক্ষুদ্র **প্রাণী**। ব্যাকটিরিয়া যেমন **উদ্ভিদ্** শ্রেণীর অন্তর্গত, প্রোটোজোয়া তেমনি **জীবশ্রেণীর** অন্তর্গত। এই পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য আমরা ব্যাকটিরিয়াকে **"বীজাণু"** ও প্রোটোজোয়াকে **"জীবাণু"** বলিতেছি। কেহ কেহ ইহাদের আদ্যপ্রাণী বলিয়া থাকেন। জীবসকলকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; বহু কোষবিশিষ্ট

প্রাণীমাত্রকেই মেটাজোয়া (metazoa) বলা হয় ও এককোষ-বিশিষ্ট প্রাণীকে প্রোটোজোয়া (protozoa) বলা হয়। অতএব প্রোটোজোয়া অতি প্রাথমিক সর্ব্বনিম্ন স্তরের জীব ; ইহার এক একটি প্রাণী কেবল একটি করিয়া জীবকোষ দিয়া গঠিত এবং একটিমাত্র জৈববস্তুতে (protoplasm) তাহা সম্পূর্ণ, সুতরাং ইহার কোনো অঙ্গবিভাগ হইতে পারে না। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ বিভাগও নাই ; একই প্রোটোজোয়া আহারের দ্বারা পুষ্টিলাভ করিলে ক্রমে উহার অংশবিশেষ বিচ্যুত হইয়া দুই বা চার বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায় এবং কালক্রমে এই সকল খণ্ড পুষ্ট হইয়া পুনরায় সেগুলিও ঐরূপে বিভক্ত হইতে থাকে। এইরূপে ইহারা এক পিতা হইতে একাধিক পুত্র ও তাহা হইতে ততোধিক পৌত্রে বিভক্ত হইয়া ইহাদের বংশানুক্রমিক পারম্পর্য্য নিত্য বজায় রাখে। ইহাদের এক দেহ চলিয়া যায়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে অংশবিশেষ দ্বারা বহু দেহ গঠিত হইয়া যায়। সুতরাং ইহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু নাই বলিতে হইবে। কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা না ঘটিলে ইহাদের মৃত্যু হয় না, অবস্থা পরিবর্ত্তনদ্বারা নিত্যই ইহারা আপন অস্তিত্বের ধারা বজায় রাখিয়া চলে।

প্রোটোজোয়ার দ্বারাও যে ব্যাধির সৃষ্টি হয় এ কথা পূর্ব্বে জানা ছিল না, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই তাহা প্রথম জানিতে পারা গিয়াছে। প্রথম মাইক্রস্কোপ নির্ম্মাতা লীউভেনহোয়েক (Leeuwenhoek) ১৬৭৫ সালে ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার পর অনেকে অনেক প্রকার প্রোটোজোয়ার বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তখন কেবল প্রাকৃতিক সৃষ্টিবৈচিত্র্য হিসাবেই ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা হইত। ১৮৭৫ সালে আমাশা রোগের এমিবা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাই রোগের কারণ কি না, সে সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ হয়। পরে ১৮৮০ সালে যুগপ্রবর্ত্তনকারী লাভেরান (Laveran) ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করিয়া গ্রীষ্মপ্রধানদেশস্থ রোগগুলির কারণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রকার অনুসন্ধানের প্রথম সূত্রপাত করেন। বলিতে গেলে এই সময় হইতেই ট্রপিক্যাল মেডিসিন (Tropical medicine) নামক বর্ত্তমান চিকিৎসা বিভাগের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তখন হইতে প্রোটোজোয়ার

প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে জানিতে পারা যায় যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সহিত প্রোটোজোয়ার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ, এবং নানাপ্রকার গ্রীষ্মপ্রধানদেশ-সুলভ ব্যাধি প্রোটোজোয়ার দ্বারাই জন্মাইয়া থাকে। গ্রীষ্মদেশস্থ আমাশা-বিশেষের কারণ এক প্রকার এমিবা, আফ্রিকার স্লীপিং সিক্‌নেসের কারণ ট্রিপানোসোম, কালাজরের কারণ লীশ্‌ম্যানিয়া, ইত্যাদি বহুপ্রকার প্রোটোজোয়া একে একে আবিষ্কৃত হয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রোটোজোয়া-তত্ত্ব (Protozoology) আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পূর্ণরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা জানিয়াছি যে রোগের উৎপত্তিকারক হিসাবে প্রোটোজোয়ারও বিশিষ্ট স্থান আছে, এবং ভারতবর্ষীয় রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ইহাদের বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক।

ব্যাক্‌টিরিয়া ও প্রোটোজোয়ার চরিত্রগত প্রভেদ—

ব্যাক্‌টিরিয়া ও প্রোটোজোয়ার মধ্যে যেমন মূলগত ও প্রকৃতিগত
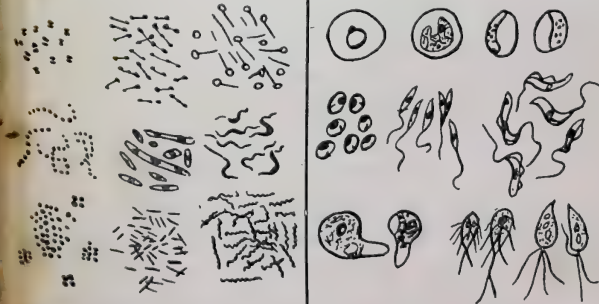
কয়েকপ্রকার বীজাণু
(ইহাদিগকে দেখিতে অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রস্কোপের আবশ্যক)

কয়েকপ্রকার প্রোটোজোয়া
(ইহারা বীজাণু অপেক্ষা কিছু বৃহৎ হইলেও মাইক্রস্কোপ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর নয়)

প্রভেদ আছে, ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়াতেও তেমনি বিস্তর প্রভেদ আছে। ব্যাক্‌টিরিয়াও নানারূপ রোগের সৃষ্টি করে, প্রোটোজোয়াও

কয়েকপ্রকার রোগের সৃষ্টি করে,—কিন্তু এই দুই জাতীয় রোগের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য বেশ লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্যই পরস্পরের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা আমাদের বিশেষরূপে জানিয়া রাখা দরকার ; ইহাদের অভিব্যক্তিতে যে পার্থক্য আছে মোটামুটি ভাবে সেগুলি না জানা থাকিলে চিকিৎসাতেও নানারূপ ভ্রান্তি ঘটিতে পারে।

(১) প্রথমতঃ, সংখ্যাধিক্য ; ব্যাকৃটিরিয়াদিগের একটি বিশিষ্টতা এই যে, সর্ব্বদাই ইহারা সংখ্যাবহুল ভাবে অবস্থান করে। প্রোটোজোয়া তত অধিক পরিমাণে জীবদেহে অবস্থান করে না, ইহাদের সংখ্যার কিছু সীমা আছে, সুতরাং চেষ্টা করিলে কতগুলি প্রোটোজোয়া রোগীর দেহে আছে তাহা কতকটা হিসাব করিয়াও বাহির করা যাইতে পারে। ব্যাকৃটিরিয়ার সংখ্যা সম্বন্ধে এরূপ কোনো অনুমান করাই অসম্ভব, তবে ব্যাকৃটিরিয়ার সংখ্যার উপর রোগের বিষাক্ততার পরিমাণ একেবারেই নির্ভর করে না, বরং তাহা অনেকটা নির্ভর করে প্রোটোজোয়ার সংখ্যার উপর। ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংখ্যায় যত অধিক হয় রোগীও তত অধিক পীড়িত হয়, কিন্তু কোনো ব্যাকৃটিরিয়ার সম্বন্ধেই এরূপ কথা বলা চলে না।

(২) ব্যাকৃটিরিয়ার যত সহজে কাল্চার করা যায়, প্রোটোজোয়ার কাল্চার করা তত সহজ নয়। যদিও বা নানারূপ কৃত্রিম খাদ্য দিয়া অনেক কষ্টে অনেক দিন পরে ইহাদের কাল্চার হইতে পারে, তথাপি কাল্চার করিলেই ইহাদের চেহারার একেবারে বদল হইয়া যায় এবং তাহার ক্রিয়ারও যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। কালাজ্বরের জীবাণুর কাল্চার করিতে বহু আয়াসের ও বহু সময়ের প্রয়োজন এবং কাল্চারে তাহার রূপের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু ব্যাকৃটিরিয়ার প্রায় একদিনেই কাল্চার হইয়া যায় ও তাহাতে তাহার রূপ স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

(৩) ব্যাকৃটিরিয়া কোনো জন্তুর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে যত সহজে রোগ জন্মানো সম্ভব,—প্রোটোজোয়ার দ্বারা এরূপ কৃত্রিম রোগ জন্মানো তত সহজে সম্ভব নয়। প্রত্যেক প্রোটোজোয়ার বিশিষ্ট বাহন (carrier and vector) আছে—(যেমন ম্যালেরিয়ার বাহন মশা)—

কোনো প্রাণীর শরীরে প্রোটোজোয়ার দ্বারা রোগ জন্মাইতে হইলে তাহার বাহনের মধ্যস্থতার সাহায্য লইতে হইবে, নতুবা সুবিধা হইবে না। একজনের শরীর হইতে ম্যালেরিয়ার রক্ত লইয়া সরাসরি অন্য লোকের শরীরে ইন্‌জেকশন্ দিলে তাহারও ম্যালেরিয়া হইবে বটে, কিন্তু ব্যাকৃটিরিয়ার মত ম্যালেরিয়ার জীবাণু কাল্চার করিয়া কাহারো শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে তদ্দ্বারা রোগ জন্মিবে না। এই সকল কারণে ব্যাকৃটিরিয়া-জনিত ব্যাধি যতটা সংক্রামক, প্রোটোজোয়া-জনিত ব্যাধি ততটা সংক্রামক নয়।

(৪) ব্যাকৃটিরিয়া ধুলা-মাটিতে পড়িয়াও বহুকাল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু প্রোটোজোয়া এরূপ নয়। ইহারা পরগাছার মত নিতান্তই পরনির্ভর (parasites), আশ্রয়দাতার শরীর ভিন্ন অন্য কোথাও বাঁচিতে পারে না ; যে জীব ইহাদের বিশিষ্ট আশ্রয়দাতা, তাহারই মধ্যে একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে নিত্য ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানোই ইহাদের বাঁচিয়া থাকার একমাত্র উপায়। কাহারও শরীরে একবার প্রবেশ লাভ করিলে ইহাদের নির্ম্মূল করা অতি কঠিন। যেখানে প্রবেশ করে সেখানে ইহারা বহুকাল টিঁকিয়া থাকিতে চায়। ইহারা একই আশ্রয়দাতার শরীরে বহুকাল যাবৎ ভোগ দখল করিতে থাকে এবং বহুকাল যাবৎ তাহাকে ভোগাইতে থাকে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, এমিবিক্ আমাশা প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৫) ব্যাকৃটিরিয়া অতি বিষাক্ত হইলেও প্রায়ই তাহাদের জীবনের একটা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ কাল থাকে,—তন্মধ্যে হয় রোগী মরিয়া যায়, নতুবা মেয়াদ ফুরাইলে ইহারা আপনিই মরিয়া যায়, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে ব্যাকৃটিরিয়াজনিত রোগ প্রায় আপনিই আরোগ্য হয়। প্রোটোজোয়ার আচরণ সেরূপ নয়। প্রোটোজোয়ার কোনো নির্দ্দিষ্ট কালাকাল নাই, যতদিন পারে ততদিন তৎসৃষ্ট রোগ লাগিয়া থাকে। কলেরা বা নিউমোনিয়ার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

(৬) ব্যাকৃটিরিয়া জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ বিজাতীয় শত্রু। ইহারা জীবের শরীরে প্রবেশ করিলেই শরীরের রস-রক্তের মধ্যে নানাপ্রকার

অ্যান্টিবডি প্রস্তুত হইয়া ইহাদের মারিবার চেষ্টা করে। রোগ আরোগ্য হইয়া গেলেও ঐ অ্যান্টিবডি শরীরে অনেক কাল পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত ঐ অ্যান্টিবডি নিঃশেষ হইয়া না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ ব্যাক্‌টিরিয়া পুনরায় তথায় রোগ জন্মাইতে পারে না। কিন্তু এ-বিষয়ে ব্যাক্‌টিরিয়ার সহিত প্রোটোজোয়ার কোনোই মিল নাই। প্রোটোজোয়াও এক প্রকার জৈবপদার্থ এবং তাহার আশ্রয়দাতার দেহও জৈবপদার্থে গঠিত। সুতরাং প্রোটোজোয়া তাহার স্বজাতীয় শত্রু। সুস্থ জীবের শরীরে নীত হইলেও ইহাদের স্ফূর্ত্তি লাভ করা কঠিন। দৈবাৎ ইহারা প্রবেশ করে এবং দৈবাৎ রোগের সৃষ্টি করে। ইহাদের বিরুদ্ধে জীবের শরীরে কোনোরূপ বিশিষ্ট অ্যান্টিবডি প্রস্তুত হয় না,—শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তির দ্বারাই ইহারা প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই প্রত্যাখ্যান সম্পূর্ণ নয়, আংশিক মাত্র। অর্থাৎ জীবের শরীরে প্রবেশ করিলে ইহারা প্রায় বেশী মাত্রায় বাড়িতেও পায় না অথচ একেবারে মরিয়াও যায় না। এই প্রকার প্রতিরোধ শক্তিকে ঠিক ইমিউনিটি (immunity) বলা চলে না,—ব্যাক্‌টিরিয়া-প্রতিরোধের ক্ষমতার মত ইহা মোটেই নয়। ইহাকে immunitas non sterilans বলা হয়,—অর্থাৎ এক প্রকার আপোষ নিষ্পত্তির অবস্থা। যখন ইহাদের দূর করা যাইতেছে না, তখন থাকে থাকুক,—কিন্তু বেশী বাড়িতে না পায় বা শরীরের কোনো অনিষ্ট না করে,—এই ভাবেই ইহাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং প্রোটোজোয়া যখন শরীরে প্রবেশ করে, রোগ প্রায়ই তখন জন্মায় না। উহার বহুদিন পরে যদি কখনো শরীরের অবনতি ঘটে, তখন এই সন্ধিসর্ত্ত ভাঙিয়া ইহারা বলবান হইয়া রোগ প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কলেরা-বীজাণু প্রবেশ করিলে ২।৩ দিনের মধ্যেই রোগ জন্মিয়া যায়। কিন্তু ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করিবার ২।৩ মাস, এমন কি ছয় মাস পরেও কখনো কখনো রোগ জন্মিতে দেখা যায়।

(৭) মানুষের সহিত এই দুই প্রকার শত্রুর সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। সুতরাং স্বাভাবিক আরোগ্যশক্তির যে সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া ব্যাক্‌টিরিয়াজনিত রোগের চিকিৎসায় ভ্যাক্সিন ও সিরাম প্রভৃতি প্রস্তুত ও

প্রয়োগ করা হয়,—প্রোটোজোয়াজনিত রোগের চিকিৎসা সেরূপ পন্থায় হইতে পারে না। কোনো প্রোটোজোয়ার রোগে ভ্যাক্সিনাদির প্রয়োগ-বিধি নাই, এখানে চিকিৎসার বিভিন্ন পথ। প্রোটোজোয়া দমনের জন্য কেবল এমন রাসায়নিক বা ভেষজ ঔষধের প্রয়োজন, যাহা উহাদের পক্ষে যথেষ্টই মারাত্মক অথচ রোগীর পক্ষে মোটেই অনিষ্টকারী হইবে না। এই প্রকারের নানারূপ বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ ছাড়া প্রোটোজোয়াজনিত রোগের চিকিৎসা করার অন্য পন্থা জানা নাই। কোন ঔষধটি কোন জীবাণুর পক্ষে অব্যর্থ (specific), তাহা লইয়া যে শাস্ত্র বর্ত্তমানে গড়িয়া উঠিয়াছে, উহার নাম নব-রসায়ন-চিকিৎসা বা কিমো-থেরাপি (chemotherapy)। মহামতি এরলিক (Ehrlick) ইহার নব প্রবর্ত্তক। ম্যালেরিয়ার কুইনিন, কালাজ্বরের অ্যান্টিমনি, এমিবা রোগের এমিটিন, সিফিলিসের স্যাল্‌ভারসান্ প্রভৃতি এই কিমো-থেরাপির অন্তর্গত।

প্রোটোজোয়ার জাতিভেদ—

প্রোটোজোয়া সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি পেটের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে,—ইহাদের নাম ইন্‌টেষ্টিন্যাল প্রোটোজোয়া (intestinal protozoa) বা অন্ত্রাশ্রিত জীবাণু। **এমিবা** তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর কতকগুলি কেবল রক্তের মধ্যেই প্রবেশ করে,—এগুলি ব্লাড-প্রোটোজোয়া (blood protozoa) বা রক্তাশ্রিত জীবাণু। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার রক্তের বাহিরে গিয়াও শরীরের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে,—যেমন **ট্রিপানোসোম** (trypanosome) ; আর কতকগুলি রক্ত ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যায় না,—যেমন **ম্যালেরিয়ার জীবাণু**। বিভিন্ন প্রোটোজোয়ার জীবন বৃত্তান্ত বিভিন্ন রোগ বর্ণনার সহিত আলোচিত হইবে।

হেল্‌মিন্থ্‌ (Helminths) বা ক্রিমি

ক্রিমির দ্বারা যে রোগ জন্মায় একথা বহু প্রাচীন কাল হইতেই বিদিত আছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের নানাগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে এবং তাহাতে

নানাপ্রকার দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্রিমির শ্রেণীবিভাগ করা আছে। অন্যান্য
দেশের প্রাচীন পুস্তকেও ইহার বিষয় উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন মিশরের
যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও ক্রিমিরোগের
বর্ণনা ও উহার চিকিৎসার কথা লিখিত আছে। আরব দেশের প্রাচীন
গ্রন্থেও ক্রিমির কথা আছে। প্রাচীন গ্রীসে হিপোক্রেটিস্ও ইহার বিষয়
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সহজ চক্ষে দৃশ্যমান বলিয়া পূর্ব্বযুগের সকলেই
ইহাদের একপ্রকার রোগের কারণ স্বরূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

ক্রিমির দ্বারা সাধারণতঃ পেটের রোগই হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য
রোগও ইহাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব। ইহারা স্বভাবতঃ বিষাক্ত নয় বটে,
কিন্তু কখনো কখনো ইহারা শরীরের মধ্যে নানাপ্রকার বিষাক্ত বীজাণু
বহন করে, এবং সেই হেতু পরোক্ষভাবে অত্যন্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিতে
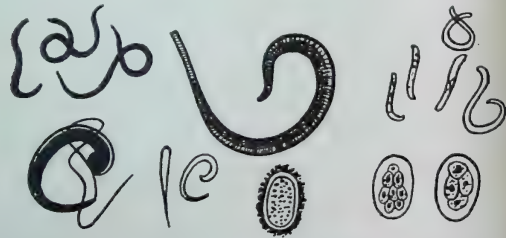
কয়েক প্রকার হেল্‌মিন্থ বা ক্রিমি। ইহারা অধিকাংশই চক্ষুগোচর, তবে ইহাদের ডিমগুলি মাইক্রস্কোপ ব্যতীত দেখা যায় না। এই চিত্রের ক্রিমিগুলি স্বাভাবিক আকারে দেখানো হইয়াছে, কেবল ডিমগুলি মাইক্রস্কোপে যেরূপ দেখা যায় সেইরূপ বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

পারে এবং মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। কখনো কখনো
ইহাদের দ্বারা জ্বরও হইতে দেখা যায়; তদ্ব্যতীত কয়েকপ্রকার রক্ত
মোক্ষণকারী ক্রিমি আছে, তাহাদের দ্বারা পাণ্ডুরোগ প্রভৃতিও ঘটিতে পারে।

ক্রিমি বহুকোষ-বিশিষ্ট প্রাণী, সুতরাং ইহারা মেটাজোয়া (Metazoa)
রাজ্যের অন্তর্গত। ইহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রবিশেষের নাম হেল্‌মিন্থোলজি
(Helminthology)। বর্ত্তমানে হেল্‌মিন্থ্ বা ক্রিমিদিগের শ্রেণীবিভাগ

করা হইয়াছে। একশ্রেণীর নাম **ট্রিম্যাটোডা** (Trematoda);
ইহারা দেখিতে ছোট ছোট পাতার মত, চ্যাপ্টা ও ডিম্বাকৃতি। ইহাদের
মুখে একপ্রকার শোষণযন্ত্র (suckers) থাকে, তদ্দ্বারা ইহারা রক্ত ও রস
শোষণ করে। ইহারা কেবল যে অন্ত্রেই আশ্রয়গ্রহণ করে তাহা নয়,
বিভিন্ন প্রকার ট্রিম্যাটোডা শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করে। কোনোটি
লিভারে, কোনোটি মূত্রাশয়ে এবং কোনোটি ফুস্‌ফুসে থাকিয়া নানাপ্রকার
উৎপাতের সৃষ্টি করে। লিভার ফ্লুক্ (liver flukes) এই শ্রেণীর
অন্তর্গত। এই ক্রিমির রোগ আমাদের দেশে তেমন দেখা যায় না।

আর এক শ্রেণীর নাম **সেস্‌টোডা** (Cestoda)। পেটের ভিতর
হইতে যে প্রকাণ্ড বহুফুট দীর্ঘ ফিতার মত ক্রিমি (tapeworms)
বাহির হইতে দেখা যায়, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মুখের শোষণযন্ত্রের
দ্বারা ইহারা অন্ত্রের একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং ল্যাজের দিকে
ক্রমশঃই দৈর্ঘ্যে বাড়িতে থাকে। ইহারা অধিকাংশই উভলিঙ্গ (hermaphrodite), অর্থাৎ স্ত্রী-যন্ত্র ও পুরুষ-যন্ত্র উহাদের একই শরীরের মধ্যে
বিদ্যমান। গরু, শূকর প্রভৃতি জন্তুর মাংসের মধ্যে ইহাদের ডিম্বানুরূপ
বীজ (cysticercus) অবস্থান করে, ঐ মাংস অর্দ্ধপক্ব বা অপক্ব অবস্থায়
খাইলে অন্ত্রে এই সকল ক্রিমি জন্মায়।

আর এক শ্রেণীর নাম **নিম্যাটোডা** (Nematoda)। সকল প্রকার
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কেঁচোর মত গোলাকৃতি ক্রিমি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।
ইহাদের সবগুলিরই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। ইহাদের অধিকাংশই অন্ত্রাশ্রয়ী।
কেঁচোক্রিমি (round worm), সূতাক্রিমি (thread worm), হুকওয়ার্ম
(hookworm), হুইপ্‌ওয়ার্ম (whipworm) প্রভৃতি অন্ত্রাশ্রয়ী ক্রিমি
এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কেবল গিনিওয়ার্ম (guinea worm) নামক
ক্রিমি চর্ম্মনিম্নে অবস্থান করে এবং ফাইলেরিয়া-ক্রিমি (filaria) লিম্ফ্যাটিক
শিরায় ও রক্তশিরার মধ্যে অবস্থান করে। অন্ত্রাশয়ী ক্রিমির ডিমগুলি
খাদ্যের সহিত অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং তথায় ক্রিমিরূপে পরিণত হইয়া
পুনরায় ডিম প্রসব করিতে থাকে, উহা রোগীর মলের সহিত নির্গত
হয়। কেবল গিনিওয়ার্মের ডিমগুলি cyclops নামক ক্ষুদ্র জলচর জীবের

পেটে থাকে, পানীয় জলের সহিত উহারা অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে পরিণত অবস্থায় চর্ম্মনিম্নে আসিয়া উপস্থিত হয়। ফাইলেরিয়া এরূপে সংক্রামিত হয় না, মশার কামড়ের দ্বারা উহার শাবকগুলি মশার পেট হইতে মনুষ্যরক্তে প্রবেশ করে। রোগবর্ণনা সম্পর্কে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

রোগের বাহন

এ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার রোগবীজের কথা বলা হইল, অতঃপর কি উপায়ে ইহারা জীবের শরীরে প্রবেশ করে সে কথা বলা প্রয়োজন। এইসকল বীজ যে প্রাণসম্পন্ন এ-কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহারা ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন নয়। অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়া এবং চেষ্টার দ্বারা যে কেবল রোগ উৎপন্ন করিবার জন্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে বা এক জীবের শরীর হইতে অন্য জীবের শরীরে গমনাগমন করিতে থাকিবে, এরূপ হওয়া সম্ভবপর নয়। কোনো বীজাণুই আপন চেষ্টায় কোথাও রোগ জন্মাইতে অগ্রসর হয় না। প্রকৃতির নিয়মের অধীন হইয়া ইহারা নিষ্কামভাবে অবস্থান করে এবং উপযুক্ত বাহনের যোগাযোগ ঘটিলে তৎকর্ত্তৃক দেহ হইতে দেহান্তরে নীত হয়। এইরূপে খাদ্যপানীয়ের মধ্য দিয়া, নানারূপ সংস্পর্শের দ্বারা, দংশনপটু কীটপতঙ্গের দ্বারা ও অন্যান্য নানা উপায়ে ইহারা জীবের শরীরে প্রবেশ করিতেছে।

বাহনের সাহায্য ব্যতীত যে অনেক রোগের বীজই শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, এ-কথা আমরা ভালরূপে জানিতে পারিয়াছি উনবিংশ শতাব্দীতে। তৎপূর্ব্বে আমাদের ধারণা এ-সম্বন্ধে অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। প্রথমে ১৮১১ সালে ম্যাকগ্রেগর (Mc Gregor) বলেন, মাছির দ্বারা চোখওঠা রোগ সংক্রামিত হয়। ১৮৪৯ সালে স্নো (Snow) এবং উইলিয়াম বাড্

(William Budd) প্রমাণ করিয়া দেন যে পানীয় জলের দ্বারা কলেরা সংক্রামিত হইতেছে। ১৮৫৮ সালে বাড্ ও এম. ডব্লিউ. টেলর (M. W. Taylor) কর্ত্তৃক প্রমাণ হয় যে পানীয় জল ও দুগ্ধের দ্বারা টাইফয়েড রোগ সংক্রামিত হয়। ১৮৭৭ সালে জেকব (Jacob) কর্ত্তৃক প্রমাণ হয় যে ডিফ্থীরিয়া রোগও দুগ্ধের দ্বারা সংক্রামিত হয়। ১৮৭৮ সালে ম্যানসন্ প্রমাণ করেন যে মশার কামড়ের দ্বারা ফাইলেরিয়া জীব-দেহে প্রবেশ করে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ রোগেরই সংক্রমণপ্রণালী জানিতে পারা গিয়াছে।

এখন আমরা জানি যে রোগহিসাবে বিভিন্ন রোগবীজের কয়েকপ্রকার বিভিন্ন প্রবেশপথ ও প্রবেশের উপায় আছে, এবং সেই পথে উহা জীবের শরীরে প্রবেশ করিয়া আপন স্থান অধিকার করে। যতদূর পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, সেই সকল বিভিন্ন উপায় এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল :—

(১) ক্ষত স্থানের মধ্য দিয়া। শরীরের কোথাও ক্ষত হইলে নিম্নলিখিত বীজাণুগুলি তন্মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে :—

ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্, ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্. টিটেনাসের বীজাণু, অ্যানিরোবিক্ বীজাণু, অ্যান্থ্রাক্স্ বীজাণু ইত্যাদি।

ইহারা অক্ষত দেহে সাধারণতঃ প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বত্র সুলভ হইলেও ইহারা ক্ষতের অপেক্ষা রাখে।

(২) সংক্রামিত অঙ্গের সহিত অঙ্গসংযোগের দ্বারা।

গনোরিয়া, সিফিলিস্, সফ্ট্ সোর্ (soft sore) প্রভৃতি রোগ এইরূপেই কেবল সাক্ষাৎ সংযোগের দ্বারা সংক্রামিত হয়,—অন্য কোনো উপায়ে হইতে পারে না।

(৩) শ্বাসবায়ুর সহিত নাসিকার মধ্য দিয়া। বহু এপিডেমিক্ রোগের বীজাণু ও অদৃশ্য ভাইরাস্ এই পথে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে এবং পরস্পরের মধ্যে দ্রুতবেগে সংক্রামিত হইতে থাকে। রোগীর হাঁচি কাসি প্রভৃতির দ্বারা এই সকল রোগ-বীজ বায়ুপথে নিকটস্থ ব্যক্তির শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। নিম্নলিখিত রোগগুলি এই উপায়ে সংক্রামিত হয় :—

সর্দ্দি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা. নিউমোনিয়া, ডিফ্থীরিয়া, মেনিঞ্জাইটিস্, পোলিওমায়েলাইটিস্, বসন্ত, হাম, পানিবসন্ত, মাম্প্স্ ও যক্ষ্মা।

(৪) পেটের রোগসমূহের বীজমাত্রই সাধারণতঃ মুখ দিয়া পেটের ভিতর প্রবেশ করে। খাদ্যপানীয়ের মধ্য দিয়া এবং দূষিত হস্তের দ্বারাই এই সকল বীজ প্রবেশ করা সম্ভব। অধিকাংশ সময়ে কয়েকটি বিভিন্ন পথে আদান প্রদান হইতে হইতে অবশেষে উহা অজানিতভাবে মুখের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগীর মলমূত্রাদি হইতে তাহার হস্তে, তাহার হস্ত হইতে অন্যের হস্তে ও পরে উহার মুখে,—অথবা রোগীর মলমূত্রাদি হইতে মাছির পায়ে, তথা হইতে খাদ্যে, তথা হইতে মুখে,—এইরূপভাবেই একাধিক আদান-প্রদানের দ্বারা এই সকল বীজ পেটে প্রবেশ করে।

নিম্নলিখিত রোগগুলি এইরূপে সংক্রামিত হয়ঃ—

কলেরা, টাইফয়েড্, প্যারাটাইফয়েড্, ব্যাসিলারি আমাশা, এমিবিক আমাশা, কয়েক প্রকার অন্ত্রাশ্রয়ী প্রোটোজোয়ার পীড়া, অধিকাংশ ক্রিমিরোগ।

দুই একটি পেটের রোগে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়,—যেমন হুকওয়ার্ম পীড়া। ইহার বীজ মুখ দিয়া প্রবেশ করে না, গাত্রচর্ম্ম ভেদ করিয়া উহা রক্তের মধ্য দিয়া অবশেষে পেটে গিয়া প্রবেশ করে।

(৫) কোনো কোনো রোগের বীজ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর শরীরেই অবস্থান করে, এবং দৈবাৎ উহার কামড়ের দ্বারা বা উহার দুগ্ধাদির ব্যবহারের দ্বারা সরাসরি ঐ বীজ মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়।

এইরূপে বিষাক্ত ইঁদুরে কামড়াইলে 'র‍্যাট্-বাইট্ ফিবার' (rat bite fever) হয়, বিষাক্ত ছাগলের দুধ পান করিলে 'মাণ্টা ফিবার' (malta fever) হয়।

(৬) যে সকল রোগের বীজ কেবল রক্তের মধ্যেই থাকে, তাহা কেবল কীট পতঙ্গাদির দংশনের দ্বারাই এক জনের রক্ত হইতে আহরিত হইয়া অন্যের রক্তের মধ্যে নীত হয়, এবং ঐ মধ্যস্থ জীবের মধ্যে অবস্থানকালে তাহা মৃত না হইয়া নবশক্তি প্রাপ্ত হয়। নিম্নলিখিত রোগগুলি এইরূপে পতঙ্গাদির দংশনের দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকেঃ—

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়াসিস্, ডেঙ্গু, প্লেগ, টাইফাস্, রিল্যাপ্সিং ফিবার, আফ্রিকার স্লীপিং সিক্‌নেস্, ইয়েলো ফিবার।

পূর্ব্ব হইতেই একরূপ অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে মশা, মাছি ও উকুন এই

তিন প্রকার রক্তপায়ী জীবের দ্বারা (the fatal triad) আমাদের শরীরে অনেক প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। তাহার পর মাইক্রস্কোপ যন্ত্রের উদ্ভাবনার পর দেখা গেল যে সত্য সত্যই তাহাদের শরীরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট রোগের বীজ সকল সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং পরীক্ষা করিয়াও দেখা গেল যে, ঐ সকল কীটের দ্বারা দংশন করাইলে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের কয়েকটি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে জানা গিয়াছে যে, কেবল ঐ তিন প্রকার কীট নয়, আরও নানারূপ কীটের দ্বারা রোগবীজ বাহিত হয় এবং প্রত্যেক বিভিন্ন রোগের জন্য স্বতন্ত্ররূপ বাহন আছে। যে রোগের যে বিশিষ্ট বাহন কেবল তাহার দ্বারাই ঐ বিশিষ্ট রোগ সংক্রামিত হওয়া সম্ভবপর, অন্য কাহারো দ্বারা নয়। স্বভাবের এইরূপ অলঙ্ঘ্য নিয়ম রহিয়াছে বলিয়াই এখন আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে **মশার কামড় ব্যতীত ম্যালেরিয়া** হওয়ার উপায় নাই। তেমনি আরো আমরা বলিতে পারি যে বিভিন্ন জাতীয় **মশা ফাইলেরিয়া রোগ ও ডেঙ্গু রোগের বাহন, স্যাণ্ডফ্লাই** (উল্‌কি পোকা) **কালাজ্বরের বাহন, উকুন প্রভৃতি টাইফাস্ রোগের বাহন, র‍্যাট্‌ফ্লী** (ইঁদুরের মাছি) **প্লেগ রোগের বাহন**—,ইত্যাদি। অবশ্য এই সকল কীট-দংশন না হইলেও কৃত্রিম উপায়ে ঐ সকল রোগ উৎপন্ন করা যাইতে পারে, যেমন ম্যালেরিয়া-রোগীর দেহের রক্ত সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ইন্‌জেক্‌শন করিয়া দিলে ম্যালেরিয়া হয়, কিংবা প্লেগবীজাণু লইয়া ইন্‌জেক্‌শন করিলেও প্লেগ হয়। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বাভাবিক উপায়ে বাহনের মধ্যস্থতা ব্যতীত ঐ সকল রোগ জন্মিবার উপায় নাই। অতএব বাহনদিগের সম্বন্ধেও আমাদের কিছু কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কীট-বাহনদিগের সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার নাম এণ্টোমলজি (Entomology)।

(৭) বর্ত্তমানে আমরা আরো জানিতে পারিয়াছি যে, সুস্থ ব্যক্তিও কতকগুলি রোগের বাহন (healthy carrier) হইতে পারে। ইহা এখন প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, অনেক লোক শরীরে রোগবীজ পোষণ করে অথচ তাহাদের নিজের কোনো পীড়া হয় না, কিন্তু তাহাদের সংস্পর্শে যাহারা আসে তাহারা উহার দ্বারা সংক্রামিত হইয়া রোগে

আক্রান্ত হয়। বস্তুতঃ কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগ এইরূপেই কেরিয়ারের দ্বারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। যে দেশে কলেরা নাই, সে দেশে হয় তো কোনো কলেরা-বীজবাহী সুস্থ ব্যক্তি গিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন হইতেই সেখানে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ সম্বন্ধেও পূর্ব্ব হইতে অনেকে সন্দেহ করিতেন, কিন্তু ১৯০৬ সালে ক্লিঙ্গার (Klinger) নামক জার্ম্মান বীজাণুতত্ত্ববিদ্ প্রথম প্রমাণ করিয়া দেখান যে সুস্থ ব্যক্তির মলে টাইফয়েড্ বীজাণু রহিয়াছে, এবং তাহাই পানীয় জল সংক্রামিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে টাইফয়েড্ রোগ উৎপন্ন করিতেছে। অতঃপর নানাস্থানে সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সুস্থ মানুষ নানা রোগের বাহন হইয়া সমাজের মধ্যে রোগ উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। এখন প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে কেবল কলেরা ও টাইফয়েড্ নয়, অনেক রোগই সুস্থ ও আপাতঃসুস্থ ব্যক্তির দ্বারা সংক্রামিত হয়। এমিবা-রোগের অধিকাংশই মানুষের হাত হইতে খাদ্যসংস্পর্শের দ্বারা জন্মায়। এ-ছাড়া ডিফ্থীরিয়া, মেনিঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি আরও অনেক রোগের নাম করা যাইতে পারে যেগুলি সাবধানতা সত্ত্বেও কেরিয়ারের সংস্পর্শে অতর্কিতে শরীরে প্রবেশ করে। আর এ কথাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে রোগ আরোগ্য হইয়া গেলেই রোগীর সংক্রামকতা নষ্ট হয় না, আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীরে রোগের বীজ অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকিয়া যায় এবং তাহারাই রোগবিস্তারের অজানিত বাহন বা কেরিয়ার।

রোগের ক্ষেত্র

জীবদেহ মাত্রই রোগের ক্ষেত্র। রোগবীজ তথায় বিশিষ্টরূপে রোপিত হইলে তাহা অসুস্থ হয়। কিন্তু রোগ যখন নাই তখন কোনো রোগবীজ তথায় উপস্থিত থাকিলেও উহাকে সুস্থ অবস্থা বলি।

এই কথাটি আমাদের সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া লওয়া দরকার যে 'স্বাস্থ্য' বলিতে কখনই রোগবীজশূন্যতা বুঝায় না, কেবলমাত্র রোগলক্ষণশূন্যতা বা পীড়ার অবর্ত্তমানতাই বুঝায়। রোগবীজ আমাদের শরীরে কতই থাকিতে পারে, এবং তাহাই স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক জীবজগৎ এমন ভাবেই নিয়ন্ত্রিত যে এক প্রাণীর অস্তিত্ব অন্য প্রাণীর অস্তিত্বের উপর সর্ব্বদাই নির্ভর করে। সকল প্রকার জীবই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, পরস্পরের আশ্রয় ব্যতীত কেহই বাঁচিতে পারে না,—ইহাই সৃষ্টির এক বিশেষ রহস্য (biological phenomenon of parasitism)। উচ্চশ্রেণীর জীব নিম্ন শ্রেণীর জীব হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং নিম্নশ্রেণীর জীবও খাদ্য সংগ্রহের জন্য উচ্চশ্রেণীর জীবের আশ্রয় গ্রহণ করে, পরস্পরের মধ্যে এইরূপ আদানপ্রদান সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। রোগবীজাণুও আপন খাদ্যলাভের জন্য মানুষের আশ্রয়ে আসে, কোনোরূপ রোগ জন্মাইবার জন্য নয়। এই জন্য জীবাণু প্রভৃতিকে মনুষ্যাদি উচ্চশ্রেণীর জীবের প্যারাসাইট্ (parasites) বলা হয়। কিন্তু সেই জীবাণু বা বীজাণুই যখন কোনো কারণে বিশিষ্টভাবে শিকড় গাড়িবার সুযোগ পায়, তখন উহাদের স্বভাবের (biological balance) পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং তখন হইতেই উহারা রোগ জন্মাইবার কারণ হইয়া পড়ে। যে বীজাণু এক সময় নিরীহ (commensal) অবস্থায় থাকে, তাহাই সময়ান্তরে বিপত্তিকারী (pathogenic) হইয়া পড়ে। ক্ষেত্রগত অবস্থার পরিবর্ত্তনই ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

অবশ্য বীজাণু নানাপ্রকারের আছে,—তাহার মধ্যে কতক নিরীহ, কতক বিষাক্ত। নিরীহ বীজাণুগুলিকে আমরা বলি মানুষের শরীরের স্বাভাবিক 'ফ্লোরা' বা পরগাছা (normal flora of the human body),

—ইহারা নিরুপদ্রবে আমাদের শরীরে সর্ব্বদা বাস করে এবং হয়তো অনেক উপকারও করে। কিন্তু বিষাক্ত বীজাণুও অনেক সময় প্রতিরোধ-শক্তির প্রভাবে নিরীহ হইয়া শরীরে অবস্থান করে। এই স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তিকে সাধারণভাবে বলা হয়, **রেজিষ্ট্যান্‌স্** (resistance)। ইহা অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান থাকিলে সেই অবস্থাকে বলা হয় **ইমিউনিটি** (immunity)। যখন উহা হ্রাস পায় তখন বলা হয় **রোগপ্রবণতা** (susceptibility)। অতএব ক্ষেত্রগত অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার উপরই রোগবীজের ক্রিয়া নির্ভর করে।

বর্ত্তমান যুগে রোগবীজ যে কাহার শরীরে নাই এই কথাই বলা কঠিন। পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে অনেকের শরীরে রোগবীজ রহিয়াছে অথচ রোগ নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যক্ষ্মাবীজাণুর কথা, যাহাকে আমরা যমের মতই ভয় করিয়া থাকি। আমরা কতজনেই যে এই বীজাণুকে শরীরের মধ্যে পোষণ করিতেছি তাহার স্থিরতা নাই। পরীক্ষা করিলেই ইহা প্রমাণ করিতে পারা যায়। লণ্ডন সহরে কোনো একটি পল্লীর সমস্ত অধিবাসীকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের দেহে বীজাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে, অথচ তাহাদের যক্ষ্মারোগের কোনোই লক্ষণ নাই। প্রতিরোধ-শক্তির প্রভাবে এই বীজাণু তাহাদের শরীরে আপন বিষক্রিয়াও প্রকাশ করিতে পারে না, যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধিও করিতে পারে না, কোনো নিভৃততম প্রদেশে আশ্রয় লইয়া নিরুপদ্রবে বাস করে।

ক্ষেত্র উপযুক্ত না থাকিলে বীজ-রোপন কখনও সফল হয় না। জীবের দেহই রোগ বীজের ক্ষেত্র বটে, কিন্তু তাহা অনুকূল অবস্থায় না থাকিলে বীজ প্রবেশ করিলেও তথায় রোপিত হইতে পারে না। অতএব রোগের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইলে কেবল বীজের কথাই ভাবিলে চলিবে না, ক্ষেত্রের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। বীজাণু-বিজ্ঞানের যখন প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন বীজের দিকেই সকলের অত্যন্ত ঝোঁক পড়িয়াছিল, এবং সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে কেবল এই তথ্যের সম্যক আলোচনা করিলেই রোগসমস্যার সমাধান হইবে। তদবধি বীজাণু-

তত্ত্ব বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহা লইয়া বিজ্ঞান-জগতে এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে কেবল ঐ জ্ঞান লইয়াই শেষ মীমাংসা করা যাইবে না,—ক্ষেত্রবিচার করাও প্রয়োজন। সেইজন্য আধুনিক যুগে মনুষ্যদেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা-বৈচিত্র্যের দিকে আবার নূতন করিয়া ঝোঁক পড়িয়াছে।

অনেকের দেহই নানারূপ রোগের বীজ গ্রহণ করিবার পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তির দেহ কোনো কোনো বিশেষ রোগের পক্ষে অনুপযুক্ত। কি গুণের দ্বারা ইহা সম্ভব হয়,—ও কিসে এই অনুপযুক্ততা অর্জ্জন করিতে পারা যায়?

রোগমাত্রই যে বিশ্বজনীন এ কথা বলা চলে না। প্রায়ই দেখা যায় একদেশের লোকের যে রোগ অন্যদেশের লোকের তাহা হয় না,—এক বয়সের যে রোগ অন্য বয়সে তাহা হয় না,—এক অবস্থায় যে রোগ হয় অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে সে রোগ আর হয় না।

কি প্রকার শক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বারা মানুষের মধ্যে রোগের এরূপ তারতম্য হয়?

পূর্ব্বে আমরা অ্যান্টিবডি প্রভৃতি শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধী বস্তুর কথা বলিয়াছি। কিন্তু সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে কে? একজনেরই শরীরে এক সময় এক রোগের উপযুক্ত অ্যান্টিবডি যথেষ্ট থাকে অথচ অন্য রোগের বিরুদ্ধে তাহা থাকে না,—আবার সময়ান্তরে অ্যান্টিবডির অদলবদল হয়,—ইহার কারণ কি? খুব শৈশব অবস্থায় সর্দ্দি কাসি ম্যালেরিয়া নিত্যই হয়, কিন্তু টাইফয়েড্ বা মেনিঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি রোগ কম হয়,—এগুলি একটু বয়স বাড়িলে দেখা যায়,—আবার পরিণত বয়সে এ-গুলি প্রায় হয়ই না,—তখন নূতন ধরণের রোগ দেখা দেয়,—এ সকলের অর্থ কি?

আমাদের শরীরে নানারূপ আভ্যন্তরিক গ্রন্থি বা ডাক্টলেস্ গ্ল্যাণ্ড (ductless glands) আছে,—জন্ম, বয়স, অবস্থা ও ঘটনাচক্র অনুসারে সেগুলির ক্রিয়ার তারতম্য হয় এবং সময়বিশেষে সেগুলির পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সকল গ্রন্থি বা গণ্ডসমূহই আমাদের শরীরের গঠন, মনের গঠন, রোগপ্রবণতা (constitutional differences and susceptibility),

এমন কি স্বভাব-চরিত্রকেও নিয়ন্ত্রিত করে,—আজকালকার অনেকের এই মত। এই সকল গণ্ডের কোনো প্রণালী (duct) নাই, কিন্তু আপন আপন আভ্যন্তরিক রস ভিতরে ভিতরে রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়,—এবং এই রসের দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় থাইরয়েড (thyroid) গ্রন্থি, যাহা গলদেশে অবস্থিত,—উহা অতদূরে থাকিয়া নিম্নে প্রজনন গ্রন্থিগুলিকে (sexual glands) নিয়ন্ত্রিত করে, অপরপক্ষে শরীরের পুষ্টিকেও নিয়ন্ত্রিত করে—আবার মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থিকেও (pituitary) নিয়ন্ত্রিত করে। জুঙ্গেব্লুট (Jungeblut) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বলেন যে বয়স ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থিগুলির ক্রিয়ার বদল হয়, সেই সঙ্গে শরীরের পরিবর্ত্তন হয় এবং রোগপ্রবণতারও বদল হইয়া যায়।

সুতরাং যে ব্যক্তি একই রোগে বারংবার ভুগিতেছে,—তাহাকে পুনঃপুনঃ ভ্যাক্সিনাদি দ্বারা চিকিৎসা করা অপেক্ষা, কোন গ্রন্থির দোষে এইরূপ হইতেছে বুঝিয়া তাহারই সংশোধন করা আবশ্যক,—এই প্রকারের ধারণাই আজকাল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে। গণ্ডরস সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের এখন অতি শৈশব অবস্থা, এখনও ইহা প্রশ্নমাত্র, সুতরাং এখনো কিছুই বিশেষ করিয়া বলা সম্ভবপর নয়। কেবল এইটুকু বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান জগৎ এই পথেই অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছে,—এবং অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আর এক নবযুগের আবির্ভাব সূচিত হইতেছে।

রোগ-সকলের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের কথা ছাড়িয়া আরো দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ রোগেরই কতকগুলি বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম ক্ষেত্রও থাকে, অর্থাৎ মনুষ্যেতর কতকগুলি জন্তুর শরীরে রোগের বীজ রোপিত করিলে অনেক রোগই কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করিতে পারা যায়। এই সকল জন্তুর স্বাভাবিক উপায়ে ঐ রোগ হয় না বটে, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে তাহারা বীজগ্রহণের উপযোগী।

রোগের বীজ ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে এখানে কেবল মোটামুটি ভাবেই বলা সম্ভব। এ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা জানিবার আছে, যাঁহারা

কৌতূহলী তাঁহারা এ বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ সকল পাঠ করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়ী তাঁহাদের এত কথা জানিবার প্রয়োজন কি? রোগ ও তাহার চিকিৎসা, এই দুই বিষয়ে উত্তমরূপে জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে রোগ ও তাহার বীজ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে উপযুক্তরূপ চিকিৎসা হইতে পারে না; যিনি ঔষধাদির আবিষ্কার-কর্ত্তা তিনিই যদি কেবল উহা জানেন এবং যিনি ঔষধের প্রয়োগ-কর্ত্তা তিনি যদি সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন তবে ঔষধের আবিষ্কার হইলেও তাহার যথাযথ প্রয়োগ হইতে পারে না। রোগের ঔষধ হাৎড়াইয়া ব্যবহার করার দিন আর নাই। এখন ঔষধাদির আবিষ্কার ও রোগ সম্বন্ধে গবেষণা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে রোগের বীজ জানা আছে এবং যে সকল জন্তু তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া জানা গিয়াছে, সেই বীজ আহরণ করিয়া ঐ সকল জন্তুর উপর আরোপ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে রোগ উৎপাদন করা হয়, এবং ল্যাবোরেটরিতে বসিয়া একটির পর একটি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেখা হয় কোন ঔষধটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। রাসায়নিক ও ব্যাকৃটিরিওলজিষ্ট এক একটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে থাকেন এবং কৃত্রিম রোগীর উপর তাহার পরীক্ষা হইতে থাকে। এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে যে ঔষধটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা অতঃপর জীবের স্বাভাবিক রোগে প্রয়োগ করিয়া দেখা হয় এবং তাহাতে সুফল হইলে উহা জগতে প্রচার করা হয়। অতএব যে পর্য্যন্ত রোগের নির্দ্দিষ্ট বীজ ও নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র জানা না যায় সে পর্য্যন্ত ঔষধের ফলাফলের বিষয় জ্ঞান অস্পষ্ট থাকিয়া যায়, এবং অধিকতর তেজস্বী ঔষধ আবিষ্কৃত হয় না। যে সকল দুরারোগ্য ব্যাধি যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে সন্ত্রস্ত ও চিন্তান্বিত করিয়া রাখিয়াছে ও যাহার উপযুক্ত ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহার বীজ ও উপযুক্ত ক্ষেত্র যদি জানিতে পারা যায় তবে ঔষধ আবিষ্কার অনেক সহজ হইয়া আসিবে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ইহাই পন্থা। চিকিৎসকও বৈজ্ঞানিক, সুতরাং এবিষয়ে তাঁহার অজ্ঞ থাকিলে চলিবে না। রোগ যে কোনো অবাস্তব সৃষ্টি নয়, ইহার বীজ আছে বা ক্ষেত্র আছে, এ কথা জানা থাকিলে তিনি কৃতনিশ্চয় হইয়া কার্য্য করিবেন।

জ্বর পরিচয়

জ্বর লইয়া যে রোগগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে, এখন আমরা সেই গুলির আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে জ্বরের হেতু সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক।

অধিকাংশ রোগে প্রায়ই জ্বর হয় কেন, তাহার অনেক কারণ অনেকে বলেন। প্রাচীন চরকাদি গ্রন্থে জ্বরের সহিত ক্রোধের তুলনা করা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে জৈব প্রকৃতি যখন কোনো রূপে প্রতিহত ও সংক্ষুব্ধ হয় এবং তাহার শান্তি ভঙ্গ হয়, তখন তাহা কুপিত হইয়া জ্বর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমরাও অন্যভাবে এই কথাই বলি। জ্বরকে আমরা বলি রি-অ্যাকশন (re-action) বা প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ আঘাতের প্রত্যাঘাত, অমঙ্গলের প্রতিবাদ। প্রাচীনকালের রীতি অনুসারে বলিতে হয় যে, ইহা শারীরিক কাম্য অবস্থার বৈষম্যজনিত একপ্রকার ক্রোধের অভিব্যক্তি (কামাৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ)। বর্ত্তমান চিন্তাধারা অনুসারে আমরা বলি যে কোনো শান্তিভঙ্গকারী বিরুদ্ধশক্তির সহিত শরীরের সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ার উহা এক প্রকার চিহ্ন।

জ্বর বলিতে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঘটনা (process) মনে করা উচিত নয়; কোনো অলক্ষিত ঘটনা বা ঘটনাবলীর উহা প্রকাশক চিহ্ন মাত্র। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ কোনো রোগ হেতু অকস্মাৎ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং তাহাকেই আমরা জ্বর বলি। অর্থাৎ জ্বর নিজে একটি পৃথক ব্যাধি নহে, ইহা অন্য ব্যাধির লক্ষণ স্বরূপ।

উত্তাপের কথা—

স্থলচর প্রাণী মাত্রেরই শরীরে উষ্ণরক্ত প্রবাহিত (worm blooded)। প্রত্যেক স্থলচর প্রাণীর দেহেই একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপ আছে। কেবল জলচর প্রাণীর তাহা নাই, তাহাদের রক্ত শীতল (cold-blooded)। কেবল শীতল নয়,—তাহারা যখন যে অবস্থায় থাকে, শরীরের তাপও

তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়, এইরূপে জল হিম হইলে রক্তও হিম হয়, জল উষ্ম হইলে রক্তও উষ্ম হয়। কিন্তু আমাদের তাহা হয় না। বাহিরের উত্তাপ যেমনই পরিবর্ত্তিত হইতে থাক, আমাদের শরীর সেই অবস্থাতে থাকিয়াও উত্তাপের একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা রক্ষা করে,—যে অবস্থাতেই পড়ুক স্থলচর প্রাণী আপন তাপের নির্দ্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন হইতে দেয় না। তাপের সমতা না থাকিলে আমাদের শরীর রক্ষার কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতে পারে না বলিয়া মাংসপেশীসকল, গাত্রচর্ম্ম, রক্তশিরা, স্নায়ুমণ্ডলী প্রভৃতি সমস্তই এই তাপ রক্ষা কার্য্যে সহায়তা করে।

উত্তাপের সৃষ্টি হয় মাংসপেশী সমূহের চালনা ও সংঘর্ষের দ্বারা। বিশ্রাম অবস্থাতেও যে সকল ক্রিয়া শরীরাভ্যন্তরে চলিতে থাকে তাহাতেও উত্তাপের সৃষ্টি হইতে থাকে, তবে তাহা অনেক কম। শীতকালে সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, দ্রুত অঙ্গ চালনা করিলেই শরীর গরম হইয়া উঠে। লিভারের ক্রিয়া হইতেও রক্তের তাপবৃদ্ধি হয়, সেইজন্য শরীরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা লিভারের রক্ত সর্ব্বাপেক্ষা গরম। একদিকে যেমন শরীরে উত্তাপ উৎপন্ন হইতে থাকে, অন্য দিকে তেমনি উহা খরচ হয় নিঃশ্বাস বায়ু ও ঘর্ম্মাদির দ্বারা। এইরূপে পরিমিত উৎপাদন ও ব্যয়ের দ্বারা উত্তাপের সামঞ্জস্য নিত্য রক্ষিত হয়।

স্নায়ু-শক্তির দ্বারা এই সামঞ্জস্য নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। মস্তিষ্কে এইজন্য স্বতন্ত্র তাপ-নির্দ্ধারক কেন্দ্র (heat regulating centre) আছে। তৎকর্ত্তৃক তাপজনন ক্রিয়াকে বলা হয় থার্মোজেনেসিস্ (thermogenesis), তাপক্ষয় ক্রিয়াকে বলা হয় থার্মোলাইসিস্ (thermolysis), এবং দুইয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করাকে বলা হয় থার্মোষ্ট্যাক্সিস্ (thermostaxis)।

আমাদের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৭·৮ হইতে ৯৮·৮ ডিগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বাহিরের উত্তাপ কেমন এবং শরীরের ক্রিয়া কিরূপ চলিতেছে সেই অনুসারেই নিত্য ঐ সীমার মধ্যে নানারূপ ইতরবিশেষ ঘটিতে থাকে। দেহে এক প্রকার উত্তাপ সর্ব্বদা থাকিতে পারে না, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থাতেও প্রায় প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সময়ে সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ টেম্পারেচারের মধ্যে দুই ডিগ্রী পর্য্যন্ত তফাৎ ঘটিতে দেখা

যায়। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমাদের টেম্পারেচার সাধারণতঃ ভোর ৫টার সময় সর্ব্বাপেক্ষা কম হয় এবং সন্ধ্যা ৬টার সময় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। আর যেহেতু সকলের স্বাভাবিক টেম্পারেচার একই রূপ হইতে পারে না, সেই হেতু ঠিক কত টেম্পারেচার হইলে কাহার পক্ষে জর, কাহার পক্ষে জর নয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা কিছু কঠিন। দুর্ব্বল লোক হইলেই তাহার স্বাভাবিক টেম্পারেচার কম হইবে আর সবল লোক হইলেই বেশী হইবে, এ কথাও ঠিক নয়। অনেক বিবেচনার পর চিকিৎসক সম্প্রদায় ইহা ধার্য্য করিয়া লইয়াছেন যে **৯৯ ডিগ্রীর নীচে** উত্তাপ থাকিলে সাধারণতঃ তাহাকে জর বলা হইবে না। এরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকিলে কার্য্যের সুবিধা হয় না। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম মীমাংসা করিতে হইলে আগে দেখিতে হয় রোগীর সর্ব্বনিম্ন টেম্পারেচার কত থাকে এবং তাহা কতদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহা দুই ডিগ্রীর অধিক ছাড়াইয়া যায় কিনা।

শরীরের যে স্বাভাবিক উত্তাপ, তাহা ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে কিংবা বরফ লাগাইলেও কমে না। এই স্বাভাবিকের সীমা অতিক্রম করিলে জর হয়। জর অস্বাভাবিক অবস্থা। বরফ প্রয়োগ করিলে বা শীতল জলে স্নান করাইলে এই অস্বাভাবিক উত্তাপ কমাইতে পারা যায়।

জর কাহাকে বলে?

পূর্ব্বে বলা হইল যে ৯৯ ডিগ্রী বা তদূর্দ্ধে টেম্পারেচার না উঠিলে তাহাকে জর বলা হইবে না। কিন্তু অনেক সময় শরীরের অসুস্থতা বশতঃ 'জর ভাব' হইতে পারে এবং নাড়ীও চঞ্চল হয়, অথচ থার্ম্মোমিটারে ৯৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠে না। ইহাকে আমরা 'জর ভাব' বলিয়া থাকি, কারণ জর নাম না দিলেও ইহাতে জরের লক্ষণ দেখা যায়। ইংরেজীতে ইহাকে বলে apyrexial fever।

জরের যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা যে কেবল উত্তাপ বৃদ্ধির জন্যই হয় তাহা নয়। কেবলমাত্র তাপবৃদ্ধিই জর নয়। অত্যধিক তাপবৃদ্ধি

হইলে, অর্থাৎ ১০৫ বা ১০৬ ডিগ্রী হইলে কেবল ঐ তাপের জন্য নানারূপ কষ্টদায়ক লক্ষণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন তাপবৃদ্ধি মাত্রই জরের সম্পূর্ণ স্বরূপ নয়। জর বলিতে একরূপ লক্ষণ-সমষ্টি বুঝায়,—তাপবৃদ্ধি উহার মধ্যে একটি মাত্র লক্ষণ, তবে সর্ব্বাগ্রে প্রতীয়মান হয় বলিয়া উহাকেই আমরা প্রাধান্য দিয়া থাকি।

জর না হইয়াও অন্য প্রকারে শরীরের তাপবৃদ্ধি হইতে পারে। হিষ্টিরিয়াতে অনেক সময় তাপবৃদ্ধি হয় অথচ তাহা জর নয়। মস্তিষ্কে কোন গুরুতর আঘাত লাগিলে (injury to the brain) শরীরের তাপবৃদ্ধি হয়; যদিও জর নাই তবু তাপবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপেও শরীরের তাপ অকস্মাৎ বাড়িয়া উঠিতে পারে। কয়েক প্রকার ঔষধের দ্বারাও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু এই সকল অবস্থা জর পদবাচ্য নয়। অপর পক্ষে কয়েক প্রকার বীজাণু বা তাহার বিষ শরীরের মধ্যে ইন্‌জেকশন করিয়া দিলেও উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার সঙ্গে জরের অন্যান্য লক্ষণও উপস্থিত থাকে। এইরূপ লক্ষণযুক্ত তাপবৃদ্ধির অবস্থাকেই আমরা জর বলি। আজকাল আমরা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাই যে কলেরা বা টাইফয়েডের প্রতিরোধক ভ্যাক্সিন ইন্‌জেকশন লইলে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হয় এবং অল্প জরও হয়। মৃত বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে যে অবস্থা হয়, জীবন্ত বীজাণু প্রবেশ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় ঐ সকল লক্ষণ হয়। অলিভার হীথ (Oliver Heath) নামক বৈজ্ঞানিক নিজের শরীরে টাইফয়েড্ ভ্যাক্সিন্ লইয়া তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং টাইফয়েড্ রোগীদের রক্তের মধ্যে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এই সকল পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে রক্তের উত্তাপ যত বাড়ে ততই উহা বীজাণুর পক্ষে অনিষ্টকারী। উত্তাপ লাগিলে বীজাণুর সংখ্যা কমিয়া যায় এবং উত্তাপের দ্বারা অ্যান্টিবডির মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বীজাণু বা তদনুরূপ কোনো বিজাতীয় পদার্থ রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিলে রক্তের অবস্থা এমন ভাবে উত্তেজিত হয় যাহাতে উহা মস্তিষ্কে গিয়া তাপ নির্দ্ধারক কেন্দ্রকে চঞ্চল করে, এবং

সেই জন্যই জর হয়। যতই এই জর বাড়িতে থাকে ততই অ্যান্টিবডি জন্মিতে থাকে, এবং এই অ্যান্টিবডি বীজাণু বিনাশের সহায়তা করে। এইরূপে বীজাণু কিছু পরিমাণ বিনষ্ট হইলে জর কমিয়া যায়। তৎপরে আবার যদি বীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সঙ্গে সঙ্গে আবার জর বাড়ে, আবার নূতন অ্যান্টিবডি প্রস্তুত হইতে থাকে। এই ভাবেই সংগ্রাম চলিতে থাকে। বীজাণুর তেজ যত হয় জরের তেজও তত হয়, এবং অ্যান্টিবডির প্রয়োজন অনুসারে জরের কাল নির্দ্ধারিত হয়। যদি বীজাণু বিশেষ বিষাক্ত হয় ও শীঘ্র শীঘ্র অ্যান্টিবডিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলে, তখন আর জর ত্যাগ হইবার অবসর ঘটেনা, সুতরাং জর তখন নিত্য লাগিয়া থাকে। কিন্তু অ্যান্টিবডির শক্তি বীজাণু অপেক্ষা অধিক হইলে পুনঃপুনঃ জর ত্যাগ হইতে থাকে। অবশেষে যখন বীজাণুসকল পরাস্ত হয় তখন আর জর আসেনা। টাইফয়েড্ প্রভৃতি দীর্ঘস্থায়ী রোগে বীজাণুর বিষ অধিক বলশালী বলিয়া জর ও দৈহিক সংগ্রাম বিলম্বিত হয়। জরের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষুধা, অবসন্নতা, আলস্য, প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ থাকে,—হীথ বলেন তখন শরীরের যাবতীয় শক্তি কেবল বীজাণু-সংগ্রামে নিয়োজিত থাকে বলিয়া শরীরের অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় রাখা আবশ্যক,—সেইজন্যই ঐ সকল লক্ষণ।

শিক্, ফন্ পির্কে (Schick, Von Pirquet) প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণের মত এই যে, রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র উহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি জাগ্রত হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ না বাধে ততক্ষণ রোগের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। এই দুই বিজাতীয় ও বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে এক তৃতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়,—তাহার নাম দেওয়া হয় "অ্যাপোটক্সিন" (apotoxin)। ইহা বিষাক্ত দ্রব্য এবং ইহার দ্বারাই জর বা অন্যান্য রোগলক্ষণের উদ্ভাবনা হয়। অর্থাৎ স্বয়ং বীজাণুর দ্বারা রোগের সৃষ্টি হয় না,—দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া হইতে রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রতিক্রিয়া না হয় ততক্ষণ বীজাণু বর্ত্তমান থাকিলেও রোগ হয় না। বীজাণুর প্রবেশ হইতে প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব পর্য্যন্ত এই অন্তরালবর্ত্তী সময়ের নাম ইনকিউবেশন পীরিয়ড্ (incubation period) বা রোগের প্রচ্ছন্ন কাল। বিভিন্ন

বীজাণু অনুসারে বিভিন্ন অ্যাপোটক্সিন প্রস্তুত হয়,—তাহার প্রচ্ছন্ন কালও বিভিন্ন, ক্রিয়াও বিভিন্ন।

যে দিক দিয়াই দেখা যাউক,—জর আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক,—ইহা অনিষ্টকারী নয়। জর আমাদের শরীরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ করে। ইহাকে রোগের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবধর্ম্মের একটি আবশ্যকীয় লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যেখানে রোগের বিষ অত্যন্ত অধিক এবং রোগীর জৈবশক্তি তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত, সেখানে প্রতিক্রিয়াও নাই, জরও নাই,—কিন্তু রোগীর মৃত্যু সেখানে অনিবার্য্য। যেখানে নিউমোনিয়া হইয়াছে অথচ জর নাই,—সেখানে রোগীর বাঁচিবার কোনোই আশা নাই। সেখানে আমরা তেজস্কর ঔষধের দ্বারা জর আনিবার চেষ্টা করি,—জর দেখা গেলে বিপদ কাটিয়াছে মনে করি। ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়াতেও যেখানে দেখি রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পরিপূর্ণ অথচ জর নাই, সেখানেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় পাই। অতএব জরকে আমরা মঙ্গলজনক বলিয়াই গ্রহণ করি এবং নানারূপে রোগ আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিলেও জরটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি না যায় ততক্ষণ উহাকে তাড়াইতে বিশেষ ব্যস্ত হই না।

জ্বরের সাধারণ লক্ষণ

ভিন্ন ভিন্ন জরে লক্ষণ হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সুতরাং সাধারণভাবে জরের লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা চলে না। তবে জরের কতকটা সাধারণ রূপ আছে। সকল জরই প্রথমে বাড়িয়া ওঠে; কতকদূর পর্য্যন্ত বাড়িবার পর ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে; তাহার পর আবার কমে। এই অনুসারে জরমাত্রকেই তিন অবস্থায় ভাগ করা হয়।

প্রাথমিক অবস্থা (initial stage)। কখনও জর দ্রুতবেগে বাড়িয়া ওঠে (যেমন ম্যালেরিয়াতে, নিউমোনিয়াতে) আবার কখনও ধীরে ধীরে বাড়ে (যেমন টাইফয়েডে)।

দ্বিতীয়—**জরের স্থিতি বা মধ্য অবস্থা** (acme, fastigium)। জর

যতটা উঠিবার ততটা উঠিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত উহার ভোগ হইতে থাকে,—ইহা সেই অবস্থা।

তৃতীয়—**জ্বরের শেষ অবস্থা** বা (deferescence)। এই সময়ে কখনও বা জ্বর হঠাৎ উচ্চ হইতে নামিয়া একেবারে ত্যাগ হইয়া যায়,—ইহাকে বলে ক্রাইসিস্ (crisis)। (ইহা আমরা প্রায় নিউমোনিয়াতে দেখিতে পাই।) আর কখনও বা জ্বর বহু সময় ধরিয়া ধাপে ধাপে নামিতে নামিতে ক্রমে নর্ম্মালে আসিয়া পৌঁছায়,—ইহাকে বলে (lysis)। (এইরূপ নামা প্রায় টাইফয়েডে দেখা যায়।)

জ্বর কিরূপভাবে উঠিল, কতদিন ও কিরূপভাবে তাহার ভোগ হইল, এবং কিরূপে তাহা ত্যাগ হইল,—ইহা দেখিয়া রোগের অনেকটা পরিচয় লাভ করা যায়, কারণ বিভিন্ন জ্বরের গতিবিধি ও ভোগ বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। জ্বরের আদি আচরণ দেখিয়া উহার অন্ত কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা সম্ভবপর,—এইজন্য প্রথম হইতেই টেম্পারেচার লওয়া ও তাহা নিয়মমত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। টেম্পারেচার চার্ট বা নক্সা প্রস্তুত করিয়া লওয়ার ইহাই উদ্দেশ্য।

জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ **আনুষঙ্গিক লক্ষণ** থাকে। তাহার মধ্যে কতকগুলি জ্বরের কারণেই ঘটে এবং কতকগুলি ঘটে রোগের কারণে,—যাহা হইতে জ্বরের উৎপত্তি। অক্ষুধা হওয়া, শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকা প্রভৃতি লক্ষণ জ্বরের জন্যই হয়।

(১) জ্বর আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই গায়ে কাঁটা দেয় ও **শীতবোধ** হইতে থাকে। কেবল যে ম্যালেরিয়াতেই এরূপ হয় তাহা নয়, অধিকাংশ জ্বরেই এরূপ দেখা যায়। ইহার কারণ তখন ভিতরে ভিতরে তাপ উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু বাহিরের হাওয়া শীতল,—গাত্রচর্ম্ম এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। এ সময় গায়ে হাত দিলে মনে হয় বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু মুখের ভিতর টেম্পারেচার লইলেই দেখা যায় রীতিমত জ্বর। গায়ের চামড়া সঙ্কুচিত হইয়া ও কাঁটা দিয়া কিছুক্ষণ পরে নিজেই উত্তপ্ত হইয়া ওঠে, তখন জ্বর বাহিরে প্রকাশ পায়।

শীতবোধ করা (chilliness) ও কম্প দেওয়ার (rigor) মধ্যে

পার্থক্য আছে। শীত বোধ করা কেবলমাত্র গাত্রচর্ম্মের ক্রিয়া, কিন্তু কম্প হইলে তৎসঙ্গে মাংসপেশীসমূহও সঞ্চালিত হয়, সেইজন্য কম্প হইলেই উত্তাপ আরও অধিক হয়। ম্যালেরিয়াতে কম্প হয় বলিয়া জ্বরও খুব বাড়িয়া ওঠে। ম্যালেরিয়া ছাড়া কয়েকপ্রকার কঠিন ব্যাধিতেও প্রথমে কম্প দিয়া জ্বর আসে,—যেমন নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস্ ইত্যাদি।

(২) জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে **নাড়ী চঞ্চল** হয় এবং **শ্বাসক্রিয়া দ্রুতগতি** চলিতে থাকে। জ্বরের সময় শরীরের মধ্যে যথেষ্ট দাহ হইতে থাকে, এবং বিদগ্ধ আবর্জ্জনাসমূহ দূর করিবার জন্য ও উষ্মতাকে শীতল করিবার প্রচেষ্টায় দ্রুতগতি শ্বাসবায়ুগ্রহণ ও রক্ত চলাচল আবশ্যক হইয়া পড়ে। মানুষের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৭০-৮০ বার। যাহার যে স্বাভাবিক গতি,—জ্বর অবস্থায় তাহার প্রত্যেক ডিগ্রী তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর বেগ প্রায় ৪-৫ সংখ্যা করিয়া বাড়ে। ইহার অবশ্য কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই,—রোগ অনুসারে অনেক ইতরবিশেষ হয়।

(৩) জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ, **তৃষ্ণাবৃদ্ধি, মূত্র হ্রাস, জিহ্বা অপরিষ্কার** হওয়া। ইহা ছাড়া মাথাধরা, অনিদ্রা, গায়ে ব্যথা হওয়া, ভুলবকা প্রভৃতিও প্রায় দেখা যায়। জ্বর মাত্রেরই এগুলি সাধারণ লক্ষণ। জ্বর এগুলির কারণ নয়,—রোগের বিষ অর্থাৎ toxaemia এগুলির কারণ। যে রোগের বিষ যত অধিক, তাহার লক্ষণও তত বহুলপ্রকার ও সুপরিস্ফুট হয়। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া রোগ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাইতে পারে, কিন্তু তবু লক্ষণ মিলিলেই রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া উচিত নয়,—অতি সাবধানে ও স্থিরবুদ্ধির দ্বারা মত গঠন করা কর্ত্তব্য।

মারাত্মক জ্বর হইলে সাধারণ লক্ষণগুলি ছাড়াও কয়েকপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মারাত্মক জ্বরে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া প্রায়ই খুব দ্রুত হয় এবং প্রস্রাব গাঢ় হয়। প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে অ্যাল্‌বুমেন প্রায়ই পাওয়া যায় এবং অ্যাসিটোনও (acetone) কখনো কখনো পাওয়া যায়।

অত্যন্ত মারাত্মক জ্বরে গায়ে একপ্রকার লাল লাল গুটিকার চিহ্ন বাহির হয়,—ইহাকে র‍্যাশ্ (rashes) বাহির হওয়া বলে। অত্যধিক বিষ হেতু রক্তশিরাসকল বিকৃত হয় এবং রক্তের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়।

শিরার গাত্র ভেদ করিয়া সেইজন্য রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং স্থানে স্থানে চামড়ার নীচে তাহা জমিয়া (petichae) ক্যাল্‌সিটার মত দেখায়।

এ ছাড়া মারাত্মক জরে আরো নানারকমের বিচিত্র উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলির বিস্তৃত উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নাই। এই সকল উপসর্গকে রোগের লক্ষণ মনে করিয়া তাহা হইতে রোগ সাব্যস্ত করা ঠিক নয়, কারণ অনেক রোগেরই অবস্থার কাঠিন্য অনুসারে একই প্রকার উপসর্গ দেখা যায়। স্থতরাং এই সকল সাধারণ উপসর্গগুলিকে বাদ দিয়া বিশিষ্ট লক্ষণগুলি ধরিয়া রোগ চিনিবার প্রয়াস করিতে হইবে।

জ্বর চেনা

জর হইলে তাহার পশ্চাতে কারণ আছে ইহা সাব্যস্ত করিয়া লইতে হইবে এবং সে কারণটি কি তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাকেই বলে জর চেনা। আগেকার কালে জরের প্রকৃতি দেখিয়া জর চেনা হইত, অর্থাৎ নূতন জর বা পুরাতন জর বা জীর্ণজর, সবিরাম কি অবিরাম জর, কেবলমাত্র তাহা দেখিয়া চিকিৎসা করা হইত। কিন্তু এখন বোঝা গিয়াছে যে, সে পদ্ধতি ভ্রান্ত, কারণ জরের চিকিৎসা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, রোগের চিকিৎসা করাই উদ্দেশ্য। স্থতরাং এখন সেই দৃষ্টি লইয়া জর চিনিতে হইবে।

চেষ্টা করিলে জর চেনা মোটেই কঠিন নয়, এ কথা সকল সময়ে বলা চলে না। কতকগুলি জর আছে যাহা সহজেই চেনা যায়,—কতকগুলি জর আছে যাহা বিলম্বে চেনা যায়,—কতকগুলি জর আছে যাহা চিনিতে সূক্ষ্মবুদ্ধির আবশ্যক,—আর কতকগুলি জর আছে যাহা চেনা নিতান্তই কঠিন। বস্তুতঃ অধিকাংশ জরই আমরা চিনিতে পারি বটে, কিন্তু সব জরগুলিই যে চিনিতে পারিব একথা বোধ হয় কেহই বলিতে পারেন না। তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ মানুষের যত প্রকার রোগ হইতে জরের উৎপত্তি হয় তাহার সবগুলিই যে আমাদের জানা আছে তাহা নয়। এমন কতকগুলি রোগ আছে যেগুলিকে এখনও পর্য্যন্ত আমরা চিনি না,—

স্থতরাং সেই সকল রোগ হইলে কেবলমাত্র আনুমানিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। এমন কয়েকটি জর আমরা এখনও দেখিতে পাই যাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—এমন কি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদির দ্বারাও তাহার কিছু সন্ধান পাওয়া যায় না। এই সকল জরকে বলা হয় "P. U. O" (pyrexia of uncertain origin) অর্থাৎ "**অনুক্ত**" বা "**অনামা**" জর। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, যে জরকে আমরা চিনিনা তাহা আমাদের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় এবং অনির্দ্দিষ্ট। অনুক্ত জরের সংখ্যা পূর্ব্বে অনেক বেশী ছিল—এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, ক্রমশঃ যত নূতন নূতন রোগবীজ আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই কতকগুলি জর পরিচিতের পর্য্যায়ের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে, স্থতরাং দুর্জ্ঞেয়ের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। এইরূপে ভবিষ্যতে হয়তো অপরিচিত জর বলিয়া আর কোনো কথাই থাকিবেনা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও জর সম্বন্ধে আমাদের যে অস্পষ্ট ধারণা ছিল, এখনকার স্পষ্টতর ধারণার সহিত তাহার তুলনা করিলেই বুঝা যায় চিকিৎসাবিজ্ঞান অল্প সময়ের মধ্যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তবু এখনও অনামা জর যে কিছু রহিয়া গিয়াছে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখিলে বর্ত্তমানে এইরূপ অনামা জর হয়তো শতকরা পাঁচ বা দশটির অধিক হইবে না, স্থতরাং আপাততঃ সেইগুলিকে বাদ দিয়া নির্দ্দিষ্ট জরগুলি চেনা সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট উপায়ের কথা বলা যাইতে পারে।

সাধারণ বুদ্ধি ও সাধারণ ব্যক্তি লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার। সাধারণ শক্তির অনুশীলনের দ্বারা কিরূপে রোগ চিনিতে পারা যায়, বিজ্ঞান তাহাই নির্দ্দেশ করে। এইরূপে বর্ত্তমানে রোগ চিনিবার যে সকল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে তাহা দ্বারা অধিকাংশ জরই চিনিতে পারা সম্ভব। এই শিক্ষা লাভ করিয়াও যে কাহারো কাহারো নিকট অনেক নির্দ্দিষ্ট জরও অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যায়,—তাহা শিক্ষার দোষে নয়। দোষ কেবল এই শিক্ষার সদ্ব্যবহার না করাতে, শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করাতে, তাহার সমস্ত নিয়মগুলি না পালন করাতে, তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করাতে, এবং যে সকল শিক্ষা পাওয়া যায় তাহার সম্যক চর্চ্চা না করাতে। রোগ

চিনিবার যে সকল পদ্ধতি আছে তাহা যিনিই সম্পূর্ণ মানিয়া চলিবেন তিনিই যে অধিকাংশ জর চিনিয়া লইতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

রোগীর আপাদমস্তক ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমাদের দেশের অধিকাংশ জরই সহজে ধরা পড়ে, ইহা সকলেই জানেন। রজার্স তাঁহার পুস্তকে স্পষ্টই বলেন—"In majority of cases of fevers in the tropics a diagnosis can be made by purely clinical methods in two or three days. In the mixed infections and doubtful cases a routine laboratory examination of blood etc. always help—". অর্থাৎ—"এদেশের অধিকাংশ জরই কেবল রোগী-পরীক্ষার দ্বারা দুই তিন দিনের মধ্যেই ধরা যায়। যেগুলি মিশ্রিত রোগ বা যেখানে সন্দেহ স্থল সেখানে রক্তাদি পরীক্ষার দ্বারা সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া যায়।" অতএব আমাদের সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং রোগীকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে, পরে সন্দেহ উপস্থিত হইলে ল্যাবরেটরি পরীক্ষাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

চিকিৎসকের অবস্থা অনেকটা অন্ধের মত,—দৃষ্টি শক্তি নাই, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাকে পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে। যে অন্ধ চতুর নয়, সে নিশ্চিন্ত মনে কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, বাধা পাইলে পুনরায় ভিন্ন পথ খুঁজিতে থাকে। কিন্তু যে চতুর সে প্রথমে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, কান পাতিয়া শোনে, শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ প্রভৃতির দ্বারা অনুভব করিয়া লয়, সন্দেহ হইলে যষ্টির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া পথ চিনিয়া লয়, তাহার পর অগ্রসর হয়। যে পথে একবার অগ্রসর হইবে সে পথ হইতে যেন ফিরিতে না হয় ইহাই তাহার চেষ্টা। আমাদেরও এইরূপ চতুর হওয়া প্রয়োজন। রোগ সম্বন্ধে যেখানে যতটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিবার অভ্যাস রাখিতে হইবে, তবেই ভুলের সংখ্যা কম হইবে। একদিকের সন্ধানকে উপেক্ষা করিয়া অন্যদিকের সন্ধান সম্বন্ধে কৌতূহলী হইলে চলিবে না। একদিকে যেমন অনুমান, অভিজ্ঞতা, ও প্রত্যক্ষদৃষ্টির সাহায্য লইতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি যন্ত্রাদির নির্দ্দেশকেও মানিয়া লইতে হইবে।

একদিক দিয়া যে সন্দেহের উদয় হইবে, অন্যদিক দিয়া তাহা নিশ্চিত কিনা মিলাইয়া দেখিতে হইবে; তবেই রোগনির্ণয় নির্ভুল হইবে।

যে-কোনো রোগই হউক বা যে-প্রকার জরই হউক, রোগীর সমস্ত শরীর ও সকল অঙ্গ তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ইহাতে রীতিমত অভ্যস্ত হওয়া উচিত; এমন অভ্যাস করা প্রয়োজন যেন প্রত্যেক রোগীকেই যন্ত্রচালিতের মত একে একে সব পরীক্ষাগুলি করিয়া লওয়া হয়, কোনো স্থলে তাহার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা না থাকে। রোগটি হয়তো প্রথমেই চিনিতে পারা গিয়াছে, তথাপি অভ্যাস মত পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ করা চাই। এইরূপ অভ্যাস রাখিবার আবশ্যকতা অনেক আছে। রোগ চিনিতে না পারিলেও এইরূপ পরীক্ষার দ্বারাই সুচিকিৎসা করা সম্ভব। কারণ রোগ না চিনিলেও চিকিৎসককে চিকিৎসা করিতে হইবে, ইহাতে লজ্জার কথা কিছু নাই। নানা কারণে রোগ চিনিতে কিছু বিলম্বও হইতে পারে, অথবা উহা অনির্দ্দিষ্টও থাকিয়া যাইতে পারে। মনে করুন জরটি কিসের বুঝিতে পারিলাম না,—কিন্তু জরের চরিত্র দেখিলাম, গতিবিধি দেখিলাম, শরীরের কোথায় কি বিকৃতি ঘটিয়াছে দেখিলাম; কেবল চাক্ষুষ দেখা নয়, যন্ত্রাদির দ্বারা আভ্যন্তরিক বিকৃতিও যথাসম্ভব লক্ষ্য করিলাম,—এবং সেই মত চিকিৎসা করিলাম। ইহাও সুচিকিৎসা; জটিল রোগ হইলে ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, এবং যদিও রোগের নাম বলিতে পারা যায় না তথাপি তাহা এইরূপে আরোগ্যও করিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে এ সম্বন্ধে উপদেশচ্ছলে দুইটি সুন্দর শ্লোক আছে, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলে বোধ করি অবান্তর হইবে না :—

বিকারাণামকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন
ন হি সর্ব্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ।
নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাত্তস্মাচ্চিকিৎসকঃ
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধিমুপাচরেৎ।

অর্থাৎ,—সকল বিকারের নাম দিতে না পারিলে কখনও লজ্জিত হইবে না, কারণ সকল রোগের নাম বিশিষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করা নাই। দোষ না থাকিলে রোগ জন্মে না। সুতরাং চিকিৎসক অনুক্ত রোগগুলিকে

বিভিন্ন লিঙ্গরূপধারী ব্যাধি (disease picture) মনে করিয়া কেবল উহার লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা করিবেন।

আমাদের দেশে যে চিকিৎসক যত জর আরোগ্য করিতে পারেন, তিনিই তত বিচক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হন। এই বিচক্ষণতা অর্জ্জন করিবার জন্য কোনো অসাধারণ মেধাশক্তির প্রয়োজন নাই, উহার একমাত্র উপায় রোগী পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ। ইহা যে কেবল রোগ চিনিবার জন্যই প্রয়োজন তাহা নয়,—কোন পথে চিকিৎসা পরিচালিত হইবে, ঔষধের মাত্রাদি কিরূপ হইবে, একই রোগের উপযুক্ত ঔষধ নানাপ্রকারের থাকিলে কোন বিশিষ্ট ঔষধটি কাহার পক্ষে বাছিয়া লইতে হইবে, ইত্যাদি অনেক বিষয় কেবল রোগী দেখিয়াই স্থির করিতে হয়।

আসল কথা, জর মাত্রেরই এবং রোগ মাত্রেরই একটা রূপ আছে। লক্ষণাদির একত্র সমাবেশে সেই রূপ মূর্ত্ত হইয়া ওঠে। উহার সমস্ত চিহ্নগুলিকে একত্রিত করিয়া বিচক্ষণ চিকিৎসক সেই মূর্ত্তিটি আপন মনশ্চক্ষে দেখিতে পান। যখন সেই মূর্ত্তি কোনো রোগ বিশেষের বিশিষ্ট মূর্ত্তির সহিত মিলিয়া যায় তখন তিনি উহার নামকরণ করিয়া দিতে পারেন। রীতিমত অনুশীলন ব্যতীত এই প্রকার দৃষ্টিশক্তি জন্মায় না। চিহ্নগুলির সম্বন্ধে যিনি যত ভাল করিয়া আলোচনা করেন, তিনি রোগটিকে তত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পান, যিনি চিহ্নজ্ঞাপক লক্ষণাদির সহিত যত অল্প পরিচিত তাঁহার নিকট উহা তত অস্পষ্টরূপে দেখা দেয়। যাহাতে ঐ চিহ্নসকল উত্তমরূপে পরিচিত থাকে সেজন্য নিত্য রোগী পরীক্ষার অভ্যাস করিয়া রাখিতে হয়, এবং রোগসমূহের রূপদর্শন-দক্ষতা রীতিমত চেষ্টার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। কেবল তাহাই নয়, নানাবিধ পুস্তকাদি পাঠের দ্বারা এই অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ ও নিত্য সজীব করিয়া রাখিতে হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে রোগ চেনার এই পদ্ধতি আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ইহা চলিবে। রোগটিকে দেখিতে পাওয়াই চিকিৎসকের প্রথম কার্য্য। প্রাচীন যুগের চরক কি বলিয়াছিলেন দেখুন :—

> জ্ঞানবুদ্ধিপ্রদীপেন যো নাবিশতি তত্ত্ববিৎ
> আতুরস্যান্তরাত্মানং ন স রোগাংশ্চিকিৎসতি।

অর্থাৎ,—তত্ত্ববিদ্ হইয়াও যিনি জ্ঞানবুদ্ধি-প্রদীপের দ্বারা রোগের অন্তরাত্মাকে (অর্থাৎ রোগের স্বরূপ) প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে না পান তিনি চিকিৎসা করিবার অধিকারী নহেন।

আর এখনকার অতি-আধুনিক ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষায় ধুরন্ধর জনৈক প্যাথোলজির অধ্যাপক কি বলিতেছেন দেখুন—"To find out what is the matter is the first step; the plan actually followed in practice is the upbuilding of a diagnosis by grouping the symptoms."—অর্থাৎ, "আগে দেখ কি হইয়াছে, লক্ষণগুলিকে একজোট কর এবং তদ্বারা রোগের একটা পরিচয় খাড়া কর।" তাহার পর ইনি বলিতেছেন,—"It may be easy or difficult; if the latter, the laboratory is certain to be called upon for assistance and upon its findings may be built up a diagnosis."—"সকল সময় পরিচয় সহজ না হইতে পারে; যদি কঠিন হয় তবে ল্যাবরেটরির সাহায্য লইতে হইবে।" সকল সময় কেবল স্থূলগোচর লক্ষণ দেখিয়া রোগের মূর্ত্তি স্পষ্ট হয় না। তখন আরো সূক্ষ্মতর চিহ্নের সন্ধান করিতে হইবে। দেখা গিয়াছে রোগের সূক্ষ্ম চিহ্নও নানারূপ আছে। স্থূল চিহ্নের সহিত সূক্ষ্ম চিহ্ন যোগ করিতে পারিলে মূর্ত্তি অধিকতর স্পষ্ট হইয়া ওঠে। এই সূক্ষ্ম চিহ্নগুলিকে দেখিতে যন্ত্রাদির আবশ্যক। সেইজন্য এখন ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষার প্রচলন হইয়াছে। এই সকল পরীক্ষা রোগের অস্পষ্ট রূপকে স্পষ্টতর করিবার জন্যই আবশ্যক। "A laboratory report is only an adjunct to diagnosis, and not the diagnosis itself."—অর্থাৎ ইহা রোগের পরিচয় পত্র নহে, পরিচয়ের সাহায্যকারী মাত্র। অতএব আগে রোগটিকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখ, পরে প্রয়োজন হইলে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ, এবং উভয় দৃষ্টি মিলিত করিয়া তাহার স্বরূপ চিনিয়া লও।

রোগ চিনিবার পদ্ধতি পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। কেবল বর্ত্তমানে রোগের সূক্ষ্মতর চিহ্নের কতকগুলি সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,

এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নানারূপ নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই দেখা যাইতেছে যে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লক্ষণ ব্যতীত রোগের নানারূপ সূক্ষ্মতর চিহ্ন আছে, এবং যন্ত্রের দ্বারা তাহার অধিকাংশই নির্ভুলরূপে ধরা যায়। মানুষের ইন্দ্রিয়-শক্তি যতই প্রখর হউক, নানা কারণে তাহার ভুল হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই থাকে। ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা প্রাচীন গ্রীক্ পণ্ডিত হিপোক্রেটিস্ বলিয়া গিয়াছেন,—"Experience is fallacious and judgment difficult"—অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ভ্রান্তিপূর্ণ এবং বিচার কার্য্য অতি কঠিন। বর্ত্তমান যুগের মানুষের চিকিৎসক সমাজে যিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, সেই অস্লারও (Osler) তাঁহার পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় এই কথাটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কি প্রাচীন যুগে, কি বর্ত্তমান যুগে,—চিকিৎসা ক্ষেত্রে সকলেই ঠকেন এবং সকলেই এ কথা স্বীকার করেন। সুতরাং মনকে সর্ব্বদাই সন্দেহপূর্ণ রাখিতে হয়, এবং কোনো চিহ্নকেই উপেক্ষা করা চলে না। এক দিকে যেমন দৃষ্টিশক্তিকে প্রখরতর করিয়া তুলিতে হইবে, অন্য দিকে তেমনি যন্ত্রাদির নির্দ্দেশও মানিতে হইবে। একটি চিহ্নের দ্বারা যে সত্য প্রতীয়মান হইবে, অন্য চিহ্নের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া লইতে হইবে। তবেই ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা কম হইবে।

অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না বলিয়া আজকাল অনেকে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার উপর অত্যধিক ঝোঁক দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও ঠিক নয়। তাহাতে আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে যে অনেকটা খর্ব্ব করা হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। আর ল্যাবরেটরি পরীক্ষা কখনো কখনো চিকিৎসককে ভুল পথেও লইয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া অনেক রোগে পরীক্ষার বিশিষ্ট চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হয়, কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসায় বিলম্ব করা চলে না। এই সকল নানাকারণে বিজ্ঞান যতই উন্নত হউক, বুদ্ধিবিচার দ্বারা রোগী-পরীক্ষা কখনই বর্জ্জিত হইতে পারে না। রোগ চিনিতে হইলে আগে দেখিতে হইবে স্বয়ং রোগীকে, তাহার পর ল্যাবরেটরি পরীক্ষা।

জ্বর কয় প্রকার?

একদিনের জ্বর দেখিয়া জ্বরের ভবিষ্যৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে পারা প্রায় সম্ভব হয় না। কিন্তু জ্বর প্রায়ই এক ভাবে থাকে না, অনতিবিলম্বে অল্পাধিক উঠানামা করিতে আরম্ভ করে। রোগ অনুসারে ইহার মধ্যেও কিছু তারতম্য ঘটিতে থাকে, এইজন্য দুই তিন দিনের জ্বর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেই তাহার চরিত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে ও তাহা হইতে রোগের কতক অনুমান পাওয়া যায়। দীর্ঘকালব্যাপী জ্বরে দুই এক সপ্তাহের পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন হইতে পারে। জ্বরের চরিত্র অনুধাবন করিবার জন্য জ্বরকে মোটামুটি চারিটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়, যথা :—

(১) কণ্টীনিউড্ বা বিরামহীন জ্বর (Continued fever)

অর্থাৎ যে জ্বর নিত্য একভাবেই লাগিয়া থাকে, বিশেষ উঠা নামা করে না। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে বলে সন্ততক জ্বর, যাহার 'বন্ধানুমুক্তিত্ব' নাই। এইরূপ জ্বরে টেম্পারেচার সর্ব্বক্ষণ প্রায় একই মাত্রাতে নিশ্চল হইয়া থাকে, যখন কমে তখন বড়জোর দেড় ডিগ্রী পর্য্যন্ত কমে, তাহার নীচে কখনই নামে না। যে জ্বর ১০৪° পর্য্যন্ত উঠিয়াছে তাহা যদি একবারও ১০২½°এর নীচে নামিতে না দেখা যায়, তবে তাহা কণ্টীনিউড্ ফিবার। **টাইফয়েড** জাতীয় রোগে এইরূপ প্রায়ই দেখা যায় দ্বিতীয় সপ্তাহে। কেবল তাহাই নয়, **নিউমোনিয়া, প্লেগ, মেনিঞ্জাইটিস্** প্রভৃতি রোগেও এইরূপ জ্বর দেখা যায়। এই সকল রোগে প্রায়ই জ্বর অনেকটা উচ্চে উঠিয়া রোগমুক্তি কাল পর্য্যন্ত একভাবে স্থির হইয়া থাকে। যে সকল রোগের ভোগকালের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, এবং মৃত্যু হইলে ঐ কালের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে নতুবা ঐ কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলেই রোগটি আপনি দূর হইয়া যায়,—এই জাতীয় রোগেই প্রায় জ্বরের চরিত্র ঐরূপ হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে রোগ-বীজের সহিত জীবনীশক্তির নিরবচ্ছিন্ন তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে এবং এই সংগ্রামের মীমাংসাও আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; কারণ এরূপ সংগ্রাম বহুদিন যাবৎ চলিতে পারে না। অতএব জীবনী-

শক্তিকে যতটুকু সাহায্য করিবার তাহা এই সময়েই করা উচিত। এই প্রকার জ্বর প্রায়ই ১০৩° বা ১০৪° পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা যায়,—১০৫°
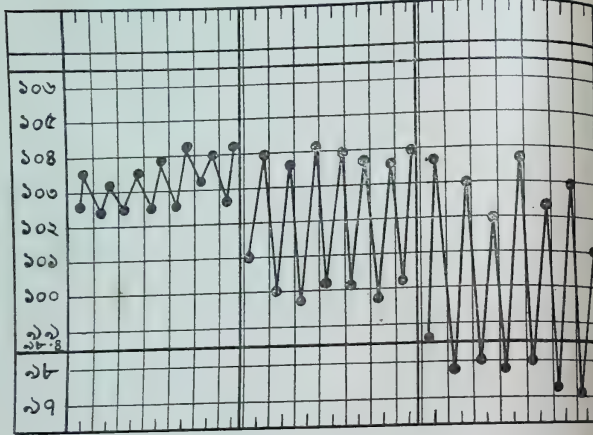
এখানে তিনপ্রকার জ্বরের চার্ট পাশাপাশি দেওয়া হইয়াছে। প্রথমটি কণ্টীনিউড জ্বরের, দ্বিতীয়টি রেমিটেণ্ট্ জ্বরের এবং তৃতীয়টি ইণ্টারমিটেণ্ট্ জ্বরের চার্ট। তিনপ্রকার জ্বরের কি পার্থক্য তাহা চার্ট দেখিয়া বুঝা যায়।

পর্য্যন্ত দৈবাৎ ওঠে, ও তাহার অধিক উঠিতে যদি কখনও দেখা যায়, উহা অতি দুর্লক্ষণ। সাধারণতঃ বিষাক্ত বীজাণু-ঘটিত রোগেই জ্বরের এইরূপ চরিত্র হইয়া থাকে। প্রোটোজোয়ার রোগে এমন জ্বর প্রায় হয় না।

(২) রেমিটেণ্ট্ জ্বর (Remittent fever)

ইহাতেও জ্বরটি একেবারে না ছাড়িয়া নিত্য লাগিয়া থাকে, কিন্তু কণ্টীনিউড্ জ্বরের মত একই উচ্চ সীমাতে সর্ব্বদা অবস্থান করে না, অনেকটা ব্যবধান

রাখিয়া ওঠানামা করিতে থাকে। ইহা সময়ে সময়ে ১½ ডিগ্রীরও অধিক নীচে যায় আবার উহার অধিক উঠিয়া যায়। যে জ্বর ১০৩° পর্য্যন্ত উঠিতেছে এবং ১০১°-এর নীচে নামিতেছে কিন্তু একবারও ছাড়ে নাই, উহাই রেমিটেণ্ট ফিবার। **টাইফয়েড** জাতীয় রোগে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহেও যদি এইরূপ জ্বর দেখা যায় তবে বুঝা যায় রোগটি অপেক্ষাকৃত মৃদু। **নিউমোনিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, মেনিঞ্জাইটিস্** প্রভৃতি বিষাক্ত বীজাণুঘটিত রোগও মৃদু হইলে জ্বরের এইরূপ আচরণ দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় জীবনী-শক্তি বোধ হয় বীজাণু অপেক্ষা অধিক বলবান, সেইজন্যই জ্বরের এরূপ ওঠানামা চলিতেছে। তবে কেবল সীমানির্দ্দিষ্ট রোগগুলিতেই যে এরূপ জ্বর হয় তাহা নয়, বহুকালবিলম্বিত পুরাতন রোগেও এইরূপ জ্বরের গতি দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, **কোলাই বীজাণুর জ্বর, কালাজ্বর, যক্ষ্মার জ্বর,** ইত্যাদি। সুতরাং নির্দ্দিষ্টকাল-ব্যাপী ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল-ব্যাপী দুইপ্রকার রোগেই এরূপ জ্বর হইতে পারে।

(৩) ইণ্টারমিটেণ্ট্ বা সবিরাম জ্বর (Intermittent fever)

ইহাতে জ্বর মাঝে মাঝে একেবারে ছাড়িয়া যায় এবং পুনরায় ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ উহা নিত্য লাগিয়া থাকে না,—মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। ইহা দুই প্রকারের হইতে পারে—**নিয়মিত ও অনিয়মিত।** যে জ্বর ঠিক নিয়মিত সময়ের অন্তর করিয়া বারে বারে আসিতে থাকে, এবং মধ্যবর্ত্তী কিছু সময়ের জন্য একেবারে ছাড়িয়া যায়, তাহাই নিয়মিত ইণ্টারমিটেণ্ট্ জ্বর। রিল্যাপ্সিং ফিবারকেও ইণ্টারমিটেণ্ট্ বলা চলে, তবে তাহার কিছু স্বতন্ত্র বিশেষত্ব আছে।

(ক) **নিয়মিত ইণ্টারমিটেণ্ট জ্বরে** বিচ্ছেদের ব্যবধান খুব দীর্ঘ নয়, উহা হ্রস্ব এবং নির্দ্দিষ্ট। এইরূপ নিয়মিতভাবে জ্বর হইতে থাকা ও পুনঃ পুনঃ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রকৃত কারণ আর কিছুই নয়, যে রোগবীজের দ্বারা ঐ রোগের উৎপত্তি তাহারই ধারাবাহিক জীবনচক্রের রীতি অনুসারে জ্বরটি নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। উহাদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হইবার এক একটি

নির্দ্দিষ্ট কাল থাকে, প্রতিবার পুরাতন জীবনচক্র সম্পূর্ণ হইয়া যখন নূতন জীবনচক্র আরম্ভ হয় তখনই একবার করিয়া জ্বর দেখা যায়। এইরূপ নিয়মিত জীবনচক্র **ম্যালেরিয়া** জীবাণু ছাড়া অন্য কোনো রোগবীজের প্রায় দেখা যায় না, সেইজন্য নিয়মিত ইন্টারমিটেন্ট্ জ্বর মাত্রকেই ম্যালেরিয়া বলিয়া
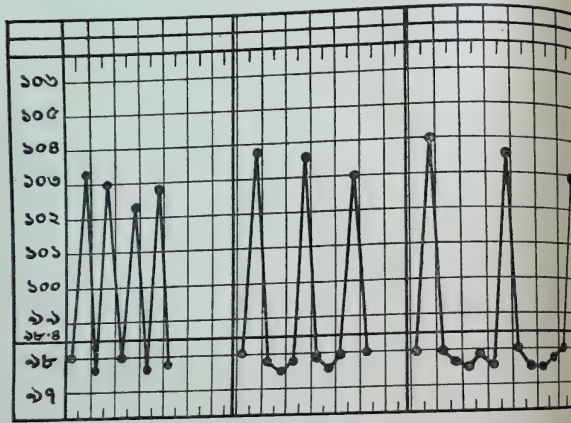
তিনপ্রকার নিয়মিত ইন্টারমিটেন্ট্ জ্বরের চার্ট। প্রথম চার্টটি প্রাত্যহিক জ্বরের, দ্বিতীয়টি একদিন অন্তর ও তৃতীয়টি দুইদিন অন্তর জ্বরের। বলা বাহুল্য কেবল চার্ট দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে তিনটি তিনপ্রকার ম্যালেরিয়ার জ্বর।

ধরিয়া লওয়া হয়। নিয়মিত জ্বরের বিভিন্ন রূপ আছে; যেমন, প্রত্যহ নিয়মিত দুইবার করিয়া জ্বর আসা (দ্বৌকালীন, ইং double quotidian),—প্রত্যহ নিয়মিত একবার করিয়া জ্বর আসা (অন্যেদ্যুষ্ক, ইং quotidian),—একদিন অন্তর পালাজ্বর (দ্বিতীয়ক, ইং tertian),—দুইদিন অন্তর পালা জ্বর (তৃতীয়ক, ইং quartan),—চারদিন অন্তর পালাজ্বর,—ইত্যাদি।

(খ) **অনিয়মিত ইন্টারমিটেন্ট জ্বরের** অনিয়মিত বিচ্ছেদ ঘটিতে

থাকে, এবং জ্বরের ভোগও অনিয়মিত হয়। ইহার কারণও স্বতন্ত্র, বীজাণুর জীবনচক্রের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। এস্থলে বীজাণু-সংগ্রামের জয়-পরাজয় অনুসারেই এইরূপ জ্বর-বিজ্বরের অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যে সকল রোগের বীজাণু রোগীকে একেবারে পরাস্ত করিতে পারে না, মধ্যে মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও পুনরায় বলসঞ্চয় করিয়া নূতন তেজে আক্রমণ করে, সেইরূপ ধরণের রোগেই এইপ্রকার জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বরের এইরূপ প্রকৃতি হওয়াতে এই সকল রোগ প্রায়ই বিলম্বিত হয় ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগীর সহিত সংগ্রাম করিতে থাকে। আমাদের দেশের **কালাজ্বর** এই প্রকার জ্বরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর এক উদাহরণ **যক্ষ্মারোগ। কোলাই জ্বরেও** এক এক সময় এইরূপ আচরণ দেখা যায়।

যে কয়টি রোগে প্রায় এইরূপ দীর্ঘকাল-ব্যাপী অনিয়মিত ইন্টারমিটেন্ট জ্বর হইতে দেখা যায়, তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

পুরাতন ম্যালেরিয়া

কালাজ্বর

কোলাই বীজাণুর জ্বর (৩।৪ মাস পর্য্যন্তও ইহা থাকিতে পারে)

পুরাতন ইনফ্লুয়েঞ্জা (একমাস পর্য্যন্তও থাকে)

শরীরে কোথাও পুঁজ জমিলে বা কক্কাইজাতীয় বীজাণুর সংক্রামণ হইলে (যেমন সোয়াস্ অ্যাবসেস্, মূত্রগ্রন্থির Pyonephrosis, পিত্তাশয় প্রদাহ, স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু সম্পর্কীয় প্রদাহ, এম্পায়িমা (Empyema), পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি)

ম্যালিগন্যাণ্ট এণ্ডোকার্ডাইটিস্ (Malignant endocarditis)

এমিবার জ্বর ও লিভারের প্রদাহ বা অ্যাবসেস্ (amaebiasis)

সিফিলিসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা (Secondary and visceral syphilis)

যক্ষ্মা ও উক্ত বীজাণু কর্তৃক অন্যান্য রোগ

এনীমিয়া—সাধারণ ও মারাত্মক (Secondary and pernicious)

লিউকীমিয়া, ব্যাণ্টিস্ ডিজীজ প্রভৃতি।

আর একপ্রকার অনিয়মিত ইন্টারমিটেন্ট জ্বর আছে, এখানে তাহার উল্লেখ আবশ্যক। ইহার নাম **মাণ্টা ফিবার** বা মেডিটারেনিয়ান্ ফিবার (Malta fever or Mediterranean fever)। ইহা আমাদের বাংলাদেশে নাই, কিন্তু বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট দেখা যায়। অসিদ্ধ ছাগলের দুধ খাইয়া এই জ্বর হয়,

micrococcus melitensis নামক ক্ষুদ্র বীজাণু ঐ দুগ্ধের মধ্যে সংক্রামিত থাকিয়া এই রোগের সৃষ্টি করে। এই জ্বরের কোনো নিয়ম নাই, বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার ভোগ। সবিরাম বা অবিরাম জ্বর প্রায় দশ পনেরো দিন পর্য্যন্ত ভোগ হইবার পর ইহা ছাড়িয়া যায়, রোগী তিন দিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত বিজ্বর অবস্থায় থাকে, আবার জ্বরের পালা আসে। কতদিন জ্বর বা বিজ্বর অবস্থা থাকিবে তাহার কোনো নিয়ম নাই, তবে একাদিক্রমে দশ দিনের অধিক বিজ্বর অবস্থা কখনই থাকে না। বিজ্বর অবস্থা কখনও একবার দশদিন অতিক্রম করিয়া গেলেই জানা যায় রোগটি আরোগ্য হইল। ইহাতে প্লীহাও বাড়িতে দেখা যায়। বাংলা দেশে এই রোগ থাকিলে ম্যালেরিয়ার সহিত ইহার ভুল হইত সন্দেহ নাই।

(৪) রিল্যাপ্সিং বা পৌনঃপুনিক জ্বর (Relapsing fever)—

যে জ্বর পর্য্যায়ক্রমে কয়েকদিন যাবৎ নিত্য লাগিয়া থাকে, তৎপরে কয়েক-দিন যাবৎ মোটেই থাকে না, আবার চক্রবৎ ভাবে কয়েক দিন জ্বর ও কয়েক দিন বিজ্বর রূপে উহার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়, তাহাকেই রিল্যাপ্সিং ফিবার বা পৌনঃপুনিক জ্বর বলা হয়। আসল রিল্যাপ্সিং ফিবার যাহাকে বলে সেরূপ জ্বর বাংলা দেশে কমই দেখা যায়। তথাপি ইহার কিছু মোটামুটি পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশে একদিন বা দুই দিন অন্তর যে পালাজ্বর হয়, যাহাকে আমরা টার্শিয়ান ও কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া বলি, তাহাকে রিল্যাপ্সিং ফিবারের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু পুরাতন পৌনঃপুনিক ম্যালেরিয়া বলিতে যাহা আমরা বুঝি, অর্থাৎ যাহাতে রোগী কিছুকাল ভাল থাকিয়া পুনঃ পুনঃ জ্বরে আক্রান্ত হইতে থাকে, তাহাকে রিল্যাপ্সিং ফিবারের পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না;—কারণ সে জ্বর অনিয়মিত ব্যবধানে হয়। রিল্যাপ্সিং ফিবার প্রায়ই অনিয়মিত হয় না—ইহার যাওয়া আসার একরূপ বিচিত্র নিয়ম আছে। এই নিয়মটুকু বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আমরা জানি কোয়ার্টান ম্যালেরিয়াতে দুইদিন অন্তর যে জ্বর আসে তাহা একদিন মাত্র থাকিয়াই হয়তো ছাড়িয়া যায়, আবার দুইদিন রোগী সুস্থ অবস্থায় থাকে। ইহাকেই আমরা বলি দুইদিন অন্তরের পালা জ্বর। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে এ নিয়ম সর্ব্বদা ঠিক বজায়

থাকে না। জ্বরটি একদিন মাত্র না থাকিয়া কখনো দুইদিন পর্য্যন্তও ভোগ হইতে পারে, এবং তখন একদিনের ব্যবধানেই হয় তো আবার জ্বর আসে। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জ্বর-আসার সময়ের এবং ব্যবধান-সময়ের কতকটা স্থিরতা থাকিলেও প্রতিবারে জ্বর ভোগ কতক্ষণ পর্য্যন্ত হইবে তাহার কোনো স্থিরতা থাকে না, সুতরাং জ্বরভোগের বা জ্বরত্যাগের সময় হিসাব করিয়া রোগ নির্ণয় করা যাইতে পারে না! রোগনির্ণয়ের সূত্র এই যে প্রথম বারের জ্বর আসার সময় হইতে দ্বিতীয় বারের জ্বর আসার সময় পর্য্যন্ত কত ব্যবধান, এবং ব্যবধানটুকু প্রতিবারে বজায় থাকিতেছে কি না,—ইহা দেখিয়াই বিচার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কতক্ষণ জ্বরভোগ হইয়াছে ও কতক্ষণ বিজ্বর অবস্থা ছিল তাহা গণনার মধ্যে আসিবে না। প্রতিবারের জ্বর ও বিজ্বর দুই অবস্থাকে একত্র করিয়া লইয়া যতটা সময়, উহাকে এক একটি **রোগ-পর্ব্ব বা পালা** (disease period) বলা হয়। রিল্যাপ্সিং ফিবার মাত্রেরই আপন আপন রোগপর্ব্বকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। তাহার কারণ এই যে রিল্যাপ্সিং-ফিবার উৎপাদনকারী বীজাণুর নিজ নিজ জীবন চক্রের আবর্ত্তনকাল নির্দ্দিষ্ট থাকে; এক একবার উহাদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হইয়া পুনরায় জীবনচক্র আরম্ভ-হইবার সময় হইলেই রোগীর নূতন করিয়া জ্বর আসে। সে জ্বর কতক্ষণ থাকিবে ও কখন বিজ্বর অবস্থা আসিবে তাহা নির্ভর করে রোগীর বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের উপর। সুতরাং রোগ চিনিবার সময় সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া রোগ-পর্ব্ব কতকাল,—অর্থাৎ একবার জ্বর আসার সময় হইতে আর একবার জ্বর আসার সময় পর্য্যন্ত কতটা ব্যবধান তাহাই দেখিতে হইবে। এই হিসাবে দেখা যায় টার্শিয়ান জ্বরের রোগ-পর্ব্ব দুইদিন, কোয়ার্টান জ্বরের রোগ-পর্ব্ব তিন দিন। আয়ুর্ব্বেদ মতেও বোধ হয় এইরূপ হিসাব করা হইত, সেইজন্যই টার্শিয়ান জ্বরের নাম ছিল তৃতীয়ক জ্বর, কোয়ার্টানের নাম ছিল চতুর্থক জ্বর।

আসল রিল্যাপ্সিং ফিবারগুলির নাম ও উহার নির্দ্দিষ্ট রোগ-পর্ব্বকাল এখানে উল্লেখ করা হইল :—

রোগের নাম	রোগপর্ব্বকাল
(১) ইঁদুর কামড়ানোর জ্বর (rat-bite fever)	...৫ হইতে ৭ দিন।
(২) ট্রেঞ্চ্ ফিবার (trench fever) ...	...৫ হইতে ৬ দিন।
(৩) ডেঙ্গু (dengue) ...	...৩ হইতে ৪ দিন।
(৪) ইয়েলো ফিবার (yellow fever) ...	...৩ হইতে ৪ দিন।
(৫) আঁঠুলি দ্বারা রিলাপ্সিং ফিবার (tick relapsing fever) ...	...১০ হইতে ১৩ দিন।
(৬) উকুন দ্বারা রিল্যাপ্সিং ফিবার (louse relapsing fever) ...	...১০ হইতে ১৬ দিন।
(৭) জাপানী ইন্‌ফেক্‌টিভ্ জণ্ডিস্ (infective jaundice)	...প্রায় ১৫ দিন।

ইহার মধ্যে কেবল ইঁদুর কামড়ানোর জ্বর ও ডেঙ্গু ছাড়া আর কোনোটিই আমরা এদেশে দেখিতে পাই না। ইঁদুর কামড়ানোর জ্বরে আমরা প্রায়ই এরূপ দেখিতে পাই যে রোগী পর্য্যায়ক্রমে ২।৩ দিন করিয়া জ্বরে ভোগে ও ৩।৪ দিন করিয়া ভাল থাকে। ইহাই আসল রিল্যাপ্সিং ফিবার। ডেঙ্গুকে অনেকে রিল্যাপ্সিং ফিবার বলেন এই হিসাবে যে কখনো কখনো উহা দুই তিন দিন ভোগের পর ছাড়িয়া গিয়া মাঝে দুই একদিন ভাল থাকিয়া আবার একবার দেখা দেয়,—কিন্তু সকল ডেঙ্গুতেই ইহা দেখা যায় না। আসল "রিল্যাপ্সিং ফিবার" বলিতে যাহা বুঝায়,—অর্থাৎ যাহা আঁঠুলির দ্বারা ও উকুনের দ্বারা সংক্রামিত হয়, তাহা পৃথিবীর অনেক স্থানেই হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের পাঞ্জাব ও বোম্বাই অঞ্চলে ইহা যথেষ্ট দেখা যায়, মান্দ্রাজেও কিছু কিছু আছে, কিন্তু বঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যায় এ রোগ একেবারেই নাই। অন্যান্য রিল্যাপ্সিং ফিবারগুলি ভারতবর্ষে হয় না।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে রিল্যাপ্সিং ফিবার মাত্রেই কোনো না কোনো স্পাইরোকীট জাতীয় বীজাণু (spirochaetes) কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। সুতরাং এইরূপ ধারাবাহিকভাবে পুনঃ পুনঃ জ্বর আসা দেখিলেই কোনো স্পাইরোকীটের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

নূতন জ্বর ও পুরাতন জ্বর

নূতন জ্বরের সীমা উর্দ্ধসংখ্যা দশদিন পর্য্যন্ত। যে জ্বর দশদিনের মধ্যেই ছাড়িয়া যায় তাহাকে আমরা তরুণ বা নূতন জ্বর (short fever)

বলিয়া থাকি। এই প্রকার জ্বর আমাদের দেশে অনেক দেখা যায়। ইহার মধ্যে কয়েকটিকে ভাল করিয়া চেনাও যায় না, কিন্তু তথাপি উহা আপনিই শীঘ্র সারিয়া যায় এবং মারাত্মক হয় না বলিয়া আমরা সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো অনুসন্ধান করি না। ইহার মধ্যে কোনোটি বা ডেঙ্গু, কোনোটি বা "সাত দিনের জ্বর" (seven days' fever), কোনোটি বা "পাঁচ দিনের জ্বর" (five days' fever), কোনোটি "তিন দিনের জ্বর" (three days' fever) বা স্যাণ্ড্‌ফ্লাই ফিবার (sandfly fever), এইরূপ নানারকমের বৈচিত্র্য আছে। আরো কয়েকটি অল্প দিনের জ্বর আছে যাহা একটি কোনো বিশিষ্ট এবং স্থানীয় রোগরূপ লইয়া উপস্থিত হয়, এবং তাহার মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে রোগও দূর হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও ছাড়িয়া যায়; যেমন হাম-জ্বর, মাম্প্‌স্ বা কর্ণমূল ফুলার জ্বর, সর্দ্দিজ্বর, নবীন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি। এই সকল জ্বর চেনা কঠিন নয়, যেহেতু উহার স্থানীয় কারণটি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায় জ্বরের উৎপত্তি উহা হইতেই। কিন্তু যেখানে ঐরূপ কিছু স্পষ্ট কারণ দেখিতে না পাওয়া যায় সেইখানেই বলা যায় না উহার গতিবিধি কিরূপ হইবে।

রজার্স তাঁহার পুস্তকে ("Fevers in the Tropics") জ্বরকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। অল্পকালব্যাপী জ্বরগুলিকে বলিয়াছেন শর্ট ফিবার (short fevers) এবং দীর্ঘকালব্যাপী জ্বরগুলিকে বলিয়াছেন লং ফিবার (long fevers)। যে জ্বর প্রায় সাত দিন হইতে দশ দিনের মধ্যে ছাড়িয়া যায় সেইগুলিই শর্ট ফিবার, এবং যেগুলি দশদিনের অধিককাল থাকে সেগুলি লং ফিবার। এইরূপ ভাবে ভাগ করিয়া লওয়াতে এই সুবিধা হয় যে সাতদিন বা দশদিন অতিক্রম হইবার পরেও যে জ্বর ছাড়ে না, তাহা যে অল্পকালস্থায়ী জ্বরতালিকার অন্তর্গত কোনো রোগ নয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ করিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী কোনো একটি রোগ হইবে ইহা অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। বস্তুতঃ চিকিৎসক মাত্রেই কার্য্যক্ষেত্রে এইরূপ ভাগ করিয়া বিচার করিয়া থাকেন। এইরূপে জ্বরবিভাগের এক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অল্পস্থায়ী জ্বর (শর্ট ফিবার)

* তরুণ ম্যালেরিয়া
* তরুণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। ডেঙ্গু। হাম
বসন্ত। মাম্প্‌স্
সর্দ্দিকাসি
* ব্রঙ্কাইটিস্। নিউমোনিয়া
* কোলাইজ্বর
ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি
প্লেগ
মেনিঞ্জাইটিস্
* সেপ্‌টিক্ জ্বর
* ফাইলেরিয়ার তরুণ জ্বর
সাতদিনের জ্বর। তিনদিনের জ্বর
সর্দ্দিগর্ম্মির জ্বর (sunstroke)
ক্রিমি জ্বর

দীর্ঘস্থায়ী জ্বর (লং ফিবার)

টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড
* পুরাতন ম্যালেরিয়া
* পুরাতন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা
* পুরাতন কোলাইজ্বর
* পুরাতন সেপ্‌টিক জ্বর
সেপ্‌টিক এণ্ডোকার্ডাইটিস্
কালাজ্বর
এমিবার জ্বর
* ফাইলেরিয়ার জ্বর
রিল্যাপ্সিং জ্বর সমূহ
এনীমিয়ার জ্বর
* পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্
যক্ষ্মা
ক্যান্‌সার

এই তালিকা অবশ্য সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে কতকগুলি রোগ অল্পদিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং অল্পদিনেই তাহার সমাপ্তি ঘটে, আর কতকগুলি রোগ নূতন অবস্থা অতিক্রম করিয়া পুরাতন হইয়াও দাঁড়াইতে পারে। অতএব কোন রোগগুলি এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে এবং কোন রোগগুলি তাহা পারে না, সে সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ যে রোগ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহার চিকিৎসা উপস্থিত মতই করিতে হয়, যাহাতে কোনোরূপে অক্ষত ভাবে রোগীকে ঐ সীমা পার করিয়া দিতে পারা যায়। আর যে গুলি তরুণ অবস্থা হইতে ক্রনিক ব[illegible] পুরাতন হইয়া উঠিতে দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই হয়তো অবত্নে বা অচিকিৎসায় ঐরূপ হইয়া থাকে, অতএব প্রথম হইতেই সে সব রোগে

(যে রোগগুলি নূতন অবস্থা হইতে সময়ান্তরে পুরাতন অবস্থায় যাইতে পারে তাহাতে * চিহ্ন দেওয়া হইল)

সাবধান হইতে হয় যেন সেরূপ কোনো সুযোগ না হইতে পারে; এবং ঐ সকল রোগের নূতন অবস্থায় একরূপ চিকিৎসা, পুরাতন অবস্থায় অন্যরূপ চিকিৎসা, এ কথাও মনে করিয়া রাখিতে হয়।

এখানে আরো একটি লক্ষ্যের বিষয় আছে। অনেকে বলেন যে দীর্ঘস্থায়ী জ্বরের মধ্যে কেবল টাইফয়েড্-জাতীয় জ্বর ছাড়া অন্যান্য জ্বরে অবিরাম ভোগ হইতে প্রায় দেখা যায় না,—অর্থাৎ অধিককালব্যাপী জ্বরমাত্রই প্রায় ইণ্টারমিটেণ্ট্ হইয়া থাকে, কেবল টাইফয়েড্‌জ্বরগুলিই রেমিটেণ্ট্ প্রকৃতির হয়। এইজন্যই বোধ হয় টাইফয়েড্-জাতীয় জ্বরগুলিকে সেকালে রেমিটেণ্ট্ ফিবার বলা হইত। তবে নিতান্ত সাধারণ ভাবেই এ কথা বলা চলে, জোর করিয়া বলিবার মত কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে বলিয়া দেখা যায় না। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের নূতন অবস্থায় প্রায়ই অবিরাম জ্বর হয়, কিন্তু পুরাতন হইয়া গেলে তাহা প্রায়ই ছাড়িয়া ছাড়িয়া যায়। সেপ্‌টিক ব্যাধি (সেপ্‌টিক এণ্ডোকার্ডাইটিস্ প্রভৃতি) মারাত্মক হইলে তাহার জ্বর কখনই ত্যাগ হয় না। এমন কি মারাত্মক যক্ষ্মাতেও জ্বরত্যাগ হয় না। অতএব জ্বরত্যাগ হইতেছে কি হইল না, ইহা দেখিয়া রোগের অবস্থামাত্র বোঝা যায়, কিন্তু স্বরূপ চেনা যায় না। জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হইতেছে এমন টাইফয়েডও দেখা গিয়াছে।

শৈশবের জ্বর

শিশুদের জ্বর সম্বন্ধে কিছু স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রাপ্ত বয়স্কদের যে সকল রোগ হয় অল্পবয়স্কদেরও তাহার অধিকাংশই হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্ব্যতীত উহাদের জ্বর হইবার আরো কতকগুলি স্বতন্ত্র কারণ আছে। কতকগুলি রোগ বিশেষ করিয়া কেবল শিশুদের মধ্যেই জন্মিয়া থাকে। সুতরাং সচরাচর উহাদের কি কি কারণে জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা তাহা পৃথকভাবে স্মরণ করিয়া রাখা উচিত।

সামান্য দোষেই শিশুদের জ্বর হইয়া পড়ে। তাহার কারণ উহাদের মস্তিষ্কের তাপনির্দ্ধারক কেন্দ্র ও তাহার অনুবর্ত্তী স্নায়ুসকল উপযুক্তরূপে কার্য্যকুশল হইতে কিছু বিলম্ব ঘটে এবং ততদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল যন্ত্র

অব্যবস্থিতরূপে ক্রিয়া করিতে থাকে। শরীরের মধ্যে সামান্য কোনো ব্যতিক্রম ঘটিলেই উহা উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ উত্তাপ বাড়িয়া যায়। এই জন্য **কোষ্ঠবদ্ধতা** হইলেও উহাদের জর হয়, **সামান্য সর্দ্দি** লাগিলেও জর হয়, শরীরের কোথাও **আঘাত** পাইলেও জর হয়, এবং **মানসিক উত্তেজনা** বা উদ্বেগ উপস্থিত হইলেও জর হয়। এই সকল তুচ্ছ কারণে জর হওয়া শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, সেই জন্য একদিন উহাদের সামান্য জর দেখিলে চিন্তিত হইবার কারণ নাই। শিশু-হাঁসপাতাল সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে পিতামাতা একবার হাঁসপাতালে আসিয়া দেখা দিয়া চলিয়া যাইবার পর অনেক শিশুর টেম্পারেচার অকস্মাৎ বাড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। উপযুক্ত পরিমাণ **পথ্যের অভাবে,** এমন কি পানীয় **জলের অভাবেও** শিশুদের জর হইতে দেখা যায়,—ইহাকে **তৃষ্ণার জর** (thirst fever) বলা হয়; শিশুকে জল পান করাইতে থাকিলেই এই তৃষ্ণার জর দূর হইয়া যায়।

শিশুদের স্বাভাবিক টেম্পারেচারই প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা কিছু বেশী। কিন্তু তথাপি উহা ৯৯ ডিগ্রীর নীচে। ৯৯ ডিগ্রী উত্তাপ হইলেই তাহাকে জর বলিতে হইবে।

যে কোনো রোগেই শিশুদের টেম্পারেচার বয়স্কদের অপেক্ষা অনেক বেশী বাড়িয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত কারণ ছাড়া তাহার আর এক কারণ এই যে উহাদের প্রতিক্রিয়াশক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবলভাবে ক্রিয়া করে। উহাদের রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যা স্বভাবতঃই অধিক এবং উহারা বিজাতীয় শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে পূর্ব্ব হইতে অভ্যস্ত নয়, অতএব শত্রুর প্রথম সাক্ষাৎ পাইয়া উহারা প্রয়োজনের অধিক মাত্রায় তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হয়। সেই জন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, নানা প্রকার সংক্রামক রোগে বয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদের রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া যায়।

জর হইলেই শিশুরা যেন একেবারে মুশড়িয়া পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের লাবণ্য চলিয়া যায়, শরীর শুখাইয়া যায়, এবং বয়স্ক

লোকে অধিক দিন জর ভোগ করিলে যে অবস্থা হয়, শিশুদের অল্প দিনের মধ্যেই সেইরূপ অবস্থা ঘটে। তাহার কারণ রোগের সহিত সংগ্রাম করিতে উহাদের শরীরের সার পদার্থ অত্যধিক মাত্রায় ব্যয়িত হইয়া যায়। একে তো শিশুরা যাহা খায় তাহা উহাদের গঠনকার্য্যেই লাগিয়া যায়, সুতরাং সঞ্চয়স্থানে অল্পই অবশিষ্ট থাকে। তাহার উপর জর হইলে তাহা শীঘ্রই সমস্ত দাহ হইয়া যায়, সুতরাং দাহের ইন্ধন যোগাইবার জন্য শরীরের মেদের (fat) উপর টান পড়িতে থাকে এবং উহার দাহ হইতে বিষাক্ত পদার্থ সকল (ketone bodies) উৎপন্ন হইতে থাকে। রক্তস্থ লবণাদি (mineral salts) উহার সহিত অপব্যয়িত হয় এবং তাহার অভাবে স্নায়ুসকল বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্য কিছু অধিক জর হইলেই ছেলেদের প্রায় তড়্কা, হাত পায়ের খিঁচুনি (twitchings), চম্‌কাইয়া ওঠা, ভুল বকা প্রভৃতি লক্ষণসকল দেখা যায়। শর্করা জাতীয় খাদ্যের দ্বারা এই দাহের উপযুক্ত ইন্ধন যোগানো যায়, সুতরাং প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করিলে শরীরপদার্থকে দাহ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। শিশুদের জরের চিকিৎসার সময় এ কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শিশুরা যেমন ঘন ঘন জরে আক্রান্ত হয়, বয়স্কেরা সেরূপ হয় না। তাহার কারণ বয়স্কেরা যেরূপ নানা প্রকার রোগবীজকে সহ্য করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে, শিশুদের তাহা অর্জ্জিত হয় নাই। সমস্ত রোগই তাহাদের পক্ষে নূতন। বাল্যকাল হইতে নানাবিধ রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঐ শক্তি (acquired immunity) অর্জ্জিত হয় এবং তখন আর বিশেষ কারণ ব্যতীত ঐ সকল রোগের বীজ সহজে রোগ জন্মাইতে পারে না। বাল্যকালের কয়েক প্রকার ব্যাধি যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আর হয় না, তাহার কারণই এই যে ঐ সকল রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি বাল্যকালে একবার অর্জ্জিত হইয়া আজীবন বর্ত্তমান থাকিয়া যায়।

শিশুদিগের জরের বিশিষ্ট কারণ ও রোগসমূহের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে। শৈশবের জরগুলিকেও মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করিয়া

লইতে পারা যায়ঃ—(১) **অল্পদিনের জ্বর** (২) **অধিক দিনের জ্বর** (৩) **পুনঃ পুনঃ জ্বর**।

(১) অল্পদিনের জ্বর—

অর্থাৎ যে জ্বর ২।১ দিন হইতে ৬।৭ দিনের মধ্যে ছাড়িয়া যায়,—তাহার কারণ :—

(ক) **সামান্য জ্বর**=কোষ্ঠবদ্ধতা, হজমের দোষ (শিশুদের মধ্যে এইজন্য জ্বর হওয়া অতি সাধারণ, ইহার ইংরেজী নাম (alimentary fever), *দাঁত ওঠা, গলায় টন্‌সিল্ বৃদ্ধি ও ফেরিঞ্জাইটিস্ (pharyngitis), কর্ণপ্রদাহ (otitis media), সর্দ্দি কাসি।

(খ) **অধিক জ্বর**=ম্যালেরিয়া, *হাম, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস্, মাম্প্‌স্, ডিফ্‌থীরিয়া, পানি বসন্ত, ব্যাসিলারি ডিসেন্‌টেরি, মূত্র প্রদাহ (nephritis), ক্রিমি রোগ, মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত (concussion)।

(২) অধিকদিনের জ্বর—

অর্থাৎ যে জ্বর অপেক্ষাকৃত অধিক দিন থাকে,—তাহার কারণ :—

(ক) **অপেক্ষাকৃত অল্পকাল ব্যাপী**=ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্ ও প্যারা-টাইফয়েড্, কোলাই বীজাণুর জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস্, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, *হুপিংকাশি, নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস্, *পোলিওমায়েলাইটিস্, রিউম্যাটিক্ ফিবার।

(খ) **অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ব্যাপী**=কোলাই বীজাণুর জ্বর, কালাজ্বর, *ইন্‌ফ্যান্টাইল লিভার, যক্ষ্মা ও স্ক্রোফুলা।

(৩) পুনঃ পুনঃ জ্বর—

অর্থাৎ যে সকল জ্বর অনিয়মিত ভাবে একবার করিয়া আরোগ্য হয় এবং কয়েকদিন পরে আবার আসিয়া উপস্থিত হয়,—তাহার কারণ :—

ম্যালেরিয়া, *রিকেট্‌স্, পুরাতন কোলাই বীজাণুর জ্বর, পুরাতন টন্‌সিল প্রদাহ ও গণ্ডসমূহের বৃদ্ধি (ষ্ট্রেপ্‌টো ও ষ্ট্যাফিলোকক্কাই জনিত), পুরাতন ব্যাসিলারি আমাশা ও অন্ত্রপ্রদাহ, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ (হাঁপানির লক্ষণসহ), ক্রিমিদোষ।

(যে সকল রোগ কেবল শৈশবেই হয় সেগুলির নাম * চিহ্নিত করা হইয়াছে)

সাধারণতঃ শিশুদের এই সকল জ্বরই হইয়া থাকে। আরো একপ্রকার জ্বর (obscure fever) উহাদের কখনো কখনো দেখা যায় যাহার জ্বর ছাড়া অন্য কোনো লক্ষণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং কেহই উহার কারণ বুঝিতে পারে না। সম্ভবতঃ তাপনির্দ্ধারক কেন্দ্রের দোষেই ইহা হইয়া থাকে। রোগী ইহাতে বিশেষ দুর্ব্বল হয় না, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। এই জ্বর চিকিৎসকের পক্ষে বড় সমস্যার বিষয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিকিৎসায় বিফল হইয়া সমস্ত রোগগুলিকে তিনি একে একে বাদ দিতে না পারেন, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। সর্ব্বশেষে যক্ষ্মা রোগের সন্দেহটি কিছুতে মন হইতে দূর হইতে চায় না। এই জ্বরে টেম্পারেচার অধিক হয় না, প্রায় ১০০ ডিগ্রীর নীচেই থাকে।

মূল ব্যাধি ও আনুষঙ্গিক ব্যাধি

রোগ চেনার মধ্যে সকলের চেয়ে কঠিন কাজ, নানারূপ জটিল লক্ষণের মধ্য হইতে আসল রোগটিকে বাছিয়া লওয়া—অর্থাৎ কোনটি মূল ব্যাধি এবং কোনটি তাহার আনুষঙ্গিক উপসর্গ ইহার সম্যক্ বিচার করা। পুস্তক পাঠে সমস্ত রোগই শিখিতে পারা যায়, কিন্তু এই বিচারটি কেবল শিখিতে হয় অভিজ্ঞতার দ্বারা। রোগ প্রায়ই পুস্তকবর্ণিত মূর্ত্তিতে দেখা দেয় না, অনেকগুলি জটিল লক্ষণ লইয়া অন্যরোগের সহিত জড়িত ভাবে উপস্থিত হয়। নবীন চিকিৎসক সম্পূর্ণ কৃতবিদ্য হইয়াও তখন স্থির করিতে পারেন না, চিকিৎসার জন্য কোনটিকে প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং কোনটিকে উপসর্গরূপে বিবেচনা করিবেন। প্রত্যেক রোগের মূল কারণ কোথায়, সমস্ত অবান্তর লক্ষণগুলি হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিয়া তাহারই অনুসন্ধানে তৎপর হইলে এই দ্বিধার মীমাংসা হইবে। মূল রোগের লক্ষণ ও উপসর্গের লক্ষণ দুইই একত্রে মিলিয়া থাকে। মূল রোগকে ইংরেজীতে বলা হয় প্রাইমারি (primary) এবং আনুষঙ্গিকগুলিকে বলা হয় সেকেণ্ডারি (secondary)। যদিও প্রাইমারি হইতেই সেকেণ্ডারির উৎপত্তি, তথাপি অনেকসময় সেকেণ্ডারি অবস্থাগুলি

অতিপ্রকট হইয়া প্রাইমারি রোগটিকে ঢাকিয়া ফেলে। তখনই রোগ চেনা কঠিন হইয়া পড়ে এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও ভুল হইয়া যায়। এই সময় কখনো কখনো ল্যাবোরেটরি পরীক্ষার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে, কারণ এই পরীক্ষা কোনোরূপ লক্ষণ-সাপেক্ষ নয়, কোথায় কি অন্তর্নিহিত কারণ রহিয়াছে, কেবল তাহাই স্পষ্টরূপে ইহা দেখাইয়া দেয়। কেবল রোগটি দেখিয়া তাহার কারণ চেনা সময়বিশেষে অত্যন্ত কঠিন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়তো অনেক সময় ইহা ধরিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু প্রায়ই কিছু বিলম্বে। চিকিৎসা করিতে করিতে ঔষধের ক্রিয়া দেখিয়া ইহা ক্রমশঃ তাঁহাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া পড়ে। ল্যাবোরেটরি পরীক্ষায় ইহা কতক নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভব।

প্রায় একই প্রকারের অভিব্যক্তি বিভিন্নরূপ ব্যাধিতে দেখা যাইতে পারে। শরীরের একই স্থানে প্রদাহ হইলে একইরূপ লক্ষণ দেখা যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ প্রদাহই যে মূল রোগ ইহা বলা যায় না। এমনও হইতে পারে যে আসল রোগটি আছে রক্তের মধ্যে, কিন্তু স্থানীয় দুর্ব্বলতা থাকায় শরীরের কোনো বিশিষ্ট অংশে স্থানীয় প্রদাহ উপসর্গরূপে (local manifestation of a general disease) উপস্থিত হইয়াছে। একটি উদাহরণ দিলে এ-কথা স্পষ্টরূপে বোঝা যাইবে। ব্রঙ্কাইটিস্ একটি বিশিষ্ট ব্যাধি, ইহার অর্থ শ্বাসনালীর প্রদাহ। শ্বাসনালীগুলির নিজস্ব প্রদাহহেতু সর্দ্দি জমিয়া একটি স্বতন্ত্র ব্যাধিরূপে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে; আবার কয়েকটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী-রোগে অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী উপসর্গের মত ইহা আসিয়া পড়িতে পারে। যেমন দেখা যায় টাইফয়েড্ রোগে। টাইফয়েড্ রোগটি অনেকদিন যাবৎ চলিবে, কিন্তু তাহার সহিত যদি ব্রঙ্কাইটিস্ লাগিয়া থাকে এবং সেই অবস্থায় চিকিৎসক তাহা দেখেন, তখন যে পর্য্যন্ত ঐ ব্রঙ্কাইটিস্টি দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত হয়তো সন্দেহ থাকিয়া যায় ইহা আসলে ব্রঙ্কাইটিস্ না টাইফয়েড্। এমনি কালাজ্বরেও ব্রঙ্কাইটিস্ থাকে, কখনো কখনো উহাতে প্রথম হইতেই ব্রঙ্কাইটিস্ দেখা দেয়, সে সময় যদি ধরা পড়ে উহা কালাজ্বর, তবে উপযুক্ত চিকিৎসায় জ্বরও সারে, ব্রঙ্কাইটিস্ও সারে,

নতুবা অনেক বিলম্ব হইয়া যায়। ম্যালেরিয়াতেও একরূপ ব্রঙ্কাইটিসের ভাব দেখা যায়, উহাতে কেবল ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসা করিলে কিছুই আরোগ্য হয় না, কিন্তু যেমনি ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা হয়, তেমনি ব্রঙ্কাইটিসও অদৃশ্য হইয়া যায়। এইরূপে আরও অনেক রোগে ব্রঙ্কাইটিস্ উপসর্গরূপে উপস্থিত হইতে পারে।

অতএব কেবল লক্ষণ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, লক্ষণগুলির পশ্চাতে কি কারণ রহিয়াছে, তাহার পর্যান্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা জ্বর দেখিলাম ও তৎসঙ্গে দেখিলাম ব্রঙ্কাইটিস্ রহিয়াছে, তখনি মনে করিলাম জ্বরের কারণ বোঝা গিয়াছে, শরীরের আর কোনো স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম না, ইহাতে অনেক সময় ঠকিতে হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে যাহা দেখা যায় তাহাই যে যথেষ্ট নয়, আরো যে কিছু সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, এবং কোথায় কি সন্দেহ করিতে হইবে, কোথায় ঠিক সন্ধানটি পাওয়া যাইবে, ইহাও জানা প্রয়োজন, এ কথা অভিজ্ঞ চিকিৎসকমাত্রই স্বীকার করিবেন। প্রথম হইতে চিকিৎসকের এই ক্ষমতা অর্জ্জন করিতেই সচেষ্ট হওয়া উচিত। চেষ্টা থাকিলেই ইহা ক্রমে অর্জ্জন করা যায়।

স্থান-কাল-পাত্রের বিচার

রোগী দেখিবার সময় সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে **কোন দেশের রোগী** দেখিতেছি। এ কথা বলা নিতান্ত অপ্রয়োজন মনে হইতে পারে, কিন্তু অনেক সময় এই সামান্য বিষয়েও ভুল হইতে দেখা যায়। বাংলাদেশে বসিয়া রোগী দেখিতেছি,—যদি বলি রোগটি স্কার্লেট্ ফিবারের মত মনে হইতেছে, অথবা যদি বলি একটি ইন্‌ফেক্‌টিভ জণ্ডিস্ (Infective jaundice) রোগী দেখিলাম, বা পুনঃ পুনঃ জ্বর হইতেছে দেখিয়া যদি বলি, বোধ হয় উহা রিল্যাপ্সিং ফিবার,—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমার অধিগত বিদ্যা যথেষ্ট থাকিলেও সহজ বিবেচনা শক্তির অভাব ঘটিয়াছে। কারণ যে রোগ বাংলাদেশে কখনই হয় না এইরূপ জানা আছে, তাহার লক্ষণ দেখা গেলেও সহজে সে রোগের নাম উচ্চারণ করা উচিত নয়।

যদি সন্দেহ নিতান্তই হয়, তবু কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতামত না লইয়া কিছু বলা উচিত হয় না।

দেশে **উপস্থিত কি ব্যাধির প্রাদুর্ভাব** আছে সে সন্ধানও চিকিৎসকের রাখা প্রয়োজন। তাহাতে কাজের অনেক সুবিধা হয়। কারণ দেশে যে সময় যে ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে, উহার তখন নানাপ্রকারের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহার তখন এমন সকল অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার আদর্শ রূপের সহিত হয়তো অনেক বিষয়ে মিল নাই। অন্য সময়ে ঐ রোগের ওরূপ লক্ষণ-বৈচিত্র্যও থাকে না, এবং থাকিলেও তাহা চেনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু কোনো সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় ঐ রোগটির কথা স্মরণ থাকিলে লক্ষণ-বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও উহা ধরা পড়িয়া যায়। এই জন্য চিকিৎসকের পক্ষে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা নিত্য জানিয়া রাখা প্রয়োজন। মনে করুন দেশে ম্যালেরিয়া হইতেছে; এই সময় হঠাৎ একটি লোকের রক্তদাস্ত হইতে লাগিল। তখন ম্যালেরিয়ার কথাই আগে মনে করা উচিত ও সেই মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু অন্য সময়ে কাহারো রক্তদাস্ত দেখিলে ম্যালেরিয়ার কথা আগে মনে করিবার কোনো কারণ নাই, তখন অন্যান্য রোগের কথাও ভাবিতে হইবে। আবার সাময়িক ব্যাধি মনে করিয়া সর্ব্বদা গড্ডালিকার মত চোখ বুজিয়া চিকিৎসা করিয়া গেলেও চলিবে না। প্রত্যেক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং সন্দেহটি ঠিক করা হইয়াছে কিনা তাহাও প্রত্যেকবার বিচার করিয়া লইতে হইবে। নতুবা আবার অন্যদিক দিয়া ভুল ঘটিয়া যাইতে পারে।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক এক দেশে এক এক সময় এক এক প্রকার জ্বরের অত্যধিক প্রকোপ ঘটিয়া থাকে। অতএব জ্বর হইলেই আগে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে উহা সাময়িক রোগটি হওয়াই সম্ভব কি না। ইহাই রোগ-নির্ণয়ের প্রথম সূত্র। এইরূপ ভাবে একটি রোগকে ধরিয়া প্রথম হইতে লক্ষণ মিলাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলে, অথবা লক্ষণগুলি আগে দেখিয়া লইয়া এই ভাবে বিচার আরম্ভ করিলে চিকিৎসকের দিশাহারা হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। নতুবা একই লক্ষণ লইয়া অনেক রোগের উদয় হয়, এ ক্ষেত্রে প্রথম সন্দেহ কোনটির উপর পড়িবে? অথচ

প্রথম সন্দেহ কিছু করিতেই হয়, নতুবা উপস্থিত চিকিৎসাও চলিতে পারে না, সাবধানও হওয়া যায় না। মনে করুন একটি লোকের হঠাৎ খুব জ্বর হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা আছে, এ-ছাড়া উপস্থিত কোনো লক্ষণ নাই। অনেক রোগেই এরূপ হইতে পারে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার সময় হইলে তাহাকে প্রথমে ম্যালেরিয়াই সন্দেহ করিব, বসন্তের প্রাদুর্ভাব থাকিলে বসন্তের আশঙ্কা করিব, পাড়ায় মেনিঞ্জাইটিস্ হইতে থাকিলে মেনিঞ্জাইটিসের কথাও ভাবিব, গ্রীষ্মকালে হইলে মনে করিব উহা ডেঙ্গু হওয়া সম্ভব, অথবা শীতকালে হইলে মনে করিব, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা রিউম্যাটিক্ ফিবার জাতীয় কিছু হইবে। আবার বোম্বাই অঞ্চলে শীতকালের কাছাকাছি এইরূপ জ্বর হইলে প্লেগের কথাও মনে করিতে হইবে, কিংবা দূর সীমান্ত প্রদেশ ও ভীমতাল নৈনিতাল প্রভৃতি অঞ্চলে হইলে টাইফাস (typhus) জাতীয় জ্বরের কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। এইরূপে দেশকালের বিচারের দ্বারা রোগের সূত্র সহজে ধরিতে পারা যায়।

কেবল স্থান সম্বন্ধে নয়, **রোগের ঋতু সম্বন্ধেও** বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক। ঋতুতে ঋতুতে রোগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে ইহা আমরা নিত্যই দেখিয়া আসিতেছি। অতএব কোন ঋতুতে কি পীড়া হওয়া স্বাভাবিক তাহার বিশেষ ধারণা করিয়া রাখিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের যুগে রোগ চিনিবার অন্য উপায় বিশেষ ছিল না, কিন্তু তাঁহারা ঋতু ধরিয়াই অনেক রোগ চিনিয়া লইতেন। এই জন্য তাঁহারা বায়ু পিত্ত কফের নাম ধরিয়া কোন ঋতুতে কোন ধাতুর প্রকোপ বা বিকৃতি হয়, তাহার নানারূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেন বিভিন্ন প্রকারের ঋতুপীড়া সকল এই ধাতুবিকৃতি হইতেই সৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানারূপ ধাতুগত পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে ইহা আমরা প্রতি বৎসরই দেখিতে পাই। কেবল আমাদেরই শরীরের মধ্যে নয়, প্রকৃতির সর্ব্বত্রই এ পরিবর্ত্তন ও আবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। বর্ষাকালে আমাদের নানারূপ পেটের দোষ (বায়ুবৃদ্ধি?) দেখা যায়, শরৎকালে পিত্তবিকৃতি ঘটে, শীতকালে শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়,—ইত্যাদি কথা সাধারণেও বলিয়া থাকে। কিন্তু এখন

আমরা জানিয়াছি যে কেবল তথাকথিত ধাতুবিকৃতি হইতেই রোগের সৃষ্টি হয় না, ঋতুতে ঋতুতে উহার সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক দিয়া উপযুক্ত রোগ-বীজের যোগাযোগ ঘটিতে থাকে এবং কারণগুলির একত্র সমন্বয় ঘটিয়া একটি রোগের জন্ম হয়। যেমন মনে করুন সর্দ্দিপীড়া। শীতকালে আমরা ইহাকে বলি 'ঠাণ্ডা লাগিয়াছে'। তাহার কারণ শীতকালে আমরা বন্ধঘরে থাকিতে বাধ্য হই, কিন্তু কার্য্যগতিকে হঠাৎ ঠাণ্ডার মধ্যে বাহির হইয়া আসি, এইরূপ হঠাৎ পরিবর্ত্তনে শরীর বাহিরের আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না এবং তদ্দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যাহার শরীরে হয়তো পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট বীজাণুসকল নিস্তেজ অবস্থায় বসিয়াছিল, তাহার শরীরে ইহারা এই সুযোগে সক্রিয় হইয়া উঠে, তখন সংগ্রাম বাধিয়া যায় এবং সর্দ্দিজ্বর প্রভৃতি আসিয়া দেখা দেয়। এইভাবে অনেকে এই সময় সর্দ্দিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে ও তখন আরো অনেক লোককে তাহারা সংক্রামিত করিতে থাকে।

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধেও এরূপ কথা বলা যায়। শরৎকালে অনেকেরই কিছু পিত্তবিকৃতি ঘটে। আবার শরৎকালেই মশার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। শুধু তাহাই নয়, শরৎকালের মশা কিছু অধিক দিন বাঁচে এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণুও মশার পেটে গিয়া অধিককাল জীবিত থাকে। কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অন্য ঋতুতে যদি মশা জন্মানো যায় এবং সেই মশাকে যদি ম্যালেরিয়ার রক্ত পান করানো হয় তবে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পেটে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধিকাংশই মরিয়া যায়, অনেক চেষ্টাতেও বাঁচাইয়া রাখা যায় না। সেইজন্য ম্যালেরিয়া ও মশা লইয়া পরীক্ষা করিতে হইলে ল্যাবোরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে শরৎকালের মত আবহাওয়ার অবতারণা করিবার আবশ্যক হয়। শরৎকাল, মশা ও ম্যালেরিয়া উভয়ের পক্ষেই প্রশস্ত। আবার এদিকে পিত্তবিকৃতি ভিন্ন ম্যালেরিয়া জোর করিয়া ধরিতে পারে না, শরৎকালে তাহাও ঘটিয়া থাকে। রোগটি হইবার জন্যই যেন এত প্রকারের যোগাযোগ হয়।

অতএব ঋতু-পীড়া মাত্রেরই বিশেষ কতকগুলি কারণ থাকে, এবং ঋতুর মধ্যেই সে কারণ বর্ত্তমান। এ-কথা মানিয়া লইতে হইবে এবং কোন ঋতুতে কি পীড়া হয় তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

রোগীর বয়স, জাতি প্রভৃতির কথাও এই সঙ্গে বিচার্য্য, সে কথা বলা বাহুল্য। কারণ রোগেরও পক্ষপাতিত্ব থাকে। যেমন, কোলাই জ্বর মেয়েদের যত হয়, পুরুষদের তত হয় না। ম্যালেরিয়া শিশুকালেই বেশী করিয়া ধরে। বালককালের রোগ টাইফয়েড্, যৌবনকালের রোগ যক্ষা ও বার্দ্ধক্যের রোগ ব্রঙ্কাইটিস্, ইত্যাদি কথা সাধারণেই বলিয়া থাকে। অতএব রোগ বিচারের সময় পাত্রের কথাও ভুলিলে চলিবে না। কোনো শিশুর পেটে প্রকাণ্ড প্লীহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উহাকে কালাজ্বর বলিতে নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে শৈশবে কালাজ্বর অপেক্ষা ম্যালেরিয়া হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক। শিশুর রক্তামাশা রোগ দেখিবামাত্র এমিটিন ইন্‌জেকশন্ দিতে তৎপর হওয়া উচিত নয়, মনে রাখিতে হইবে যে শিশুদের এমিবিক আমাশা প্রায় হইতেই পারে না, উহাদের ব্যাসিলারি আমাশাই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। এই সকল সাধারণ অভিজ্ঞতার কথাগুলি ভাল করিয়া জানিয়া রাখা আবশ্যক, নচেৎ পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা।

টেম্পারেচার দেখা

আজকাল সকলেই টেম্পারেচার দেখিতে জানেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু সাধারণকে একথা বুঝাইতে হইবে যে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর ঠিক একভাবে একই উপায়ে টেম্পারেচার দেখা উচিত ও তাহা লিখিয়া রাখা উচিত। যখন তখন ঘন ঘন থার্ম্মোমিটার দিয়া কোনো লাভ নাই। টেম্পারেচার দেখার উদ্দেশ্য জ্বরের গতির অনুসরণ করা, এবং তদ্দ্বারা জ্বরের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা জন্মানো। জ্বরের উত্তাপ ঘড়ির কাঁটার মত ঠিক নিয়মে চলে না, যতবার দেখা যাইবে, ততবারই কিছু বৈচিত্র্য পাওয়া যাইবে,—এইরূপ বৈচিত্র্যময় জ্বরের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলে চিকিৎসকের কোনোই লাভ হইবে না, বরং ধাঁধা লাগিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

চারঘণ্টা অন্তর টেম্পারেচার রাখিলেই যথেষ্ট, তাহাতে জর কোন পথে যাইতেছে ইহার যথেষ্ট কিনারা পাওয়া যায়।

অনেকে টেম্পারেচার লওয়া সম্বন্ধে নানারূপ খুঁটিনাটি করিয়া থাকেন। মুখে থার্ম্মোমিটার দিয়া টেম্পারেচার লওয়া উচিত অথবা বগলে দিয়া লওয়া উচিত,—ইহার মধ্যে কোনটি ভাল এই লইয়া অনেকে বিচার করিতে বসেন। কিন্তু টেম্পারেচার লওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য জ্বরের গতিবিধি দেখা ; এ-কথা মনে করিলেই বুঝিবেন, যে ভাবেই টেম্পারেচার লওয়া হউক তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না,—প্রথম হইতে যেখানে যেভাবে যত মিনিটের জন্য থার্ম্মোমিটার লাগাইয়া টেম্পারেচার লওয়া হইবে,—বরাবর সেই একই নিয়ম বজায় রাখিলেই হইল, তাহাতেই জ্বরের ওঠানামার চরিত্রটুকু বুঝিতে পারা যাইবে। সেই উদ্দেশ্যে মুখেই দেখা হউক বা বগলেই দেখা হউক উহা সমান কথা। যিনি যেরূপ নিয়মেই টেম্পারেচার দেখুন, সেই নিয়মের কখনও বদল না হইলেই হইল।

অনেক সময় দেখা যায় এক বগলে একরূপ টেম্পারেচার হইল, অন্য বগলে অন্যরূপ হইল, এমন কি এক ডিগ্রীর পর্য্যন্ত তফাৎ হইল ; ইহাতে অনেকে সন্দেহ করেন, বুঝি থার্ম্মোমিটার যন্ত্রটিই খারাপ। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়, এরূপ অসামঞ্জস্য হইতেই পারে। যখন তাপসংরক্ষণ কেন্দ্রের বিপর্য্যয় ঘটিয়াই জ্বরের সৃষ্টি হয়, তখন শরীরের বিভিন্নস্থানে তাপের অসাদৃশ্য হইবে ইহাতে বিচিত্র কি ? যখন কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিয়াছে এবং ভিতরে প্রবল উত্তাপ, তখন দেখিবেন গা ঠাণ্ডা। যখন গায়ে বেশ তাপ ফুটিয়াছে, তখনো অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন হাত পা ঠাণ্ডা, কপাল গরম। বস্তুতঃ তাপের অসামঞ্জস্য হইলে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক,—শরীরের এক অংশে যত তাপ, অন্য অংশে তাহা নাই। কলেরাতে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, সমস্ত অঙ্গ হিম, কিন্তু মলদ্বারে (rectal) টেম্পারেচার লইলেই দেখা যায় হয় তো রীতিমত জ্বর। ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্‌ ম্যালেরিয়াতেও আমরা কখনো কখনো এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাই। সেই জন্যই মুখে টেম্পারেচার লওয়ার ব্যবস্থা আছে, কারণ মুখের ভিতর এরূপ অসামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদের দেশে নানাকারণে এরূপ ভাবে টেম্পারেচার লওয়া সম্ভব নয়,

তাহাতে অনেক বিপদেরও আশঙ্কা আছে, বিশেষতঃ যদি ভুল-বকা রোগী হয়। অতএব বগলে লওয়ার প্রথাই কাজ চালাইবার পক্ষে যথেষ্ট। জ্বর থাকিলে ইহাতে টেম্পারেচার উঠিবে, দু-পয়েন্ট কম কি বেশী ইহা লইয়া চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বগলে টেম্পারেচার লইলে থার্ম্মোমিটার বগলের মধ্যে পাঁচ মিনিটকাল রাখাই উচিত। ছোট ছেলেদের বগলে টেম্পারেচার লওয়া বড় মুস্কিল, উহাদের পক্ষে সহজ উপায় কুঁচ্‌কির খাঁজের (groin) মধ্যে থার্ম্মোমিটার লাগানো।

অল্পদিনের জ্বরে টেম্পারেচার কাগজে লিখিয়া রাখিলেও চলে, কিন্তু যেখানে কিছু দীর্ঘদিন ধরিয়া জ্বর হইতেছে সেখানে একটি **চার্ট** (temperature chart) করিয়া রাখিলেই ভাল হয়। জ্বরের গতি সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইতে টেম্পারেচারের চার্ট যেমন সাহায্য করে, টেম্পারেচার-লিখিত তালিকা সেরূপ করিতে পারে না। খুব মনোযোগ দিয়া তালিকা পাঠ করিয়া গেলেও জ্বরের একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মে মাত্র, কিন্তু চার্টের দিকে চাহিবামাত্র অতি সহজে স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়া যায়। সেইজন্য চিকিৎসকের চার্ট দেখা অভ্যাস করা উচিত এবং রোগীর গৃহে তাহা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহা কিছুই কঠিন নয়, দিনের পর দিন তালিকা লেখা অপেক্ষা ইহা আরো সহজ। প্রত্যেক হাঁসপাতালে নার্সরা ইহা করিয়া থাকে এবং নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারাও ইহা অনায়াসে করানো যায়। চার্ট করিবার ছক-কাটা কাগজ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, কিংবা সাদা কাগজে রুল টানিয়া ইহা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। নীচে ৯৬ ডিগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া উপরে ক্রমবর্দ্ধমান এক এক ডিগ্রীর জন্য এক একটি লাইন নির্দ্দিষ্ট করা থাকে ; যখন যত টেম্পারেচার উঠে, চার্টের উপর তাহার উপযুক্ত স্থানে একটি করিয়া বিন্দু আঁকিয়া দিতে হয় ; উপরে ঘরে ঘরে তারিখ এবং সময় নির্দ্দেশ করা থাকে। পরে এক বিন্দু হইতে পরবর্ত্তী বিন্দু পর্য্যন্ত রেখা টানিয়া পরস্পরকে যুক্ত করিয়া দিতে হয়। এইরূপে জ্বরের ওঠানামা অনুসারে চার্টের রেখাও সমানতলে ওঠানামা করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। অতএব এইরূপ রেখাসঙ্কেতের দ্বারা—জ্বর কিরূপ ভাবে উঠিয়া নামিয়া, বা কত সময়ের

ব্যবধান রাখিয়া, বা একস্থানে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে থাকিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহা দৃষ্টিমাত্রে বুঝিতে পারা যায়। (৭২ ও ৭৪ পৃষ্ঠার চার্ট দেখ) সুরের মধ্যে যেমন কোনো ছন্দ থাকিলে বাদ্যের তালে তাহা অনায়াসে ধরা পড়ে, জরের মধ্যে যে প্রকৃতি বা ছন্দ আছে তাহাও তেমনি চার্টের রেখার উঠানামা দেখিলে অনায়াসেই ধরা যায়। সুরের ছন্দ ধরিতে তাল দেওয়ার যে আবশ্যক, জরের ছন্দ ধরিতে চার্টেরও সেই আবশ্যক। জরের মূর্ত্তি চার্টের উপর স্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়া যায়, সে মূর্ত্তি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চিকিৎসককে আর হাৎড়াইতে হয় না। কিছুদিনের পুরাতন-জর দেখিতে গেলেই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে একটি চার্ট প্রস্তুত করিয়া লওয়া। অনেক গোলমেলে বা এলোমেলো জর, যাহার স্বরূপ কিছুতে বোঝা যাইতেছে না,—এই চার্ট হইতেই তাহা চিনিয়া লওয়া অনেক সময় সহজ হইয়া পড়ে। অবশ্য চার্ট দেখিয়া জর চেনা চিকিৎসকের অভ্যাস থাকা উচিত, আশা করা যায় যে এখন সকল চিকিৎসকেরই তাহা আছে।

রোগী পরীক্ষা

কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন রোগী দেখিতে আগে জিজ্ঞাসু হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে, আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে বা অনুমানশক্তিকে তখন আদৌ প্রশ্রয় দিবে না। আগে মালমশলা সংগ্রহ কর, তারপর সেইগুলি একত্রিত করিয়া বুদ্ধিবলে রোগের মানসিকমূর্ত্তি গড়িয়া তোল।

রোগের ধারাবাহিক ইতিহাসই আমাদের প্রথম মালমশলা। ইহার জন্য নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন। কিরূপ সংবাদ লইতে হইবে আমরা এখানে তাহার কিছু নমুনা দিলাম :—

(১) **কবে হইতে জর হইয়াছে?**—এই প্রশ্নের উপর অনেক তথ্যই নির্ভর করে। কতদিন জরভোগ হইয়াছে জানিতে পারিলে নূতন অথবা পুরাতন ইহা বুঝিতে পারা যায় এবং রোগের বর্ত্তমান অবস্থাও জানা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় জরের প্রথম তারিখটা পাওয়া এদেশে

প্রায়ই কঠিন হয়, রোগী বা তাহার আত্মীয় প্রায়ই এ সম্বন্ধে ভুল করে। সেইজন্য একমুখে শুনিয়াই বিশ্বাস করা উচিত নয়,—এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত।

(২) **জর কখনও ছাড়িয়াছে কি ছাড়ে নাই?**—যদি ছাড়িয়া থাকে তবে কতবার ছাড়িয়াছে, কখন ছাড়িয়াছে, বিজর অবস্থা কতক্ষণ ছিল, পুনরায় কিরূপ ভাবে জর আসিল? জর আসার ও ছাড়ার কোনো নিয়ম আছে কি না?

(৩) **প্রথম জর আসার ইতিহাস কি?**—জর কম্প দিয়া আসিয়াছিল কিনা? জর আসার সঙ্গে সঙ্গে কি কি লক্ষণ দেখা গিয়াছিল? বমি হইয়াছিল কিনা? সর্দ্দি-কাসি ছিল কি না? গলায় ব্যথা ছিল কিনা? গায়ে ব্যথা ছিল কিনা? পেটের অসুখ ছিল কিনা? খাওয়া দাওয়ার কিছু অত্যাচার হইয়াছিল কিনা?

(৪) জর যদি একবারও না ছাড়িয়া থাকে তবে উহা **কিরূপ ভাবে বাড়িয়াছে**? ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে অথবা একেবারে প্রথম হইতেই বাড়িয়া উঠিয়াছে? জর কখন কমে, কখন বাড়ে? জর বাড়িবার সময় কি কি কষ্ট হয়, জর কমিবার সময় কি কি লক্ষণ দেখা যায়?

(৫) **উপস্থিত কি কি উপসর্গ আছে?**—শরীরের কোথাও ব্যথা বা ফুলা, বা ঘা-ফোঁড়া আছে কিনা? সর্দ্দিকাসি আছে কি না? প্রস্রাব কিরূপ হয়? দাস্ত কিরূপ হয়? ক্ষুধা কেমন? নিদ্রা কেমন হয়? শরীরে কি কি কষ্ট আছে?

(৬) **রোগী প্রায়ই এরূপ জরে ভোগে কিনা?**—পূর্ব্বে আর কত দিন আগে জর হইয়াছিল? পূর্ব্বে কি কি রোগ হইয়াছিল?

(৭) **রোগীর বয়স কত?** কোথায় বাস করে,—একই স্থানে বরাবর থাকে অথবা মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করে? ইতিপূর্ব্বে কোন কোন দেশে গিয়াছিল? রোগী কি কাজ করে? দৈনিক জীবন কিরূপ যাপন করে?

জিজ্ঞাসাবাদ সম্বন্ধে সকল কথা বলা সম্ভব নয়, আমরা কয়েকটি মাত্র অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের নমুনা দিলাম। অনেকে বলিয়া থাকেন রোগীকে

কিছু প্রশ্ন করিও না, কিছু ধরাইয়া দিও না, তাহার রোগ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা নিজমুখে বলিতে দাও, তুমি চুপ করিয়া শুনিয়া যাও। কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে একথা চলে না; শিক্ষিত সমাজে এরূপ চলিতে পারে কিন্তু সাধারণের ঘরে নয়। আমাদের দেশের লোক ভুগিতে জানে কিন্তু বলিতে জানে না। তাহারা এ সকল কথা স্মরণ করিয়াও রাখে না, ইহার তাৎপর্য্যও বোঝে না। মনে করে জ্বর হইয়াছে বলিলেই যথেষ্ট হইল, আর যাহা জানিবার তাহা ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া বা কল লাগাইয়া জানুক। অতএব সব কথা খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত উপায় নাই।

জিজ্ঞাসাবাদ ও সন্দেহের দ্বারা চিকিৎসকের মনে কিছু না কিছু ধারণা জন্মে, এবং প্রায়ই হয়তো কতকগুলি রোগের কথা একসঙ্গে মনে উদয় হয়। কিন্তু তখনও ঐ সকল ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। রোগীর পূর্ব্ব ইতিহাস যাহাই থাকুক, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা বা বর্ত্তমান রোগটি কি, তাহা কেবল পরীক্ষার দ্বারাই স্থির করিতে হইবে। তাহা পূর্ব্ব ইতিহাসের সহিত মিলিতেও পারে, অথবা নাও মিলিতে পারে। অতএব অতঃপর রোগীকে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত ধারণাগুলিকে দৃঢ়তর করিবার বা বর্জ্জন করিবার যুক্তিযুক্ততা অনুসন্ধান করিতে হইবে। যে রোগগুলি সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হয়, সেইগুলির বিশিষ্ট লক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যাইবে, অধিকাংশ অনুমান দূরীভূত হইয়া মাত্র দুই একটি রোগের সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়া উঠিবে। যদি দুই বা ততোধিক ব্যাধি সম্বন্ধে তুল্য সন্দেহ হইতে থাকে, তবে পুনরায় পরীক্ষা করিলে তাহার মীমাংসা হইতে পারিবে। যদি একদিনে এরূপ মীমাংসা সম্ভবপর না হয়, তবে দুই তিন দিন উপর্য্যুপরি পরীক্ষা করিতে করিতে অধিকাংশ স্থলেই একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইবে। এইজন্যই নিয়ম আছে যে প্রত্যেক দিন রোগীর আপাদমস্তক নূতন করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক, এবং পুরাতন রোগীকে দেখিতেছি মনে না করিয়া প্রত্যেক বার মনে করা উচিত নূতন রোগী দেখিতেছি। এইরূপে প্রথম দিনের পরীক্ষার ভুল দ্বিতীয় দিনে সংশোধিত হয়;

যেগুলি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য লক্ষণ সে গুলিকে একবার মাত্র দেখিয়া আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়। কারণ ইন্দ্রিয় সকলের সমান হয় না এবং সকল দিন সমান অবস্থায় থাকে না, অতএব ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।

রোগী পরীক্ষা করিতে হইবে এই বদ্ধমূল বিশ্বাস মনে লইয়া যে জ্বর যখন হইয়াছে তখন অবশ্য ইহার পশ্চাতে কিছু কারণ আছে, এবং সেই কারণটিকে আবিষ্কার করাই আমার সঙ্কল্প। অতএব এখানে উপস্থিত-বুদ্ধি ও নিখুঁৎ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির আবশ্যক।

পরীক্ষা কিরূপ প্রণালীতে করিতে হইবে তাহা বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন, কারণ সকল চিকিৎসকই সেই শিক্ষা প্রথমে লাভ করেন। কেবল বক্তব্য এই, প্রত্যেক রোগীর সমস্ত শরীর পরীক্ষা করিতে হইবে, কিছুই বাদ দেওয়া হইবে না। পেটের সমস্ত যন্ত্রগুলি একে একে পরীক্ষা করা, বুক পিঠ ও হৃদ্‌যন্ত্র ষ্টেথোস্কোপ দিয়া পরীক্ষা করা, মুখ নাক দাঁত জিভ গলা প্রভৃতি দেখা, সমস্ত অঙ্গের উপর চোখ বুলাইয়া দেখা কোথাও কিছু স্থানীয় বিকৃতি আছে কি না, বা স্থানীয় প্রদাহ কোথাও আছে কি না,—এই সকল চিকিৎসকের নিত্যকর্ম্ম। এমন কতকগুলি জ্বর আছে যাহাতে জ্বর ছাড়া আর কিছুই লক্ষণ নাই। তবু রোগীকে বার বার পরীক্ষা করা উচিত, কারণ জ্বরের দ্বারা কোনো যন্ত্র বিকল হইতেছে কি না তাহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জ্বর মাত্রেই শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়াছে অনুমান করিতে হয়, অতএব এই বিষের দ্বারা কখন কোন যন্ত্র বিকল হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এ গুলিকে বিষক্রিয়া-হেতু অনিষ্ট হইতে বাঁচাইবার জন্যও নিত্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। যদিও নাড়ী দেখিয়া আমরা বলিতে পারি না রোগী কতদিনে আরোগ্য হইবে বা কতদিনে তাহার মৃত্যু হইবে, তথাপি নাড়ী হইতে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানিতে পারি। সহজ বুদ্ধিতে এইটুকু বোঝা যায় যে রোগের বিষ মাত্রেই রক্তস্রোতকে ও হৃৎপিণ্ডকে বিপর্য্যস্ত করে, যেহেতু রক্তের মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে আসল প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। যেমন রোগ তাহার সেই মত প্রতিক্রিয়া ও সেইমত রক্তপ্রবাহের প্রকৃতি। নাড়ীর গতিতে তাহা নির্দ্দেশিত হয়।

কোন রোগে কিরূপ নাড়ীর বেগ হইবে তাহা আমাদের কতক জানা আছে। নিউমোনিয়ার নাড়ী এক প্রকার, টাইফয়েডের নাড়ী অন্য প্রকার। শুধু তাহাই নয়, জরের উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপ নিষ্কাশনের চেষ্টা হয়, অক্সিজেন বাষ্পের দ্রুত আদান প্রদান হয়, সেইজন্য রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হয়। সুতরাং জরের সঙ্গে নাড়ীর গতি সমান তালে চলিতেছে কি না তাহা দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি রোগের পূর্ণভোগ সত্বেও শরীরশক্তি সতেজ আছে অথবা পিছাইয়া পড়িতেছে। এইজন্যই নাড়ী দেখিবার প্রয়োজনীয়তা। রোগ যতই কঠিন হউক, নাড়ী যতক্ষণ সতেজ থাকে, ততক্ষণ জানি যে হৃৎপিণ্ড সবল আছে, সুতরাং অরোগ্যের আশা তখনও আছে। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া গেলে সে আশাও কমিয়া যায়। নাড়ীতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। যদি নাড়ী অনিয়মিত ভাবে চলিতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে থামিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়াছে, তাল ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। নাড়ী যদি খুব ক্ষীণ (soft) হয় অথচ অতি দ্রুতবেগে চলিতে থাকে, এবং যতটা জর তাহার সহিত নাড়ীর সামঞ্জস্য না থাকে, তবে বুঝিতে হয় রোগটি প্রবল এবং শরীর তাহার সহিত যুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু রোগের প্রথম অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া না দেখিলে ইহা বুঝা যায় না। অনেক রোগে প্রথম অবস্থাতেই সতেজ হইলেও নাড়ী খুব দ্রুত চলিতে থাকে, তাহার কারণ রোগটিকে উপযুক্তরূপে দমন করিতে তখন রক্তস্রোতের ঐরূপ গতিই প্রয়োজন। যে নাড়ী প্রথম হইতেই দ্রুত, তাহা পরবর্ত্তী অবস্থাতেও দ্রুত হইবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু যে নাড়ী প্রথমে মন্দগতি পরে দ্রুত, তাহাই আশঙ্কাজনক। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য রোগের প্রথম হইতে **নাড়ী গণনা** করা প্রয়োজন। নাড়ী দ্রুত অথবা বিলম্বিত ইহা আন্দাজে বুঝিয়া লওয়া ঠিক নয়। অভ্যাস করিলে নাড়ীর গতি অনুভবের দ্বারা অনুমান করা কঠিন হয় না বটে, কিন্তু **ঘড়ি ধরিয়া এক মিনিটকাল** নাড়ীর গতির সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিলে তাহা সুনির্দ্দিষ্ট ও অভ্রান্ত রূপে জানা যায়। কেবল নাড়ী ধরিয়া অনুমান করা অপেক্ষা এটুকু কষ্টস্বীকার করিয়া নাড়ীর বেগ গণনা করা

প্রত্যেক চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে। নতুবা পূর্ব্বদিন ও পরদিনের নাড়ীর তুলনা করা কষ্টসাধ্য হয়। সেইজন্য জর মাত্রেই প্রত্যহ নাড়ী গণিয়া রাখা আবশ্যক এবং কাগজে তাহা লিখিয়া রাখা আবশ্যক। যখন ইহার উপর চিকিৎসাদি কতকটা নির্ভর করে তখন ইহা অনিশ্চিত রূপে মনে মনে রাখা ঠিক নয়। আমাদের স্বাভাবিক নাড়ীর বেগ প্রতি মিনিটে ৭০ হইতে ৮০।৯০ পর্য্যন্ত। জর হইলে বেগ বাড়ে। কিন্তু সকল জাতীয় জরেই যে উহা একই নিয়মে বাড়িবে এমন কোনো কথা নাই। রোগ অনুসারে নাড়ীর বেগবৃদ্ধির ইতর-বিশেষ হয়। এই কথাটি আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

টেম্পারেচারের চার্টের উপর ভিন্ন-রংএর কালি দিয়া নাড়ীর বেগের চার্ট করিয়াও অনেকে রাখেন। ইহাতে জরের উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেছে কি না, দৃষ্টিমাত্রে ইহা বোঝা যাইতে পারে।

ল্যাবোরেটরি পরীক্ষা

রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া যে সকল ক্লিনিক্যাল্ (clinical) পরীক্ষাদির কথা এ পর্য্যন্ত বলা হইল, তদ্দারা যদি সকল রোগ চিনিতে পারা যাইত তবে তো কোনো কথাই নাই। কিন্তু অনেক সময় তাহা হয় না। কখনো কখনো রোগ জটিল মূর্ত্তি লইয়া আসে। কখনো বা দুই তিনটি রোগ একত্রে মিশিয়া জটিলতার সৃষ্টি করে, আবার কখনো বা আপাতঃ দৃষ্টিতে যে রোগ একরূপ দেখায়, তথোপযুক্ত চিকিৎসা করিয়া ফল না পাইলে তখন বুঝিতে পারা যায় ইহা সেই রোগ নয়, এক রোগের ছদ্মবেশ লইয়া অন্য কোনো রোগ হইয়াছে। রোগ সকল সময় মানুষের অভিজ্ঞতার সহিত মিল রাখিয়া চলে না, সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে কেবল লাক্ষণিক সিদ্ধান্ত যথেষ্ট হয় না, আরো স্পষ্ট নির্দ্দেশের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এইরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিবার জন্যই ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষার নানারূপ প্রণালীর উদ্ভাবনা হইয়াছে। এইসকল পরীক্ষার উপর বর্ত্তমান চিকিৎসকেরা

যথেষ্ট নির্ভর করিয়া থাকেন, কারণ উহার ফলাফল অভ্রান্ত ও নিরপেক্ষ, কোনো ব্যক্তিগত ধারণার দ্বারা তাহা গঠিত হয় না, যন্ত্রাদির সাহায্যে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট তাহা একইরূপে প্রতিভাত হয়। ইহা নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নয়। এক একটি রোগের নির্ভুল চিহ্ন, তাহার বিশিষ্ট বীজাণু, রক্তাদির মধ্যে তাহার বিশিষ্টরূপ প্রকাশ,—এই সকল আবিষ্কার করিতে কত মহাপণ্ডিত নিজেদের জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাহারই ফলে বর্ত্তমানে যদি আমরা রোগ সম্বন্ধে স্পষ্টতর নির্দ্দেশ পাইতে পারি তবে সে সুযোগ ত্যাগ করিব কেন?

ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত এবং তাহার অভাবে কিরূপ অসুবিধায় পড়িতে হয়, মফঃস্বলের চিকিৎসকেরা তাহা সময়ে সময়ে ভালমতেই টের পান। তাঁহারা রোগীও যথেষ্ট দেখেন এবং স্থূল পরীক্ষার দ্বারা রোগ চেনা যতটা সম্ভব, তাহার রীতিমত প্রয়াস করেন সন্দেহ নাই। তথাপি প্রায়ই তাঁহাদের দ্বিধা উপস্থিত হয় এবং এই দ্বিধার মীমাংসা করিতে না পারায় সমর্থস্থলে তাঁহারা রোগীকে সহরে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারাও যখন দুই তিনটি রোগের কথা একসঙ্গে মনে উদয় হয়, এবং তাহার মধ্যে কোনটি স্থির করিতে না পারিয়া চিত্ত দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, তখন চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। যে কয়প্রকার রোগ সম্বন্ধে অনেকেরই এইরূপ সন্দেহের উদয় হওয়া স্বাভাবিক তাহা মোটামুটি বলিতেও পারা যায়। যেমন—

টাইফয়েড্ না ইনফ্লুয়েঞ্জা?
টাইফয়েড্ না ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া?
টাইফয়েড্ না সেপ্‌টিক্ জ্বর?
টাইফয়েড্ না মেনিঞ্জাইটিস্?
ম্যালেরিয়া না টাইফয়েড্?
ম্যালেরিয়া না মেনিঞ্জাইটিস্?
ম্যালেরিয়া না ফাইলেরিয়া না কোলাইজ্বর?
ম্যালেরিয়া না কালাজ্বর?

কলেরা না ডিসেণ্টেরি না ম্যালেরিয়া?
ব্যাসিলারি ডিসেণ্টেরি না এমিবিক ডিসেণ্টেরি?
ব্রঙ্কাইটিস্ না নিউমোনিয়া?
টন্‌সিলাইটিস্ না ডিফ্‌থীরিয়া?

মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল, কিন্তু এরূপ অনির্দ্ধারিত অবস্থা আরো অনেক রোগে হয়, ল্যাবোরেটরি পরীক্ষা ভিন্ন প্রয়োজনের সময় তাহার মীমাংসা হয় না।

সাধারণ লোকে এইরূপ তর্ক করিয়া থাকে যে পূর্ব্বকালে যখন এই সকল পরীক্ষা ছিল না, তখন কি রোগের চিকিৎসা হইত না? কিন্তু এ তর্ক অচল, কারণ অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অবস্থার তুলনা হয় না। পূর্ব্বের চিকিৎসা তখনকার অবস্থার অনুরূপ ছিল, এখনকার চিকিৎসা বর্ত্তমান অবস্থার অনুরূপ হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। তখনকার দিনে রোগের পর্য্যায় ছিল লক্ষণানুযায়ী (symptomatic classification) এবং চিকিৎসাও ছিল কেবল লক্ষণানুযায়ী। এখন তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অবশ্য প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই এ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন রোগের বিশিষ্ট বীজাণু প্রভৃতির অনুযায়ী চিকিৎসাও সুনির্দ্দিষ্ট (specific) পদ্ধতিতে হইয়া থাকে। এ জন্য বর্ত্তমান যুগে বিশিষ্ট রোগ অনুসারে বিশিষ্ট ঔষধও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ ঔষধগুলির অধিকাংশই নানারূপ জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে প্রস্তুত অথবা বীজাণুর বিষ হইতে প্রস্তুত, এবং যে ঔষধটি যে রোগের পক্ষে ধার্য্য সেই নির্দ্দিষ্ট রোগটিতে ভিন্ন উহার কোনই ক্রিয়া নাই। বিশেষ করিয়া রোগ না চিনিয়া এই সকল তেজস্কর ঔষধ প্রয়োগ করাও যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে কালাজ্বর নিশ্চিতরূপে না জানিয়া অ্যাণ্টিমনি ইন্‌জেকশন দেওয়া যায় না, আমাশা রোগ এমিবিক কি না তাহা না বুঝিয়া এমিটিন ইন্‌জেক্‌শন দিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। এইরূপে বহুরোগই এখন নিশ্চিতরূপে না চিনিয়া উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা চলে না, সেই জন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগটি অভ্রান্তরূপে চিনিতে না পারা যায় ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

মোটের উপর এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মানুষ এখন আর

আনুমানিক অভিজ্ঞতা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না,—সকল বিষয়েই অবিসম্বাদিত সত্য প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে চায়। সেইমত বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রকে আগে ল্যাবোরেটরি-শিক্ষা প্রদান করিয়া পরে রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত করা হয়। অনেক বিবেচনার পর যে পদ্ধতি উপযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাকেই আমাদের বর্ত্তমানে মানিয়া চলিতে হইবে। যেখানে এই সকল পরীক্ষার প্রয়োজন সেখানে তাহার সাহায্য গ্রহণ না করিলে চিকিৎসা অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তবে ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষায় রোগনির্ণয় সম্বন্ধে সাহায্য পাওয়া যায় বলিয়া যে তাহার অতিব্যবহার বা অপব্যবহার করিতে হইবে তাহা নয়। আমেরিকার জনৈক শ্রেষ্ঠ প্যাথলজিষ্ট তাঁহার প্যাথলজি সম্বন্ধীয় পুস্তকের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—"To order tests at random is a waste of effort and is not to the best interests of the patient,"—অর্থাৎ, অবিবেচনার সহিত কতকগুলি পরীক্ষা করাইলে শক্তির অপচয় হয় মাত্র এবং তাহাতে রোগীরও কোনো উপকার হয় না। সুতরাং ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষার দ্বারা কেবল যেখানে যেটুকু সাহায্যের প্রয়োজন সেখানে সেইটুকু সাহায্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য চিকিৎসকের জানা প্রয়োজন কোন রোগের সন্দেহে কি পরীক্ষার আবশ্যক, কোন অবস্থায় ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষা করাইলে সন্দেহের মীমাংসা হইতে পারে,—কখন কোন পরীক্ষা করার উপযুক্ত সময়, কত দিন রোগভোগের পর কি পরীক্ষা করাইলে কি ফল আশা করা যায়, কতদিনের আগে বা পরে পরীক্ষা করানোর সার্থকতা নাই, কোন পরীক্ষার কি অর্থ এবং পরীক্ষার কোন ফল দেখিয়া কোন রোগ সন্দেহ করিতে হইবে,—ইত্যাদি অনেক কথাই জানিবার আছে। কেবল রক্তাদি পরীক্ষা করাইলেই যে রোগটির নাম জানা যাইবে এরূপ সহজ পন্থা ইহা নয়। পরীক্ষা করানোর কি সার্থকতা তাহা রীতিমত না জানা থাকিলে পরীক্ষা সত্ত্বেও রোগটি অচেনা থাকিয়া যায়। অতএব কোথায় কোন পরীক্ষার আবশ্যক এবং কোথায় কি ভাবে তাহার অর্থ করিতে হইবে ইহাও শিক্ষা করা দরকার।

ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষার ক্ষেত্রও যে সীমাবদ্ধ ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যতটা সাহায্য ইহার দ্বারা পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করিয়া কোনো লাভ হয় না। সেইজন্য কোনরূপ পরীক্ষার কতটুকু সীমা আছে তাহা জানিয়া চিকিৎসার প্রয়োজন অনুসারে কখনও বা ল্যাবোরেটরি পরীক্ষার ফলাফল মানিয়া লইতে হইবে এবং কখনও বা তাহা অগ্রাহ্যও করিতে হইবে। সকল সময় যে পরীক্ষার নির্দ্দেশ নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই।

দু-একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। ধরা যা'ক টাইফয়েড্ রোগ চিনিবার জন্য ভিডাল্ (Widal) পরীক্ষার কথা। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে—এইরূপ রোগে রক্তের মধ্যে বীজাণুর বিরুদ্ধে একরূপ পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহার নাম এগ্লুটিনিন্ (agglutinin)। এই পদার্থ যে-কোনো টাইফয়েড্ বীজাণুর সংস্পর্শে আসিবে তাহাকেই তাল পাকাইয়া ফেলিবে,—এবং তখন দেখা যাইবে যে বীজাণুর-তাল গুঁড়ার মত ঝরিয়া পড়িতে থাকিবে। ইহাকেই বলে ভিডাল্ পরীক্ষা। এই পরীক্ষার জন্য টাইফয়েড্-বীজাণুর কাল্চার করিয়া মজুত রাখিতে হয় এবং তাহা রোগীর রক্তের সিরামে মিশাইয়া দেখিতে হয় তাহাতে ঐরূপ গুঁড়া দেখা যাইতেছে কি না। এই পরীক্ষার আবার মাত্রা-ভেদ আছে, অর্থাৎ দেখিতে হয় কতটা সিরামের দ্বারা কত পরিমাণের টাইফয়েড বীজাণু তাল পাকাইতেছে, এবং সেই মতে ফলাফল ব্যক্ত করিতে হয়। আমরা সাধারণতঃ $\frac{১}{২০০}$ ভিডাল্ "+" দেখিলে তাহাকে টাইফয়েড্ বলি, তাহার কম মাত্রার হইলে বলি না। কিন্তু এ নিয়ম সকল সময়ে চলে না। অনেকের রক্তে কিছু স্বাভাবিক এগ্লুটিনিনও (normal agglutinin) থাকে। আবার টাইফয়েডের প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন ইনজেকশন লইলেও সুস্থ ব্যক্তির রক্তে ইহা জন্মায়, এবং পরীক্ষা করিলেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি এইরূপ ভ্যাক্সিন লইয়াছে, তাহার যদি অন্য কোনো কারণে জ্বর হয় এবং রক্তপরীক্ষায় ভিডাল + পাওয়া যায়, তবে তাহাকে টাইফয়েড্ বলা চলিবে না। যে ব্যক্তি ছয় মাস পূর্ব্বে টাইফয়েডে ভুগিয়াছে এবং এগ্লুটিনিন তাহার শরীরে এখনও বর্ত্তমান, তাহার যদি এখন জ্বর হয় এবং রক্ত পরীক্ষায় কিছু ভিডাল্ "+" পাওয়া যায় তবে তাহাকেও টাইফয়েড্ বলা চলিবে না। অপর পক্ষে যে ব্যক্তির জ্বর হওয়াতে প্রথম সপ্তাহে ভিডালের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না, কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে পাওয়া গেল মাত্র ভিডাল্ + $\frac{১}{২০}$, তবু তাহাকেও টাইফয়েড্ বলিতে হইবে, কারণ এ স্থলে এগ্লুটিনিন

গোটেই ছিল না, সম্প্রতি দেখা দিল। অতএব ভিডাল্ দেখিলেই টাইফয়েড্ সাব্যস্ত করা যাইবে না,—এ সম্বন্ধে অনেক পূর্ব্বাপর কথার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে—কালাজ্বরের রক্ত পরীক্ষা। সকলেই জানেন কালাজ্বর রোগীর রক্তের সিরামে এক ফোঁটা ফর্ম্মালিন দিলে তাহা জমিয়া সাদা হইয়া যায়, ইহাকে বলে অ্যাল্‌ডিহাইড্ পরীক্ষা (aldehyde test)। অন্ততঃ দুই এক মাস জ্বরে ভোগার পর কালাজ্বর রোগীর রক্ত এই পরীক্ষার উপযোগী হয়, তাহার পূর্ব্বে ইহার দ্বারা রোগ ধরা পড়ে না। কিন্তু পুরাতন ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি কয়েকটি পুরাতন রোগে ছয় মাস বা ততোধিককাল ভুগিতে থাকিলেও এই পরীক্ষায় কালাজ্বরের চিহ্নের মত সিরাম জমিয়া ঈষৎ সাদা হওয়ার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এ ক্ষেত্রে অ্যালডিহাইড পরীক্ষায় "ঈষৎ চিহ্ন" (slightly positive) পাওয়া গিয়াছে শুনিলে কিছুই স্থির করা চলিবে না। তখন রোগীর অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া এ পরীক্ষার ফলাফল বিচার করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে রোগী ছয়মাস বা বৎসরাধিককাল রোগে ভুগিতেছে, তবে জানিতে হইবে যে তাহার পক্ষে এ "ঈষৎ চিহ্নের" কোনোই মূল্য নাই, কারণ যে কোনো পুরাতন রোগেই উহা দেখা দিবে। আর যদি দেখা যায় যে রোগী মাত্র মাসাবধি বা তাহারও কম সময় জ্বরে ভুগিতেছে, এবং তাহাতেই এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে, তখন জানিতে হইবে রোগটি নিশ্চয় কালাজ্বর,—কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহার "ঈষৎ চিহ্ন" দেখা দিয়াছে।

এই দুই দৃষ্টান্ত হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে অধিকাংশ পরীক্ষার ফলাফল রোগের অবস্থার সহিত মিলাইয়া বিচার করিতে হয় এবং প্রয়োজনমত তাহা গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে হয়। সহজ চক্ষে কিছু দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষায় যাহা দেখিব তাহাই মানিয়া লইব, এরূপ অভ্যাস করিলে ভুল হইবে। এগুলি কেবল রোগের তদন্ত মাত্র। তদন্ত হইয়া গেলে শেষ বিচারের ভার আপন বুদ্ধির উপর। সেই জন্য মনশ্চক্ষু সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং "জ্ঞানবুদ্ধিপ্রদীপেন" দেখিতে হইবে সর্ব্বলক্ষণ ও সর্ব্বপরীক্ষা সমন্বিত রোগের আসল মূর্ত্তি কি।

হাঁসপাতালের ব্যবস্থা—

উত্তম হাঁসপাতালগুলিতে রোগনির্ণয় করিবার জন্য কতকগুলি বিধিবদ্ধ

নিয়ম আছে। সকলের পক্ষে এ পদ্ধতি যে আদর্শ হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি স্থানবিশেষে যে ইহার আবশ্যকতা আছে তাহা বুঝাইবার জন্য ইহা বিবৃত হইতেছে। যেখানে নানা প্রকারের বহু রোগী একত্রে থাকে, যেখানে উপযুক্তরূপ সরঞ্জাম ও সুবিধা আছে, এবং যেখানে বুদ্ধিচাতুর্য্যের অবকাশ দেওয়া অপেক্ষা ধারাবাহিক নিয়ম ও কার্য্যশৃঙ্খলা মানিয়া চলা অধিক প্রয়োজন, সেখানে এইরূপ নিয়ম বাঁধিয়া কার্য্য করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সেইজন্য হাঁসপাতালে প্রত্যেক জ্বর-রোগীর জন্য এইরূপ পরীক্ষাদির বন্দোবস্ত আছে:—

(১) রোগীর প্রত্যেক অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া কোথায় কি পাওয়া যায় তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে। এ জন্য ছাপানো ফর্ম্ম থাকে এবং তাহাতে প্রত্যেক পরীক্ষার ফলাফল লিখিবার স্থান নির্দ্দেশ করা থাকে, সেইগুলির পাদপূরণ করিতে হয়। এই সঙ্গে একটি করিয়া টেম্পারেচারের চার্ট থাকে, তাহার নিত্য পূরণ করিয়া জ্বরের গতি নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

(২) প্রত্যেক রোগীর মূত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় কত পরিমাণ প্রস্রাব হইতেছে তাহা মাপিয়া দেখিতে হয় এবং দুই একদিন অন্তর ল্যাবোরেটরিতে প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া তাহার সম্পূর্ণ ফলাফল লিখিয়া রাখিতে হয়। প্রয়োজন বোধ হইলে প্রস্রাব কাল্‌চার করিয়াও দেখিতে হয় কোনো বীজাণু পাওয়া যায় কি না।

(৩) প্রত্যেক রোগীর মল চাক্ষুষ পরীক্ষা করা হইবে এবং ল্যাবোরেটরিতে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের দ্বারাও পরীক্ষা করিতে হইবে। একবার মাত্র নয়,—কিছু দোষ না পাওয়া গেলেও অন্ততঃ ছয়বার এইরূপ পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি কোনো সন্দেহের কারণ থাকে তবে মলেরও কাল্‌চার করিতে হইবে। প্রত্যেক রোগীর মলেই বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে কোনো ক্রিমি বা এমিবা প্রভৃতি কোনো প্রোটোজোয়া আছে কি না। এ দেশের রোগী মাত্রেরই মল পরীক্ষা করানো আবশ্যক।

(৪) প্রত্যেক রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা হইবে। ম্যালেরিয়া আছে কি না ইহা দেখিবার জন্য প্রথমেই উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন রক্ত পরীক্ষা হইবে। এ-ছাড়া রক্তের অবস্থা কিরূপ, লোহিত কণিকার সংখ্যা কত ও শ্বেত কণিকার সংখ্যা কত, তাহা

গণনা করা হইবে। শ্বেতকণিকাগুলির প্রকার ভেদে উহাদের তুলনামূলক সংখ্যা কোনটির কিরূপ (differential count) তাহাও পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৫) এই সকল পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অ্যাল্‌কালাইন্‌ ফিবার মিকশ্চার (diaphoretic mixture) ছাড়া, এবং প্রয়োজন হইলে জোলাপ ছাড়া আর কোনো ঔষধ দেওয়া হইবে না। ইতিমধ্যে প্রায়ই জ্বরের কিছু কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। যদি উপরোক্তরূপ পরীক্ষায় জ্বরের কোনই কারণ না পাওয়া যায় অথচ জ্বর বেশ ওঠানামা করিতেছে (রেমিটেণ্ট বা ইণ্টারমিটেণ্ট) দেখা যায় এবং ম্যালেরিয়া বলিয়া কোনো সন্দেহ হয়, তবে দুই দিন উপর্য্যুপরি কুইনিন প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে। যদি ইহাতে কোনো ফল না হয় বা ম্যালেরিয়া বলিয়া সন্দেহেরও কারণ না থাকে তবে অনতিবিলম্বে রক্ত লইয়া কাল্‌চার করিতে হইবে।

(৬) এইরূপ ব্যবস্থায় অধিকাংশ রোগ ধরা পড়িবে। ইহাতেও যেগুলি চেনা যাইবে না, সেগুলির জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। টাইফয়েড্‌ কি না জানিবার জন্য ভিডাল পরীক্ষা (Widal), কালাজ্বর কি না জানিবার জন্য অ্যাল্‌ডিহাইড্‌ ও অ্যান্টিমনি (Chopra's test) পরীক্ষা, যক্ষ্মা রোগের জন্য গয়ার (sputum) পরীক্ষা, উপদংশ রোগের জন্য ভাসারমান্‌ বা কান্‌ পরীক্ষা (Wassermann or Kahn test),—ইত্যাদি সমস্তই একে একে করিতে হইবে।

দেখা গিয়াছে যে এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা শতকরা ৯০টি জ্বরের প্রকৃত কারণ ধরা পড়িয়া যায়। সুতরাং ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া সকলে বিবেচনা করেন। অবশ্য ইহাতেই যে সমস্ত জ্বরের কারণ জানিতে পারা যায় তাহা নয়। কতকগুলি জ্বর ইহা সত্ত্বেও অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যায়। তবে সেই সকল স্থলে এই পরীক্ষাদির দ্বারা অন্ততঃ কোন রোগগুলি যে নয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে অনেকগুলি রোগকে সম্ভাব্যের তালিকা হইতে বাদ দিতে (eliminate) পারিলে চিকিৎসকের সন্দেহের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসে। এ ছাড়া কোন দিক দিয়া আরো বিশিষ্টতর অনুসন্ধানের প্রয়োজন এবং লক্ষ্যস্থল কোন দিকে তাহারও একটা নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে শ্বেতকণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি রহিয়াছে অথচ শরীরে কোথাও কোনো বিকৃতির চিহ্ন পাওয়া যায় না, এরূপ অবস্থায় সন্দেহ

করিতে হয় শরীরের আভ্যন্তরিক প্রদেশে হয় তো কিছু প্রদাহ আছে যাহা উপর হইতে দৃষ্টিগোচর নয়। এরূপ স্থলে চিকিৎসক বিবেচনা করেন যে সার্জ্জন বা অস্ত্রচিকিৎসাবিদের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক, অথবা স্ত্রী-রোগী হইলে ধাত্রীবিদ্যাপারদর্শীর দ্বারা পরীক্ষা করানো আবশ্যক। ঐ সকল দিক দিয়াও যদি কোথাও কিছু না পাওয়া যায় তবে এক্স্‌রে রশ্মির দ্বারা ফুস্‌ফুসের বা অন্য কোনো সন্দেহোপযুক্ত অঙ্গবিশেষের ফোটো তুলাইয়া দেখা আবশ্যক। কিংবা যদি প্রস্রাবে কিছু দোষের চিহ্ন পাওয়া যায় বা রক্তের মধ্যে কোনো রাসায়নিক বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায় তবে জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা (biochemical analysis of blood) রোগীর রক্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক, তন্মধ্যে কোনো স্বাভাবিক পদার্থের অভাব ঘটিয়াছে কি না, বা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না (blood-urea, non-protein nitrogen estimation &c.)। সাধারণতঃ এই পরীক্ষাগুলির প্রয়োজন হয় না, তবে জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে এগুলির আবশ্যক হয়। এইরূপে নানাদিক দিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত একটা মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারা যায়। প্রত্যেক রোগই এক একটি স্বতন্ত্র সমস্যা, তন্মধ্যে কোনোটি বা সরল, কোনোটি জটিল। কোনোটি এক রোগের বীজ হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোনোটি বা বহুবীজের সম্মিলনে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বসমেত রোগীর বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহাই জানিতে হইবে এবং তাহারই চিকিৎসা করিতে হইবে। এরূপ স্থলে তথ্য সংগ্রহ ছাড়া উপায় নাই। প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহ হইয়া গেলে তাহা হইতে যে রোগের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে তাহাই নির্ভুল হইবে।

গৃহের ব্যবস্থা—

বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববর্ণিত ধারাবাহিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা আমাদের আদর্শ হইলেও গৃহস্থের ঘরে ইহার সুযোগ হওয়া সর্ব্বত্র সম্ভব নয়। বার বার নানারূপ পরীক্ষা করানোর সুবিধা ও সঙ্গতি গৃহস্থের থাকিতে

পারে না। বিজ্ঞান সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে সত্য এবং চিকিৎসককে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে ইহাও সত্য, কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসকের কর্মক্ষেত্র দারিদ্র্য, অভাব ও অসুবিধার মধ্যে। কাজেই সাধারণ চিকিৎসককে সমস্ত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াও উহাকে গৃহস্থের অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে,—ইহাই তাঁহার জীবনের সাধনা হইবে। কিরূপে তাহা সম্ভব ইহা কেহ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে পারিবে না, আপন সামর্থ্য ও চাতুর্য্য অনুসারে সেই পন্থা বাহির করিয়া লইতে হইবে। আমরা তাহার সামান্য কিছু ইঙ্গিত দিতে পারি মাত্র।

জ্বর হইলেই যে রক্তাদি পরীক্ষার প্রয়োজন এমন নয়। রজার্সের সেই কথাটি স্মরণ করুন। তিনি বলিয়াছেন যে এ দেশের অধিকাংশ জ্বরই দুই তিন দিন দেখিলে চিনিতে পারা যায়। কেবল যেগুলি জটিল বা মিশ্রিত জ্বর সেগুলির জন্যই ঐ সকল পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। অতএব ঐগুলি ব্যতীত অধিকাংশ জ্বরই যাহাতে বিনা পরীক্ষায় চিনিতে পারা যায় তাহার জন্য অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত। এই অভিজ্ঞতা যেখানে নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ যেখানে ১০ দিন জ্বর ভোগ হইয়া গেল অথচ লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসায় ফল হইতেছে না, সে স্থলে রক্তাদি পরীক্ষার প্রয়োজন। তবে এ স্থলেও অনর্থক কতকগুলি পরীক্ষা করাইয়া লাভ নাই, যে পরীক্ষার নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে আগে তাহাই করাইতে হইবে। সুতরাং 'নিতান্ত আবশ্যক' কোন পরীক্ষাটি তাহাও সে স্থলে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং এ বিষয়েও কিছু অভিজ্ঞতা থাকার দরকার। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ যাহা মনে জাগে তাহা মিটাইবার জন্যই পরীক্ষা করাইতে হইবে। হয় তো সন্দেহ করাতেও ভুল হইতে পারে, কিম্বা হয় তো একে একে অনেক প্রকার পরীক্ষারও প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে অযথা অর্থব্যয় বা অনর্থক উৎপীড়ন করা না হয়। মানুষের সুবিধার জন্যই বিজ্ঞানের সৃষ্টি, কেবল বৈজ্ঞানিকতা পুরাপুরি বজায় রাখিতে গিয়া মানুষকে অসুবিধায় ফেলিলে সে উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়।

ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষাও দুই রকমের আছে। কতকগুলি পরীক্ষা সহজ, কতকগুলি কঠিন। সহজ পরীক্ষাগুলি অনেক চিকিৎসকই নিজে নিজে করিয়া লইতে পারেন, যদি তাহার অভ্যাস রাখেন। সচরাচর যে পরীক্ষাগুলির দরকার হয় সেগুলি প্রায়ই সহজ, এবং যেগুলি কদাচিৎ দরকার হয় সেইগুলি কঠিন। কঠিন পরীক্ষাগুলি সাধারণ চিকিৎসকের পক্ষে করা সম্ভব নয়, সেগুলির জন্য ল্যাবোরেটরির সাহায্য লইতেই হয়। কিন্তু সহজ পরীক্ষাগুলি চিকিৎসারই অঙ্গস্বরূপ, বর্ত্তমান কালের চিকিৎসক এগুলি শিক্ষা করিয়াও যদি সদ্ব্যবহার না করেন তবে তিনি যে অন্যায় করেন এ কথা বলিতেই হইবে।

একটি মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র এখনকার চিকিৎসকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। বুক পিঠ পরীক্ষা করিতে যেমন আমরা ষ্টেথোস্কোপ নিজেরাই রাখি এবং নিজেরাই ব্যবহার করি, সে জন্য পরের সাহায্য লই না,—সহজ রক্তাদি পরীক্ষার জন্য তেমনি আমাদের নিজেদেরই মাইক্রোস্কোপ রাখা উচিত এবং এবিষয়েও পরের সাহায্য গ্রহণ না করা উচিত। বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম অঞ্চলে যেখানে কোনোরূপ সাহায্য পাওয়ার উপায় নাই, সেখানে মাইক্রোস্কোপের অভাব যে কিরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। অথচ একটি যন্ত্র কিনিয়া তাহার চর্চ্চা রাখিলে কিছুই অনিশ্চয়তা থাকে না এবং ইহাতে খ্যাতিও বাড়ে। জ্বরের রোগীকে যখন দেখিতে গেলাম তখন বুক পিঠ পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে এক ফোঁটা রক্তও স্লাইডে টানিয়া লইলাম, বা গলায় ঘা দেখিলে স্লাইডে তাহার রস লাগাইয়া লইলাম, কালাজ্বর মনে হইলে শিরা হইতে কিছু রক্ত টানিয়া লইলাম, এবং বাড়ী আসিয়া উহা পরীক্ষা করিয়া উচিতমত ব্যবস্থা করিলাম,—এইরূপ পদ্ধতিতে রোগ চিনিয়া চিকিৎসা করাই এখন আমাদের দেশের আদর্শ হওয়া উচিত।

জ্বর চিনিতে মাইক্রোস্কোপের কি আবশ্যকতা—

মাইক্রোস্কোপ-পরীক্ষার মধ্যে রক্তে **ম্যালেরিয়ার জীবাণু আছে কি না** এই পরীক্ষাই সর্ব্বপ্রধান। ম্যালেরিয়ার দেশে যে কোনো জ্বরেই রক্ত পরীক্ষার আবশ্যকতা হইলে এই পরীক্ষাটি সর্ব্বাগ্রে করা উচিত, তাহা বলা বাহুল্য।

জর চিনিবার জন্য আর একটি অত্যাবশ্যকীয় অথচ সহজ পরীক্ষা **রক্তকণিকার সংখ্যা গণনা করা** (counting of blood corpuscles)। এই সংখ্যা-গণনার দ্বারা অনেক ব্যাধি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে ধরা পড়ে। প্রায় জরমাত্রেই স্বাভাবিক কণিকাসংখ্যার বৈষম্য ঘটে, এবং কোন রোগে কি প্রকারের সংখ্যা-বৈষম্য হয় ইহা জানা থাকিলে উপস্থিত রোগটি কি হওয়া সম্ভব এবং কি হওয়া সম্ভব নয় তাহার একটা সুনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং তখন কয়েকটি মাত্র সম্ভাব্য রোগের মধ্য হইতে যেটির সহিত বর্ত্তমান লক্ষণগুলির মিল আছে সেই রোগটিকে অনায়াসে বাছিয়া লইতে পারা যায়। রোগ চিনিবার এই অন্যতম নূতন উপায়টি সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত, কারণ এই প্রণালীতে অনেক রোগ চিনিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায় এবং অনেক মারাত্মক ভুল সংশোধন করা যায়। রক্তকণিকাগুলির সংখ্যা গণনা করাও সহজ, অভ্যাস করিলে সকলেই ইহা করিতে পারেন।

শরীরের প্রবহমান রক্তের স্রোতে কণিকাগুলি সর্ব্বত্রই সমানভাবে ভাসিতে থাকে। স্রোত কখনও স্থগিত হয় না বলিয়া রক্ত-কণিকাসকল সর্ব্বত্র সমানভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সংখ্যার ন্যূনাধিক্য কোথাও ঘটে না। এক ফোঁটা আঙুলের রক্তেও যে পরিমাণ কণিকা থাকিবে, এক ফোঁটা হৃৎপিণ্ডস্থ রক্তেও সেই পরিমাণ কণিকা থাকিবে। অতএব আঙুলের বা যে কোনো স্থানের রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায় রোগীর রক্তের কণিকা-সম্পদ কিরূপ। কি উপায়ে গণনা করিতে হয় তাহা এখানে বলার প্রয়োজন নাই, তাহার জন্য কিছু শিক্ষার প্রয়োজন এবং চিকিৎসকমাত্রেই সে শিক্ষা ছাত্রাবস্থায় পাইয়া থাকেন। এই গণনার নির্দ্দেশ অনুসারে কিরূপে রোগ চেনা যায় কেবল তাহাই এস্থলে বিবেচ্য।

রক্তের মধ্যে কণিকা দুই প্রকারের আছে,—**লোহিতকণিকা** (red-cells) এবং **শ্বেতকণিকা** (white-cells or leucocytes)। তন্মধ্যে লোহিতকণিকা একই প্রকারের, এবং তাহার স্বাভাবিক সংখ্যা প্রতি বর্গ-মিলিমিটারে (একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দু-পরিমাণের মধ্যে)

৫ মিলিয়ন হইতে ৬ মিলিয়ন পর্য্যন্ত (৫০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ)। এনীমিয়া বা রক্তশূন্যতা হইলে এই সংখ্যা কমিয়া যায়। সুতরাং ইহার গণনার দ্বারা কেবল এইটুকু জানা যায় যে রোগীর রক্তাল্পতা ঘটিয়াছে কি না, এবং কতটা পরিমাণে ঘটিয়াছে।

কিন্তু শ্বেতকণিকার গণনার দ্বারাই নানারূপ রোগের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। শ্বেতকণিকা এক প্রকারের নয়, মোটামুটি চার প্রকারের শ্বেত কণিকা রক্তের মধ্যে আছে। অতএব শ্বেতকণিকার গণনা দুই রকম হিসাবে করিতে হয়। একরূপ গণনা **শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যা কত** (total count of leucocytes)। আর একরূপ গণনা **কোন প্রকারের শ্বেতকণিকা কত অনুপাতে আছে** (differential count of leucocytes), অর্থাৎ শতকরা কোন জাতীয় শ্বেতকণিকার কিরূপ তুলনামূলক পরিমাণ। দুইরূপ গণনাই আবশ্যক।

শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যা দেখিয়া রোগ চিনিবার উপায়

শ্বেতকণিকার স্বাভাবিক মোট সংখ্যা প্রতি বর্গ-মিলিমিটারে **গড়ে ৫৫০০ হইতে ৮৫০০** (5,500 to 8,500 per cmm.)। স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যেও এতটা বিস্তীর্ণ ব্যবধান রাখিবার অর্থ এই যে, এই সংখ্যার মাত্রা সর্ব্বদা একভাবে থাকে না। একই ব্যক্তির সুস্থ অবস্থায় পরিশ্রম করিলে, বিশ্রাম করিলে ও আহার করিলে তদ্দ্বারা সংখ্যার ইতরবিশেষ ঘটে, এবং এক সময় হইতে অন্য সময়ের তুলনা করিলে দুই এক হাজার সংখ্যার অল্পাধিক্য প্রায়ই হইতে দেখা যায়। তবে সাধারণতঃ ৫৫০০ হইতে ৮৫০০ পর্য্যন্ত সীমার মধ্যেই ইহা ওঠানামা করে। কিন্তু কতকগুলি রোগে এই সীমা অতিক্রম করিয়া শ্বেতকণিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়, আবার অন্য কতকগুলি রোগে ইহা অনেক কমিয়া যায়; আর যে রোগে যেরূপ সংখ্যা পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা, প্রায়ই তাহার ব্যতিক্রম হয় না। অতএব এখানে মস্ত সুবিধার কথা এই যে, কি কি রোগে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়ে ও কত বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, আর কি কি রোগে সংখ্যা কমে ও

কত কমে,—ইহা যদি আমরা জানিয়া রাখি তবে তাহা হইতেও আমরা অনেক সাহায্য পাইতে পারি। যে রোগ সন্দেহ করিয়াছি তাহার সহিত সংখ্যা গণনায় মিলিল কি না বুঝিতে পারি, কিংবা যে রোগ সন্দেহ করিতে পারি নাই সেই রোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হইতে পারে। এ ছাড়া রোগীর অবস্থার অবনতি হইতেছে বা উন্নতি হইতেছে, এই গণনার দ্বারা তাহাও জানা যাইতে পারে। শ্বেতকণিকাগুলিকে রোগ-বিজয়ের সেনানী বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সুতরাং সৈন্যসংখ্যা কত ইহা জানিতে পারা যে আমাদের বিশেষ আবশ্যক, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু সুস্থ অবস্থাতেও শ্বেতকণিকার সংখ্যা কয়েক স্থলে স্বাভাবিক মাত্রার অতিরিক্ত হইয়া থাকে (physiological leucocytosis),—অতএব সে অবস্থাগুলি আগে জানিয়া রাখা উচিত।

শিশু যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যন্ত বেশী থাকে—এমন কি জন্মের পর দুই একদিন পর্য্যন্ত ১৫,০০০ হইতে ২০,০০০ পর্য্যন্ত সংখ্যা থাকিতে দেখা যায়। প্রথম বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ পর্য্যন্ত সংখ্যা থাকে। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই সংখ্যা প্রায়ই ১০,০০০এর নীচে নামিতে দেখা যায় না। তাহার পর সংখ্যা কমিতে কমিতে দ্বাদশ বৎসর বয়সে আসিয়া ইহা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে পৌঁছায়। অসহায় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকৃতি তাহাদের সৈন্যসংখ্যা স্বভাবতঃই বাড়াইয়া রাখে, সেই জন্যই দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মারাত্মক রোগসমূহ শীঘ্র হইতে পারে না। আবার অতি **বৃদ্ধ বয়সেও** শ্বেতকণিকার সংখ্যা অল্প কিছু বাড়িতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে **গর্ভাবস্থাতেও** শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়ে এবং প্রসব হইবার পর এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই বৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকে। শ্বেতকণিকার সংখ্যাবিচার করিবার সময় এই কথাগুলি স্মরণ রাখা উচিত।

শ্বেতকণিকার সংখ্যাবৃদ্ধিকে **লিউকোসাইটোসিস্** (leucocytosis) বলা হয় এবং সংখ্যাহ্রাসকে **লিউকোপীনিয়া** (leucopenia) বলা হয়।

লিউকোসাইটোসিস্ (Leucocytosis)

সাধারণতঃ শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যা দশ হাজার বা তদূর্দ্ধে উঠিলে তাহাকে লিউকোসাইটোসিস্ বলা যায়। দশ হাজারের নীচে থাকিলে তাহা বলা যাইতে পারে না। নিম্নলিখিত রোগগুলিতে লিউকোসাইটোসিস্ হইয়া থাকে:—

(১) **নবীন প্রদাহ** (acute inflammation) মাত্রেই লিউকোসাইটোসিস্ দেখা যায়। 'সেপটিক' বীজাণুর আক্রমণ মাত্রেই এইরূপ প্রদাহ উপস্থিত হয়। নবীন প্রদাহের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ **নিউমোনিয়া**। আসল নিউমোনিয়াতে শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং প্রায়ই তাহা ২০,০০০-এর উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। অতএব সর্দ্দিকাসিযুক্ত জ্বরে যদি দেখা যায় যে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কুড়ি হাজারের উপর উঠিয়াছে, তবে সম্ভবতঃ তাহা নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়ার বীজাণু ব্যতীত **ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস, ষ্ট্যাফিলোকক্কাস ও কোলাই বীজাণুর** দ্বারা যে কোনো অংশে যে কোনোরূপ প্রদাহ হউক এবং তজ্জনিত জ্বর হউক, তাহাতেও লিউকোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

(২) শরীরের যে কোনো স্থানে **পুঁজ জমিয়া** থাকিলে (suppuration) শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ব্যথার স্থানে পুঁজ জমিতেছে কি না এবং অস্ত্রপ্রয়োগের আবশ্যক কি না, শ্বেতকণিকার গণনা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—রোগীর কিছুদিন যাবৎ জ্বর হইতেছে কিন্তু কোথাও কোনো রোগের চিহ্ন নাই, দেখা গেল শ্বেতকণিকার সংখ্যা কুড়ি হাজারের অধিক; তখন শরীরের কোনো গভীর স্থানে, অর্থাৎ লিভার বা কিডনি বা পেরিটোনিয়ম, বা অন্য কোথাও পুঁজ জমিতেছে তাহা অনুমান করিয়া খুঁজিতে হইবে এবং প্রয়োজনমত অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিংবা **অ্যাপেন্ডিসাইটিস্** রোগ হইয়াছে, যদি দেখা যায় যে শ্বেতকণিকার সংখ্যা প্রত্যহ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে তবে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক ইহা বুঝিতে হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত রোগগুলিতে লিউকোসাইট-সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় (hyper-leucocytosis):—**মেনিঞ্জাইটিস্** (cerebro-spinal meningitis), **ইরিসিপেলাস, পাঈমিয়া** (বিস্ফোটক রোগ), **প্লেগ, নিউমোনিয়া, ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্** কর্ত্তৃক রক্তদুষ্টি (streptococcal septicæmia), ইত্যাদি।

এই রোগগুলিতে লিউকোসাইটের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ বা তাহার অধিক থাকে।

(৪) নিম্নলিখিত রোগগুলিতে লিউকোসাইটোসিস্ কিছু অল্প পরিমাণে হয়ঃ— **রিউম্যাটিক্ ফিবার** (Rheumatic fever), **ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া** ও **ব্রঙ্কাইটিস্, প্লুরিসি** (কেবল তরুণ অবস্থায়), **টন্‌সিলাইটিস্,** প্রভৃতি। এই সকল রোগে লিউকোসাইটের সংখ্যা প্রায় ১৫,০০০এর অধিক দেখা যায় না। সাধারণ যে কোনো প্রদাহেই লিউকোসাইটের সংখ্যা এইরূপ কিছু বৃদ্ধি পাইবে, এমন কি গায়ে **ঘা ফোঁড়া** প্রভৃতি হইলেও এইরূপ লিউকোসাইটোসিস্ দেখিতে পাওয়া যাইবে। মোটামুটিভাবে এইকথা বলা যাইতে পারে যে সেপটিক্ প্রকৃতির বীজাণু কর্তৃক উৎপন্ন সংক্রামক ব্যাধি মাত্রেই লিউকোসাইটোসিস্ হইবে। প্রোটোজোয়ার ব্যাধিসমূহে ইহা ঘটে না। তবে প্রোটোজোয়াদির সহিত যদি সেপটিক্ বীজাণু (septic cocci) আসিয়া যোগ দেয়, তবে তখন লিউকোসাইটোসিস্ হয়; যেমন আমরা এমিবিক আমাশায় কখনো কখনো দেখিতে পাই।

লিউকোপীনিয়া (Leucopenia)

শ্বেতকণিকার সংখ্যা পাঁচ হাজার বা তন্নিম্নে কমিয়া গেলে তাহাকে লিউকোপীনিয়া বলা হয়। নিম্নলিখিত রোগসমূহে নিউকোপীনিয়া হইয়া থাকে ঃ—

(১) তরুণ রোগের মধ্যে **টাইফয়েড** ও **প্যারাটাইফয়েড** জ্বর। রক্তের মধ্যে যদি ম্যালেরিয়ার জীবাণু না থাকে এবং জ্বরের গতি যদি টাইফয়েডের মত হয় ও তৎসঙ্গে লিউকোপীনিয়া থাকে, তবে তাহা সম্ভবতঃ টাইফয়েড বলিয়া মনে করিতে পারা যাইবে। টাইফয়েড রোগে যদি লিউকোপীনিয়া হইতে হঠাৎ লিউকোসাইটোসিস আসিয়া উপস্থিত হয় তবে বুঝিতে হইবে উহার সহিত কোনো নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে।

(২) **ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে** প্রায় লিউকোপীনিয়া হয়, তবে উহার সহিত অন্য বীজাণুরসংমিশ্রণ (secondary infections) থাকিলে তাহা হয় না। **ডেঙ্গুতেও** লিউকোপীনিয়া হয়। অতএব তরুণ জ্বরে লিউকোপীনিয়া থাকিলে এই তিন প্রকার রোগই হইতে পারে,—**ডেঙ্গু, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা,** অথবা **টাইফয়েড** জাতীয় জ্বর। তবে ডেঙ্গু সাতদিনের বেশী থাকে না, এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সর্দ্দিকাশি লইয়া আরম্ভ হয়, সুতরাং পৃথক করিয়া লওয়া কঠিন নয়।

(৩) ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে **হাম, পানিবসন্ত** এবং **মাম্পস্** (mumps) রোগেও লিউকোপীনিয়া হয়।

(৪) **কালাজ্বরের** লিউকোপীনিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহাতে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমিতে কমিতে এক হাজার পর্য্যন্ত বা তন্নিম্নে গিয়াও পৌছিতে পারে। পুরাতন জ্বরে এরূপ অতিরিক্ত লিউকোপীনিয়া দেখিলে কালাজ্বর সন্দেহ করা উচিত।

(৫) **অনেক প্রকার পুরাতন রোগেই** কিছু না কিছু লিউকোপীনিয়া হয়। রক্তশূন্যতা রোগে শ্বেতকণিকার সংখ্যাও যে কমিবে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; সুতরাং বহু পুরাতন জ্বরগুলিতে রক্তশূন্যতাহেতু সংখ্যাহ্রাস হইয়াছে অথবা কালাজ্বরের জন্যই তাহা হইয়াছে ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত। **পুরাতন ম্যালেরিয়াতেও** অল্প লিউকোপীনিয়া দেখা যায়। এইরূপে পুরাতন **উপদংশ** (syphilitic) রোগে ও **যক্ষ্মাদি** রোগেও (tubercular diseases) কিছু লিউকোপীনিয়া দেখা যায়। বহুদিনের **পুরাতন প্রদাহ** মাত্রেই (chronic inflammation) রোগের সহিত যুঝিয়া শ্বেতকণিকার সংখ্যা কিছু কমিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় **পুরাতন লিভার অ্যাবসেস্** (chronic liver abscess); হয়তো ৫।৬ মাস যাবৎ লিভারে পূঁজ রহিয়াছে, কিন্তু শ্বেতকণিকার গণনা মাত্র চার বা পাঁচ হাজার হইল, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

(৬) যেখানে রোগের সহিত শরীরের যুঝিবার শক্তির একান্ত অভাব সেখানে রোগটি যাহাই হউক, লিউকোসাইটোসিস্ হওয়ার পরিবর্ত্তে কখনো কখনো সেখানে লিউকোপীনিয়া হইতে দেখা যায়। এরূপ অস্বাভাবিক স্থলে লিউকোপীনিয়া হওয়া দুর্লক্ষণ। যদি নিউমোনিয়া রোগে দেখা যায় যে লিউকোসাইটোসিস্ হওয়ার পরিবর্ত্তে লিউকোপীনিয়া হইয়াছে তবে সে রোগীর বাঁচিবার আশা খুব কম। ইহা অস্বাভাবিক লিউকোপীনিয়া, প্রকৃতি এখানে সৈন্যসংগ্রহ করিতে অপারগ, ইহাই বুঝিতে হইবে।

চতুর্ব্বিধ শ্বেতকণিকার সংখ্যাতারতম্য দেখিয়া রোগ চিনিবার উপায়—

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্বেতকণিকা মোটামুটি চারি প্রকারের আছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপ কণিকার বিভিন্নরূপ ক্রিয়া, এবং বিভিন্ন-জাতীয় রোগে কোনো

কোনো প্রকারের কণিকা অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পায়, ও সেই অনুপাতে অন্য প্রকারের কণিকার সংখ্যা কমিয়া যায়। ইহা হইতেও কতক ধারণা করিতে পারা যায় যে কোন জাতীয় রোগ জন্মিয়াছে। বস্তুতঃ শ্বেতকণিকার মোটসংখ্যা গণনার অপেক্ষাও এই তুলনামূলক গণনা অধিক প্রয়োজনীয়। কারণ কেবল মোটসংখ্যা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে শ্বেতকণিকা সর্ব্বসমেত কমিয়াছে কিংবা বাড়িয়াছে,—কিন্তু কোন প্রকারের শ্বেতকণিকা বাড়িয়া যাওয়াতে এই মোটসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা জানিবার কোনোই উপায় থাকে না। অথচ তাহাই জানা অধিক প্রয়োজন। পূর্ব্বে আমরা যে লিউকোসাইটোসিস্ কথার উল্লেখ করিয়াছি এবং যে সকল রোগে লিউকোসাইট বৃদ্ধি হয় বলিয়াছি,—তাহাতে আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে বহুবীজ-বিশিষ্ট পলিনিউক্লিয়ার (polynuclear) জাতীয় শ্বেতকণিকারই বৃদ্ধি হেতু এই লিউকোসাইটোসিস্। যেখানে এই পলিনিউক্লিয়ার লিউকোসাইটগুলি বৃদ্ধি হইয়া শ্বেতকণিকার মোটসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, কেবল তাহাকেই আমরা আসল 'লিউকোসাইটোসিস্' বলি,—অন্যজাতীয় শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি হইয়া মোটসংখ্যা বাড়িয়া গেলেও তাহাকে লিউকোসাইটোসিস্ বলি না। যদি লিম্ফোসাইট জাতীয় কণিকার সংখ্যা বাড়িয়া তজ্জন্য মোটসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, তাহাকে লিউকোসাইটোসিস্ না বলিয়া বলা হয় 'লিম্ফোসাইটোসিস' (lymphocytosis)। যদি ইওসিনোফিল্ (eosinophiles) জাতীয় কণিকার বৃদ্ধি হেতু মোটসংখ্যা বাড়ে,—তাহাকে বলা হয় 'ইওসিনোফিলিয়া' (eosinophilia)। অতএব যথার্থ লিউকোসাইটোসিস্ হইয়াছে কিনা ইহা বুঝিবার জন্য দুইরূপ গণনাই একসঙ্গে দেখা আবশ্যক,—অর্থাৎ কি কি প্রকারের শ্বেতকণিকা বাড়িয়াছে ও কমিয়াছে তাহাও দেখিতে হইবে, এবং সর্ব্বসমেত শ্বেতকণিকার সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে তাহাও দেখিতে হইবে,—তবেই রক্তের অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

শ্বেতকণিকাগুলির হ্রাসবৃদ্ধির পার্থক্য গণনা (differential count) করা অতি সহজ, যদি বিভিন্নরূপের কণিকাগুলিকে ভাল করিয়া চেনা থাকে। ম্যালেরিয়া দেখিবার জন্য যে স্লাইডে রক্ত টানিয়া লওয়া হয় তাহাতেই

এই গণনা করিতে পারা যায়। মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ঐ স্লাইডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে যতক্ষণে একশতটি শ্বেতকণিকার সংখ্যা সম্পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক কণিকাটিকে পৃথক ভাবে চিনিয়া চিনিয়া উহা কোন পংক্তির মধ্যে পড়িবে একটি কাগজে তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়। পরে একশত গণনা সম্পূর্ণ হইলে সেই কাগজটিতে যোগ দিয়া দেখিতে হইবে কোন পংক্তির মধ্যে শতকরা কতগুলি কণিকা আছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় চারিপ্রকার শ্বেতকণিকার মধ্যে কোন জাতীয় কণিকা কি পরিমাণে বর্ত্তমান। সহজ গণনা বলিয়া কেহ কেহ ম্যালেরিয়া পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই তুলনামূলক (differential) গণনাটি করিয়া দেন, কিন্তু মোটসংখ্যা (total) গণনার কষ্টটুকু স্বীকার করিতে চান না। আবার কেহ কেহ মোটসংখ্যার গণনা করিয়া ছাড়িয়া দেন, কিন্তু এই গণনাটুকু করেন না। ইহাতে বৃথা পরিশ্রম হয়, অথচ কিছুই লাভ হয় না, কারণ দুই প্রকার গণনা লইয়া একসঙ্গে বিচার করিয়া না দেখিলে কিছুই অর্থ উপলব্ধি করা যায় না। কেবল মাত্র মোটসংখ্যা গণনার (total count) দ্বারা যথার্থ লিউকোসাইটোসিস্ হইয়াছে কি না বুঝিবার উপায় নাই, এবং কেবলমাত্র হ্রাসবৃদ্ধির পার্থক্য গণনার (differential count) দ্বারা লিউকোপীনিয়া হইয়াছে কি না বুঝিবার উপায় নাই, অথচ রোগ চিনিবার জন্য বিশেষ করিয়া ঐ দুইটির কথাই জানা প্রয়োজন।

এখন দেখা যাউক চারিপ্রকার শ্বেতকণিকার মধ্যে স্বাভাবিক মাত্রা কোনটির কত। অবশ্য উহাদের স্বাভাবিক সংখ্যারও অল্প ইতর-বিশেষ ও পরিবর্ত্তন নিত্যই ঘটিতে থাকে। তথাপি প্রত্যেকের একটা মোটামুটি সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পূর্ণবয়স্ক সুস্থব্যক্তির রক্তে বিভিন্ন জাতীয় শ্বেতকণিকাগুলি এইরূপ অনুপাতে থাকে :—

পলিনিউক্লিয়ার (polynuclears)—	**শতকরা ৬০ হইতে ৭৫**
লিম্ফোসাইট (lymphocytes)—	„ **২৫ হইতে ৪০**
লার্জ মনোনিউক্লিয়ার (large mononuclears)—„	**২ হইতে ৫**
ইওসিনোফিল্ (eosinophiles)—	„ **০ হইতে ২**

কিন্তু শৈশবকালে শ্বেতকণিকাসকল এইরূপ অনুপাতে থাকে না, তখনকার গণনা

স্বভাবতঃই কিছু বিভিন্ন প্রকার হয়। জন্মলাভের পর শিশুর শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যার প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে পলিনিউক্লিয়ারেরও সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখন উহা প্রায় ৮০%। কিন্তু বয়স এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই উহা ক্রমে ক্রমে কমিতে কমিতে প্রায় ৩০% আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পলিনিউক্লিয়ারের অপেক্ষা লিম্ফোসাইটের সংখ্যাই বেশী থাকে,—প্রায় উহা ৫০% পরিমাণেরও উর্দ্ধে যাইতে দেখা যায়। সুতরাং বাল্যাবস্থায় লিম্ফোসাইটের সংখ্যা স্বভাবতঃই অধিক এবং পলিনিউক্লিয়ারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। প্রায় যৌবনোন্মেষ-কাল (puberty) পর্য্যন্ত সকলের অনেকটা এইরূপই থাকে, তৎপরে পূর্ব্বলিখিত স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কেবল পাহাড়ে উচ্চভূমিতে বাস করিবার কালে বয়স্ক-দিগেরও লিম্ফোসাইটের সংখ্যা স্বভাবতঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অতঃপর দেখা যাউক কোন কোন প্রকারের কণিকার সংখ্যা পরিবর্ত্তনের দ্বারা কি কি রোগ সূচিত হয় :—

পলিনিউক্লিয়ার (Polynuclears)—অন্যান্য জাতীয় কণিকা অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা স্বভাবতঃই অধিক, এবং প্রদাহজনিত কোনো রোগ উপস্থিত হইলে আরো অধিক হয়। ইহাদের সংখ্যা ৮০% ছাড়াইলেই বুঝিতে হইবে লিউকোসাইটোসিস্ হইয়াছে। এইগুলিই আসল লিউকো-সাইট-পদবাচ্য। ইহারা বীজাণুভুক্ (phagocytes) এবং দুর্গরক্ষীস্বরূপ সর্ব্বদা রক্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। টক্সিন্‌ঘটিত (toxic) রোগগুলিতে ইহাদের বিশেষ ক্রিয়া নাই, কিন্তু কোনো **সেপ্‌টিক্** (septic) রোগের বীজাণুশক্র সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেই ইহাদের কার্য্য বাড়িয়া যায়, তখন ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

নিউমোনিয়া রোগে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। **মেনিঞ্জাইটিস্** প্রভৃতি রোগে ইহাদের সংখ্যা শতকরা ৯০-এর কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিতে পারে। সে সময় রক্তের স্লাইডে খুঁজিয়া দেখিলে পলিনিউক্লিয়ার লিউকোসাইট ছাড়া আর কোনো প্রকারের শ্বেতকণিকাই প্রায় দেখা যায় না। শরীরের অভ্যন্তরে কোথাও **পূঁজের সূচনা** হইলে ইহাদের সংখ্যা ৯০%এরও উপরে যাইতে দেখা যায়। পেটের কয়েকটি রোগেও ইহাদের সংখ্যা-নির্দ্দেশের দ্বারা বিশেষ সন্ধান মিলিতে পারে। **অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্** রোগে যদি শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যা

খুব বেশী নাও থাকে (হয়তো দশ হাজার বা পনেরো হাজার), কিন্তু যদি পলি-নিউক্লিয়ার কণিকার সংখ্যা শতকরা ৯০-এর কাছাকাছি দেখা যায়, বা উত্তরোত্তর ইহা বাড়িতে দেখা যায়, তবে বুঝিতে হয় যে আশু অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক। **পিত্তকোষ-প্রদাহেও** (cholecystitis) এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। **অন্ত্ররোধ** (intestinal obstruction) উপস্থিত হইলেও ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত রোগ মারাত্মক হইলে পলিনিউক্লিয়ারগুলি দেখিতে অন্যরূপ হইয়া যায়। নিউমোনিয়া, মেনিঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি কয়েকটি বিষাক্ত রোগে মৃত্যুর পূর্ব্বে রক্ত পরীক্ষা করিলে প্রায়ই দেখা যায় ইহাদের চেহারার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন,—তখন ইহাদের ভাঙা ভাঙা ক্ষতবিক্ষত মূর্ত্তি, এবং প্রত্যেকের মধ্যবর্ত্তী-স্থানটুকু বিন্দু বিন্দু আবর্জ্জনায় (coarse granules) পরিপূর্ণ। ইহাদের এইরূপ ভাঙা মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝা যায় রোগী শীঘ্রই মারা যাইবে। জার্ম্মান পরীক্ষকগণ এই কণিকার চেহারার তারতম্য দেখিয়া রোগীর ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই জাতীয় কণিকার কেন্দ্রস্থ বীজ বা নিউক্লিয়াস দুইভাগ হইতে পাঁচভাগে পর্য্যন্ত বিভক্ত (segmented) থাকে। এক বা দুইভাগ-বিশিষ্ট কণিকাগুলি অপরিপক্ক, এবং তিন হইতে পাঁচভাগ-বিশিষ্ট কণিকাগুলি পরিপক্ক। স্বাভাবিক অবস্থায় অপরিপক্ক কণিকার সংখ্যা শতকরা ৪০, এবং পরিপক্কের সংখ্যা শতকরা ৬০ থাকে। অপরিপক্কের সংখ্যা বিষাক্ত অবস্থা (toxaemia) হইলেই বাড়িয়া যায়। সুতরাং অপরিপক্কের সংখ্যা শতকরা ৪০এর উপর হইলেই বুঝিতে হইবে কোনো কঠিন রোগ হইয়াছে। এই প্রকার গণনাকে *Arneth index* বলা হয়। এই *Arneth index*এর উপর বর্ত্তমান ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকেন। ইহার বিশিষ্ট গুণ এই যে যেখানে লিউকোসাইটোসিস্ হয় না (যেমন যক্ষ্মা রোগে) সেখানেও এই গণনা দেখিয়া রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

লিম্ফোসাইট (Lymphocytes)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শিশুদের লিম্ফোসাইটের সংখ্যা স্বভাবতঃই অধিক। যাহাদের শরীরে গণ্ডমালা বা গণ্ড-বৃদ্ধি রোগ থাকে (chronic glandular disease) তাহাদের রক্তে ইহার সংখ্যা বাড়িয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা শ্বেতকণিকার মোটসংখ্যাও বাড়ে। ইহাকে লিম্ফোসাইটোসিস্ বলে।

যে সকল বালকবালিকার **গলগণ্ড** আছে, বা **পুরাতন টন্‌সিল্-বৃদ্ধি**

রোগ (chronic tonsillitis and adenitis) আছে, অথবা যাহাদের **রিকেট্‌স্** (rickets) আছে, তাহাদের রক্তে প্রায়ই এই অবস্থা হয়। কিন্তু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায় **হুপিং কাসি** (whooping cough) রোগে। ইহাতে লিম্ফোসাইটের সংখ্যা শতকরা ৫০।৬০ পর্য্যন্তও হইতে পারে। **বসন্ত** রোগেও (small pox) প্রায় অনুরূপ লিম্ফোসাইটোসিস্ ঘটে।

আর একটি বিশিষ্ট রোগে লিম্ফোসাইটের অতিবৃদ্ধি দেখা যায়, তাহার নাম **লিউকীমিয়া** (lymphatic leukæmia)। ইহাতে শ্বেতকণিকার মোটসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়,—এমন কি পঞ্চাশ ষাট হাজার পর্য্যন্ত হইতে পারে, অথচ তাহার প্রায় সমস্তই লিম্ফোসাইটের সংখ্যাধিক্যের জন্য, অন্য শ্বেতকণিকার স্থান তথায় তুলনায় অতি অল্প। লিম্ফোসাইটের সংখ্যা এই রোগে শতকরা ৭০।৮০ পর্য্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে।

লিউকোপীনিয়া হইয়াও কয়েকটি রোগে লিম্ফোসাইটের কিছু প্রাচুর্য্য দেখা যায়। তন্মধ্যে **কালাজ্বরই** সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহাতে শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যাও কমে, পলিনিউক্লিয়ারগুলির সংখ্যাও কমে, অথচ লিম্ফোসাইটের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বাড়িয়া যায়। এই অবস্থা কিন্তু আরো কয়েকটি তরুণ রোগে হয়; যথা,—**টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডেঙ্গু,**—এবং **পার্নিশাস্ এনীমিয়া** (pernicious anaemia) রোগে। দুইটি পুরাতন রোগেও এইরূপ লিম্ফোসাইট বৃদ্ধি দেখা যায়,—**উপদংশ** (Syphilis) এবং **যক্ষ্মা** রোগে (Tuberculosis)।

লার্জ মনোনিউক্লিয়ার বা মনোসাইট (Large mononuclears or monocytes)—প্রোটোজোয়াজনিত রোগ মাত্রেই এই জাতীয় কণিকা বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে প্রোটোজোয়ার যথেষ্ট আধিপত্য, সুতরাং আমাদের দেশের অনেক রোগেই ইহাদের বৃদ্ধি ঘটিতে দেখা যায়। **ম্যালেরিয়া** তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ম্যালেরিয়াতে এই কণিকা শতকরা ১৫ হইতে ২০ পর্য্যন্ত সংখ্যায় বাড়িয়া যায়। **কালাজ্বরেও** তাহাই হয়। **এমিবা কর্ত্তৃক আমাশা** রোগেও উহা হয়। সুতরাং ইহাদের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগের উপর উঠিলেই প্রোটোজোয়ার সম্ভাবনার কথা মনে করা উচিত। তবে ডেঙ্গু প্রভৃতি কয়েকটি অন্য রোগেও এইগুলির কিছু বৃদ্ধি হয়।

সেপ্‌টিক্ **এণ্ডোকার্ডাইটিস** (endocarditis) রোগেও এগুলি বাড়ে। আবার **টাইফয়েড** জাতীয় রোগেও ইহার কিছু বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহারাও জীবাণুভুক্। অপেক্ষাকৃত বড় বড় আকারের জীবাণুকে খাইয়া ফেলিতে পারে বলিয়া ইহাদের নাম macrophages। ম্যালেরিয়ার রক্ত পরীক্ষা করিতে করিতে অনেক সময় ইহাদের ভিতর ম্যালেরিয়া জীবাণুর ভুক্তাবশিষ্ট-গুঁড়া (melanin pigments) দেখিতে পাওয়া যায়। কালাজ্বর রোগীর রক্তের স্লাইড লইয়া যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে এক একটি মনোসাইটের মধ্যে কালাজ্বরের জীবাণুও দেখিতে পাওয়া যায়; অবশ্য তাহার জন্য যথেষ্ট অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

ইওসিনোফিল (Eosinophiles)—**ক্রিমি** বা হেলমিন্থ্ কর্ত্তৃক রোগ মাত্রেই ইওসিনোফিল্‌গুলি সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়।

হুকওয়ার্ম, রাউণ্ডওয়ার্ম, ফিতাক্রিমি প্রভৃতি যে কোনো ক্রিমির আক্রমণ হইলেই ইওসিনোফিলের সংখ্যা বাড়ে। **ফাইলেরিয়া** ঘটিত রোগেও এ-গুলির যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এ-ছাড়া **হাঁপানি রোগে** (bronchial asthma) ইহাদের অতিবৃদ্ধি হয়,—তখন উহার সংখ্যা শতকরা ৫০।৬০ পর্য্যন্ত হইতে পারে,—এবং এইরূপ ইওসিনোফিলিয়া হওয়ার জন্য শ্বেতকণিকার মোট-সংখ্যাও হাঁপানি রোগে খুব বাড়িয়া যায়। **আমবাত** জাতীয় কয়েক প্রকার অসুস্থতা (anaphylaxis) হইলেও ইহাদের বৃদ্ধি ঘটে। এ-ছাড়া কোনো কোনো চর্ম্মরোগেও ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়,—যথা **একজিমা, সোরায়াসিস্** (psoriasis) ইত্যাদি। কালাজ্বরে ইওসিনোফিলের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়। কয়েকটি কঠিন রোগেও ইহার সংখ্যা কমিয়া যায়; আবার আরোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি বাড়িতে দেখা যায়। সুতরাং কালাজ্বর, এনীমিয়া প্রভৃতি রোগে যদি ইওসিনোফিল দেখা দেয়, তাহা শুভ লক্ষণ।

আমরা মোটামুটিভাবে নানা রোগের নানারূপ রক্ত-লক্ষণের কথা ব্যক্ত করিলাম। জ্বরের পরিচয় সম্পর্কে এই সকল রক্তকণিকা-গণনার ফলাফল বিচারের কথা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে এগুলি ভাল করিয়া জানা থাকিলে রোগ চিনিবার বিশেষ সুবিধা হয়। চিকিৎসক এ পরীক্ষা নিজে না করিতে পারিলেও অন্য কেহ যদি করিয়া দেয় কিংবা কোনো ল্যাবোরেটরি হইতে রোগীর রক্তপরীক্ষার ফলাফল লিখিত হইয়া আসে,

তবে এইগুলি জানা থাকিলে চিকিৎসক তাহা হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। অতএব বর্ত্তমান কালের চিকিৎসক মাত্রেরই জানিয়া রাখা দরকার এইরূপ রক্তপরীক্ষার দ্বারা কি কি সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে এইরূপ রক্তকণিকা-গণনার দ্বারা যে জ্বর আপাততঃ অনিশ্চিত বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহাকে কোনো একটি বিশিষ্ট পংক্তির মধ্যে ফেলা যাইতে পারে। অন্ততঃ এটুকু প্রায়ই বোঝা যাইতে পারে যে উহা কোনো সংক্রামক বীজাণুঘটিত ব্যাধি, অথবা কোনো প্রোটোজোয়া-ঘটিত গ্রীষ্মপ্রধানদেশসুলভ ব্যাধি। ইহাতেও আমাদের যথেষ্ট লাভ, কারণ তখন চিকিৎসা করিবার একটা কিনারা পাওয়া যায়। যেখানে প্রবল জ্বর চলিতেছে এবং লাক্ষণিক চিকিৎসায় ফল হইতেছে না, সেখানে ম্যালেরিয়া হইল কি টাইফয়েড হইল কি সেপ্‌টিক রক্তদুষ্টি ঘটিল, ইহা না বুঝিয়া আর কোনো দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না,—এবং সে স্থলে এইরূপ রক্তপরীক্ষা আমাদের কতক ইঙ্গিত দিতে পারে।

কিন্তু তবু এই সকল রক্তপরীক্ষার ফলাফল হইতে যে সিদ্ধান্ত আসে তাহাই নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া চলিবে না। বিচারের দ্বারা ইহার অর্থ বুঝিয়া দেখিতে হইবে তবেই ইহার নির্দ্দেশ স্বীকার করিয়া লওয়া চলিবে, এই কথাটুকু বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। মনে করুন একটি লোকের কালাজ্বর হইয়াছে এবং তাহার ব্রঙ্কাইটিসও আছে; সেইজন্য তাহার রক্তপরীক্ষায় হয়তো লিউকোপীনিয়া পাওয়া গেল না; সে স্থলে লিউকোপীনিয়া নাই সুতরাং কালাজ্বর নয়, এরূপ বিবেচনা করিলেই ভুল হইবে। কিংবা মনে করুন একটি এনীমিয়া (রক্তশূন্যতা) রোগীর লিউকোপীনিয়া আছে দেখা গেল; তাহার শরীরে রক্তই কম, সেইজন্য তাহার শ্বেতকণিকার সংখ্যাও স্বভাবতঃই কম রহিয়াছে,—সেই কথাটির বিচার না করিয়া সংখ্যার হ্রাস দেখিবামাত্র যদি কালাজ্বর মনে করা হয় তবে তাহাও ভুল হইবে। এরূপ স্থলে কালাজ্বরের অন্যান্য বিশিষ্ট পরীক্ষাগুলি না করিয়া কিছুতে বলা যাইতে পারেনা উহা কালাজ্বর কি না। রোগী না দেখিয়া বা রোগীর অবস্থা না বুঝিয়া কেবল কণিকাসংখ্যার তারতম্য হইতে

কখনো বলা যাইতে পারে না রোগটি কি, কারণ একরূপ গণনার নানারূপ অর্থ হইতে পারে।

আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক। নিউমোনিয়াতে যে খুব বেশী লিউকোসাইটোসিস্ হয় ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু একটি কালাজ্বর রোগীর যদি নিউমোনিয়ার আক্রমণ হয়,—সে স্থলে ওরূপ লিউকোসাইটোসিস্ প্রত্যাশা করা চলিবে না। হয়তো সেখানে শ্বেতকণিকার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প কিছু বাড়িতে পারে, কিংবা তেমন নাও বাড়িতে পারে; কিন্তু এরূপ স্থলে লিউকোসাইটোসিস্ নাই দেখিয়া বলা চলিবে না যে নিউমোনিয়া হয় নাই; সেখানে বুক পরীক্ষার দ্বারাই উহা বুঝিতে হইবে। অপরপক্ষে মনে করুন একজন পুরাতন হাঁপানিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্রঙ্কাইটিস ও জ্বর হইয়াছে; তাহার লিউকোসাইটের সংখ্যা স্বভাবতঃই বেশী ছিল, এই নূতন রোগের আক্রমণে তাহা আরো কিছু বাড়িয়া গেল,—হয়তো বিশ ত্রিশ হাজার হইল। ইহা দেখিয়া যদি এখানে নিউমোনিয়া মনে করেন তবে ভুল হইবে। এ স্থলে তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস, তাহার ইওসিনোফিলের গণনা এবং তাহার বুকের অবস্থা সমস্ত বুঝিয়া ঐ লিউকোসাইটোসিসের অর্থ করিতে হইবে।

মোট কথা একটি বা দুইটি মাত্র চিহ্ন হইতে কোনোই সিদ্ধান্ত করা যায় না। সন্দেহস্থলে সমস্ত চিহ্ন একত্র করিয়া সকল দিক হইতে যে রোগ সম্ভাব্য বলিয়া বোধ হয় তাহাই গ্রহণ করিতে হয়। যেরূপ রক্তপরীক্ষার কথা আমরা বলিলাম তাহাও পরোক্ষভাবে কতকগুলি চিহ্নের নির্দ্দেশ করে মাত্র। বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার অর্থ করিতে পারিলে এই চিহ্নের দ্বারা অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। অনেক সময় ইহা আমাদের অনেক ভুল পথ হইতে নিবৃত্ত করে। কিন্তু ইহার উপর বেশী দাবী করা চলে না। তথাপি আমরা এই পরীক্ষার উপর এত ঝোঁক দিলাম এইজন্য যে আঙুল হইতে সামান্য এক ফোঁটা রক্ত লইলেই তাহার দ্বারা অনেক সন্ধান মিলিতে পারে, অথচ এই পরীক্ষা করা অতি সহজ। তবে বলাবাহুল্য ইহাই যথেষ্ট পরীক্ষা নয়। যেখানে প্রথম হইতেই জ্বর প্রবলরূপে দেখা দিয়াছে—এবং যেখানে অনুসন্ধানের দ্বারা উহার কারণ বুঝা যাইতেছে না,—

সেখানে যদি সুবিধা থাকে তবে রক্তের কাল্‌চার করিয়া দেখাই সর্ব্বোত্তম পন্থা। রক্তের কাল্‌চার হইতে যদি কোনো বীজাণু বাহির হয়, তবে তাহাই যে জ্বরের কারণ এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ থাকে না। অতএব রক্তের কাল্‌চার সম্বন্ধেও কতকগুলি কথা আমাদের জানিয়া রাখা উচিত।

রক্তের কাল্‌চার পরীক্ষা

সুস্থ অবস্থায় রক্তের মধ্যে বীজাণু থাকিতে পারে না। সেইজন্য জীবের রক্তকে ষ্টেরাইল (sterile) বা বীজাণুশূন্য বলা হইয়া থাকে। কেবল বীজাণুর আক্রমণের দ্বারা রোগ জন্মিলে সেই বীজাণু যদি রক্তের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে তবেই তাহা কাল্‌চারে পাওয়া যায়। রক্তে বীজাণু প্রবেশ করিলে তাহাকে ব্যাক্‌টিরীমিয়া (bacteraemia) বলা হয়। সকল প্রকার বীজাণুর রক্তে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা বা প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং সকল রোগেই যে রক্তের কাল্‌চারে বীজাণু পাওয়া যাইবে তাহা নয়। * যে রোগগুলিতে পাওয়া সম্ভব তাহা বলিতেছি ঃ—

(১) **টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড**—জ্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে রক্তের কাল্‌চার করিলে এই রোগের বীজাণু তাহাতে নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। যদি একবার কাল্‌চার করিলে না পাওয়া যায়, তবে দ্বিতীয়বার কাল্‌চার করিলে তাহা পাওয়া যাইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথম সপ্তাহের মধ্যে টাইফয়েড জাতীয় রোগ চিনিবার পক্ষে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

(২) **কক্কাই (cocci) জাতীয় বীজাণুর রোগে**—যথা ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাই, ষ্ট্যাফিলোকক্কাই, মেনিঙ্গোকক্কাই প্রভৃতির আক্রমণে। এই সকল কক্কাইয়ের দ্বারা অনেক বিষাক্ত জ্বরের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বোক্ত দুইপ্রকার **সেপ্‌টিক্** বীজাণু (Strepto and Staphylo) প্রায়ই কোনো স্থানীয় প্রদাহ

* একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে কেবল বীজাণুঘটিত ব্যাধিগুলিতেই রক্তের কাল্‌চার হওয়া সম্ভব, অন্য কোনোপ্রকার ব্যাধিতে নয়। আল্‌ট্রা-মাইক্রোস্কোপিক ভাইরাসের দ্বারা যে সকল ব্যাধি হয় (যেমন বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি), তাহাতে যথেষ্ট রক্তদুষ্টি থাকিলেও কাল্‌চার করিয়া কোনো লাভ নাই। টক্সিন্‌ঘটিত ব্যাধিতেও কাল্‌চারে কিছু পাওয়া যাইবে না।

হইতে রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া রক্ত দূষিত করে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রসবের পর প্রসূতির জ্বর (puerperal fever)। ঘা, ফোঁড়া হইতেও এইরূপ রক্তদুষ্টি হইতে পারে,—যথা পাঈমিয়া (pyæmia) রোগে। আরো কয়েকটি কক্কাইজাতীয় বীজাণু রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তবে এই সকল রোগ হইলেই যে রক্তের কাল্‌চারে বীজাণু নিশ্চিত পাওয়া যাইবে এরূপ নয়। যেখানে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে সেখানে রোগটি অতীব গুরুতর।

(৩) **কয়েকপ্রকার ব্যাসিলাই জাতীয় বীজাণুর রোগে**—যেমন অ্যানথ্রাক্স ও প্লেগ রোগে। কখনো কখনো টাইফয়েড বীজাণুর জাতীয় অথচ তাহার অপেক্ষা অল্প বিষাক্ত কয়েক প্রকার ব্যাসিলাইকেও রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। তাহারাও টাইফয়েডের মত জ্বরের সৃষ্টি করে এবং রক্তের কাল্‌চার করিয়াও তাহাদের পাওয়া যায়। যথা কোলাই বীজাণু।

অতএব রক্তের কাল্‌চার করিলে অনেক প্রকার রোগ ধরা পড়িয়া যাওয়া সম্ভব। কাল্‌চারে কিছু না পাওয়া গেলে অবশ্য কিছুই সাহায্য হয় না, কিন্তু বীজাণু পাওয়া গেলে রোগটি যে তাহার দ্বারাই প্রসূত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না, এবং রোগের গুরুত্বও উপলব্ধি করা যায়। এই জন্য সুবিধা থাকিলে রোগবিশেষে রক্তের কাল্‌চার করানো অতি উত্তম। কি কি অবস্থায় রক্তের কাল্‌চারের ব্যবস্থা উচিত তাহা সকলের জানিয়া রাখা দরকার। ঃ—

(ক) যে কোনো **রেমিটেণ্ট** বা **কণ্টীনিউড** প্রকৃতির (টাইফয়েডের মত) জ্বরে প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই রক্তের কাল্‌চার করানো উচিত।

(খ) **প্রসবের পর** যে জ্বর ১০১ ডিগ্রীর উপর ওঠে ও যাহা ৪৮ ঘণ্টার পরেও কমে না, এবং যাহা ম্যালেরিয়াও নয়, অর্থাৎ কুইনিনাদি দিয়াও যদি সে জ্বর কমানো না যায়।

(গ) রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রে (হার্টে) যদি বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায় এবং স্যালিসিলেট (Salicylates) প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়াও যদি সে জ্বর কমানো না যায়।

সেপ্‌টিক্ বা ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট এণ্ডোকার্ডাইটিস (malignant

endocarditis) নামক একপ্রকার মারাত্মক হৃদ্‌রোগ আছে, প্রায়ই তাহা ষ্ট্রেপ্‌টোককাই কর্তৃক সৃষ্ট হইতে দেখা যায়। এই দারুণ ব্যাধি হৃদ্‌যন্ত্রকে নষ্ট করিয়া ফেলে এবং এই রোগে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য। ইহাতে বহুদিন যাবৎ প্রবল জ্বর ভোগ হইতে থাকে, কোনো উপায়েই সে জ্বর দমন করা যায় না। ইহাতে জ্বর ও হৃদয়ের দোষ ছাড়া আর একটি লক্ষণ প্রায় দেখা যায়,—প্লীহাটি অল্পে অল্পে বাড়ে। সুতরাং উহাকে প্রথমে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর বলিয়া সন্দেহ হয় এবং নানারূপ চিকিৎসাও করা হয়। কিন্তু তাহা সমস্তই নিষ্ফল হয়। এইরূপ রোগ সন্দেহ হইলেই রক্তের কাল্‌চার করিয়া দেখা উচিত।

(ঘ) গায়ে যদি কোথাও কোনো ক্ষত থাকে এবং কম্প দিয়া বার বার প্রবল জ্বর আসিতে থাকে তবে রক্তের কাল্‌চার করিয়া দেখা উচিত। কোনো **অস্ত্রোপচারের পর** যদি প্রবল জ্বর হয়, যদি তাহা ম্যালেরিয়া না হয় ও ৪৮ ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে কাল্‌চারের ব্যবস্থা করা উচিত। কেবল তাহাই নয়, যে কোনো কম্পযুক্ত প্রবল জ্বর, যাহা ম্যালেরিয়া নয় এবং যাহার কারণ বুঝা যাইতেছে না, সুযোগ থাকিলে তাহার রক্তের কাল্‌চার করানো অতি উত্তম।

(ঙ) প্রথম হইতেই যাহা **কালাজ্বর** বলিয়া মনে হইতেছে, যাহা ম্যালেরিয়া নয় বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, এদিকে ক্রমে ক্রমে প্লীহা বাড়িতেছে এবং লিউকোসাইটের সংখ্যা কমিতেছে, অথচ কালাজ্বরের সিরাম পরীক্ষাদির দ্বারা কোনরূপ চিহ্ন পাওয়ার তখনও সময় হয় নাই, এরূপ স্থলে রক্তের উপযুক্তরূপ কাল্‌চার করিলে কালাজ্বর কিনা জানিতে পারা যায়। অবশ্য কালাজ্বরের জীবাণুর জন্যই এস্থলে কাল্‌চার করিতে হইবে ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা দরকার, কারণ প্রোটোজোয়া কাল্‌চারের ব্যবস্থা বীজাণু কাল্‌চারের ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

রক্তের কাল্‌চার করিতে হইলে সকল রোগের তরুণ অবস্থাতেই তাহা করা উচিত, পুরাতন অবস্থায় করিয়া বিশেষ ফল হয় না। কাল্‌চারের জন্য রক্ত লইতে হইলে জ্বরের বৃদ্ধির সময় তাহা লওয়া উচিত, অথবা কম্পের সময় রক্ত লইতে পারিলে আরো উত্তম। জ্বর কম থাকিবার কালে

রক্ত লইলে প্রায় বিফল হইতে হয়। রক্ত লওয়ার সময় জ্বর অন্ততঃ ১০১ ডিগ্রী হইতে ১০৩° ডিগ্রীর মধ্যে থাকা আবশ্যক। যিনি রক্তের কাল্‌চার করিবেন তাঁহাকে দিয়াই রক্ত লইতে হয়, কারণ রক্ত লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা কালচার্‌-মীডিয়ার (গ্লুকোজ্‌ ব্রথ্‌ প্রভৃতি) মধ্যে ভরিয়া দিতে হয়, নতুবা চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা; এ ছাড়া রক্ত লইতে অত্যন্ত সাবধানতার আবশ্যক, নতুবা বাহিরের বীজাণু উহার মধ্যে অনায়াসে সংক্রামিত (contaminated) হইয়া যাইতে পারে। রক্ত কাল্‌চার সম্বন্ধে এই কথাগুলি সকলেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক।

কাল্‌চার ছাড়া রক্তের অন্যান্য পরীক্ষাও কখন কিরূপে করানোর নিয়ম আছে তাহাও জানিয়া রাখা উচিত। টাইফয়েডের জন্য **ভিডাল (Widal) পরীক্ষা** জ্বরের **দশ দিন** অতিক্রম না হইলে করাইয়া প্রায়ই কিছু ফল পাওয়া যায় না। কালাজ্বরের **সিরাম পরীক্ষা** অন্ততঃ **তিন সপ্তাহ** জ্বরভোগের পর করাইতে হয়। **সিফিলিসের** রক্তপরীক্ষা রোগ দেখা দিবার **ছয় সপ্তাহের** পর করানো উচিত। শিরা হইতে রক্ত লইয়া শুষ্ক টেষ্ট্‌ টিউবে ভরিয়া ল্যাবোরেটরিতে পাঠাইয়া দিলে এই পরীক্ষাগুলি হইতে পারে। কিরূপে রক্ত লইয়া পাঠাইতে হইবে তাহাও উত্তমরূপে জানিয়া রাখা দরকার।

অন্যান্য পরীক্ষা

জ্বর চিনিবার জন্য কেবল নয়, জ্বরের অবস্থা বুঝিবার জন্য ও রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য আরো কয়েক প্রকার পরীক্ষার আবশ্যক হইতে পারে। পরীক্ষা বহুবিধ আছে এবং যতই করা হইবে ততই তথ্য সংগ্রহ হইবে ইহা সত্য বটে, কিন্তু এস্থলে আমরা কতকগুলি সহজ পরীক্ষার কথাই বলিতেছি, যেগুলি সকলের দ্বারাই করা সম্ভব, অথচ যাহা হইতে অনেক মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। **প্রস্রাব পরীক্ষা** ইহার মধ্যে একটি। রোগীর প্রস্রাব চাক্ষুষ দেখিতে কিরূপ, উহা অ্যাসিড অথবা অ্যাল্‌কালাইন, উহাতে অ্যাল্‌বুমেন আছে কি না, এটুকু অন্ততঃ প্রত্যেক চিকিৎসকের অবশ্য দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন, এবং ইহা হইতেও অনেক সময় যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। সম্ভব হইলে প্রস্রাব

মাইক্রোস্কোপের দ্বারা দেখা উচিত উহাতে কাস্ট (casts) প্রভৃতি আছে কি না। এই সকল তথ্য জানিতে পারিলে চিকিৎসার যথেষ্ট সুবিধা হয়।

গলায় অথবা অন্য কোথাও ঘা থাকিলে তাহার অল্প রস লইয়া মেথিলিন ব্লু দিয়া রং করিয়া মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করাও কিছু কঠিন নয়। ইহাতেও চিকিৎসার অনেক সুরাহা হইতে পারে। বুকে কাসির দোষ থাকিলে **গয়ার পরীক্ষা** করিয়া দেখাও বিশেষ কঠিন নয়, এবং যক্ষ্মারোগের বীজাণু বা অন্যান্য বীজাণু যদি ফুস্‌ফুস্ আক্রমণ করিয়া থাকে তবে এই পরীক্ষায় অনায়াসে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। পেটের কোনো দোষ আছে সন্দেহ হইলে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে **মলপরীক্ষাও** সকলের পক্ষে করা সম্ভব। এমিবা প্রভৃতি জীবাণু অথবা ক্রিমি থাকিলে তাহার ডিম (ova) উহাতে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ততঃ এই সহজ পরীক্ষাগুলি করিতে যদি চিকিৎসক অভ্যাস করেন তবে তিনি যে চিকিৎসায় অধিকতর সাফল্য লাভ করিবেন এবং অধিকাংশ রোগই চিনিয়া লইতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিকিৎসাকে যিনি ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে এই আনুষঙ্গিক বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করিতেই হইবে, নতুবা অসম্পূর্ণ চিকিৎসা করিয়া নিজেরই মনে অসন্তুষ্টি জন্মিতে থাকিবে।

সহজ বুদ্ধিতে রোগ মীমাংসা

সব পরীক্ষার শেষে সহজ বুদ্ধিকে রোগ বিচার করিবার ভার দিতে হইবে। অনেকে মনে করেন সহজ ব্যাধি চেনা খুবই সহজ এবং কঠিন ব্যাধি চেনাই কঠিন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। অনেক সময় কঠিন ব্যাধি সহজেই চিনিতে পারা যায়, কিন্তু সহজ ব্যাধিই চেনা কঠিন হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন যে ব্যাধিমাত্রেই বৈচিত্র্য আছে। সহজ ব্যাধিতেও দু একটি লক্ষণ এমন দেখা যায় যাহাতে অনেক সময় মনে হয় বুঝি কোনো একটি কঠিন ব্যাধি হইয়াছে। অথচ কঠিন ব্যাধির সহিত সম্পূর্ণ না মেলাতে চিকিৎসককে কিছু দ্বিধার মধ্যে পড়িতে হয়। সুতরাং কোনো লক্ষণকেই "ও কিছু নয়" বলিয়া

উড়াইয়া দেওয়াও উচিত হয় না, আবার সামান্য কিছু বৈচিত্র্য দেখিবামাত্র প্রথম হইতেই তাহাকে বিপজ্জনক বলিয়া মত প্রকাশ করিলে তাহাও বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতে পারে, এবং হাস্যাস্পদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মোট কথা কি উপায়ে রোগ মীমাংসা নির্ভুল হওয়া সম্ভব, তাহা বলিয়া দিবার কোনো উপায় নাই। পরীক্ষাদির পর শেষ পর্য্যন্ত আপন অভিজ্ঞতা ও বিচারশক্তির দ্বারাই তাহার মীমাংসা করিয়া লইতে হয়।

বিভিন্ন জ্বরের প্রচ্ছন্নকাল (Incubation period)

কোন জ্বরের প্রচ্ছন্নকাল কতদিন ইহা আমাদের জানিয়া রাখা দরকার। রোগের বীজ যেইমাত্র শরীরে প্রবেশ করে তখনই রোগ প্রকাশ পায় না, প্রায়ই কিছু বিলম্ব ঘটে। বীজ প্রবেশ করার সময় হইতে রোগ প্রকাশ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত যে অন্তরালবর্ত্তী সময়, তাহাকেই রোগের প্রচ্ছন্নকাল বা incubation period বলা হয়। প্রত্যেক রোগের প্রচ্ছন্নকাল বিভিন্ন, এবং পরীক্ষার দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ নিয়মিত বিলম্বের কারণ কি তাহা এখনও ভাল করিয়া জানা যায় নাই। কেহ বলেন বীজাণুর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট সীমা (threshold) অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত জ্বর দেখা দেয় না,—কেহ বলেন বীজাণুর সঙ্গে জীবনীশক্তির সংগ্রাম ঘোরতর না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বর হয় না। যে জন্যই হউক, এ কথা নিশ্চয় যে এই অন্তরালবর্ত্তী সময়ের মধ্যে কোনো বাহ্যিক লক্ষণ না দেখা গেলেও ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া চলিতে থাকে, এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইলেই রোগের স্বরূপ প্রকাশ হয়।

বিভিন্ন রোগের প্রচ্ছন্নকাল জানা থাকিলে তাহা আমাদের অনেক কাজে লাগে। ইহাতে রোগের সংক্রমণ নিবারণ করিতে পারা যায় এবং সময়মত চেষ্টা করিলে বহু ব্যক্তিকে রোগের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়। যেমন মনে করুন বসন্ত রোগের প্রচ্ছন্নকাল ১২ দিন, এ-কথা যদি জানা থাকে তবে যে বাড়ীতে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে সেখানে ১২ দিনের মধ্যে যতশীঘ্র সম্ভব অন্যান্য সকলকে টিকা দিতে পারিলে তাহারা রোগ হইতে নিস্তার পাইতে পারে। কেবল তাহাই নয়, জনহিতের জন্যও ইহা

জানিয়া রাখা দরকার, কারণ যাহারা সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসে, তাঁহাদের যদি উহার প্রচ্ছন্নকাল অতিক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত কোনো পৃথক স্থানে রাখা যায় (quarantine) এবং ঐ সময়ের মধ্যে রোগ দেখা না দিলে পরে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে রোগটি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে না। কয়েকটি রোগের প্রচ্ছন্নকাল এখানে উল্লিখিত হইল:—

হাম—১০ দিন।	মাম্প্স্—১৭ হইতে ২১ দিন।
পানিবসন্ত—১০ দিন হইতে ২০ দিন।	হুপিং কাসি—৬ হইতে ১৪ দিন।
বসন্ত—১২ দিন।	ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—৩ হইতে ৪ দিন।
ডিফ্‌থীরিয়া—২ হইতে ৬ দিন।	ডেঙ্গু—২ হইতে ৬ দিন।
কলেরা ও	টাইফয়েড—১০ দিন হইতে ৩ সপ্তাহ।
ব্যাসিলারি ডিসেন্টেরি—২৪ ঘণ্টা।	মেনিঞ্জাইটিস্—১ হইতে ৫ দিন।

জ্বর চিকিৎসার সাধারণ বিধি

(কলিকাতার কোনো প্রখ্যাতনামা প্রবীণ চিকিৎসকের বাণী সংগ্রহ করিয়া এই অধ্যায় লিখিত)

জ্বর চিকিৎসা বলিতে কেবল জ্বরটি বন্ধ করিবার প্রয়াস কখনই বুঝায় না। জ্বর চিকিৎসার মাত্র দুই প্রকার উদ্দেশ্য থাকিবে। প্রথমতঃ, যে কারণে জ্বর হইয়াছে সেই মূল কারণটি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বেশীর ভাগ জ্বরই কোনোরূপ আগন্তুক রোগবীজ সংক্রমণের দ্বারা ঘটিয়া থাকে,—অতএব সেই নির্দ্দিষ্ট শত্রুকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ও তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাকেই বলে specific treatment বা নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা। যে রোগের যে নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা, রোগ স্থির করিয়া তাহার পক্ষে তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে। এ-সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলা যায় না, বিভিন্ন রোগ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসাবিধি নির্দ্দেশ করা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, জ্বরের দ্বারা শরীরের যাহা কিছু অনিষ্ট হইতেছে বা অপচয় ঘটিতেছে এবং রোগীর যে সকল কষ্ট অনুভূত হইতেছে সেগুলিকে একে একে দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জ্বর যতক্ষণ পর্য্যন্ত দমন করিতে না পারা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বরের যে সকল কষ্ট ও গ্লানি থাকে, সাধারণভাবে সেগুলি দূর করিবার যে চেষ্টা করা হয় তাহার নাম symptomatic treatment বা লাক্ষণিক চিকিৎসা। জ্বর যদিও একপক্ষে উপকারী বটে, তথাপি জ্বরের দ্বারা শরীরে নানাপ্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য আসে, দুর্ব্বলতা আসে, এবং বেশী জ্বর হইলে শরীরের যন্ত্রসকল তাহার অতিরিক্ত ক্লেদ দূর করিতে অসমর্থ হয়, ও সেই সকল বিষাক্ত পদার্থ জমিয়া থাকাতে হৃদয়, মস্তিষ্ক প্রভৃতি প্রধান যন্ত্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব জ্বর যতদিন চলিতে থাকে এবং বিশিষ্ট বা স্পেসিফিক্ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেও ফল পাইতে যতদিন বিলম্ব ঘটে, অথবা যেখানে কোনো স্পেসিফিক্ চিকিৎসার নির্দ্দেশ নাই, এরূপ স্থলে চিকিৎসক

নানা উপায়ে ততদিন কেবল চেষ্টা করিতে থাকেন যাহাতে কোনো অনিষ্ট না হইতে পারে এবং যন্ত্রসকল বিকল হইয়া না পড়ে। বহুবিধ উপায়ের দ্বারা ইহার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এক প্রকার সাময়িক কার্য্যবিধি স্থির করিয়া লওয়া উচিত,—যাহার মূল সূত্র হইবে সর্ব্বপ্রকারে শরীর হইতে জ্বরের বিষগুলি নিষ্কাশনের (elimination) বন্দোবস্ত করা।

এখানে কেবল ঐ সকল লাক্ষণিক চিকিৎসাই সাধারণভাবে বিবৃত করা হইতেছে। বলা বাহুল্য এইরূপ চিকিৎসার কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম করিয়া দেওয়া চলে না। কারণ কোন ঔষধটি লক্ষণবিশেষের পক্ষে অধিকতর উপকারী মনে হয়, কোনটির সহিত কোনটি মিলাইলে ক্রিয়া ভাল হয়, কোন মাত্রায় কোন ঔষধ উৎকৃষ্ট ক্রিয়া দেখায়, ইত্যাদি অনেক কথা ক্ষেত্র হিসাবে বিচার করিতে হয়। তবে অধিকাংশ চিকিৎসক যেরূপ ব্যবস্থায় অধিকতর ক্ষেত্রে ফল পাইয়া থাকেন তাহাই এখানে উক্ত হইতেছে।

প্রথম ব্যবস্থা

জ্বরের প্রথমেই **কোষ্ঠ পরিষ্কারের** ব্যবস্থা করা উচিত। সাধারণতঃ সকল রোগেই ইহা করা যাইতে পারে, এমন কি টাইফয়েড রোগেও অতি প্রথম অবস্থায় ইহা উপকারই করে, অপকার করে না। কেবল মাত্র একটি রোগে বিরেচক বা পার্গেটিভ ঔষধ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ,—তাহা অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্। এ ছাড়া **সকল প্রকার জ্বরেই** প্রথমে একবার পেট পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত।

বিভিন্ন চিকিৎসক বিভিন্ন রকম জোলাপ ব্যবহারের পক্ষপাতী, কিন্তু জ্বরের সময় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আগে **ক্যালোমেল** দিয়া পরে কোনো **সেলাইন্** বা লবণজাতীয় জোলাপ (saline purgatives) প্রয়োগ করা। জ্বরের সময় এক প্রকার জোলাপে ভাল কাজ হয় না, সেই জন্য দুই প্রকার ঔষধের প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ক্যালোমেল পিত্তকে তরল করে এবং ক্ষুদ্র অন্ত্রকে (small intestines) উত্তেজিত করে, আর সেলাইন-জোলাপ অন্ত্রগাত্র হইতে রস টানিয়া বৃহৎ অন্ত্রের আবর্জ্জনাগুলিকে ধুইয়া

বাহির করিয়া দেয়। সুতরাং এই দুই প্রকার ঔষধের প্রয়োগে জোলাপের ক্রিয়া অসম্পূর্ণ হইতে পারে না।

ক্যালোমেল একবারে ২ গ্রেন মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা উহা **ভগ্নাংশ মাত্রায়** (fractional dose) দুইবারে বা চারিবারে দিতে পারিলে ফল অনেক ভাল হয়। একবারে ২ গ্রেন মাত্রায় যে কাজ না করিতে পারে, ¼ গ্রেন মাত্রায় উহা চারিবার দিলে সর্ব্বসমেত এক গ্রেন হইলেও উহাতে তদপেক্ষা অধিক ফল হয়। অতএব প্রতি মাত্রায় ¼ গ্রেন ক্যালোমেল অল্প সোডা বাইকার্বের সহিত মিলাইয়া চারিটি পুরিয়া সন্ধ্যার সময় একঘণ্টা বা আধঘণ্টা অন্তর খাইতে দিয়া পরদিন প্রাতে যে-কোনো সেলাইন-জোলাপের ব্যবস্থা করাই উত্তম। এজন্য সাধারণতঃ **ম্যাগনিসিয়াম্ সাল্‌ফেট** (২ ড্রাম হইতে ৪ ড্রাম) দেওয়া চলিতে পারে, অথবা **সিড্‌লিজ্ পাউডার** (Seidlitz powder) বা ফ্রুট্ সল্ট্ জাতীয় যে-কোনো ঔষধ দেওয়া যায়।

ছেলেদের পক্ষে এরূপ জোলাপ না দিয়া **ক্যাষ্টর অয়েল** দেওয়াই উত্তম। ইহা ছেলেদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। ছেলেদের সামান্য দুই এক দিনের জ্বর প্রায় ক্যাষ্টর অয়েল দিলেই ছাড়িয়া যায়। শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে বা লিভারের রক্তচলাচল সাময়িক আবদ্ধ হওয়াতে প্রায়ই জ্বর হইতে দেখা যায়, এবং জোলাপ দিলেই তাহা আরোগ্য হয়। এইজন্য শিশুদিগকে অনেকে গ্রে পাউডারের (Hydrarg. cum creta) পুরিয়া দিয়া থাকেন, এবং ইহাতেও বেশ উপকার হয়। অনেকে অ্যাল্‌কালাইন্ মিকশ্চারের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন, তাহাতেও পিত্তদোষ দূর হইয়া ও প্রস্রাব বৃদ্ধি হইয়া শীঘ্রই জ্বরত্যাগ হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত সর্দ্দিকাসির লক্ষণ দেখা গেলে প্রথম হইতে তাহার ব্যবস্থা করিলেও শীঘ্রই জ্বর ছাড়িয়া যাইতে পারে ও রোগীকে অধিক দিন ভুগিতে হয় না। এইরূপে সাময়িক ব্যবস্থার দ্বারা অনেক জ্বরই বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু যে জ্বর এক সপ্তাহের মধ্যে ছাড়িল না তাহার জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

জ্বরের অন্যান্য কষ্ট লাঘব করিবার জন্য নানারূপ প্রাথমিক ব্যবস্থা আছে। তবে উপস্থিত কষ্টলাঘবের জন্য কয়েকটি ঔষধ কেবল প্রথম

অবস্থাতেই প্রযোজ্য, কারণ প্রথম অবস্থাতেই জরের কষ্ট বেশী হয় এবং শরীরের তেজ তখনও কতকটা স্বাভাবিক থাকে বলিয়া এগুলি তখন প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরে এগুলির ব্যবহার হানিকর। যেমন **অ্যাস্পিরিন** (aspirin)। নূতন জরে মাথার যন্ত্রণাদি নিবারণ করিবার জন্য ইহা ২।৩ গ্রেন মাত্রায় দুই চারিবার পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অধিক এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

ঘুমের জন্য প্রথম প্রথম **ব্রোমাইড**ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে প্রয়োজন হইলে ইহা একবার মাত্র কেবল ঘুমের সময় রাত্রিকালে ব্যবহার করা উচিত। তাহাতেই ইহার উপকারিতা পাওয়া যায়। অনেকে জরের মিকশ্চারের সহিত নিয়মিত ভাবে ব্রোমাইড ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু মেনিঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ রোগ ভিন্ন ইহার নিত্য ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নাই। আর প্রত্যহই ঘুমের জন্য নিয়মিত ব্রোমাইড ব্যবহার করিতে থাকিলে উহাতে কোনো ফলও হয় না, কারণ একই প্রকার ঘুমের ঔষধ দুই তিন দিন দিলেই উহা অভ্যস্ত হইয়া যায়। সেই জন্য ঘুমের ঔষধ প্রায়ই বদল করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়।

জ্বরের মিকশ্চার

রীতিমত জর হইতে থাকিলে, অর্থাৎ কোনোরূপ স্থায়ী জর দাঁড়াইলে উহার গ্লানি দূর করিবার জন্য লাক্ষণিক চিকিৎসা হিসাবে (expectant treatment) জরমাত্রেই আমরা 'মিকশ্চার' প্রয়োগ করিয়া থাকি। ইহার উপাদানগুলি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে কতকটা স্থির করিয়া লওয়া হয়। তাহার অধিকাংশই ক্ষারজাতীয় (alkaline) এবং উহার উদ্দেশ্য প্রস্রাব ও ঘর্ম্মবৃদ্ধি করা, যাহাতে জরের ক্লেদসকল তদ্দ্বারা যথাসম্ভব নির্গত (eliminated) হইয়া যায়।

পূর্ব্বে জরের জন্য এরূপ মিকশ্চার দেওয়ার প্রথা ছিল না। ১৮৬০ সালের নিকটবর্ত্তী সময়ের চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে সন্ধান লইলে জানা যায় যে, তখন জরের জন্য কেবল পাল্‌ভ ইপিকাক্ (Pulv. Ipecac)

ও সোডাবাইকার্ব একত্রে মিশাইয়া জরের পুরিয়া দেওয়া হইত এবং উহা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাইবার ব্যবস্থা করা হইত।

তৎপরে **অ্যাসিড মিকশ্চার** ব্যবহারের বিধি প্রচলিত হইল। ১৮৮০ সালে দেখা যায় ডাক্তার তামিজ খাঁ ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে জরের জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিকশ্চার ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিতেন যে তিনি ইহাতে এই উপকার দেখিতে পাইতেন যে ইহাদ্বারা শরীরের নানা যন্ত্র হইতে রসক্ষরণ (secretions) করায়। ইহাতে পাকাশয় রসকে উত্তেজিত করে, জিহ্বা পরিষ্কার রাখে, লিভারের ক্রিয়া ভাল করে, রক্তচলাচল উত্তমরূপে হইতে থাকে এবং ইহাদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতিও হইতে দেখা যায় না। টাইফয়েড বীজাণু যতদিন আবিষ্কার হয় নাই ততদিন সকল প্রকার জরে এই ব্যবস্থাই চলিতে থাকে। পরে উহা আবিষ্কৃত হইলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত লাইকার হাইড্রার্জ্ পারক্লোরাইড ব্যবহার হইতে থাকে এবং এডওয়ার্ড বার্চ ও ১৮৯০ সালের সমসাময়িক চিকিৎসকগণ নানাপ্রকার জরে কেবল ইহাই ব্যবহার করিতে থাকেন। ১৮৯৫ সালে **ক্লোরিন মিকশ্চারের** (Burney Yeo's Chlorine mixture) প্রচলন হয় এবং তখন হইতে টাইফয়েডের জন্য উহা ব্যবহার হইতে থাকে।

জরে **ফিবার-মিকশ্চার বা ডায়াফোরেটিক্ মিকশ্চার** ব্যবহারের প্রথম সূত্রপাত করেন স্যর এডওয়ার্ড গুডীভ। জর হইলে প্রায়ই দেখা যাইত যে উহাতে মূত্রকৃচ্ছতা আসিয়া উপস্থিত হয়, কারণ জরহেতু নানারূপ আবর্জ্জনা পদার্থ নিকাশ করিবার ভার কিড্‌নির উপর গিয়া পড়ে, এবং কিড্‌নি সেগুলিকে ছাঁকিয়া বাহির করিতে অপারগ হয়। এই জন্য প্রায়ই উহাতে কিড্‌নির প্রদাহ (pyonephrosis, nephritis ইত্যাদি) উপস্থিত হয়। কিন্তু জরকালীন প্রস্রাব সরল রাখিতে পারিলে এই সকল বিপদ ঘটিতে পারে না। সেই জন্যই তখন হইতে জরে অ্যাল্‌কালাইন ফিবার-মিকশ্চার দেওয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পটাস্ নাইট্রাস্ (Pot. Nitras) এ জন্য যথেষ্ট ব্যবহার করা হইত, কারণ ইহা কিড্‌নির রক্তশিরাগুলিকে স্ফীত করিয়া প্রস্রাব সরল রাখে এবং ঘর্ম্ম উৎপাদনেও সহায়তা করে। আজকাল আর এই ঔষধটি জরের মিকশ্চারের জন্য ব্যবহৃত হয় না, কেবল রক্তচাপ

(blood pressure) নিবারণ করিবার জন্যই ইহা সচরাচর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ জরের জন্য নিম্নলিখিতরূপ মিকশ্চার দেওয়াই ভাল :—

লাইকার অ্যামন্ অ্যাসিটেট্ (Liqr. ammon acetat.)—	১ ড্রাম
পটাস্ অ্যাসিটেট্ (Pot. Acetas)—	১৫ গ্রেন
সোডা বাইকার্ব (Soda Bicarb)—	১৫ গ্রেন
জল (Aqua)—	১ আউন্স

এইরূপ মিকশ্চার তিন ঘণ্টা অন্তর দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। শরীরে ব্যথার লক্ষণ বা লিভারের দোষ থাকিলে ইহার সহিত **সোডা স্যালিসিলেট** (Soda salicylate) প্রতি মাত্রায় ১০ গ্রেন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সোডা স্যালিসিলেটের ব্যবহার ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। প্রথমে ইহা কেবল বাতরোগের জন্য ব্যবহৃত হইত, পরে জরের জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইতে থাকে। স্যালিসিলেট্ও জরের উত্তম ঔষধ, ইহা কেবল জরের তেজ কমায় না, ইহার অ্যান্টিসেপটিক্ বা বিষনাশক গুণও আছে। অনেকে স্যালিসিলেটের পরিবর্ত্তে স্যালিসিন্ (Salicin) ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে জর কিছুতেই কমিতেছে না, অনেক সময় স্যালিসিন্ ব্যবহার করিলে তাহা কমিয়া যাইতে দেখা যায়। ছেলেদের পক্ষেও এই ঔষধটি উপকারী।

এইরূপ অ্যাল্কালাইন মিকশ্চারগুলি কতকদিন পর্য্যন্ত একাদিক্রমে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনব্যাপী জরে বরাবর উহা দিতে থাকা উচিত হয় না। বহুদিন ব্যবহারে উহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল হইতে পারে এবং ক্ষুধামান্দ্য, উদরাময়ের লক্ষণ, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি আসিতে পারে। অতএব কিছুদিন পরে এই ঔষধ বদল করিবার প্রয়োজন হয় ও তখন ইহার দোষ নষ্ট করিবার জন্য অ্যাসিড মিকশ্চার দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে।

তাপ কমাইবার উপায়

সাধারণ জরে উত্তাপ কমাইবার জন্য কোনো স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করার আবশ্যক হয় না। কিন্তু জরের প্রকোপ বাড়িয়া গেলে অথবা টাইফয়েড

প্রভৃতি রেমিটেন্ট্ জরে উত্তাপ উত্তরোত্তর অধিক হইতে থাকিলে নিশ্চয় তাহা দমন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। দীর্ঘকালব্যাপী জর মাত্রেই শরীরে নানারূপ কষ্ট হইতে থাকে, যেমন মাথাধরা, সর্ব্বাঙ্গে পীড়া, অনিদ্রা, প্রলাপ, ইত্যাদি; জর কিছু কমাইতে পারিলে এই সকল উপসর্গেরও লাঘব হয়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাপ কমাইবার জন্য কিছু স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু ইহাও দেখা প্রয়োজন যে জর কমাইতে গিয়া রোগীর অন্য কোনোরূপ অনিষ্ট না হয়, অথবা জরের যাহা কার্য্য, জর কমাইতে গিয়া তাহাতে কোনোরূপ বাধা না পড়ে।

সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া বর্ত্তমানে ইহাই ধার্য্য হইয়াছে যে **জলচিকিৎসাই** (Hydrotherapy) দাহ কমাইবার প্রকৃষ্ট পন্থা। জর ১০৫ ডিগ্রীর নীচে থাকিলে মাথায় জলপটি দেওয়া, মাথা ধোয়াইয়া দেওয়া, মাথায় বরফ দেওয়া প্রভৃতির দ্বারাই কাজ চলিতে পারে, কিন্তু ১০৫ ডিগ্রী বা ততোধিক হইলে রীতিমত জল-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শীতল জলের সহিত সংস্পর্শের দ্বারা শরীরের উত্তাপ হয় তো কিছুক্ষণের জন্যই কমে এবং পরে আবার পূর্ব্বাবস্থাতেই ফিরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু ইহাতে শরীরের অন্যান্য কষ্টেরও লাঘব হয়, এবং জরের যাহা উদ্দেশ্য অর্থাৎ শরীর হইতে রোগের বিষ নির্গত করিয়া দেওয়া, সে বিষয়েও ইহার দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য হয়। সেইজন্য অধিক জর মাত্রেই আজকাল দৈনিক একবার বা বহুবার করিয়া জল-চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে।

তাপ কমাইবার জন্য জল প্রয়োগের নানারূপ উপায় আছে, বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে সেইগুলি প্রযোজ্য। এখানে সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

(১) আইস্ ব্যাগ্ দেওয়া—অর্থাৎ রবারের থলির মধ্যে বরফ ভরিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গবিশেষে শীতলতা প্রদান করা। ইহাতে দেহের সহিত জলের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হয় না, কেবল বরফের শীতলতার দ্বারা দেহের কোনো অংশ-বিশেষকে শীতল করিয়া রাখা হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে স্থানীয় রক্ত শীতল করিয়া রাখিলে ঐ রক্ত সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে হইতে ক্রমে শরীরের ভিতরকার সমস্ত রক্তকেই কিছু শীতল করে। এ-ছাড়া স্নায়ুমণ্ডলীর উপর শৈত্য প্রদান

করিলে তদ্দ্বারা তাপ-নির্দ্ধারক কেন্দ্রও পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। আইসব্যাগ্ যে কেবল মাথার উপরই দিতে হইবে এমন কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। উহা ঘাড়ে এবং বগলেও দেওয়া যাইতে পারে। **পেটের উপর** আইসব্যাগ্ দেওয়াও অতি উত্তম ব্যবস্থা, ইহাতে শরীরের অনেকটা স্থান এককালীন শীতল রাখা যায় এবং পেটের উপর ঠাণ্ডা লাগাইলে জ্বরের উত্তাপও শীঘ্র কমিয়া যাইতে দেখা যায়। মোটা গামছা বা মোটা তোয়ালে ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া চারি পাট করিয়া সমস্ত পেটের উপর কিছুক্ষণ চাপাইয়া রাখিলেও জ্বর বেশ কমিয়া যায়। এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। গাত্রের তাপ লাগিয়া শীঘ্রই তোয়ালে গরম হইয়া যায়, এই জন্য পাল্টা-পাল্টি বদল করিয়া দুইখানি তোয়ালে ব্যবহার করা চলিতে পারে। কিংবা কয়েকখণ্ড বরফের টুকরা যদি তোয়ালের পাটের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয় তবে উহা গলিয়া গলিয়া শীতল জল উহার ভিতর গড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং তোয়ালেটি আর গরম হইতে পারে না। বলা বাহুল্য বিছানা যাহাতে ভিজিয়া না যায় এজন্য অয়েলক্লথ প্রভৃতি নীচে পাতিয়া রাখা আবশ্যক। তোয়ালের ধারে ধারে চারিপাশে তুলা পাকাইয়া গুঁজিয়া দিলে ঝরাজল উহাতেও শুষিয়া লইতে পারে।

(২) **ঠাণ্ডা জলের স্পঞ্জিং**—অর্থাৎ তোয়ালে বা গামছা ঠাণ্ডা জলে জব্‌জবে করিয়া ভিজাইয়া তাহার দ্বারা সমস্ত গা মুছাইয়া দেওয়া। ইহাতে অধিক ঠাণ্ডা জল গায়ে লাগে না বটে কিন্তু অল্পজল লাগিয়া থাকে বলিয়া তাহা শীঘ্র শীঘ্র উদ্বায়িত (evaporation) হইয়া শরীরকে শীঘ্রই শীতল করে। এইরূপ স্পঞ্জিং করিবার নির্দ্ধারিত সময় ১৫ মিনিট হইতে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত। ১০৩ ডিগ্রীর অধিক জ্বর উঠিলেই স্পঞ্জিং করা চলিতে পারে, এবং ইহা দৈনিক দুই তিনবার,—এমন কি প্রয়োজন হইলে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

স্পঞ্জিং করিবার সাধারণ বিধি এই যে এক একটি অঙ্গ ধরিয়া পৃথক ভাবে ভিজা তোয়ালে দিয়া ঘষিয়া মাজিয়া দিতে হয় ও তাহা মুছাইয়া দিয়া শুষ্ক বস্ত্রে ঢাকিয়া পুনরায় অন্য অঙ্গ ভিজা তোয়ালের দ্বারা ঘষিতে হয়। এইরূপে সর্ব্বসমেত ১৫।২০ মিনিট কালের মধ্যে গা মোছানো সমাপ্ত করিয়া লইতে হয়।

কিন্তু অধিক জ্বরে রোগী অচৈতন্যবৎ থাকিলে তখন আরো **বিশিষ্ট-রূপের স্পঞ্জিং** করা দরকার, যেমন হাঁসপাতালে করা হইয়া থাকে। ইহার নিয়ম এইরূপ:—অয়েল ক্লথের উপর কম্বল বিছাইয়া রোগীকে তাহার উপর শোয়াও। মাথায় আইসব্যাগ, এবং প্রয়োজন বোধ করিলে হাতে পায়ে গরম জলের বোতলের সেঁক দাও। রোগীর গাত্রাবরণ একেবারে খুলিয়া দিয়া, একখানি বড় তোয়ালে ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া সমস্ত বুক ও পেটের উপর বিস্তৃত করিয়া দাও এবং সেখানি গরম হইয়া গেলেই তাহা বদল করিয়া দিবার ব্যবস্থা রাখ। এদিকে আর একখানি তোয়ালে ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া একে একে হাত, পা, বগলের নীচে, কুঁচকির কাছে, দুই পায়ের মধ্যে এবং পিঠের দিকে মোছাইতে থাক ও মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া উহা ভিজাইয়া লইতে থাক। এইরূপে ১৫ মিনিট কাল গত হইলে শুষ্ক বস্ত্র দিয়া সমস্ত অঙ্গ মুছাইয়া দাও, তৎপরে ভিজা বিছানাটি টানিয়া লইয়া গায়ে উত্তমরূপে ঢাকা দিয়া রোগীকে একমাত্রা ব্রাণ্ডি খাইতে দাও। এইরূপ রীতিমত স্পঞ্জিং করিলে রোগী বেহুঁস থাকিলেও কতকটা চৈতন্যলাভ করে ও সুস্থ বোধ করে, এবং জ্বরও অনেকটা কমিয়া যায়।

ঠাণ্ডা জলে স্পঞ্জিং করাতে যদি কোনো আপত্তি থাকে, অর্থাৎ রোগী যদি তাহাতে অসুস্থ বোধ করে কিংবা কোনো কারণে উহা ক্ষতিজনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ঠাণ্ডা জলের পরিবর্ত্তে **গরম জলের স্পঞ্জিং** করিলেও উপকার হইতে পারে। তবে গরম জলের স্পঞ্জিং-এর দ্বারা উপকার হয় অন্যরূপ ভাবে। উষ্ণ জলের স্পর্শ লাগিয়া ত্বকের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া ওঠে এবং তাহাতে ভিতরকার উষ্ণ রক্ত বাহিরের সংস্পর্শে চলিয়া আসিবার সুযোগ পায়। এইজন্য জল যতটা-গরম সহ্য করিতে পারা যায় ততটা পর্য্যন্ত ব্যবহার করা উচিত, এবং গরম জলের স্পঞ্জিং পাঁচ মিনিটের অধিক দেওয়া উচিত নয়।

(৩) **ওয়েট্ প্যাক্** (Wet Pack) বা ভিজা চাদর জড়ানো—ওয়েট্ প্যাক্ দিয়া রোগীকে আধঘণ্টা হইতে দেড়ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজা কাপড়ে জড়াইয়া রাখিয়া দেওয়া চলে। অধিক জ্বর হইলে হাঁসপাতাল মাত্রেই এই ব্যবস্থা করা হয়, কারণ ইহাতে অধিক পরিশ্রমের আবশ্যক

হয় না,—ওয়েট্ প্যাক্ লাগাইয়া দিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করা চলে। ওয়েট্ প্যাক্ দেওয়ার নিয়ম এই :—বিছানার উপর আগে একটি বড় অয়েল ক্লথ পাতিয়া, তাহার উপর একটি কম্বল পাতিয়া, তাহার উপর একটি ঠাণ্ডাজলে বা বরফজলে ভিজানো জব্‌জবে বিছানার চাদর বিছাইয়া রোগীকে উহার উপর শোয়াও। রোগীর সমস্ত শরীরটা ঐ ভিজা চাদরের উপর থাকিবে, কেবল মাথাটি চাদরের বাহিরে শুষ্ক কম্বলের উপর থাকিবে। চাদরখানি প্রস্থের দিকেও কিছু বড় হওয়া দরকার, কারণ দুইপাশ হইতে ঐ ভিজা চাদর ঘুরাইয়া আনিয়া দুই রকম ভাবে রোগীর দেহের উপর আচ্ছাদন করিয়া দিতে হইবে। প্রথমে রোগীর হাত দুটি উপরদিকে তুলিয়া দিয়া একপাশের চাদরটি বগলের নীচে দিয়া আনিয়া দেহের সম্মুখভাগ জড়াইয়া অন্যদিকের বগলের তলায় লইয়া মুড়িয়া দিতে হইবে, এবং নীচের দিকে পায়ের ফাঁকের মধ্যেও যথাসম্ভব চালাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর হাতদুটি নামাইয়া লইয়া অন্য পাশের চাদর দিয়া হাতদুটি সমেত সমস্ত দেহ আর এক পাল্টা জড়াইতে হইবে। এইরূপে ভিজা কাপড়ে রোগীকে আপাদগ্রীবা জড়াইয়া দেওয়া হইল, কেবল মুখটি ও মাথাটি বাকী রহিল,—মাথার উপর বরফ দেওয়া হইতে থাকিল। এখন ভিজা চাদরের উপর একখানি শুষ্ক কম্বল বা চাদর চাপা দেওয়া হউক। যাহাতে রোগীর গায়ে এ-সময় হাওয়া লাগিতে না পারে সেইজন্যই এরূপ ব্যবস্থা। অন্য উপায়ে, অর্থাৎ যখন উদ্বায়নের (evaporation) দ্বারা রোগীর শরীরকে শীতল করা উদ্দেশ্য থাকে তখন ভিজা কাপড়টির উপর আর কোনোরূপ ঢাকা না দিয়া রোগীকে তদবস্থায় পাখার নীচে রাখা যাইতে পারে। কিন্তু ওয়েট্ প্যাকের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে উপর হইতে চাপা দেওয়া থাকিলে শরীরের উত্তাপে ভিতরকার ভিজা চাদরটি শীঘ্রই গরম হইয়া উঠে। শরীরের উপরকার ত্বক তখন প্রথমটায় বেশ ঠাণ্ডা হয়, এবং ত্বকের উপরকার রক্ত শীতল হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও ভিতরের রক্তের সহিত উষ্ণতার আদান প্রদান হইতে থাকে। এইরূপে চাদরের জলটি যত গরম হইতে থাকে, শরীরের উষ্ণতা তত কমিতে থাকে। ক্রমে চাদরের ভিতর ভাপ উঠিতে থাকে ও ইহাতে বাষ্পস্নানের

মত ক্রিয়া হয়। ইহাতে ক্রমে ক্রমে আরাম অনুভব হইতে থাকে, মুখে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা যায়, সমস্ত দেহ ঘামে ভিজিয়া যায় এবং আরাম পাইয়া রোগী ঘুমাইয়া পড়ে।

এই সকল জলচিকিৎসার দ্বারা জ্বরের বিকার ও হাত পায়ের খিঁচুনি প্রভৃতি দূর হয়, প্রস্রাব সরল হয় ও ঘাম হইয়া অনেক গ্লানি দূর হইয়া যায়, হৃৎপিণ্ড সবল হয় ও নাড়ী পুষ্ট হয়, অনিদ্রা দূর হয়, উত্তেজিত স্নায়ুসকল সুস্থ হয়, এবং যে রোগী কিছুতে খাইতে চায় না সেও ইহার পর সহজেই পথ্য গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য ইহাতে জ্বরও কিছু কমে এবং চর্ম্মের উপযুক্ত প্রসাধন হওয়াতে বেড্‌সোর (bedsore) প্রভৃতি হইতে পারে না।

(৪) **বাথ্ (Bath) বা অবগাহন**—অত্যধিক জ্বরে অর্থাৎ ১০৬ ডিগ্রীর কাছাকাছি উত্তাপ উঠিলে রোগীকে বাথ্ দেওয়া, অর্থাৎ কিছুক্ষণ শীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখার ব্যবস্থা অতি উত্তম। ছেলেদের পক্ষেও এ ব্যবস্থা খুব ভাল। বেশী জ্বরে অনায়াসে রোগীকে ঠাণ্ডা জলে অবগাহন করানো যাইতে পারে,—ইহাতে কিছু অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই বা ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় নাই। শরীরে অধিক উত্তাপ ভোগ হইতে দেওয়া কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয় এবং ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার মিথ্যা আশঙ্কা করিয়া বর্ত্তমান বিপদের প্রতিকার না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা অত্যন্ত ভুল।

অবগাহন করাইবার জন্য বড় টবের প্রয়োজন। হাঁসপাতালে বড় বড় বাথ টব সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের ঘরে প্রায়ই এরূপ কোনো জলের টব থাকে না। সে স্থলে বিছানাতেই **অয়েলক্লথের টবের** মত (oilcloth tank) প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিছানার উপর একটি বৃহদায়তন পুরু অয়েল ক্লথ পাতিয়া মধ্যে রোগীর শরীর অনুযায়ী স্থান রাখিয়া চতুর্দ্দিকে কয়েকটি মোটা বালিস অয়েলক্লথের তলায় চৌকোন করিয়া এরূপ ভাবে সাজাইতে হয় যাহাতে উহা একটি অয়েলক্লথের চৌবাচ্চার মত দেখিতে হয়। অতঃপর একদিকের বালিসের উপর রোগীর মাথা রাখিয়া তাহাকে উহার ভিতর নগ্নদেহে শোয়াইয়া তন্মধ্যে ১০।১৫ বালতি ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিতে হয়। ইহার ভিতর

রোগীকে ১৫ মিনিট হইতে আধঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে; ইতিমধ্যে মাথায় বরফ চলিতে পারে। তৎপরে একদিকের বালিস একটু সরাইয়া জল নিকাশের একটি কোণ করিয়া দিলে ধীরে ধীরে সমস্ত জলটি নিকাশ হইয়া যাইতে পারে এবং উপযুক্তস্থানে বাল্‌তি ধরিলে ঐ জল তাহাতে গিয়া পড়ে। একটু সাবধানতার সহিত করিলে ইহাতে বিছানা ভিজিবার সম্ভাবনা থাকে না। অতঃপর রোগীকে শুষ্ক বস্ত্রে মুছাইয়া অয়েলক্লথটি টানিয়া লইয়া গায়ে শুষ্কবস্ত্রের দ্বারা ঢাকা দিতে হয়। দুর্ব্বল ও বয়স্থ রোগীকে বাথ দিতে হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমে কিছু ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া লইয়া বাথ দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা। প্রয়োজন অনুসারে দিনের মধ্যে ২।৩ বার এরূপ বাথ দিলেও অনিষ্ট হয় না।

(৫) **ঔষধের দ্বারা তাপ দমন**—যদি পুনঃ পুনঃ স্পঞ্জিং ও বাথ প্রভৃতি দিয়াও জ্বর তেমন না কমে তাহা হইলে ঔষধের সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাপনিবারক ঔষধগুলি প্রায়ই কিছু দুর্ব্বলকারী। তন্মধ্যে সম্প্রতি **পাইরামিডন্** (Pyramidon) নামক ঔষধটি যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে, কারণ ইহাতে অনিষ্ট কম হয়। তবে পুস্তকের লিখিতমত ৫ গ্রেন মাত্রা অত্যন্ত অধিক, এত অধিকমাত্রায় ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি মাত্র ½ গ্রেন মাত্রায় ইহা অর্দ্ধঘণ্টা বা একঘণ্টা অন্তর দুই তিনবার দেওয়া যায়, তবে দুই ঘণ্টার মধ্যে ২।৩ ডিগ্রী জ্বর বেশ কমিয়া যায় অথচ শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। অতএব এইরূপ মাত্রাতেই ইহা ব্যবহার করা উচিত। যখনই প্রয়োজন তখনই ইহা দেওয়া যাইতে পারে, তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বসমেত ৩ গ্রেনের অধিক দেওয়া নিরাপদ নয়। এইরূপ নিয়মে ও এইরূপ মাত্রায় ইহা একাদিক্রমে দশদিন পর্য্যন্তও দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে অনিষ্ট হয় না। শিশুদের পক্ষে দশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহা ¼ গ্রেন মাত্রায় দেওয়া উচিত, এবং সমস্ত দিনে এক গ্রেনের অধিক দেওয়া ঠিক নয়। বলা বাহুল্য যে সময় টেম্পারেচার বাড়িয়াছে কেবল সেই সময়েই ইহা প্রয়োগ করা উচিত। ইহাতে রোগ আরোগ্য হয় না বটে কিন্তু জ্বরের উত্তাপ কমাইয়া রাখার দরুন রোগীর কষ্টের অনেক লাঘব হয়।

জ্বর চিকিৎসায় কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে

জ্বরমাত্রেই শরীরের তিনটি যন্ত্র বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়,—**কিড্‌নি** (মূত্রগ্রন্থি), **লিভার** (যকৃৎ) ও **হার্ট** (হৃৎপিণ্ড)। রোগের বিভিন্নতা অনুসারে আরও অনেক আভ্যন্তরিক যন্ত্র আক্রান্ত হইতে পারে, যথা অনেক রোগে ফুস্‌ফুস্‌ও আক্রান্ত হয়, অনেক রোগে মস্তিষ্কও আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কিড্‌নি, লিভার ও হার্ট, এই তিনটি যন্ত্রের উপর দিয়াই জ্বরের অনিষ্টকারী ক্রিয়া সর্ব্বাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য চিকিৎসকের এই যন্ত্রগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এইগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে রোগ যতই কঠিন হউক, ক্রমে ক্রমে তাহা আরোগ্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব এই তিনটি যন্ত্রকে যথাসম্ভব সুস্থ অবস্থায় রাখিবার জন্য আমাদের প্রথম হইতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

কিড্‌নী (Kidney)

যাহাতে মূত্রগ্রন্থির ঝিল্লিসমূহ অবরুদ্ধ না হইয়া যায়, যাহাতে প্রস্রাব সরল ও পরিষ্কার থাকে, অর্থাৎ যাহাতে রোগের বিষনিকাশের পথ নিত্য উন্মুক্ত থাকে, এইজন্যই জ্বরের প্রথম হইতে অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চার প্রভৃতির ব্যবস্থা। সে কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিডনিকে অনর্থক উত্তেজিত করিয়া প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু যাহাতে মূত্রকৃচ্ছ না জন্মায় ও প্রস্রাব স্বাভাবিক থাকে এবং অন্ততঃ ৩০।৪০ **আউন্স প্রস্রাব দৈনিক** নির্গত হইতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত; কেবল ঔষধের দিক দিয়া নয়, পথ্যের দিক দিয়াও এ বিষয়ে সাহায্য করা উচিত। যদি প্রস্রাব সরল না থাকে এবং উত্তরোত্তর উহার মাত্রা কমিয়া যাইতে থাকে, তখন উহা নিবারণের একমাত্র উপায়—

গ্লুকোজ (glucose or grape sugar)—গ্লুকোজের গুণের কথা সকলেই এখন জানেন। শরীরের অনুপরমাণুগুলিকে জ্বরের দাহ হইতে কেবল ইহাই রক্ষা করিতে পারে। অন্তর্নিহিত দাহের মুখে ইহা

এমন ইন্ধন যোগায় যাহাতে প্রবল জ্বরেও শরীরের কোথাও ক্ষয় হইতে পারে না; "You can not give too much glucose in high fevers",—অর্থাৎ প্রবল জ্বরে যতই গ্লুকোজ দাও, কখনই তোমায় বলিতে হইবে না যে গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত হইয়াছে। সব দিক দিয়াই ইহার উপকারিতা আছে। পুষ্টিকারক পথ্য হিসাবে, প্রস্রাববর্দ্ধক হিসাবে, এবং হার্টের শক্তিবর্দ্ধক (stimulant) হিসাবে ইহার অদ্বিতীয় গুণ। যদি জ্বরের সহিত কিড্‌নিতে কোনো দোষ থাকে বা প্রস্রাব কম হইতে থাকে তবে তো ইহা দিতেই হইবে।

প্রথমে গ্লুকোজ মুখ দিয়া খাওয়াইয়া দেখাই ভাল, ইহাতেই অনেক সময় যথেষ্ট কাজ হয়। পূর্ব্বে খাইবার জন্য আঠার মত ঘন গ্লুকোজ ব্যবহৃত হইত, তাহা জলের সহিত গুলিয়া অধিকক্ষণ রাখিয়া দিলে গাঁজিয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল এবং প্রস্তুত করার নানারূপ অসুবিধা ছিল। কিন্তু এখন গ্লুকোজ চিনির মত গুঁড়া আকারে (pulv. glucose) পাওয়া যায়, উহাতে কোনোরূপ অসুবিধা নাই। গ্লুকোজ সমস্তদিনে **এক আউন্স হইতে চার আউন্স পর্য্যন্ত** প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সকল রকম পানীয় খাদ্যের সহিত কিছু কিছু গ্লুকোজ মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তবে জলের সহিত মিশাইয়া পান করিতে দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ ইহাতে জলও কতকটা পান করা হয় এবং গ্লুকোজও প্রয়োগ করা হয়। অশিক্ষিত রোগীর জন্য বোতলে গ্লুকোজের জল প্রস্তুত করিয়া দিয়া সমস্ত দিনে ইচ্ছামত উহা ব্যবহার করিতে বলাই উত্তম ব্যবস্থা। এক বোতল জলে এক আউন্স পরিমাণ গ্লুকোজ ও ৬০ গ্রেন সোডা বাইকার্ব একত্রে মিশাইয়া এই জল প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যহ এইরূপ দুই বোতল জল রোগীকে পান করানো যাইতে পারে।

মলদ্বার দিয়া গ্লুকোজ (rectal glucose) অন্ত্রমধ্যে প্রয়োগ করাও উত্তম ব্যবস্থা; উহাতে অন্ত্রগাত্র হইতে গ্লুকোজ শরীরের মধ্যে গৃহীত হয়। মলদ্বার দিয়া প্রয়োগ করিবার জন্য উহা নর্ম্মাল সেলাইনের (normal saline) সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত; কিন্তু উহার সহিত সোডা বাইকার্ব মিশ্রিত করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে গ্লুকোজ গাঁজিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

১ আউন্স গ্লুকোজের গুঁড়া ১ পাইণ্ট সেলাইনের সহিত মিশ্রিত করিয়া (5 per cent) উহারই ৪।৫ আউন্স পরিমাণ এক এক বারে ৪ ঘণ্টা অন্তর রবারের নল দিয়া ধীরে ধীরে মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। রোগের অবস্থা কঠিন হইলে ইহার পরিবর্ত্তে অনবরত ফোঁটা ফোঁটা করিয়া গ্লুকোজ অন্ত্র মধ্যে প্রয়োগ করিবার (continuous dripping method) আবশ্যক হয়। এজন্য রবারের নলটি অনবরত মলদ্বারে লাগানো থাকে, এবং উহাতে এমন ভাবে একটি টিপ্‌কল লাগানো থাকে যাহাতে তৎসংলগ্ন পাত্র হইতে গ্লুকোজের জল ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নিয়মিত ভাবে পড়িতে থাকে।

যেখানে গ্লুকোজ খাওয়াইয়া বা মলদ্বার দিয়া প্রয়োগেও ফল হইতেছে না এবং উত্তরোত্তর প্রস্রাব কমিয়া যাইতেছে সেখানে ইনজেকশনের ব্যবস্থা করা উচিত। গ্লুকোজ **ইণ্ট্রামাস্কুলার ইনজেকশন** করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। শতকরা ১২½ ভাগ (12½%) গ্লুকোজ (অর্থাৎ সাত ভাগ জল ও এক ভাগ গ্লুকোজ) ২০ সি. সি. পরিমাণ (এক আউন্সের কিছু কম) পর্য্যন্ত অনায়াসে মাংসপেশীর মধ্যে ইন্‌জেকশন দেওয়া যায়, ইহার অধিক ঘন হইলে ব্যথা লাগে। জানুর পাশে উপরের দিকে (fascia lata-র মধ্যে) এইরূপ ইনজেকশন ৫০ সি. সি. পর্য্যন্তও দেওয়া যাইতে পারে।

ইন্ট্রাভেনাস্‌ গ্লুকোজের মাত্রা শতকরা ২৫ ভাগ (এক ভাগ গ্লুকোজ ও তিন ভাগ জল) হিসাবে ২০ সি. সি. হইতে ৫০ সি. সি. পর্য্যন্ত। রক্তশিরার মধ্যে এতটা পরিমাণ গ্লুকোজ কিছু ধীরে ধীরে প্রয়োগ করা উচিত এবং হার্টের অবস্থা বুঝিয়া ইহা ব্যবহার করা উচিত। তবে ইহাতে শরীরে গ্লুকোজের আধিক্য (hyperglycaemia) হইবার কোনো আশঙ্কা নাই। এই ইনজেকশন প্রত্যহ দেওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ ঘন করিয়া গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে ইহা কিড্‌নির ঝিল্লিতে (epithelium) গিয়া প্রচুর পরিমাণে জল টানে (by osmosis) এবং এইরূপে প্রস্রাব বৃদ্ধি করে। কেবল তাহাই নয়, ইহা যেখানে যেখানে গিয়া উপস্থিত হয় সেখানে জীবকোষ সমূহের মধ্য হইতে জল টানিয়া বাহির করে এবং জলের পরিবর্ত্তে গ্লুকোজ গিয়া তথায় প্রবেশ করে। এইরূপে ইহা সমস্ত কোষগুলিকেও পুষ্ট করে এবং

হৃৎপিণ্ডকেও বলসম্পন্ন করে। অতএব ঔষধ ও পথ্য দুই প্রকার গুণই ইহাতে একত্রে বিদ্যমান।

লিভার (Liver)

জ্বরে লিভারের দোষ দেখিলে চিকিৎসার তিনরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ভগ্নাংশিক মাত্রায় **ক্যালোমেল** দেওয়ার কথা ও অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চারের সহিত **সোডা স্যালিসিলেট্‌** (Soda Salicylate) দেওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় এগুলি ব্যবহার করিলে বেশ উপকার হয় এবং পিত্তের দোষ হেতু যে জ্বরের উৎপত্তি তাহা এই ব্যবস্থাতেও অনেক সময় আরোগ্য হইয়া যায়।

জ্বরের পরবর্ত্তী অবস্থায় লিভারের দোষ দূর করিবার জন্য,—বিশেষতঃ যদি উহার সহিত কাম্‌লা (jaundice) থাকে তাহা হইলে **ইউরোট্রোপিন** (Urotropine 40% solution) ইন্‌ট্রাভেনাস্‌ ইনজেকশন উপকারী। ইহা পিত্তদোষ নাশক এবং মূত্রবৃদ্ধিকারক। অনেকে ইহাকে বীজাণুনাশক বলিয়া মনে করেন এবং সেইজন্য অনির্দ্দিষ্ট বিষাক্ত জ্বর মাত্রেই ইহা ব্যবহার করেন। কিন্তু এ ধারণা ভুল। ইহা কোলাই বীজাণুর (B. coli) বিরুদ্ধে কার্য্যকরী বটে, কিন্তু সকল সময় নয়। অন্যান্য বীজাণুকেও ইহার বিনাশ করিবার কোনো ক্ষমতা (germicidal effect) নাই। তবে ইহার গুণ এই যে বর্ত্তমান বীজাণুর বিষকে ইহা উপস্থিত মত দূর করিতে পারে (removes the toxin for the time being), কিন্তু পুনর্ব্বার বিষের সঞ্চয় নিবারণ করিতে পারে না। কেবল উপস্থিত বিষগুলিকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই জ্বর-বিকারে (toxaemia) ইহা ইনজেকশনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এবং সেইজন্য গ্লুকোজের সহিত একত্রে মিশাইয়াও ইহা ইনজেকশনরূপে রক্তের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ইহার আসল গুণ এই যে ইহা পিত্তদোষ দূর করে। Schering-এর প্রস্তুত ইউরোট্রোপিনেরই সকলে সুখ্যাতি করেন। ইহার ইনজেকশনের পূর্ণ মাত্রা ৫ সি. সি.।

লিভারে যদি ব্যথা টের পাওয়া যায় এবং সেই কারণেই জ্বর ছাড়িতেছে না বলিয়া কোথাও সন্দেহ হয়, তবে সে স্থলে **এমিটিন্‌** (Emetine)

ইনজেকশন দিলে অনেক সময় আশ্চর্য্য উপকার হয়। কিন্তু এরূপ জ্বরের স্থলে এমিটিন পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা উচিত নয়। এখানে ⅓ গ্রেন বা ⅔ গ্রেন মাত্রায় ইহা উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট। যদি উপকার হয় তবে এই মাত্রাতেই হইবে।

হার্ট (Heart)

হৃৎপিণ্ডকে সবল রাখিবার জন্য জ্বরের প্রথম হইতেই কোনো স্বতন্ত্র ঔষধাদি প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। সকল জ্বরে এবং সকল ক্ষেত্রেই যে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইবে এমন নহে। জ্বরের প্রথম হইতে যদি উচিত মত সাবধান হওয়া যায়, তবে হৃৎপিণ্ড বিকল হওয়ার বা হার্টফেল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। কি কি কারণে হার্টফেল হইতে পারে পূর্ব্ব হইতে তাহা জানা থাকিলে, এবং সেই কারণগুলি ঘটিতে না দিলে অনেক স্থলে হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখিতে পারা যায়। যে যে কারণে সাধারণতঃ **হার্টফেল** হয় তাহা উল্লেখ করা হইল ঃ—

(১) উপযুক্ত পথ্যের অভাব।
(২) উপযুক্ত পরিমাণ জল পান না করা।
(৩) মুক্তবায়ু ও অক্সিজেন বাষ্পের অভাব।
(৪) উপযুক্ত বিশ্রামের ও ঘুমের অভাব।
(৫) হঠাৎ উঠিয়া বসা, বা দাঁড়ানো বা চলাফেরা।
(৬) মূত্র শ্রাবের অল্পতা।
(৭) বহুক্ষণ যাবৎ প্রবল জ্বর লাগিয়া থাকা।
(৮) অতিরিক্ত বমি বা অতিসার বা উদরাময়।
(৯) সূক্ষ্ম ধমনীসমূহের প্রাচীরের স্নায়বিক শিথিলতা (vasomotor paralysis) ও তজ্জনিত অতিঘর্ম্ম।
(১০) অতিরিক্ত রক্তশ্রাব।

এই সকল দোষ যথাসম্ভব নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা হইলে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তায় পড়িতে হয় না।

আগেকার নিয়ম ছিল প্রবল জ্বর অথবা কঠিন ব্যাধি মাত্রেই প্রথম হইতে

ষ্টিমুল্যান্টের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু এখন সে পদ্ধতি প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। এখন সর্ব্ববিষয়ে **গ্লুকোজই** আমাদের ভরসাস্থল ("sheet anchor"); ইহা নিরাপদে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে পারে, সেইজন্য অন্যান্য ষ্টিমুল্যান্টের পরিবর্ত্তে প্রথম হইতে ইহাই প্রয়োগ করা হইতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার কোনো চিহ্ন না পাওয়া যায় ততক্ষণ ষ্টিমুল্যান্ট হিসাবে আর কোনো ঔষধ ব্যবহার করা হয় না; কারণ এখনকার ধারণা এই যে রোগের বিষের বিরুদ্ধে হার্টকে স্বতঃই যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়, এ-অবস্থায় যতক্ষণ সে নিজে সামলাইয়া চলিতেছে ততক্ষণ তাহাকে অনর্থক উত্তেজিত করিয়া লাভ নাই, বরং যতটা সম্ভব তাহার শ্রম লাঘবের দিকেই লক্ষ্য করা উচিত। কিন্তু যখন কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যাইবে তখন হইতেই তাহার প্রতিকার করা অবশ্য প্রয়োজন।

হৃৎপিণ্ডকে সবল রাখিবার জন্য নানা রকমের ঔষধ আছে, উহার কোনটির কি উপকার এবং কোথায় কোনটি প্রযোজ্য তাহা একে একে আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রাণ্ডি (Alcohol)—আগেকার কালে দীর্ঘকাল-স্থায়ী জর মাত্রেই ব্রাণ্ডি ব্যবহার করা হইত। এখন সে নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। তবে কখনো কখনো ইহা অল্প পরিমাণে দিতে হয়। ইহা এখন নিউমোনিয়াতেই বেশী ব্যবহারে লাগে; বিশেষতঃ ছেলেদের নিউমোনিয়াতে ইহা সত্যই উপকারী। ঘুম আনাইবার জন্যও কখনো কখনো ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্পঞ্জিং করিবার পরেও ইহার ব্যবহার আবশ্যক হইয়া পড়ে। রোগের আরোগ্য কালে প্রয়োগ করিলে ইহার দ্বারা ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়া থাকে। তবে রোগের প্রথম অবস্থায় ইহার ব্যবহার উচিত নয়। ইহা ষ্টিমুল্যান্ট্ হিসাবে প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য, যদি দেওয়া হয় তবে কেবল পথ্য হিসাবে। ইহা অতি উত্তম শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য (carbohydrate food), এবং অতি সহজে ইহা হজম হইয়া যায়। সেই হিসাবে ইহা অল্প অল্প মাত্রায় সমস্ত দিনে মোট এক আউন্স পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট, তাহার অধিক নয়। অন্যান্য ব্রাণ্ডি অপেক্ষা পুরাতন লিকার ব্রাণ্ডিই (Old Liquor Brandy) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বমি বন্ধ করিবার জন্য অনেকে শ্যাম্পেনও (Champagne)

ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্রাণ্ডি দুধের সহিত মিশাইয়াও দেওয়া যাইতে পারে। আসলে ব্রাণ্ডি ঠিক ষ্টিমুল্যান্ট্ নয়, এবং উহা ষ্টিমুল্যান্ট্ রূপে প্রযোজ্য নয়। যে সকল ঔষধ রীতিমত ষ্টিমুল্যান্ট্ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ হার্টফেলের মত লক্ষণ দেখিলে যেগুলি প্রয়োগ করা হয়, অতঃপর সেগুলির কথা বলা হইতেছে।

ডিজিটেলিস্ (Digitalis)—হার্টের ঔষধ বলিতে সর্ব্বাগ্রে ডিজিটেলিসের নাম করা উচিত, কারণ হার্টকে রক্ষা করিবার জন্য সাধারণতঃ ইহার উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হয়। অনেকে জ্বরের সময় ডিজিটেলিস্ ব্যবহার করিয়া থাকেন এই আশাতে যে হার্টকে সবল রাখিতে পারিলে জ্বরের বিষাক্ততা (toxaemia) বাড়িতে পারিবে না। কিন্তু প্রকৃত টক্সীমিয়া অবস্থায় ইহার দ্বারা যে বিশেষ কিছু কাজ হয় না তাহা বহুবার দেখা গিয়াছে। অতএব জ্বরের বাড়ের মুখে ইহা না দিলেও চলে। তবে কখন ডিজিটেলিসের প্রয়োগ উপযুক্ত? যখন নাড়ীর গতি অতি দ্রুত (frequency of pulse rate) হইতেছে, অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে উহা যখন প্রতি মিনিটে ১২০-র উপর হইয়াছে—অথবা যখন নাড়ীর গতি অনিয়মিত হইয়াছে (arythmia) ও সমান তালে চলিতেছে না—কিংবা যখন সবল নাড়ী হঠাৎ নরম হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে (soft pulse),—তখনই ডিজিটেলিসের প্রয়োজন।

ডিজিটেলিস্ হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন নামের নানা রকমের ঔষধ আছে। আজকাল Pandigal, Digifortis, Diginutin, Digalen প্রভৃতি ঔষধগুলির যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে, কিন্তু এগুলি কেবল হৃদ্‌রোগের পক্ষেই ব্যবহার্য্য। জ্বরে ব্যবহারের জন্য সাধারণ **টিঞ্চার ডিজিটেলিস্**ই ভাল। যে উপকার পাইবার জন্য জ্বরে ইহা প্রয়োগ করা হয়, টিঞ্চারের দ্বারাই সে উপকার উত্তমরূপে পাওয়া যায়; আর **১০ ফোঁটা মাত্রাই** ইহার উৎকৃষ্ট মাত্রা। এই মাত্রাই প্রয়োজন অনুসারে দৈনিক তিনবার অথবা পাঁচবারও দেওয়া যাইতে পারে। জ্বরে দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডকে কিছু সাহায্য করিবার জন্যই ডিজিটেলিস্ দেওয়া হয়, সুতরাং ইহার অধিক মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই। কেবল হৃদ্‌রোগের জন্যই ডিজিটেলিস দুই এক দিনের মধ্যে

৩।৪ ড্রাম পর্য্যন্ত খাওয়াইয়া দিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু এখানে উহার সে উদ্দেশ্য নয়। মনে রাখা দরকার যে ডিজিটেলিসের দ্বারা জ্বরের হার্টকে কিছুতে ভাল করা যাইবে না, যতক্ষণ রোগের উপশম না হয়। স্থতরাং যেটুকু সাহায্য ইহার দ্বারা সম্ভব তাহা ঐ দশ ফোঁটা মাত্রা হইতেই পাওয়া যাইবে।

ডিজিটেলিস্ সর্ব্বদা পৃথক ভাবেই খাইতে দেওয়া উচিত, কোনো মিকশ্চারের সহিত একত্রে প্রেস্‌ক্রপশন করিতে নাই, কারণ ইহা গ্লুকোসাইড্ (glucoside) এবং জলের সহিত মিশাইয়া রাখিলেই তলানি পড়িয়া যাইবে। বার বার ঔষধ যদি খাওয়ানো কষ্টকর হয় তাহা হইলে মিকশ্চার খাওয়ানোর সময় এক দাগ ঢালিয়া ডিজিটেলিস্ উহার সহিত সদ্য মিশাইয়া লইয়া একত্রে খাওয়ানো যাইতে পারে। মিকশ্চারের শিশিতে ডিজিটেলিস্ পূর্ব্ব হইতে মিশাইয়া রাখিলে উহার গুণ থাকে না।

হার্টফেল হইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ আশু বিপদের সম্ভাবনা (failing heart) হইলে তখন আর ডিজিটেলিসে বিশেষ স্থবিধা হয় না। তখনকার পক্ষে **ষ্ট্রোফ্যান্থিন্**ই সর্ব্বোত্তম। ডিজিটেলিসের সর্ব্বপ্রধান উপকারিতা দেখা যায় যখন অধিক পরিশ্রম করিয়া হৃদ্‌পিণ্ড আয়তনে বৃহৎ হইয়া পড়ে (dilatation of heart) সেই অবস্থাতে।

ত্বরিৎ ফললাভের জন্য অনেকে ডিজিটেলিসের ইন্‌জেকশন ব্যবহার করিয়া থাকেন। **ডিজিটেলিন্** (digitalin) ও **ডিজিপিউরেটাম্** (digipuratum) দুইই ইন্‌জেকশনে ব্যবহার হয়। তবে ডিজিটেলিনে ঠিক ডিজিটেলিসের ক্রিয়া পাওয়া যায় না, এবং ডিজিটেলিসের সমস্ত গুণটি উহাতে থাকে না। উহা অপেক্ষা বরং ডিজিপিউরেটাম্ই উত্তম।

ষ্ট্রোফ্যান্থিন্ (Strophanthin)—আশু হার্টফেল নিবারণের জন্য ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা ডিজিটেলিসের মত শীঘ্র রক্তে গিয়া পৌছিতে পারে না সেইজন্য ইহা প্রথম বারে **ইন্ট্রাভেনাস** ইন্‌জেক্‌শন রূপেই প্রয়োগ করা উচিত, এবং তাহাতে অভিলষিত ফলও তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। ইহার মাত্রা সাধারণতঃ ১/২৫০ গ্রেন। ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌শনের দ্বারাও ইহা দ্বিতীয়বার

প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং তৃতীয়বার দিতে হইলে উহার চার ঘণ্টা পরে আবার দেওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ডিজিটেলিস্ দিবার পর ষ্ট্রোফ্যান্থিন্ ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া বিপজ্জনক, কিন্তু অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না। অন্ততঃ উপস্থিত বিপদের সময় এ সকল মতদ্বৈধের কথা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন নাই। ষ্ট্রোফ্যান্থিন্ ইন্‌জেক্‌শনের দ্বারা অনেক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনা যায়। মার্কের (Merck) প্রস্তুত ষ্ট্রোফ্যান্থিন্ই সকলে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কার্ডিয়াজল্ (Cardiazol)—ইহা কর্পূর হইতে প্রস্তুত এবং ষ্টিমুল্যান্ট হিসাবে ইহা আজকাল যথেষ্ট ব্যবহার হইতেছে। তবে ইহা অপেক্ষা **কেফীন** (Caffeine) ও **থিওব্রোমিন্** (Theobromine group) হইতে প্রস্তুত ডাইউরেটিন (Diuretin) প্রভৃতির ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী।

ইউফাইলিন্ (Euphyllin)—ইহাও ঐ জাতীয় ঔষধ। হৃৎপিণ্ডকে ইহা সবল করে। হার্টের মাংসপেশীগুলির মধ্যস্থ উহার নিজস্ব ধমনী সকলকে (coronary vessels) ইহা স্ফীত করে, স্থতরাং রক্তচলাচলের দ্বারা উহার মাংসকোষগুলির উপযুক্ত খাদ্য (nutrition) অধিক পরিমাণে সরবরাহ হইতে থাকে, তাহাতে উহার দুর্ব্বলতা দূর হয়। ডিজিটেলিসের এ শক্তি নাই। হার্টের বলকারক হিসাবে ইউফাইলিন্ উত্তম ঔষধ।

অ্যাট্রোপিন্ ও ষ্ট্রিক্‌নিন্ (Atropine and Strychnine)—উত্তেজক হিসাবে এই দুইটি ঔষধ কখনো কখনো একত্রে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত অবস্থায় ইহা প্রযুক্ত—

(১) যখন রোগীর অনবরত ঘাম হইতে দেখা যাইতেছে।

(২) যখন শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হইতেছে। ষ্ট্রিক্‌নিন্ ও অ্যাট্রোপিন্ দুইই শ্বাস ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে (respiratory centre) উত্তেজনা আনয়ন করে।

(৩) যখন নাড়ী খুব দুর্ব্বল অথচ দ্রুতগতি, যেমন নিউমোনিয়াতে প্রায় দেখা যায়। অ্যাট্রোপিন অধিক মাত্রায় দিলে ভেগাস্ স্নায়ুকে নিস্তেজ করিয়া নাড়ীর গতি আরো বাড়াইয়া দিতে পারে বটে কিন্তু অল্পমাত্রায় ১/১৫০ গ্রেন হিসাবে দিলে সে ভয় নাই। ইহা বরং নাড়ীকে সবল করে এবং গতির

মাত্রা কমাইয়া দেয়। অ্যাট্রোপিন ১/১০০ গ্রেন মাত্রায় ও ষ্ট্রিক্নিন্ ১/৬০ গ্রেন মাত্রায় ইন্‌জেকশন দেওয়া উচিত।

অ্যাড্রেন্যালিন্ (Adrenaline chloride solution)—সময়ে সময়ে ইহাও বিশেষ উপকারী। ইহা হৃৎপিণ্ডকে সবল করিতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রক্তশিরাগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া রক্তের চাপ (blood pressure) বাড়াইয়া দেয়। সুতরাং নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে, বিশেষতঃ শিশুদের নিউমোনিয়া ও ডিফ্‌থীরিয়া প্রভৃতি বিষাক্ত রোগে যদি দেখা যায় নাড়ীর চাপ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, তখন ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঐ সকল রোগের বিষের দ্বারা স্থানীয় স্নায়বিক শৈথিল্য হেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীগুলির চাপ অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে (vasomotor paralysis), এবং হার্টফেলের ইহাও এক অন্যতম কারণ,—সুতরাং যেখানেই ঐরূপ অবস্থা সন্দেহ করা যায় সেইখানেই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য এরূপ অবস্থায় অ্যাড্রেন্যালিন্ মুখ দিয়া খাওয়াইয়া বিশেষ ফল হয় না, তখন ইনজেক্‌শন দেওয়া কর্ত্তব্য। ইনজেক্‌শনের মাত্রা অতি কম হওয়া দরকার,—২ ফোঁটা হইতে ৫ ফোঁটার অধিক ইহা কখনই দেওয়া উচিত নয়। কোল্যাপ্স্ (collapse) অবস্থায় বারে বারে ইহা প্রযোজ্য।

অক্সিজেন্ (Oxygen)—যদি হার্ট দুর্ব্বল থাকে, নিঃশ্বাসের কষ্ট থাকে, রোগীর ঘাম হইতে থাকে এবং মুখে নীলাভা (cyanosis) দেখা যায়,—তাহা হইলে অক্সিজেন বাষ্প ব্যবহার করা প্রয়োজন। কেবল নিউমোনিয়া বা ফুসফুস্ সংক্রান্ত রোগেই নয়, টাইফয়েডেও ইহা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। টাইফয়েড রোগে যদি দেখা যায় যে নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১২০-র উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তখন হইতেই অক্সিজেন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। টাইফয়েডের নাড়ী ১২০-র উপর উঠিতে দেওয়া উচিত নয়, এবং হার্টের দুর্ব্বলতা আশঙ্কা করিলে তখন হইতেই তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত। অক্সিজেন প্রয়োগ করিলে শ্বাস প্রশ্বাসের উপকার হয় সত্য, কিন্তু তদপেক্ষা হার্টের উপরই ইহার অধিক ক্রিয়া হয়।

অক্সিজেন বাষ্প প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে সিলিণ্ডারের চাবি খুলিয়া রবারের নলটি জলে ডুবাইয়া দেখিয়া লইতে হয় কিরূপ বেগে বাষ্প নির্গত

হইতেছে। এমন ভাবে চাবি খোলা উচিত যাহাতে নল ডুবাইলে জলের ভিতর **প্রতি মিনিটে ৬০।৭০টি** বুদ্বুদ উঠিতে থাকে। অতঃপর নলের সহিত একটি কাচের ফানেল্ (funnel) যুক্ত করিয়া উহা রোগীর নাক ও মুখের উপর অতি নিকটে লইয়া ধরিতে হয়। উহা নাক হইতে তিন ইঞ্চির অধিক দূরে রাখা উচিত নয়, তাহাতে অক্সিজেন দেওয়া না দেওয়া সমান হয়। অক্সিজেন কেহ কেহ প্রতি ঘণ্টায় ১৫ মিনিট করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন, কেহ কেহ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে বলেন। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় কোনো বিশেষ ফল হয় না। ইহা অপেক্ষা অক্সিজেন একবার দিতে আরম্ভ করিলে উহা বরং **একাদিক্রমে ৩।৪ ঘণ্টা** কাল দিয়া হার্টের অবস্থা কতকটা ভাল হইয়া আসিলে কিছু সময়ের জন্য উহা বন্ধ রাখিয়া দেওয়াই উত্তম ব্যবস্থা।

কাচের ফানেল মুখের যতই কাছে রাখা হউক, অক্সিজেন কতকটা মাত্র ভিতরে প্রবেশ করে এবং কতকটা হাওয়ার সহিত মিশিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা এই, অক্সিজেন সিলিণ্ডারের রবারের নলের প্রান্তভাগে একটি ছোট কাচের পাইপ যোগ করিয়া উহা রোগীর মুখের ভিতর ধরাইয়া দিয়া তাহাকে বলিতে হয় বাষ্পটি তামাক খাওয়ার মত টানিয়া লইতে। ইহাতে বাষ্পেরও অপচয় হয় না এবং রোগীও কোনোরূপ অস্বস্তি অনুভব করে না।

আর এক উপায় রবারের ক্যাথিটার নলের সহিত যোগ করিয়া উহা নাকের মধ্য দিয়া একেবারে গলার ভিতর (naso-pharynx) পর্য্যন্ত চালাইয়া দেওয়া। রোগী অচৈতন্য অবস্থায় না থাকিলে এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না।

অক্সিজেন প্রয়োগ করিবার আরও নানারূপ ব্যবস্থা আছে। Haldane's mask বলিয়া একরূপ মুখোসের মত ব্যাগ আছে, উহা মুখ ঢাকিয়া গলা পর্য্যন্ত লাগানো থাকে, এবং তাহার মধ্যে অক্সিজেন অধিক চাপে (high pressure) প্রয়োগ করা হয়,—কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। আরও এক উপায় অক্সিজেনের তাঁবু (Oxygen tent) বা ছিদ্রবিহীন মশারির মধ্যে রোগীকে রাখা এবং উহার ভিতর নিত্য অক্সিজেন সরবরাহ করিতে থাকা,—কিন্তু সে ব্যবস্থাও এখানে কোথাও নাই।

অক্সিজেন বাষ্প প্রয়োগ করা ছোট ছেলে-মেয়েদের পীড়াতে বিশেষ করিয়া উপকারী।

জ্বরের উপসর্গ চিকিৎসা

জ্বরের সহিত প্রায়ই নানাপ্রকার উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। বলা বাহুল্য চেষ্টা করিলেই সমস্ত উপসর্গ দূর করা যায় না; এমন কতকগুলি উপসর্গ থাকে, রোগ উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত যে গুলির কিছুতে নিবৃত্তি করা যায় না। তথাপি যতটা সম্ভব রোগীর কষ্টলাঘবের চেষ্টা করা উচিত। সমস্ত প্রকার উপসর্গের কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়, কেবল সচরাচর যে সকল উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলির কথাই এখানে উল্লেখ করা হইল।

বমি ও হিক্কা—জ্বরের সহিত বমির লক্ষণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক জনের বমি এমন অনিবার্য্য হইয়া ওঠে যে কোনো প্রকারেই তাহা বন্ধ করা যায় না। তথাপি চেষ্টা করিতে করিতে নানাপ্রকার উপায়ের মধ্যে কোনোটিতে হয়তো আশ্চর্য্য উপকার দেখায়। যে কয়প্রকার উপায় উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাই এখানে বিবৃত হইল। তবে কোনো প্রকার ঔষধ মুখ দিয়া খাইতে না দেওয়াই বমির উত্তম চিকিৎসা। অতিরিক্ত বমি হইতেছে দেখিলে সর্ব্বাগ্রে ঔষধের সংখ্যা কমানোই আবশ্যক। তখন ইন্‌জেকশন প্রভৃতির দ্বারা অথবা মলদ্বার দিয়া **গ্লুকোজ** এবং **সেলাইন্‌** অথবা ইন্‌ট্রাভেনাস ইন্‌জেক্‌শনের দ্বারাও গ্লুকোজ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়। বমি নিবারণের অন্য কয়েকটি বিভিন্ন ব্যবস্থা নিম্নে লিখিত হইল :—

(ক) ক্যালোমেল— ১/৬ গ্রেন
সোডা বাইকার্ব—১/২ গ্রেন

ঔষধ দুইটি একত্রে মিশাইয়া আধঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে। এইরূপ ৪।৫টি পুরিয়া দিতে দিতেই বমি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। বমির জন্য ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও উত্তম ব্যবস্থা। কেহ কেহ ইহার সহিত এক আধ গ্রেন ক্লোরিটোন (Chloretone) মিশাইয়াও দেন। কিন্তু উহা খাইতে বিস্বাদ, রোগী-বুঝিয়া উহা প্রয়োগ করা উচিত।

(খ) **টিংচার আইওডিন** (Rect.) এক ফোঁটা করিয়া অল্প জলের সহিত প্রতি ঘণ্টায় কয়েকবার খাইতে দেওয়াও উত্তম ব্যবস্থা।

(গ) **অ্যাড্রেন্যালিন্‌** (Adrenaline Chloride Sol.) তিন ফোঁটা করিয়া অল্প জলের সহিত অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ মাত্রা দিলেও অনেকের বমি বন্ধ হয়। ইহাতে হিক্কারও উপকার হয়। কেহ কেহ অ্যাড্রেন্যালিনের সহিত আরো কিছু কিছু মিশাইয়া মিকশ্চার প্রস্তুত করিয়া দেন, যথা—

অ্যাড্রেন্যালিন—	৫ ফোঁটা
কার্ব্বলিক অ্যাসিড—	১/২ ফোঁটা
হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড্‌ ডিল—৩ ফোঁটা	
ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার—	৪ ড্রাম

(ঘ) যদি বমির সঙ্গে অম্লের লক্ষণ থাকে তবে একবার একগ্লাস জলে এক ড্রাম বা দুই ড্রাম পরিমাণ **সোডা বাইকার্ব** গুলিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিলে ভাল হয়। ইহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া গেলেও সোডার দ্বারা পেট ধুইয়া যায় বলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর বমি হয় না। যদি ইহা পেটে থাকিয়া যায় তবুও ভাল, কারণ তাহাতে ডুয়োডিনাম ধুইয়া গিয়া কতকটা জোলাপের মত কার্য্য হয়।

(ঙ) **ক্লোরিটোন্‌ও** (Chloretone) বমির ভাল ঔষধ। ইহা ৫ গ্রেন বা ১০ গ্রেন মাত্রায় একবার রাত্রিকালে প্রয়োগ করিলে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে এবং বমিও বন্ধ থাকে। ইহা ক্যাপ্‌সুলের মধ্যে ভরিয়া দেওয়াই উচিত।

(চ) যে রোগীর অধিকদিন যাবৎ নিত্য বমি হইতেছে, অর্থাৎ বমি যেখানে ক্রনিক্‌ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে নিম্নলিখিত দুইপ্রকার বড়ি একসঙ্গে খাইতে দিলে বিশেষ ফল হয় :—

ক্লোরিটোন্‌ (Chloretone)—	২ গ্রেন
অ্যানিস্‌থেসিন্‌ (Anaesthesin)—	১/২ গ্রেন
সীরিয়াম্‌ অক্‌জ্যালেট্‌ (Cerii oxalate)—	১/২ গ্রেন
পাঁউরুটির খণ্ড (Bread)—	অল্প পরিমাণ (Q. S.)

একপ্রকার বড়ি।

মেন্থল (Menthol)—	¼ গ্রেন
পাঁউরুটির খণ্ড (Bread)—	অল্প পরিমাণ (Q. S.)

অন্যপ্রকার বড়ি।

এই দুইপ্রকার বড়ি পৃথকভাবে প্রস্তুত করিবার কারণ এই যে মেন্থল ও ক্লোরিটোন একসঙ্গে মিশিলেই গলিয়া যায়, সেইজন্য এই দুটিকে পৃথক করিয়া রাখিতে হয়, এবং খাইবার সময় একত্রে দিতে হয়।

(ছ) **নিম্ন অন্ত্র প্রত্যহ ধৌত করা** (Bowel wash)—বমি এবং হিক্কার ইহা অতি উত্তম চিকিৎসা। এক পাইণ্ট্ জলে এক ড্রাম সোডা বাইকার্ব গুলিয়া সেই জল ডুশ দিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিতে হয়। হিক্কার ইহাতে যথেষ্ট উপকার হয়; কারণ বৃহৎ অন্ত্রে কোনো অবরোধ বা চাঞ্চল্য (irritation) উপস্থিত হওয়াতেই প্রধানতঃ হিক্কা হইয়া থাকে, এবং অন্ত্রধৌত করিয়া দিলেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়।

উদরাময়ের উপসর্গ (Diarrhoea)—জরের সঙ্গে কখনো কখনো উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যায়। অনেক সময় মনে হয় যে রোগের বিষ নিষ্কাশনের জন্য (elimination) ইহা প্রকৃতির একরূপ প্রচেষ্টা। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে বস্তুতঃ তাহা নয়, যেখানেই উদরাময়ের লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে সেখানেই দেখা গিয়াছে যে অন্ত্রের মধ্যে কোনো-রূপ স্থানীয় প্রদাহ বা ক্ষত রহিয়াছে, নতুবা ওরূপ উদরাময় হইতে পারে না। এই ক্ষত বা প্রদাহ ঐ বর্ত্তমান রোগ হইতেই সৃষ্ট হয় এবং ইহা উক্ত রোগেরই একটি অঙ্গ স্বরূপ।

অতএব রোগটির উপযুক্ত চিকিৎসা করিলেই উদরাময়েরও চিকিৎসা করা হইবে। অল্পস্বল্প উদরাময় দেখা গেলে উহার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া উহাকে দমন করিবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। হঠাৎ উদরাময় হইলে প্রথমে দেখা উচিত পথ্যের দোষে উহা হইতেছে কিনা, এবং যদি কোনো পথ্য হজম হইতেছে না বলিয়া সন্দেহ হয় তবে উহা বন্ধ করিয়া দিয়া খুব সহজে যাহা হজম হয় এরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। এ ছাড়া একটু কোষ্ঠতারল্য বরং থাকাই ভাল, কারণ অনেক সময় তাহা

না থাকিলে বরং প্যারাফিন্, ক্যালোল্ (Calol) প্রভৃতির দ্বারা উহা করাইয়া লইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে; কিন্তু যদি অত্যধিক মাত্রায় উদরাময় দেখা দেয় এবং উহাতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে বলিয়া অনুমান হয়, তখন উহা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এরূপ উদরাময়ের উপসর্গ নিবারণের জন্য আমরা প্রায়ই **বিস্‌মাথ** ব্যবহার করিয়া থাকি। পূর্ব্বকালে ইহার জন্য ডাইলিউট সাল্‌ফিউরিক্ অ্যাসিড্ ব্যবহৃত হইত; Burney Yeo ব্যবহার করিতেন ক্লোরিন্ মিকশ্চার (Chlorine mixture)।

বিস্‌মাথ আমরা নানারূপে দিয়া থাকি। অনেকে **অর্‌ফল্** (Orphol) ১০ গ্রেন মাত্রায় উদরাময় বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত দৈনিক ২।৩ বার দেওয়া পছন্দ করেন। কেহ কেহ ইহার সহিত **ট্যানিজেন্** (Tannigen) ৫ গ্রেন করিয়া মিশাইয়া দুইটি ঔষধ একসঙ্গে প্রয়োগ করেন। কেহ বা **বিস্‌মাথ সবনাইট্রেট** (Bismuth subnitras) ব্যবহার করেন এবং উহার সহিত **বিটান্যাফথল্** (βnaphthol) মিশাইয়া দেন। কেহ বা **বিস্‌মাথ সবগ্যালেট্** (Bismuth subgallate) ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই গুলিতে যদি উপকার না হয় তবে কোনো কোনো সময় **ডোভার্স পাউডার, লাইকার ওপিয়াম্** প্রভৃতি আফিমসংযুক্ত ঔষধ দুই একমাত্রা দিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অবশ্য কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসক কখনও উদরাময় বন্ধ করিবার জন্য আফিম ব্যবহার করিতে চান না। কিন্তু এক এক সময় ইহা ব্যতীত উপায়ও থাকে না। বিশেষতঃ যাহাদের আফিম খাওয়ার অভ্যাস আছে তাহাদের যদি উদরাময় হয়, তবে উহা মারাত্মক হইয়া পড়ে এবং তখন আফিম ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে সে উদরাময় দমন করা যায় না।

উদরাময় প্রত্যহ হইতে থাকিলে নিম্ন অন্ত্র ধৌত করিয়া দেওয়াও (Bowel wash) মন্দ ব্যবস্থা নয়। কেবল টাইফয়েড রোগে প্রথম সপ্তাহটি ছাড়া অন্য সময় ইহা চলে না। অন্যান্য রোগে অনায়াসে চলিতে পারে। অন্ত্র ধুইবার জন্য এক পাইন্টের অধিক জল দেওয়া উচিত নয়। ঐ জলে অল্প একটু বোরিক্ এসিড (প্রতি পাইন্টে ১ ড্রাম) মিশাইয়া দিতে

হয়, অথবা পটাস্ পার্ম্যাঙ্গানেট্ (Pot. permanganate) এক পাইণ্ট জলে ½ গ্রেন হিসাবে গুলিয়া দিতে হয়। ইহাতে স্থানীয় প্রদাহের নিবৃত্তি হয় এবং অন্ত্রের বিষ নষ্ট করে।

সর্দ্দি কাসির উপসর্গ (Pulmonary complications)—কয়েক প্রকার জ্বরে বুকে সর্দ্দির লক্ষণও দেখা যাইতে পারে। টাইফয়েডে ইহা প্রায় জ্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই দেখা দেয়। তবে ইহা অল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, বিশেষ গুরুতর হইতে পারে না। কোনো জ্বরের আনুষঙ্গিক রূপে যে শ্লেষ্মার উদ্রেক দেখা যায় তাহা প্রায় ব্রঙ্কাইটিসের আকারেই হইয়া থাকে, কিংবা উহা বড় জোর ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ার অবস্থা পর্য্যন্তও অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু আসল নিউমোনিয়ার মত ফুসফুস্ আক্রান্ত হইতে (lobar consolidation) কখনও দেখা যায় না। সুতরাং অল্প অল্প শ্লেষ্মার লক্ষণ দেখিলে কোনো স্বতন্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। ব্রঙ্কাইটিস্ হইতেছে দেখিলে প্রথমে ক্যালসিয়াম (Calcium lactate or Calcium gluconate) ১০ গ্রেন মাত্রায় খাইতে দিলেই যথেষ্ট। স্থান বিশেষে ক্যাল্সিয়াম ইনজেকশন দিবারও প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে উহা ইন্ট্রাভেনাস দিবার আবশ্যক নাই। অল্প পরিমাণে **ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড** (Calcium Chloride 10% solution, ½ c. c. to 1 c c) ½ সি. সি. বা ১ সি. সি. মাত্রায় অনায়াসে চর্ম্ম নিম্নে বা ইনট্রামাস্কুলার ইনজেকশন রূপে প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যাইতে পারে, অথচ তাহাতে ব্যথা হয় না। আজকাল **ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটও** (Calcium gluconate) ২½ সি. সি. মাত্রায় অনেকে ইনট্রামাস্কুলার প্রয়োগ দিয়া থাকেন। ক্যালসিয়ামের দ্বারা স্নায়বিক লক্ষণগুলিরও (nervous symptoms) কিছু উপকার হয়। উপসর্গ স্বরূপ সর্দ্দিকাসির জন্য কোনো ভ্যাক্সিন বা সিরামের প্রয়োজন নাই।

কোষ্ঠবদ্ধতা—কোষ্ঠবদ্ধতার কথা পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। জ্বরের প্রথম অবস্থাতেই সুবিধা পাইলে একবার উত্তমরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিলে খুবই ভাল হয়। সেজন্য ক্যালোমেল ও সেলাইন পার্গেটিভ, অথবা ক্যাষ্টর অয়েল প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু জ্বর

কিছুদিন অগ্রসর হইবার পর ঐ সকল ব্যবস্থা নিরাপদ নয়, এবং টাইফয়েড রোগে এ অবস্থায় কোনো জোলাপই দেওয়া যায় না। তখন **গ্লিসিরিন ও গরম জলের** অথবা **গ্লিসিরিন ও ওলিভ অয়েলের** পিচকারী দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। অন্যান্য প্রকার জ্বরে মৃদু ক্রিয়াযুক্ত জোলাপ প্রয়োগ করার আবশ্যক হয়। জ্বরকালীন জোলাপ হিসাবে সিরাপ অফ ফিগ্স্ (Syrup of figs) অথবা প্যারাফিন সংযুক্ত ঔষধগুলি ব্যবহার করাই প্রশস্ত। প্যারাফিনযুক্ত ক্রীম অফ ম্যাগনিসিয়া (Boots' cream of Magnesia) নামক ঔষধটি জ্বরকালীন জোলাপের পক্ষে উপযুক্ত।

মূত্রকৃচ্ছতা—সময়ে সময়ে জ্বরের মধ্যে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যাইতেও দেখা যায়। কেবল যে প্রস্রাবের মাত্রা কমিয়া যাওয়াতেই এইরূপ হয় তাহা নয়, অনেক সময় প্রস্রাব মূত্রথলিতে জমিয়া থাকিলেও তাহা নির্গত হইতে চায় না, এবং রোগী অচৈতন্যের অবস্থায় থাকিলে সে এ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখও করে না। সেইজন্য প্রস্রাব সম্বন্ধে প্রত্যহ বিশেষ সংবাদ রাখা প্রয়োজন এবং কতখানি প্রস্রাব দৈনিক হইতেছে তাহারও হিসাব রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া পেটে হাত দিয়া নিত্য দেখা উচিত থলিতে প্রস্রাব জমিয়া রহিয়াছে কি না। অ্যাল্‌কালাইন ঔষধাদি দিলে প্রস্রাব সরল থাকে সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথচ মূত্রাশয়ে জমিয়া আছে দেখিলে তলপেটে ফোমেণ্ট প্রভৃতি দিয়া প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করিতে হয়। গ্লিসিরিনের পিচকারী দিয়া একবার দাস্ত করাইয়া দিলে উহার সঙ্গে সঙ্গেও অনেক সময় প্রস্রাব নির্গত হইয়া যাইতে পারে। নানাপ্রকার উপায় করিয়াও যদি প্রস্রাব না হয় তবে অগত্যা ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইয়া দিতে হয়।

শয্যাক্ষত বা বেড্সোর (Bedsore)—অনেক দিন বিছানায় শুইয়া শুইয়া দুর্ব্বল জ্বর-রোগীর অনেক সময় পিঠের দিকে বেড্সোর হইতে দেখা যায়। এইজন্য প্রথম হইতে যদি প্রত্যহ একবার **স্পিরিট** দিয়া পিঠ ঘষিয়া মুছিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিঠের চামড়া শক্ত হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে বেড্সোর হইতে পারে না। স্পিরিট দিয়া মুছাইয়া পিঠে কিছু পাউডার মাখাইয়া দিলে আরো উত্তম হয়। বেড্সোর একবার আরম্ভ হইয়া

গেলে তাহা আরোগ্য করা অতি কঠিন। ইহার জন্য নানারকম ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু স্পিরিট ও পাউডার অপেক্ষা কোনোটিকেই অধিক ফলপ্রদ বলিয়া মনে হয় না। কেবল মাত্র **আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির** প্রয়োগের দ্বারা (ultra-violet rays) অনেকটা উপকার দেখিতে পাওয়া যায়।

মুখের ঘা—জর-রোগীর মুখ নিত্য পরিষ্কার রাখা অতি আবশ্যক। রোগী নিজে এ সময় মুখের কোনোই যত্ন লইতে পারে না, সেইজন্য প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া মুখ পরিষ্কার করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, নতুবা শীঘ্রই মুখে ঘা হইয়া পড়ে। এ জন্য কিছু লবণ-জল, বা গ্লাইকোথাইমোলিন্ বা লিষ্টারিন প্রভৃতির দ্বারা কুল্‌কুচা করাইয়া দিলে অথবা অপারগ হইলে আঙলে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া ঐরূপ ঔষধাক্ত জলে ডুবাইয়া মুখের ভিতর মুছাইয়া দিলেও উত্তম পরিষ্কার হয়। মুখে ঘা হইতে আরম্ভ হইলে কুল্‌কুচা করিবার জন্য কণ্ডিজ্ লোশন্ অর্থাৎ পাতলা করিয়া পটাস্ পার্ম্যাঙ্গানেটের জল উত্তম ঔষধ। আর একটি উত্তম ঔষধ ইলেক্ট্রোলিটিক ক্লোরিন (জলের সহিত অল্প পরিমাণে মিশাইয়া কুল্‌কুচা করা)। হাইড্রোজেন পেরক্সাইডও অতি উত্তম। এই সকল ঔষধাক্ত জলের দ্বারা মুখ ধোয়াইয়া তুলির দ্বারা ভিতরে বোরিক গ্লিসিরিন (Boric glycerine) লাগাইয়া দিলে ঘা শীঘ্র আরোগ্য হয়।

জ্বরের পথ্য

আগেকার দিনে জর হইলেই আমাদের দেশে ব্যবস্থা করা হইত—লঙ্ঘন ও উপবাস। তখনকার ধারণা ছিল যে জর হইলেই হজম শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় ও শরীর রসস্থ হয়, এবং সেই রসকে জীর্ণ করিবার জন্য উপবাসই প্রশস্ত। এই ব্যবস্থা দুই একদিনের জরে চলিতে পারে এবং তাহাতে উপকারও হয়, কিন্তু দুই একদিনের অধিক কাল রোগীকে উপবাস করাইলে তাহার অনিষ্ট করা হয়। সাধারণ অবস্থায় আমরা যে সকল গুরু ও কঠিন খাদ্য খাইয়া থাকি, জর হইলে তাহা তখনই বন্ধ করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ জর হইলে ঐসকল খাদ্য হজমের শক্তি কমিয়া যায় ইহা সত্য কথা; কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে এমন খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া উচিত যাহা স্বাভাবতঃই তরল এবং চিবাইতে না হয়,

যাহা জর কালেও অনায়াসে হজম হইতে পারে, অথচ যাহা পুষ্টিকর এবং জরের জন্য শরীরের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা যথাসম্ভব পূরণ করিতে পারে। জরের সময় খাদ্য মাত্রেই একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নয়, এবং সেরূপ অন্যায় আদেশ করিলে তাহা কখনও প্রতিপালিত হয় কি না সন্দেহ।

পথ্যের উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসার অর্দ্ধেক অংশ করা হয় বলিয়া যে কথা আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি, তাহা যে কতদূর সত্য একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। জর হইলেই শরীরের ক্ষয় হইতে থাকে এবং ওজন কমিয়া যায় এ কথা সকলেই জানেন। তাহার কারণ শরীরের অনেক সার পদার্থ (body proteins) জরের তাপে পুড়িয়া গিয়া প্রস্রাবাদির সহিত নাইট্রোজেন রূপে নির্গত হইতে থাকে; জর যত অধিক হয় নাইট্রোজেনের অপচয়ের মাত্রা ততই বাড়িতে থাকে ইহা রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন দেখা যায় যে রোগী যতটা নাইট্রোজেন-পদার্থ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে উহা প্রস্রাবের সহিত ত্যাগ করে। এই অতিরিক্ত নাইট্রোজেন শরীরের সঞ্চয় স্থান হইতেই ব্যয় হইতে থাকে। সেই অতিরিক্ত ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য জরে উপযুক্তরূপ পথ্যের প্রয়োজন। অতএব পথ্যের ব্যবস্থার সময় এইরূপ আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে যে, জরের তাপে দগ্ধ হইবার জন্য যতটা ইন্ধনের প্রয়োজন তাহা যেন বাহির হইতে পথ্যের মধ্য দিয়া যথাসম্ভব সরবরাহ করা হয়, এবং শরীরের সঞ্চয়ের উপর বিশেষ টান না পড়ে। কার্য্যক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াও বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহাতে রোগীর অপকার না হইয়া যথেষ্ট উপকার হয়, এবং উপযুক্ত পথ্য পাইলে রোগী জর সত্ত্বেও শীঘ্র নিস্তেজ হইতে পারে না। অবশ্য এ অবস্থায় সহজপাচ্য ও ইন্ধনশক্তি (caloric value) সম্পন্ন উপযুক্ত পথ্যের প্রয়োজন। একমাত্র কার্বোহাইড্রেট্ বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যেরই এই গুণ আছে, সেইজন্য জরের সময় এই গুলির ব্যবস্থাই বিশেষ করিয়া করা হয়। দুধও উপযুক্ত খাদ্য, কিন্তু দুধে প্রোটীন বা পলীয় দ্রব্যই অধিক থাকে, কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা খুব কম। সেইজন্য দুধ স্বতন্ত্রভাবে না দিয়া উহার সহিত কোনো

কার্বোহাইড্রেট,—অর্থাৎ বার্লি, সাগু, খই, এরারুট, শটি, ওটমিল, হর্লিক, মেলিন্স ফুড, মিছরি প্রভৃতি মিশাইয়া দিতে বলা হয়। আমরা অতঃপর এই সকল বিভিন্ন প্রকার কার্বোহাইড্রেট্ পথ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জ্বর-রোগীকে যথেষ্ট পথ্য দিতে হইলেও উহা এককালীন অত্যধিক মাত্রায় দেওয়া উচিত নয়। উহা নিয়মিত সময়ে ও নিয়মিত মাত্রায় দেওয়া আবশ্যক। কঠিন রোগে নিয়ম করিয়া **তিন ঘণ্টা অন্তর পথ্য** দেওয়া উচিত এবং **প্রতিবারে ৩।৪ আউন্সের অধিক দিতে নাই**। জল ছাড়া **২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ২৪ আউন্স পরিমাণ পথ্য** দিতে হইবে ইহা মনে রাখিলেই হইল। রোগী অচৈতন্য অবস্থায় থাকিলে তাহাকে নিয়মিত সময় অন্তর জাগাইয়াও পথ্য দিতে হইবে।

বার্লি—বাজারে বার্লি দুই রকম আকারে পাওয়া যায়, পার্ল বার্লি (pearl barley) অর্থাৎ দানা বার্লি, এবং বার্লি পাউডার অর্থাৎ গুঁড়া বার্লি। বার্লি অর্থে যব শস্য ইহা সকলেই জানেন। গুঁড়া বার্লি অপেক্ষা বার্লির আস্ত দানা বা পার্ল বার্লি সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করাই ভাল; এবং উহা অধিকক্ষণ সিদ্ধ না করিয়া মাত্র **১৫ মিনিটকাল** যাবৎ জলে ফুটাইয়া লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। বার্লিতে যে ষ্টার্চ দানা (starch) থাকে তাহার সেলুলোজ আবরণ (callulose coating) খুব কঠিন, সুতরাং তাহা ভেদ করিয়া বার্লির ষ্টার্চ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে অনেক সময় লাগে, অন্ততঃ তাহা দুই এক ঘণ্টার কম নয়। কিন্তু কেবল ষ্টার্চ খাইতে দেওয়া বার্লি ব্যবহারের উদ্দেশ্য নয়, বার্লিতে আসলে যে ভিটামিন ও মিউসিলেজ্ (mucilage) বা পিচ্ছিল পদার্থ থাকে এবং কিছু কিছু লবণ থাকে সেইগুলিও উহার সহিত দেওয়া উদ্দেশ্য, আর অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিলেই এই প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি নষ্ট হইয়া যায়। অতএব ১৫ মিনিটের অধিককাল বার্লি সিদ্ধ করা উচিত নয়। পার্ল বার্লির মধ্যে মর্টনের বার্লিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। দেশী বার্লিও টাট্‌কা হইলে ব্যবহার করা যাইতে পারে; অথবা উৎকৃষ্ট টাটকা যব ঝাড়িয়া লইয়া হামানদিস্তাতে কুটিয়া খোসা ছাড়াইয়া তাহা জলে ফুটাইয়া লইলেও অতি উত্তম পানীয় পথ্য প্রস্তুত

হইতে পারে। এই বার্লির জল সরবতের মতও পান করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা দুধের সহিত মিশাইয়া দিলেই আদর্শ পথ্য প্রস্তুত হয়, কারণ তাহাতে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটীন দুইই একসঙ্গে দেওয়া হয়। এই পথ্য অনেকদিন পর্য্যন্ত রোগীকে নিঃসঙ্কোচে দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে উপযুক্ত পথ্য দেওয়া হইতেছে না বলিয়া চিন্তার আর কোনো কারণ থাকে না।

অনেকে বার্লির দ্বারা রুটি প্রস্তুত করিয়া রোগীর পথ্য দিতে বলেন, কিন্তু বার্লির রুটি পথ্য হিসাবে ভাল নয়, কারণ রুটির মত প্রস্তুত করিলেও উহার সমস্ত ষ্টার্চ অসিদ্ধ ও কাঁচা থাকিয়া যায়। এই কাঁচা ষ্টার্চ পেটে গিয়া কোনোই লাভ নাই, সুতরাং বার্লির রুটি রোগীকে না দেওয়াই ভাল।

সাগু—সাগু-গাছের গুঁড়ির ভিতরের কোমল অংশ হইতে (sago pulp) সাগু-দানা জন্মায়। ইহার ষ্টার্চ তত কঠিন নয়, কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলেই উহা বাহির হইয়া আসে। অতএব অধিক ষ্টার্চের পথ্য দেওয়া যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে সাগু দুধের সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে,—তাহাতে দুধও কতকটা সহজপাচ্য হয়। সাগুর মধ্যে ষ্টার্চ ছাড়া গ্লুটেন্ (gluten) আছে, কিছু ফস্‌ফেট্‌স্ (phosphates) আছে, এবং অন্যান্য লবণ আছে। যেখানে হজমশক্তি ভাল আছে সেখানে সাগু ও দুধ উত্তম পথ্য, কিন্তু কঠিন রোগে এত অধিক ষ্টার্চ না দিয়া বার্লির ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

এরারুট—ইহাও কতকটা সাগুর মত গাছের শিকড়ের মধ্য হইতে প্রস্তুত হয়। এই গাছগুলি দেখিতে কতকটা হলুদ গাছ বা আদা গাছের মত। ইহাতে ষ্টার্চ ছাড়া আর কিছুই নাই,—ইহার খাদ্যগুণ খুবই কম। যে সময় পুষ্টিকর কোনো খাদ্য দেওয়া বিশেষ অভিপ্রেত নয় সেই সময় মন ভুলানো হিসাবে ইহা অনেকে ব্যবহার করেন।

খই—খইয়ের খাদ্যগুণ যে ভাতের অপেক্ষাও অনেক বেশী আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শুষ্ক উত্তাপের দ্বারা যখন খই ফুটিয়া যায় তখন উহার সেলুলোজের আবরণ একেবারে উন্মুক্ত হইয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ ষ্টার্চ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং পেটে যাওয়া মাত্র উহা সহজেই হজম হয়। ইহাছাড়া ধান্যের যত কিছু ভিটামিন উহাতে সম্পূর্ণরূপে বজায়

থাকে এবং লবণগুলিও অবিকৃত অবস্থায় থাকে। অধিকন্তু ইহাতে কোনো রোগের বীজাণু প্রভৃতি (disease germs and fungi) থাকিতে পারে না। সেই জন্য সাধারণ জ্বর-রোগীর পক্ষে ইহা আদর্শ পথ্য, তবে টাইফয়েড জাতীয় রোগে ইহা দেওয়া যাইতে পারে না।

খইয়ের মণ্ড করিয়া খাওয়াই উত্তম ব্যবস্থা। গরম টাট্‌কা খই প্রথমে একবার গরম জলে ফেলিয়া তখনি তুলিয়া লইবে,—ইহাতে উহার গাত্রসংলগ্ন বালির গুঁড়াগুলি ঝরিয়া নীচে পড়িয়া যাইবে। তাহার পর পুনরায় উহা অন্য গরম জলে ৫ মিনিট হইতে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই খই দুধের সহিত মিশাইয়া অথবা অন্যরূপেও খাওয়া যাইতে পারে। দুধে খই ফেলিলে উহা দুধকে ভিতরে ভিতরে শুষিয়া লয়, সুতরাং পেটে গিয়া দুধ যে ছানা বাঁধিয়া হজমের বিঘ্ন ঘটাইবে সে সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপে দুধ-খই একত্রে খাইলে দুধও শীঘ্র হজম হয় এবং খইও হজম হয়। হিক্কা ও বমির পক্ষে খই খুবই ভাল পথ্য।

চি ড়া—জ্বরের পক্ষে ইহা গুরুপাক খাদ্য। তবে বিজ্বর অবস্থায় কখনো কখনো ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার খাদ্যগুণ যথেষ্ট, এবং উহা প্রায় আটা ময়দার রুটির সহিত সমতুল্য। অধিকন্তু ইহাতে ধারকগুণ আছে।

দুধ হইতে প্রস্তুত নানারূপ হাল্কা পথ্য—

অনেক রোগী জ্বর অবস্থায় দুধ হজম করিতে পারে না, তাহার কারণ জ্বরকালে হজমশক্তি মন্দ হওয়ায় পেটের ভিতর দুধের ছানার বা কেজিনের (casein) যে শক্ত দলা বাঁধে তাহা আর ভাঙিতে পারে না, সুতরাং উহা পচিয়া উঠিয়া গ্যাস উৎপন্ন করে এবং নানারূপ অনিষ্ট করে। সেইজন্য এই সকল রোগীকে বাহির হইতে দুধ ছিঁড়িয়া (by artificial coagulation) খাইতে দেওয়া হয়, যাহাতে পেটে গিয়া উহা শক্ত দলা বাঁধিতে না পারে।

যদি খুব অল্প ছিঁড়িয়া দিলেই দুধ হজম করা যাইবে এইরূপ বোধ হয় তাহা হইলে **সাইট্রেট্-যুক্ত দুধের** (citrated milk) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রতি আউন্স দুধে ২ গ্রেন পরিমাণ সোডা সাইট্রেট, এই হিসাবে উহা মিশাইয়া দিলে দুধের কেজিন শীঘ্রই সূক্ষ্মভাবে

পৃথক পৃথক হইয়া যায়। এই দুধ তখন বার্লির জলের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা অপেক্ষা আরো হাল্কা ও সহজপাচ্য করিতে হইলে দুধ রীতিমত ফাটাইয়া (milk whey) দেওয়া উচিত। দুধ তিন রকম ভাবে ফাটানো যাইতে পারে:—

(১) **ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডের দ্বারা** (Lactic-acid coagulation)—দুধ জাল দিবার সময় তাহার মধ্যে দুই চামচ পরিমাণ দই মিশাইয়া দিলে যাহা হয় তাহাকেই বলে Lactic-acid fermentation। ইহাকে ছানা-কাটা দুধ বলা যাইতে পারে, ইংরেজীতে যাহাকে বলে whey। ইহা অবশ্য ঘোল নয়, ঘোল অন্য পদার্থ,—দধি মন্থন করিলে যাহা হয় তাহাই ঘোল। ঘোলও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পাংলা দাস্ত হইতে থাকিলে উহা বেশী পরিমাণে না দেওয়াই ভাল।

(২) **সাইট্রিক্ অ্যাসিডের দ্বারা** (Citric acid coagulation)—ফুটন্ত দুধে লেবুর রস, দিলে ছানাটি পৃথক হইয়া যায়, বাকী যাহা থাকে তাহাকে আমরা 'ছানার জল' বলি। ইহাতে প্রায় সমস্ত কেজিনটাই পৃথক হইয়া যায় সুতরাং পুষ্টিকারক কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না, কেবল অল্প একটু ল্যাক্‌ট্যাল্‌বুমেন (lactalbumen) থাকে মাত্র। ইহাতে পুষ্টিকরও বিশেষ কিছু নাই এবং ইহাতে ধারকগুণও কিছু নাই। উহা অপেক্ষা বরং পাতলা করিয়া ঘোল দিলে ভাল হয়। তবে পথ্যের বদল হিসাবে ইহা সাবধানে প্রস্তুত করিয়া দুই একবার দেওয়া যাইতে পারে মাত্র।

(৩) **পেঁপের দ্বারা** (Ferment coagulation)—দুধে জল মিশ্রিত করিয়া উনানে চড়াইয়া উহার মধ্যে কাঁচা পেঁপে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দিলে দুধ ফুটিবার সময় ছানা কাটিয়া যায়। উহা ছাঁকিয়া লইলে উত্তম whey প্রস্তুত হয়, তাহা রোগীকে অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। পেঁপের রসে ছানা কাটার গুণও আছে (milk coagulating ferment) এবং প্যাপেন (papain) নামক একপ্রকার হজমকারক পদার্থও আছে। সুতরাং জ্বরের সহিত পেটের অসুখ থাকিলে কখনো কখনো এই পথ্যে বেশ উপকার হয়।

বিলাতী দুধ—জ্বরের পথ্য হিসাবে আমরা অনেকেই নানাপ্রকার বিলাতী দুধ ব্যবহার করিয়া থাকি, কারণ মল্ট্ (malt) মিশ্রিত থাকে বলিয়া এই সকল দুধ রোগীরা সহজে হজম করিতে পারে এবং ইচ্ছামত এগুলি পাতলা বা ঘন করিতে পারা যায়। মেলিন্স্ ফুডই এজন্য সচরাচর ব্যবহার হয়, এবং হর্লিকের দুধ ও ওভাল্টিন-ও অনেকে পছন্দ করেন। Eledon (acid buttermilk) নামক পথ্য কেহ কেহ পেট-রোগাদের জন্য ব্যবহার করেন এবং প্রায়ই ইহা বেশ সহ্য হয়; ঘোলকে গুঁড়া আকারে রূপান্তরিত করা (desiccated) ব্যতীত ইহা অন্য কিছুই নয়।

বেঙ্গার্স ফুড—(Benger's food)—রোগীর জন্য উৎকৃষ্ট ও আদর্শ পথ্য বেঙ্গার্স ফুড; ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রোগীর পথ্য আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। দুধকে পেপটোনাইজ (peptonise) করিয়া উহার সহিত সুজি সিদ্ধ করিয়া মিশাইয়া তাহাতে প্যান্‌ক্রিয়াটিন্ যোগ করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব ইহাতে প্রোটীন ও কার্বোহাইড্রেট দুইই আছে, এবং বিনা আয়াসে যাহাতে পেটে যাওয়া মাত্র হজম হইতে পারে সেইরূপ উপায়ে ইহা প্রস্তুত। যে রোগী কোনো খাদ্যই হজম করিতে পারে না সেও বেঙ্গার্স ফুড হজম করিতে পারে। টাইফয়েড জাতীয় জ্বরে ইহার তুল্য পথ্য আর নাই। ইহার বিশেষ গুণ এই যে ইহা দুধকে অনায়াসে হজম করাইয়া দিতে পারে। ইহার প্রস্তুত প্রণালী কিছু জটিল, সেইজন্য ডাক্তারদের তাহা বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখা উচিত এবং ডাক্তারি শিক্ষার সময় ছাত্রদেরও ইহা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। অনেক ডাক্তার বলিয়া থাকেন যে বাঙালীর ঘরে এরূপ জটিল প্রক্রিয়াতে পথ্য প্রস্তুত করানো সম্ভব হয় না, কিন্তু ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। যে সকল গৃহস্থ প্রত্যহ ছত্রিশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া থাকে তাহারা যে একটি পথ্য নিয়মমত প্রস্তুত করিতে পারিবে না ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসল কথা ভালমতে বুঝাইয়া দেওয়া হয় না বলিয়াই মেয়েরা ইহা প্রস্তুত করিতে পারে না, ঠিকমত বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাহারা অনায়াসেই ইহা করিতে পারিবে। কেবল প্রস্তুত প্রণালী বুঝাইয়া দিলে হইবে না, ইহা যে রোগীর পক্ষে কত উপকারী তাহাও বলিয়া দেওয়া দরকার।

বেঙ্গার্স ফুডের প্রস্তুত প্রণালী বস্তুতঃ বিশেষ কঠিন নয়। উহার বিজ্ঞাপনে ফুড তৈয়ারী করিবার যে সব নিয়ম লেখা থাকে সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না এবং সেইজন্য উহা প্রস্তুত করা সম্ভব বলিয়া মনে করে না। ঐ সকল লিখিত নিয়ম কেবল বিলাতী রন্ধনশালার জন্য, যেখানে থার্মোমিটার প্রভৃতি যন্ত্র নিত্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বেঙ্গার্স ফুড প্রস্তুতের অতি সহজ নিয়মও আছে, তাহা কাগজে লেখা থাকে না বটে কিন্তু সেই নিয়মে প্রস্তুত করিলে অতি সুন্দর পথ্য তৈয়ারী হয়।

বেঙ্গার্স ফুড প্রস্তুতের **পাঁচটি প্রক্রিয়া** আছে, তাহা পাঁচটি বিভিন্ন দফায় উল্লেখ করা হইল। ঠিক ঠিক নিয়ম অনুসারে এই পাঁচটি প্রক্রিয়া করিতে পারিলেই উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইবে।

(১) যে দুধ দিয়া ইহা প্রস্তুত হইবে তাহা কাঁচা এবং টাট্কা হওয়া চাই,—সদ্য দোহন করা দুধ হইলেই সকলের চেয়ে ভাল। জ্বাল দেওয়া দুধ হইলে চলিবে না। একটি পরিষ্কার পাত্রে পূরা একচামচ (চায়ের চামচের) বেঙ্গার্স ফুডের গুঁড়া লইয়া তাহাতে চার চামচ টাটকা দুধ দিয়া দুইটিকে চামচের দ্বারা নাড়িয়া উত্তমরূপে একত্রে মিশাইয়া ফেল।

(২) স্বতন্ত্রভাবে তিন আউন্স টাটকা দুধ ও তিন আউন্স জল একত্রে মিশাইয়া আগুনে ফুটাইয়া লও। একবার উত্তমরূপে ফুটিয়া উঠিবামাত্র উহা নামাইয়া লও এবং পাঁচ মিনিটকাল যাবৎ ঠাণ্ডা হইতে সময় দাও।

(৩) অতঃপর প্রথম দফায় প্রস্তুত বেঙ্গার্সফুড-গোলার মধ্যে দ্বিতীয় দফায় প্রস্তুত গরম দুধ এক হাতে অতি ধীরে ধীরে ঢালিতে থাক এবং অন্য হাতে চামচ দিয়া নাড়িয়া তাহা উত্তমরূপে মিশাইতে থাক। এত ধীরে ধীরে উহা ঢালিতে হইবে যেন সমস্ত দুধটুকু ঢালিতে ৩।৪ মিনিট সময় লাগে। ইহা যদি সম্ভব না হয় তবে চামচের দ্বারা এক এক চামচ করিয়া দুধ লও এবং প্রতিবার উহা বেঙ্গার্সফুডের সহিত ঘাঁটিয়া মিশাইয়া দাও।

(৪) সমস্ত ফুডটি এখন একটি কাচের গ্লাসে লইয়া উহা একটি গরম জলের পাত্রের মধ্যে বসাইয়া দিয়া ঘড়ি ধরিয়া ত্রিশ মিনিটকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। এই ত্রিশ মিনিট উত্তাপের মধ্যে অবস্থানকালে দুধটির উপর বেঙ্গার্স ফুডের রাসায়নিক হজমের প্রক্রিয়া চলিতে থাকিবে।

অতএব জলের উত্তাপটি যেন সমস্ত দুধটিতে লাগে এবং ত্রিশ মিনিটের মধ্যে জলটি যেন ঠাণ্ডা হইয়া না যায় এইরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। জলটি অত্যন্ত গরম হইলেও চলিবে না, কারণ তাহাতে আবার ফুডের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং জলে ফুড বসাইবার পূর্ব্বে
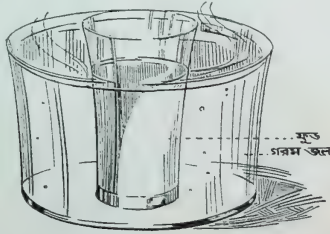
দেখিয়া লইতে হইবে যেন উহা বেশ হাতসহা গরম হয়, অর্থাৎ হাত ডুবাইলে যেন ছ্যাক্ করিয়া অত্যন্ত গরম না লাগে। সহ্য সীমার মধ্যে যে উত্তাপকে আমরা হাতসহা গরম বলি উহা Fahrenheit থার্ম্মোমিটার অনুসারে প্রায় ১৪০ ডিগ্রী। সকলেরই এই উত্তাপ অনুভবের শক্তি প্রায় সমান, অল্প ইতর-বিশেষ হয় মাত্র। আর আমরা যাহাকে কুসুম-কুসুম গরম বলি, ঐ থার্ম্মোমিটার অনুসারে তাহা প্রায় ১০০ ডিগ্রী। পাত্রের জলটি ঐ ত্রিশ মিনিটকাল যেন ১৪০ ডিগ্রী হইতে ১০০ ডিগ্রীর সীমার মধ্যে থাকে এই কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব ফুডের গ্লাসটি হাতসহা গরম জলে বসাইলে ত্রিশ মিনিট পরে দেখা যাইবে উহা তখনও কুসুম-কুসুম গরম আছে। এই প্রকার গরমের মধ্যে ত্রিশ মিনিটকাল ফুডটিকে রাখিতে পারিলেই উহার হজমক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

(৫) এখন উহা অন্যপাত্রে ঢালিয়া আর একবার আগুনে ফুটাইয়া লও এবং এক-বল্‌কা ফুটিয়া উঠিলেই নামাইয়া লও।

এই পাঁচ দফাতে ফুডটি প্রস্তুত হইয়া গেল, উহা প্রয়োজনমত ঠাণ্ডা করিয়া রোগীকে খাইতে দাও। আবশ্যক হইলে উহাতে কিছু

মিষ্ট প্রয়োগ করিতে পার। এই ছয় আউন্স ফুড একেবারেও খাইতে দেওয়া যাইতে পারে, অথবা তিন আউন্স করিয়া দুইবারেও দেওয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডায় রাখিলে ইহা দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে, তাহার অধিক রাখা চলে না। অতএব প্রত্যেকবার ইহা নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়াই ভাল।

পেপ্‌টোনাইজ্ করা দুধ (Peptonized milk)—ইহাও অতি সহজপাচ্য এবং বেঙ্গার্স ফুডের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলিতে পারে। দুধ পেপটোনাইজ করিবার জন্য এক প্রকার গুঁড়া পাওয়া যায়, তাহার নাম Fairchild's peptonizing powder (Zymine powder)। প্রথমে একভাগ দুধের সহিত দুইভাগ জল মিশাইতে হয়। পরে ঐ পাতলা দুধের এক পাইন্ট (অর্দ্ধ সের) পরিমাণ একটি কাচের গ্লাসে লইয়া উপরোক্ত গুঁড়া একটিউব পরিমাণ তন্মধ্যে মিশাইয়া দিয়া উহা বেঙ্গার্স ফুডের মত গরম জলের পাত্রের মধ্যে ১৫ মিনিটকাল বসাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপে পেপটোনাইজ হইয়া গেলে উহা তুলিয়া লইয়া একবার আগুনে ফুটাইয়া অতঃপর রোগীকে খাইতে দিতে হয়।

ফলের রস

অন্যান্য পথ্যের মাঝে মাঝে রোগীকে বরাবরই কিছু কিছু ফলের রস খাইতে দেওয়া ভাল। ইহাতে খাদ্যগুণ খুব বেশী না থাকিলেও যে সকল টাটকা ভিটামিন ও লবণ প্রভৃতি থাকে তাহাতে রোগীর অনেক উপকার করে। রোগীর জন্য যে সকল ফল ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু অধিক জ্বরগ্রস্ত রোগীকে কখনও আস্ত ফল দিতে নাই, তাহার রস বাহির করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহাই পান করিতে দেওয়া উচিত। যে যে ফলের রস নিশ্চিন্তরূপে দেওয়া যাইতে পারে তাহার কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হইল।

কচি ডাবের জল—ইহা টাইফয়েড রোগেও বেশ দেওয়া যায়। ইহাতে কিছু ক্ষার (alkali), ঈষৎ স্নেহ পদার্থ (fat), ঈষৎ অ্যাল্‌বুমেন (vegetable albumen) ও পটাস্ (potash salts) আছে,—অন্য কিছুই নাই।

ডালিমের রস—অনায়াসে দেওয়া যায়।

কমলালেবুর ও সরবতি লেবুর রস—অনায়াসে দেওয়া যায়।

আঙুরের রস—অল্প দেওয়া যাইতে পারে; বেশী দিলে পেট ফাঁপে। আস্ত আঙুর দেওয়া উচিত নয়, উহার রস করিয়া দিতে হয়।

পাকা আনারসের রস—অতি উত্তম, অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে।

কালো জামের রস—টাইফয়েডেও দেওয়া যায়।

আপেলের রস—ছেঁচিয়া রস নিংড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

জামরুলের রস—ইহাও ছেঁচিয়া রস করিয়া দেওয়া যায়। চিবাইতে দেওয়া উচিত নয়।

কেশুরের রস—কেশুর ছেঁচিয়া উহার রস নিংড়াইয়া ছাঁকিয়া দেওয়া যায়। ইহা অতি সুস্বাদু।

শাঁখআলুর রস—শাঁখআলু ছেঁচিয়া রস করিয়াও রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন **আখের রস**ও অতি উত্তম খাদ্য। ইহা গ্লুকোজের মত প্রস্রাব পরিষ্কার করে, অথচ ইহা টাটকা ভিটামিনযুক্ত খাদ্য, সুতরাং দিতে পারিলে ইহা গ্লুকোজ অপেক্ষা উত্তম জিনিষ। ইহাতে কোনোই অপকার করে না এবং বেশী জ্বরের সময়ও ইহা অনায়াসে দিতে পারা যায়। আখের রস বাহির করা কিছুই কঠিন নয়। বড় আখের ছাল ছাড়াইয়া দুই দিক ধরিয়া মোচড় দিলেই রস আপনি বাহির হইয়া আসে। এইরূপ রস পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া নির্ভয়ে রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে।

আরোগ্য পথ্য

জ্বর ছাড়িয়া গেলেই ক্রমে ক্রমে পথ্যের বদল করিবার প্রয়োজন হয়। কারণ জ্বর ছাড়িলেই যদিও বুঝা যায় যে রোগটি আর নাই তথাপি টাইফয়েড জাতীয় কঠিন রোগে অনেক সময় উহার অবশিষ্ট কিছু থাকিয়া যায়, এবং তখন শরীরও দুর্ব্বল, হজম শক্তিও ক্ষীণ থাকে। কাজেই ধীরে ধীরে খাদ্যের উন্নতি করিতে হয়। প্রথমে কয়েকদিন বেঙ্গার্স ফুড, সাইট্রেট্যুক্ত দুধ প্রভৃতি দেওয়াই ভাল, ক্রমে খাঁটি দুধ হইতে পরিবর্ত্তন সুরু করিতে হয়। তখন দৈনিক দুই একবার করিয়া দুধ-বার্লি অথবা কেবল খাঁটি দুধ দিতে দিতে দুধের মাত্রা

বাড়াইতে হয়। এই সময় মুখ বদলানো হিসাবে বাতাসা, মিছরি, চকোলেট (milk chocolates), লজেঞ্জ্ প্রভৃতি কিছু কিছু দেওয়া যাইতে পারে।

ইহার পর অবস্থা বুঝিয়া চিবাইয়া খাওয়ার মত খাদ্য অল্পে অল্পে দিতে আরম্ভ করিতে হয়। আমাদের দেশে প্রথমে ভাত দেওয়াই ভাল। কিন্তু একেবারেই রীতিমত ভাত-তরকারী খাইতে না দিয়া প্রথমে গলা-গলা ভাত দুধের সহিত মিশাইয়া নরম করিয়া দেওয়া উচিত, পরে ক্রমে তরকারী দিতে হয়।

অনেকে প্রথমে নরম পাঁউরুটি দেন, পরে ভাত দেন, তাহাও মন্দ ব্যবস্থা নয়। কিন্তু ভাতই বাংলাদেশের প্রচলিত খাদ্য, সুতরাং ভাত খাইতে পাইলে রোগী যেমন সন্তোষ লাভ করে অন্য কিছুতে সেরূপ করে না। কাজেই চিবাইয়া খাওয়ার মত যখন উপযুক্ত অবস্থা হয়, তখন একেবারে অন্নপথ্য দেওয়াই ভাল। আমাদের দেশে এখনও অনেকে দুবেলা ভাত খায়, এমন কি পল্লীগ্রামের লোকে প্রত্যহ তিন বেলা বা চার বেলা করিয়া কেবল ভাতই খাইয়া থাকে। আমাদের দেশে ময়দা বা আটার রুটির ব্যবস্থা পূর্ব্বে কখনই ছিল না। পূর্ব্বে এ অঞ্চলে পিঠাকেই রুটি বলা হইত, অর্থাৎ চালের গুঁড়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতেই রুটি প্রস্তুত করিত, অথবা গুড় দিয়া পিঠা প্রস্তুত করিত। (গুড় যদি পরিষ্কার হয় তবে তাহা যে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, এ কথাও এখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।)

অনেকে রোগীর জন্য সুজির রুটির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু সুজি সচরাচর টাট্কা পাওয়া যায় না, কারণ শস্য হইতে ইহা সাধারণ খাদ্যের মত নিত্য প্রস্তুত করা হয় না। কেবল অবান্তর দ্রব্য (bye product) রূপেই ইহা পৃথক করা হয়, এবং দোকানে বিক্রয়ের জন্য আসিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে। নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ নয় বলিয়া ইহা সর্ব্বদা টাট্কা থাকিতে পারে না। একই গোধূম শস্য হইতে ময়দা সুজি ও আটা, তিনপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। গোধূম পিষিয়া চালুনিতে ছাঁকিলে উহা হইতে যে মিহি অংশ প্রথমে বাহির হইয়া আসে তাহা ময়দা, পরে তদপেক্ষা মোটা দানা যাহা বাহির হয় তাহা সুজি, এবং সর্ব্বশেষে যাহা ভুষির গায়ে লাগিয়া থাকে তাহা আটা। অবশ্য এই

তিনরকম খাদ্যের তিন প্রকার বিভিন্ন গুণ আছে। ময়দাতে ষ্টার্চের ভাগ বেশী আছে, সুজিতে নাইট্রোজেন পদার্থ (nitrogenous element) বেশী আছে, এবং আটাতে ভিটামিন পদার্থ বেশী আছে। কিন্তু বিহারে আটা এরূপে ছাঁকিয়া প্রস্তত করে না। সে দেশে টাটকা শস্যকে যাঁতায় সর্ব্বসমেত ভাঙিয়া লইয়া উহা না ছাঁকিয়া তাহা হইতে মোটা রুটি (whole-meal bread কিংবা semolina) প্রস্তত করে।

অনেকে সুজি সিদ্ধ করিয়া লইয়া তাহার রুটি প্রস্তত করিতে বলেন। তাহার কারণ এই যে আমরা যে ভাবে রুটি সেঁকিয়া থাকি তাহাতে আটা বা ময়দা বা সুজি কিছুই ভালরূপে সিদ্ধ (baked) হয় না, অনেকটা কাঁচা থাকিয়া যায়। বিহারে বা পাঞ্জাবে এ ভাবে রুটি সেঁকা হয় না, তথায় অল্প আঁচে অনেকক্ষণ ধরিয়া রুটি সেঁকে, সুতরাং উহা উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়; কিন্তু আমরা তাহা করি না বলিয়াই সুজিকে আগে সিদ্ধ করিয়া লইয়া রুটি প্রস্তত করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। তাহাতে উহা কাঁচা থাকে না এইটুকুই লাভ, নচেৎ সুজির নিজস্ব কোনো বিশেষ উপকারিতা নাই। ইহা অপেক্ষা বরং টাটকা ময়দা বা টাটকা আটা সিদ্ধ করিয়া লইয়া পরে উহার রুটি প্রস্তত করিয়া সেঁকিয়া খাইলে অনেক ভাল হয়।

জ্বরের পরিচর্য্যা

রোগের অল্পবিস্তর পরিচর্য্যা করিতে সকলেই জানেন, সুতরাং এ বিষয়ে বিশদভাবে বলিবার কোনো আবশ্যক নাই। কেবল মোটামুটি কয়েকটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন।

পরিচর্য্যার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য রোগীকে বিশ্রাম দেওয়া। রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে বিশ্রাম দিবার জন্যই পরিচর্য্যাকারীর প্রয়োজন, কারণ বিশ্রাম পাইলেই রোগী আরোগ্য হইবার সুযোগ পাইবে, নতুবা আরোগ্য হওয়া কঠিন হইতে পারে। এজন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই বিধি মনুষ্য সমাজে প্রচলিত হইয়াছে যে কাহারো জ্বর হইলেই তাহাকে বিশ্রাম দিতে হইবে; জ্বরের রোগী সম্পূর্ণ শয্যাগত থাকিবে, জ্বর না ছাড়া পর্য্যন্ত বিছানা হইতে উঠিবে না। কিন্তু বিশ্রাম বলিতে অনেক কথা বুঝায়,

কেবলমাত্র বিছানায় শুইয়া থাকা নয়। O'meara বলেন—"Rest means a comfortable bed, well made and well cared for; it means a competent nurse to exercise every nicety of her profession; it means mental quiet, the exclusion from the sick room of unnecessary visitors, of friends and even members of the family except for such brief moments as will afford comfort to the patient"। অর্থাৎ,—"বিশ্রাম দিতে হইবে একটি সযত্ন-প্রস্তত ও সযত্ন-রক্ষিত সজ্জায়; শুশ্রূষাকারিণী তাঁহার সমস্ত শিক্ষা ও বুদ্ধি-চাতুর্য্য শুশ্রূষার জন্য নিয়োগ করিবেন; রোগীকে মানসিক বিশ্রামও দিতে হইবে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন কেহই রোগীর ঘরে ভিড় করিয়া থাকিবে না, কেবল রোগীর যদি ইচ্ছা হয় তো অল্প সময়ের জন্য তাহারা এক একবার দেখা দিবে মাত্র।" এই কথা কেবল শুশ্রূষাকারীর নয়, আত্মীয় স্বজন সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। এই জন্যই ইউরোপীয় সমাজে কাহারো অসুখ হইলেই হাঁসপাতালে বা নার্সিংহোমে চলিয়া যায়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে প্রায়ই ইহার বিপরীত ব্যবস্থা হয়। কাহারো রোগ হইলেই এদেশের লোকের আত্মীয়তা যেন বাড়িয়া যায়, অনবরত রোগীর ঘরে আত্মীয় স্বজনের ভিড় লাগিয়া থাকে, সকলেই নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে থাকে এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা ও উপদেশের দ্বারা রোগীকে আরো উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলে। ইহাতে রোগীর অনিষ্ট নিশ্চয়ই হয়। কেবল চিকিৎসায় কখনো রোগ সারে না, শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিরতিও নিতান্ত প্রয়োজন।

রোগীকে যত বিশ্রাম দিতে পারা যায় ততই ভাল। অন্য সময়ে বিছানায় থাকিবে আর মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইলেই বারে বারে উঠিয়া যাইবে, এরূপ করিলে বিশ্রামের ফলটুকু সব নষ্ট হয়। প্রস্রাব বিছানায় শুইয়া অনায়াসে করা যাইতে পারে, ইহাতে কাহারো কোনো ক্ষতি নাই কিন্তু রোগীর অনেক লাভ হয়। কঠিন রোগীকে মলত্যাগও উঠিয়া বসিয়া করিতে দেওয়া উচিত নয়, শুইয়া বা অল্প একটু বালিশে হেলান দিয়া উহা সমাধা করা উচিত। কোনো কাজেই যাহাতে শরীরের কোনো

প্রকার চেষ্টা বা শ্রম না হয় তাহাই করিতে হইবে। মলত্যাগের পর অধিক জল ব্যবহার করিতে দেওয়াও উচিত নয়, সাবধানে অল্প জল দিয়া মুছিয়া দিতে হইবে।

আবার যে রোগী অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে তাহাকে নিত্য একভাবে পড়িয়া থাকিতে দেওয়াও উচিত নয়। তাহাকে ধরিয়া সাবধানে মধ্যে মধ্যে **পাশ ফিরাইয়া** দিতে হইবে।

রোগীর গাত্র সর্ব্বদা **পরিষ্কার রাখার** চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যহ একবার করিয়া গরম জল দিয়া গা মোছানো উচিত। জ্বর কমানোর জন্য যে স্পঞ্জিং বা স্নান করানো হয়, তাহা ছাড়াও পরিষ্কার রাখিবার জন্য ইহা স্বতন্ত্রভাবে করা দরকার। এ ছাড়া পিঠ ও পাছা প্রত্যহ একবার করিয়া স্পিরিট দিয়া মুছিয়া দিতে হইবে, যাহাতে বেড্‌সোর প্রভৃতি হইতে না পারে।

রোগীর **মুখ নিত্য পরিষ্কার** রাখিতে হইবে। দাঁত ও দাঁতের মাড়ি মাজিয়া অথবা ভিজা কাপড়ে ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রত্যহ প্রয়োজন। চোখদুটিও প্রত্যহ গরম জলে ধুইয়া দিতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে বোরিক লোশন দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

মাথার চুল লইয়া অনেক সময় অসুবিধা হইতে পারে। পুরুষ হইলে চুলগুলি কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক হইলে চুল কাটিতে যথেষ্ট আপত্তি হইয়া থাকে। এ স্থলে অনর্থক চুল কাটিয়া বিশেষ লাভ নাই। অনেকে বলেন চুলের উপর বরফ দিবার সুবিধা হয় না, কিন্তু বরফ মাথায় দিলেই যে রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে তাহা নয়। বরফ দেওয়ার উদ্দেশ্য রোগীকে একটু আরাম দেওয়া, চুলের উপর দিয়াও তাহা করা যাইতে পারে। আর পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মাথায় বরফ দেওয়া ব্যতীত পেটের উপর বরফের ব্যাগ দিলে উহার চতুর্গুণ কাজ হইতে পারে।

রোগীর ঘরের জানালা দরজা সর্ব্বদা খোলা রাখা উচিত, কেবল ঝড় বৃষ্টি বা ঠাণ্ডা হাওয়া থাকিলে উহা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। **মুক্ত বাতাস** রোগীর পক্ষে বড়ই প্রয়োজন। রাত্রিকালেও জানালা দরজা

খোলা রাখিতে কোনো আশঙ্কা নাই। রোগীর গায়ে কিছু কাপড় ঢাকা থাকা ভাল, যদি শীতকাল বা বর্ষাকাল হয়। গ্রীষ্মের সময় খালিগায়ে থাকিতে দেওয়াই উত্তম।

নিয়মিতভাবে ঔষধপথ্য দেওয়াও শুশ্রূষার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে। ঔষধ ও পথ্য ঘড়ি ধরিয়া নিয়ম করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যাহা নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে, তাহার ক্রিয়াও নিয়মিতরূপে হইতে থাকিবে। সেইজন্য অচৈতন্য রোগীকে জোর করিয়া নিয়মমত ঔষধ পথ্যাদি দিতে হয়। তবে সাধারণ রোগে নিদ্রিত রোগীর নিদ্রা ভাঙাইয়া নিয়ম পালন করিবার তেমন আবশ্যক নাই, কারণ নিদ্রাও অনেক সময় বিশেষ উপকারী।

পরবর্ত্তী চিকিৎসা (After-treatment)

রোগ সারিয়া গেলেও কিছুদিন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। রোগের জন্য শরীরের যে ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তাহাই শীঘ্র পূরণ করিবার জন্য এই চিকিৎসা করিতে হয়।

জ্বর হইতে উঠিয়া অনেকের ক্ষুধামান্দ্য হইতে দেখা যায়, এই জন্য টনিকের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় তিক্ত ও অম্লগুণসম্পন্ন ঔষধাদির ব্যবহারই প্রশস্ত। নিম্নলিখিত প্রেস্ক্রিপ্‌শনের ঔষধটি অতি উত্তম টনিকের কাজ করে—

অ্যাসিড হাইড্রোক্লোর ডিল্— (Acid Hydrochlor. dil.)	১০ ফোঁটা
গ্লিসিরিণ অ্যাসিড পেপসিন্— (Glycerine Acid Pepsin)	৩০ ফোঁটা
টিংচার নক্সভমিকা—	৫ ফোঁটা
বা লাইকার ষ্ট্রীক্‌নিন্ হাইড্রোক্লোর— (Tinct. Nux vomica or Liqr. Strychnine Hydrochlor)	৩ ফোঁটা
ইন্‌ফিউশান্ জেন্‌শিয়ান্— (Inf. Gentian)	১ আউন্স

প্রত্যহ দুইবার আহারের পর সেব্য।

জর ছাড়িবার পর অনেকের কিছু দুর্ব্বলতা এবং রক্তাল্পতা হইতে দেখা যায়। উহার জন্য Stearn's Elixir Digestive Glycerophosphates অতি উত্তম ঔষধ। ইহা সকল দিকেই টনিকের মত কাজ করে। ইহাতে অ্যাসিডও আছে এবং একটু লৌহও আছে। Fellow's Syrup, Ner Vigor প্রভৃতি ঔষধগুলিও এই জাতীয়, সুতরাং এগুলিও ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে রক্তাল্পতা যদি অধিক হয় তাহা হইলে সে জন্য স্বতন্ত্ররূপ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়।

কাহারো কাহারো জরের পর কোষ্ঠকাঠিন্য হইতে দেখা যায়। সেজন্য Angier's Emulsion প্রভৃতি প্যারাফিন্-ঘটিত ঔষধগুলি বেশ উপকারী।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট জানি এ-কথা কেহই মনে করিবেন না। এখনও এ-রোগের বিষয় অনেক কথা জানিতে বাকী আছে; নতুবা চারিশত বৎসর হইয়া গেল কুইনিন ব্যবহার চলিতেছে, পঞ্চাশ বৎসর হইল ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে, চল্লিশ বৎসর হইল মশার দ্বারা ম্যালেরিয়ার সংক্রমণের কথা জানা গিয়াছে—তাহার পর আরো কত তথ্যের আবিষ্কার হইল, তথাপি দেশে দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সমান ভাবেই চলিতে থাকে কেন? ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি যে আরো কিছু জানিতে বাকী আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ কথায় হয় তো অনেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতে পারেন। কিন্তু অমীমাংসিত সমস্যাগুলির কথা ছাড়িয়া দিয়া কার্য্যতঃ এই জটিল রোগ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতটা জানিতে পারা যায় তাহাও নিতান্ত সামান্য নয়। উপস্থিত যতটা জানা গিয়াছে—চিকিৎসকের পক্ষে তাহার সমস্ত জানিয়া রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট। সকল চিকিৎসক যদি ইহার সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য জানিয়া রাখেন,—তাহা হইলেও দেশের অর্দ্ধেক ম্যালেরিয়া কমিয়া যাইতে পারে এবং অনেক অকালমৃত্যু নিবারিত হয়। স্যর উইলিয়ম অস্‌লার বলিতেন,—Know Malaria and Syphilis in all their manifestations and relations, and all other things clinical will be added unto you,—অর্থাৎ, শুধু ম্যালেরিয়া ও সিফিলিসের বিষয় যত কিছু জানিবার আছে তাহাই যদি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পার তবে ডাক্তারি সম্বন্ধে আর যাহা কিছু জানিবার তাহা আপনিই জানা হইয়া যাইবে। আমেরিকার ডাক্তারদের তিনি যদি এই উপদেশ দিয়া থাকেন, তবে আমাদের দেশের পক্ষে সে উপদেশ আরো কত বেশী প্রয়োজনীয়! বলিতে গেলে এ দেশে ম্যালেরিয়ার মত চিকিৎসকের অবশ্য-শিক্ষণীয় এমন সুলভ রোগ অথচ এমন জটিল সমস্যা আর কিছু নাই।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় সম্পূর্ণ অধিকারলাভ সহজ মনে করা উচিত নয়। ইহার জন্য রীতিমত সাধনার আবশ্যক এবং এ-সম্বন্ধে কোথায় কি তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, কে কি নূতন কথা বলিল, তাহার নিত্য সংবাদ রাখা প্রয়োজন। অবশ্য অনেকেই তাহা করিয়া থাকেন, সুতরাং এখানে যাহা লিখিত হইল তাহা তাঁহাদের পক্ষে হয় তো পুরাতন কথার পুনরুক্তি মাত্র হইবে। কিন্তু হিন্দু যেমন রামায়ণ কথা বার বার শুনিতে বিরক্ত হয় না,—চিকিৎসকের তেমনি ম্যালেরিয়ার কথার পুনরুল্লেখে বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে না। জানা থাকিলেও এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণই ম্যালেরিয়া। বাংলার পল্লী সকল তো শ্মশান হইয়াছে, সহরগুলিও বড় বাদ যায় না। সভ্যতার সমস্ত উপকরণ লইয়া শ্রেষ্ঠ রাজধানী কলিকাতাও এ রোগ হইতে নিষ্কৃতি পায় না। ম্যালেরিয়ার হাত এড়াইয়াছে এ-কথা বোধ হয় অনেক বাঙালীই বলিতে পারে না। কেবল লোকক্ষয় করিয়াই এ-রোগ ক্ষান্ত হয় না, জীবিত ব্যক্তিকেও ইহা কিরূপ অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখে তাহা এদেশের সকলেই জানে। যে বাঙালী কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত ভারতের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিল, সে বাঙালী আজ কোথায় পিছাইয়া পড়িয়াছে! যাহা কিছু জ্ঞান বুদ্ধি ও মেধা মানুষ বাল্য হইতে যৌবনের মধ্যেই অর্জ্জন করে। কিন্তু বাঙালী বাল্যকাল হইতেই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে সুরু করে এবং উন্নতির পথে পদে পদে প্রতিহত হইতে থাকে, অন্য সকলে তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্ন উদ্যম লইয়া বাঙালী পিছাইয়া পড়িবে, বিচিত্র কি? বাংলাদেশ তো সামান্য, শুনা যায় রোমরাজ্যও নাকি এইরূপে ধ্বংস হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়ার বিস্তার সীমা

ম্যালেরিয়া কেবল বাংলারই ব্যাধি নয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশ মাত্রেই ইহার প্রকোপ, শীতপ্রধান দেশেও কিছু কিছু আছে। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই অল্পবিস্তর ম্যালেরিয়া আছে; যে দেশ যত নীচু, সে দেশে ম্যালেরিয়া

তত বেশী, এবং যে দেশ যত উঁচু সে দেশে ম্যালেরিয়া তত কম। কেবল যে স্থান সমুদ্রতল হইতে ৬০০০ ফুটের অধিক উচ্চ (যেমন সিমলা পাহাড়) সেখানে ম্যালেরিয়া নাই, কারণ এত উচ্চে এনোফিলিস মশা থাকে না। ছোট নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল অনেকটা উচ্চ বলিয়া সেখানেও ম্যালেরিয়া খুব কম হয়। কিন্তু আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে ইহার যথেষ্ট প্রকোপ। পঞ্জাবে কোনো কোনো বৎসর এমন ম্যালেরিয়া হয় যে বাংলা দেশও তাহার কাছে হার মানে। বর্ম্মাতে ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যথেষ্ট ম্যালেরিয়া আছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত এসিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, রুশিয়া প্রভৃতি দেশেও ইহার অভাব নাই। পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডের সন্ধান লইলে দেখা যায় আফ্রিকার পশ্চিম তীরে এবং মধ্যদেশে ইহা এত বেশী, যে আমাদের দেশের সহিত তাহার তুলনাই হয় না। উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট ম্যালেরিয়া; পানামা অঞ্চলে পূর্ব্বে ইহাতে প্রভূত লোকক্ষয় হইত, রস্ সাহেবের প্রচেষ্টায় বহু অর্থব্যয়ে এখন সে দেশ ম্যালেরিয়াশূন্য হইয়াছে। সিন্‌কোনার জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সমস্তটাই ম্যালেরিয়া-পীড়িত। অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলসমূহও আজ পর্য্যন্ত ভীষণভাবে আক্রান্ত হইতেছে। ইউরোপও ইহাতে কম পীড়িত নয়। ইটালি ও গ্রীস আমাদেরই মত বহু বহু শতাব্দী ধরিয়া এই রোগে ভুগিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদিস্থান রোমরাজ্য, যাহা এককালে শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলনীয় ছিল, ম্যালেরিয়া তাহা ধ্বংস করিয়াছে। ইতিহাসে শুনা যায় যে বদ্ধজল ও দূষিত বায়ু ইহার উৎপত্তির কারণ মনে করিয়া তখনকার জ্ঞানী ব্যক্তিরা দেশময় বড় বড় নালা কাটিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা দেশকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এখনও ইটালির বহুস্থান অকর্ষিত অবস্থায় বন হইয়া পড়িয়া আছে; সে সকল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া এমন ভীষণ যে মানুষ তথায় বসবাস করিতে পারে না। ইউরোপের অন্যান্য স্থানে, যথা সুসভ্য ফ্রান্স, জার্ম্মানি, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, স্পেন, তুরস্ক, সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া দেখা যায়। ইংলণ্ডেও এককালে ম্যালেরিয়া ছিল; এমন কি লণ্ডন সহরেও ম্যালেরিয়া হইত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

লণ্ডন সেণ্ট্ টমাস্ হাঁসপাতালে অনেক ম্যালেরিয়া রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। টেম্স্ নদীর বাঁধ বাঁধিবার পরে নদীতীরবর্ত্তী জলাভূমি শুখাইয়া গিয়া বাসোপযোগী হওয়াতে ম্যালেরিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

সুতরাং এমন অনেক দেশ আছে যেখানে মানুষ ম্যালেরিয়ার দ্বারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক উৎপীড়িত। বৎসর বৎসর পৃথিবীর সকল দেশে ম্যালেরিয়াতে এত লোকের মৃত্যু হয় যে কোনো মহাযুদ্ধেও এত লোকক্ষয় হয় না। কেবল ভারতেই প্রতি বৎসর আট দশ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়াতে মরে। লীগ্ অফ নেশন্স্-এর তরফ হইতে ম্যালেরিয়া কমিশন সম্প্রতি সমস্ত পৃথিবীর ম্যালেরিয়া-পীড়িত রোগীর মোট সংখ্যা সংগ্রহ করিবার জন্য পৃথিবীব্যাপী সকল দেশের স্বাস্থ্যবিভাগের নিকট হইতে ম্যালেরিয়ার বাৎসরিক তালিকা চাহিয়াছিলেন। সমস্ত তালিকা একত্র করিয়া দেখা গিয়াছে যে গত ১৯৩৩ সালে ১,৭৭,৫০,৭৬০ সংখ্যক ব্যক্তি, অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি মানুষ ম্যালেরিয়াতে ভুগিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে প্রতি বৎসর কত লোক ম্যালেরিয়াতে ভুগিয়া থাকে এবং কত লোক মরে।

ইতিবৃত্ত

মনুষ্যজন্মের কোন আদিমকাল হইতে যে এই রোগের প্রথম সূত্রপাত তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ মশা যখন প্রথম মনুষ্যরক্তের আস্বাদ পায় তখন হইতেই এই রোগের উৎপত্তি। তদবধি মশার উদর হইতে মানুষের রক্তে এই জীবাণুর আদান প্রদান নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের নাশ করিয়াই হউক বা মশার উচ্ছেদ করিয়াই হউক, এই সূত্র একবার ছিন্ন করিতে না পারিলে মানুষের ম্যালেরিয়া নিবারিত হইবার নয়।

বহু পুরাকালেও যে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টজন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অর্ফিয়াসের কাব্যে পালাজ্বরের কথা উল্লিখিত আছে। পঞ্চম শতাব্দীতে হিপোক্রেটিস তাঁহার পুস্তকে পালাজ্বরের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব্বে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে জ্বরের সহিত মশকদংশনের সংশ্রবের কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে। আয়ুর্ব্বেদে যাহাকে বিষমজ্বর বলে তাহা যে ম্যালেরিয়া সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাধবনিদানে বিষমজ্বরের অতি নিখুঁৎ শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদে রেমিটেণ্ট্ ফিবারের নাম সন্ততক জ্বর; যে জ্বর প্রত্যহ একবার করিয়া আসে ও প্রত্যহ ছাড়ে তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক (subtertian), একদিন অন্তর জ্বরের নাম তৃতীয়ক (tertian), দুই দিন অন্তর জ্বরের নাম চতুর্থক (quartan)। শেষোক্তগুলি ম্যালেরিয়া ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

প্রাচীন মিশর দেশেও ম্যালেরিয়া অবিদিত ছিল না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং আরব্য চিকিৎসা পুস্তকেও সবিরাম কম্পজ্বরের উল্লেখ আছে।

এই সকল জ্বরের লক্ষণ অনুসারে তখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ চিকিৎসা চলিত, তাহাতে বিশেষ ফল হইত না। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রদেশে তথাকার রাজপ্রতিনিধির পত্নী কাউণ্টেস্ সিন্‌কন্ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া 'সিন্‌কোনার' ক্বাথ খাইয়া আরোগ্য লাভ করেন, এবং তখন হইতে সবিরাম জ্বরে সিন্‌কোনার খ্যাতি ক্রমে ক্রমে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হয়। কিরূপে সিন্‌কোনা আবিষ্কৃত হইল সে ইতিহাস পরে বর্ণিত হইবে।

অতঃপর সকল প্রকার সবিরাম জ্বরেই সিন্‌কোনা ব্যবহৃত হইতে থাকে, এবং ঐ জ্বরগুলিকে তখন দুইভাগে বিভক্ত করা হয়,—যে জ্বর সিন্‌কোনাতে সারে, এবং যে জ্বর উহাতে সারে না। ক্রমে ১৭৫৩ সালে টর্টি (Torti) সিন্‌কোনা-বাধ্য সকল জ্বরকে এক স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত করেন, এবং দূষিত বাষ্পের প্রভাবে এই গুলির উৎপত্তি অনুমান করিয়া উহার নাম দেন 'ম্যালেরিয়া' অর্থাৎ mal air বা দূষিত বায়ু হইতে উৎপন্ন ব্যাধি। এই জ্বরের কারণ সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ এই বিশ্বাস লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

অবশেষে লাভেরাঁ (Laveran) নামে ফরাসী চিকিৎসক ১৮৮০ সালে অনুবীক্ষণের সাহায্যে রোগীর রক্তকণিকার মধ্যে জীবন্ত ও গতিশীল ম্যালেরিয়া-

ম্যালেরিয়া জীবাণুর আবিষ্কারক লাভেরাঁ
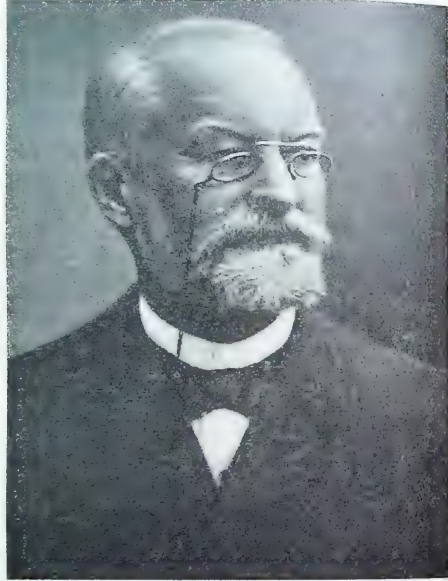
জীবাণু প্রথম দেখিতে পান। ইটালীয় পণ্ডিত গল্‌গি (Golgi) ইহার পর ১৮৮৫ সালে দেখিতে পান যে এই সকল জীবাণু আপনাআপনি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে (by sporulation), এবং রক্তকণিকার মধ্যে থাকিয়া ইহাদের এই সংখ্যার আধিক্য হেতু তাহা স্ফীত হইয়া যখন এক সঙ্গে অনেকগুলি ফাটিয়া যায়, ঠিক সেই সময় রোগীর কম্প দিয়া জর আসে।

কিন্তু এই সব জীবাণু কোথা হইতে কি উপায়ে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে

এ সমস্যার মীমাংসা তখন কেহই করিতে পারেন নাই। তবে অনেক দিন হইতেই মশার উপর লোকের সন্দেহ ছিল। আফ্রিকার লোকেরা পূর্ব্বে মশাকে ও কম্পজরকে একই নামের দ্বারা অভিহিত করিত ও মশারি ব্যবহার করিলে জর হয় না এ কথা তাহারা জানিত। জীবাণু আবিষ্কারের পর জরের সংক্রামকতা লক্ষ্য করিয়া লাভেরাঁ প্রভৃতি অনেকে অনুমান করেন যে কোনো রক্তপায়ী জীবের দ্বারা ইহারা একজনের রক্ত হইতে অন্যের রক্তে নীত হয়। রক্ত ব্যতীত শরীরের অন্য কোথাও ইহারা থাকে না, এবং রক্তেও ইহারা কেবলমাত্র কণিকার অভ্যন্তরেই সর্ব্বদা থাকে; অতএব স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোনো সাহায্য ব্যতীত রোগীর রক্ত হইতে ইহাদের আপনা আপনি বাহিরে আসা সম্ভব হয় না। ইহাতে ম্যানসন্ (Manson) বিবেচনা করেন যে নিশ্চয়ই কোনো দংশনপটু জীবের সাহায্যে ইহারা রক্তের বাহিরে আসে; আর যেখানে ম্যালেরিয়া সেখানেই মশার আধিক্য দেখিয়া মশাই এই রোগের বাহক এইরূপ তাঁহার সন্দেহ জন্মে। তাঁহার এই অনুমান সপ্রমাণ করিবার জন্য রোনাল্ড রস্ (Sir Ronald Ross) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি হাঁসপাতালের পরীক্ষাগারে নানারূপ গবেষণা করিতে থাকেন। রস্ কবি ছিলেন; তিনি এই সময় একটি কবিতায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যে তাঁহার এমন শক্তি হউক যাহাতে লক্ষ লক্ষ মানবের ব্যাধির কারণ নির্ণয় করিয়া তিনি পৃথিবীকে ব্যাধিমুক্ত করিতে পারেন। নানারূপ চেষ্টা করিতে করিতে প্রথমতঃ তিনি এনোফিলিস্ মশার পেটে লেজবিশিষ্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেখিতে পান, কিন্তু কলিকাতায় সে সময় ম্যালেরিয়ার প্রাচুর্য্য না থাকায় তাঁহার কার্য্যে বাধা পড়ে। অন্যদিক দিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, পাখীদের একরূপ জর হয় তাহা অবিকল আমাদের ম্যালেরিয়ার মত, এবং জরের সময় তাহাদের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর অনুরূপ জীবাণুও (Proteosoma) দেখিতে পাওয়া যায়। আরও তিনি দেখিলেন যে কিউলেক্স মশা পাখীদের কামড়ায় এবং সেই মশার পেটের ভিতর গিয়া এই সকল জীবাণুও ম্যালেরিয়ার জীবাণুর ন্যায় লেজবিশিষ্ট হয়। মশা রক্ত খাইয়া তাহার পেটের ভিতর এই সকল

জীবাণু প্রবেশ করিলে তথায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের জীবনধারার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় এবং কিরূপ আকারে আবার তাহারা পাখীর শরীরে প্রবেশ করে, তখন ইহাই আবিষ্কার করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। বহু মশাকে পীড়িত পাখীর উপর দংশন করাইয়া বিভিন্ন সময়ে তাহাদের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া এই জীবাণুদের কখন কি পরিবর্ত্তন ঘটে একে একে তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরিশ্রমের
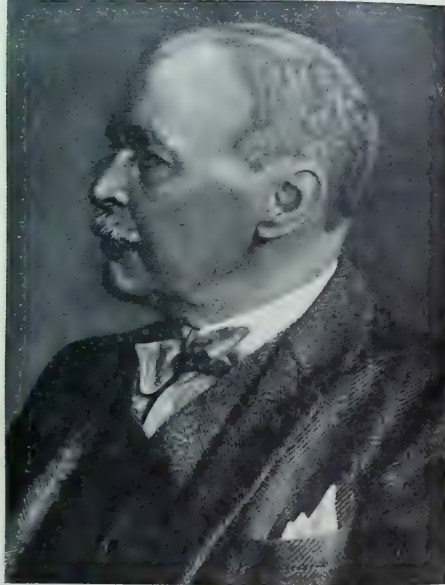
ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ-রহস্য আবিষ্কারক স্যর রোনাল্ড রস্

ফলে মশার শরীরে এই জীবাণুদের বিভিন্নরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি ও পূর্ণ পরিণতি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া তিনি পর্য্যালোচনা করিতে

সক্ষম হন। তখনই সর্ব্বপ্রথম জানা যায় যে যদিও এই জাতীয় জীবাণু, পীড়িত পাখীর রক্তে (বা মানুষের রক্তে) আপনা আপনি এক হইতে বহুতে বিভক্ত হইয়া অযৌনরূপে (by sporogony) বংশবৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু মশার শরীরে প্রবেশ করিলেই ইহাদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে চলিতে থাকে। এখানে পুং-বীজ (micro-gametocyte) হইতে লেজের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখা বাহির হইয়া স্ত্রী-বীজের (macro-gametocyte) শরীরে প্রবেশ করে ও এইরূপে তখন কেবল স্ত্রী-পুরুষের যৌন সঙ্গমের দ্বারা (by schizogony) ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়।

অতঃপর জানিতে পারা গেল যে কিউলেক্স মশার শরীরে পাখীর ম্যালেরিয়ার জীবাণু যে ভাবে জন্মান্তর পরিগ্রহ করে, এনোফিলিস মশার শরীরেও মানুষের ম্যালেরিয়ার জীবাণু অবিকল সেইরূপ ভাবেই জন্মান্তর গ্রহণ করে। এই আবিষ্কার হইতেই ম্যালেরিয়ার জীবাণুর সমস্ত রহস্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া গেল এবং ইহাদের দ্বৈত জীবনের দুইরূপ বিভিন্ন ধারার কি উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মানুষের দেহ হইতে মশার দেহ ও পুনরায় মশার দেহ হইতে অন্য মানুষের দেহে যাতায়াত করার যে প্রাকৃতিক প্রয়োজন তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা গেল। রোনাল্ড রসের এই আবিষ্কার যেদিন সম্পূর্ণ হয় সেদিন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা জেনারেল হাঁসপাতালে তাঁহার স্মৃতিফলকের গায়ে খোদিত আছে :—

This day relenting God hath placed within my hand
A wondrous thing, and God be praised, at His command
Seeking His secret deeds with tears and toiling breath
I find thy cunning seeds O million-murdering Death.
I know this little thing a myriad men will save,
O Death! where is thy sting? thy victory, O Grave!

অর্থাৎ—"আজ আমার হাতে ভগবান এক অমূল্য বস্তু দিয়াছেন, তাঁহার অশেষ জয় হউক। তাঁহারই নিয়োগে বহু পরিশ্রমের ফলে আমি মৃত্যু রাক্ষসের রহস্যময় বীজের সন্ধান পাইয়াছি। এই সামান্য জ্ঞানটুকুর দ্বারা এখন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে। হে মৃত্যু, তোমার দৃপ্ত জয়োল্লাস এখন কোথায় রহিল?"

ম্যালেরিয়ার মূল কারণ সম্বন্ধে এত বড় আবিষ্কার আমাদেরই দেশে কলিকাতা সহরের এক হাঁসপাতালে বসিয়া স্যর রোনাল্ড রস্ প্রথম ঘোষণা করিলেন এবং পৃথিবীময় তাহা রাষ্ট্র হইল; তাহারই ফলে কত দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইল, অথচ আমরা যেমন ভুগিতেছিলাম তেমনই আজও ভুগিতেছি !

রোনাল্ড রসের বাকী কার্য্যটুকু শেষ করিলেন গ্রাসি ও বিগ্নামি (Grassi, Bignami) প্রমুখ ইটালীয় পণ্ডিতগণ। ১৮৯৯ সালে তাঁহারা ম্যালেরিয়াবাহী এনোফিলিস মশা ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার মধ্যে ম্যালেরিয়া জীবাণুর ক্রমবিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে দেখাইলেন এবং রোনাল্ড রসের বর্ণনার সহিত তাহা অবিকল মিলিয়া গেল। ম্যালেরিয়ার সহিত এনোফিলিস মশার যোগাযোগ যখন এতটা প্রমাণ হইয়া গেল, তখন প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা ইহার সত্যতা নিরূপণের জন্য কয়েকজন চিকিৎসক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় প্রাচীন রোমের সর্ব্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়া-প্রধান গ্রামে গিয়া একটি কুটীরের মধ্যে তিন মাস বাস করিয়া আসিলেন। তাঁহারা যে কুটীরে থাকিতেন তাহার সমস্ত দরজা জানালা সূক্ষ্ম তারের জাল দিয়া এরূপভাবে আবৃত করিয়া লইলেন যাহাতে একটিও মশা ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই ঘরের বাহিরে আসিতেন না, ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়া-নিবারক অন্য কোনো উপায় তাঁহারা অবলম্বন করেন নাই। দিনের বেলা তাঁহারা বাহিরে আসিয়া সকলের সঙ্গে মিশিতেন, রৌদ্র বৃষ্টি গ্রাহ্য করিতেন না, স্থানীয় জল পান করিতেন এবং কখনও কুইনিন খান নাই। ফলে এই সময় যদিও গ্রামবাসীদের কেহই ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না, কিন্তু ইহাদের তিনজনকে এই রোগ স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতঃপর ঐ গ্রাম হইতে বহু সংখ্যক এনোফিলিস মশা খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া বিলাতে পাঠানো হইল, এবং ম্যানসন আপন পুত্রকে ও অপর এক ব্যক্তিকে এই সকল মশার দ্বারা দংশন করাইলেন। জীবনে তাঁহাদের কখনো ম্যালেরিয়া হয় নাই, কিন্তু দংশিত হইবার কিছু দিন পরে দুইজনেই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত

হইলেন এবং তাঁহাদের রক্ত পরীক্ষা করিয়া ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেল। তাঁহারা পরে বহুবার পুনঃ পুনঃ জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিবারেই রক্তে জীবাণু পাওয়া গিয়াছিল। অবশেষে কুইনিন খাইয়া তাঁহারা আরোগ্য লাভ করেন। এইরূপে এনোফিলিস মশার দ্বারা ম্যালেরিয়ার সংক্রমণের কথা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির সঠিক কারণ নির্ণীত হওয়াতে ইহার উপযুক্ত প্রতিবিধানও হইতে পারে, এই বিবেচনায় কর্ত্তৃপক্ষ ম্যালেরিয়া-পীড়িত পানামা অঞ্চলে স্যর রোণাল্ড রসকে প্রেরণ করিলেন। তিনি কয়েক বৎসর তথায় থাকিয়া বহু অর্থব্যয়ে মশার উচ্ছেদ করিয়া দিয়া ঐ স্থান ম্যালেরিয়াশূন্য করিয়া তুলিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের কিছুই আর বাকী রহিল না। পরে মিশর দেশেও এনোফিলিসকুলকে নির্ম্মূল করিয়া সে দেশও তিনি ম্যালেরিয়াশূন্য করিলেন। অতএব এখন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে একমাত্র এনোফিলিস মশার দংশনের দ্বারাই ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয়, অন্য কোনো উপায়ে ম্যালেরিয়া হওয়া একেবারে অসম্ভব। এনোফিলিস ছাড়া অন্যান্য মশাকে বহুবার ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পান করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কিন্তু কখনই তাহাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিয়া বাঁচে নাই।

মশার পরিচয়

মশা আমাদের দংশন করে বটে, কিন্তু রক্ত ইহাদের স্বাভাবিক খাদ্য নয়। সাধারণতঃ ইহারা গাছপাতার রস খাইয়াই জীবন ধারণ করে। পুরুষ মশা কখনও কোনো জীবকে দংশন করে না। কেবলমাত্র স্ত্রী-মশারাই সুবিধা পাইলে রক্ত পান করে; সুতরাং কেবলমাত্র স্ত্রী-মশার দ্বারাই ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয়। ইহারা বদ্ধ জলের উপর ডিম পাড়ে, অন্য কোথাও নয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মশার বিভিন্নরূপ জলে অভিরুচি। কেহ বা নদীর ধারে ধারে, কেহ বা জলাশয়ের কিনারায় শৈবালে ঢাকা নিরাপদ স্থানে, কেহ বা ডোবা নর্দ্দমার জলে, কেহ বা উন্মুক্ত জলাধার মাত্রেই, অর্থাৎ ভাঙা হাঁড়িতে, খোলা টিনে, ত্যক্ত কলসীতে, ভাঙা বোতলে, অথবা বৃক্ষকাণ্ডের গহ্বরে যেখানেই কিছু জল জমিয়া আছে সেখানেই গিয়া দলে

দলে ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ গরমের সময় ইহাদের প্রজনন শক্তি স্ফূর্তি পায় এবং ঠাণ্ডার সময় হ্রাস পায়। শীতের সময় অধিকাংশ মশাই মরিয়া যায়, অল্প যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা অন্ধকার স্থানে আশ্রয় লইয়া কোনওরূপে দিন কাটাইয়া দেয়, কিন্তু বর্ষার সময় ইহারা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া উঠে এবং এক একবারে সহস্র সহস্র ডিম পাড়ে। (সেইজন্য এই ঋতুতে মশার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সুরু হয়।) ডিমগুলি (eggs) জলে ভাসিতে ভাসিতে প্রথমে চঞ্চল শূক-কীটাবস্থা বা লার্ভার (larva) আকার প্রাপ্ত হয়; পরে ঐ কীটগুলি গুটিকার মত খোলস রচনা করিয়া মূককীট বা পিউপাতে (pupa) পরিণত হয়; এই খোলস ফাটিয়া অবশেষে পরিণতিপ্রাপ্ত মশা (adult) ডানা বাহির করিয়া উড়িয়া যায়। ডিম হইতে মশার সম্পূর্ণ পরিণতি হইবার জন্য দশ বারো দিন সময়-লাগে, কখনো বা একমাসও লাগিতে পারে। ইহারা স্থান পরিবর্ত্তন বড় পছন্দ করে না, যে জলে জন্মিয়াছে সেই জলে গিয়াই বারে বারে ডিম পাড়ে; সহজে আপন আপন স্থান ত্যাগ করে না এবং বেশী দূরে বা অধিক উপরে উড়িয়া যায় না। ইহারা এক দমে তিন চারি হাজার ফুট দূর অবধি উড়িয়া যাইতে পারে না, কারণ ভীষণ ম্যালেরিয়া-সঙ্কুল বন্দরে তীর হইতে চারি হাজার ফুট দূরে বহুদিন যাবৎ জাহাজ ভিড়াইয়া দেখা গিয়াছে যে তথায় মশাও আসিতে পারে নাই, ম্যালেরিয়াও হয় নাই। স্ত্রী-মশারা স্বভাবতঃ নিশাচর। দিনের বেলা উহারা গাছপালার অন্ধকারে, গুহা নালার মধ্যে, অথবা ঘরের কোণে, বাক্স আলমারীর পাশে, কাপড় চোপড়ের আড়ালে অন্ধকার স্থানে লুকাইয়া থাকে, এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথা হইতে বাহির হইয়া সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তভাবে সর্ব্বত্র উড়িয়া বেড়ায়। হাওয়া ইহাদের প্রিয় নয়,—কারণ অল্প বাতাস উঠিলেই ইহাদের উড়াইয়া লইয়া যায়। রাত্রে কোথাও আলোক দেখিলে ইহারা আকৃষ্ট হয়।

কিউলেক্স ও এনোফিলিসের পার্থক্য—

সকল প্রকার মশার জীবনযাত্রা ও চরিত্র কতকটা একরূপ হইলেও কিউলেক্স, ডাঁস প্রভৃতি (Culex and Aedes) মশার সহিত এনোফিলিস

(Anopheles) মশার অনেক পার্থক্য আছে। যথা,—(১) কিউলেক্স দেখিতে কটা রংএর এবং ইহাদের ডানাগুলিও এক-রঙা ধূসর। কিন্তু এনোফিলিসের রং অপেক্ষাকৃত গাঢ় ও ইহাদের ডানাতে ফড়িং-এর বা চড়াই পাখীর ডানার মত বাদামী ও সাদা রং-এর ছোপ দেওয়া থাকে, সুতরাং কোনো মশা এনোফিলিস কি না তাহা ডানা দেখিলেই বুঝা যায়। তদ্ব্যতীত কিউলেক্স মশা আকারে কিছু বড়, এনোফিলিস উহা অপেক্ষা ছোট। (২) এনোফিলিসের বসিবার ভঙ্গীও স্বতন্ত্র। কোথাও বসিলে ইহারা লেজ উঁচু করিয়া শরীরটিকে তির্য্যকরেখায় রাখে, কিন্তু কিউলেক্স পিঠ কুব্জ করিয়া বসিবার স্থানে শরীরটি সমান্তরাল ভাবে রাখে। (৩) কিউলেক্স উড়িবার সময় ভোঁ ভোঁ করিয়া একরূপ শব্দ হয়, কিন্তু এনোফিলিস উড়িবার সময় কোনো শব্দ হয় না। (৪) বিভিন্ন জাতীয় মশা জলের উপর ডিম পাড়িয়া সেগুলি বিভিন্নরূপ নিয়মে সাজাইয়া রাখে, সুতরাং ডিমগুলির সাজাইবার কৌশল দেখিয়াও কোন মশার ডিম তাহা চেনা যায়। (৫) ডিমগুলি যখন লার্ভা (larva) বা শূককীট অবস্থায় পরিণত হয় তখন সেগুলি চঞ্চলভাবে খেলিয়া বেড়ায়, কিন্তু শ্বাসবায়ু লইবার প্রয়োজন হয় বলিয়া মধ্যে মধ্যে লেজসংলগ্ন শ্বাসযন্ত্রটি জলের উপর জাগাইয়া দিয়া যে ভঙ্গীতে বিশ্রাম করে, বিভিন্ন জাতীয় মশার সে ভঙ্গীও বিভিন্নরূপ। কিউলেক্সের লার্ভা মাথা নীচের দিকে করিয়া লেজটি উপর দিকে ভাসাইয়া দেয়, কিন্তু এনোফিলিসের লার্ভা জল পৃষ্ঠে সমতলভাবে শুইয়া লেজটি উপরে বাহির করিয়া দেয়। সুতরাং সকলরূপ অবস্থাতেই ইহাদের পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লওয়া যায়, কেবল পিউপা বা মূককীট অবস্থায় ইহাদের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না।

এনোফিলিস মশা মাত্রই যে ম্যালেরিয়ার বাহক তাহাও নয়। ইহাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে ও তন্মধ্যে মাত্র কয়েক শ্রেণীর মশাই এই রোগের উপযুক্ত বাহন। ডানার সাদা কালো দাগের সূক্ষ্ম তারতম্য দেখিয়া ইহাদের শ্রেণী নিরূপণ করিতে হয়। যে জাতীয় এনোফিলিস ম্যালেরিয়াবাহী তাহারা সকল প্রকার ম্যালেরিয়ার জীবাণুই পোষণ করিতে পারে। যেখানেই ম্যালেরিয়া আছে সেখানেই ম্যালেরিয়াবাহক কোনো না কোনো শ্রেণীর মশা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন দেশও

আছে যেখানে এই সকল মশা থাকা সত্ত্বেও ম্যালেরিয়া নাই। ইংলণ্ডে এক সময় ম্যালেরিয়া ছিল, এখন কিন্তু উপযুক্ত মশা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও
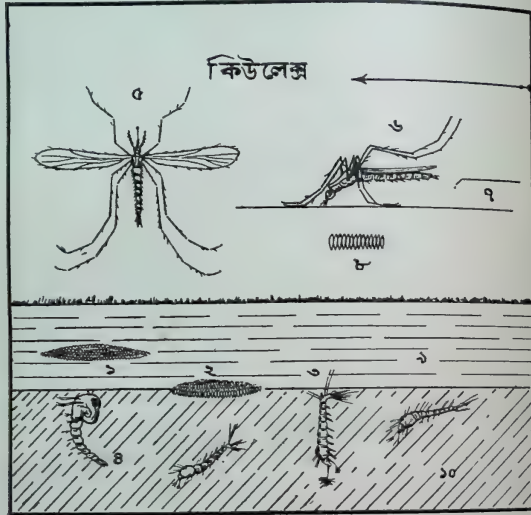
(১) কিউলেক্সের ডিম
(২) ডিমগুলি একত্র সংলগ্ন হইয়া কিরূপভাবে জলের উপর ভাসে
(৩) শূককীট (লার্ভা)
(৪) মূককীট (পিউপা)
(৫) পরিণত কিউলেক্স মশা
(৬) কিউলেক্সের বসিবার ভঙ্গী
(৭) উহার দেহের সমান্তরাল রেখা
(৮) ডিমের সাজাইবার কৌশল (বর্দ্ধিত)
(৯) জলের উপরাংশ
(১০) জলের ভিতরাংশ

তথায় ম্যালেরিয়া নাই। হল্যাণ্ডে এবং ডেনমার্কেও যথেষ্ট এনোফিলিস আছে,

অথচ তথায় ম্যালেরিয়া নাই। কাশ্মীরেও এই সকল এনোফিলিস আছে, সেখানেও কিন্তু ম্যালেরিয়া হয় না। আজকালকার দিনে এই সকল দেশে
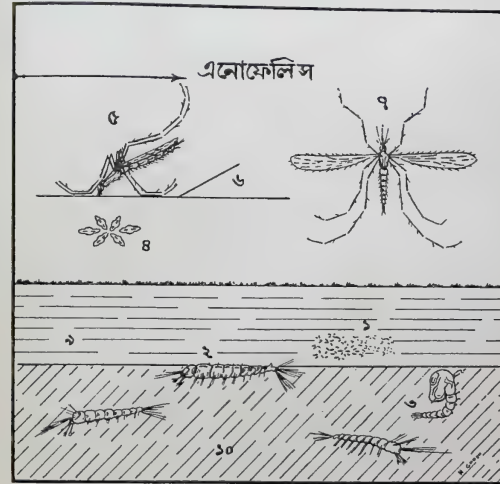
(১) এনোফিলিসের ডিম
(২) শূককীট (লার্ভা)
(৩) মূককীট (পিউপা)
(৪) ডিমগুলি পৃথক থাকিয়া কিরূপভাবে জলে ভাসে (বর্দ্ধিত)
(৫) এনোফিলিসের বসিবার ভঙ্গী
(৬) উহার দেহের তির্য্যক রেখা
(৭) পরিণত এনোফিলিস মশা
(৯) জলের উপরাংশ
(১০) জলের ভিতরাংশ

(কলিকাতা হাইজীন ইনষ্টিট্যুটের কয়েকখানি চিত্র হইতে প্রফেসর কৃষ্ণন্‌-এর সৌজন্যে এই চিত্র দুইখানি সংগৃহীত)

নিত্যই লোকের গতিবিধি, সুতরাং ম্যালেরিয়ার বীজ লইয়া কেহ যে তথায় যায় নাই এ কথা কিছুতেই বলা চলে না। ঐ সকল দেশে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বহুলোক যাতায়াত করে, তত্রস্থ এনোফিলিস মশাও তাহাদের দংশন করে, অথচ তথায় স্থানীয় অধিবাসীদের ম্যালেরিয়া হয় না। উপযুক্ত বাহন থাকা সত্ত্বেও তথায় ম্যালেরিয়া নাই কেন (anophelism without malaria), এই প্রশ্ন লইয়া বর্ত্তমান লীগ অফ্ নেশন্স্-এর ম্যালেরিয়া কমিশন অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন, কারণ ইহার মীমাংসা করিতে পারিলে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনেক জটিলতা দূর হইয়া যাইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই সকল দেশে মশারা সম্ভবতঃ এমন কোনো পাতার রস খায় যাহা ম্যালেরিয়া-জীবাণুর পক্ষে বিষ, সেইজন্য তাহারা মশার পেটে গিয়াও পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। সে জিনিষটি কি তাহা এতাবৎ অজ্ঞাত।

রোগীর শরীরে উপযুক্ত মশা দংশন করিলেই যে সকল সময়ে বীজ আহরণ করিতে পারিবে, অথবা জীবাণুবাহী মশা প্রত্যেকবার দংশন করিলেই যে সুস্থ লোকের নিশ্চয় ম্যালেরিয়া ধরিবে এমন কোনো কথা নাই। কার্য্য-কারণের সংযোগের মধ্যে অনেক ফাঁক পড়িয়া যাইতে পারে। জেম্‌স্ (James) পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়াছেন যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বীজ মশার পেটে গেলে তবেই জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি সফল হইতে পারে, তাহার কম হইলে ইহারা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। মানুষের দেহে রোগবীজ বপনেরও একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা আছে, উহার কম সংখ্যক জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে ম্যালেরিয়া হয় না। অপর পক্ষে অত্যধিক বীজ এককালে গ্রহণ করিলেও অনেক মশা আপনিই মরিয়া যায়। বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াও দেখা গিয়াছে যে ম্যালেরিয়ার রক্ত পান করিবার পর, প্রতি পাঁচটি মশার মধ্যে একটি মাত্র বাঁচিয়া থাকে, অবশিষ্ট চারিটি মরিয়া যায়। আবার ব্যক্তি বিশেষে ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহাদের রক্ত বোধ হয় কোনো কারণে ম্যালেরিয়া জীবাণুর পক্ষে অনুকূল নয়, কাজেই উপযুক্ত মশা দংশন করিলেও তাঁহাদের সহজে ম্যালেরিয়া হয় না।

অতএব এনোফিলিস মশার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার দংশনের দ্বারা রোগবীজ সঞ্চালন পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা পরে পরে ঘটিয়া যায়, তাহার মধ্যে

নানারূপ বাধা বিঘ্ন ও ব্যতিক্রম আছে। সমস্ত ঘটনাপরম্পরা যদি নির্ব্বিবাদে ঘটিতে পারে তবেই ম্যালেরিয়া জন্মায়, নতুবা নয়। প্রকৃতির এই প্রচেষ্টায় অপচয়ের অংশই অধিক,—কৃতকার্য্যতা খুব কমই হয়। কিন্তু তাহাতেই ম্যালেরিয়া এত পর্য্যাপ্ত!

জীবাণুর পরিচয়

ম্যালেরিয়া-জীবাণুই যে ম্যালেরিয়া-জ্বরের উৎপত্তির হেতু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রমাণ এই যে যাহারই ম্যালেরিয়ার জ্বর হয় তাহারই রক্তে এই জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কুইনিন খাইয়া জ্বর বন্ধ হইলে ইহাদেরও আর দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যে রোগীর রক্তে কোনো নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর ম্যালেরিয়া-জীবাণু দেখা যায় তাহার রক্ত লইয়া সুস্থ ব্যক্তির দেহে ইন্‌জেকশন দিলে দশ দিনের মধ্যে উহার জ্বর দেখা দেয় এবং উহার রক্তেও ঐ নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর জীবাণু পাওয়া যায়। বহুবার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।

এই জীবাণুরা প্রোটোজোয়া রাজ্যের অন্তর্গত এককোষ-বিশিষ্ট প্রাণী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আশ্রয় ভেদে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর দুইপ্রকার জীবনযাত্রা; অর্থাৎ মানুষের রক্তে অবস্থান কালে ইহারা একপ্রকার অযৌন জীবন যাপন করে, এবং মশার পেটে গিয়া ইহারা স্বতন্ত্র যৌন-জীবন যাপন করে, সুতরাং বিভিন্ন আশ্রয়ে ইহাদের বিভিন্নরূপ জন্মচরিত্র পর্য্যায়ক্রমে ও স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইল।

মানুষের আশ্রয়ে—ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তাশ্রয়ী ও ডিম্ব প্রসবকারী, সেজন্য জীবাণু পর্য্যায়ের মধ্যে ইহারা Haemosporidia শ্রেণীর অন্তর্গত, এবং প্লাস্‌মোডিয়া (Plasmodia) নামে অভিহিত। ইহারা লোহিত কণিকার (R.B.C.) মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তন্মধ্যস্থিত লোহিত পদার্থ (hæmoglobin) ইহাদের খাদ্য। এই খাদ্য জীর্ণ করিয়া অবশেষে কালো রংএর একরূপ গুঁড়া দ্রব্য আপন শরীরের মধ্যে সঞ্চয় করে, ইহাকে হিমোজোইন (haemozoin pigments) বলে। এইরূপে পুষ্টি

সাধনের দ্বারা স্ফীত হইয়া ক্রমে ইহারা এক হইতে পনেরো ষোলো বা কুড়ি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

মশার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যখন মানুষের শরীরে স্পোরোজয়েট রূপে প্রথম প্রবেশ করে তখন হইতে ইহাদের জীবন চরিত্র অনুসরণ করা যাক্।

স্পোরোজয়েটগুলি যে অবস্থায় রক্তের মধ্যে প্রথমে আসে সেই অবস্থাতেই যে ইহারা রক্তকণিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, একবার ইহাদের বিভক্তি হইয়া তাহার পর সেগুলি কণিকাতে আশ্রয় লইতে পারে,—একথা সম্প্রতিমাত্র জানা গিয়াছে (Missiroli, 1933.)। যে সকল স্পোরোজয়েট রক্তের মধ্যে নীত হয়, কিছুক্ষণ পরে তাহার প্রত্যেকটি চার পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া এক একটি স্পোর বিভিন্ন রক্ত-কণিকার মধ্যে প্রবেশ করে। কণিকামধ্যস্থ খাদ্য খাইয়া যখন ইহাদের আকার বর্দ্ধিত হয়, তখন উহাকে ট্রোফোজয়েট (trophozoites) বলা হয়। উহার অঙ্কুরটিও (nucleus) অপেক্ষাকৃত বড় হয় ও তাহার চারিদিকে হিমোজোইনের গুঁড়া জমিতে দেখা যায়। ক্রমে উহা যখন ভাগ হইতে স্বরু করে, তখন হইতে উহার নাম হয় শাইজোণ্ট্ (schizont)। প্রথমে অঙ্কুরটি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথকভাবে ছড়াইয়া পড়ে, পরে উহার শরীরপদার্থ এই প্রতি অঙ্কুরাংশকে কেন্দ্র করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে বেষ্টন করে ও স্বতন্ত্র হইয়া যায়। এখন হিমোজোইন গুঁড়াগুলি উহার মধ্যস্থলে একত্রিত হয় এবং তাহার চতুষ্পার্শে বিভক্ত অংশগুলি গোলাপের পাপড়ির মত পাশাপাশি সাজানো হয়। পরিণত শাইজোণ্ট্ আকারে বৃহৎ হওয়াতে উহার আধার-স্বরূপ রক্তকণিকাটি ফাটিয়া যায় এবং তখন উহার পাপড়ি বা মেরোজয়েটগুলি (merozoites) এক একটি নবজাত জীবাণুরূপে মুক্ত অবস্থায় রক্তের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে কিছু নষ্ট হয়, কিন্তু অধিকাংশই নূতন নূতন রক্ত কণিকার মধ্যে পুনরায় গিয়া আশ্রয় লাভ করে। এইরূপে ইহাদের জীবনধারা চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

অতএব মনুষ্য-আশ্রয়ে ইহাদের জীবন তিনরূপ অবস্থায় বিভক্ত :—**তরুণ অবস্থায় ইহারা মেরোজয়েট্‌,** যখন নিরাশ্রয় ভাবে রক্তের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। **পরিণত অবস্থায় ইহারা ট্রোফোজয়েট্‌,** যখন রক্ত-কণিকার

আশ্রয়ে আপন পুষ্টি সাধনে রত। **বার্দ্ধক্য অবস্থায় ইহারা শাইজোণ্ট্‌,** যখন প্রত্যেকটি বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া সংখ্যা বৃদ্ধির আয়োজন চলিয়াছে। এইরূপে ইহারা এক হইতে ২০, ৪০০, ৮০০০ এই অনুপাতে বাড়িতে থাকে।

কিন্তু বেশীদিন এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি চলে না, তাহা হইলে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী কেহই অধিকদিন বাঁচিত না। কিছুদিনের মধ্যেই আশ্রয়দাতার শরীর-রসের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি প্রবল হইয়া ওঠে। তখন যে সকল আশ্রয়হীন মেরোজয়েট রক্তস্রোতে প্লীহার মধ্যে নীত হয় তাহাদের আর রক্ষা নাই, সকলেই নিষ্পেষিত হয়; প্লীহাই এই সকল জীবাণুর সংহার-যন্ত্র। এ দিকে রক্তকণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়াতে ইহাদের আশ্রয়েরও সুবিধা হয় না, এবং খাদ্যও প্রচুর জোটে না। তখন কতকগুলি ট্রোফোজয়েট আর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস না করিয়া আত্মরক্ষার্থ সঙ্কুচিত হইয়া বীজে পরিণত হইতে থাকে। জ্বরের প্রথম সূত্রপাতের ৮।৯ দিন পর হইতেই রোগীর রক্তে এই সকল বীজ বা গ্যামেটোসাইটের (gametocytes) উদ্গম হইতে দেখা যায়, উহার পূর্ব্বে নয়। এই সকল গ্যামেটোসাইট্ আর ক্লীব নয়। যেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট সেইগুলি পুং-বীজ এবং যেগুলি বড় সেগুলি স্ত্রী-বীজ। এইরূপে এখান হইতেই বীজগুলি স্ত্রী ও পুরুষ দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়। এই সকল বীজ বা গ্যামেটোসাইট বর্ম্মাবৃত হইয়া রক্ত-কণিকার মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে, মশার পাকস্থলীতে না যাওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের আর কোনোই পরিবর্ত্তন নাই। যে সকল বীজ রক্তের মধ্যেই থাকিয়া যায়, তাহাদের পরমায়ু ২১ দিন হইতে এক মাস পর্য্যন্ত, তৎপরে ইহারা আপনিই বিনষ্ট হয়। আর যেগুলি ইতিমধ্যে মশার পেটে প্রবেশ করিতে পারে তাহারাই তথায় পরস্পর সঙ্গমের ফলে পুনরায় নূতন করিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে।

রোগীর রক্তের মধ্যে জীবাণুদিগের যখন এই সকল অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, সেই সঙ্গে রোগীর শরীরেও তাহার অনুবর্ত্তী লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকে। যথা,—(১) যখন পরিণত শাইজোণ্ট্‌গুলি কণিকার মধ্য হইতে **ফাটিয়া বাহির হয়** ও মেরোজয়েটগুলিকে মুক্ত করিয়া দেয়, ঠিক সেই সময় প্রতি দফায় রোগীর কম্প দিয়া **জ্বর আসে।** (২) যখন মেরোজয়েটগুলি

রক্তকণিকার মধ্যে নিজ নিজ আশ্রয় লাভ করিয়া **ট্রোফোজয়েট হয়** তখন রোগীর ঘাম দিয়া **জর ছাড়িবার সময়**। (৩) যখন ট্রোফোজয়েটগুলি পুষ্ট হইয়া **শাইজোণ্টের প্রথম অবস্থা**, তখন রোগীর **জর নাই**। (৪) যখন শাইজোণ্ট বহুভাগে বিভক্ত হইয়া **ফাটিবার উপক্রম** করিতেছে তখন রোগীর আবার **হাত পা ঠাণ্ডা** হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু এরূপ নিয়ন্ত্রিত ভাবে ঘটনার সমাবেশ হইলেও কম্প দিয়া জর আসার জন্য জীবাণুরা সম্পূর্ণ দায়ী নহে। শাইজোণ্টমুক্তির দ্বারা অকস্মাৎ অনেকগুলি রক্ত কণিকা একত্রে ফাটিয়া যাওয়াতে রক্ত প্রবাহের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় (protein shock or anaphylatic shock), সেই জন্যই এরূপ কম্পজর হয়। জীবাণুর সংখ্যা রক্তের মধ্যে অল্প থাকিলে কম্পজর উপস্থিত হইতে পারে না,—ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। খ্যাতনামা রস্ ও টম্‌সন্ দুইজনে মিলিয়া পরীক্ষার দ্বারা ম্যালেরিয়া **জরের গণ্ডি** (febrile threshold) কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে গড়ে **১০০ কোটি বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক জীবাণু** (at least 200 parasites per cmm. of blood, or one thousand million in total) রক্তে এককালীন না থাকিলে রোগ সত্বেও জর প্রকাশ হইতে পারে না। এইজন্য শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিলেও প্রথমে জর হয় না, কিছুদিন সুস্থ অবস্থায় কাটিয়া যায়। পরে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে হইতে যখন এই গণ্ডীর সীমা পার হয়, অর্থাৎ ১০০ কোটিতে আসিয়া উপস্থিত হয় (প্রায় ৭ হইতে ২৩ দিন সময় লাগে) তখনই জর দেখা দেয়। আবার কুইনিন খাইবার ফলে জীবাণুর সংখ্যা যখন ১০০ কোটির কম হয় তখনি জর ছাড়িয়া যায়, কিন্তু জীবাণু সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল না হওয়া পর্য্যন্ত জর ছাড়িলেও রোগ সারে না। শীঘ্র কুইনিন খাওয়া বন্ধ করিলেই আবার সংখ্যা বাড়িয়া যায় ও আবার জর হয়।

মশার আশ্রয়ে—মানুষের রক্তে বাসকালে ম্যালেরিয়া-জীবাণু কিরূপ জীবন যাপন করে, এ পর্য্যন্ত তাহাই বলা হইল। ইহাদের জীবন-চক্রের তাহা একদিক মাত্র,—অতঃপর মশার শরীরে ইহাদের কিরূপ রূপান্তর ঘটে দেখা যাক।

মশা যখন মানুষকে কামড়ায়,—সেই সঙ্গে উহারা দংশিত স্থানে অল্প এক-

বিন্দু লালা ঢালিয়া দেয়। উহাদের হুল কতকটা আমাদের ইন্‌জেকশনের ছুঁচের মত,—তাহা ফুটাইবামাত্র উহাদের লালাগ্রন্থির রস তাহার মধ্য দিয়া গড়াইয়া আসে। এই রস অল্প জালাপ্রদ (irritating) ও রক্তকে কিছু তরল করে (prevents clotting)। এই জালার ফলে ঐ স্থানে কতকটা রক্ত আসিয়া জমে অথচ তাহা জমাট বাঁধে না। সেইজন্যই মশা কামড়াইলে ক্ষতস্থান লাল হইয়া ওঠে। যতটা রক্ত সেখানে আসিয়া জমে তাহা তরল অবস্থাতেই উহারা হুলের মধ্য দিয়া টানিয়া লয়,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজ বা গ্যামেটোসাইট থাকিলে সেগুলিও মশার পেটে গিয়া উপস্থিত হয়। মানুষের গরম রক্তের মধ্য হইতে মশার পেটে শীতল আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া নূতন প্রেরণায় এই সকল বীজের নবতর জীবন সুরু হয়। ফলে একটিমাত্র পুংবীজ ও একটিমাত্র স্ত্রীবীজ হইতে একপক্ষকালের মধ্যে বহু সন্ততির সৃষ্টি হয়। প্রথমে স্ত্রীবীজ আপন কেন্দ্রবস্তু হইতে অর্দ্ধ অংশ নিকাশ করিয়া দিয়া পুংবীজগ্রহণের স্থান করিয়া গোলাকৃতি অবস্থায় অপেক্ষা করিতে থাকে। ইতিমধ্যে পুংবীজের শরীর হইতে চতুর্দ্দিকে কতকগুলি সূক্ষ্ম লেজ বাহির হয়,—এবং সেগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ হইতে হইতে তাহারই একটি আসিয়া স্ত্রীবীজের গাত্রসংলগ্ন হয় ও পরে তাহার ভিতরে প্রবেশ করে। এই দুই বীজের সংমিশ্রণে যে গতিশীল ভ্রূণ সৃজিত হয় তাহার নাম জাইগোট (zygote)। ইহা এখন মশার পাকস্থলীর গাত্র ভেদ করিয়া উহার বহিরাবরণের তলায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আপনার চতুস্পার্শ্বে একটি আবরণ রচনা করে। এখন ইহার নাম উসিষ্ট (oocyst)। এই উসিষ্ট ক্রমে স্ফীত হইতে থাকে এবং তাহার মধ্যস্থ ভ্রূণটি বহুধা বিভক্ত হইয়া বহুসংখ্যক ছুঁচালো লম্বা লম্বা sporozoites বা ডিম্বে পরিণত হয়। প্রতি উসিষ্ট হইতে প্রায় দশ সহস্র স্পোরোজয়েট জন্মায়। ভিতরকার চাপে তখন উসিষ্টের আবরণটি ফাটিয়া যায় এবং স্পোরোজয়েটগুলি মশার সর্ব্বগাত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অধিকাংশই অবশেষে লালা গ্রন্থির (salivary glands) মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং হুলের মধ্য দিয়া লালার সহিত নিঃসৃত হইতে থাকে। এখন এই মশা কাহাকেও

মনুষ্যচক্র (hnman cycle)
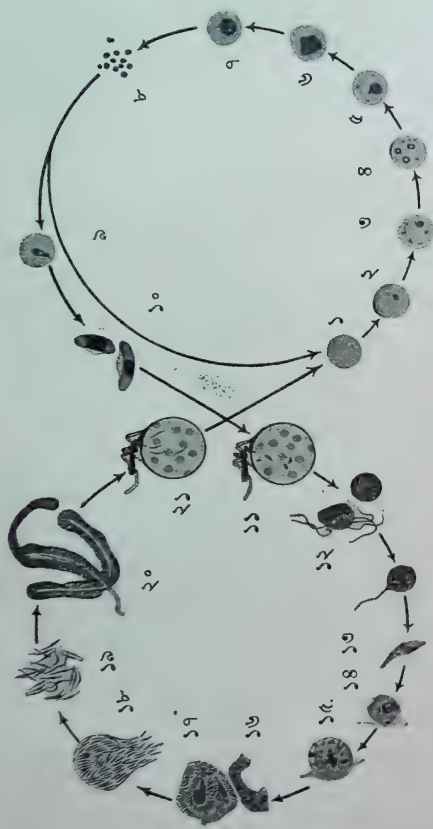
মশকচক্র (mosquito cycle)

ম্যালেরিয়া জীবাণুর দুই প্রকার জীবন চক্র। নোল্স্ ও সিনিয়র হোহাইটের "ম্যালেরিয়া" পুস্তক হইতে এই চিত্রখানি সংগৃহীত।

মনুষ্যচক্রে—(১) সুস্থ লোহিত কণিকা (২—৪) কণিকামধ্যে ট্রোফোজয়েটের ক্রমবিকাশ (৫—৭) শাইজোণ্ট্ অবস্থার ক্রমিক পরিণতি (৮) কণিকা ফাটিয়া মেরোজয়েটসমূহের মুক্তি (৯) বীজ বা গ্যামেটোসাইটের সৃষ্টি (১০) পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ (ক্রেসেণ্ট্)।

মশকচক্রে—(১১) স্ত্রী-এনোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া-রোগীর রক্তপানকালে বীজগুলি গ্রহণ করিল (১২) মশার পেটের ভিতর গিয়া স্ত্রীবীজ আয়তনে বাড়িল ও পুংবীজ হইতে লেজ বাহির হইল (১৩) উভয়ের সঙ্গম হইল (১৪) উভয়ের সঙ্গমে একটি জাইগোট সৃষ্ট হইল (১৫—১৭) উহা ক্রমে উসিষ্ট্ রূপে পরিণত হইল (১৮—১৯) উসিষ্ট ফাটিয়া তন্মধ্যস্থ স্পোরোজয়েটগুলি মুক্ত হইল (২০) স্পোরোজয়েটগুলি মশার লালাগণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল (২১) ঐ মশা সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করায় স্পোরোজয়েট তাহার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দংশন করিলে ঐ সকল স্পোরোজয়েট লালার সহিত দংশিত প্রাণীর রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে।

এইরূপেই ম্যালেরিয়া-জীবাণুর রূপ হইতে রূপান্তর এবং আশ্রয় হইতে আশ্রয়ান্তর চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। নিত্যকার বাস ইহাদের একস্থানে নয়,—মানুষের মধ্য দিয়া ইহারা এক মশা হইতে অন্য মশায় চালিত হয়, আবার মশার মধ্য দিয়া এক মানুষ হইতে অন্য মানুষে সংক্রামিত হয়। সেইজন্য ইহাদের জীবনচক্রে কখনও ছেদ পড়ে না,—এবং সেইজন্যই ইহাদের উচ্ছেদ করা এত কঠিন।

অতএব **মানুষ—মশা—ম্যালেরিয়া-জীবাণু**—এই তিনের একত্র সংযোগ না ঘটিলে ম্যালেরিয়া হয় না। মশা কামড়াইলেই যে ম্যালেরিয়া হইবে এমন কথা নাই। যে মশা কামড়াইবে তাহার লালার মধ্যে ম্যালেরিয়ার স্পোরোজয়েট থাকা চাই, এবং দংশনের সঙ্গে উহা সফলভাবে রক্তে গিয়া পৌছানো চাই,—সে রক্তও উর্ব্বর থাকা প্রয়োজন এবং স্পোরোজয়েটও সংখ্যায় অতি অল্প হইলে চলিবে না,—এত প্রকারের সর্ত্ত সম্পূর্ণ হইলে তবে ম্যালেরিয়া জন্মিতে পারিবে, নতুবা নয়। সুতরাং এতরকম ঘটনা-সংযোগের মধ্য দিয়া ম্যালেরিয়া হওয়া একটা আকস্মিক ব্যাপার। সেইজন্য কাহাকেও হয়তো দুইমাস ধরিয়া মশা কামড়াইতেছে তবু সে ম্যালেরিয়ার হাত এড়াইয়া গেল, আবার কেহ মাত্র একরাত্রি মশার কামড় ভোগ করিয়াছে তাহাতেই তাহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিল। কিন্তু আমাদের দেশে এতই মশা ও এতই ম্যালেরিয়া-জীবাণু যে এই আকস্মিক ঘটনাই নিত্য ঘটিতে থাকে,—কাহারও বড় এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই।

ম্যালেরিয়া ও তাহার জীবাণু তিন প্রকার

ম্যালেরিয়া জীবাণুর সাধারণ পরিচয় দেওয়া হইল, কিন্তু অতঃপর ইহাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আবশ্যক। কারণ "ম্যালেরিয়া" বলিতে একটি মাত্র রোগকে বুঝায় না, তিনটি বিভিন্ন রোগকে একসঙ্গে বুঝায়, যথা,—**বিনাইন টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া; কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া ও**

ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। বস্তুতঃ নামে ম্যালেরিয়া হইলেও এ তিনটি পৃথক রোগ, কারণ তিনরূপ বিভিন্ন জীবাণু হইতে উহার উৎপত্তি। এই তিন প্রকার রোগের লক্ষণাদিরও যেমন কিছু পার্থক্য আছে, এই তিনরূপ জীবাণুরও তেমনি আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য আছে। জীবাণুর আকার প্রকার দেখিয়া বলিতে পারা যায় কোন জাতীয় ম্যালেরিয়া হইয়াছে। একই প্রকারের জীবাণুর দ্বারা একইরূপ ম্যালেরিয়া হয়, অন্যরূপ হইতে পারে না। আবার দুই তিনরূপ জীবাণুর মিশ্রণে মিশ্রিত ম্যালেরিয়াও হইতে পারে; তাহাও ইহাদের আকৃতি দেখিয়া চেনা যায়। অতএব তিনপ্রকার ম্যালেরিয়া ও তিনপ্রকার জীবাণুর স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা বিশেষ আবশ্যক।

প্লাসমোডিয়াম্ ভাইভাক্স—ইহার অন্য নাম **বিনাইন্ টার্শিয়ান্** (B. T.) অর্থাৎ একদিন অন্তর সরল পালা-জ্বরের জীবাণু। নামে ইহারা পালা-জ্বরের জীবাণু হইলেও কাজে যে ইহারা কেবল পালাজ্বরই ঘটায় তাহা নয়। ইহাদের দ্বারা অবিরাম জ্বরও হইতে দেখা যায়, দৈনিক সবিরাম জ্বরও হইতে দেখা যায়, আবার একদিন অন্তর পালা জ্বরও হইতে দেখা যায়। ইহাদের জীবনচক্র একবার সম্পূর্ণ হইতে ৪৮ ঘণ্টা করিয়া সময় লাগে; সুতরাং একটি মাত্র দলে প্রবেশ করিয়া যদি ইহারা একযোগে ক্রিয়া সুরু করে তবেই নির্দ্দিষ্ট ৪৮ ঘণ্টা অন্তর পালাজ্বর হয়। নতুবা যদি ইহাদের দুই তিনটি দল বিভিন্ন সময়ে রক্তে প্রবেশ করে তখন তাহাদের দফায় দফায় স্ফুটনের সময় সাপেক্ষ হইয়া জ্বরও এলোমেলো ভাবে দেখা দেয়। সুতরাং সে জ্বর দেখিয়া চিনিবার কোনোই উপায় থাকে না তাহা কোন জাতীয় ম্যালেরিয়া।

তরুণ অবস্থায় লোহিত কণিকার মধ্যে এই বি. টি. জীবাণুদের দেখিতে কতকটা আংটির মত; তাহার মধ্যস্থানটি শূন্য, বোধ হয় খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য উহা ফাঁক হইয়া যায়, অঙ্কুরটি (nucleus) আংটির সীলের মত একপাশে থাকে এবং শরীরাংশ (protoplasm) আংটির বেষ্টনীর মত বৃত্তাকারে বেরিয়া থাকে। ক্রমে ইহার ট্রোফোজয়েট যত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে থাকে, অঙ্কুরটি এক স্থানে থাকিলেও ইহার শরীরাংশ (protoplasm)

অতি চঞ্চল ভাবে নিয়তই আকার পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। রোগীর শরীর হইতে রক্ত লইয়া তাহা রং না করিয়া যদি তাজা অবস্থায় পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যায় যে বি. টি. জীবাণু রক্ত কণিকার মধ্যে থাকিয়া ঠিক এমিবার মত শুঁড় বাহির করিতেছে এবং দ্রুত আকার পরিবর্ত্তন করিতেছে। এইরূপে ভিতর হইতে জীবাণুর দ্বারা নিত্য ধাক্কা খাওয়াতে রক্ত কণিকার গোল আবরণটি তুবড়িয়া গিয়া বিকৃত ও বৃহৎ আকারে পরিণত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের হিমোগ্লোবিনটুকু খাইয়া ফেলাতে কণিকাটি ফ্যাকাসে হইয়া যায়। স্লাইডে লওয়া রক্তটি অতঃপর শুখাইয়া গেলে এবং রং করিলে জীবাণুগুলি যে যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি ভাবেই মরিয়া পড়িয়া থাকে। সেইজন্য তখন মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক ট্রোফোজয়েট বিভিন্ন ও বিচিত্র আকারের, একটির সহিত আরেকটির কোনোই সাদৃশ্য নাই। অতএব পরস্পরের আকারে কোনোটির সহিত কোনোটির সাদৃশ্য না থাকাই ইহাদের এক বিশেষত্ব, এবং ইহাদের আর এক বিশেষত্ব এই যে ইহারা যে কণিকার মধ্যে থাকে সেটি দেখিতে অন্যান্য সাধারণ কণিকা অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও বিকৃত হয়। সুতরাং বিকৃত ও বর্দ্ধিতায়তন কণিকার মধ্যে আঁকাবাঁকা চেহারার জীবাণু দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে তাহা বি. টি. (B. T.) অর্থাৎ বিনাইন্ টার্শিয়ান জীবাণু। এই জীবাণু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া কণিকার যে টুকু স্থান অবশিষ্ট থাকে তাহা একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল লাল বিন্দুতে ভরিয়া যায় (Schuffner's dots); এও ইহাদের এক বিশেষত্ব, এরূপ আর অন্য কোনো জীবাণুর বেলা দেখা যায় না। এই বি টি. ম্যালেরিয়ার জীবাণুগুলি ক্রমে বড় হইয়া বৃহৎ শাইজোণ্টে পরিণত হয়, এবং এই শাইজোণ্ট হইতে প্রায় ১৪।১৬টি মেরোজয়েট জন্মে।

শাইজোণ্টের আর এক নাম রোজেট্ (rosette)। ইহার অর্থ, স্ফুটনোন্মুখ গোলাপের পুষ্পাবস্থা। পরিণত জীবাণু রক্তকণিকার মধ্যে থাকিয়াই বহুধা বিভক্ত হইয়া যে ১৪ হইতে ১৬টি ছোট ছোট কুঁড়ি-জীবাণুতে বা মেরোজয়েটে পরিণত হয়, উহারা ফুলের পাপড়ির মত গায়ে গায়ে সংলগ্ন থাকিয়া কণিকামধ্যস্থ স্থানটি সমস্ত অধিকার করিয়া থাকে, ও ফাটিয়া বাহির

হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহাদের দেখিতে বড়ই চমৎকার।
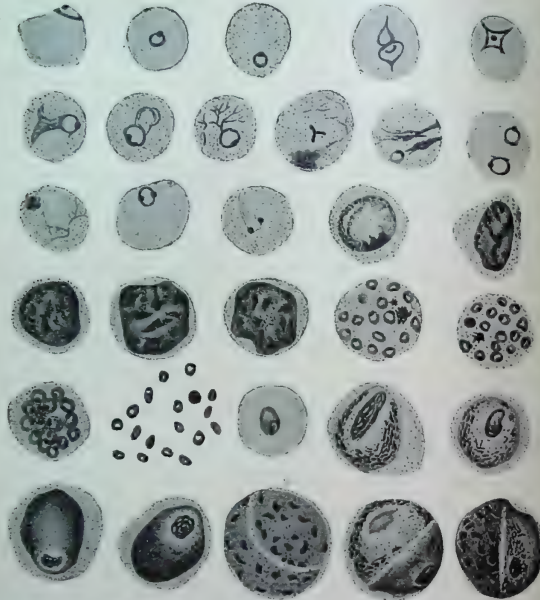
বি. টি. জীবাণুর বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নপ্রকার মূর্ত্তি

(১-১০) কণিকামধ্যস্থ ট্রোফোজয়েটের তরুণ অবস্থা হইতে ক্রমবিকাশ। (১১) একটি কণিকার মধ্যে দুইটি জীবাণু। (১২-১৯) শাইজোণ্টের ক্রমবিকাশ। (২০-২২) পরিণত শাইজোণ্ট্ বা রোজেট্। (২৩) মুক্ত অবস্থায় মেরোজয়েট। (২৪) বীজের প্রথম অবস্থা। (২৫-২৬) পুং গ্যামেটোসাইট। (২৭-২৮) স্ত্রী গ্যামেটোসাইট। (২৯-৩১) এক কণিকার মধ্যে দুইটি করিয়া গ্যামেটোসাইট।

(নোল্‌স্-এর "প্রোটোজুলজি" পুস্তক হইতে সংগৃহীত)

যে সময় মেরোজয়েটগুলি ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে সেই সময় রোগীর

কম্প দিয়া জ্বর আসে। অতঃপর মেরোজয়েটগুলি এক একটি নূতন কণিকার মধ্যে প্রবেশ করে, এবং ক্রমে তাহাদেরও পরিণতি হইতে থাকে। প্রত্যেক মেরোজয়েটের এক জন্ম ঘুরিয়া আবার নূতন মেরোজয়েটের সৃষ্টি করিতে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রত্যেক বারই একটি কণিকা হইতে বাহির হইয়া ইহারা এক সঙ্গে ১৬টি কণিকাকে আক্রমণ করে, এইরূপে ৪৮ ঘণ্টা অন্তর জীবাণুর সংখ্যা ১৬ গুণ করিয়া বাড়িয়া যাইতে থাকে। কিছুদিন এই ভাবেই চলে।

ক্রমে ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বীজরূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। প্রথম জ্বর দেখা দিবার ১০।১২ দিন পর হইতে কোনো কোনো জীবাণুকে বীজরূপে (gametocytes) রক্তের মধ্যে দেখা যায়। যে জীবাণু বীজে পরিণত হইবে, মেরোজয়েট অবস্থা হইতেই তাহার গঠন চলিতে থাকে। এমিবার মত ক্ষিপ্রগতি তাহার থাকে না, ধীরে ধীরে তাহা বড় হইয়া বৃত্তাকার প্রাপ্ত হয়, কণিকামধ্য হইতে যথাসম্ভব খাদ্য (haemozoin pigment) সংগ্রহ করিয়া লয় এবং একটি মাত্র কেন্দ্রপদার্থ (nucleus) লইয়া খোলসের মধ্যে অবস্থান করে। বীজে সম্পূর্ণ পরিণত হইতে ইহাদের দ্বিগুণ সময় অর্থাৎ ৯৬ ঘণ্টা লাগে।

এই সকল টার্শিয়ান জীবাণু মারাত্মক নহে বলিয়া উহা ইচ্ছাপূর্ব্বক মানুষের রক্তের মধ্যে প্রয়োগ করিয়া বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কয়েক প্রকার স্নায়বিক ব্যাধি ও পক্ষাঘাত রোগ (জি. পি. আই. রোগ) ম্যালেরিয়া রোগের দ্বারা আরোগ্য হয়। সেইজন্য ঐ সকল ক্ষেত্রে বি. টি. জীবাণুর দ্বারাই কৃত্রিম উপায়ে ম্যালেরিয়া উৎপাদন করা হয়। এইরূপে বহুলোকের শরীরে ম্যালেরিয়ার রক্ত ইন্‌জেকশন করিয়া তাহার ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে এই জাতীয় ম্যালেরিয়া-রোগীর রক্ত লইয়া কোনো সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ইন্‌জেকশন দিলে ৭ দিন হইতে ২৩ দিনের মধ্যে প্রথম জ্বরের সূত্রপাত হয়। ক্রমেই জ্বর বাড়িতে থাকে এবং ২ দিন হইতে ৫ দিন পর্য্যন্ত প্রায়ই উহার বিচ্ছেদ হয় না। ইহার পর দশ বারো দিন ধরিয়া প্রত্যহ কম্প দিয়া জ্বর আসে ও ছাড়িয়া যায়। তৎপরে জ্বরের রীতি বদলাইয়া যায় এবং এখন হইতে একদিন অন্তর পালাজ্বর সুরু হয়।

(ইহাতেই বুঝা যাইবে যে তরুণ অবস্থায় জরের আচরণ দেখিয়া ম্যালেরিয়ার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।)

সচরাচর যে সকল পুরাতন ম্যালেরিয়া আমরা দেখিতে পাই, যাহাতে রোগী কতক দিন মাত্র ভাল থাকে আবার উল্টিয়া পাল্টিয়া জরে পড়ে, এ সব জর অধিকাংশই বি. টি. জীবাণু প্রসূত। এই প্রকারের ম্যালেরিয়া প্রায়ই মারাত্মক হয় না, কিন্তু যাহাকে একবার ধরে তাহাকে আর কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। এই ম্যালেরিয়া রোগীকে প্রাণে মারে না, কিন্তু ভাতে মারে। লোকের উন্নতির পথে ইহাই প্রধান অন্তরায়। ইহার প্রাদুর্ভাব বৎসরের মধ্যে দুই বার। একবার হয় বসন্তকালের শেষ দিকে আর একবার বর্ষার মধ্যে। গরম পড়িবার মুখে আর একবার দেখা দিলেও সংখ্যায় তাহা কম, কিন্তু বর্ষার শেষেই ইহার প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শরৎকাল পর্য্যন্ত ইহা চলিতে থাকে, তাহার পর ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার পালা আসে।

প্ল্যাসমোডিয়াম্ ম্যালেরিয়া

ইহার অপর নাম **কোয়ার্টান** (Quartan)। ইহাদের দ্বারাই দুইদিন অন্তর পালাজর হয়। (কিন্তু সর্ব্বদা তাহা নাও হইতে পারে।) ইহারাও বি. টি-র মত দীর্ঘজীবী,—একবার ধরিলে পুনঃ পুনঃ জর হইতে থাকে এবং কুইনিন ইহাদের সহজে মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না। এই জীবাণু এদেশে প্রায় বিরল। বাংলাদেশের কোথাও কোথাও, এবং আসাম অঞ্চলেও এই জাতীয় ম্যালেরিয়া কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোনো বিশিষ্ট ঋতু নাই; সারা বৎসর এই-জাতীয় জীবাণুর সমান প্রকোপ দেখা যায়। রক্তের মধ্যে ইহাদের ক্রমবিকাশ বি. টি.-র মতই। প্রথম অবস্থায় ইহারাও দেখিতে নীল-আংটির মত। তবে ইহারা টোফোজয়েট অবস্থায় বি. টি-র মত চঞ্চল নহে, প্রায়ই কিছু স্থিরগতি ও গোলাকার। ইহাদের মধ্যেই হিমোজোইনের গুঁড়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তাহা চাপ বাঁধিয়া থাকে। ইহাদের পরিণত অবস্থার শাইজোণ্ট অষ্টদল গোলাপ ফুলের
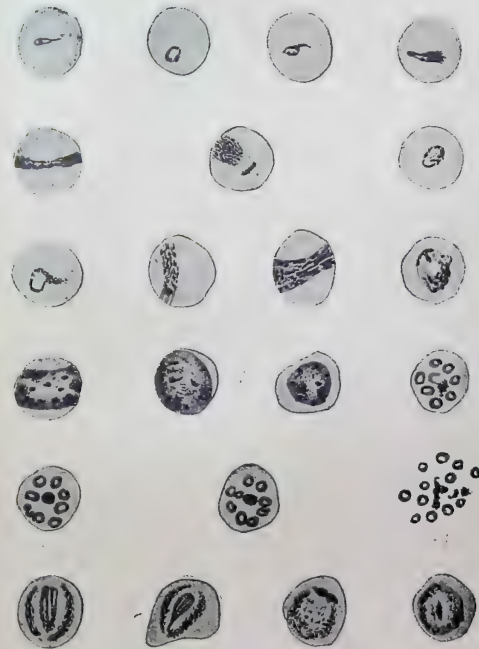
প্ল্যাস্‌মোডিয়াম্ ম্যালেরিয়া-জাতীয় জীবাণুর মনুষ্যরক্তে বিভিন্নরূপ প্রকাশ (চিত্রখানি নোল্‌স্‌এর "প্রোটোজুলজি পুস্তক" হইতে সংগৃহীত)।

(১—৯) ক্ষুদ্র রিং-এর আকার হইতে ট্রোকোজয়েটের ক্রমিক বিবর্দ্ধন। ইহারা আকারে যত বৃহৎ হয় ততই হিমোজোইন্ গুঁড়া অধিক পরিমাণে জমিতে থাকে। (১০-১৪) অপরিণত শাইজোণ্ট অবস্থা। (১৫-১৭) পরিণত শাইজোণ্ট বা রোজেট্। (১৮) মেরোজয়েটগুলির মুক্তি। (১৯-২০) পুং-গ্যামেটোসাইট। (২১-২২) স্ত্রী-গ্যামেটোসাইট।

মত দেখিতে অতি সুন্দর, এবং এক একটি শাইজোণ্ট প্রায়ই আটটি করিয়া মেরোজয়েট প্রসব করে। ইহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা যদিও দেখিতে অনেকটা বি. টি-র মত, কিন্তু যে কণিকার অভ্যন্তরে থাকে তাহা আয়তনে **স্ফীত না হইয়া বরং সঙ্কুচিত** হইয়া যায়, এবং তাহাতে Schuffner's dots কখনই থাকে না। বীজ অর্থাৎ গ্যামেটোসাইট্ ইহাদের অতি অল্পই হয়, সেইজন্য এ রোগের প্রসারও অনেকটা সীমাবদ্ধ। ইহাদের একবার জীবনচক্র সম্পূর্ণ হইতে ৭২ ঘণ্টা সময় লাগে বলিয়াই জ্বর নিয়মিত ২ দিন অন্তর হয়। এই ম্যালেরিয়া মারাত্মক নহে।

প্ল্যাসমোডিয়াম্ ফ্যালসিপেরাম্

এই জীবাণুই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। ইহারা এপিডেমিক্ ম্যালেরিয়ার জীবাণু, অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার মহামারী ইহাদের দ্বারাই হয়। এইজাতীয় জীবাণুর অনেক নাম :—**ম্যালিগন্যাণ্ট** (Malignant Tertian) বা ক্রূর জীবাণু; Subtertian parasites বা প্রাত্যহিক জ্বরের জীবাণু; Æstivo-autumnal অর্থাৎ শারদীয় জীবাণু; Laverania malaria,—(লাভের্ঁার স্মৃতি রক্ষার্থে)। সংক্ষেপে ইহাদের **এম্. টি.** (M. T.) অর্থাৎ **ম্যালিগন্যাণ্ট টার্শিয়ান্** বলা হয়। ইহাদের জীবনধারা পূর্ব্বোক্তগুলি হইতে কিছু বিভিন্ন। প্রথম তরুণ অবস্থায় ইহারা অন্যান্য জীবাণুদের মত আংটির আকারে রক্ত-কণিকার মধ্যে থাকিয়া শরীরের সর্ব্বত্রই সঞ্চরণ করে, কিন্তু যেমনি একটু বয়স বাড়িয়া পরিবর্ত্তনের সময় হয় তখনি ইহারা রোগীর শরীরের উপরিতলস্থ (peripheral) রক্ত হইতে অদৃশ্য হয়, অর্থাৎ তখন বহিরঙ্গের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া শরীরের গভীরতর প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং সাধারণতঃ যকৃৎ, মস্তিষ্ক, অন্ত্রনালী, অস্থিমজ্জা প্রভৃতির রক্তবাহী সূক্ষ্ম ধমনীগুলির (capillaries) মধ্যেই ইহাদের পরিণতি ও পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে। তৎপরে একবার জীবনচক্র সম্পূর্ণ হইলে নূতন ট্রোফোজয়েটগুলি আংটির আকারে আবার বাহিরের রক্তে কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। আর সময়মত যখন ইহাদের বীজ বা গ্যামেটো-

প্ল্যাসমোডিয়াম ফ্যাল্‌সিপেরাম-জাতীয় জীবাণুর বিভিন্নরূপ প্রকাশ (:চিত্রখানি নোল্‌স্-এর "প্রোটোজুলজি" পুস্তক হইতে সংগৃহীত)।

(১-১০) নানা প্রকারের এম্. টি. রিং, অর্থাৎ অতি তরুণ অবস্থার ট্রোফোজয়েট। রক্তের মধ্যে ইহাদের কেবল এই অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো কণিকার মধ্যে একাধিক রিং থাকে, এমন কি ৪।৫ টিও একত্রে থাকিতে দেখা যায়। (১১-১৩) শাইজোণ্ট অবস্থা। ইহা কেবল প্লীহাদি আভ্যন্তরিক যন্ত্রের মধ্যেই দেখা যায়। (১৪) পরিণত শাইজোণ্ট বা রোজেট। ইহাও আভ্যন্তরিক প্রদেশ ব্যতীত পাওয়া যায় না। (১৫) ক্রেসেণ্টের পূর্ব্বাবস্থা। (১৬-১৭) পুং-ক্রেসেণ্ট্। (১৮) ক্রেসেণ্টের পূর্ব্বাবস্থা। (১৯-২০) স্ত্রী-ক্রেসেণ্ট্। (২১-২৪) অস্বাভাবিক প্রকৃতির এম. টি. জীবাণু। কখনো কখনো ইহাদের এই বিকৃত রূপ দেখা যায়। ইহাকে tenue form বলা হয়।

সাইট জন্মিতে আরম্ভ হয় তখন সেগুলিও বাহিরের রক্তে আসিয়া দেখা দেয়। সুতরাং বাহিরের রক্তে ইহাদিগকে কখনই পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই না, রক্ত পরীক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র তরুণ আংটির আকারে একরূপ অবস্থাতেই সর্ব্বদা দেখি, আর জ্বর কিছু পুরাতন হইলে তাহার সহিত বীজগুলিও দৃষ্টিগোচর হয়; সেইজন্য ম্যালিগন্যাণ্ট জীবাণুর রিং (ring) ও ক্রেসেণ্ট্ (crescent) ছাড়া রক্ত পরীক্ষায় আমরা আর কিছুই দেখিতে পাই না। সুতরাং ইহাদের চেনা সহজ, কিন্তু খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। আংটিগুলি বা রিংগুলি কতকটা চন্দ্রবিন্দুর আকারের, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ বৃত্তের ন্যায়, এবং উহার বেষ্টনী চুলের মত এত সূক্ষ্ম যে অমনোযোগের সহিত দেখিলে ধরা যায় না। যে কণিকার মধ্যে ইহারা প্রবেশ করে সেগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থাতেই থাকে, আকারে বা আয়তনে **কমেও না, বাড়েও না**। ইহাদের বীজগুলিও নূতন ধরণের, দেখিতে কতকটা শশীকলার মত বলিয়া সেগুলির নাম ক্রেসেণ্ট্ (crescent)। পুং-ক্রেসেণ্ট্‌গুলি অপেক্ষাকৃত বেঁটে ও মোটা, এবং স্ত্রী-ক্রেসেণ্টগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা ও কৃশ।

ম্যালিগন্যাণ্ট জীবাণুর বিশেষত্ব কেবল এই নয়; অসাধারণ সংখ্যা-বাহুল্যও ইহাদের এক বিশেষত্ব। অন্যান্যজাতীয় জীবাণু অপেক্ষা প্রায়ই ইহাদের সংখ্যা রক্তের মধ্যে অনেক বেশী দেখা যায়। এই জীবাণু যাহার রক্তে থাকে, তাহার শতকরা প্রায় ২৫টি কণিকা একসঙ্গে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কাহারো কাহারো অধিকাংশ কণিকাই জীবাণু বহন করে, জীবাণুমুক্ত কণিকা খুব কমই থাকে। কেবল তাহাই নয়, এক একটি কণিকার মধ্যে এক সঙ্গে দুইতিনটি জীবাণু প্রায়ই দেখা যায়—এমন কি এক কণিকার মধ্যে একত্রে ৮টি জীবাণুও থাকিতে দেখা গিয়াছে। এইজাতীয় জীবাণুর ইহাই এক বিশেষত্ব, অন্য কোনো ম্যালেরিয়ার জীবাণু এক কণিকার মধ্যে প্রায় একটির বেশী থাকে না।

ম্যালিগন্যাণ্ট্ ম্যালেরিয়ার রক্তের মধ্যে এই সূক্ষ্ম আংটি ও ক্রেসেণ্ট্ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখি না বটে, কিন্তু মৃত্যুর পর শবব্যবচ্ছেদ করিলে প্লীহা, যকৃৎ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যন্ত্রের ভিতরকার রক্তে ভূরি ভূরি শাইজোণ্ট ও মেরোজয়েট নানা আকারে বর্ত্তমান দেখা যায়। এই জীবাণুর কাল্চার

করিলেও এই সকল অবস্থা-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। তাহাতে প্রত্যেক শাইজোণ্ট্ ১৪টি হইতে ১৬টি মেরোজয়েট প্রসব করে। কিন্তু ইহাদের জন্মচক্র অতিক্রম করিতে সময়ের কোনো স্থিরতা নাই—৩৬ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো সময় জন্মচক্র সম্পূর্ণ হইতে পারে, সেইজন্য ইহারা অনিয়মে প্রায় অনবরতই নূতন নূতন মেরোজয়েট প্রসব করিতে থাকে। সেইজন্য এই প্রকারের ম্যালেরিয়াতে জ্বরও প্রায় একজ্বরী হইয়া লাগিয়া থাকে।

এইজাতীয় জীবাণু বাস্তবিকই ক্রূর, কখন যে কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবে পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার কিছুই বলা যায় না। ম্যালেরিয়া হইতে যে নানারূপ অনর্থ ঘটিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে হঠাৎ মৃত্যু হইতে দেখা যায়, সে সকলের মূল এই এম্. টি. জীবাণু। ইহারা যে সকল কণিকাকে আশ্রয় করে, সে গুলি একরূপ আঠাযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর গায়ে গায়ে জুড়িয়া যায়, এবং একসঙ্গে অনেকগুলি রক্ত-কণিকা সংলগ্ন হইয়া কোনো সূক্ষ্মধমনীর ভিতরগাত্রে আটকাইয়া যাওয়াতে অনেক সময় স্থানীয় রক্তচলাচলের অবরোধ ঘটিবার উপক্রম হয়। অন্যস্থানে এরূপ হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু মস্তিষ্ক বা কোনো আভ্যন্তরিক যন্ত্রের মর্ম্মস্থলে আটকাইয়া গিয়া যদি হঠাৎ রক্তপ্রবাহের অবরোধ ঘটায়, তখনি মহা বিপদ উপস্থিত হয়। এরূপ হইবার কারণ এই যে, আক্রান্ত কণিকাগুলি যখন শরীরের অন্তর-প্রদেশে গিয়া প্রবেশ করে তখন উহারা সর্ব্বত্র সমান ভাবে ছড়াইয়া থাকে না। এক একটি স্থান যেন বাছিয়া লইয়া তথায় উহার অধিকাংশ এক সঙ্গে গিয়া প্রবেশ করে। হয় মস্তিষ্কে, নয় লিভারে, নয় অস্থিমজ্জায়, নয় অন্ত্রমধ্যে, কোথায় গিয়া প্রবেশ করিবে কিছুই স্থিরতা নাই। সেখানে গিয়া পরে যতই জীবাণুর সংখ্যা বাড়ে, ততই একসঙ্গে কতকগুলি কণিকা বাহিরে আসিতে চায়, ততই উহারা ধমনীগাত্রে জুড়িয়া যায়। এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যদি মস্তিষ্কের ধমনীতে রক্তচলাচল বন্ধ হইয়া যায় তবে রোগী তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়ে, কখনো বা দারুণ আক্ষেপ (convulsions) হইতে থাকে, কখনো বা জ্বরের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া যায় (hyperpyrexia), এবং শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিতে পারে। যাহাকে আমরা সেরিব্রাল (cerebral) ম্যালেরিয়া বলি তাহা এইরূপেই হয়। যদি অন্ত্রনালীস্থ ধমনীতে এইরূপ

অবরোধ ঘটে তবে কলেরার মত লক্ষণসকল প্রকাশ পায়, কখনো বা রক্তাতিসার প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এবং ইহাতেও মৃত্যুসম্ভাবনা যথেষ্ট; ইহাকে আমরা অ্যাল্‌জিড্ (algid) ম্যালেরিয়া বলি। ইহা ব্যতীত অন্যান্য নানারূপ অসামান্য উপসর্গও ইহাদের দ্বারা ঘটিতে পারে। সামান্য জ্বর হইতে অকস্মাৎ এই সকল মারাত্মক দুর্ঘটনা যে কখন উপস্থিত হইবে, অল্প সময় পূর্ব্বেও তাহার বিন্দু বিসর্গ জানা যায় না। সেইজন্য কাহারো রক্তে এম. টি. জীবাণু আছে শুনিলেই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়।

শরৎকাল হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই জীবাণুর অত্যধিক প্রাদুর্ভাব। আমাদের দেশে প্রায় শারদীয় পূজার উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইতে সুরু করে। এম. টি. জীবাণুকর্ত্তৃক ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার যেখানে প্রাদুর্ভাব হয় সেখানে উহা দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে জ্বর একটু পুরাতন হইলেই ইহারা অত্যধিক ক্রেসেন্ট বা বীজ সৃষ্টি করিতে থাকে। অন্যান্য ম্যালেরিয়ার জীবাণুর অপেক্ষা ইহাদের বীজের সংখ্যা অনেক বেশী। আট নয় দিন অচিকিৎসিত থাকার পর রক্ত পরীক্ষা করিলেই রোগীর রক্তে ঝুড়ি ঝুড়ি ক্রেসেন্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারো কাহারো এক বিন্দু রক্তের মধ্যে তিন চারি হাজার পর্য্যন্ত ক্রেসেন্ট্ দেখা গিয়াছে।

ম্যালিগ্‌ন্যান্টের বীজ বা ক্রেসেন্ট—ক্রেসেন্ট্ সম্পর্কেও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া হইলেই যে সব সময় রক্তে ক্রেসেন্ট্ জন্মায় তাহা নয়। ইহাদেরও জন্মিবার বিশিষ্ট ঋতু আছে; সারা বৎসরের মধ্যে কেবল নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেই ক্রেসেন্টের অত্যধিক প্রাচুর্য্য দেখা যায়, অন্য সময় ক্রেসেন্ট জন্মানো অতি বিরল। সিন্‌টন প্রভৃতি গবেষকগণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে বৎসরের অন্যান্য সময় যদি শতকরা একজনের রক্তে ক্রেসেন্ট্ পাওয়া যায় তো ঐ দুইমাসে শতকরা ১৫ জনের রক্তে উহা মিলিবে। ঐ দুইমাসই ম্যালেরিয়ার মহামারী হইবার সময়, তাহার কারণ তখন ক্রেসেন্ট্‌ও প্রচুর জন্মায়, এবং মশাও যথেষ্ট বাড়ে। ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া হইবার একমাত্র উপাদান এই ক্রেসেন্ট্, এবং এনোফিলিস মশা-ই তাহার বাহন। ক্রেসেন্টের পরমায়ু

অনেকদিন, একবার জন্মিলে উহারা ৩।৪ সপ্তাহ কাল রক্তের মধ্যে জীবিত থাকে।

কুইনিনে ক্রেসেন্টের কিছুই করিতে পারে না। রক্তে ক্রেসেন্ট্ জন্মিবার পর কুইনিন দিলে রোগ আরোগ্য হয় বটে, কিন্তু সংক্রমণের বীজ বা ক্রেসেন্ট্‌গুলি ঐ সুস্থ রোগীর রক্তে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়; সুতরাং যদিও রোগী কুইনিন খাইতেছে, তথাপি তাহার রক্ত হইতে মশার দ্বারা অন্যের শরীরে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। রোগের প্রথম হইতে কুইনিন আরম্ভ করিলে এরূপ হইতে পারে না, কারণ রোগ দেখা দিবার পর ৮।৯ দিন গত না হইলে জীবাণুরা ক্রেসেন্ট জন্মাইবার সুযোগ পায় না, সুতরাং তৎপূর্ব্বে কুইনিন খাওয়াইলে সে সুযোগ নষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে তথাপিও আমাদের দেশে ক্রেসেন্ট্ জন্মিবার সুযোগ যথেষ্টই ঘটে, কারণ দুই চারি দিনের জ্বরেই রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিবে, এত অর্থও এ দেশের লোকের নাই, এত শিক্ষাও নাই, এবং জীবনের প্রতি এত আসক্তিও নাই।

ম্যালেরিয়ার রক্ত পরীক্ষা

ম্যালেরিয়া চিনিতে সাধারণতঃ বড় বিলম্ব হয় না বটে, কিন্তু কখনো কখনো ইহার মূর্ত্তি এমন বিকৃত হইয়া পড়ে যে রক্তপরীক্ষা ব্যতীত কিছুতেই সন্দেহ দূর হয় না। তদ্ব্যতীত ম্যালেরিয়াও তিনরূপ স্বতন্ত্র প্রকারের, সুতরাং তিন প্রকার জীবাণুর মধ্যে কাহার দ্বারা জ্বর হইয়াছে, রক্তপরীক্ষা ব্যতীত তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। আবার অনেক সময় একাধিক প্রকার জীবাণু একত্রও রক্তের মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারে। কখনো কখনো একজন রোগীর রক্তে তিন প্রকার জীবাণুও একসঙ্গে থাকিতে দেখা যায়। এই সকল সমস্যা নিশ্চিতরূপে সমাধান করিতে হইলে রক্তপরীক্ষা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

অবশ্য সহজদৃষ্টিতে যাহা ম্যালেরিয়া বলিয়া বুঝা যাইতেছে, তাহার জন্য রক্তপরীক্ষা না করিলেও কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু যেখানে সন্দেহস্থল সেখানে বহুমূল্য সময় অনর্থক নষ্ট না করিয়া সত্বর রক্তপরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রত্যেক ম্যালেরিয়া-রোগীর রক্ত পরীক্ষামাত্রই যে জীবাণু দেখিতে পাওয়া যাইবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। সেইজন্য একবার পরীক্ষায় না পাওয়া গেলে দুই তিন দিন রক্ত লইয়া কখনো কখনো দুই তিনবার পরীক্ষার আবশ্যক হয়। এইরূপ করিলে অধিকাংশ স্থলেই জীবাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এমনও হইতে দেখা গিয়াছে যে, রোগটি নিঃসন্দেহ ম্যালেরিয়া, অথচ জীবাণু পাইলাম না, কিন্তু তবু কুইনিন দিতেই তাহা ভাল হইয়া গেল। ইহাতে অনেকে হয় তো মনে করিতে পারেন যে এ পরীক্ষার সারবত্তা কি আছে; কিন্তু এ পরীক্ষায় যত সংশয়ের অপনোদন হয় এবং যত অসম্ভব স্থানে ইহা আশ্চর্য্যরূপে চোখ ফুটাইয়া দেয়, সে তুলনায় এরূপ অকৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল।

রক্তপরীক্ষায় কেবল যে ম্যালেরিয়া চেনা যায় তাহা নয়, জীবাণুর

সংখ্যা কত, বীজের উৎপত্তি হইয়াছে কিনা, রোগীর রক্তের অবস্থা কেমন, এ সমস্ত কথাই উহাতে জানিতে পারা যায়। অতএব ম্যালেরিয়া রোগের সম্পূর্ণ পরিচয় লইতে হইলে রক্তপরীক্ষা আবশ্যক, আর রক্তপরীক্ষা করিতে হইলে মাইক্রোস্কোপ আবশ্যক। নোল্‌স্ (Knowles) উপমাস্বরূপ বলেন, সমুদ্রে কম্পাসবিহীন নাবিকের যে অবস্থা, এ দেশে মাইক্রোস্কোপবিহীন ডাক্তারের সেই অবস্থা। কিন্তু কেবল মাইক্রোস্কোপ হইলেই হয় না, তাহার তোড়জোড়ও সঙ্গে রাখিতে হয়। কিছু কাচের স্লাইড, কয়েক প্রকার রং (reagents), টেষ্টটিউব, র‍্যাক্, প্রভৃতিও রাখা আবশ্যক। এই সকল সরঞ্জাম থাকিলে রক্ত পরীক্ষা করা কিছুই কঠিন নয়।

পরীক্ষার জন্য রক্ত লইতে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন। ভাল করিয়া ইহা না শিখিলে অনেকে রক্ত লইতে এমন খারাপ করিয়া ফেলেন, যে তাহা হইতে ম্যালেরিয়া-জীবাণু খুঁজিয়া বাহির করার কোনো উপায় থাকে না।

রক্ত লওয়ার নিয়ম—প্রথমতঃ স্লাইডগুলি পরিষ্কার, দাগবিহীন ও শুষ্ক হওয়া দরকার। যেন কোনো ময়লা বা তেলাদাগ উহাতে না

থাকে। পরিষ্কার শুষ্ক কাপড় দিয়া উত্তমরূপে ঘষিয়া লইলেই স্লাইড গুলি প্রায় পরিষ্কার হইয়া যায়। বেশী পুরাতন স্লাইড হইলে উহা সাবান

জলে ধুইয়া শুষ্ক কাপড়ে ঘষিয়া মুছিয়া লইতে হয়। রক্ত লইবার জন্য দুইখানি স্লাইড প্রস্তুত থাকিবে। ঐ স্লাইড কোনো সমতল স্থানে বা পরিষ্কার কাগজের উপর স্থাপন করিবে, হাতে ধরিয়া থাকিবে না। অতঃপর ছুঁচের মুখ একটু আগুনে পুড়াইয়া বা অ্যাল্‌কোহলে ডুবাইয়া মুছিয়া লইয়া রোগীর আঙুলের মাথায় অল্প একটু বিঁধিয়া দিবে। ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বিঁধিলে উহাতে ব্যথা পাওয়া যায় না। অতঃপর আঙুল ধরিয়া অল্প টিপিয়া দিলেই এক ফোঁটা রক্ত বাহির হইবে। এই প্রথম নির্গত রক্তটুকু তুলা দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া পুনরায় এক ফোঁটা রক্ত টিপিয়া বাহির করিবে। প্রথম বিন্দুটি পরীক্ষার জন্য লওয়া ঠিক নয়। একখানি স্লাইডের সরু ও মসৃণ কিনারা (edge) বাছিয়া লইয়া তাহাতে ঐ

রক্তটুকু ঠেকাইয়া লইবে। পরে ঐ কিনারাটি সমতলস্থ দ্বিতীয় স্লাইডের পিঠের উপর এক পাশে তির্য্যকভাবে স্থাপন করিবে, এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য ঐ অবস্থায় উহা স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিবে। দেখিতে দেখিতে রক্ত বিন্দুটি

কিনারার লাইন ধরিয়া দ্বিতীয় স্লাইডের উপর ছড়াইয়া পড়িবে। তখন হাতের স্লাইডখানি ঐরূপ তির্য্যকভাবেই রাখিয়া এক ঝোঁকে এবং
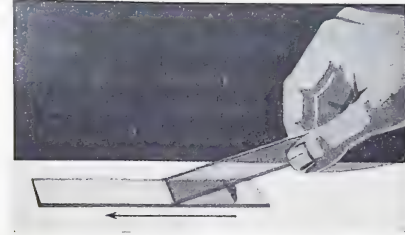
সমান বেগে দ্বিতীয় স্লাইডের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘষিয়া ঠেলিয়া দিবে। রক্তবিন্দুটি এইরূপে ছড়াইয়া ও ঘষিয়া যাওয়াতে স্লাইডের উপর রক্তের একটি পাৎলা স্তর (film) পড়িয়া যাইবে, তাহাতে রক্তকণিকাগুলি পৃথক পৃথক ভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। হাওয়া লাগিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ রক্ত শুকাইয়া যাইবে। রক্তের ফিল্‌ম্ সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গেলে স্লাইডখানি কাগজে মুড়িয়া

স্লাইডের উপর রক্তের ফিল্‌ম্ এইরূপ হওয়া উচিত

লইবে; অতঃপর পরীক্ষার অবসর হইলে তখন উহা কোনো সুবিধাজনক স্থানে রাখিয়া রং করিবে। প্রথমে ৮।১০ ফোঁটা লীশ্‌ম্যানের রং (Leishman stain) তাহার উপর ঢালিয়া দিবে,—কুড়ি গুণিতে যতক্ষণ

সময় লাগে ততক্ষণ অপেক্ষা করিবে, পরে উহার দ্বিগুণ পরিমাণ ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার তাহার উপর ঢালিয়া দিবে। তখন রং ও জল পরস্পর সাবধানে মিলাইয়া দিয়া দশ মিনিটকাল অপেক্ষা করিবে। পরে উহার উপর সাধারণ জল ঢালিয়া স্লাইডখানি উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে। অতঃপর হাওয়া লাগিয়া উহা শুকাইয়া গেলে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করিবে।

ম্যালেরিয়া থাকিলে ইহাতে **গোলাপী রংএর কণিকার মধ্যে নীল রংএর জীবাণু এবং তাহার মধ্যে সিন্দুর বর্ণের অঙ্কুর** ও মধ্যে মধ্যে খদির বর্ণের গুঁড়া (হিমোজোইন) বড়ই সুন্দর রূপে দেখা যায়। কণিকামধ্যস্থ জীবাণুর এই বর্ণ-বৈচিত্র্য একবার দেখিলে আর ভোলা যায় না। তবে রক্তের মধ্যে ইহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে কিছু অভ্যাস ও ধৈর্য্যের আবশ্যক। ভাগ্য প্রসন্ন থাকিলে অবিলম্বেই জীবাণু পাওয়া যায়, অন্যথা বহুক্ষণ চক্ষুপীড়া সহ্য করিয়া ইহাদের সাক্ষাৎ-লাভের প্রয়াস পাইতে হয়। সংশয়স্থলে দুই চারিখানি স্লাইড না দেখিয়া আশা ত্যাগ করা উচিত
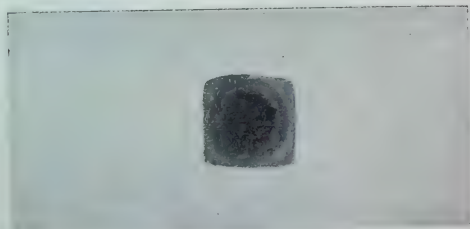
স্লাইডে ঘন রক্তবিন্দু (thick film) কিরূপে লইতে হয়

নয়। ঘন রক্তবিন্দু (thick film) পরীক্ষার দ্বারাও শীঘ্র সংশয় দূর করা যায়, কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক।

একটি কথা এখানে বলা দরকার যে রক্ত লইবার পূর্ব্বে যদি কুইনিন খাওয়া হয় তবে অনেক অনুসন্ধান করিলেও রক্তে জীবাণু দেখা যাইবে না। ৪।৫ দিন পূর্ব্বে খাইলেও তাহাই হয়। আর জ্বর থাকিতে

থাকিতে রক্ত লওয়াই ভাল, কারণ তাহাতে অধিক জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বদা দুখানি স্লাইডে রক্ত লইবে।

রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়া-জীবাণু দেখিতে না পাওয়া গেলেও ম্যালেরিয়ার কয়েকটি অন্যান্য চিহ্ন অনেক সময় তাহাতে এমন পাওয়া যায়, যাহাতে রোগটি ম্যালেরিয়া বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, হিমোজোইন্ গুঁড়ার (haemozoin pigment) অস্তিত্বের দ্বারা। এই গাঢ় হরিদ্রাভ খদির রংএর গুঁড়া যদি Large mononuclear জাতীয় শ্বেতকণিকার মধ্যে দেখা যায়, এবং বহু পরিমাণে অনেকবার তাহা নজরে পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে রোগীর ম্যালেরিয়া আছে, কারণ ঐ গুঁড়া অন্য রোগে জন্মায় না। দ্বিতীয়তঃ,—শ্বেতকণিকার সংখ্যার অনুপাত দেখিয়াও ম্যালেরিয়া কতক চেনা যায়। ম্যালেরিয়াতে Large mononuclear জাতীয় শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যন্ত বাড়ে। সাধারণতঃ এগুলি শতকরা ৫টির অধিক থাকে না,—কিন্তু ম্যালেরিয়াতে উহা শতকরা ১৫ হইতে ২০ পর্য্যন্ত বাড়িতে পারে। অতএব যাহার জ্বরের সঙ্গে এগুলিও বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় তাহার ম্যালেরিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। কালাজ্বরে ও ম্যালেরিয়াতে এ সম্বন্ধে অনেকটা মিল আছে। কালাজ্বরে শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়, ম্যালেরিয়াতেও তাহা কমে, কিন্তু অত নয়। কালাজ্বরে উহা প্রায় ৩০০০-এরও কম হইয়া যায়, ম্যালেরিয়াতে তাহা হয় না। এ ছাড়া কালাজ্বরে Polynuclear কণিকার সংখ্যা প্রায় ৫০-এর নীচেই যায়, ম্যালেরিয়াতে তাহা কখনও হয় না,—৫০-এর উপরই উহার সংখ্যা থাকে। রক্তের এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়াও ম্যালেরিয়া চিনিতে কিছু সাহায্য হইতে পারে। তবে এগুলি নিশ্চিত প্রাপ্তব্য চিহ্ন নয়, ম্যালেরিয়া মাত্রেই এ-গুলি নাও ঘটিতে পারে। হিমোজোইন্ গুঁড়া সব ম্যালেরিয়াতে পাওয়া যায় না, শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যা না কমিয়া কোথাও বাড়িয়াও যাইতে পারে (Leucocytosis), এবং Large mononuclear কণিকার সংখ্যা অধিক না বাড়িতেও পারে। সুতরাং এগুলি না থাকিলে ম্যালেরিয়া নয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেবল যেখানে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেখা যাইতেছে না, সেখানে যদি এই সকল চিহ্ন

থাকে, তখন ম্যালেরিয়া সন্দেহ করার পক্ষে কয়েকটি যুক্তি পাওয়া যায়, ইহাই বক্তব্য।

ম্যালেরিয়া চিনিবার অন্য উপায় ঃ—

রক্তপরীক্ষা ছাড়াও অন্য পরীক্ষার দ্বারা ম্যালেরিয়া চিনিবার উপায় আছে। ম্যালেরিয়াতে প্রস্রাবে ইউরোবিলিন্ (Urobilin) নামক পদার্থের বৃদ্ধি হয়। রক্তকণিকা সকল ভাঙিয়া যাওয়াতে তদ্দ্বারা এই ইউরোবিলিন উৎপন্ন হয়। এ সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে। ম্যালেরিয়া ব্যতীত কালাজ্বরে, বা এনীমিয়া রোগে বা শরীরের অভ্যন্তরে কোথাও রক্তক্ষয় হইতে থাকিলেও প্রায় প্রস্রাবে ইউরোবিলিন দেখা দেয়। কিন্তু দুই তিন দিনের জ্বরেই যদি ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে রোগটি নিশ্চয় ম্যালেরিয়া। যেখানে ডেঙ্গু, কি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কি টাইফয়েড, কিংবা ম্যালেরিয়া, তাহা বুঝা যাইতেছে না, হয় তো রোগী দুই একবার কুইনিন খাইয়া ফেলিয়াছে, কিংবা হয় তো রক্তপরীক্ষার উপস্থিত সুবিধা নাই, অথবা রক্তপরীক্ষা করিয়া কিছু পাওয়া যায় নাই,—এরূপ স্থলে প্রস্রাবের ইউরোবিলিন পরীক্ষায় অনেক সন্দেহের মীমাংসা করা যায়।

এই পরীক্ষা বিশেষ কঠিন নয়। ইহার জন্য একটি মাত্র ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া রাখা আবশ্যক। সমান সমান পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটার একত্রে মিলাইয়া, ঐ জলে para-di-methyl-amino-benzaldehyde নামক ঔষধের শতকরা তিনভাগ হিসাবে দ্রাবণ প্রস্তুত করিতে হয়। নিজে প্রস্তুত করা কঠিন হইলে বেঙ্গল কেমিক্যাল বা অন্য কোনো রাসায়নিক ল্যাবরেটরিতে অর্ডার দিলেই তাহারা প্রস্তুত করিয়া দিবে (3% sol. of para-di-methyl-amino-benzaldehyde in 50% hydrochloric acid)। এই ঔষধ একটি ফোঁটা-ফেলা শিশিতে ভরিয়া রাখা উচিত। বড় টেষ্টটিউবে এক ইঞ্চি পরিমাণ (৫ সি. সি.) প্রস্রাব লইয়া তাহাতে ৫ ফোঁটা উপরোক্ত ঔষধ ফেলিতে হয়। যদি ইউরোবিলিন উহাতে অধিকমাত্রায় থাকে তবে দেখিতে দেখিতে ঐ প্রস্রাব ঘোর লালবর্ণ হইয়া যাইবে। যদি কিছু কম থাকে তবে লালবর্ণ ধারণ করিতে ২।১ মিনিট বিলম্ব হইবে। লাল বর্ণের গাঢ়ত্ব দেখিয়া ইউরোবিলিনের মাত্রা অনুমান করা যাইবে। যদি উহা গোলাপী রং হয় তবে অল্প আছে এবং ঘোর লাল হইলে অনেক আছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইউরোবিলিন কিছুমাত্র থাকিলে ঐ ঔষধের দ্বারা প্রস্রাব তিন

মিনিটের মধ্যে নিশ্চয় লাল হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। উহা না থাকিলে প্রস্রাবের রং বদলাইবে না।

রাত্রের সঞ্চিত প্রস্রাব অথবা ভোর বেলাকার প্রথম প্রস্রাব লইয়াই পরীক্ষা করা উচিত। ম্যালেরিয়া জ্বরের দ্বিতীয় দিন হইতেই ইহা প্রস্রাবে পাওয়া যায় এবং জ্বর ছাড়িবার পরও ছয়দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। কুইনিন খাইবামাত্র প্রথমটা ইউরোবিলিনের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। ইউরোবিলিন যত অধিক থাকে রোগটি তত তীব্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। ম্যালেরিয়া মাত্রেই ইহা না থাকিতে পারে, কিন্তু যদি থাকে তবে খুব সম্ভব তাহা ম্যালেরিয়া। সুতরাং যেখানে কুইনিন খাওয়া হইয়াছে এবং রক্তপরীক্ষায় বিশেষ সন্ধান মিলিবার আশা নাই, সেখানে এই পরীক্ষা রোগ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে, কারণ ম্যালেরিয়ার উপর কুইনিন পড়িয়া থাকিলে ইউরোবিলিনের মাত্রা বাড়িয়া তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

Linzenmeir's test :—

রোগীর রক্ত লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারাও ম্যালেরিয়া চিনিতে পারা যায়। ইহাতেও মাইক্রোস্কোপের আবশ্যক হয় না, এবং এ পরীক্ষাও বিশেষ কঠিন নয়। ইহার নাম Linzenmeir's test। একটি ইন্‌জেক্‌শনের পিচকারীতে ১ সি. সি. পরিমাণ সাইট্রেটযুক্ত জল লইয়া (5% solution of sodium citrate) পরে উহারই মধ্যে রোগীর শিরা হইতে ৫ সি. সি. পরিমাণ রক্ত টানিয়া লও। একত্র মিশাইয়া উহা একটি টেষ্টটিউবের মধ্যে ঢালিয়া রাখ। আধ ঘণ্টা পরে রক্তের কণিকাগুলি নীচে তলাইয়া পড়িবে এবং উপরে পরিষ্কার সিরামটি থিতাইয়া থাকিবে। এই পরিষ্কৃত সিরামের রং যদি তখন পিঙ্গল (পিত্তের ন্যায় হরিদ্রাভ) দেখিতে হয়, তবে রোগটি নিশ্চয় ম্যালেরিয়া। অন্য কোনো রোগে ইহা হয় না, কালাজ্বরেও না। ম্যালেরিয়ার অতি প্রথম অবস্থায়, যখন রক্তে জীবাণু পাওয়া সম্ভব নয়, তখনও রক্তের মধ্যে এই চিহ্ন পাওয়া যাইবে।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণাদি

তরুণ ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়ার প্রথম লক্ষণ জর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রক্তের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত একশত কোটি সংখ্যায় উপস্থিত না হয় ততক্ষণ জর হয় না। এই সংখ্যায় পৌছিতে উহাদের প্রায় ৭ দিন হইতে ২৩ দিন পর্য্যন্ত সময় লাগে,—সুতরাং সংক্রামিত মশা কামড়াইবার পর এই কয়েকদিন অতীত হইলে তবে প্রথম জর দেখা দেয়। ঐ জর একবার মাত্র হইয়াও ছাড়িয়া যাইতে পারে, কিংবা প্রথম হইতেই উহা সবিরাম অথবা অবিরাম হইতে পারে, অথবা প্রথম কয়েকদিন অবিরাম জরের পর ছাড়িয়া ছাড়িয়া জর আসিতে পারে,—তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। যদি একবার মাত্র ম্যালেরিয়ার দেশে গিয়া দুই এক দিন থাকিয়া পলাইয়া আসি, (হয় তো তাহাতে শরীরে একবারমাত্র একজাতীয় জীবাণু প্রবেশ করিয়াছে,)—তাহা হইলে জীবাণুর প্রকৃতি অনুসারে নির্দ্দিষ্টরূপ জর হওয়াই সম্ভব। কিন্তু বহুদিন তথায় বাস করিলে ও বহু বীজ প্রবেশ করিলে প্রায়ই এলোমেলো জর হয় এবং জরের উপরই আবার জর আসে।

ম্যালেরিয়ার জরকে তিন অবস্থায় ভাগ করা হয়। প্রথম,—কম্প দিয়া জর আসা। দ্বিতীয়,—উত্তাপের স্থায়ী অবস্থা। তৃতীয়,—ঘাম দিয়া জর ত্যাগ। পরে কিছু সময় সুস্থ থাকার পর ইহার পুনরায় আবৃত্তি। সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম। তবে জরের কোনো নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই;—অল্প অল্প ঘুষ্‌ঘুষে জরও হইতে পারে, মাঝারি রকমের জরও হইতে পারে, এবং এমন প্রবল জরও হইতে পারে যাহাতে শরীরের তাপ ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্তও উঠিয়া যায়। জীবাণুর সংখ্যার সহিত জরের তাপবৃদ্ধির কোনো সংশ্রব নাই। অল্প জীবাণুতেও অনেক জর আর অনেক জীবাণুতেও সামান্য জর দেখা যাইতে পারে। ইহা রোগীর শরীরের অবস্থা ও জীবাণুর ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

ম্যালেরিয়ার জর আসা অনেকটা বৈশাখী ঝড় আসার মত। দুই একদিন পূর্ব্ব হইতে শরীরটা একটু ভার বোধ হয়। জরের সূচনায় মধ্যে মধ্যে হাই ওঠে, বার বার আলস্য ভাঙিতে ইচ্ছা হয়, হাত পা কামড়ায়, মাথা ধরে। তাহার পর যেন ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু হয়,—হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে, পিঠের দিকে সির্ সির্ করিতে থাকে, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। তৎপরে কম্প দেখা দেয়। সকাল হইতে দুপুরের মধ্যেই প্রায় এই জর আসে, ম্যালেরিয়ার জর প্রায় সন্ধ্যার দিকে আসে না। জর আসার সময়টি বেশ উপভোগ্য,—অনেকের হয় তো বাল্যে জর আসার কথা স্মরণ আছে। অতি গরমেও লেপ মুড়ি দিয়া জর আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের 'বাতিক বৃদ্ধির' লক্ষণ দেখা যায়, এবং স্বভাব অনুসারে রোগী নানারূপ বকিতে থাকে। কচি ছেলেদের জর আসিবার সময় কখনো কখনো আক্ষেপ (তড়্কা) হইতেও দেখা যায়।

জর আসার পরই উত্তাপের অবস্থা। তখন লেপ ফেলিয়া রোগী দাহের যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে,—অনবরত পিপাসা হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বমি করিতে থাকে,—এ ছাড়া শিরঃপীড়া, কোমরে ব্যথা, হাত পা কামড়ানো, প্রভৃতি নানারূপ লক্ষণ দেখা দেয়। জরের ভোগ শেষ হইলে প্রচুর ঘাম দিয়া জর ত্যাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সকল যন্ত্রণার অবসান হয়।

কিন্তু এরূপ বিধিমত লক্ষণ সর্ব্বদা দেখা যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ম্যালেরিয়া জরের কোনোই স্থিরতা নাই,—যে কোনো রকম জরই ইহাতে হইতে পারে। যে জর নিয়মমত একবার করিয়া ছাড়িতেছে আবার প্রবল হইয়া আসিতেছে তাহাকে ম্যালেরিয়া বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক,—কিন্তু যে জর ছাড়ে না, বা একইভাবে কিছুদিন যাবৎ লাগিয়া থাকে,—তাহা যে ম্যালেরিয়া নয়,—এমন কথা বলা চলে না। সুতরাং কেবল জরের গতিবিধি দেখিয়া সব ম্যালেরিয়া চিনিতে পারা যাইবে না। তবে জরের সঙ্গে আরো কতকগুলি লক্ষণ থাকে,—সেগুলি সমবেতভাবে ম্যালেরিয়ার নির্দ্দেশক। এ-গুলিও যে সব সময় স্পষ্টরূপে কেবল ম্যালেরিয়াতেই দেখা যায় তাহা নয়,—তবে ইহার মধ্যে কিছু না কিছু প্রায়ই উহাতে লক্ষ্য করা যায়, এবং সব লক্ষণ জরের সহিত একত্রে জুড়িয়া

দেখিলে ম্যালেরিয়ার সন্দেহ স্পষ্টতর হইয়া ওঠে। এই সকল লক্ষণ পৃথকভাবে আলোচিত হইল।

(১) **কাঁপুনি**—কম্প দিয়া জ্বর আসিলে প্রথমে ম্যালেরিয়া বলিয়াই বুঝি। ইহা সাধারণ নিয়ম হইলেও দুটি কথা মনে রাখিতে হইবে। ম্যালেরিয়া মাত্রেই,—বিশেষতঃ ম্যালিগ্ন্যান্ট্ হইলে,—জ্বর কম্প দিয়া নাও আসিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আরো কয়েকটি রোগ আছে যাহার কম্প দিয়া প্রথম সূত্রপাত হয়, যেমন :—**ডেঙ্গু, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, প্লেগ, বসন্ত, টাইফয়েড, মেনিঞ্জাইটিস** প্রভৃতি। সুতরাং কম্প দেখিলেই ম্যালেরিয়া মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলিবে না। আমরা ম্যালেরিয়া দেখিতে দেখিতে এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে অন্যান্য রোগের সময়ও এরকম ভুল প্রায়ই করিয়া থাকি।

(২) **জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসা**—ম্যালেরিয়াতেই ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু আরো কয়েকটি রোগ আছে যাহাতে এ-লক্ষণ দেখা যায়। যেমন,—**কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া বা বাতশিরার জ্বর, লিভার অ্যাবসেস্, বিস্ফোটক রোগ** (Pyaemia), **কোলাই বা অন্যান্য বীজাণুজনিত জ্বর** (Bacterial septicaemia), **পশ্চিম দেশের রিল্যাপ্সিং ফিবার** (Relapsing fever), **ইঁদুরে কামড়ানোর জ্বর** (Rat bite fever), প্রভৃতি। প্রথমে ভুল হইলেও, কুইনিনে কোনো ফল না হইলেই তখন এগুলি ধরা পড়িয়া যায়। আরো এক কথা,—অন্য রোগের সঙ্গে ম্যালেরিয়া মিশ্রিত থাকিলেও জ্বর এরূপভাবে আসিতে পারে, সে কথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(৩) **বমি**—জ্বর আসার সঙ্গে সঙ্গে বমি হইতে থাকা ম্যালেরিয়ার একটি অভ্রান্ত লক্ষণ। অন্যান্য কয়েকটি রোগে,—বিশেষতঃ **টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, বসন্ত, মেনিঞ্জাইটিস** প্রভৃতিতেও প্রথমে বমি দেখা দেয় বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার বমির সহিত তাহার বেশ পার্থক্য আছে। ম্যালেরিয়ার মত সে বমি বারে বারে হয় না। আর ম্যালেরিয়ার বমি প্রায়ই **পিত্ত মিশ্রিত,** টক্, ও দুর্গন্ধযুক্ত। জ্বর আসার সঙ্গে সঙ্গে বমি হইয়াছিল কিনা এ-কথা প্রত্যেক রোগীকে আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

(৪) **গন্ধ**—ম্যালেরিয়া রোগীর গায়ে বিশেষ একরূপ 'জ্বরগন্ধ' পাওয়া যায়। যাঁহারা ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন সে গন্ধ কিরূপ। ইহা ইঁদুরের গন্ধের মত একরূপ সোঁদা সোঁদা বিকৃত গন্ধ,—রোগীর কাছে গিয়া বসিলেই তাহা নাকে আসিয়া লাগে। যাঁহারা এই গন্ধ চেনেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন এই গন্ধটাই তাঁহারা আগে খোঁজেন, এবং একবার টের পাইলে তাঁহাদের রোগ চেনার কথা আর ভাবিতে হয় না। তবে সকলের পক্ষে ইহা অনুভব করা সম্ভব নয়, কারণ সকলের ঘ্রাণশক্তি সমান নয়।

(৫) **প্লীহা বৃদ্ধি**—জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে প্লীহার বৃদ্ধি হওয়া ম্যালেরিয়ার নির্ভুল চিহ্ন। এই প্লীহা আমাদের রোগনির্ণয়ে এতই সহায়তা করে যে কোনো দিগ্‌নির্ণয়যন্ত্রও বোধ হয় নাবিককে তত করিতে পারে না। মাত্র ২।৩ দিনের জ্বরেই ম্যালেরিয়াতে প্লীহা বাহির হইয়া পড়ে। অন্যান্য কয়েকটি রোগেও প্লীহা বাড়ে বটে, কিন্তু এত শীঘ্র ম্যালেরিয়াতে ছাড়া অন্য কিছুতেই প্লীহা পাওয়া যায় না। সেইজন্য যেখানে অশিক্ষিত রোগী রোগ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিতে পারে না, যেখানে রক্তপরীক্ষা করাও অসম্ভব, সেখানে উপস্থিত জ্বর থাকুক বা না থাকুক, প্লীহাই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। এ দেশে যে কোনো রোগী পরীক্ষা করিতে গেলে আগে দেখা উচিত পেটে প্লীহা আছে কি না, এবং এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া পরে শরীরের অন্যান্য অংশ পরীক্ষা করা উচিত। তরুণ জ্বরের সহিত প্লীহা থাকিলে এবং শরীরের আর কোথাও কোনো দোষ পাওয়া না গেলে ম্যালেরিয়াই সাব্যস্ত করা উচিত; আর ইহার সহিত অন্য কোনো রোগের লক্ষণ দেখা গেলে তাহাই যদি উপস্থিত জ্বরের হেতু বলিয়া মনে হয়, তবে অবশ্য আগে তাহারই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ম্যালেরিয়ার কথাও যেন সেই সঙ্গে মনে থাকে। এই নিয়মে কাজ করিয়া গেলে আমাদের দেশে চিকিৎসায় বড় ঠকিতে হয় না। অতএব প্লীহা আছে কি না এটুকু যত্ন পূর্ব্বক দেখাই কর্ত্তব্য। দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় পরীক্ষা করিলে ইহা অনেক সময় টের পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ রোগী যদি হৃষ্টপুষ্ট হয়। সুতরাং রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া পেটের বন্ধন শিথিল

করিয়া হাঁটু তুইটি মুড়িয়া দিয়া পেটের পেশী সম্পূর্ণ নরম রাখিয়া পরীক্ষা করা উচিত। এই অবস্থায় বাম পাঁজরের নীচে হাত রাখিয়া রোগীকে
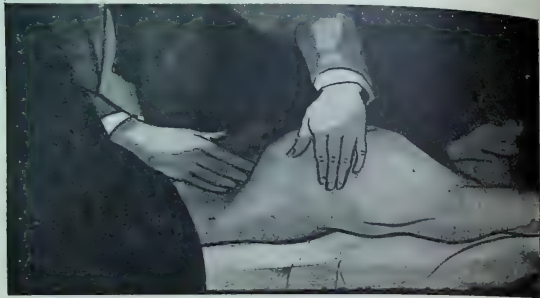
প্লীহা-বৃদ্ধি পরীক্ষা করার প্রণালী। রোগীর বাম পাঁজরের নীচে এইরূপে হাত রাখিয়া তাহাকে সজোরে নিঃশ্বাস লইতে বলিতে হয়, এবং প্লীহার বৃদ্ধি থাকিলে উহা তৎক্ষণাৎ হাতে আসিয়া ঠেকে। বলা বাহুল্য, অল্প প্লীহা-বৃদ্ধি থাকিলেই তাহা এইরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক; যাহাদের প্লীহা অত্যন্ত বৃহৎ, তাহাদের জন্য এরূপ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাদের পেটের উপর হাত দিলেই উহা বুঝিতে পারা যায়।

লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস লইতে বলিলে প্লীহার নিম্নপ্রান্তটুকু তৎসঙ্গে উঠানামা করিতেছে ইহা বেশ অনুভব করা যায়। প্লীহার অল্পবৃদ্ধিও ইহাতে বুঝা যায়। কিন্তু বেশী বড় হইলে তাহা পেটের সমস্ত স্থান অধিকার করে, তখন উহা প্লীহা অথবা পেটের পেশী শক্ত হইয়া আছে ইহা বুঝিতে অনেক সময় ধাঁধা লাগে।

প্লীহা সম্বন্ধে কয়েকটি সাবধানতার আবশ্যক। জ্বরের সঙ্গে প্লীহা না থাকিলে তাহা ম্যালেরিয়া নয়, এরূপ নিশ্চিত ধার্য্য করা উচিত নয়। সকলের ম্যালেরিয়াতে, বিশেষতঃ ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে, প্লীহা না দেখা দিতে পারে, অথবা বিলম্বে প্রকাশ পাইতে পারে। ম্যালেরিয়া মারাত্মক হইলে প্লীহা বাড়িতে সুযোগ পায় না। এরূপ অবস্থায় প্লীহার উপর একান্ত নির্ভর করিতে গেলে ভুল হইবে।

দশ পনেরো দিন জ্বরের ভোগ হইয়া যাওয়ার পর অনেক রোগেই প্লীহা একটু বাড়ে। বিশেষতঃ **টাইফয়েডে, কোলাইজ্বরে, বীজাণু আক্রমণ মাত্রেই,** এবং **যক্ষ্মা রোগে** প্লীহা বাড়ে। সুতরাং অনেক দিন জ্বরের পর অল্প একটু প্লীহা দেখিয়া ম্যালেরিয়া মনে করিলে ভুল হইতেও পারে। ম্যালেরিয়া হইলে এতদিনের জ্বরে প্লীহা কতটা বাড়িত, তাহাই এ স্থলে মনে করিয়া দেখা উচিত।

কালাজ্বরেও প্লীহা ম্যালেরিয়ার মত বাড়িতে থাকে, সুতরাং প্রথম অবস্থায় প্লীহা দেখিয়া এই তুই রোগের পার্থক্য বোঝা কঠিন। কুইনিনের ফলাফল দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়, তখন এ ছাড়া অন্য উপায় নাই। তবে পুরাতন ম্যালেরিয়ার ও পুরাতন কালাজ্বরের প্লীহাতে কিছু তফাৎ আছে; ম্যালেরিয়ার প্লীহা যত কঠিন ও যত বৃহৎ হয়, কালাজ্বরে ততটা হয় না। কালাজ্বরের প্লীহা প্রায় নরম থাকে এবং বড় হইলেও একেবারে পেটজোড়া হয় না।

ম্যালেরিয়ার দেশে অনেকের প্লীহা নিত্যই বড় হইয়া থাকিতে দেখা যায়, অথচ তাহাদের জ্বর নাই। এইরূপ বারোমেসে প্লীহা লইয়া উহারা যদি অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হয়,—তখন চিকিৎসক অনেক সময় ভুল করিয়া রোগটি ম্যালেরিয়া বলিয়া মনে করিতে পারেন। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেই তখন জানা যাইবে যে উক্ত প্লীহাটি অনেক কালের; এরূপ লোকের নূতন ম্যালেরিয়া হইলেও তাহা চিনিতে গণ্ডগোল হয়।

(৬) **লিভার বৃদ্ধি**—ম্যালেরিয়ার প্রথম অবস্থায় পিত্তবিকৃতির নানা লক্ষণ দেখা গেলেও তখন লিভার বাড়ে না; কিছুদিন পরে লিভারের বৃদ্ধি হয়। শিশুদের কিন্তু জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে লিভার শীঘ্র বড় হইয়া ওঠে, এবং এমনও হইতে দেখা যায় যে প্লীহা তেমন বাড়ে নাই কিন্তু লিভারটি বেশ বাড়িয়াছে। ম্যালেরিয়াতে অনেক সময় লিভারে রক্ত জমিয়া (congestion) রীতিমত ব্যথা হইতেও দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় লিভার-অ্যাবসেস্ বলিয়া ভুল হওয়াও বিচিত্র নয়।

(৭) **পেটের দোষ**—অনেকের ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটের দোষ হইতে দেখা যায়,—কাহারো কাহারো পুরাপুরি আমাশা এবং উদরাময়ও হইয়া থাকে। এরূপ প্রায় ম্যালিগ্ন্যাণ্ট্ ম্যালেরিয়াতেই দেখা যায়।

ম্যালেরিয়ার অতিসারের বিশেষত্ব এই যে মলে পিত্তের ভাগ খুব বেশী থাকে।

(৮) **কামলা**—ম্যালেরিয়াতে পিত্তদোষ হেতু রোগীর চোখে অল্প বিস্তর হরিদ্রাভা (jaundice) প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। দুই একদিনের জ্বরেই কামলা দেখা দিলে ম্যালেরিয়া সন্দেহ করা উচিত; বিশেষতঃ যদি ঘোর হরিদ্রাভা দেখা যায় তবে ম্যালিগন্যান্ট্ ম্যালেরিয়া সন্দেহ করা উচিত।

(৯) **রক্তহীনতা**—ম্যালেরিয়াতে অতি দ্রুত রক্তহানি হইতে থাকে এবং রোগী শীঘ্রই পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়ে। অন্য কোনো রোগে এত শীঘ্র রক্তহীনতা দেখা যায় না। প্রতিবার জ্বর আসার সঙ্গে সঙ্গে যদি ১০০ কোটি রক্তকণিকা বিনষ্ট হয় তবে এরূপ শীঘ্র রক্তহানি হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। ম্যালিগ্ন্যান্ট্ ম্যালেরিয়াতে ইহা আরো বেশী হয়,—কারণ উহাতে অনেক রক্ত ক্ষয় (haemolysis) হইতে থাকে। এ-ছাড়া রক্ততারল্য হইয়া ম্যালেরিয়াতে নাক দিয়া, দাঁত দিয়া, অর্শ দিয়া রক্তপাত হইতে এবং অত্যধিক ঋতুস্রাব হইতে প্রায়ই দেখা যায়।

(১০) **হরিদ্রা বর্ণের প্রস্রাব**—জ্বরের সময় প্রস্রাবের মাত্রাও কমিয়া যায় এবং তাহার বর্ণ গাঢ় হরিদ্রা মিশ্রিত রক্তাভা ধারণ করে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ম্যালেরিয়ার প্রস্রাব মাত্রেই প্রায় ইউরোবিলিন (urobilin) পাওয়া যায়। কাহারো কাহারো মূত্রকৃচ্ছতাও দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে প্রস্রাবের মধ্যে অ্যাল্বুমেন্ ও কাষ্ট্ (albumen and casts) থাকিতেও দেখা যায়।

(১১) **সর্দ্দি কাসি**—ইহাও ম্যালেরিয়ার এক অন্যতম লক্ষণ এবং অনেক সময় ম্যালেরিয়াতে ব্রঙ্কাইটিস্, এমন কি ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। তখন মনে হয় রোগটি বুঝি মূলতঃ ফুস্ফুসেরই দোষ, কিন্তু প্লীহা ও জ্বরের লক্ষণ দেখিয়া ম্যালেরিয়া সন্দেহ করিয়া কুইনিন দিবা মাত্র শ্লেষ্মাঘটিত সমস্ত দোষ অদৃশ্য হইয়া যায়। সাধারণ ম্যালেরিয়াতেও অনেক সময় বুকে একটু ব্রঙ্কাইটিস্ ও পেটে প্লীহা একত্রে থাকিতে দেখা যায়। তখন কিসের চিকিৎসা আগে করা হইবে ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ব্রঙ্কাইটিস্ ও ম্যালেরিয়া দুইটি স্বতন্ত্র রোগও একত্রে থাকিতে পারে,—কিংবা

ম্যালেরিয়াই উক্ত ব্রঙ্কাইটিসের মূল কারণ এমনও হইতে পারে। এরূপ স্থলে দুই চিকিৎসাই এক সঙ্গে করা উচিত। ম্যালেরিয়ার ঋতুতে অনেক সময় জলে ভিজিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইয়া যে জ্বর দেখা দেয় তাহাও ম্যালেরিয়া। শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকিলে ঠাণ্ডা লাগার সুযোগ পাইয়া প্রথমে সর্দ্দি লইয়াই জ্বর দেখা দেয়, সুতরাং জ্বরের সহিত সর্দ্দি বা গায়ে ব্যথা দেখিয়াই ভুলিয়া যাওয়া ঠিক নয়।

তিনরূপ ম্যালেরিয়ার তিনরূপ লক্ষণ

ম্যালেরিয়া যখন তিনটি বিভিন্ন জাতীয়, তখন লক্ষণের মধ্যেও পরস্পরের কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু এই সকল পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম, এবং ম্যালেরিয়া রোগটিও অনেক সময় মিশ্রিত হইয়া থাকে; অপিচ সকল ম্যালেরিয়ার প্রায় একই চিকিৎসা বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে কেহ মনোযোগ দেন না। বিশেষতঃ রক্ত পরীক্ষা করিলেই যখন জানা যায় উহা কোন জাতীয় ম্যালেরিয়া, তখন লক্ষণ হইতে পার্থক্য অনুমান করার তেমন প্রয়োজন এখন আর নাই। তবে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে, এবং প্রথমে রোগ দেখিয়া উহা ধারণা করিতে অভ্যাস করিয়া পরে রক্ত পরীক্ষার সহিত মিলাইয়া দেখিতে থাকিলে ক্রমে সে ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। জীবাণুর বর্ণনাকালে আমরা উহাদের যে সকল পার্থক্যের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, রোগ বিচারকালে সে গুলিও মনে রাখা আবশ্যক।

কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া—প্রথমতঃ কোয়ার্টান ম্যালেরিয়াকে এই বিচার হইতে সহজে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কারণ প্রথম কয়েকদিন অনিয়মিত জ্বর হওয়ার পরই ইহা দুইদিন অন্তর নিয়মিত ভাবে আসিতে থাকে, সুতরাং জ্বর দেখিলেই এ রোগ চেনা যায়। ইহার কোনো ঋতুভেদও নাই, এবং সংখ্যায় ইহা অনেক কম। জ্বরের মেয়াদও কম, অল্প সময়ের জন্য জ্বর হইয়াই ছাড়িয়া যায়, সুতরাং দুইদিন অন্তর ক্ষণস্থায়ী জ্বরে মানুষ অপটু হইয়া পড়ে না, রীতিমত কাজকর্ম্মও করে, রোগেও ভোগে। রীতিমত চিকিৎসা না হইলে দুইবৎসর পর্য্যন্তও ইহা নিয়মিত ভাবে চলিতে থাকে। রক্তের মধ্যে ইহার জীবাণু খুব কম সংখ্যাতেই থাকে, সুতরাং

অনেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। রক্তে না পাওয়া গেলেও জরের গতিক দেখিয়া ইহা বেশ চেনা যায়। এই ম্যালেরিয়া কখনও প্রাণঘাতী হইতে শুনা যায় নাই।

বিনাইন ও ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার পার্থক্য—বিনাইন অর্থে সরল, ম্যালিগ্ন্যাণ্ট্ অর্থে ক্রূর। পরস্পরের চরিত্র অনুসারেই এইরূপ নামকরণ। বিনাইন টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া তত বিষাক্ত নয়, কিন্তু ইহার বাহ্যাড়ম্বর যথেষ্ট; আর ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া বেশী বিষাক্ত, কিন্তু উহার বাহ্যাড়ম্বর কম,—এমন কি যতই অধিক বিষাক্ত হয় ততই উহার জরের আড়ম্বর কম দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদের বিষম জরের বর্ণনায় 'বহির্ব্বেগ' ও 'অন্তর্ব্বেগ' বলিয়া দুইরূপ লক্ষণের উল্লেখ আছে; কথা দুইটি বেশ অর্থপূর্ণ। আমরা এখানে ঐ দুটি কথা প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারি, বিনাইন টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া বহির্ব্বেগযুক্ত, এবং ম্যালিগ্ন্যাণ্ট্ ম্যালেরিয়া অন্তর্ব্বেগযুক্ত।

বিনাইন টার্শিয়ান ম্যালেরিয়াতে—প্রচুর কম্পের সহিত জর আসে, এবং জরের প্রকোপও যথেষ্ট। ১০৫ ডিগ্রী জর ইহাতে নিত্যই হয়, কিন্তু এত জরেও রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে না। বরং জরের সময় রোগী যন্ত্রনাসূচক চীৎকার করিতে থাকে, অতিশয় বকিতে থাকে, প্রবল ভাবে অস্থিরতা প্রকাশ করিতে থাকে, ঘন ঘন বমি করিতে থাকে, এবং এমন লক্ষণ দেখায় যেন রোগ বড়ই ভীষণ। কিন্তু এরূপ বাহ্য লক্ষণ-প্রাবল্য দেখা গেলেও রোগীর জ্ঞান সম্পূর্ণ থাকে, নাড়ী দ্রুত হইলেও বেশ সবল থাকে, জিহ্বা খুব অপরিষ্কার হয় না, এবং চেহারায় বা ভাবে-ভঙ্গীতে জীবনের কোনো আশঙ্কা আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহার যত কিছু উদ্বেগ সমস্তই বাহিরে, ভিতরের বিকৃতি সে তুলনায় কম। এক কথায় বলা যায় ইহাতে বহির্ব্বেগ ও বহির্দ্দাহ যথেষ্ট থাকে। জরের বিরামের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রনারও বিরাম হইয়া যায়, সুতরাং সবিরাম নামটি এখানে সার্থক।

ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে—অন্তর্ব্বেগই প্রবল; উহা প্রায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, বাহিরে তাহার উপযুক্ত প্রকাশ শীঘ্র দেখা যায় না। পূর্ব্বকালে ইহাকেই বোধ হয় স্বল্প-বিরাম জর বলা হইত। উত্তাপের বিরাম হইলেও ইহার অন্তর্বিকার ঘোচে না। জর শীত করিয়া আসিলেও তাহা কম্প নয়,

জরের বেগও প্রায় কম। খুব বেশী জর এ ম্যালেরিয়াতে কচিৎ দেখা যায়। রোগী চীৎকার করে না বা সকলকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে না, কিন্তু অকস্মাৎ কেমন অস্থির হইয়া ওঠে অথবা নিঝুম হইয়া পড়ে। অল্প জরেই রোগী যেন শীঘ্র নিস্তেজ ও বিবর্ণ হইয়া যায়। এদিকে জর কম থাকিলেও নাড়ীর বেগ খুব দ্রুত, এত অল্প জরে উহা কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় মুখে উদ্বিগ্ন ভাব, ভিতরে যথেষ্ট গ্লানি, নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষীণ, জিহ্বা অত্যন্ত ময়লা, প্রস্রাব অত্যন্ত ঘোরবর্ণ। বিনাইন টার্শিয়ান জরে যেমন ঘাম দিয়া জর ছাড়ার সঙ্গে শরীরের গ্লানি দূর হইয়া যায়, ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে তেমন আরামদায়ক ঘামও হয় না—এবং জর ছাড়িয়া গেলেও অস্থিরতা প্রভৃতি দূর হয় না। জর নাই অথচ রোগ পূর্ণমাত্রায় আছে তাহার চিহ্নস্বরূপ নানারূপ লক্ষণ ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতেই দেখা যায়, বিনাইন টার্শিয়ানে তাহা হয় না।

বিনাইন টার্শিয়ান ম্যালেরিয়ার—জরের আচরণ অনেকটা একই প্রকার। অনেক সময় উহা পালাজর (টার্শিয়ান) নয় বটে কিন্তু তবু ইহার প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট ও সরল। অবিরাম রূপে কিছুদিন থাকিলেও ইহা যে ম্যালেরিয়া তাহা চিনিতে অধিক বিলম্ব হয় না। জর ছাড়া অন্য কোনো মূর্ত্তিতে ইহা ছদ্মভাবে আত্মপ্রকাশ করে না। চিকিৎসা না হইলে এইরূপে কতকদিন ভোগ হইয়া (একমাস দেড়মাসও হইতে পারে) জরটি ক্রমশঃ কমিতে কমিতে আপনিই ছাড়িয়া যায়। ইহার পর রোগী প্রায় দশ দিন হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত বেশ ভাল থাকে, তৎপরে হয়তো আবার জর হয়। এখনও চিকিৎসা না হইলে কয়েক দিন ভুগিয়া আবার তাহা ছাড়িয়া যায়। অতঃপর উহা প্রতিমাসে প্রায় একবার দুইবার করিয়া আসা যাওয়া করিতে থাকে এবং রোগটি পুরাতনে দাঁড়াইয়া যায়। এইরূপে দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ চলিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসা না করিলেও এই ম্যালেরিয়াতে প্রায় কেহ মরে না। তবে শরীর ক্রমশঃ রক্তশূন্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং এ অবস্থায় অন্য রোগ আসিয়া সহজে আক্রমণ করিতে পারে। আবার চিকিৎসা করিলেও

ইহা অনেক সময় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না। এই ম্যালেরিয়া তেমন বিষাক্ত নয় বটে কিন্তু চিকিৎসায় ইহা সহজবাধ্য নয়। রীতিমত চিকিৎসা সত্ত্বেও পুনর্ব্বার জ্বর হইতে প্রায়ই দেখা যায়, তবে চিকিৎসা করিতে থাকিলে শরীর তেমন নিস্তেজ বা রক্তশূন্য হয় না, প্লীহাও অধিক বাড়িতে পারে না, এবং বিনা চিকিৎসায় যেমন অন্য রোগ আসিয়া সহজে ধরিতে পারে, উহাতে তাহা পারে না।

ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার—জ্বরের আচরণ ভিন্ন প্রকার। ইহার সম্বন্ধে কোনো কথাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। ইহাতে জ্বর প্রত্যহ ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসিতে পারে, কিন্তু ছাড়িলেও জ্বরের ভোগ অনেকক্ষণ, বিরাম-কাল অল্প; কিংবা না ছাড়িয়া টাইফয়েডের মত প্রত্যহ ধাপে ধাপে বাড়িয়াও চলিতে পারে। হয়তো অল্প জ্বর হইতে হইতে একদিন অকস্মাৎ প্রবলজ্বর হইয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া যাইতে পারে। অথবা প্রথমে একটু জ্বর হইয়া তাহার পর আর জ্বরই হয় না, এদিকে অন্যান্য মারাত্মক লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কেবল জ্বরের প্রকৃতি দেখিয়া ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া চেনা কঠিন। কম্প বা ঘাম ইহাতে কমই হয়, এবং প্লীহাও কিছু বিলম্বে বাড়ে। এমনও হইতে পারে যে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত কম্প বা ঘাম একবারও হইল না, প্লীহাও একটু বাড়িল না। প্রথম দুই এক দিনের মধ্যে রক্তপরীক্ষার দ্বারাও ইহার জীবাণুগুলির সাক্ষাৎ না মিলিতে পারে, সুতরাং একবার মাত্র পরীক্ষায় জীবাণু না পাওয়া গেলেও নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। অল্প জ্বর হইলেও তাহার সহিত যথেষ্ট গ্লানি, বমি, ও চোখে কমলার (jaundice) চিহ্ন দেখিলেই এই ম্যালেরিয়া সন্দেহ করিয়া সাবধান হইতে হয়।

ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া ক্রূর বটে, কিন্তু বিনাইনের মত দীর্ঘভোগী নয়। চিকিৎসা না করিলে যেগুলি মারাত্মক না হয় সেগুলিতে প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে জ্বর ছাড়িয়া যায়। আটদশদিন সুস্থ থাকার পর আবার যদি জ্বর হয়, তাহারও ভোগ প্রায় এক সপ্তাহ। এইরূপে আট দশ দিন অন্তর ৪।৫ দফায় জ্বর আসিয়া ক্রমে আপনিই তাহা কমিয়া যায়। চিকিৎসা না করিলে ইহা বেশী দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় না বটে, কিন্তু অকস্মাৎ ইহা

মারাত্মক হইবার খুবই সম্ভাবনা। তবে প্রথম আক্রমণেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক, ক্রমে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই উহার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সময়মত চিকিৎসার দ্বারা ইহা আরোগ্য করা সহজ সাধ্য; অধিকাংশই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়, রিল্যাপ্সের সংখ্যা কম।

ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার সাধারণ পরিচয় এইরূপ, কিন্তু ইহার অন্যরূপ পরিচয়ও আছে। ইহা মধ্যে মধ্যে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে ও এমন বিচিত্র উপসর্গ লইয়া উপস্থিত হয় যে তাহা ম্যালেরিয়া বলিয়া চেনাই দুষ্কর। তখন এই বিচিত্রতা দেখিয়াই তাহাকে ম্যালেরিয়া অনুমান করা যায়, এবং এই সকল বিচিত্রতা অনুসারে তাহার নামকরণ হইয়া থাকে। এইরূপ ছদ্মবেশ বিনাইনে হয় না, কেবল ম্যালিগ্‌ন্যান্টেই সম্ভব।

ছদ্মবেশী ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া চেনা সকলের চেয়ে সহজ, অথচ ইহাতেই সময় সময় অত্যন্ত ভুল হয়। তাহার কারণ ইহা কখনো দেখা দেয় স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে, কখনো দেখা দেয় ছদ্মমূর্ত্তিতে। অভিজ্ঞতা থাকিলেও ইহার সবগুলিকে চেনা নিতান্তই কঠিন। হয় যেটি ম্যালেরিয়া নয় তাহাকে ম্যালেরিয়া মনে করিয়া ঠকিয়া যাই, নতুবা যেটি ম্যালেরিয়া তাহাকে কিছুতেই ম্যালেরিয়া বলিয়া মনে হয় না, চিকিৎসায় বিলম্ব করিয়া ফেলি। এই রকম ভুল কত হয় তাহা দেখিবার জন্য কর্ণেল প্রক্টর (Proctor) একবার ৪২৬টি ম্যালেরিয়া রোগীর এক তালিকা প্রস্তুত করেন। প্রথমে এইগুলি কি রোগ বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে ইহার মধ্যে ৩৬২ রোগীকে ম্যালেরিয়া বলিয়াই অনুমান করা হইয়াছিল এবং রক্ত পরীক্ষার দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হয়, আর বাকী ৬৪টি সম্পূর্ণ অন্যরোগ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল, পরে রক্তপরীক্ষার দ্বারা ভুল সংশোধন করা হয়। সুতরাং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছেও শতকরা ১৫টি এমন ভুল হইয়া থাকে। রোগের ছদ্মবেশের জন্যই এই সকল ভুল হয়।

আমরা যে কয়টি ছদ্মবেশের কথা জানি তাহা বিবৃত করিলাম,

কিন্তু এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়, ম্যালেরিয়া আরো অনেক অসম্ভব রূপ ধারণ করিতে পারে।

(১) **প্রবল জ্বর** (Hyperpyrexia)—ইহাতে পূর্ব্বে অল্প জ্বর হইতে হইতে, অথবা হঠাৎ একেবারেই ১০৭।১০৮ ডিগ্রী জ্বর হইয়া রোগী বেহুঁস হইয়া পড়ে। গুমোট গরমের সময় এই জ্বর দেখিয়া উহা তাত লাগার জ্বর (heat stroke) বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এইরূপ রোগীকে বাঁচানো কঠিন, জ্বর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ নাড়ীও ছাড়িয়া যাইতে পারে।

(২) **সেরিব্র্যাল ম্যালেরিয়া** (Cerebral malaria)—দুই তিন দিন যাবৎ অল্প অল্প জ্বর হইতেছে, তখনো ম্যালেরিয়া বলিয়া সন্দেহ হয় নাই বা উহার চিকিৎসাও করা হয় নাই, এমন সময়েই হঠাৎ এই অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। কাহারো কাহারো প্রথমে সামান্য লক্ষণ সকল দেখা যায়,—নিদ্রালু ও আচ্ছন্ন ভাব আসে, বাক্যে জড়তা আসে, কথায়-বার্ত্তায় অসংবদ্ধতা ও ঈষৎ প্রলাপ লক্ষিত হয়, কিন্তু এগুলিকে প্রায় তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় না। ক্রমে ভুল বকা সুরু হয়, কিংবা রোগী একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ে, গায়ের তাপে চামড়া শুষ্ক ও স্বেদবিহীন হইয়া থাকে, নাড়ী দ্রুত হয়, মধ্যে মধ্যে এক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিতে থাকে, কিংবা থাকিয়া থাকিয়া কয়েকবার দ্রুত নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে (stertorous breathing)। রোগীকে ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না, বা চোখ মেলিয়া চায় না। কখনো কখনো মৃগীর মত উহার দাঁতি লাগিয়া যায়, কখনো বা ধনুষ্টঙ্কারের মত হাত পা খিঁচুনি ও আক্ষেপ হইতে থাকে। সেইজন্য অনেক সময় ইহাকে মেনিঞ্জাইটিস, অথবা পক্ষাঘাত, বা সন্ন্যাস রোগ (apoplexy) ইত্যাদি বলিয়া ভ্রম হয়। প্রথম লক্ষণ দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসা করিলে ইহা অনেক সময় আরোগ্য হইয়া যায়। কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ প্রকাশ হওয়ার পর যতই চিকিৎসা করা হউক বা ইন্‌জেকশন দেওয়া হউক—তখন উহাকে রক্ষা করা অসম্ভব। এই অবস্থায়,—কয়েকটি কুইনিন ইন্‌জেকশন দেওয়া হইল তবুও রোগী বাঁচিল না, অতএব ইহা ম্যালেরিয়া নয়,—এ কথা যেন

কেহ না ভাবেন। রক্ত পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইত ম্যালেরিয়ায় তাহা পরিপূর্ণ। এরূপ অবস্থায় পৌছিলে চিকিৎসা একেবারে নিষ্ফল।

(৩) **টাইফয়েডের মত ম্যালেরিয়া** (Typhoid-like malaria) —আগে ইহাকে বলা হইত 'টাইফো-ম্যালেরিয়া', সে কথা এখন উঠিয়া গিয়াছে। ইহাকে আসল ম্যালেরিয়াই বলিতে হইবে, কারণ লক্ষণ যেমনই হউক, রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বর্ত্তমান। ইহাতে জ্বর ছাড়ে না, দিনে দিনে বাড়িতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভুলবকা দেখা দেয়। তবে ইহাতে প্রথম হইতেই রোগী যেমন বেহুঁস হইয়া থাকে, টাইফয়েডে প্রথম অবস্থায় তাহা হয় না। এ স্থলে রক্তপরীক্ষা না করিয়া টাইফয়েডের মত চিকিৎসা করিতে থাকিলেই সর্ব্বনাশ, রোগ চিনিতে বিলম্ব হইলে রোগী মারা যাওয়ারও সম্ভাবনা। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, টাইফয়েড ও ম্যালেরিয়া একত্রে থাকাও মোটেই অসম্ভব নয়, বিশেষতঃ আমাদের দেশে। এ অবস্থায় জ্বরের তেজ খুব প্রবল হয়, কুইনিন দিলে তাহা কতকটা কমে। এরূপ বুঝিলে দুই চিকিৎসাই এক সঙ্গে করা উচিত।

(৪) **অ্যাল্‌জিড্‌ ম্যালেরিয়া** (Algid malaria)—ইহাকে **পার্নিশাস্‌** (pernicious) ম্যালেরিয়াও বলা হয়। ইহাতে রোগীর জ্ঞান হারায় না বা মস্তিষ্ক বিকার হয় না বটে, কিন্তু এমন কতকগুলি মারাত্মক লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় যাহার কলেরার মত আশু প্রতিকার আবশ্যক, নতুবা প্রাণনাশের সম্ভাবনা। এই সকল লক্ষণ অধিকাংশই উদর সম্পর্কিত। ইহারও কয়েকপ্রকার রূপান্তর আছে, পৃথক ভাবে সেগুলি বলা যাইতে পারে। কিন্তু সকল রূপেই রোগী যেন মৃত্যুমুখে গিয়া উপস্থিত হয়,—সমস্ত শরীর হিম হইয়া যায়, নাড়ী একেবারে দমিয়া যায়—অথচ দ্রুত বেগে চলিতে থাকে, গায়ে মোটে উত্তাপ পাওয়া যায় না (মুখের ভিতর টেম্পারেচার লইলে জ্বর পাওয়া যাইতে পারে),—অর্থাৎ কলেরায় যেরূপ অবস্থা হয়, অনেকটা সেইরূপ। ইহার বিভিন্ন রূপগুলি এই :—

(ক) কলেরার মত—ইহাতে হঠাৎ ঘন ঘন তরল দাস্ত হইতে থাকে,—তবে উহা একেবারে বর্ণবিহীন নয়, পিত্তের কিছু রং প্রায়ই থাকে। ইহার সঙ্গে বমিও থাকে, মূত্ররোধ হয়, হাতে পায়ে খিল্‌ ধরিতে থাকে,

হাতের ও পায়ের চামড়া চুপ্‌ষিয়া যায়, স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয়,—সমস্তই অবিকল কলেরার অনুরূপ। কেবল দুইটি বিষয়ে তফাৎ দেখা—জর কিছু থাকে, এবং মলে কিছু রং থাকে। রক্ত পরীক্ষা ব্যতীত ইহা চেনা কঠিন। ইহাতে কলেরার মতই সেলাইন ইনজেকশন দেওয়া প্রয়োজন,—এবং সেলাইনের সহিত কুইনিন মিশাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

(খ) আমাশার মত—ইহাতে জরের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আমাশার লক্ষণ,—মলে প্রচুর আম ও রক্ত,—সঙ্গে সঙ্গে রক্তবমন হইতেও দেখা যায়। পিত্ত বমি ও অন্যান্য আক্ষেপের লক্ষণও এই সঙ্গে থাকে।

(গ) পাকস্থলী প্রদাহের মত—পেটে অসহ্য শূল বেদনা, ঘন ঘন বমি, তাহাতে রক্তের ছিট্‌ও থাকে, পেটে হাত দিলে অত্যন্ত ব্যথা,—হঠাৎ দেখিলে মনে হয় কোনো বিষাক্ত খাদ্যদ্রব্য খাইয়া (food poisoning) হয়তো এইরূপ হইয়াছে। আরো একরূপ ম্যালেরিয়া দেখা যায় যাহাতে ক্রমাগত পিত্তবমন হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ হলুদবর্ণ হইয়া যায়, প্রস্রাবও হলুদ বর্ণের হইতে থাকে। ইহাকে বীলিয়াস্ (bilious) ম্যালেরিয়াও বলা যায়। ইহা ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের খুব কাছাকাছি অবস্থা।

(ঘ) রক্তপাতী (Haemorrhagic)—ইহাতে কেবল রক্ত-দাস্ত, রক্তবমন প্রভৃতি হইতে থাকে এবং শরীরের যে কোনো স্থান হইতে রক্তপাত হইতে পারে। ইহাতে একপ্রকার আকস্মিক রক্তহীনতাও (acute haemolytic anaemia) হইতে দেখা যায়।

(ঙ) হার্টফেলের মত (syncopal form)—ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জর ছাড়িবার সময় কখনো কখনো এইরূপ অবস্থা হয়। জর ছাড়িয়া ঘাম হইতে হইতে শরীর একেবারে হিম ও অবসন্ন, নাড়ী একেবারে ক্ষীণ, এবং হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়। এই সময় রোগী উঠিয়া বসিতে প্রয়াস করিলে বা কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিলে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী সকল একেবারে নিস্তেজ হইয়া যাওয়াতে (degeneration of myocardium) এইরূপ অবস্থা ঘটে। এইরূপ অবস্থা দেখিলে তখনকার মত কুইনিন বন্ধ রাখিয়া অ্যাড্রেন্যালিন, ব্রাণ্ডি, ষ্ট্রিক্‌নিন্ প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ দিতে হয়।

(৫) **উন্মাদ অবস্থা** (Confusional insanity and dementia)—ম্যালেরিয়া হইতে উন্মাদের লক্ষণ কখনো কখনো দেখা যায়। উহাতে রোগী হঠাৎ অত্যন্ত অস্থির হইয়া ফিরিতে থাকে,—না বাঁধিলে কিছুতে ধরিয়া রাখা যায় না, অনবরত বেফাঁস কথা বকিতে থাকে, নিদ্রা একেবারেই হয় না,—দেখিলে মনে হয় পূর্ণ উন্মাদ রোগ। কিন্তু ঐ সঙ্গে অল্প অল্প জর হইতে থাকে এবং রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়। কুইনিন দিলেই ঐ সমস্ত লক্ষণ দূর হইয়া যায়।

(৬) **আরো কয়েক প্রকার অস্বাভাবিক প্রকৃতির** ছদ্মবেশী ম্যালেরিয়া আছে। **ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসের** কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। **হাঁপানির** লক্ষণও ম্যালেরিয়াতে যথেষ্ট দেখা যায়, কুইনিন দিলেই তাহা আরোগ্য হয়। এ ছাড়া **প্রস্রাবের দোষ** (nephritis), **পক্ষাঘাত** (hemiplegia), **হৃৎপিণ্ডের পীড়া** (angina pectoris), **আমবাত** (urticarea) প্রভৃতি রোগও ম্যালেরিয়ার বিষ হইতে উৎপন্ন হয়,—এবং যত রকমের লক্ষণই তাহাতে হউক, কুইনিনাদিই উহার একমাত্র ঔষধ।

কয়েকটি অস্বাভাবিক প্রকৃতির ছদ্মবেশী ম্যালেরিয়ার উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতে পারে :—

১। একটি যুবক পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ সর্দ্দিজরে আক্রান্ত হয়। কয়েকদিন ভুগিবার পর জরের তেজ কমিয়া যায়, কিন্তু নানারূপ চিকিৎসা সত্ত্বেও কিছুতে তাহার বুকের সর্দ্দি নির্দ্দোষ হইয়া সারে না এবং প্রত্যহই অল্প জর হইতে থাকে। প্রায় মাসাবধি চিকিৎসার পর স্থানীয় চিকিৎসক সন্দেহ করেন যে সম্ভবতঃ উহা যক্ষ্মায় পরিণত হইবে, এবং উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়াও তাহার সর্দ্দি নিবারণের জন্য ভ্যাক্সিনাদি প্রয়োগ করা হয়, ক্যালসিয়ম ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়, কিন্তু কিছুতেই জরটুকু এবং সর্দ্দিটুকু যায় না। গয়ার পরীক্ষা এবং এক্স্‌রে পরীক্ষাতেও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তথাপি যক্ষ্মা সন্দেহেই তাহার চিকিৎসা চলিতেছিল,—ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন তাহার জরের মাত্রা কিছু অধিক হয় এবং উহার সহিত কিছু শীতের লক্ষণও থাকে। তখন চিকিৎসক তাহাকে একটি কুইনিন-গ্লুকোনেট ইন্‌জেকশন প্রয়োগ

করেন। কিছু উপকার দেখাতে ঐ ইন্‌জেকশন উপর্যুপরি আরো তিনটি প্রয়োগ করা হয়। তদবধি রোগীর জর ও সর্দ্দি একেবারে দূর হইয়া যায় এবং অল্পদিনেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠে।

২। একটি মেয়ে কলেজে পড়িত। প্রত্যহ বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া জলযোগের পরই তাহার গায়ে আমবাত বাহির হইত এবং অনবরত চুলকাইতে থাকিত। ইহাতে সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইত না। কিন্তু প্রাতঃকালে উঠিয়াই সে সুস্থ হইয়া যাইত। ইহার জন্য বহু চিকিৎসক প্রায় ছয় মাস যাবৎ তাহার চিকিৎসা করিয়াছেন কিন্তু কেহই উহার উপশম করিতে পারেন নাই। কেহ বলিতেন উহা লিভারের দোষে হয়, কেহ বলিতেন ক্যাল্‌সিয়মের অভাবে হয়। অতঃপর জনৈক চিকিৎসক বলেন যে আমবাত উঠিবার সময় উহার টেম্পারেচার কত হয় তাহা লক্ষ্য করা হউক। ইহাতে দেখা যায় উহা কোনো দিন বা ৯৯ ডিগ্রী, কোনো দিন বা তাহারও কিছু বেশী হয়। তখন তাহাকে কুইনিন খাইতে দেওয়া হয়। উহাতে প্রথম দিনেই ফল দেখা যায় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার সমস্ত লক্ষণ দূর হইয়া যায়। পরে সন্ধান লইয়া জানা গিয়াছে যে দুই বৎসর পূর্ব্বে সে ম্যালেরিয়ার দেশে বাস করিত।

৩। এক ব্যক্তিকে উন্মাদ অবস্থায় হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সাধারণ হাঁসপাতালে উন্মাদের চিকিৎসা হইবে না বলিয়া তাহাকে রাঁচি পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথামত রক্তাদির পরীক্ষা করা হয়। ইহাতে তাহার রক্তে ম্যালিগ্‌ন্যান্ট্‌ ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়। কিন্তু জর তাহার মোটেই ছিল না এবং পূর্ব্বেও কখনো হয় নাই। যাহা হউক অতঃপর তাহাকে কুইনিন ইন্‌জেকশন দেওয়া হইতে থাকে এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই তাহার উন্মাদ অবস্থা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

আমরা মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিলাম, এরূপ অনেক উদাহরণ অনেকেই দিতে পারিবেন।

পুরাতন ম্যালেরিয়া

পুরাতন ম্যালেরিয়া দুই রকমের হয়। বিনা চিকিৎসায়, ভুল চিকিৎসায় বা অপরিমিত চিকিৎসায় তরুণ ম্যালেরিয়া যখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়,—সে একরূপ পুরাতন দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ম্যালেরিয়া। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এরূপ

অবস্থায় আসিয়া কতকগুলি ক্রমে আপনিই আরোগ্য হইয়া যায়, আর কতকগুলি তাহা না হইয়া পুরাতন দাঁড়াইয়া যায়। অন্যপক্ষে, উপযুক্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও যে সকল ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, কিছুকাল বাদে পুনর্ব্বার দেখা দেয়, পুনর্ব্বার চিকিৎসায় তাহা আপাতঃ আরোগ্য হয়, কিন্তু আবার দেখা দেয়,—অর্থাৎ চিকিৎসা সত্ত্বেও যাহা বারে বারে আসিতে থাকে,—সে আর একরূপ পুরাতন **পৌনঃপুনিক বা রিল্যাপ্‌সিং** ম্যালেরিয়া। এই দুই প্রকার পুরাতন ম্যালেরিয়াকে ভিন্ন ভিন্ন চক্ষে দেখা উচিত। একটি চিকিৎসার অভাবে পুরাতন হইয়াছে,—অপরটি চিকিৎসা সত্ত্বেও পুরাতন। দুইয়ের মধ্যে লক্ষণের পার্থক্যও অনেক আছে, চিকিৎসারও পার্থক্য হইবে। একটিতে তরুণ ম্যালেরিয়ার মত সম্পূর্ণ চিকিৎসার আবশ্যক, অন্যটিতে ঔষধ পরিবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে।

ক্রনিক বা মজ্জাগত ম্যালেরিয়া

জর যাহাদের অল্প হইতেছিল বলিয়া প্রথম হইতে গ্রাহ্য করা আবশ্যক বোধ হয় নাই,—কিংবা যাহারা কুইনিন কিছুতে খায় না, কুইনিনের ভয়ে অন্যান্যরূপ চিকিৎসা করাইতে থাকে,—অথবা অর্থাভাবে যাহারা প্রথম হইতে চিকিৎসা করায় না,—বা ডাক্তার যাহাদের অতি অল্প মাত্রায় কুইনিন দেন,—কিংবা ম্যালেরিয়া নয় মনে করিয়া মোটেই কুইনিন দেওয়া হয় না,—তাহাদেরই অনেকের ম্যালেরিয়া এইরূপ ক্রনিক হয়। এ অবস্থায় জর নিত্য হইতে থাকিলেও উহার বেগ প্রায়ই কম থাকে। এই জর মধ্যে মধ্যে হয়, ও মধ্যে মধ্যে বাদ যায়। অনেকের অল্প ঘুষ্‌ঘুষে জর প্রায় প্রত্যহই লাগিয়া থাকে, কিন্তু টেম্পারেচার লইয়া না দেখিলে তাহা টের পাওয়া যায় না। প্লীহাটি বিশাল, যকৃৎও যথেষ্ট বর্দ্ধিত, কাজেই উদর স্ফীত হইয়া থাকে। শরীর কৃশ রক্তশূন্য ও নিস্তেজ, হস্তপদাদি অবয়ব ক্ষীণ, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক বিবর্ণ পাণ্ডুর,—পুরাতন ম্যালেরিয়ার এ ছবি আমাদের অতি পরিচিত। ইহাকে বাস্তু-ম্যালেরিয়া বলা যায়, বৎসরাবধি ইহার ভোগ সমানে চলিতে পারে। বিনাইন ও ম্যালিগ্‌ন্যান্ট দুই প্রকার জীবাণু কর্ত্তৃকই ইহা হইতে পারে। অবশ্য ম্যালিগ্‌ন্যান্ট্‌ হইলেও এরূপ পুরাতন অবস্থায় তাহা আর মারাত্মক থাকে না।

এই অবস্থায় রক্ত পরীক্ষার দ্বারাও জীবাণু প্রায়ই পাওয়া যায় না, কারণ তখন ইহাদের সংখ্যা অনেক কম, এবং অধিকাংশই শরীরের গভীর স্থানে লুকাইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যহই জর হইতেছে, প্রকাণ্ড প্লীহা, অথচ রক্তে জীবাণু পাওয়া গেল না—দেখিয়া এইগুলিকেই আমরা অনেক সময় কালাজ্বর বলিয়া ধরিয়া লই এবং ইউরিয়া ষ্টিবামিন্ প্রভৃতি অ্যান্টিমনি ঘটিত ঔষধ অনর্থক ইন্‌জেকশন দিতে থাকি। এরূপ পুরাতন জরে সম্পূর্ণ রক্তপরীক্ষার দ্বারা রোগটি নিশ্চিত রূপে চিনিয়া না লইয়া এই সকল গুরুতর চিকিৎসায় হাত দেওয়া কিছুতে উচিত নয়। যে জর দুই তিন মাসের বা ততোধিক পুরাতন, তাহাতে কালাজ্বরের বিশেষ রক্তপরীক্ষায় (অ্যাল্‌ডিহাইড্ ও চোপ্‌রা টেষ্ট্) যদি কালাজ্বরের সুস্পষ্ট চিহ্ন না পাওয়া যায়, তবে নিশ্চয় উহা কালাজ্বর নয়। সুতরাং এই পরীক্ষা আগে করিয়া দেখা দরকার। তাহা যদি নিতান্ত অসম্ভব হয়,—তবে আগে ম্যালেরিয়া ধরিয়াই চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। সংশয়-স্থলে আগে ধরিতে হইবে ম্যালেরিয়া, তাহার পর কালাজ্বর। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ফল না হইলে তখন কালাজ্বরের কথা ভাবা উচিত। কালাজ্বরকে প্রথমে ম্যালেরিয়া বলিয়া ভুল করিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু ম্যালেরিয়াকে কালাজ্বর বলিয়া ভুল করা বিশেষ দোষের কথা। সুতরাং সন্দেহ স্থলে অন্ততঃ দশদিন ম্যালেরিয়ার মত উপযুক্তরূপ চিকিৎসা করার পর অন্য চিকিৎসায় হাত দিতে হয়। বলা বাহুল্য রক্তপরীক্ষা না করিয়া পুরাতন প্লীহাজরের চিকিৎসা করাই উচিত নয়। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর ছাড়াও আরো কয়েকটি রোগে বহুদিনের জন্য প্লীহাযুক্ত জর হইতে থাকে, সেগুলি মনে রাখা আবশ্যক, যথা :—

(১) এমিবাজনিত জ্বর (amaebiasis)
(২) যক্ষ্মা রোগ (Tuberculosis)
(৩) উপদংশ রোগ (Visceral Syphilis)
(৪) লিউকীমিয়া (Leukaemia)
(৫) রক্তশূণ্যতা (Anaemia)
(৬) কর্কট রোগ (Cancer)

রিল্যাপ্সিং বা পৌনঃপুনিক ম্যালেরিয়া

একবার মাত্র ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইলেও তাহা হইতে পুনঃপুনঃ জর হওয়া সম্ভব। সিগারো বলেন,—Malaria is really a relapsing disease,—

অর্থাৎ ইহা আবর্তনশীল ব্যাধি। সেই জন্য দেখা যায় একবার চিকিৎসায় সকলের ম্যালেরিয়া সারে না। কাহারো দুই তিনবার, কাহারো বহুবার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। ম্যালেরিয়া-জীবাণু প্রোটোজোয়া জাতীয়, এবং প্রোটোজোয়া মাত্রেই রোগকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে চায়। সুতরাং রীতিমত চিকিৎসায় জর বন্ধ হইয়া গেলেও পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা রহিল কি না বলা যায় না। রিল্যাপ্স্ বা পুনরাক্রমণ হওয়া না হওয়া কতকটা নির্ভর করে উপযুক্ত চিকিৎসার উপর, এবং কতকটা রোগীর নিজস্ব ধাতের উপর। কেবল রীতিমত চিকিৎসা হইলেই যে আর জর হইবে না এ কথাও নিশ্চিত বলা যায় না। জেম্‌স্ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ম্যালেরিয়া হওয়ার ধাত যাহার বেশী, তাহারই রিল্যাপ্স্ হওয়ার সম্ভাবনা (susceptibility to relapse is a susceptibility to malaria)। অল্পেই যাহাকে ম্যালেরিয়াতে ধরে, সহজেই তাহার পুনরাক্রমণও হইতে পারে। এমন লোক আছে যাহারা কিছুতেই ম্যালেরিয়াকে এড়াইতে পারে না, আবার এমন লোক আছে যাহারা ম্যালেরিয়ার দেশে বসবাস করিয়াও উহা এড়াইয়া যায়, কোনো কোনো বৎসরে দুই একবার ভোগে মাত্র। সময় বিশেষে মানুষের এইরূপ ধাতের পরিবর্তনও হইতে দেখা যায়। এক বৎসর যে ব্যক্তি জরে মোটেই ভুগিল না, দ্বিতীয় বৎসরে সে পুনঃ পুনঃ জরে পড়িতে লাগিল, আবার কয়েক বৎসর হয় তো একেবারে এড়াইয়া গেল, এমন প্রায়ই দেখা যায়। এইরূপে ধাত যাহার যখন ম্যালেরিয়ার পক্ষে অনুকূল, তাহার তখন উপযুক্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ রিল্যাপ্স্ বা ম্যালেরিয়ার পুনরাবর্তন হইতে পারে।

এখানে 'ধাত' কথাটির অর্থ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া দরকার। ম্যালেরিয়ার দেশে সকলকেই নিত্য মশায় কামড়ায় এবং অনেকের শরীরেই জীবাণু প্রবেশ করে। তন্মধ্যে যাহার রেজিষ্ট্যান্স্ (resistance) কিছু কম তাহাকেই ম্যালেরিয়ায় ধরে। তথাপি কুইনিনাদি ঔষধের দ্বারা জীবাণু সকল যখন দমিত হয়, সেই অবসরে শরীর আপন অক্ষমতাটুকু সারিয়া লয়,—সেই কারণে ভবিষ্যতে আর ঐ সকল জীবাণু বাড়িতে পায় না এবং ম্যালেরিয়াও হয় না। কিন্তু যাহার সে শক্তি একেবারেই নাই, অথবা অনেক কম, কুইনিনাদিতে তাহার ম্যালেরিয়া একেবারে বন্ধ করা যায় না। কুইনিন যতদিন চলিতে

থাকে ততদিন জীবাণু দমন থাকে, উহার ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলেই ক্রমে ক্রমে তাহারা পুনরায় সংখ্যায় বাড়িয়া উঠে। কুইনিনের দ্বারা কখনো সমস্ত জীবাণু মরে না,—এমন কোনো ঔষধ আজও পাওয়া যায় নাই যদ্দ্বারা জীবাণু নিঃশেষে মারা যায়। চিকিৎসান্তে যে কয়েকটি জীবাণু অবশিষ্ট থাকে সেগুলি কালক্রমে শরীরের তেজে আপনিই ধ্বংস হয়। কিন্তু যাহার শরীরে সেরূপ তেজ নাই তাহার শরীরে এগুলি টিঁকিয়া যায় এবং প্রকাশ্যে বিচরণ না করিয়া অস্থিমজ্জা, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি আভ্যন্তরিক প্রদেশে লুকাইয়া আশ্রয় লইয়া থাকে। শরীর যতদিন ভাল থাকে ততদিন ইহারা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না এবং বহুকাল এইরূপে কাটিয়া যাইতে পারে, এমন কি নয় দশ মাস পর্য্যন্তও ইহাদের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে যখনই শরীরে কোনো পরিবর্ত্তন আসে এবং ইহাদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটে, তখনই ইহারা সংখ্যাবৃদ্ধি সুরু করে এবং তখন আবার জ্বর উপস্থিত হয়। ইহাকেই ম্যালেরিয়ার 'রিল্যাপ্স্' বলা হয়।

অনেকে চিকিৎসা সত্ত্বেও রিল্যাপ্স্ হওয়ার সম্ভাবনার কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন ম্যালেরিয়া যেখানে বারো মাস লাগিয়া আছে সেখানে পুরাতন ম্যালেরিয়াই দেখা দিল কিংবা নূতন ম্যালেরিয়ার আমদানি হইল, জ্বর দেখিয়া বা রক্তে জীবাণু দেখিয়া তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? যাহারা ম্যালেরিয়ার দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছে, তাহাদেরও রিল্যাপ্স্ হইতে থাকিলে ইঁহারা বলেন, নিশ্চয় উহারা ভাল করিয়া কুইনিন খায় নাই সেইজন্য উহাদের ম্যালেরিয়া সারে নাই, উপযুক্ত চিকিৎসা করা হইলে ইহাদের রিল্যাপ্স্ হইতে পারিত না। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা দেখান যে কয়েকটি জেলখানায় যখন ব্যবস্থা করা হয় যে ডাক্তারেরা স্বয়ং দাঁড়াইয়া প্রত্যেকবার কুইনিন ওজন করিয়া রোগীদের খাওয়াইবেন, তখন দেখা গেল যে তাহার মধ্যে একটিরও রিল্যাপ্স হইল না। প্রথম হইতে উচিত মত কুইনিন খাইলে যে রিল্যাপ্স খুব কমই হয় ইহা সত্য হইলেও, একেবারেই যে তাহা হইবে না এমন কথা বলা চলে না। কয়েকটি স্থানে হয় নাই বলিয়া যে আর কোথাও তাহা হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এমন কথাও চলেনা। নির্দ্দিষ্ট মত চিকিৎসার পরেও যে রিল্যাপ্স

হইতে পারে তাহা বড় বড় পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এ দেশ হইতে ইউরোপীয়গণ অনেকে ম্যালেরিয়া লইয়া বিলাতে যান। তাঁহারা যে উহার রীতিমত চিকিৎসা করান এ কথা বলাই বাহুল্য, তথাপি তাঁহারা দুই তিন বৎসর যাবৎ মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে থাকেন। সুতরাং চিকিৎসা করিলেও যে ম্যালেরিয়ার রিল্যাপ্স হয় এ কথা নিশ্চয়। আমাদের দেশে ইহা অপেক্ষাকৃত কম, অথবা হইলেও তাহা ধরা যায় না; কিন্তু এমন অনেক দেশ আছে, যেমন ইটালি, ঈজিপ্ট, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি,—যেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের অপেক্ষা উত্তম ও নিয়মবদ্ধ হইলেও রিল্যাপ্সের সংখ্যা অনেক বেশী।

তরুণ ম্যালেরিয়া হইতে রিল্যাপ্স খুব কমই হয়, পুরাতন ম্যালেরিয়াতেই রিল্যাপ্সের সম্ভাবনা বেশী। অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার প্রথম হইতেই রীতিমত চিকিৎসা হইলে জীবাণুরা তাহা সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু ম্যালেরিয়া কিছু পুরাতন হইয়া গেলে জীবাণুসকল ইতিমধ্যে কিছু শক্তি সঞ্চয় করিয়া ফেলে, সুতরাং তখন রীতিমত চিকিৎসা করা সত্ত্বেও তাহারাই পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া রোগ জন্মায়।

পৌনঃপুনিক ম্যালেরিয়া দুই প্রকারের হইতে দেখা যায়। একরূপ **দ্রুত রিল্যাপ্স** (Early relapse)—আর একরূপ **বিলম্বিত রিল্যাপ্স** (Late relapse or recurrence)।

দ্রুত রিল্যাপ্স (Early relapse)—

এই প্রকার রিল্যাপ্সে জ্বর অল্পদিন অন্তর ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। একবার জ্বর ভোগের পর হইতে দ্বিতীয়বার জ্বর হওয়া পর্য্যন্ত ইহাতে **দশদিন হইতে দুইমাস** পর্য্যন্ত সময়ের অন্তরাল থাকে। সেইজন্য এই-জাতীয় রিল্যাপ্সে প্রতিমাসে হয়তো দুইবার করিয়াও জ্বর আসিতে পারে, প্রতি মাসে একবারও আসিতে পারে, আবার দেড় বা দুই মাস অন্তরও জ্বর হইতে পারে। ইহাতে একবার জ্বর হইয়া গেলে পরবর্ত্তী দশদিনের মধ্যে পুনরায় জ্বর নিশ্চয়ই হইবে না, কিন্তু তাহার পর দুইমাসের অধিক কাল রোগীর বিনাজ্বরে কাটিবে না, দুইমাসের মধ্যে যেদিন হউক নিশ্চয় একবার জ্বর দেখা দিবে। আমরা

প্রতিমাসের অমাবস্যা পূর্ণিমাতে, অথবা বিশেষ বিশেষ তিথিতে একবার করিয়া এইরূপ জ্বরের রিল্যাপ্সের কথাই প্রায় শুনিয়া থাকি। ইহাই আরোগ্য করা সকলের চেয়ে কঠিন। এইরূপ ভাবের ম্যালেরিয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে দুই বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। ঘন ঘন জ্বর হওয়াতে রোগীর শরীর ক্রমে দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য হয়, প্লীহা অত্যন্ত বাড়ে, এবং শরীর ভাঙিয়া পড়ে। এই ম্যালেরিয়ার আনুষঙ্গিক রূপে প্রায়ই আরো কয়েকটি রোগ মিশ্রিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়,—হয় হুকওয়ার্ম, না হয় এমিবা, নতুবা প্রচ্ছন্ন যক্ষ্মা, নতুবা অন্য কিছু। তখন দেখা যায় ম্যালেরিয়া ও তাহার আনুষঙ্গিকের চিকিৎসা এক সঙ্গে করিলে তবেই উহাতে অভিলষিত ফল পাওয়া যায়। সেইজন্য এই সকল রোগীর চিকিৎসায় সর্ব্বাঙ্গীন পরীক্ষা ও একাধিক রোগের অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এইরূপ ম্যালেরিয়াতে শরীর রোগপ্রবণ হইয়া পড়ায় যে কোনো দ্বিতীয় রোগ অনায়াসে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। বিশেষতঃ এই অবস্থাতেই যক্ষ্মা আক্রমণের বিশেষ সুবিধা, এবং আমাদের দেশে আজকাল যক্ষ্মার যে এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার এই একটি মূল কারণ। আর, যে রোগই এইরূপ দুর্ব্বল শরীরে ধরে তাহাই কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব এইরূপ ম্যালেরিয়া পুনঃ পুনঃ হইতে থাকা কিছুতেই অবহেলার বিষয় নয়, যত শীঘ্র সম্ভব ইহা আরোগ্যের চেষ্টা করা উচিত। একবার দুইবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু পৌনঃপুনিক ম্যালেরিয়াই শরীরকে অকর্ম্মণ্য করে ও নানারূপে মানুষের সর্ব্বনাশ করে। ইহাই আমাদের দেশের এক বিশেষ সমস্যা।

বিলম্বিত রিল্যাপ্স (Late relapse or recurrence)—

এক প্রকার বিলম্বিত পুনরাবির্ভাবও ম্যালেরিয়াতে **সাতমাস হইতে দশমাস অন্তর** একবার করিয়া ঘটে। বহুদিন অন্তর করিয়া ম্যালেরিয়া-জ্বর অনেকেরই হয়, কিন্তু তাহা যে সেই পুরাতন রোগটি অথবা নূতন ম্যালেরিয়া ইহা বুঝিবার কোনোই উপায় নাই, কারণ দশ মাস অন্তর এদেশে ম্যালেরিয়ার ঋতু প্রতি বৎসরই নূতন করিয়া আসে। কিন্তু

এদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও ম্যালেরিয়া-সম্পর্কশূন্য সুদূর পশ্চিমদেশে, এবং বিলাতে গিয়াও, এদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির কয়েকমাস অন্তর হঠাৎ এক একবার জ্বর হইতে দেখা যায়, তাহাতেই বুঝা যায় যে এতদিন পরেও পুরাতন ম্যালেরিয়ার পুনঃ প্রকাশ হইতে পারে। আমাদের দেশেও অনেকের ভাদ্র-আশ্বিন মাসে একবার জ্বর হইয়া সাত আট মাস পরে আবার বসন্তকালের শেষে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হঠাৎ আর একবার জ্বর হইতে দেখা যায়,—বোধ হয় তাহার মধ্যে অনেকগুলি এই জাতীয় রিল্যাপ্স্-ম্যালেরিয়া। অথবা কার্ত্তিকমাসে যাহার একবার জ্বর হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর হয় নাই,—হঠাৎ পরবৎসর শ্রাবণ মাসে একদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার রীতিমত ম্যালেরিয়া ধরিল, অথচ সে সময় দেশে ম্যালেরিয়া নাই,—ইহাও বোধ হয় ঐরূপ ম্যালেরিয়া। সিন্টন্ এইপ্রকার বিলম্বিত ম্যালেরিয়ার কথা তেমন বিশ্বাস করেন না, কারণ তিনি সৈনিকদের মধ্যে কোথাও এরূপ ঘটনা লক্ষ্য করেন নাই,—কিন্তু সম্প্রতি লীগ অফ নেশন্স-এর ম্যালেরিয়া কমিশন এইরূপ বিলম্বিত রিল্যাপ্স (late relapse) সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কমিশনের সভ্যদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরূপ বিলম্বিত ম্যালেরিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ম্যালেরিয়া-জীবাণু দশমাস পর্য্যন্ত জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। সুতরাং কোনো ঔষধ প্রকৃতপক্ষে ম্যালেরিয়ার রিল্যাপ্স্ বন্ধ করিতে পারে কিনা তাহা জানিতে হইলে অন্ততঃ এক বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখা দরকার। তাঁহারা আরো বলেন যে এরূপ রিল্যাপ্স্ শরীরের পক্ষে তেমন হানিকর নয় এবং ইহা নিবারণ করিবার জন্য সাধারণ চিকিৎসা ছাড়া বিশেষ কোনো বাঁধাবাঁধি করিবার আবশ্যক নাই,—কারণ দুই একবার মাত্র এরূপ আক্রমণ হওয়ার পর শরীরের জীবাণুদমন-শক্তি আপনিই বাড়িয়া যায় এবং আপনিই উহা বন্ধ হইয়া যায়।

প্রচ্ছন্ন ম্যালেরিয়া (Latent Malaria)

কেহ ম্যালেরিয়ার দেশে গিয়া লক্ষ্য করিলে দুইটি বিষয় বিশেষ করিয়া তাহার নজরে পড়ে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে প্রায়ই সেখানে অল্প কয়েকজন

মাত্র জরে ভুগিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই সুস্থ শরীরে প্রাত্যহিক কাজকর্ম্ম করিতেছে, সুতরাং সে দেশে বেশী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আছে বলিয়া তখন মনে হয় না। স্থানীয় ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করিলেও শুনা যায় যে সে দেশে ম্যালেরিয়া তেমন প্রবল নয়, কয়েক ঘরে হইতেছে মাত্র। অথচ যে কেহ নূতন লোক সে দেশে গিয়া কয়েকদিন মাত্র বাস করিয়া আসিবে, তাহার কয়েকদিন পরে নিশ্চয় ম্যালেরিয়া হইতে দেখা যাইবে। দেশের লোকের জর নাই, অথচ বিদেশী আগন্তুক সেখানে গেলে আর অব্যাহতি পায় না, ইহাই বিশেষ করিয়া লক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহাও লক্ষিত হয় যে দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের পেটে বড় বড় প্লীহা, অথচ তাহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, কোনো রোগ আছে বলিয়া আপাততঃ মনে হয় না। বয়স্থদের মধ্যেও কাহারো কাহারো এরূপ প্লীহা থাকে বটে, কিন্তু ছেলেদের তুলনায় তাহার সংখ্যা অনেক কম। এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া ক্রিষ্টোফার ম্যালেরিয়াপূর্ণ নানা দেশে গিয়া তথাকার স্থানীয় অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন বয়সে কিরূপ ম্যালেরিয়া হয়, বয়সানুসারে কে কিরূপ ভাবে জরে ভোগে, কাহার রক্তে কত জীবাণু থাকে এবং প্লীহার বৃদ্ধি কোন অবস্থায় কিরূপ হয়, তাহার একটি চমৎকার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই তালিকা এখানে উদ্ধৃত হইল—

বয়স বিভাগ	শতকরা কত-গুলির প্লীহা বড়	উহার মধ্যে শতকরা কত-গুলির রক্তে জীবাণু পাওয়া যায়	রক্তে জীবাণুর সংখ্যার গড়-পড়তা (per cmm.)	গড়ে কতবার জরে ভোগে
১-২ বছর বয়সে	৭৫	১০০	১২,৬২৩	প্রায় বারোমাসই জর
৩—৫ বয়সে	৮৮	৯৬	১,৩২০	২৫ দিনে একবার
৬—১২ বয়সে	৭২	৮৬	১,০১৮	মাসে একবার
১২—১৬ বয়সে	৪৬	৫০	১৯৮	তিন মাসে একবার
পূর্ণবয়স্কদের	১১	৫০	১২২	ছয় মাসে একবার

এই তালিকা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ম্যালেরিয়ার দেশে দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শতকরা ৭৫টি শিশু ক্রমাগতই ম্যালেরিয়ায় ভোগে; বলা বাহুল্য ইহার মধ্যে কতকগুলি মরে। যাহারা বাঁচে তাহারা ছয় বৎসর পর্য্যন্ত নিত্যই জরে ভুগিতে থাকে। **ছয় বৎসর পর্য্যন্ত** শিশুরা নিতান্ত অসহায় থাকে, ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে উহাদের শরীরে কোনো শক্তি জন্মায় না। তাহার পর যত বয়স বাড়ে ততই উহারা ম্যালেরিয়া সহ্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে থাকে। যখন বয়স্থ হইয়া উঠে তখন তাহারা একরূপ বিজয়ী,—রক্তে জীবাণু ঢুকিলেও সংখ্যায় উহা বাড়িতে পায় না, কাজেই সর্ব্বদা আর জর হয় না,—কেবল বিশিষ্ট ঋতুতে বাৎসরিক দুই একবার জর হয় মাত্র। এই সকল দেশে যে ছেলেগুলিকে পথেঘাটে বাহির হইতে দেখা যায়, তাহারা বয়সানুসারে কতকটা শক্ত হইয়াছে। কিন্তু অল্পবয়স্ক শিশুগুলি, যেগুলি ঘরের ভিতর থাকে, এবং যাহাদের জর লাগিয়া থাকিলেও বিশেষ লক্ষ্য না করা পর্য্যন্ত তাহা জানা যায় না,—ইহারাই ম্যালেরিয়ার আসল ডিপো, এবং প্রভূত জীবাণু ইহাদের রক্তে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এমনি করিয়া গোপনে গোপনে ম্যালেরিয়া সর্ব্বদা শিশুদের মধ্যেই আশ্রয় করে, এবং মশা ইহাদের নগ্নদেহ হইতেই অধিকাংশ বীজ সংগ্রহ করে। সেইজন্যই তথায় নূতন আগন্তুক গেলে ম্যালেরিয়া যদিও চোখে দেখিতে পান না, কিন্তু নিজের মধ্যেই তাহা অচিরে প্রত্যক্ষ করেন। কোথায় কত ম্যালেরিয়া আছে তাহা জানিবার একমাত্র উপায় সেখানে কতগুলি ছেলের পেটে প্লীহা আছে তাহার সন্ধান করিয়া দেখা। অধিকাংশস্থলে ম্যালেরিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের শরীরে গোপন ভাবেই সর্ব্বদা বিরাজ করে, এবং প্লীহা বৃদ্ধিই তাহার পরিচয়। শিশুদের ও বয়স্থদের মধ্যে কেবল এই পার্থক্য যে শিশুদের যত ঘন ঘন জর হয়, বয়স্থদের তাহা হয় না।

কিন্তু বয়স্থদের জর হয় না বলিয়া যে তাহাদের শরীরে ম্যালেরিয়া একেবারেই নাই তাহা নয়। মশা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই কামড়ায় এবং ম্যালেরিয়ার বীজ নিত্য আদান প্রদান করে। কিন্তু যাহারা পূর্ব্বে বহুবার ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া কিছু বিরুদ্ধশক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের রক্ত জীবাণুদের তেমন অনুকূল নয় বলিয়া সেগুলি সংখ্যায় জরের গণ্ডি (febrile threshold) অর্থাৎ

১০০ কোটীর সীমা অতিক্রম করিতে পারে না,—কম সংখ্যায় শরীরের মধ্যে একরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। উহার মধ্যে কতক মরে, কতক বাঁচে, কতক নূতন আমদানি হয়, এইভাবেই চলিতে থাকে। কোনো কারণে শরীর দুর্ব্বল হইলে বা **পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন** ঘটিলে যদি এই শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া গুপ্ত ম্যালেরিয়া হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই জন্য ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়, এবং দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি দুরবস্থা উপস্থিত হইলে, ম্যালেরিয়ার স্তিমিত প্রদীপ হঠাৎ নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে দেখা যায়। ম্যালেরিয়ার মুখ্য কারণ জীবাণু, কিন্তু গৌণ কারণ **স্বাস্থ্যের অবনতি**। বাংলা দেশে অনেকের রক্তেই জীবাণু আছে, কিন্তু তন্মধ্যে যাহাদের **স্বাস্থ্য** ভাল এবং অন্নের সংস্থান আছে তাহাদের শরীরে রোগটি শীঘ্র ধরিতে পারে না, কিন্তু অন্নের অভাব হইলে, বা অন্য কোনো কারণে যখন **স্বাস্থ্যের অবনতি** ঘটে তখনই ম্যালেরিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। একটু ঠাণ্ডা লাগিলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, হঠাৎ কোনো গুরুতর আঘাত পাইলে, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, আহার বিহারের কোনোরূপ অনিয়ম বা অত্যাচার হইলে, অথবা যে কোনো কারণে **স্বাস্থ্য** বিচলিত হইলেই শরীরস্থ ম্যালেরিয়া-জীবাণু স্ফূর্ত্তি পায় এবং বহুদিন পরে হয়তো হঠাৎ আবার জ্বর আসিয়া পড়ে।

আমাদের দেশে অনেককাল সুস্থ থাকা সত্ত্বেও **সন্তান প্রসবের পরই** যে প্রসূতিদের হঠাৎ জ্বর হইতে দেখা যায়, অনেক সময় ইহাই তাহার কারণ। কুইনিন দিলেই এ জ্বর ছাড়ে; এইজন্য প্রসবান্তে কুইনিন দিয়া পোষ্ট-পার্টেম মিকশ্চার (Post-partem mixture) এ দেশে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। কোনো **বড় অপারেশনের পরও** যে হঠাৎ জ্বর হইতে দেখা যায়, তাহাও অধিকাংশ ম্যালেরিয়া। সেই জন্য নিয়ম আছে যে ম্যালেরিয়ার দেশের লোককে অপারেশন করিতে হইলে পূর্ব্বে কয়েকদিন **কুইনিন** খাওয়াইয়া লইতে হইবে। কোনো কোনো তেজস্বী ঔষধ ব্যবহার করিলেও **স্বাস্থ্য** বিচলিত হইয়া হঠাৎ গুপ্ত-ম্যালেরিয়া প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। অনেক কালাজ্বরে কয়েকটি ইন্‌জেকশন দিবার পর জ্বর বেশ ছাড়িয়া গিয়া বিনা কারণে আবার একদিন উহা হঠাৎ বাড়িয়া যাইতে

দেখি, এবং কুইনিন দিলেই সে জ্বর তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়,—এও পূর্ব্বের সঞ্চিত পুরাতন ম্যালেরিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। স্যাল্‌ভারসন্ ইন্‌জেকশন দিবার পরও এইরূপে পূর্ব্বসঞ্চিত ম্যালেরিয়া হঠাৎ প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে।

সুতরাং এক বৎসর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার দেশে ছিলাম, ইতিমধ্যে একবারও জ্বর হয় নাই, অতএব ম্যালেরিয়ার হাত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইয়াছি, এ কথা মনে করা ভুল। ম্যালেরিয়া-তত্ত্ববিদ্‌রা ম্যালেরিয়ার প্রচ্ছন্নতার মেয়াদকাল **তিন বৎসর** ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ তিন বৎসরের মধ্যে যদি কোনো রোগীর একবারও ম্যালেরিয়ার জ্বর দেখা না যায়, তবেই বুঝিতে হইবে তাহার এ রোগ আর নাই, তৎপূর্ব্বে এ কথা বলা যায় না।

আমাদের দেশে ইহা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, গ্রামের যাহারা প্রাচীন ব্যক্তি এবং বারোমাস গ্রামেই বাস করে, তাহাদের ম্যালেরিয়া খুব কমই হয়, কিন্তু উহারা ক্বচিৎ স্থানান্তরে গমন করিলেই একবার জ্বর হইয়া পড়ে। সাধারণে বলে নূতন জায়গার জল সহ্য হয় না বলিয়া এইরূপ জ্বর হয়। বস্তুতঃ নূতন জায়গায় বাস করিতে গেলে প্রথমে অনেকেরই এইরূপ দুই একবার জ্বর হইতে দেখা যায়, কিন্তু কিছুদিন তথায় বাস করিতে করিতে আবার তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাও সেই প্রচ্ছন্ন ম্যালেরিয়া, আবহাওয়ার অবস্থান্তর ঘটিলেই একবার প্রকাশ হইয়া পড়ে, আবার তাহা ধাতস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা দমন হইয়া যায়। যাহারা একভাবে এক অবস্থার মধ্যেই বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপন করে, তাহাদের ম্যালেরিয়া বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। প্রাচীন গ্রামবাসীদের যে ম্যালেরিয়া কম হয়, ইহাও তাহার এক কারণ। ম্যালেরিয়া তাহাদের সহ্য হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের দৈনিক জীবন একরূপ সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে থাকে,—সুতরাং সহজে কিছু স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সুযোগ থাকে না।

অতএব ম্যালেরিয়ার দেশস্থ সকলের দেহেই ম্যালেরিয়ার বীজ গোপনে নিহিত রহিয়াছে ইহাই সাব্যস্ত করিয়া লওয়া উচিত, এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনো কিছু ব্যতিক্রম ঘটিলেই যদি জ্বর হইয়া পড়ে তবে এই কথাই স্মরণ করা উচিত, এবং পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া হইয়াছিল কিনা তাহার

সন্ধান লওয়া উচিত। ম্যালেরিয়ার উপযুক্ত সময় নয় বলিয়া উহা ম্যালেরিয়া হইতে পারে না, এ কথা মনে করা উচিত নয়। বস্তুতঃ এরূপ ম্যালেরিয়া যখন তখন হইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার ক্যাকেক্সিয়া ও প্লীহোদর
(Malarial Cachexia and Splenomegaly)

বহুকাল যাবৎ বিনা চিকিৎসাতে পুরাতন বা ক্রনিক ম্যালেরিয়ার শেষ পর্য্যন্ত যেরূপ অবস্থা হয়, তাহাকেই আমরা "ক্যাকেক্সিয়া" নামে অভিহিত করি। এই শব্দটি আমরা আগে খুবই ব্যবহার করিতাম,—যখন কালাজরের বীজাণু আবিষ্কৃত হয় নাই এবং কালাজর চিনিবার উপায় জানা ছিল না। কিন্তু তাহার পর দেখা গেল, যে-গুলিকে আমরা ক্যাকেক্সিয়া বলিতাম এবং কুইনিনে যাহার কিছু উপকার হইত না, তাহার অনেকগুলিই কালাজর। এখন আমরা জানিয়াছি যে ম্যালেরিয়ার ক্যাকেক্সিয়া কমই হয়, কারণ ভালরূপ চিকিৎসা না করিলেও ম্যালেরিয়া প্রায় এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু সংখ্যায় কম হইলেও ক্যাকেক্সিয়া যে একেবারেই হয় না একথা বলা চলে না। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে এরূপ অবস্থা নিতান্ত বিরল নয়, এবং তাহার প্রতিকৃতিও কালাজর হইতে যথেষ্ট পৃথক, দেখিলেই অনেকটা চিনিতে পারা যায়। ইহাতে যেরূপ রক্তশূন্যতা হয়, কালাজরে তাহা হয় না, এবং ইহাতে প্লীহা যতটা বড় হয় কালাজরে ততটা হয় না; আর কালাজরে যেরূপ রীতিমত জর হইতে থাকে, ইহাতে জরও তেমন সুস্পষ্ট নয়।

পুরাতন বা ক্রনিক ম্যালেরিয়া হইতেও ইহার কিছু পার্থক্য আছে,—ইহা বস্তুতঃ ম্যালেরিয়ার পরবর্ত্তী অবস্থা। প্লীহার পরিসর ও রোগীর আকার দেখিয়া এ অবস্থা চিনিয়া লইতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। প্লীহাটি ইটের মত কঠিন হয় ও এতই বড় হয় যে কুঁচকির নিকটে গিয়া ঠেকে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায় যে শরীরে রক্তের লেশ মাত্র নাই। রোগীর মূর্ত্তি অস্থিচর্ম্মসার, স্ফীতোদর, পাংশুবর্ণ, রুক্ষ, অল্প অল্প জর গায়ে লাগিয়া থাকে, কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে পারে না, অথচ শয্যাগতও নয়। এমন

অবস্থাতেই মাসের পর মাস কাটিয়া যায়, ক্রমে শরীর আরো রক্তহীন হইয়া পড়ে, হাত পা ফুলিতে থাকে। ইহাদের রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার কোনো জীবাণু পাওয়া যায় না, বোধ হয় প্লীহার মধ্যেও ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকে না, কারণ তখন ম্যালেরিয়া ইহাদের শরীরে ভোগ সম্পূর্ণ করিয়া অবশেষে উহা জীর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু ম্যালেরিয়া ছাড়িয়া গেলেও শরীরের যে ক্ষতি করিয়া গিয়াছে তাহা পূরণ করিবার সামর্থ্য ইহাদের আর নাই। জীবনী-শক্তি ইহাদের ক্লান্ত ও নিরুদ্যম, ধমনীতে রক্তস্রোত আছে বটে কিন্তু তাহার কোনো তেজ নাই। নিস্তেজ রক্ত-নিঃস্বতাই এই অবস্থার হেতু। সামান্য যে জরটুকু লাগিয়া থাকে তাহা রক্তহীনতার জর। এই অবস্থাকেই ক্যাকেক্সিয়া, প্লীহোদর (tropical splenomegaly) প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ইহা আরোগ্য করা বড় কঠিন, কারণ এখানে যে শক্তি প্রায় নিবিয়া গিয়াছে তাহাকেই পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। সেইজন্য শরীরে তখন কোথায় কি অভাব আছে, কোথায় কি কি রোগ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে ও একে একে সেগুলি দূর করিতে হইবে। হুকওয়ার্ম, উপদংশ, লিভারের দোষ, আমাশার দোষ, প্রভৃতি অনেক উপসর্গ ইহার সঙ্গে থাকিতে দেখা যায়। অন্যান্য পরীক্ষার সঙ্গে ইহাতে রক্ত-পরীক্ষা করানোই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়া আছে কি না, কালাজর হওয়া সম্ভব কি না, লিউকীমিয়া (Leukaemia) হইতে পারে কি না, অথবা শুধুই ক্যাকেক্সিয়া, রক্ত-পরীক্ষা ভিন্ন তাহা বুঝিবার কোনোই উপায় নাই। Gaucher's disease প্রভৃতিতেও এই একইরূপ অবস্থা হয়। সুতরাং এরূপ স্থলে রক্ত-পরীক্ষাই রোগ চিনিবার একমাত্র উপায়।

ম্যালেরিয়াতে রক্তের কি পরিবর্ত্তন ঘটে

(Blood pathology)

ম্যালেরিয়াতে রক্তপরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তরুণ অবস্থার প্রথম সপ্তাহে উহাতে যেরূপ দ্রুত রক্তক্ষয় হইতে থাকে, পরে ততটা হয় না। আরো দেখা গিয়াছে যে উহাতে জ্বরের সময় রক্তের চাপ (Blood pressure) কমিয়া যায় এবং শ্বেত কণিকার সংখ্যা বাড়ে,—পরে শ্বেত কণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ কিছু কমিতে থাকে।

ম্যালেরিয়াতে যে দ্রুত রক্তহানি ঘটিতে থাকে এবং রোগী দেখিতে দেখিতে পাণ্ডু হইয়া যায়, এ কথা আপাতঃ দৃষ্টিতেও বুঝা যায়। ইহাতে রক্তের লোহিত কণিকাগুলি ভাঙিয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ হিমোগ্লোবিন গলিয়া বিশ্লেষিত হইতে থাকে,—সেই জন্য এই রক্তহানিকে **গৌণ রক্তশূন্যতা** (secondary heamolytic anaemia) বলা হয়। হিমোগ্লোবিন পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার কতক অংশ একদিকে কৃষ্ণবর্ণ **লৌহযুক্ত পিগ্‌মেণ্টে** (pigments) পরিণত হয় ও লিভার, প্লীহা, অন্ত্রগাত্র প্রভৃতি স্থানে গিয়া উহা জমিতে থাকে ; পুরাতন ম্যালেরিয়ায় মৃত রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলেই তাহার অন্ত্রগাত্রে কালো কালো দাগ (slaty pigmentation) নিশ্চয় দেখা যাইবে, এ কথা রজার্স প্রায় বলিতেন। অন্যদিকে হিমোগ্লোবিনের লৌহশূন্য অবশিষ্ট অংশ **বিলিরুবিন** (Bilirubin) রূপে রক্তের মধ্যে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে থাকে। এই বিলিরুবিন পিত্তের একটি উপকরণ, এবং ইহার দ্বারা রঞ্জিত হইয়াই পিত্ত পিঙ্গল বর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য ইহার নাম পিত্ত-রঞ্জক (bile pigment)। সুতরাং পিত্তের কতক অংশ হিমোগ্লোবিন হইতেই প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় উহা হইতে বিলিরুবিন আহরিত হইয়া লিভারের মধ্যে আসিয়া রাসায়নিক সংযোগে তাহা পিত্তে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়াতে অধিক হিমোগ্লোবিন ক্ষয় হেতু অধিক বিলিরুবিন সঞ্চারিত হওয়াতে তাহা পিত্তে রূপান্তরিত না হইয়া —কতক অংশ রক্তের মধ্যেই থাকিয়া যায়, আর কতক অংশ লিভারের মধ্য দিয়া অবিকৃত অবস্থাতেই (hepatogenous bilirubin) অন্ত্র

মধ্যে নীত হয়। ইহাই রোগীর বমনের সহিত পিত্তরূপে দেখা যায় ; ম্যালেরিয়া রোগীর যখন আমাশা বা উদারময়ের লক্ষণ দেখা যায় তখন যে গাঢ় সবুজ বা কৃষ্ণবর্ণ মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইতে থাকে, তাহাতেও ইহা stercobilin রূপে অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকাতেই তাহার রং ঐরূপ দেখায়। এবং ইহাই কতক পরিমাণে ইউরোবিলিন (Urobilin) রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াও প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইতে থাকে,—সেইজন্য প্রস্রাবও গাঢ় পীত বর্ণ ধারণ করে। ম্যালেরিয়াতে এই ইউরোবিলিন প্রস্রাব পরীক্ষার দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। অতএব পিত্তরঞ্জক বিলিরুবিন অধিক হওয়াতে তাহা শরীরের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে, এবং চোখে যে হরিদ্রাভা প্রায় দেখা যায়, ইহাই তাহার কারণ। হিমোগ্লোবিনের রূপান্তর বিষয়ে আরো অনেক কথা বলিবার আছে, ব্ল্যাকওয়াটার-ফিবার সম্পর্কে তাহা উক্ত হইবে।

ম্যালেরিয়া হইলে রক্তের মধ্যে অতিরিক্ত বিলিরুবিন নিশ্চয় দেখা দিবে। সেইজন্য সিরামের রং দেখিয়া ম্যালেরিয়া চিনিবার একরূপ পরীক্ষাও আছে, ইহার নাম Linzenmeir's test। ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

প্লীহা বাড়ে কেন ?

যে সকল ম্যালেরিয়াভোগী প্লীহোদর ব্যক্তিকে এ দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিলে জানিবেন যে ইহাদের হয়তো দুইতিন বৎসর যাবৎ জ্বর হয় নাই ; তবু ইহাদের প্লীহার আয়তন এত বৃহৎ থাকে কেন ? ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা বাড়ে সত্য, কিন্তু পুরাতন ম্যালেরিয়া ছাড়িয়া গেলেও প্লীহা কেন কমে না ? তাহার কারণ এই যে ম্যালেরিয়ার প্লীহা সর্ব্বদা সক্রিয় থাকে এবং এই প্লীহাই ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করিয়া থাকে। উহারা দেশেও বাস করিতেছে, অনবরত মশাও কামড়াইতেছে, তবু উহাদের জ্বর হয় না, কারণ এই প্লীহাই উহাদের জ্বর নিবারণের একটি অস্ত্র।

প্লীহার বিশেষ কাজ কি, আগে তাহা স্পষ্টরূপে জানা ছিল না, সম্প্রতি জানা গিয়াছে। আগে আমরা জানিতাম যে প্লীহা কেবল রক্তসঞ্চয়ের

আধার, ইহাতে কয়েক প্রকার শ্বেত ও লাল রক্তকণিকা জন্মায়, এবং পুরাতন লাল কণিকা মৃত হইলে এখানে আসিয়া লয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এখন জানা যাইতেছে যে প্লীহার মধ্যে আর এক বিশিষ্ট প্রকারের জীবকোষ আছে—সেগুলির নির্দ্দিষ্ট কাজই এই যে রক্তের মধ্যে যত বিজাতীয় বা অসার পদার্থ আসিয়া পড়ে সেগুলিকে ইহারা আহরণ করিয়া খাইয়া হজম করিয়া ফেলে, এবং প্রোটোজোয়া বা অন্য কোনো প্রকার বাহিরের শত্রু (যথা ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরের জীবাণু) যদি রক্তের মধ্যে দেখা যায়, সেগুলিকেও ইহারা আটক করিয়া রাখে, এবং লাল কণিকা সমেত উহাদের খাইয়া হজম করে (phagocytosis of bacteria and debris)। এইরূপে প্লীহার ঐ জীবকোষগুলিই রোগ অনেকটা দমন করিয়া রাখে এবং শত্রুসংখ্যা অযথারূপে বাড়িয়া উঠিতে দেয় না। এইজন্য শরীরতত্ত্ববিদ ষ্টারলিং (Starling) প্লীহাকে রক্তের ছাঁকুনি (the great blood-filter) বলিয়াছেন। কিন্তু এই সকল জীবকোষ যে কেবল মাত্র প্লীহাতেই আছে তাহা নয়; যকৃতেও কিছু আছে,—অস্থিমজ্জার মধ্যে, গ্রন্থি সকলের মধ্যে, এবং রক্তের মধ্যেও কিছু কিছু থাকে। রক্তের মধ্যে যে লার্জ-মনোনিউক্লিয়ার ও ট্রান্‌জিশন্যাল্ (transitional) নামক শ্বেতকণিকা দেখা যায়, সেগুলিও এই জাতীয়। এই জীবকোষগুলিকে একত্র করিয়া রেটিকিউলো-এণ্ডোথীলিয়াল সেল্‌স্ (reticulo-endothelial cells) নাম দেওয়া হইয়াছে। এই-জাতীয় জীবকোষের সংখ্যা প্লীহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের সংখ্যা খুব অধিক নয়, কিন্তু প্রয়োজন হইলে, অর্থাৎ প্রোটোজোয়া প্রভৃতি উপস্থিত হইলে ইহার সংখ্যা খুব বাড়ে। এবং ঐ হেতু প্লীহাও তখন আয়তনে বাড়িয়া উঠে। সেইজন্যই ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্লীহাবৃদ্ধি লক্ষ্য করি। পুরাতন ম্যালেরিয়াতে অবশ্য অসার পদার্থে (fibrous tissue) পূর্ণ হইয়া প্লীহা পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়, কিন্তু প্রথম অবস্থায় প্লীহাবৃদ্ধিতে তাহা হয় না। অতএব রোগের সঙ্গে সঙ্গে প্লীহাবৃদ্ধি দেখিলে বুঝিতে হইবে দ্বাররক্ষক প্রহরী জাগিয়াছে এবং শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। সেইজন্যই দেখা যায় যে যাহাদের ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া প্লীহাটি ডাগর

হইয়াছে তাহাদের নূতন ম্যালেরিয়ার আক্রমণ আর প্রায় হয় না। আরও দেখা যায় যে মারাত্মক ম্যালেরিয়া যাহাদের ধরে তাহাদের প্লীহা প্রায় ভাল রকম বাড়িতে পায় না, এবং কুইনিন দিয়াও তাহাদের জর ছাড়াইতে বেগ পাইতে হয়; কিন্তু যাহাদের ম্যালেরিয়া সহজ হয় তাহাদের প্লীহা শীঘ্র শীঘ্র বড় হইয়া উঠে এবং কুইনিনে তাহাদের জরও শীঘ্র ছাড়ে।

অবশ্য এ সকল কথা হইতে এমন মনে করা উচিত নয় যে প্লীহা সর্ব্বদা বড় হওয়াই মঙ্গল, বা প্লীহা যতই বাড়িতে থাকিবে ততই ভাল। প্রথম অবস্থায় যখন প্লীহা বড় হয় তখন উহার রেটিকিউলো-এণ্ডোথীলিয়াল কোষগুলির সংখ্যা বাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু পরে আর তাহা হয় না। পুরাতন প্লীহাতে কেবল অনাবশ্যক fibrous tissue বা ছিব্‌ড়ার মত পদার্থই বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার মধ্যে চূণ জমিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে প্লীহার সারপদার্থ অল্পই জন্মায়।

কেবল যে ম্যালেরিয়াতে বা কালাজরেই প্লীহা এইরূপ ভাবে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে তাহা নয়। একপ্রকার রক্তের দোষ হইতেও প্লীহা আকারে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিতে দেখা যায়। এই অবস্থার নাম (Leukaemia) **লিউকীমিয়া।** এইরূপ লিউকীমিয়া রোগ আমাদের দেশে কখনও কখনও দেখা যায় এবং তাহাকে আপাতঃ-দৃষ্টিতে প্রথমে পুরাতন ম্যালেরিয়া বা পুরাতন কালাজর বলিয়াই ভ্রম হয়। কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করিলেই তাহার স্বরূপ ধরা পড়ে। আরো কয়েকটি রোগে প্লীহা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িতে পারে, তবে সে রোগগুলি সাধারণতঃ প্রায় দেখা যায় না। যথা—Gaucher's disease (প্লীহা-বৃদ্ধির সহিত ইহাতে অত্যন্ত রক্তশূন্যতা হয় এবং বংশপরম্পরায় এ রোগ ঘটিতে দেখা যায়), Banti's disease (বালক বয়সে হয়; প্লীহা অতি বৃহৎ হওয়ার সঙ্গে রক্তশূন্যতা দেখা যায় এবং শ্বেত কণিকার সংখ্যা কমিয়া যায়), Chronic haemolytic jaundice,—প্রভৃতি কয়েকটি রোগের নাম এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা

বিনা চিকিৎসায় ম্যালেরিয়া সারে কি না—

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা না করিলে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহারও যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। সকলেরই ম্যালেরিয়া বিনা-চিকিৎসায় মারাত্মক অথবা ক্রনিক হয় না,—কতক ম্যালেরিয়া আপনিও আরোগ্য হইতে পারে। সম্প্রতি এ বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ১৯২৬ সালে জেম্‌স্ এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন, তৎপরে লো (Lowe) প্রভৃতি আরো অনেকে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। মারাত্মক নয় বলিয়া বিনাইন টার্শিয়ান ম্যালেরিয়ার কয়েকটি রোগীকে হাঁসপাতালে বিনা চিকিৎসায় রাখিয়া কিরূপ অবস্থা দাঁড়ায় তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা হয়। তাহাতে দেখা যায় যে প্রথমে অনেকেরেই জর প্রত্যহ কম্প দিয়া আসে, পরে একদিন অন্তর আসিতে থাকে, এবং দুই সপ্তাহ পরে ঐ জর প্রায় আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল রোগীর রক্ত প্রত্যহ তিন চার বার করিয়া পরীক্ষা করা হইত; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে যতদিন জর থাকে ততদিন রক্তে জীবাণুও থাকে,—জর বন্ধ হইবার দুই একদিন পর হইতে আর সেগুলি দেখা যায় না। এই সকল রোগীর মধ্যে কয়েকজনের জর ছাড়িয়া গিয়া পুনরায় আর হয় নাই,—কিন্তু কয়েকজনের দ্বিতীয়বার রিল্যাপ্স্ হয়। তথাপি উহার চিকিৎসা না করায়—তন্মধ্যে কয়েকটি রোগীর জর প্রায় দুইবারমাত্র রিল্যাপ্স্ হইবার পরই আরোগ্য হয়, আর কয়েকটির তিন চার বার রিল্যাপ্স্ হইয়া আরোগ্য হয়। অবশিষ্ট কয়েকজনের যদিও জর আর হইল না, তথাপি মধ্যে মধ্যে উহাদের রক্তের মধ্যে জীবাণু পাওয়া যাইতে লাগিল,—কিছুকাল পরে তাহা আপনিই আবার অদৃশ্য হইয়া গেল। অবশ্য ইহাদের সকলকেই উত্তম পথ্য দেওয়া হইয়াছিল এবং রোগের চিকিৎসা না করা হইলেও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক চিকিৎসা না করিলেও যে অনেক বিনাইন টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া আপনিই আরোগ্য হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে এরূপ পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই ম্যালেরিয়াতে কুইনিন না দিয়া কয়েকজনের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে লাগিল,—সেই জন্য ৪৮ ঘণ্টার অধিক কাহাকেও বিনা চিকিৎসায় ফেলিয়া রাখিতে পারা যায় নাই।

কোয়ার্টান ম্যালেরিয়ার কথা সকলেই জানেন, সুতরাং তাহাতে এরূপ পরীক্ষার কোনো প্রয়োজন হয় নাই।

ইহাতে আমরা এইটুকু শিক্ষা পাই যে ম্যালেরিয়াকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়া দেখা যায়। প্রথম প্রকার, মারাত্মক ম্যালেরিয়া,—যাহাতে চিকিৎসা অবশ্য প্রয়োজনীয়, নতুবা প্রাণহানির সম্ভাবনা। দ্বিতীয় প্রকার, নিরাপদ ম্যালেরিয়া,—অর্থাৎ যাহা মারাত্মক নয়, যাহার চিকিৎসা না করিলে রোগী কষ্ট পাইবে কিন্তু মারা যাইবে না, বরং কতকগুলি হয়তো স্বাভাবিকরূপেই আরোগ্য হইবে।

ইহাতে মনে হইতে পারে যে কেবল মারাত্মক ম্যালেরিয়াতেই চিকিৎসা নিতান্ত আবশ্যক, আর নিরাপদ ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা না করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কার্য্যক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রোগ প্রবেশ করিলেই শরীরের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক সংগ্রাম হইতে থাকে। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধেও এরূপ সংগ্রাম হয়। তবে ব্যাক্‌টিরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যত প্রবল হয়, প্রোটোজোয়ার বিরুদ্ধে তত নয়, এবং উহার পদ্ধতিও বিভিন্ন। এ স্থলে রোগের লক্ষণ মাত্র দূর করিয়াই শরীরস্থ শক্তি সংগ্রাম স্থগিত করে (immunological change up to a therapeutic threshold)। অতঃপর জীবাণুর সহিত সন্ধিস্থাপনা হয়,—অর্থাৎ শরীরে জীবাণু থাকে কিন্তু রোগ থাকে না। ইহাকে বলে labile infection (immunitas non sterilisans)। কিন্তু এই সন্ধি সর্ব্বদা বজায় থাকে না,—একটু ব্যতিক্রমেই ভাঙিয়া যায়। তখন পুনরায় রোগ প্রকাশ পায় এবং শরীরকে অযথা দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। সুতরাং অনিশ্চিতের উপর কিছু নির্ভর করা যায় না, ও সেইজন্য নিরাপদ ম্যালেরিয়াতেও চিকিৎসার প্রয়োজন। চিকিৎসার উদ্দেশ্য স্বাভাবিক শক্তিকে সাহায্য করিয়া রোগকে জয় করা,—অযথা কেবল জোর

প্রকাশ করা নয়। এই সাহায্য শরীরের বল থাকিতে থাকিতে দিলে অল্পেই বেশ কাজ হয়, কিন্তু বিলম্বে বলক্ষয় হইয়া গেলে অতিরিক্ত জোর প্রকাশের প্রয়োজন হইয়া পড়ে,—কিন্তু তাহাতেও অনেক সময় উপকার না হইতে পারে।

সিন্‌কোনা ও কুইনিন

আমাদের যাবতীয় ঔষধাবলির মধ্যে সিন্‌কোনা ও কুইনিন গর্ব্ব করিবার সামগ্রী। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহা ব্যবহৃত হইয়া

সিন্‌কোনার গাছ (Cinchona succirubra) N.O. Rubiacece

আসিতেছে এবং আবিষ্কারের পর হইতে ইহা তিনশত বৎসর যাবৎ কত

দেশে কত লোকের প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এরূপ বহু-প্রচলিত ঔষধ বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। ইহার আবিষ্কারের ইতিহাস সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত।

সিন্‌কোনার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পেরু-তে (দক্ষিণ আমেরিকা)। সেখানে এই গাছ বনে জঙ্গলে স্বচ্ছন্দে ও প্রচুর পরিমাণে জন্মিত, এবং তথাকার অসভ্য অধিবাসীরা ইহা চিকিৎসার্থে ব্যবহার করিত। তাহারা আপন ভাষায় ইহাকে 'কুইনা-কুইনা' বলিত ('কুইনা'-অর্থে বক্কল, এবং 'কুইনা-কুইনা' অর্থে যে বক্কল ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই শব্দ সম্ভবতঃ গৌরবার্থে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।) সে দেশে ম্যালেরিয়ারও

সিন্‌কোনার শুষ্কপত্র
(বিলাতের মিউজিয়মে রক্ষিত)

যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল, কিন্তু ইহাকে যে কেবল ঐ প্রকার জ্বরের ঔষধ বলিয়াই তাহাদের জানা ছিল, তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তৎকালে স্পেনীয়েরা সেখানে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, জেস্যুট্ ধর্ম্মযাচকেরা তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইত, এবং তাহারাই ইহার গুণের কথা প্রথম ব্যক্ত করে। ১৬৩০ সালে ডন জোয়ান লোপেজ্ নামে একজন যাজক প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং 'কুইনা-কুইনা' বা সিন্‌কোনার ছালের ক্বাথ খাইয়া আরোগ্য লাভ করে। পরে ১৬৩৮ সালে কাউণ্টেস্ সিন্‌কন্ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন, তখন ডন্ জোয়ান তাঁহাকে এই ছাল পাঠাইয়া দেয়, তাহার ক্বাথ খাইয়া তিনিও আরোগ্য হন। ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি স্পেন দেশে যাইবার সময় ঐ ছাল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান এবং বহু লোককে উহা ব্যবহার করিতে দেন, ও অনেকেই তাহাতে উপকার পায়। ইহার পরে প্রায়ই ইহার ব্যবহার চলিতে থাকে। রবার্ট ট্যালবর (Robert Talbor) নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসক ১৬৫৫ সালে জ্বরের গুপ্ত-ঔষধ রূপে ইহাই ব্যবহার করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুইর (Louise XIV) পত্নী জ্বরে কাতর হইলে এই চিকিৎসক তাঁহাকে আরোগ্য করেন। রাজা লুই তখন এই গুপ্ত বিদ্যা বহু স্বর্ণমূল্যে তাঁহার নিকট ক্রয় করেন। ট্যালবরের মৃত্যুর পর রাজা এই ঔষধের গুপ্ত রহস্য সাধারণে প্রকাশ করেন। তখন হইতে ইউরোপের নানাস্থানে ইহার চাষ করা হইতে থাকে। কাউণ্টেস্ সিন্‌কনের নাম অনুসারে ইহার নাম দেওয়া হয় 'সিন্‌কোনা'।

ভারতে সিন্‌কোনার প্রথম ব্যবহার স্থরু হয় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে। বোগ্ (Bogue) নামক একজন বাণিজ্যজাহাজের ডাক্তার প্রথমে সিন্‌কোনার ছাল লইয়া এদেশে আসেন এবং এখানকার জ্বরে উহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পান। পরে অন্যান্য জাহাজের ডাক্তারেরা সকলেই উহা আনিতেন এবং জ্বরের চিকিৎসায় প্রয়োগ করিতেন।

১৮২০ সালে ফরাসী রাসায়নিক প'লেতিয়ের (Pelletier) সিন্‌কোনার ছাল হইতে উপক্ষার (alkaloids) আহরণ করিবার উপায় আবিষ্কার করেন এবং পেরু দেশের প্রাচীন 'কুইনা-কুইনা' নাম অনুসারে উহার উপক্ষার-বিশেষের নাম দেন 'কুইনিন'। ম্যালেরিয়াতে ইহার অধিকতর সাফল্য দেখিয়া তখন সিন্‌কোনার পরিবর্ত্তে ইহাই সাধারণে আদৃত

হয়। ১৮৪৭ সাল হইতে ভারতে রীতিমত কুইনিন ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৫২ সালে ডাচ্ ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট জাভাতে সিন্‌কোনার চাষ করিতে আরম্ভ করে। সেই অবধি জাভাতে প্রচুর সিন্‌কোনা উৎপন্ন হইতে থাকে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মারখান্ (Markhan) প্রথমে ভারতে ইহার চাষ স্থরু করেন এবং নীলগিরি, ত্রিবাঙ্কুর, লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ইহা রোপন করেন। ১৮৬৬ সাল হইতে ইহা এদেশে রীতিমত উৎপন্ন হইতে থাকে।

১৮৬৬ সালে মাদ্রাজে যে সিন্‌কোনা কমিশন বসে তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে,—সিন্‌কোনাতে যে কুইনিন, কুইনিডিন, সিন্‌কোনিন্ ও সিন্‌কোনিডিন নামক চারি প্রকার উপক্ষার পাওয়া যায়,—তন্মধ্যে কুইনিনই ম্যালেরিয়ার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। সেই অবধি সিন্‌কোনার অন্যান্য অংশ বাদ দিয়া কেবল কুইনিনের অংশটুকু বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং ম্যালেরিয়ার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়।

ইদানিং পুনরায় স্বাভাবিক সিন্‌কোনার ছালের আদর দেখা যাইতেছে, —এবং লীগ অফ নেশনস্ হইতে ইহা সর্ব্বউপক্ষার সমেত অবিকৃত রূপেই ব্যবহার করিবার নানারূপ প্রস্তাবনা হইতেছে। সিন্‌কোনা বা কুইনিন, যে রূপেই ব্যবহৃত হউক, ইহার ক্রিয়া একই প্রকারের।

কুইনিনের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। তবে কুইনিনের দোষ ও গুণ নানা প্রকার আছে, স্থতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাহার আলোচনা না করিলে উহার উচিত মূল্য উপলব্ধি করা যাইবে না।

কুইনিনের গুণ

কুইনিন দিলে ম্যালেরিয়া সারে একথা বালকেও জানে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ভাষায় যথাযথভাবে বলিতে গেলে এ কথা অনেক বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বলা প্রয়োজন, কারণ উপযুক্ত প্রয়োগের উপরই ইহার ফলাফল নির্ভর করে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত পরিমাণে, এবং

উপযুক্ত নিয়মে প্রয়োগ করিলে ইহা ম্যালেরিয়াতে অব্যর্থ। উপযুক্তভাবে কুইনিন প্রয়োগ সত্ত্বেও ম্যালেরিয়ার জ্বর গেল না, বা উহার উপসর্গ দূর হইল না, এমন হয় না। রোগ যদি ম্যালেরিয়া হয় এবং রোগীর যদি জীবনীশক্তি থাকে, তবে কুইনিনের ক্রিয়া কখনো বিফল হয় না। এই জন্যই ইহাকে ম্যালেরিয়ার স্পেসিফিক্ (specific) বলা হয়। কিন্তু ইহা সর্ব্ববিষয়ে নিষ্কলঙ্ক ঔষধ নয়, ইহার ক্ষমতা কয়েক বিষয়ে সীমাবদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ম্যালেরিয়াতে ইহার ক্রিয়ার ইতরবিশেষ হইতে দেখা যায়, এবং কোন্ ম্যালেরিয়ায় ইহা কিরূপ মাত্রায় কাজ করিবে তাহা সঠিক নির্দ্দেশ করা যায় না। সেইজন্য কুইনিন সম্বন্ধে একদেশের অভিজ্ঞতা অন্য দেশের অভিজ্ঞতার সহিত সম্পূর্ণ মেলে না; এবং এই জন্যই চিকিৎসকগণের মধ্যে ইহার মাত্রাদি ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে নানারূপ মতদ্বৈধ থাকিতে দেখা যায়। লীগ অফ নেশন্স্-এর ম্যালেরিয়া কমিশনেও ইহার মাত্রাদি সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত না হওয়াতে তাঁহারা উপদেশ দিয়াছেন যে বিভিন্ন দেশের অবস্থা অনুসারে স্থানীয় চিকিৎসকগণ নিজ নিজ দেশের উপযুক্ত মাত্রাদি নিজেরাই স্থির করিয়া লইবেন। অর্থাৎ যেখানে যেমন স্থানীয় বৈচিত্র্য দেখা যাইবে, কুইনিন তাহারই উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে, তবেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে, নতুবা নয়। সেই বিচারটুকু করিতে জানাই আমাদের প্রধান আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক বলেন—"There is greater need of learning to use knowledge than to know"—অর্থাৎ বিদ্যা আয়ত্ত করার অপেক্ষা তাহা প্রয়োগ করিতে শেখাই বেশী দরকার। কুইনিন ম্যালেরিয়ার উপযুক্ত অস্ত্র বটে, কিন্তু তাহা উচিতমত ব্যবহার করিতে জানা চাই। উচিত মত ব্যবহার করা হয় না বলিয়া কুইনিন দিয়াও অনেক ম্যালেরিয়া আরোগ্য হয় না; ইহা কুইনিনের দোষ নয়, প্রয়োগের দোষ। ঔষধ জানিলেই যে রোগ সারানো যায় না, ইহাই তাহার এক দৃষ্টান্ত। কুইনিন প্রয়োগে আমাদের যে সকল দোষ হয় তাহা যদি সম্যক জানিতে পারা যায় এবং সেই দোষগুলি বাঁচাইয়া চলা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে কুইনিন সত্যই অব্যর্থ ঔষধ, ইহা কখনও নিষ্ফল হয় না।

কুইনিন নির্ব্বাচন

কুইনিনের নির্ব্বাচন লইয়া কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু মোটের উপর তাহা ভিত্তিহীন। বিভিন্ন প্রকার কুইনিনে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। **কুইনিন সাল্‌ফেটে** শতকরা ৭২·৮ ভাগ উপক্ষার বা অ্যাল্‌কালয়েড আছে। **কুইনিন হাইড্রোক্লোরাইডেও** তদ্রূপ। **কুইনিন বাইসাল্‌ফেটে** মাত্র ৫৮ ভাগ, কিন্তু **কুইনিন বাইহাইড্রোক্লোরাইডে** শতকরা ৭৪·৮ ভাগ উপক্ষার আছে। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে **কুইনিন বাইহাইড্রোক্লোরাইড** সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তবে **কুইনিন সাল্‌ফেটই** সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, সুতরাং সাধারণতঃ উহাই ব্যবহার করা উচিত।

কুইনিনের ক্রিয়া কিরূপে হয়

কুইনিন অ্যাসিডযুক্ত জলে গুলিয়া তরলরূপেই দেওয়া হউক, বা শুষ্ক চূর্ণরূপেই দেওয়া হউক, পাকস্থলী সুস্থ অবস্থায় থাকিলে সবই হজম হইয়া রক্তের মধ্যে যায়। পাকস্থলীতে প্রথমে উহা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত মিশিয়া গিয়া অম্লগুণযুক্ত (hydrochloride) হয়, পরে তরলরূপে অন্ত্রে গিয়া ক্ষারীয় (alkaline) অন্ত্ররসের সহিত মিলিয়া রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা কুইনিন-বেস (Quinine-base) রূপে রূপান্তরিত হয়, এবং এই অবস্থায় রক্তের মধ্যে নীত হয়। কুইনিন খাইবার ২০ মিনিটের মধ্যে ইহা রক্তে গিয়া প্রবেশ করে, কিন্তু ছয় ঘণ্টার অধিককাল রক্তের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে না। শীঘ্রই ইহার কিছু অংশ যকৃতে ও অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে গিয়া বিনষ্ট হয়, বাকী অংশ প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইতে থাকে। কুইনিন খাওয়ার অর্দ্ধঘণ্টা পরে প্রস্রাব লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাতে কুইনিন পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ২৪ ঘণ্টা পরে প্রস্রাবের মধ্যে আর উহার চিহ্ন পাওয়া যায় না। সুতরাং কুইনিন একবার যাহা খাওয়া যায় তাহা অল্পকাল মধ্যেই অধিকাংশ নির্গত হইয়া যায়। এই জন্যই কুইনিন পুনঃপুনঃ দিবার প্রয়োজন।

এই সকল কথা নির্দ্দিষ্টরূপে জানা গেলেও কুইনিনের দ্বারা ম্যালেরিয়া কিরূপে আরোগ্য হয় তাহার সঠিক সন্ধান এখনও সম্যক জানা যায় নাই। জীবাণুর পক্ষে ইহা একপ্রকার বিষ, কিন্তু ল্যাবরেটরিতে যতটা মাত্রায় উহারা মরিবে দেখা যায়, সেই পরিমাণ অনুসারে মানুষের শরীরের মধ্যে উহাদের মারিবার জন্য হিসাবমত যতটা কুইনিন দেওয়া আবশ্যক (প্রতি ৮০০ ভাগ রক্তে এক ভাগ কুইনিন, অর্থাৎ একজন মানুষকে এককালীন ৩৫০ গ্রেন কুইনিন প্রয়োগ করা)—এতটা কুইনিন বস্তুতপক্ষে একদিনে কাহাকেও খাওয়ানো অসম্ভব।

তবে কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রত্যহ মাত্র ২০ গ্রেন কুইনিন দিলেই রক্তমধ্যস্থ জীবাণু ২।৩ দিনের মধ্যে অদৃশ্য হয় এবং রোগও আরোগ্য হয়। ইহার কারণ সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে এই মাত্রায় জীবাণুগুলি তৎক্ষণাৎ না মরিলেও প্রতিবারের জীবনচক্রে উহাদের সদ্যমুক্ত মেরোজয়েটগুলি যেমনি কণিকার আশ্রয় ছাড়িয়া বাহিরে আসে, অমনি কুইনিনের সংস্পর্শে সেগুলি নিশ্চল ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, সুতরাং পুনরায় নূতন কণিকার ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে কুইনিন শরীররসের সহিত মিলিয়া *টিস্যু-কুইনিন* (tissue-quinine) প্রস্তুত করে, তখন উহা সাধারণ কুইনিন অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী হইয়া উঠে। কোনো কোনো ফরাসী পণ্ডিত বলেন যে কুইনিন radio-active পদার্থ, অর্থাৎ রেডিয়ামের মত গুণের দ্বারা ইহা শরীরকোষগুলিকে অনুপ্রাণিত করে, তাহাতেই জীবাণুগুলি মরে। কুইনিন জলে গুলিলে একরূপ নীলাভ তরলজ্যোতিঃ (fluorescence) দেখা যায়, তাহাতেই বুঝা যায় ইহার radio-activity আছে। সম্প্রতি Muhlens, Nocht প্রভৃতি জার্ম্মান পণ্ডিতও বলিতেছেন যে কুইনিন প্রত্যক্ষভাবে কিছু করে না, শরীরে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তাহাকেই ইহা সাহায্য করে এবং অধিক ক্ষমতাপন্ন করিয়া দেয় (mobilizes and strengthens the means of defence), এবং তদ্দ্বারাই জীবাণুর নাশ হয়। যেভাবেই হউক উচিত মাত্রায় কুইনিন প্রয়োগের ফলে শরীরমধ্যস্থ জীবাণু যে অধিকাংশ মরিয়া যায় ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

তবে সব জীবাণু ইহাতে মরে না এবং জীবাণুর সকল অবস্থার উপর ইহার ক্রিয়া নাই। কেবল **মেরোজয়েট্** ও **ট্রোফোজয়েট্** অবস্থায় যেগুলি থাকে সেইগুলিই মরে, এবং যখনই উহারা ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয় কেবল তখনই মরে। যেগুলি বীজ বা গ্যামেটোসাইট্‌রূপে রূপান্তরিত হয়, কুইনিন সেগুলিকে কোনোমতেই নষ্ট করিতে পারে না। অপিচ, স্পোরোজয়েট অবস্থায় যখন ইহারা মশার শরীর হইতে মানুষের রক্তে প্রথম উপস্থিত হয়, সে অবস্থায়ও উহাদের উপর কুইনিনের কোনো ক্রিয়া নাই। অতএব প্রথম যখন ম্যালেরিয়ার তরুণ জীবাণু রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, আগে হইতে তথায় কুইনিন উপস্থিত থাকিলেও সেগুলি মরে না, আবার শেষে যখন ইহারা পুনরায় বীজে পরিণত হইয়া মশার পেটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, কুইনিন সেগুলিকেও মারিতে পারে না। কেবল মধ্যজীবনে ইহাদের যে সকল পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা ঘটে, সেই অবস্থাতেই ইহারা কুইনিনের দ্বারা বিনাশ পায়। এইরূপে কুইনিনে ম্যালেরিয়ার রোগটুকু আরোগ্য করে মাত্র, কিন্তু ম্যালেরিয়া হওয়া নিবারণ করিতে পারে না।

কুইনিনের দ্বারা উপকার পাইতে হইলে এই দুই কথা বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক। প্রথম কথা,—**কুইনিন খাইবার ৬ ঘণ্টা পরে ইহা রক্তের মধ্যে আর থাকে না।** দ্বিতীয় কথা,—**মেরোজয়েট ও ট্রোফোজয়েট ছাড়া অন্য কোনো অবস্থার জীবাণু ইহাতে মরে না।** অতএব ইহার দ্বারা কাজ পাইতে হইলে সময়ের এমন হিসাব করিয়া কুইনিন প্রয়োগ করা দরকার, যে কণিকামুক্ত সদ্য মেরোজয়েটগুলি যখন আশ্রয়হীন রূপে বাহির হইবে ঠিক সেই সময় কুইনিন রক্তের মধ্যে পূরামাত্রায় বর্ত্তমান থাকিবে। এই হিসাবে দিতে হইলে কম্প দিয়া জ্বর আসিবার দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কুইনিন খাওয়ানো উচিত। কিন্তু জ্বর আসার সময়টি আগে হইতে জানা সর্ব্বদা সম্ভব নয়, এবং মেরোজয়েট-মুক্তিও সর্ব্বদা নিয়মিত হয় না—বিশেষতঃ ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে উহা নিত্যই ঘটিতে থাকে। এই জন্য রোগের কয়েকদিন যাহাতে সর্ব্বদাই রক্তের মধ্যে কুইনিন বিদ্যমান থাকে এরূপ ব্যবস্থা করাই ভাল। Nocht সেই জন্য নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর তিন

গ্রেন মাত্রায় বরাবর কুইনিন দিতে থাকিবে। কিন্তু ইহাতে রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পারে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অসুবিধা হইতে পারে। সেই জন্য এখন কার্য্যোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া লওয়া হইয়াছে যে **৬ ঘণ্টা অন্তর চারবার** অথবা **৮ ঘণ্টা অন্তর তিনবার** করিয়া প্রত্যহ কুইনিন দেওয়া হইবে। ইহাতে প্রায় সর্ব্বদাই রক্তের মধ্যে কুইনিন মজুত থাকিতে পারে।

কুইনিনের দোষ

কুইনিন উৎকৃষ্ট ঔষধ হইলেও আদর্শ ঔষধ নয়। অতীত কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইহা ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ রূপেই চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক কাল পর্য্যন্ত ইহার আদর অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কিন্তু তথাপি আদর্শ-ঔষধ বলিতে কুইনিনের নাম করা যায় না। সিন্‌টন্ (Sinton) বলিয়াছেন ম্যালেরিয়ার যে **আদর্শ-ঔষধ** হইবে তাহার এই সকল গুণ থাকা দরকার—

(১) উহা ব্যবহার মাত্রে রোগের আশু নিবৃত্তি হইবে, এবং জীবনের আশঙ্কা দূর হইবে।

(২) উহা রোগীর কোনোপ্রকার অনিষ্ট করিবে না।

(৩) উহা জীবাণুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিবে, কিংবা অন্ততঃ এমন ভাবে নিস্তেজ করিয়া ফেলিবে যাহাতে পুনরায় তাহাদের দ্বারা কখনো রোগলক্ষণ প্রকাশ পাইতে না পারে। উহাতে জীবাণুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার গ্যামেটোসাইট বা বীজগুলিও নষ্ট হইবে, সুতরাং যে রোগী একবার আরোগ্য হইল তাহার রক্ত হইতে মশার দ্বারা আর ঐ রোগ সংক্রামিত হইতে পারিবে না।

(৫) উহা সকল ম্যালেরিয়াতেই সমানভাবে কাজ করিবে, এবং ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে কোন-জাতীয় ম্যালেরিয়া হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার অথবা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

(৬) ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলেই উহা নিশ্চিন্তরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে এবং সকলের পক্ষেই উহা সুলভ হইবে। উহা খাইতে

কটু হইবে না, ব্যবহারে আশঙ্কার কিছু থাকিবে না,—এবং জরও যখন ছাড়িবে সেই সঙ্গে রোগও একেবারে সারিয়া যাইবে, পুনরায় আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকিবে না।

কুইনিন এই সকল সর্ত্তের কোনোটাই সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে পারে না। কেবল কুইনিন কেন, আজকাল যে দুইটি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলিও সম্পূর্ণরূপে পারে না। এমন ঔষধ যদি পাওয়া যায় যাহা অল্প দিনে অল্লায়াসে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ও তাহার বীজ একসঙ্গে নিঃশেষে নাশ করিতে পারে, তবে তাহার সার্ব্বজনীন প্রয়োগের দ্বারা দেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত এককালীন ম্যালেরিয়াশূন্য করিয়া ফেলিতে পারা যায়। সকলেই জানে যে ম্যালেরিয়া একবার মাত্র সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে পারিলে আর তাহার পুনঃপ্রকাশ সম্ভব নয়,—এবং ম্যালেরিয়ার বীজ যদি কোথাও না থাকে তবে আর মশার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার কোনো দরকার হয় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও ম্যালেরিয়া কমাইতে পারা যাইতেছে না,—তাহার এক প্রধান কারণ আদর্শ-ঔষধ এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই।

আদর্শ-ঔষধের যে ছয়টি সর্ত্ত উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহার সহিত একে একে মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে কুইনিনের কি কি দোষ আছে :—

(১) কুইনিন ব্যবহার করিলেই রোগের আশু নিবৃত্তি হয় কিন্তু তাহা সর্ব্বদা নয়; মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে তখন ইহার ক্রিয়া নিষ্ফল।

(২) ইহা সুখসেব্য ঔষধ নয়, বরং যথেষ্ট কষ্টদায়ক। বিনা উপসর্গে এবং স্বচ্ছন্দভাবে ইহা রোগ সারাইতে পারে না। কুইনিন খাইলেই মাথা ঘোরে, কানে তালা লাগে, মুখ বিস্বাদ হইয়া যায়, কাহারো কাহারো বমি হইতে থাকে, শরীরে নানারূপ অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে। সুতরাং প্রাণের দায়ে প্রথমে তিক্ত ঔষধ খাইতে হইলেও জর ছাড়িবার পর ইহা খাইতে আর কেহ রাজি হয় না। ইহাতে রোগের যন্ত্রণা আরোগ্য করিতে গিয়া অনেক সময় ঔষধের যন্ত্রণা বিষম হইয়া পড়ে, অনেকের কুইনিন খাইয়া নানারূপ নূতন উপসর্গ হইতে দেখা যায়,—কখনো বা রক্তপ্রস্রাব প্রভৃতিও হইতে দেখা যায়। ব্ল্যাক্‌ওয়াটার-ফিবার প্রসঙ্গে সে কথার আলোচনা

হইবে। কুইনিন যে protoplasmic poison,—অর্থাৎ জীবকোষ সমূহের অনিষ্টকারী,—এ কথা সকলেই জানেন। সুতরাং কিছু অধিক কুইনিন ব্যবহার করিলেই শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রক্তশূন্যতা আসিয়া পড়ে।

(৩) ইহা সমস্ত জীবাণুকে নাশ করিতে নিশ্চয়ই পারে না,—সেই জন্য ইহার প্রয়োগ সত্ত্বেও অনেকেরই ফিরিয়া ফিরিয়া জর আসিতে থাকে।

(৪) কুইনিন ম্যালেরিয়ার বীজ (gamates) নাশ করিতে একেবারেই অক্ষম,—সেই জন্য ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ইহার দ্বারা নিবারিত করা যায় না। কুইনিন খাইয়া যাহার জর বন্ধ হইয়াছে, তাহারও রক্তে বীজ থাকে, ও সেই বীজ মশার পেটে গিয়া নূতন জীবাণুর সৃষ্টি করিতে পারে।

(৫) কুইনিন সকল প্রকার ম্যালেরিয়াতে সমান কাজ করিতে পারে না। ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে ইহা খুব উৎকৃষ্ট ঔষধ,—কিন্তু বিনাইন টার্শিয়ান্‌ ম্যালেরিয়াতে ইহার ক্ষমতা তেমন বেশী নয়, কোয়ার্টান ম্যালেরিয়াতে আরো কম। সেই জন্য শেষোক্ত দুই প্রকার ম্যালেরিয়া কুইনিন খাওয়া সত্ত্বেও একেবারে যাইতে চায় না। তখন কুইনিন ব্যতীত অন্যান্য ঔষধের সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয়।

(৬) কুইনিন সকলের পক্ষে এখনও সুলভ নয়। ম্যালেরিয়ার জন্য ইহা যে নিয়মিত পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজন,—তাহা কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য সকলের নাই। দাম বেশী বলিয়া, এবং উপযুক্ত মাত্রার ঔষধ লোকে পূরা দামে কিনিতে পারিবে না বলিয়া,—অথবা কম দামে উচিত মাত্রার ঔষধ দিলে ডিস্‌পেন্‌সারির লাভ থাকিবে না বলিয়া, অনেকে অল্পমাত্রায় সস্তা দামে ঔষধ দিতে বাধ্য হন। এ দিকে দামী ঔষধ বলিয়া অনেক কম্পাউণ্ডার হয়তো লোভ সামলাইতে পারে না,—প্রেস্‌ক্রুপশনের মাত্রা অপেক্ষা কম পরিমাণে ঔষধ সরবরাহ করে। দাতব্য ঔষধালয় গুলিতে তদ্বির করিয়া অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে কুইনিন-মিকশ্চারে যতটা করিয়া কুইনিন থাকার কথা, বস্তুতঃ তাহার অর্দ্ধেকও থাকে না। অথচ কুইনিনের সাফল্য কেবল তাহার মাত্রার উপরই নির্ভর করে।

কুইনিন মহার্ঘ্য হইবার বিশেষ কারণ আছে। যতটা কুইনিন সর্ব্বদেশের জন্য প্রয়োজন ততটা কুইনিন পৃথিবীতে জন্মায় না, সেই জন্যই উহা

মহার্ঘ্য। সিন্‌কোনার চাষ করিয়া যাহারা কুইনিন প্রস্তুত করে তাহারা চাহিদা বুঝিয়া উহার মূল্য ধার্য্য করে। লীগ অফ নেশন্‌স্‌ হইতে হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে ম্যালেরিয়ার উপযুক্ত চিকিৎসা করিবার জন্য পৃথিবীতে প্রতি বৎসর **১৩৭৭ টন্ কুইনিন আবশ্যক**,—অথচ প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীতে বাৎসরিক **মাত্র ৬০০টন্**—অর্থাৎ প্রয়োজনের অর্দ্ধেকেরও কম পরিমাণে উহা সরবরাহ হয়।

কুইনিন একে তো মহার্ঘ্য, তাহাতে আবার কটু। সুতরাং যদি বা উহা উচিত মাত্রায় রোগীর কাছে গিয়া পৌছায়, তো পেটে গিয়া পৌছায় না। কত সময় রোগী ইহা খাইয়া বমি করিয়া ফেলে, অথবা না খাইয়াই ফেলিয়া দেয়। অনেক সময় তিনবার খাওয়ার স্থলে একবার মাত্র খাইয়া জিজ্ঞাসিত হইলেও মিথ্যা কথা বলে। কুইনিন খাইয়াও যে ম্যালেরিয়ার জর বন্ধ হয় না, অধিকাংশ স্থলে এই সমস্তই তাহার কারণ। জেলের কয়েদীদের ম্যালেরিয়া কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না,—তাহার কারণ সেখানে কোনোরূপ ফাঁকি চলে না, ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উচিতমাত্রায় কুইনিন খাওয়াইয়া থাকেন। কিন্তু বাহিরে সাধারণের মধ্যে এরূপ জবরদস্তি চলিতে পারে না, এবং যে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য এত বেগ পাইতে হইবে তাহা আদর্শ-ঔষধ বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না।

কুইনিনের এতপ্রকার দোষ থাকিলেও ইহা নিষ্ফল ঔষধ নয়। জীবাণুর আক্রমণ হিসাবেই যদি ম্যালেরিয়াকে রোগ বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং যতদিন পর্য্যন্ত একটিও জীবাণু অবশিষ্ট রহিল ততদিন পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া আরোগ্য হইল না বলিয়া বিচার করেন,—তবে স্বীকার করিতে হইবে কুইনিন ম্যালেরিয়ার সেরূপ অব্যর্থ ঔষধ নয়। কিন্তু ম্যালেরিয়ার **জ্বরকে** যদি ম্যালেরিয়া-রোগ বলিয়া ধরেন, তবে বলিতে হইবে কুইনিন তাহার পক্ষে অব্যর্থ, কারণ কুইনিনে ম্যালেরিয়ার জ্বর নিশ্চয় বন্ধ হইবে। পুনরায় যদি জ্বর হয়, পুনরায় কুইনিনের দ্বারা তাহা বন্ধ হইবে। কুইনিনের ক্রিয়া কখনো এ-বিষয়ে ব্যর্থ হয় না। রোম দেশে একপ্রকার ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার কথা শুনা যায়, কুইনিনে তাহা নাকি বশ মানে না (Quinine resistant)। কিন্তু এ দেশে সেরূপ ম্যালেরিয়া নাই। এদেশের

ম্যালেরিয়া কুইনিনে নিশ্চয়ই সাড়া দিবে। তবে কুইনিনের ফল পাইতে হইলে কেবল প্রেস্ক্রিপশন লিখিয়া দিলেই চলিবে না; ঠিক মাত্রায় কুইনিন দেওয়া হইল কিনা, উচিত মাত্রায় তাহা খাওয়া হইল কিনা, তাহা পেটে গিয়া রহিল কিনা, ও রক্তের মধ্যে পৌছিল কিনা,—এ সব খবরও রাখিতে হইবে। কুইনিন-চিকিৎসার আসল রহস্য এখানেই।

কুইনিনের মাত্রা সম্বন্ধে বিচার করিবার পূর্ব্বে ম্যালেরিয়াকে দুইভাগে ভাগ করিয়া লইতে হইবে, **তরুণ ম্যালেরিয়া** ও **পুরাতন ম্যালেরিয়া**। কারণ তরুণ ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ও পুরাতন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় কিছু পার্থক্য আছে। পুরাতন ম্যালেরিয়ার কথা পরে স্বতন্ত্ররূপে বলা হইবে।

কুইনিনের মাত্রার কথা

কুইনিনের মাত্রা সম্বন্ধে কোনো নির্দ্ধারিত নির্দ্দেশ দেওয়া যায় না, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা স্থির করিয়া বলা বড় কঠিন। ইহা অল্প মাত্রায় দিলে ম্যালেরিয়া সারে না, এবং অধিক মাত্রায় দিলে অনিষ্ট করে। অতএব দুইয়ের মাঝামাঝি কতকটা সীমা বজায় রাখিয়া কুইনিন প্রয়োগ করিতে হয়,—এবং তাহারই কম-বেশী লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়। এই মতান্তরের **নিম্নসীমা দৈনিক ১৫ গ্রেন,** ও **উর্দ্ধসীমা দৈনিক ৩০ গ্রেন**। অর্থাৎ এই ১৫ গ্রেন হইতে ৩০ গ্রেনের মধ্যেই সকলে নিজ নিজ মত অনুসারে একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা স্থির করিয়া লন। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে এই সীমার মধ্যে থাকিয়া যিনি একটু অধিক মাত্রায় কুইনিন দেন তাঁহার কাছেও ম্যালেরিয়া সারে, যিনি কিছু কম মাত্রায় দেন তাঁহার কাছেও সারে,—হয়তো দুই একদিনের আগুপিছু হইতে পারে মাত্র। প্রথম আক্রমণটি এইরূপে সারিয়া গিয়া ম্যালেরিয়ার দুইরূপ পরিণতি ঘটে; কতকগুলি ম্যালেরিয়া একেবারে সারিয়া যায়, আর কতকগুলি কিছুদিন পরে আবার ফিরিয়া দেখা দেয়। চিকিৎসক তখন পুনরায় কুইনিন দেন, তাহাতে পুনরায় উহা আরোগ্য হয়, কিন্তু অল্প কয়েকজনের তাহা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ জ্বর আসিতে থাকে। রীতিমত কুইনিন ব্যবহারে অনেকেরই রোগ ভাল হইয়া যায়, কেবল অল্প কয়েকজন

চিকিৎসা সত্ত্বেও বহুকাল যাবৎ ভুগিতে থাকে। ইহা দেখিয়াই কুইনিনের গুণ সম্বন্ধে এবং মাত্রা সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের উদয় হয়। অনেকে ইহাতে মনে করেন যে প্রথম হইতে আরো অধিক মাত্রায় কুইনিন দিলে বোধ হয় এরূপ হইতে পারিত না।

এখানে এই কথাটি বুঝিতে হইবে যে কুইনিন কেবল নিজস্ব শক্তিতে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর ধ্বংস করে না, উহার সাহায্য পাইয়া মানুষের আপন শক্তিই তাহাদের ধ্বংস করে। সুতরাং যাহার শরীরে সে তেজ আছে, উপযুক্ত মাত্রার কুইনিনের দ্বারাই তাহার ম্যালেরিয়া একেবারে সারে, আর যাহার তাহা নাই তাহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় দিলেও রোগ সম্পূর্ণরূপে সারে না, বরং উহাতে অনিষ্ট করে। এমন অবস্থায় কুইনিনের লঘিষ্ট উপকারী মাত্রা কি, স্থান কাল পাত্রের হিসাব করিয়া তাহাই নির্ণয় করিয়া লওয়া উচিত, এবং সে মাত্রা অতিক্রম করা উচিত নয়। ইহাতে শরীরকে আপন ক্ষমতা প্রয়োগের উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয়। কুইনিনের বিশিষ্টতা এই যে ইহা অল্প মাত্রায় দিলেও দোষ, অধিক মাত্রায় দিলেও দোষ, সুতরাং ঠিক মাত্রাটি দেওয়া চাই। অল্পমাত্রার দোষ এই যে তাহাতে জীবাণু-গুলিকে কুইনিন সহ্য করিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া হয়। আর অধিক মাত্রার দোষ এই যে তাহাতে শরীরের স্বাভাবিক ক্ষমতাটুকু নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। দুই দিক বিবেচনা করিয়া উহার উচিত মাত্রা কতটুকু তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমাদেরই হাতে। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে বিভিন্ন মাত্রার নির্দ্দেশ করেন। সকলের কথা শুনিয়া এবং স্থানীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আমাদের পক্ষেও মাত্রা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া রাখা প্রয়োজন।

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ জেম্‌স্ (James) বলেন, প্রত্যহ **৩০ গ্রেন মাত্রায় সাতদিন** কুইনিন দিয়া পরে উহা **১০ গ্রেন করিয়া দুই মাস খাওয়াইলে** ম্যালেরিয়া নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। এরূপ দীর্ঘ দিন ধরিয়া কুইনিন কিন্তু আজকাল কেহই দেন না, এবং এখানকার ট্রপিক্যাল হাসপাতালেও প্রথম **এক সপ্তাহ ৩০ গ্রেন** করিয়া, এবং পরে আরো **দুই সপ্তাহ ২০ গ্রেন** করিয়া প্রত্যহ কুইনিন দিয়া তাহার পর উহা একেবারে বন্ধ

করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ **তিন সপ্তাহের চিকিৎসাই** এখানকার বর্ত্তমান বাঁধা নিয়ম।

কোল্‌মার (Kolmer) বলেন, **কুইনিনের বিষাক্ত মাত্রা** (fatal dose) **১৩০ গ্রেন,**—ইহার কম মাত্রায় এককালীন উহা খাইলে মানুষের মরিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব দৈনিক ৩০ গ্রেন মাত্রায় কুইনিন অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। তিনি আরো বলেন যে সুস্থ শরীরে যতটা কুইনিন সহ্য হয়, ম্যালেরিয়াতে তাহা অপেক্ষা বেশী সহ্য করা যায়। তাঁহার মতে সিফিলিস্‌-রোগী যেমন অনেক মার্কারি ও আইওডাইড্‌ সহ্য করিতে পারে, ম্যালেরিয়া-রোগী ও নিউমোনিয়া-রোগী তেমনি অনেক কুইনিন সহ্য করিতে পারে। প্রাচীন বিশেষজ্ঞেরা বলেন অল্প অল্প কুইনিন অনেক দিন ধরিয়া দেওয়া অপেক্ষা পূরা মাত্রায় উহা অল্প দিন দেওয়াই উত্তম। স্যর প্যাট্রিক ম্যান্‌সনের সময়ে নিয়ম ছিল,—জ্বর কমিবা-মাত্র ১০ গ্রেন কুইনিন দিয়া পরে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর প্রত্যহ চারবার কিংবা পাঁচবার কিছু আহারের পর ৫ গ্রেন করিয়া এক সপ্তাহ যাবৎ কুইনিন দেওয়া হইবে; তাহার পর দুইমাস পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া ১৫ গ্রেন কুইনিন খাইতে হইবে।

ম্যালেরিয়ার আধুনিক বিশেষজ্ঞ সিন্‌টনও মাত্রা সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলেন। তাঁহার মতে ম্যালেরিয়া সাব্যস্ত হইলেই কুইনিন **১০ গ্রেন মাত্রায় তিনবার** করিয়া পূরা এক সপ্তাহ দিতে হইবে—অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে **মোট ২১০ গ্রেন** কুইনিন দেওয়া হইবে। তিনি স্পষ্ট বলেন—"Quinine in doses of less than 20 grains daily for an adult has no curative effect in Malaria," তাঁহার অভিজ্ঞতা এই যে দৈনিক ২০ গ্রেন মাত্রাতেও ম্যালেরিয়া সারে, কিন্তু তাহার পরে যত লোকের পাল্টা-জ্বর দেখা যায়, ৩০ গ্রেন মাত্রার ব্যবহারে তাহার অর্দ্ধেকেরও কম লোকের পাল্টা-জ্বর হয়। সেই জন্যই তিনি ২০ গ্রেন অপেক্ষা ৩০ গ্রেনের পক্ষপাতী। সাতদিন এইরূপ মাত্রায় কুইনিন দিলেই শতকরা ৯০টি ম্যালেরিয়া তাহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে,—বাকী যে দশজনের জ্বর পুনরায় দেখা দিবে তাহাদের জন্য পুনরায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে,—কিন্তু আপাততঃ সাধারণ পক্ষে সাতদিনের চিকিৎসাই যথেষ্ট। তিনি বলেন কেবল সাতদিন ঐ মাত্রায় কুইনিন দিয়া চিকিৎসা একেবারে বন্ধ করা হউক। ভবিষ্যতে মাত্র দশজনের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া একশত জনের সকলকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুইনিন খাইতে হইবে, ইহা অন্যায়। শতকরা যে দশজনের ইহাতে

পুনরায় ম্যালেরিয়া দেখা দিবে,—বুঝিতে হইবে তাহারা স্বভাবতঃই ম্যালেরিয়া-প্রবণ (susceptible to malaria)। ভবিষ্যৎ ফল দেখিয়া তাহাদের বাছিয়া লওয়া যাইবে এবং পরে তাহাদের জন্য পুনরায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু বাকী সকলের জন্য এক সপ্তাহের চিকিৎসাই যথেষ্ট। অতএব পূর্ব্বে যে আমরা জানিতাম ম্যালেরিয়া হইলেই অন্ততঃ দুই মাস কুইনিন ব্যবহার করা উচিত,—সে প্রথা এখন উঠিয়া যাইতেছে। তবে এ কথা নিশ্চয় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত **২১০ গ্রেন** (অনেকের মতে ১৪০ গ্রেন) কুইনিন না পড়িল, ততক্ষণ ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হইল না।

কলিকাতা ট্রপিক্যাল্‌ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিগ' এবং রজার্স (Megaw and Rogers) তাঁহাদের নূতন পুস্তকে মাত্রা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—ভারতবাসীদের শরীরের আয়তনও কম, ওজনও অনেক কম,—সুতরাং এতখানি কুইনিন উপর্য্যুপরি দিলে তাহাদের সহ্য হইবে না। সিন্‌টনের পদ্ধতির কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যতদিন না জ্বর বন্ধ হয়, **কেবল ততদিন ১০ গ্রেন মাত্রায়** তিনবার করিয়া প্রত্যহ ৩০ গ্রেন হিসাবে কুইনিন দেওয়া হউক,—কিন্তু জ্বর **ছাড়িয়া গেলে তিনবারের পরিবর্ত্তে দুইবার** করিয়া ঐ মাত্রাতেই কুইনিন **আরো চার দিন** দেওয়া হউক। ইহার পর **সাত দিন কুইনিন বন্ধ** থাক। পুনরায় **পাঁচদিন ঐ মাত্রায় দুইবার** করিয়া দেওয়া হউক। আবার **এক সপ্তাহ উহা বন্ধ** থাক,—এবং তৃতীয় দফায় **আরো পাঁচদিন ঐ মাত্রায়** দেওয়া হউক। ইহাতে পূরা এক মাস চিকিৎসা চলিল,—মাঝে দুই সপ্তাহ কুইনিন দেওয়া বন্ধ রহিল। এই এক মাসের মধ্যে ইহাতে সর্ব্বসমেত প্রায় ৩৫০ গ্রেন কুইনিন পড়িল, কিন্তু ব্যবধান রাখিয়া দেওয়াতে ইহা তেমন কষ্টকর হইল না,—পুনরাক্রমণের সম্ভাবনাও কমিল। এই ব্যবস্থা কয়েকটি হাঁসপাতালে চলিতেছে। বলা বাহুল্য সিন্‌টনের অপেক্ষা ইহাতে মাত্রা যে কিছু কম হয় তাহা নয়,—তথাপি ইহা সত্ত্বেও ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ হওয়া একেবারে বিরল নয়। পুনরাক্রমণ হইলে আবার এইরূপ মাত্রাই পুনঃপ্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

আমেরিকাতে ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জন্য সেখানকার হেল্‌থ-বোর্ড হইতে বাঁধা আইন (Standard treatment) জারী করা আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে ম্যালেরিয়া হইলেই প্রথম তিন দিন ত্রিশ গ্রেন করিয়া কুইনিন খাইবে,—ইহাতেই

জর ছাড়িয়া যাইবে। ইহার পর প্রত্যহ শয়নকালে দশ গ্রেন করিয়া একমাত্রা কুইনিন আট সপ্তাহকাল খাইবে, একদিনও বাদ দিবে না। ইহাতে ম্যালেরিয়া একেবারে আরোগ্য হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে ভিন্ন দেশের জন্য চিকিৎসার বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা করা হয়, এবং এক দেশের মাত্রার সহিত অন্য দেশের মাত্রার মিল থাকে না।

যাহা হউক সকল দেশের বিশেষজ্ঞরা দৈনিক ৩০ গ্রেন হইতে ২০গ্রেন পর্য্যন্ত মাত্রাতেই কুইনিন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু আজকাল এই মাত্রা আরো কমাইবার পক্ষে অনেক কথা শুনা যাইতেছে। বিশেষতঃ লীগ অফ নেশন্‌স্ হইতে সম্প্রতি যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের ম্যালেরিয়াতত্ত্ববিদগণ একত্রে মিলিয়া ম্যালেরিয়া-চিকিৎসা সম্বন্ধে শেষমীমাংসা করিবার জন্য ঐ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন (Third general report of the Malaria Commission, June 1933);—তাহাতে তাঁহারা কুইনিনের মাত্রা কম করিবার কয়েকটি যুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—"It is no longer considered correct to use quinine or other specific remedy in large doses for prolonged periods, nor is it any longer considered correct to hold the view that relapses happen because patients are not treated early in the primary attack, or are not given sufficient quinine in that attack······Persons treated with large doses get no opportunity of acquiring sufficient defensive power to prevent relapses. Persons who are so treated usually relapse every month for a very long period." অর্থাৎ,—বেশীদিন বেশী মাত্রায় কুইনিন ব্যবহার করা ঠিক নয়, এবং তাহা না দিলেই ম্যালেরিয়া পুনরায় দেখা দিবে এ কথা মনে করাও ঠিক নয়। বেশী মাত্রায় কুইনিন দিলে রোগীর রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতা জন্মিবার সুযোগ পায় না, সেই জন্য যাহাদের অধিক মাত্রায় কুইনিন দেওয়া হয়, বরং তাহাদেরই জর বহুকাল ধরিয়া মাসে মাসে ঘুরিয়া আসিতে থাকে।

এই কথা বলিয়া ইঁহারা মাত্রা-নির্ণয়ের ভার শেষে চিকিৎসকের হস্তেই অর্পণ করিয়াছেন। নানা দেশে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে বিভিন্ন স্থানে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর বিষাক্ততায় (virulence) যথেষ্ট তারতম্য আছে। কুইনিনের ক্রিয়া যখন মাত্রা অনুসারেই সীমাবদ্ধ, তখন উহার মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি দেশবিশেষের ও কাল-বিশেষের জীবাণুর উপর এবং রোগীর ব্যক্তিগত শক্তির উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং এখন জানা গেল যে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাও প্রকৃতপক্ষে দেশগত ও ব্যক্তিগত সমস্যা ("the therapeutics of malaria is much more a local and individual problem than has hitherto been thought"),—অতএব কোন দেশের ও কোন রোগীর পক্ষে কত মাত্রা উপযুক্ত, তাহা স্থানীয় চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া জানিয়া লউন।

কিন্তু এ কথা ইঁহারা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে তরুণ ম্যালেরিয়াতে **সাতদিনের অধিক** পূর্ণমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, অনেক সময় পাঁচদিনও যথেষ্ট। রোগী যদি ম্যালেরিয়ার দেশে বাস করিতে থাকে এবং তাহার পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে, তথাপি ঐ সাতদিনের পর এক সপ্তাহ-যাবৎ ঔষধ বন্ধ থাকিবে। পূর্ব্বে চিকিৎসার জন্য যে মাত্রা দেওয়া হইয়াছে, এক সপ্তাহে তাহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গেলে পরে এমন মাত্রায় ঔষধ দিতে হইবে যাহাতে রোগেরও প্রতিবিধান হয়, এবং রোগীর স্বাভাবিক ক্ষমতাকে বাড়িয়া উঠিবারও সাহায্য করা হয়। এই পরের মাত্রাটি কি তাহা ইঁহারা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **প্রত্যহ ৬ গ্রেন** কুইনিনই পরবর্ত্তী চিকিৎসার পক্ষে উপযুক্ত মাত্রা। তাঁহারা বলেন, আরোগ্যের পর এক সপ্তাহ বাদ দিয়া, যতদিন ম্যালেরিয়ার দেশে বাস করিবে ততদিন প্রত্যহ ৬ গ্রেন করিয়া কুইনিন খাইবে, এবং সে দেশ ত্যাগ করিয়া গেলেও কতকদিন পর্য্যন্ত উহা খাইবে। ইহা সত্ত্বেও যদি দুই একবার ম্যালেরিয়া হয়, তাহাতে ভয়ের কিছু নাই। ঐ মাত্রার কুইনিন ম্যালেরিয়া জীবাণুগুলিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিতে পারিবেই না, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে জীবনীশক্তিকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও বিজয়ী হইতে সাহায্য করিবে। এইরূপে রোগী ক্রমে ক্রমে ম্যালেরিয়া সহ্য করিবার নিজস্ব শক্তি অর্জ্জনের অবসর পাইবে।

এখানে কুইনিনের মাত্রা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সমস্তই তরুণ ম্যালেরিয়ার জন্য। পুরাতনে ভিন্ন ব্যবস্থা। কিন্তু পুনরাক্রমণের চিকিৎসাতেও ইহারা সাতদিন ঐ মাত্রায় পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন। এ স্থলে ইহারা কুইনিনের বদলে নূতন ঔষধ প্রয়োগ করিতেও উপদেশ দেন। সে সকল কথা ভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইবে।

কুইনিনের মাত্রা সম্বন্ধে অভিমতের আরো অনেক বৈষম্য আছে, আমরা কেবল কয়েকটি বাছা বাছা অভিমত এখানে দিলাম। বলা বাহুল্য কাহারো অভিমত যুক্তিহীন নয়, এবং কেহই মনগড়া মত ব্যক্ত করেন নাই, বহু পরীক্ষার দ্বারা যিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। তবে সকল দিক দেখিয়া বিচার করিলে এই কথাই মনে হয় যে লীগ অফ নেশন্‌স্‌-এর যে আধুনিক অভিমত তাহাই সকলের গ্রহণ করা উচিত। **প্রথমতঃ—দৈনিক ৩০ গ্রেন মাত্রা বর্জ্জন করিয়া ২০ গ্রেন মাত্রাই ধার্য্য করা উচিত।** আমাদের দেশের দুর্ব্বল লোকের পক্ষে **১৫ গ্রেন মাত্রাও চলিতে পারে,** কিন্তু তাহার কমে কোনো কাজ হইবে না। **দ্বিতীয়তঃ—সাতদিনের অধিক ঐ মাত্রায় কুইনিন দিবার আর প্রয়োজন নাই। তৃতীয়তঃ—ভবিষ্যৎ ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য প্রত্যহ ৬ গ্রেনের অধিক কুইনিন খাইতে হইবে না।** আর শেষ কথা এই যে **কুইনিনের মাত্রা ও প্রয়োগকালের কোনো বাঁধাবাঁধি সীমা নির্দ্দেশ করা চলিবে না।** চিকিৎসক নিজের রোগীর উপযুক্ত মাত্রাদি নিজে ঠিক করিয়া লইবেন। মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে চিকিৎসার আরম্ভে প্রত্যহ ২০ গ্রেন করিয়া এক সপ্তাহে **১৪০ গ্রেন** কুইনিন দেওয়া হউক। তাহার পর এক সপ্তাহ উহা বন্ধ থাক। তাহার পর হইতে যতদিন না ম্যালেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয় ততদিন প্রত্যহ ৬ গ্রেন মাত্রায় কুইনিন চলুক। অবশ্য ম্যালেরিয়ার ভীষণ মহামারীর স্থলে এইরূপ মাত্রায় কুলায় না, তখন মাত্রা ডবল করিয়া দিবারও প্রয়োজন হইতে পারে। ঐরূপ স্থলে Deeks প্রত্যহ ৬০ গ্রেন পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রথম ২।৩ দিন কুইনিন দিয়া আগে জ্বর

বন্ধ করেন, পরে আরো দুই সপ্তাহ উহা অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তিনি বলেন ইহা ছাড়া তখন উপায় থাকে না।

শিশুদের মাত্রা

ছেলেদের পক্ষে কুইনিনের মাত্রা কিছু কম হইবে, কিন্তু অন্যান্য ঔষধের সম্বন্ধে বয়স অনুসারে মাত্রা কমাইবার যে নিয়ম, কুইনিনের সম্বন্ধে সে নিয়ম খাটিবে না। রোগী ক্ষুদ্র হইলেও তাহার শরীরে যে ম্যালেরিয়া ঢুকিয়াছে তাহা ক্ষুদ্র নয়, বরং আরো মারাত্মক। শিশুর শরীরে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর সংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে। শিশুর তরুণ রক্তে বয়স্কদের মত পূর্ব্ব হইতে ম্যালেরিয়া ধাতস্থ হয় নাই, সুতরাং ম্যালেরিয়ার দেশে নূতন আগন্তুক আসিলে যে অবস্থা হয়, ইহাদেরও সেই অবস্থা। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে শরীরে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করিবার শক্তি জন্মায় না, সুতরাং ম্যালেরিয়ার কোনো ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিতে হইলেও ছয় বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুকে দিয়াই তাহা পরীক্ষা করা হয়। অর্থাৎ এই বয়সে শরীরের পক্ষ হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না; একমাত্র ঔষধের জোরেই রোগ আরোগ্য করিতে হয়। এই কথা বিবেচনা করিয়াই এখানে কুইনিনের মাত্রা স্থির করিতে হইবে।

শিশুরা বয়স্কদের অপেক্ষা সহজে কুইনিনের ক্রিয়া সহ্য করিতে পারে। তবে তিক্ত খাইতে পারে না বলিয়া নিতান্ত শিশুদের জন্য কুইনিনের পরিবর্ত্তে ইউকুইনিন্ বা এরিষ্টোচিন্ (aristochin) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জেম্‌স্ শিশুদের জন্য এইরূপ মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন :—

১ বৎসরের ছেলে—১½ গ্রেন মাত্রায় ইউকুইনিন প্রত্যহ চারিবার।
(দৈনিক মোট ৬ গ্রেন)

২ বৎসরের ছেলে—৩ গ্রেন মাত্রায় ইউকুইনিন চারিবার।
(দৈনিক মোট ১২ গ্রেন)

৩ হইতে ৫ বৎসরের ছেলে—৫ গ্রেন মাত্রায় ইউকুইনিন চারিবার।
(দৈনিক মোট ২০ গ্রেন)

৫ হইতে ৭ বৎসরের ছেলে—প্রত্যহ ২৪ গ্রেন ইউকুইনিন, অথবা ১২ গ্রেন কুইনিন।

১০ বৎসরের ছেলে—প্রত্যহ ১৫ গ্রেন কুইনিন।

১২ বৎসরের অধিক বয়স্কদের—পূর্ণমাত্রা।

পাঠক দেখিবেন এক বৎসরের শিশুর জন্য যে মাত্রা, দুই বৎসরের শিশুর তাহা হইতে দ্বিগুণ, তিন বৎসরের শিশুর প্রায় চারি গুণ। বয়সের সঙ্গে মাত্রা একটু-একটু বাড়িবে না, একেবারে অনেকটা বাড়িবে, এই কথাটি বেশ করিয়া মনে রাখা উচিত। আরো দেখিবেন, কুইনিন যে মাত্রায় দেওয়া উচিত, ইউকুইনিন বা এরিষ্টোচিন তাহার ডবল দিতে হইবে। ইহার কারণ, এই সকল ঔষধে কুইনিনের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক থাকে। দ্বিতীয়তঃ এই সকল গুঁড়া খাওয়াইবার সময় সবটুকু খাওয়ানো প্রায় সম্ভব হয় না, কতক অংশ বাহিরে পড়িয়া নষ্ট হয়।

[কুইনিন-মিশ্রিত এবং তিক্ত-আস্বাদশূন্য একরূপ সিরাপও প্রস্তুত হইয়াছে, উহা লিলি কোম্পানীর **কোকো কুইনিন** (Coco-quinine, Lilly)। উহাতে আসল কুইনিন-সাল্‌ফেট অবিকৃতভাবে মিশ্রিত করা থাকে, অথচ খাইতে কিছুমাত্র তিক্ততা অনুভব হয় না। উহার প্রতি ড্রামে ২ গ্রেন করিয়া কুইনিন থাকে, তথাপি এমন ভাবে প্রস্তুত যে ছেলেরা উহা খাইতে কোনো আপত্তি করে না।]

শিশুদের ম্যালেরিয়া অবহেলার জিনিষ নয়। একবার ধরিলে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনিন দিয়াও তাহা শীঘ্র ছাড়ানো কঠিন, এবং চিকিৎসায় বিলম্ব করিলে প্রাণ-হানির সম্ভাবনা। এই কারণে এ দেশে প্রতিবৎসর শতকরা ১৫টি ছেলে কেবল ম্যালেরিয়াতেই মরে। ঔষধ দিতে কিছু বিলম্ব করিলে কিংবা অল্পমাত্রায় কুইনিন দিলেও জর হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, হঠাৎ মস্তিষ্ক-বিকার উপস্থিত হয়, তখন তাড়াতাড়ি কেবল কুইনিন ইন্‌জেক্‌শন দিলে কোনো রকমে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয়, একটু বিলম্ব হইয়া গেলে তাহাও হয় না। শিশু যতই ছোট হউক, এ সময় তাহার **ইন্‌জেকশনের মাত্রাও ৫ গ্রেন**, ইহার কমে ফল হয় না।

শিশুদের ½ গ্রেন বা ১ গ্রেন মাত্রায় ইউকুইনিন দিবার পক্ষে কোনো যুক্তিই

নাই। উহা উচিত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে কখনই কোনো অনিষ্ট হয় না, কিন্তু মাত্রা কম করিলেই এখানে প্রায় ঠকিতে হয়।

ট্রপিক্যাল হাঁসপাতালে একবার একটি তিন বৎসরের শিশু জর লইয়া ভর্ত্তি হইয়াছিল,—তাহার রক্তে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়। তাহাকে দৈনিক ৬ গ্রেন করিয়া ইউকুইনিন দিবার ব্যবস্থা হয়,—এবং এক দিন পরে তাহার জর ছাড়ে। ইউকুইনিন ঐ মাত্রায় দেওয়া সত্ত্বেও একদিন পরে তাহার পুনরায় প্রবল জর হয়, এবং অজ্ঞান হইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে বহু বহু জীবাণু দেখা যায়।

ইউকুইনিন দেওয়া সত্ত্বেও উহার মাত্রা কম হওয়ায় এ ছেলেটি যেমন মারা গেল, এরূপ ঘটনা এ দেশে নিত্যই ঘটে। পূর্ব্ব হইতে উচিত-মাত্রা প্রয়োগ করিলে ইহা হইতে পারে না।

গর্ভাবস্থায় কুইনিন

গর্ভাবস্থায় অনেকে কুইনিন দিতে ভয় পান। কিন্তু গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া হইলে কুইনিন দেওয়া আরো বেশী প্রয়োজন, নতুবা জীবাণুকর্ত্তৃক জরায়ু-পুষ্পের ভিতরকার ধমনীতে অবরোধ উপস্থিত হইয়া সন্তানের মৃত্যু বা গর্ভপাত হইতে পারে। ম্যালেরিয়াতে যে গর্ভপাতের কথা শুনা যায় তাহা কুইনিনের জন্য নয়, তাহা এই জন্য। অতএব গর্ভপাতের লক্ষণ দেখিলে তাহা কুইনিন দিবার পক্ষে অন্তরায় মনে করা উচিত নয়। তবে এস্থলে মাত্রায় প্রতিবারে ১০ **গ্রেনের পরিবর্ত্তে ৫ গ্রেন** করিয়া দিয়া প্রত্যহ দুইবারের স্থলে চারিবার প্রয়োগের দ্বারা উহার পূর্ণমাত্রা পোষাইয়া লওয়া উচিত। কুইনিনের দ্বারা জরায়ুসঙ্কোচের আশঙ্কা বিশেষ নাই; তবু যদি সন্দেহ হয় তো কুইনিনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পটাস্‌ ব্রোমাইড, কিংবা টিংচার ওপিয়াম দিলে আর সে আশঙ্কা থাকিবে না।

কুইনিনের উপকারিতা বাড়াইবার উপায়

কুইনিন পূর্ণ মাত্রায় দিলেও সকল সময় আশু উপকার পাওয়া যায় না। কখনও অতি সত্বর উহাতে উপকার হয়, কখনও বিলম্বে। ইহার

কারণ কুইনিন দিলেই তাহা সর্ব্বদা হজম হয় না, ইহা হজম হইবার কয়েকটি অন্তরায় আছে। কুইনিন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অন্তরায়গুলি দূর করিতে হয়, তবেই উহার দ্বারা সম্পূর্ণ কাজ পাওয়া যায়। অতঃপর সেই সকল উপায় বিবৃত হইল।

(১) সকলেই জানেন কুইনিন,—বড়ি, ট্যাবলেট, বা গুঁড়া আকারে দিলে অনেক সময় পেটে গিয়া গলে না। চিনি মাখানো কুইনিনের বড়ি কখনো কখনো মলের সহিত অভঙ্গ অবস্থায় বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। কুইনিন গলাইবার জন্য কিছু অ্যাসিডের আবশ্যক,—পেটে সব সময় তাহা উপস্থিত না থাকিতে পারে। এই জন্যই এত কটু ঔষধ হইলেও ইহা বড়িরূপে না দিয়া মিকশ্চার করিয়া দিবার প্রথা প্রচলিত। জলেও কুইনিন ভালরূপে গলে না, সেই জন্য কুইনিনের সহিত কিছু অ্যাসিড দিয়া মিকশ্চার প্রস্তুত করা হয়। অনেকে এইজন্য ডাইলিউট্ সাল্‌ফিউরিক অথবা হাইড্রোক্লোরিক প্রভৃতি ধাতব অ্যাসিড (mineral acids) ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে এগুলিতে কিছু পেটের অথবা প্রস্রাবের গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া সিন্‌টন্ প্রভৃতি দেখাইয়াছেন যে ম্যালেরিয়াতে রক্তের অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ acidosis জন্মায়। এই সকল অ্যাসিডে তাহা বাড়াইবে ছাড়া কমাইবে না। সেইজন্য ধাতব অ্যাসিডের পরিবর্ত্তে কুইনিন মিকশ্চারে **উদ্ভিজ্জ অ্যাসিড** (organic acid) ব্যবহার করা উত্তম। **সাইট্রিক অ্যাসিড** (citric acid)—এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অম্লগুণসম্পন্ন হইলেও অন্ত্রমধ্যে গিয়া ইহা ক্ষাররূপে পরিবর্ত্তিত হয় (converted into carbonates) এবং সেইরূপেই রক্ত-মধ্যে নীত হয়। ইহা চূর্ণরূপে পাওয়া যায় এবং যত মাত্রায় কুইনিন, তাহার দ্বিগুণ মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে কুইনিনও উত্তমরূপে গলিয়া যায়, অথচ কুইনিনের সহিত ক্ষারগুণযুক্ত ঔষধ একই মিকশ্চারের মধ্যে এবং একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। এইজন্য **কুইনিন, সাইট্রিক অ্যাসিড ও জল,**—একসঙ্গে মিকশ্চার করিয়া দেওয়াই উত্তম ব্যবস্থা। কুইনিন মিকশ্চাররূপেই খাইতে হইবে। যিনি ইহাতে নিতান্তই নারাজ হইবেন তাঁহাকে অগত্যা বিশ্বস্ত কোম্পানীর প্রস্তুত ট্যাবলেট-

কুইনিন দিতে হইবে। বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারকের ট্যাবলেটে সুবিধা এই যে তাহার মাত্রা ঠিক থাকে, কখনো ওজনে কম হয় না। প্রত্যেকবার এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ওজনের ট্যাবলেট্ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি খানিকটা পাতিলেবুর রস জলে গুলিয়া খাওয়া যায়, তাহাতেও অনেকটা মিকশ্চার খাওয়ার কাজ হয়।

(২) কুইনিন দিবার পূর্ব্বে পেট পরিষ্কার করিয়া লওয়া চাই। আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ উদরগহ্বরে কুইনিন নিক্ষেপ করিলে তাহার অপচয় ঘটে, কারণ ঝিল্লীগাত্র সুস্থ অবস্থায় না থাকিলে কুইনিন তাহার মধ্য দিয়া হজম না হইতে পারে। জ্বর হইলে একেই আভ্যন্তরিক রস কমিয়া যায়, তাহাতে অন্ত্রগাত্রগুলি শ্লেষ্মায় আবৃত হইয়া থাকে, সুতরাং তখন এগুলি পরিষ্কার করিয়া লইয়া কুইনিন দিলে শীঘ্র কাজ হয়। অবশ্য যেখানে মারাত্মক অবস্থা, সেখানে এ সব কথা চিন্তা করিবার বা বিলম্ব করিবার অবসর থাকে না, কিন্তু যেখানে সে অবসর আছে সেখানে কুইনিনের পূর্ব্বে কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাস্তবিকই যে ইহার প্রয়োজন আছে, রোগীর জিভের অবস্থাই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সাধারণতঃ কুইনিন দিবার পূর্ব্বে ২ গ্রেন মাত্রায় **ক্যালোমেল্** দিয়া তাহার ২।৪ ঘণ্টা পর পূর্ণ মাত্রায় (৪ ড্রাম) **ম্যাগ্‌ সাল্‌ফ** দিয়া দাস্ত করাইয়া লওয়া উচিত। এই দুই জোলাপের দ্বারা অন্ত্রগাত্র হইতে জল টানিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। ইহাতে পিত্তদোষও নাশ করে, সুতরাং লিভারের ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। এইজন্য ইহাতেই রোগী অনেকটা সুস্থ বোধ করে।

লিভারের দোষ নিবারণ করাও এক প্রথম কর্ত্তব্যের মধ্যে। ম্যালেরিয়াতে একদিকে যেমন প্লীহা বাড়ে, অন্যদিকে তেমনি লিভার বিকৃত হয়। এ কথা সকলেই জানেন। ম্যালেরিয়াতে লিভারে রক্ত জমিয়া অনেক সময় দারুণ ব্যথা হয় এবং হাত দিয়া টিপিলে ব্যথা অনুভব হয়। লিভারের দোষ হওয়াতেই আবার পুরাতন ম্যালেরিয়া নূতন করিয়া ফুটিয়া ওঠে, ইহাও প্রায় দেখা যায়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যাহাদের পুনঃ পুনঃ জ্বর হয় তাহাদের লিভারের দোষ প্রায়ই থাকে। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে যে নিত্য বমি হইতে দেখা যায়,

তাহাও পিত্তদোষের লক্ষণ। ঐ বমির মধ্যে যথেষ্ট পিত্তও থাকে। এত পিত্তের উৎপত্তি কোথা হইতে হয় তাহা পূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। ম্যালেরিয়াতে কিছু না কিছু পিত্তদোষ ঘটিবেই, এ কথা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

পিত্তদোষ নিবারণই ম্যালেরিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা, এবং সুস্থ পিত্তই কুইনিনের ক্রিয়ার প্রধান সহায়। ম্যালেরিয়া হইলেই পিত্তক্রিয়া বিকৃত হয়, এবং সর্ব্বাগ্রে তাহার নিরাকরণের উপায় না করিলে কোনো ঔষধের ক্রিয়া ভাল হয় না। আমাদের দেশে প্রাচীন বাগ্‌ভটের উক্তি আছে,—"পিত্ত ব্যতীত উষ্মা নাই, এবং উষ্মা ব্যতীত জ্বর নাই।" একথা শাস্ত্রকারেরা নিতান্ত বিনা কারণে বলিতেন না। আমরা দেখিতে পাই যে অন্ততঃ ম্যালেরিয়া জ্বর সম্বন্ধে এ কথা খুবই সত্য, এবং অনেক জ্বর সম্বন্ধেই সত্য। যাহা হউক কুইনিনের ফল পাইতে হইলে আগে পিত্তদোষ নিবারণ করিতে হইবে, ইহাই চিকিৎসার গূঢ় তত্ত্ব। **ক্যালোমেল ও ম্যাগ্‌-সাল্‌ফের** একত্র প্রয়োগের দ্বারা এই কাজ সুন্দররূপে হয়। সুতরাং ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা মাত্রেই উহা প্রয়োগ করা অতি আবশ্যক। ক্যালোমেল কেবলমাত্র বিরেচক নয়। ম্যালেরিয়াতে ইহা কুইনিনের ক্রিয়াকে যথেষ্ট সাহায্যও করে। Kolmer বলেন,—"In some unaccountable manner this drug appears to favour the absorption and activity of Quinine",—অর্থাৎ কোনো অনির্দ্দেশ্য উপায়ে ইহা কুইনিনের গুণ বাড়াইয়া দেয়।

(৩) **বমি** হওয়া ম্যালেরিয়া চিকিৎসার এক প্রধান অন্তরায়। ম্যালেরিয়াতে দুইরূপ বমি দেখা যায়। একরূপ বমি স্বতঃ-প্রবৃত্ত ভাবে হয়, তাহাতে বিনা প্ররোচনায় নিত্য নিত্য বিবমিষা ও পিত্তবমন হইতে থাকে। তাহাতে রোগীর অত্যধিক গাত্রদাহ হইতেও দেখা যায়। বিনাইন-টার্শিয়ান অপেক্ষা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতেই ইহা বেশী দেখা যায়। অনেকে বলেন রক্তের অম্লত্ব বৃদ্ধি পাওয়াতে ইহা ঘটে। কিন্তু আমাদের মনে হয় পিত্তাধিক্যই ইহার কারণ। ক্যালোমেল্‌ দিলেই ইহা নিবারিত হয়, তাহাতেই এ কথা প্রমাণিত হয়। তবে এখানে ক্যালোমেল্‌

বিরেচক হিসাবে না দিয়া অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় বমি-নিবারক হিসাবে দিতে হয়। যথা,—

প্রতি মাত্রায়—ক্যালোমেল্‌— $\frac{1}{8}$ গ্রেন
ক্লোরিটোন— ১ গ্রেন
সোডা বাইকার্ব—২ গ্রেন

একত্রে মিলাইয়া **অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর** দিতে থাকিলে, উহা ৫।৬ মাত্রা সেবনের পর হইতেই বমি বন্ধ হয় এবং গায়ের জ্বালাও নিবারিত হয়। ইহাতে যদি উপকার না হয় তবে **ভাইনাম্‌ ইপিকাক্‌** ১ ফোঁটা মাত্রায় অল্প জলের সহিত এক ঘণ্টা অন্তর ২।৪ বার দিলে বমি বন্ধ হইবে। **অ্যাড্রেনেলিন্‌ সলিউশন** ১০।২০ ফোঁটা মাত্রায় দিলেও উপকার হইতে পারে। **টিংচার আইওডিন** $\frac{1}{2}$ ফোঁটা মাত্রায় দিলেও ইহাতে কখনো কখনো কাজ হয়। এই সকল নানা উপায়ে বমি বন্ধ না করিতে পারিলে কুইনিন খাইতে দেওয়া একরূপ অসাধ্য।

আরও এক প্রকার বমি ম্যালেরিয়াতে দেখা যায়, যাহা কুইনিন খাইবামাত্রই আরম্ভ হয়, এবং কুইনিন পেট হইতে বাহির না হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত থামে না। কুইনিন না খাইলে এরূপ বমি হইবে না, অন্য কিছু খাইলেও হইবে না, কিন্তু কুইনিন যতবার দেওয়া যাইবে ততবারই উহা বমি হইবে। ইহাতে বুঝিতে হয় যে শরীরের ভিতর অম্লবৃদ্ধি হইয়াছে এবং পাকস্থলীর ভিতরকার ঝিল্লী অতিরিক্ত অম্লের দ্বারা উত্তেজিত (irritated) হইয়া আছে, তাহার উপর আবার কোনো অ্যাসিড বা তীব্র ও তিক্ত ঔষধ ধারণ করিতে উহা অক্ষম, সুতরাং ঐরূপ ঔষধ পড়িবামাত্র তাহা উদ্গীরণ করিয়া ফেলিবে। এইরূপ অবস্থায় পাকস্থলীকে প্রথমে স্নিগ্ধ করাই আবশ্যক। ক্ষার-জাতীয় ঔষধের দ্বারাই তাহা উত্তমরূপে সাধিত হয়। **সোডা বাইকার্ব** বা ঐ প্রকার অন্যান্য ঔষধের দ্বারা অতিরিক্ত অম্ল দূর হয় এবং পাকস্থলী স্নিগ্ধ হয়। যদি সোডা প্রভৃতি খাইলে তাহাও বমি হইয়া যায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, বরং ভালই হয়। কারণ এই সোডার দ্বারা পাকস্থলী ধৌত হইয়া ভিতরকার লালা ও আবর্জ্জনা বাহির হইয়া আসে। তখন সোডা পুনরায় প্রয়োগ করিতে হয়, এবং দুই তিন

বার পুনঃ পুনঃ সোডা খাওয়াইলে যখন দেখা যায় আর বমি হইতেছে না, তখন কুইনিন প্রয়োগ করা সহজ হয়। ইহাতেও যদি কুইনিন পেটে না তলায় তবে প্রতিবার কুইনিন খাওয়ার কিছু পূর্ব্বে ২০ ফোঁটা **অ্যাড্রেনেলিন** অথবা ৪।৫ ফোঁটা **ক্লোরোডাইন্** বা **টিংচার ওপিয়াম্** দিয়া তাহার পর কুইনিন দিলে বমি হইবে না।

স্বতন্ত্রভাবে সোডা দিবার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ কুইনিনের অ্যাসিড মিকশ্চারের সহিত সোডাযুক্ত অ্যাল্‌কালাইন্ মিকশ্চার একত্রে মিশাইয়া বুদ্বুদায়মান (effervescent) আকারে উহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতেও বমি না হইয়া কুইনিন পেটে থাকিয়া যাইতে পারে। এরূপ ভাবে কুইনিন দিতে হইলে দুইটি মিকশ্চার আলাদা করিয়া দিতে হয়। যথা—

১নং মিকশ্চার—	কুইনিন সাল্‌ফেট—	১০ গ্রেন
	সাইট্রিক অ্যাসিড—	২০ গ্রেন
	সিরাপ—	১ ড্রাম
	জল—	১ আউন্স
২নং মিকশ্চার—	সোডা বাইকার্ব—	১৫ গ্রেন
	সোডা পটাস্ টার্টারেট—	১৫ গ্রেন
	জল—	১ আউন্স

ঔষধ খাইবার সময় একটি কাচের গ্লাসে ১নং মিকশ্চারের সহিত ২নং মিকশ্চার মিলাইবামাত্র রাসায়নিক সংমিশ্রনের ফলে ঔষধটি ফুটিয়া ফেনা উঠিতে থাকে। ঐরূপ বুদ্বুদায়মান অবস্থায় উহা খাইয়া লইলে উহাতে যে ক্ষারীয় গ্যাস্ উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা পাকস্থলী স্নিগ্ধ হয়, ফলে ঔষধটিও পেটে থাকিয়া যায়। তবে অনেক রোগী এরূপ ভাবে কুইনিন খাইতে রাজী হয় না, কারণ ইহাতে বমি না হইলেও কুইনিনের ঢেকুর উঠিতে পারে এবং তাহা অস্বস্তির কারণ হয়।

(8) সিন্‌টনের চিকিৎসা-পদ্ধতি (Sinton's method)—ম্যালেরিয়ামাত্রে কি সর্ব্বাগ্রেই কেবল কুইনিন দিবেন? যেখানে বিপজ্জনক অবস্থা এবং ক্ষিপ্রকারিতা আবশ্যক সেখানে অবশ্য তাহাই করিতে হইবে, হয়তো সেখানে ইন্‌জেকশনও প্রয়োগ করিতে হইতে পারে, কিন্তু যেখানে এরূপ

তাড়াতাড়ি নাই, সিন্‌টন্ বলেন সেখানে আগে কয়েক মাত্রা সোডামিশ্রিত ক্ষারীয় ঔষধ প্রয়োগের পর কুইনিন দিলে উহার ফল অনেক ভাল হয়।

কুইনিনের ক্রিয়া ক্ষার জাতীয় ঔষধ প্রয়োগে বর্দ্ধিত হয় এ কথা সিন্‌টন্‌ই প্রথম বলেন। তাঁহার মতে ম্যালেরিয়াতে যে নানারূপ বিকার উপস্থিত হয় তাহা শরীরে একরূপ অম্লবৃদ্ধির (acidosis) ফল, এবং ক্ষারীয় ঔষধ এই অম্লত্ব নাশ করে; সেইজন্য ক্ষারীয় ঔষধ জরের সময় প্রয়োগ করিলে বিকারের নিবৃত্তি হয়, গাত্রদাহ দূর হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় এবং রোগী সর্ব্বতোভাবে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। যে ভাবেই হউক, অ্যাল্‌কালি (alkalies) বা ক্ষার মাত্রেই শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তিকে বাড়াইয়া দেয়। এই জন্যই ডাক্তারেরা জর হইলেই অ্যাল্‌কালাইন্ মিকশ্চার ব্যবহার করেন—(যাহাকে সাধারণতঃ আমরা 'ফিবার মিকশ্চার' বলিয়া থাকি)। জর বাড়িলে 'ফিবার মিকশ্চার' ও জর কমিলে 'কুইনিন মিকশ্চার' দেওয়ার যে পুরাতন পদ্ধতি আছে, তাহা এই হিসাবে বাস্তবিকই উপকারী। সিন্‌টন্, অ্যাকটন্, চোপ্‌রা প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বলেন যে রক্তে ক্ষারগুণ থাকিতে থাকিতে কুইনিন তথায় প্রবেশ করিলে কুইনিন-বেস্ (quinine-base) রূপে তাহা পরিবর্ত্তিত হইবার অধিক সুযোগ পায় ও তাহাতে উহার ক্রিয়া অনেকগুণ বর্দ্ধিত হয়। তদ্ব্যতীত মাথাঘোরা, কানে তালা লাগা, প্রভৃতি কুইনিনের যে সকল মন্দ লক্ষণ (cinchonism) আছে, পূর্ব্ব হইতে ক্ষারীয় ঔষধ ব্যবহারে সে গুলি অনেকাংশে নিবারিত হয়। আরো এক কথা, ক্ষারীয় ঔষধ উপযুক্তরূপে প্রয়োগের পর কুইনিন দিলে উহা অধিকাংশ লোকেরই সহ্য হয়, এবং কুইনিন খাইয়া হঠাৎ রক্ত-প্রস্রাবাদি অঘটন (ব্ল্যাক্-ওয়াটার ফিবার অথবা কুইনিন-হিমোগ্লোবিনিউরিয়া ইত্যাদি) ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই কমিয়া যায়।

ক্ষারীয় ঔষধে যে কুইনিনের ক্রিয়া বাড়ে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ অছে। পরীক্ষাকালে ১৪০০ ম্যালেরিয়া রোগীকে দুইভাগে ভাগ করিয়া সিন্‌টন্ প্রথম দলকে অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চার সহযোগে কুইনিন দিলেন, এবং দ্বিতীয় দলের জন্য শুদ্ধমাত্র কুইনিন মিকশ্চার ব্যবস্থা করিলেন। ফলে দেখা গেল প্রথম দলের

রোগীদের জ্বর যত শীঘ্র ছাড়িয়া গেল, দ্বিতীয় দলের অনেকেরই জ্বর ছাড়িতে তাহা অপেক্ষা বিলম্ব হইল, এবং তন্মধ্যে কয়েক জনের পাঁচদিন পর্য্যন্ত জ্বর ভোগ চলিল। রক্ত পরীক্ষায় দেখা গেল প্রথম দলের রোগীদের জীবাণুগুলিও শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইল। ইহা ছাড়া প্রথম দলের মত দ্বিতীয় দলের প্লীহাও তত শীঘ্র কমিল না। এই সকল পরীক্ষার দ্বারা ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণের ফলে অ্যাল্‌কালাইন ঔষধ এবং কুইনিনের মিলিত-চিকিৎসার উপকারিতা সম্বন্ধে এখন সকলেই একমত।

তবে আমরা যেরূপ ভাবে ফিবার-মিকশ্চার দিয়া থাকি সিন্‌টন্ সে ভাবে অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চার দেন না। তাঁহার ঔষধে ক্ষারের মাত্রা বেশী থাকে। তাঁহার মিকশ্চার দুইটির প্রেস্‌ক্রুপশন এইরূপ—

"এ"-মিকশ্চার—সোডা বাইকার্ব—৬০ গ্রেন
সোডা সাইট্রেট্— ৪০ গ্রেন
ক্যালসিয়ম্ ক্লোরাইড— ৩ গ্রেন
জল— ১ আউন্স।

"কিউ"-মিকশ্চার—কুইনিন সাল্‌ফেট— ১০ গ্রেন
সাইট্রিক অ্যাসিড— ৩০ গ্রেন
ম্যাগ্ সালফ্— ৩০ গ্রেন বা ৬০ গ্রেন
জল— ১ আউন্স।

মিকশ্চার দিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ তিনি ক্যালোমেল্ দিয়া চিকিৎসার স্বরু করেন। প্রথমে ২ গ্রেন ক্যালোমেল দিয়া দুই এক ঘণ্টা পরে এক আউন্স পরিমাণ ম্যাগ্ সালফ্ গরম জলের সহিত খাইতে দেন। ইহাতে উপর্য্যুপরি কয়েকবার দাস্ত হয়। তাহার পর হইতে ঔষধ স্বরু করা হয়। প্রথমে দেওয়া হয় কেবল **"এ-মিকশ্চার,"**—এক ঘণ্টা অন্তর উপর্য্যুপরি তিনবার তিন দাগ **"এ-মিকশ্চার"** পড়িয়া যাওয়ার আধঘণ্টা পরে প্রথম এক দাগ **"কিউ-মিকশ্চার"** দেওয়া হয়। এখন হইতে প্রতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বসমেত তিনবার করিয়া **"কিউ-মিকশ্চার"** দেওয়া হয়, এবং প্রত্যেক বারই উহার আধঘণ্টা পূর্ব্বে একদাগ করিয়া **"এ-মিকশ্চার"** দেওয়া হইতে থাকে। অর্থাৎ দুই ঔষধ মিলাইয়া প্রত্যহ মোট ছয়বার ঔষধ খাওয়া হয়, এবং প্রতি দাগ কুইনিনের আধ ঘণ্টা আগে আগে একদাগ করিয়া

"এ-মিকশ্চার" পড়িতে থাকে। সিন্‌টন্ বলেন নূতন ম্যালেরিয়াতে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এইরূপ চিকিৎসা চলিবে,—তাহার পর আর কোনো ঔষধের প্রয়োজন হইবে না।

পুরাতন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা ইহা অপেক্ষা কিছু স্বতন্ত্র। তাহাতে এইরূপ চিকিৎসা এক সপ্তাহ চালাইবার পর **আরো এক সপ্তাহ** অ্যাল্‌কালাইন-কুইনিন মিকশ্চার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে,—তবে দ্বিতীয় সপ্তাহে উহা দৈনিক তিনবারের পরিবর্ত্তে দুইবার করিয়া দিতে হইবে। ইহা সত্ত্বেও যে কয়েকজনের তৃতীয় দফায় ম্যালেরিয়া রিল্যাপ্স্ করিবে, তাহাদের নূতন করিয়া পুনরায় প্রথম বারের মত চিকিৎসাই করা হইবে,—কিন্তু এবার দুই সপ্তাহের পরিবর্ত্তে একাদিক্রমে তিন সপ্তাহ চিকিৎসা চলিবে। তন্মধ্যে প্রথম সপ্তাহে প্রত্যহ তিনবার করিয়া এবং পরের দুই সপ্তাহে দুইবার করিয়া ঐ মিলিত-ঔষধের প্রয়োগ করা হইবে।

আজকাল প্লাজ্‌মোকুইন্ আবিষ্কারের পর সিন্‌টন্ এই চিকিৎসার মধ্যে প্লাজ্‌মোকুইন্ যোগ করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে ⅙ গ্রেন মাত্রায় প্লাজ্‌মোকুইন্ দৈনিক মাত্র একবার করিয়া আহারের পর উপরন্ত দেওয়া হইবে, ইহা ছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ। পুরাতন ম্যালেরিয়াতে উহা কুইনিনের সঙ্গে সঙ্গে দুই সপ্তাহ যাবৎ, এবং বহু পুরাতন হইলে তিন সপ্তাহ যাবৎও চলিবে। (বলা বাহুল্য এই সকল পুরাতন ম্যালেরিয়া প্রায়ই বিনাইন-টার্শিয়ান ঘটিত।)

সিন্‌টনের প্রদর্শিত পন্থাই যে কুইনিন প্রয়োগের উৎকৃষ্ট উপায় এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাতে কেবল দুইপ্রকার প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ, ঘড়ি ধরিয়া নিয়ম করিয়া ছয়বার ঔষধ খাওয়া হাঁসপাতালে চলিতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে এরূপ নিয়ম মানা কঠিন হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সিন্‌টনের পদ্ধতিতে ঔষধের মাত্রা বড় বেশী; কুইনিনের মাত্রাও বেশী, অ্যাল্‌কালির মাত্রাও বেশী; আমাদের পক্ষে উহার মাত্রাগুলি কমাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

যাহা হউক, সিন্‌টনের নিকট আমরা এই শিখিয়াছি যে ক্ষার প্রয়োগের দ্বারা কুইনিনের দোষটুকু নাশ করে এবং গুণটুকু বাড়াইয়া দেয়। পূর্ব্বকালে

জ্বরের সময় ফিবার-মিকশ্চার ও বিজ্বরে কুইনিন-মিকশ্চার ব্যবস্থা করিয়া অজ্ঞানিত ভাবে প্রায় এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হইত। এখন জানা যাইতেছে সে পদ্ধতি উত্তম ও বিজ্ঞানসম্মত।

কুইনিনের মাত্রা সম্বন্ধে সিন্টন্ বলিয়া থাকেন যে ৩০ গ্রেনের পরিবর্ত্তে ২০ গ্রেন কুইনিন ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার রিল্যাপ্স্ বা পুনরাক্রমণের সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশী হয়,—সেই জন্যই তিনি ৩০ গ্রেনের পক্ষপাতী। কিন্তু ৩০ গ্রেনেও পুনরাক্রমণ একেবারে বন্ধ হয় না,—সংখ্যায় কিছু কমে মাত্র। আসল কথা কুইনিনের মাত্রা অধিক না বাড়াইয়া বরং স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকেই অধিক লক্ষ্য করা উচিত, স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে রিল্যাপ্স্ আপনিই নিবারিত হয়।

(৫) কুইনিনের সহিত প্রতিমাত্রায় কিছু কিছু **ম্যাগ্ সাল্ফ্** থাকিলে উহার উপকারিতা বাড়ে। প্রথমে একবার মাত্র ম্যাগ্ সাল্ফ্ বিরেচক হিসাবে দিয়া আর যদি উহা না দেওয়া হয় তবে শীঘ্রই আবার অন্ত্রগাত্রে ময়লা জমিয়া কুইনিন হজমের বিঘ্ন ঘটে। সেইজন্য কুইনিনের সহিত বরাবর কিছু **ম্যাগ্ সাল্ফ্** থাকা ভাল। ইহাতে পিত্ত তরল করে এবং তাহা কুইনিনের ক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। মিকশ্চারে প্রতিমাত্রার সহিত প্রয়োজন অনুসারে ২০ গ্রেন হইতে ৬০ গ্রেন পর্য্যন্ত উহা প্রয়োগ করা চলিবে,—কেবল রোগীর উদরাময়ের লক্ষণ দেখা গেলে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ট্রপিক্যাল্ হাঁসপাতালে যে কুইনিন মিকশ্চার ব্যবহার হয় তাহাতে ম্যাগ্ সাল্ফ প্রতিমাত্রায় ১০ গ্রেন মাত্র থাকে; উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে বিরেচন না ঘটাইয়া কেবল অন্ত্রঝিল্লী পরিষ্কার রাখিবে। সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ মাত্রাও সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৬) কুইনিন মিকশ্চারের সঙ্গে আরো একটি ঔষধ মিশানো যাইতে পারে,—**একষ্ট্রাক্ট্ ট্যারাক্সাসি লিকুইড্** (Ext. Taraxaci Liq.)। ইহা উত্তম লিভার-টনিক,—এবং পিত্ত উত্তেজনার দ্বারা কুইনিন হজম করিবার শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ম্যাগ্ সাল্ফে যাহার উদরাময় হয়, তাহার পক্ষে উহা বন্ধ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র এই ঔষধটি কুইনিন মিকশ্চারে যোগ করিয়া দিলে পিত্তের ক্রিয়া উত্তম থাকে অথচ বিরেচনের সম্ভাবনা থাকে না। ইহার মাত্রা ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা।

(৭) কেহ কেহ কুইনিনের সহিত **আর্সেনিক** মিশাইয়া দেন। আর্সেনিক ম্যালেরিয়ার বহু পুরাতন ঔষধ। ইহাতে রক্তের হানি বন্ধ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং তাহাতে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনাও কতকটা দূর হয়। লাইকার আর্সেনিক ২ ফোঁটা হইতে ৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

(৮) **টিংচার ষ্টীল** (Tinct. Ferri Perchlor.), অনেকে কুইনিন মিকশ্চারে ব্যবহার করেন। ইহাতে ম্যালেরিয়ার রক্তশূন্যতা শীঘ্রই দূর করে—কিন্তু দাস্ত কষিয়া যাইবার কিছু সম্ভাবনা আছে। মাত্রা ১০ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত।

(৯) অনেকে বলেন কুইনিনের সহিত অল্প পরিমাণে **ব্রাণ্ডি** দেওয়া ভাল। ইহাতে শরীরের কিছু শক্তি বাড়ে,—বমনেচ্ছা দূর হয়, কুইনিনের দোষ কাটে, এবং কুইনিনকে উত্তমরূপে হজম করায়। পুরাতন ম্যালেরিয়া হইলে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া এক ড্রাম মাত্রায় ইহার ব্যবহার চলিতে পারে।

(১০) কুইনিন-চিকিৎসা যখন শেষ হয়, তখন রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য, অথচ ম্যালেরিয়া-জীবাণু শরীরে নিশ্চয় কিছু অবশিষ্ট আছে। এমন অবস্থায় কুইনিনের ক্রিয়াটুকু শেষ হইলেই তাহাদের পুনশ্চ সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা। ইহাতে পুনরায় জ্বর না দেখা গেলেও রোগীকে বহুদিন যাবৎ দুর্ব্বল করিয়া রাখে। এ অবস্থায় শরীরের কিছু উন্নতি করিতে পারিলে স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা রোগের জেরটুকুও মরে, রোগীও শীঘ্র কার্য্যক্ষম হয়। এই জন্যই টনিকের প্রয়োজন। **আর্সেনিক, লৌহঘটিত ঔষধ, হিমোগ্লোবিন, লিভার একষ্ট্রাক্ট** প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যেই তখন ব্যবহৃত হয়। যাহাতে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় সেজন্য তিক্ত ঔষধ (Quassia, Gentian, Nux Vomica) প্রভৃতি, এবং হজম বৃদ্ধির জন্য অ্যাসিড (Acid Hydrochlor dil.) প্রভৃতিও টনিক হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, উপরন্তু তাহার সহিত ২।৩ গ্রেন মাত্রায় কুইনিন থাকে।

কুইনিন দিবার উপযুক্ত সময়

অনেকের ধারণা জ্বর ছাড়িলে তবে কুইনিন দিতে হয়, কারণ জ্বরের উপর কুইনিন দিলেই অনিষ্ট হইবে, অথবা জ্বর আট্কাইয়া থাকিবে।

এ সকল নিতান্ত ভিত্তিহীন কথা। জ্বরের উপর কুইনিন দিয়া কখনও সেরূপ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় নাই,—এমন কি ম্যালেরিয়া না হইলেও জ্বর অবস্থায় যদি কুইনিন দেওয়া যায়, তাহাতেও কোনো ক্ষতি হয় না। সুতরাং যেখানে রোগটি ম্যালেরিয়া বলিয়া নিশ্চিত জানা গিয়াছে, সেখানে জ্বরে বিজ্বরে সকল অবস্থাতেই নির্ব্বিবাদে কুইনিন দেওয়া চলিতে পারে। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ জেম্‌স্ এই কথাই বলেন—"Quinine should be begun immediately the diagnosis of malaria is assured, irrespective of the stage of the attack or the height of the fever." অর্থাৎ ম্যালেরিয়া নির্দ্ধারিত হইবামাত্র, রোগের যে অবস্থাই হোক বা জ্বর যতই থাকুক, তখনই কুইনিন দিবার আয়োজন করিবে। যখন রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু জ্বর একবারও ছাড়িতেছে না, তখন কি ঔষধ হাতে থাকিতে শুভক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? বিশেষতঃ যদি দেখা যায় রোগটি ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া,—(এবং এই জ্বর অবিরাম লাগিয়া থাকে)—তখন যদি কালাকাল বিচার করিতে গিয়া সময় নষ্ট করা হয়, তবে চিকিৎসকের পক্ষে তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এই প্রকারের ম্যালেরিয়াতে জীবাণুদের আবর্ত্তন-চক্র (sporulation) নিত্য চলিতে থাকে, সেই জন্য ইহাদের সংখ্যা কখন অতিরিক্ত হইয়া রোগটি বাঁকিয়া দাঁড়াইবে, পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা জানা যায় না। সুতরাং এখানে যত শীঘ্র কুইনিন দেওয়া যাইবে ততই মঙ্গল। এখানে বিলম্ব করিলেই বিপদ; কিছু পূর্ব্বে যাহা অতি সহজ, কিছু বিলম্বে তাহা অতীব দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে জ্বরত্যাগের পর কুইনিন দেওয়ার বিধি এদেশে প্রচলিত হইল কেন? তাহার উত্তর এই, যখন এ বিধি প্রচলিত হইয়াছিল, তখন ম্যালেরিয়া চেনার কোনো নির্দ্ধারিত উপায় ছিল না, আন্দাজে বুঝিতে হইত। কাজেই যতক্ষণ জ্বর থাকিত ততক্ষণ রোগ সম্বন্ধে অনিশ্চিত হইয়া কুইনিন দিতে সাহস হইত না, জ্বর ছাড়িলে বুঝা যাইত উহা নিশ্চয় ম্যালেরিয়া, তখন কুইনিন দেওয়া হইত। ইহাই

ক্রমে এমন প্রথায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে শরীরের তাপ থার্ম্মোমিটারের তীরচিহ্নের নীচে নিখুঁৎভাবে না নামিলে এখন সাধারণ লোকে কুইনিন দেওয়া মহাপাতক বলিয়া মনে করে। এই প্রথা বজায় রাখিতে গিয়া, কুইনিন দিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই এই অজুহাতে কত ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী যে আকস্মিক মৃত্যুতে প্রাণ দিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যখন ম্যালেরিয়া-জীবাণুর আবিষ্কার হয় নাই, তখনও কেহ কেহ এ কথা বুঝিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের "জ্বর চিকিৎসা" পুস্তকে দেখা যায়, তিনি কুইনিন প্রয়োগ সম্বন্ধে বার বার করিয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে জ্বর যতই অধিক হউক, যদি ১০৫ ডিগ্রীও হয়, তথাপি যেমনি তাহা নামিতে আরম্ভ করিবে,—অর্থাৎ যখন দেখিবে তাহা এক ডিগ্রী মাত্রও কমিয়াছে, কুইনিন তখনই দিবে, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবে না। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, জ্বর ছাড়িবার সময় পর্য্যন্ত কখনই অপেক্ষা করিবে না, জ্বর একটু নামিবার মুখ দেখিলেই তখন হইতে কুইনিন আরম্ভ করিবে। তাঁহার পুস্তক সেকালে অনেকেই পড়িতেন কিন্তু দেশের চিকিৎসাপদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় তাঁহার উপদেশ সকলে গ্রহণ করেন নাই। ম্যালেরিয়া-জীবাণুর অস্তিত্বও তখন জানা ছিল না, এবং ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার নিদান তখন চিকিৎসকের কল্পনাতীত; তথাপি কুইনিন দিতে বিলম্ব করিলে যেভাবে রোগ বাঁকিয়া দাঁড়ায় তাহার যে নিখুঁৎ বর্ণনা তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু এখনকার দিনে যখন সব রহস্য প্রকাশ হইয়াছে, তখনও জ্বর ছাড়িবার আশায় কুইনিন দিতে অযথা বিলম্ব করা বড়ই অন্যায় কথা। সিন্‌টনের প্রথামতে আগে অ্যাল্‌কালাইন্ মিক্‌শ্চার কয়েক মাত্রা দিবার পর জ্বর অবস্থায় কুইনিন দিতে কোনোই অশঙ্কা নাই। যদি জ্বর অত্যন্ত প্রবল থাকে, তবে ঠাণ্ডা জলে স্পঞ্জ ইত্যাদি করাইলেই উত্তাপ কিছু কমিবে, কিন্তু কুইনিন সকল অবস্থাতেই দেওয়া যাইবে। যদি জ্বর অত্যন্ত বেশী হয় এবং সে অবস্থায় কুইনিন দিতে আপত্তি থাকে, তবে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সেখানে বসিয়া থাকিয়া স্পঞ্জিং প্রভৃতির দ্বারা জ্বর

কিছু কমাইয়া কুইনিন দিয়া তবে সেখান হইতে উঠিবেন। কুইনিন না দিয়া ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার রোগীকে ছাড়িয়া যাওয়া ও তাহাকে যমের হাতে সঁপিয়া দেওয়া একই কথা। খাওয়াইতে না পারেন, এ অবস্থায় ইন্‌জেকশন দিলেও তাঁহার দোষ হইবে না।

কুইনিন ইন্‌জেকশনের কথা

সাধারণতঃ কুইনিন মুখ দিয়া প্রয়োগ করাই উত্তম। ইন্‌জেকশন দিলে যে বেশী উপকার হইবে এ কথা মনে করা ভুল। ইন্‌জেকশন দিয়া প্রয়োগ করিলে অথবা খাওয়াইলে বরং উহা প্রায় একই সময়ে রক্তের মধ্যে পৌঁছায়, এবং উপকার সমানই হয়। যে কেহ পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পারিবেন যে কুইনিন খাওয়ার আধঘণ্টা পরেই উহা প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইতে আরম্ভ হয়, এবং প্রস্রাব পরীক্ষায় তাহা অনায়াসে ধরা যায়। অতএব যাহা খাওয়া মাত্র এত শীঘ্র হজম হইয়া রক্তের মধ্যে গিয়া এমন কি প্রস্রাবে পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়, তাহা ইন্‌জেকশন করিয়া দিবার প্রয়োজন কি? যেখানে ইহা খাওয়ানো চলিতে পারে, সেখানে ইন্‌জেকশন দিবার কোনো দরকার নাই। কুইনিন ইন্‌জেকশনে যথেষ্ট বেদনা হয় এবং হাজার সাবধান হইয়া দিলেও উহাতে নানারূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা, কেবল উপস্থিত উপকারের লোভে কতকগুলি নূতন যন্ত্রণার সৃষ্টি হইতে পারে। খাইতে ইহা তিতা লাগে বটে কিন্তু তাহাতে ঐ সকল বিপদের আশঙ্কা নাই। ক্লেটন্ লেন্ এ বিষয়ে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন,—"It is possible to push into a patient with a syringe a lasting conviction that if it has come to a choice between a bitter taste and a bitterly painful experience, it is better to take quinine by mouth after all." অর্থাৎ যে রোগী তিক্ত ঔষধ খাইতে নারাজ, এক ইন্‌জেকশনেই সে জন্মের মত বুঝিতে পারে যে ইন্‌জেকশনের কষ্ট অপেক্ষা তিতা খাওয়ার কষ্ট ঢের ভাল।

তথাপি সময়বিশেষে ইন্‌জেকশনের যে প্রয়োজন আছে তাহাতে সন্দেহ নাই,

সুতরাং তাহার প্রয়োগবিধি ও প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

ইনট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশন

রোগের অতি-কঠিন অবস্থায় ইহা দিতে হইবে। আমাদের শিক্ষকেরা উপদেশ দেন, যেখানে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থা সেখানে মাংসমধ্যে ইন্‌জেকশন দিয়াও লাভ নাই, সেখানে একেবারে **রক্তশিরার মধ্যে (ইন্‌ট্রাভেনাস্)** কুইনিন প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ব্যথা লাগে না, অনিষ্ট হয় না এবং শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়। অবশ্য ইহা অতি সাবধানে দেওয়া উচিত, শিরার একটু বাহিরে ঔষধ পড়িলেই যন্ত্রণা হওয়ার ও ফুলিয়া ওঠার সম্ভাবনা। ইন্‌জেক্‌শনের যন্ত্রসকল যত্নের সহিত শোধন (sterilize) করিয়া লইতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ১০ গ্রেন মাত্রায় **কুইনিন বাইহাইড্রোব্রোমাইড,** অথবা না পাওয়া গেলে **কুইনিন বাইহাইড্রোক্লোরাইড**—১৫ হইতে ২০ সি. সি. নর্ম্যাল সেলাইন-জলে গুলিয়া উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইয়া, অতি ধীরে ধীরে প্রায় দশ মিনিট কাল ব্যাপিয়া ইন্‌জেকশনটি দিতে থাকিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মচারী বলেন প্রতি মিনিটে ½ গ্রেন হিসাবে, অর্থাৎ ১০ গ্রেন কুইনিন ২০ মিনিট সময় ব্যাপিয়া ইন্‌জেকশন দিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা দ্রুত দিলে রক্তচাপ (blood-pressure) দমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নোল্‌স্ বলেন তাঁহার নিজের পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া হওয়াতে মোটের উপর ত্রিশটি ইন্‌ট্রাভেনাস ইন্‌জেকশন তিনি নিজে লইয়াছেন, উহাতে একবারও তাঁহার কোনোরূপ অনিষ্ট হয় নাই।

কুইনিন ইন্‌ট্রাভেনাস ইন্‌জেকশন দিতে অনেকে অত্যন্ত ভয় পান; অনেকের মনেই ধারণা আছে যে এই ইন্‌জেক্‌শনে হঠাৎ হার্টফেল হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যাঁহারা জেলখানার ডাক্তাররূপে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন যে, ধীরে ধীরে ইন্‌জেক্‌শন দিলে কুইনিনের ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেক্‌শনে কোনোই অনিষ্ট হয় না। বস্তুতঃ জেলের

কয়েদীদের মধ্যে জর হইলে রক্তে ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া মাত্রই ডাক্তার তৎক্ষণাৎ একটি ইন্ট্রাভেনাস ইন্জেকশন দিয়া থাকেন, পরে মুখ দিয়া উহা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। জেলের কয়েদীর প্রাণহানি হইলে তাঁহাদের পক্ষে অপযশের কথা, অতএব তাঁহারা নিরাপদ হইবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করেন এবং রোগের অবস্থা যতই সামান্য হউক, ম্যালিগ্ন্যান্ট জীবাণু দেখিলে ইন্ট্রাভেনাস ইন্জেকশন দিতে দ্বিধা করেন না। ইহার দ্বারা এ পর্য্যন্ত কাহারো কোনোরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় নাই। ইহাতেই প্রমাণ হইবে যে এই প্রকার কুইনিন ইন্জেকশনে ভয়ের বাস্তবিক কোনো কারণ নাই। প্রয়োজন হইলে ৫ ফোঁটা অ্যাড্রেনেলিন (Adrenaline chlor. Sol.) ইহার সহিত মিশাইয়া লওয়া যায়। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া গেলে অথবা কলেরার মত অবস্থা হইলে এইরূপ ইন্জেকশনের দ্বারাই রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব, এ ছাড়া তখন আর অন্য উপায় নাই। কলেরাতে নাড়ী দমিয়া গেলে সেলাইন দিবার জন্য যেমন তৎপর হওয়া প্রয়োজন, ম্যালেরিয়ার মারাত্মক অবস্থায় এইরূপ কুইনিন ইন্জেকশন দিতে তেমনই তৎপর হওয়া উচিত। এই ইন্জেকশন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইটি পর্য্যন্ত দেওয়া চলিতে পারে, এবং তাহাতেই অনেক রোগীর অবস্থা ফিরিয়া যায়। রোগের চরম অবস্থার জন্য ইন্ট্রাভেনাস্ ইন্জেকশন নিশ্চয়ই প্রয়োজন, সে সময় কোনো দ্বিধা করিতে নাই।

ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্জেকশন

আরো দুই প্রকারে কুইনিন ইন্জেকশন করা যায়; **সাবকিউটেনিয়স্** (subcutaneous) অর্থাৎ চামড়ার নীচে, এবং **ইন্ট্রামাস্কুলার** (intramuscular) অর্থাৎ মাংসপেশীর মধ্যে। চামড়ার নীচে কুইনিন ইন্জেকশন করিতে প্রায় সকলেই নিষেধ করেন, কারণ এরূপ ইন্জেকশনে অত্যন্ত ফুলিয়া ওঠে ও ব্যথা হয়। তবে ফরাসী চিকিৎসকেরা অনেকে এইরূপ ইন্জেকশনের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন চামড়া তুলিয়া ধরিয়া সাবধানে প্রয়োগ করিলে ইহাতে ব্যথাও কম হয়, বিপদের সম্ভাবনাও কম, এবং

মাংসের কোনো ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইন্জেক্শনের অব্যবহিত পরেই উত্তমরূপে সেক দিলে আর ব্যথা হইতে পারে না। গত মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী সৈনিকদের এইরূপেই কুইনিন ইন্জেক্শন দেওয়া হইত। আমরা কিন্তু এরূপভাবে কুইনিন ইন্জেকশন দিতে সাহস করি না।

আর একরূপ উপায়, মাংসমধ্যে (intramuscular) ইন্জেকশন। আমাদের শিক্ষাগুরুরা এইরূপ ইন্জেকশন দিতেও নিষেধ করেন। ইহাতে যে কিরূপ অনিষ্ট হয় তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহারা নিম্নজন্তুর মাংসমধ্যে কুইনিন ইন্জেকশন দিয়া কয়েকদিন পরে সেই মাংস ব্যবচ্ছেদ করিয়া চাক্ষুষ দেখাইয়া দেন তাহা ক্ষতবিক্ষত হইয়া ইন্জেকশনের স্থানে গভীর গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, এবং তথায় মাংসের আর কোনো অস্তিত্ব নাই। মাংসের মধ্যে কুইনিন ইন্জেকশন দিলে যে কত ব্যথা হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। দৈবাৎ সায়াটিক (sciatic) স্নায়ুতে আঘাত লাগিলে বিকলাঙ্গ হইবার সম্ভাবনা,—সেইজন্য কত লোক ইন্জেকশনের পর বহুকাল পর্য্যন্ত খোঁড়া হইয়া থাকে,—কেহ কেহ এক বৎসরের মধ্যেও সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না; আর যন্ত্রগুলি ভালরূপে শোধিত না হইলে ঐ স্থান পাকিয়া অস্ত্র করিবার প্রয়োজন হয়,—এমন কি উহাতে ধনুষ্টঙ্কার (tetanus) হওয়ার কথাও শুনা গিয়াছে। বাহুতে ইন্জেকশন দেওয়ার ফলে কত লোকের মাংস পচিয়া হাড় বাহির হইয়া গিয়াছে। এ সকল বিপদ যাহাদের না হইয়াছে তাহাদেরও অনেকের মাংস শক্ত হইয়া যাবজ্জীবনের জন্য শরীরে ইন্জেকশনের ক্ষত-চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে।

ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্জেকশনের এত দোষ থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উহা প্রয়োগ করিয়া থাকি। এরূপ প্রয়োজনের ক্ষেত্র এদেশে নিতান্ত বিরল নয়। হয় তো সেরূপ স্থলে ইন্ট্রাভেনাস্ ইন্জেকশনও চলিতে পারে, কিন্তু সাধারণ চিকিৎসক তাহাতে রাজী হন না। অতএব তাঁহার পক্ষে উপস্থিত বিপদ নিবারণের এই একটি মাত্র উপায় ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্জেকশন—এবং এমন অনেক সময় আসে যখন নানা কারণে এইরূপ ইন্জেকশন দিতেই বাধ্য হইতে হয়। সময়মত প্রয়োগে ইহাতে যে অনেক লোকের

প্রাণরক্ষা হইয়াছে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আবার আনাড়ির মত ইন্‌জেকশন দিয়া কত লোকের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে তাহাও সত্য। সুতরাং যখন-তখন কুইনিন ইন্‌জেকশনের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়,—কিন্তু যেখানে নিতান্তই দিতে হইবে সেখানে যাহাতে অনিষ্ট খুব কম হইতে পারে সে বিষয়ে সাবধানতাও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

কুইনিন কিছুতেই ইন্‌জেকশন দিব না, এ কথা এদেশে বলা অসম্ভব। এখানে মানুষের জীবন লইয়া ম্যালেরিয়ার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিতে হয়। কুইনিন ইন্‌জেকশনের বিরুদ্ধে যতই যুক্তি থাকুক না কেন, বিপদের সময় যিনি ইহার দ্বারা ফল পাইয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনি পুনরায় যখন সেইরূপ রোগী পাইবেন, তখন যে সমস্ত যুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় তাহা প্রয়োগ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

ট্রাপিক্যাল্ মেডিসিন্ পুস্তকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কাষ্টেলানিও (Castellani) এই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"Notwithstanding the objections to this method brought forward recently by some authorities, we still strongly recommend it. as we have found it to be most successful in intractable cases, and have never so far seen any untoward symptoms" অর্থাৎ সম্প্রতি অনেকে আপত্তির নানা কারণ দেখাইলেও আমরা ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌শন্ দিবার পদ্ধতি এখনও জোরের সহিত সমর্থন করি, কারণ কঠিন রোগে আমরা স্বয়ং ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং এ পর্য্যন্ত কখনও কোনো দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখি নাই।

অতএব এই ইন্‌জেকৃশন দিতে কাহাকেও বিরত হইবার উপদেশ দেওয়া বৃথা; বরং কি উপায়ে ইহা সহজ ও নিরাপদ ভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহার কোনো সন্ধান দিতে পারিলে অনেক উপকার হয়। এ-সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহা বিবৃত করিতেছি :—

কুইনিনের সহিত ইউরিথেন মিশাইলে ব্যথা অনেক কম হয়, এ-কথা জীম্‌সা (Giemsa) প্রথমে বলেন। তাঁহার কৃত ফর্মুলার নাম জীম্‌সা মিকশ্চার (Giemsa's mixture)। উহার উপাদানগুলি এইরূপ :—কুইনিন ৭।০ গ্রেন, এথিল্ ইউরিথেন্ (ethyl urethane) ৪ গ্রেন, ও ডিস্‌টিল্‌ড্ জল

২৪ ফোঁটা। এইগুলি একত্র করিয়া ফুটাইয়া ইন্‌জেক্‌শন দিলে ব্যথা হয় না।

কুইনিন অধিক জলে না গুলিয়া অল্প জলে গুলিলেই ব্যথা কম হয়। পূর্ব্বে মনে হইত, কুইনিন যত পাৎলা করিয়া গুলিয়া লওয়া হইবে,—ব্যথাও বুঝি তত কম হইবে। কিন্তু এখন জানা যাইতেছে সে ধারণা ভুল। কুইনিন সলিউশনের একটা নির্দ্দিষ্ট সহনীয় ঘনত্ব আছে। শরীর রসের স্বাভাবিক ঘনত্বের সহিত মিল রাখিয়া (isotonic) যদি কুইনিন সলিউশনের ঘনত্ব স্থির করা যায়, তাহাতে উহা মাংসের মধ্যে শীঘ্র গিয়া মিশিয়া যায় এবং ব্যথাও হয় না বা অনিষ্টও হয় না। অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ ও পার্ক-ডেভিস্ কোম্পানী ১ সি. সি. বা ১৫ ফোঁটা মাত্র জলে ১০ গ্রেন কুইনিন গুলিয়া অ্যাম্পূল বিক্রয় করে, দেখা গিয়াছে যে তাহাতে প্রায় মোটেই ব্যথা হয় না। আমরাও স্বহস্তে এইরূপে অল্প জলে কুইনিন গুলিয়া লইতে পারি, এবং উহার
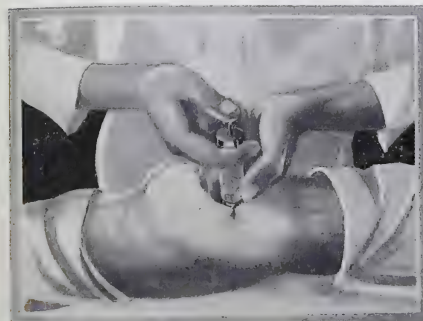
ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন

সহিত কয়েক ফোঁটা গ্লুকোজ মিশাইয়া লইলে ব্যথা আরো কম হয়। এই ইন্‌জেকশন পাছার মাংসের মধ্যে (gluteal) দেওয়াই প্রশস্ত। পাছার উপর দিকে এবং এক পাশে মাংসল স্থান অনুভব করিয়া লইয়া একটি লম্বা ছুঁচের দ্বারা মাংসের গভীর প্রদেশে ইন্‌জেকশন দিতে হয়; পরে ঐ স্থান মর্দ্দন

করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে লবণ-পুঁটুলির সেক দিতে হয়। এরূপ করিলে ব্যথা খুব কম হয়। ছুঁচটি যেন সায়াটিক্ নার্ভের (Sciatic nerve) নিকট না যায়, বা হাড়ে গিয়া না ঠেকে, এবং একই স্থানে পুনঃপুনঃ ইন্জেকশন না দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ ইন্জেকশন দিতে হইলেও একটি বা দুইটির অধিক দিতে নাই, রোগের কঠিন অবস্থা দূর হইয়া গেলেই তখন হইতে কুইনিন খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কুইনিন ইন্জেকশন কি অবস্থায় আবশ্যক ?

(১) **ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে,** যেখানে পেটের গোলমাল থাকায় কুইনিন খাওয়ানো চলে না,—অথবা যেখানে অত্যধিক ভেদ-বমি হইতে থাকায় কুইনিন হজম হইবে না বলিয়া সন্দেহ হয়; যেখানে রোগী অজ্ঞান থাকায় মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়; যেখানে জর খুব প্রবল, শীঘ্র উহার প্রতিকার প্রয়োজন; ছোট ছেলের যেখানে তড়্কা যুক্ত প্রবল জর, এবং অ্যারিষ্টোচিন্ প্রভৃতি মৃদু ঔষধের যখন কর্ম্ম নয়; যেখানে জর অতি সামান্য, কিন্তু রোগী একেবারে হিমাঙ্গ এবং অস্থির ভাবে আছড়া-আছড়ি করিতেছে বা একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, মুখের চেহারা ভাবশূন্য, নাড়ী অতি দ্রুত, প্রায় গোনা যায় না,—এদিকে রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায় ম্যালিগ্ন্যান্ট জীবাণু রক্তের মধ্যে বোঝাই। এই সকল স্থলে প্রথমে ইন্জেকশন করা দরকার।

(২) ম্যালেরিয়ার দেশে রোগী জর হইয়াই **হঠাৎ অজ্ঞান** হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার বিশেষ কিছু কারণ বুঝা যাইতেছে না; এমন অবস্থায় আগে একটি রক্তের স্লাইড লইয়া তৎক্ষণাৎ একটি কুইনিন ইন্জেকশন দিয়া পরে অন্য কথা ভাবিবার সুযোগ পাওয়া যায়।

(৩) যেখানে **টাইফয়েড কি ম্যালেরিয়া, মেনিঞ্জাইটিস্ কি ম্যালেরিয়া, সেপ্টিসীমিয়া (রক্তদুষ্টি) কিংবা ম্যালেরিয়া,**—এইরূপ সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়, অথচ রক্তপরীক্ষার দ্বারাও মীমাংসা হয় না বা রক্তপরীক্ষার সুযোগ হয় না—সেখানে উপর্য্যুপরি তিনটি কুইনিন ইন্জেক্শনে

তিন দিনে উহার মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে। সকল ক্ষেত্রে কুইনিন খাইতে দিয়া এ পরীক্ষা ঠিক চলে না। সেরূপ সন্দেহ স্থলে ইন্জেকশনের দ্বারাই ম্যালেরিয়ার চরম পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। তিনটি ইন্জেকশনেও যে জর ছাড়িল না, তাহা ম্যালেরিয়া নয়, ইহা তখন নিঃসন্দেহে স্থির করা যায়।

(৪) যেখানে **প্রসবের পরই** প্রসূতির কম্প দিয়া জর হয়—(উহা ছাড়িয়া যায় আবার আসে, ম্যালেরিয়াও হইতে পারে অথবা সেপ্টিক্ জরও হইতে পারে)—সেখানে রক্তপরীক্ষার সুবিধা না থাকিলে একবার কুইনিন ইন্জেক্শন দিয়া দেখা ভাল। আঁতুড়ের ম্যালেরিয়ার জর কুইনিন খাওয়ানোতে শীঘ্র বশ মানে না। এ স্থলে উহা যদি ম্যালেরিয়া নাও হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, কুইনিন ইন্জেকশনে সেপ্টিক্ জরেও উপকার করে।

(৫) এক একটি ম্যালেরিয়া এমন বিচিত্র দেখা যায় যে কুইনিন খাইতে দিলে স্থায়ী ফল হয় না, কিন্তু ইন্জেকশন দিলেই যেন আগুনে জল পড়ে। এমন কতকগুলি রোগীও দেখা যায় যাহাদের কুইনিন খাইলেই নানারূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, পেট কামড়ায়, হয় তো রক্তবমন হইতেও দেখা যায়, কিন্তু ইন্জেকশন দিলে তাহার কিছুই হয় না। রোগী নিজেই সে কথা পরিষ্কার করিয়া বলে এবং নিজেই ইন্জেকশন লইতে চায়। এরূপ অবস্থাতে ইন্জেকশন দেওয়া ভিন্ন উপায় কি? কুইনিন খাইলে সহ্য হয় না কিন্তু ইন্জেকশন সহ্য হয়, এমন লোকও আছে।

(৬) **হঠাৎ প্রয়োজনের জন্য** ইন্জেকশনের কুইনিন সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে হয়। পল্লীগ্রামে যেখানে রোগী দেখিতে দূরে গিয়া পড়িয়াছি,—বারবার যাতায়াত করা সেখানে সম্ভব নয়, রোগী নিরক্ষর, ঔষধ কখন আনিবে কখন খাইবে কোনো স্থিরতা নাই,—এ দিকে প্রবল জর, অকস্মাৎ উহা বিকৃতভাব ধারণ করাও বিচিত্র নয়,—সেখানে আগে একটু রক্ত পরীক্ষার্থে স্লাইডে টানিয়া লইলাম, আর উপস্থিত একটি কুইনিন ইন্জেকশন দিয়া চলিয়া আসিলাম, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইহাতে এমনও হইতে পারে যে ভুল করিয়া আসিলাম, আবার এমনও হইতে পারে যে অপঘাত মৃত্যু হইতে মানুষটিকে রক্ষা করিলাম। অবস্থা বিশেষে এরূপ ভুল করায় ক্ষতি নাই। এ

দেশের ম্যালেরিয়াকে বিশ্বাস নাই,—এখানে **ম্যালেরিয়া নয় ভাবিয়া ভুল করা অপেক্ষা ম্যালেরিয়া ভাবিয়া ভুল করা অনেক ভাল।** একটিতে প্রাণের হানি হইতে পারে, অপরটিতে কিছু কষ্ট দেওয়া হয় মাত্র। ইন্‌জেক্‌শন এখানে অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু অন্যায় নয়।

(৭) **পুরাতন দুর্দ্দম ম্যালেরিয়া** এক একটি এমন আছে,—যেখানে প্রকাণ্ড প্লীহা ও যকৃৎ লইয়া রোগীর দুই তিন মাস যাবৎ জ্বর চলিতেছে; কুইনিনও খায়, দুই একদিন ভালও থাকে, আবার একটু জ্বর হয়; জ্বর হয়তো অল্পই, কিন্তু সেটুকু আর কিছুতে যায় না; কুইনিন অনিয়ম করিয়া খাইয়া উহার উপর রোগী বিশ্বাস হারাইয়াছে; রক্ত পরীক্ষায় জানা গেল ইহা কালাজ্বর নয়, তবে ম্যালেরিয়ার জীবাণুও পাওয়া গেল না। এস্থলে ম্যালেরিয়া ভিতরে ভিতরে সক্রিয় অবস্থাতেই আছে, কিন্তু শরীরের প্রতিরোধ-শক্তি অনেকটা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এমন পুরাতন ম্যালেরিয়া আজকাল প্লাজ্‌মোকুইন ও আটেব্রিন্ এই দুই নূতন ঔষধেও সারিতে পারে। কিন্তু যদি তাহাতে বিশ্বাস না হয় বা দিতে কাহারো আপত্তি থাকে,—অথচ এ জ্বর জোর করিয়া না তাড়াইলে যাইবে না বলিয়া মনে হয়,—এমন অবস্থায় উপর্য্যুপরি কুইনিন ইন্‌জেক্‌শনে বেশ কাজ হয়। উহার নিয়ম এই যে চারদিন যাবৎ প্রত্যহ ১০ গ্রেন করিয়া এক একটি ইন্‌জেক্‌শন,—তাহার পর সাত দিন বিশ্রাম; আবার চার দিনে চারটি ইন্‌জেক্‌শন,—আবার সাতদিন বিশ্রাম; আবার চারদিনে চারটি ইন্‌জেক্‌শন। অর্থাৎ তিনদফায় সর্ব্বসমেত বারোটি ইন্‌জেকশন দিয়া কেবল ইন্‌জেকশনের সাহায্যেই ম্যালেরিয়া শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ দূর করিয়া দিবার এই চরম পদ্ধতি। ইহা নিতান্ত আসুরিক চিকিৎসা বলিয়া মনে হয় বটে—কিন্তু এক একজনের ভুগিয়া ভুগিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়া যায় যে তখন ইহা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। অবাধ্য পুরাতন ম্যালেরিয়াতে উপর্য্যুপরি বারোটি কুইনিন ইন্‌জেক্‌শন দিবার ব্যবস্থা স্যর রোণাল্ড রস্ নিজেই প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যখন রোগ মানুষকে নিতান্ত অভিভূত করিয়া ফেলে তখন এরূপ বল-প্রয়োগ ছাড়া আর উপায় কি? অবশ্য অন্যান্য উপায়ে যখন কিছুতে ফল হইতেছে না, কেবল তখনকার জন্যই এ ব্যবস্থা।

(৮) ম্যালেরিয়ার মহামারীর সময় কুইনিন ইন্‌জেকশন ছাড়া উপায় থাকে না। মনে করুন কয়েকটি গ্রামে ম্যালেরিয়ার মড়ক উপস্থিত হইয়াছে। ঘরে ঘরে লোকের জ্বর হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত দাস্ত হইতেছে এবং দুই একদিন ভুগিতে ভুগিতেই অনেকে মরিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ ছেলেগুলি একটিও রক্ষা পাইতেছে না। মড়কের সময় এইরূপই হয়। এ অবস্থায় ডাক্তার একা কি করিবেন? বিচার বা তর্কের সময় ইহা নয়। এখানে ডাক্তারের কর্ত্তব্য কেবল বৃদ্ধগুলিকে বাদ দিয়া জ্বর দেখা মাত্র প্রত্যেক স্থলে কুইনিন ইন্‌জেক্‌শন প্রয়োগ করিতে থাকা। বিশেষতঃ এ সময় ছোট ছেলেদের ইন্‌জেকশন দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। কুইনিন তাহাদের খাওয়ানো যায় না, এবং ইউকুইনিনের মত সৌখীন ঔষধের উপর নির্ভর করাও যায় না। তাহাদের একেবারে পাঁচগ্রেন করিয়াই ইন্‌জেক্‌শন প্রয়োগ করিতে হয়, তাহারা ইহা বেশ সহ্য করিতে পারে। যেখানে ম্যালেরিয়াতে গ্রাম উজাড় করিতে থাকে, সেখানে হেল্‌থ্ ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। তাঁহারা কয়েক হাজার কুইনিন অ্যাম্পুল সঙ্গে দিয়া গ্রামে গ্রামে এক একটি ডাক্তার পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের কাজই এই, ঘরে ঘরে গিয়া এক একটি রক্তের স্লাইড লওয়া ও এক একটি ইন্‌জেকশন দেওয়া। ইহাতে শীঘ্রই মড়ক নিবারিত হয়। বর্ত্তমানে আটেব্রিনের ইন্‌জেক্‌শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতঃপর ভবিষ্যতে এরূপ এপিডেমিকে হয়তো তাহাই ব্যবহৃত হইবে।

কুইনিনের বিষম ক্রিয়া (Quinine intolerance)

আমরা প্রায়ই শুনি যে কুইনিন সকলের ধাতে সয় না। এ-কথা নিতান্ত মিথ্যা নয়, তবে যতটা শুনা যায় ততটা সত্য নয়। কুইনিন সম্বন্ধে অনেকের মনে একরূপ অহেতুক বিভীষিকা আছে। কোনো কোনো রোগী আগে হইতে ডাক্তারকে সাবধান করিয়া দেয় যেন তাহাদের কুইনিন কখনো না দেওয়া হয়, কারণ কুইনিন তাহাদের সহ্য হইবে না। কিন্তু কুইনিনের নাম গোপন করিয়া নানাবিধ উপায়ে উহার স্বাদ ঢাকিয়া দিলে দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলেই তাহা বেশ সহ্য হইতেছে। রোগীর মঙ্গলের জন্য

কখনো কখনো এরূপ প্রতারণাও আবশ্যক হইয়া পড়ে, যুক্তির দ্বারা মানুষকে সকল সময় বুঝানো যায় না। কিন্তু কয়েকজনের বাস্তবিকই এমন বিচিত্র ধাত (idiosyncrasy) যে কুইনিন অল্প মাত্রাতেও তাহাদের শরীরে বিষের মত ক্রিয়া করে। লুকাইয়া কুইনিন দিলেও তাহা খাওয়ামাত্র দেখিতে দেখিতে বিষ-লক্ষণ সকল (anaphylactic symptoms) প্রকাশ পায়। কাহারো আমবাত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া ওঠে, কাহারো রক্ত-প্রস্রাব হইতে থাকে, কাহারো পেটে কলিকের মত অসহ্য শূলবেদনা হয়, কাহারো অত্যন্ত শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, কাহারো বা বুক ধড়্ফড় করিতে করিতে সর্ব্বশরীর হিম হইয়া নাড়ী ছাড়ার উপক্রম হয়। কেন এমন হয় তাহার কোনো কারণ দেওয়া যায় না। তবে পূর্ব্বে যে সিন্টন্-প্রণালীর চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে, সেই মতে ক্ষারীয় ঔষধ প্রয়োগের পর কুইনিন ব্যবহার করিলে এই সকল বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। তথাপিও যাহাদের কিছুতে কুইনিন সহ্য হয় না, তাহাদিগকেও উহা ক্রমশঃ সহ্য করানোর উপায় আছে। এই সকল রোগীদের প্রথমে কুইনিন প্রতিমাত্রায় ½ গ্রেন বা ⅓ গ্রেন করিয়া তিন চারি ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়, এবং ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়াইয়া যাইতে হয়। এইরূপ ভাবে কয়েকদিনে ক্রমশঃ ৫ গ্রেন পর্য্যন্ত মাত্রায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া তখন হইতে ঐ মাত্রাতেই প্রত্যহ কুইনিন দিতে থাকিলে আর কোনো বিপত্তি ঘটে না। বলা বাহুল্য, একবার কুইনিন ছাড়িয়া দিলে আবার যদি উহাদের ভবিষ্যতে কুইনিন দিবার প্রয়োজন হয়, তখন পুনরায় ঐ ভাবেই ভগ্নাংশ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। যাহাদের পক্ষে কুইনিন এমন অসহ্য, তাহাদের ম্যালেরিয়ার দেশে বাস পরিত্যাগ করাই ভাল। কোল্মার বলেন যাহারা ম্যালেরিয়ার দেশে নূতন যাইতেছে, এবং পূর্ব্বে কখনও কুইনিন খায় নাই, তাহাদের যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ২।৪ গ্রেন কুইনিন খাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত উহা সহ্য হইবে কি না।

আজকাল অবশ্য আটেব্রিন্ প্রভৃতি ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং কুইনিন যাহার সহ্য না হইবে তাহার পক্ষে সেইগুলি এখন অনায়াসে ব্যবহার করা চলিতে পারিবে।

কুইনিন অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারের ফলে কাহারো কাহারো জন্মের মত ইন্দ্রিয়হানি হওয়ার কথা শুনা যায়। বেশী মাত্রায় কুইনিন খাইয়া বধির হইয়া গিয়াছে এমন লোকও দেখা যায়। আবার উহাতে অন্ধ হওয়ার কথাও শুনা গিয়াছে; ইহাকে Quinine amaurosis বলে। চক্ষুর রূপবহা স্নায়ু (optic nerves) নষ্ট হওয়ার ফলে এইরূপ অন্ধত্ব উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য স্বাভাবিক মাত্রায় কুইনিন সেবনে এ সকল মারাত্মক দোষ ঘটে না।

ক্বচিৎ দুর্ঘটনার কথা ছাড়িয়া দিয়া কুইনিনের ব্যবহারে প্রায় যে সকল অল্পসল্প অসুস্থতা হইতে দেখা যায়, যেমন কানে তালালাগা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা, অরুচি প্রভৃতি, এ গুলিকে আমরা সিন্কোনিজম্ (Cinchonism) বলিয়া থাকি। উহা নিবারণের উত্তম ঔষধ **হাইড্রোব্রোমিক্ অ্যাসিড** (Acid Hydrobromic dil.), উহা ৩০ হইতে ৬০ ফোঁটা মাত্রায় পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। কুইনিন্ খাইয়া দুর্ব্বল বোধ হইলে **ব্রাণ্ডিতেও** বেশ উপকার হয়। গোদুগ্ধ পথ্য করিলে এই সকল উপসর্গ প্রায় আসিতে পারে না, এইজন্য যতদিন কুইনিন খাওয়া যায়, পারত-পক্ষে ততদিন দুগ্ধ পান করা উচিত, এবং কুইনিন খালিপেটে না খাইয়া আহারের পর খাওয়াই উত্তম ব্যবস্থা। অবশ্য যতই চেষ্টা করা হউক, কুইনিন খাইলে একটু কান ভোঁ ভোঁ করিবেই, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। এটুকু সিন্কোনিজম্ হওয়া দোষের নয়, বরং ভালই। ইহাতে বুঝা যায় যে কুইনিন রীতিমত ধরিয়াছে, অর্থাৎ রক্তে প্রবেশ করিয়া ইহার ক্রিয়া চলিতেছে। এই চিহ্নটুকু না পাওয়া গেলে বরং সন্দেহের কথা যে কুইনিন ঠিকমত হজম হইতেছে না। অতএব এটুকু নিবারণ করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। যদি অত্যধিক কিছু কষ্ট হইতে দেখা যায় তবেই তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। উচিত মাত্রার ব্যবহারে উহা প্রায়ই হয় না।

সিন্কোনা ফেব্রিফিউজ

সিন্কোনার ছালে যে চারি প্রকার উপক্ষার (alkaloids) আছে, তন্মধ্যে কুইনিনই ম্যালেরিয়ার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, এই কথাই আমরা বরাবর জানিতাম। কিন্তু ১৯২০ সালে অ্যাক্টন (Acton) দেখাইয়া দিলেন যে সিন্কোনার মধ্যে **কুইনিডিন্** (Quinidine) নামক যে

উপক্ষার বর্ত্তমান তাহাও ম্যালেরিয়ার পক্ষে বিশেষ উপকারী। তিনি বলিলেন কুইনিন ও কুইনিডিন দুইই ম্যালেরিয়ার ঔষধ, তবে পরস্পরের ক্রিয়ার কিছু পার্থক্য আছে। **কুইনিন** ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার পক্ষে

কর্ণেল অ্যাক্‌টন

শ্রেষ্ঠ, কিন্তু **কুইনিডিন** বিনাইন-টার্শিয়ান ও কোয়ার্টান ম্যালেরিয়াতে শ্রেষ্ঠ, এমন কি কুইনিন অপেক্ষাও উহাতে অধিক ফলপ্রদ। অন্যান্য অনেক ম্যালেরিয়াবিদ্ পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। তবে ম্যালিগ্‌ন্যান্ট্ ছাড়া অন্য দুইপ্রকার ম্যালেরিয়াতে কুইনিডিন অধিক ফলপ্রদ হইলেও ইহা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ, সুতরাং ইহার তেমন

প্রচলন হইল না। অতঃপর দেখা গেল যে সিন্‌কোনা হইতে কুইনিনের অংশটুকু সাধ্যমত বাহির করিয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা **"সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ"** নামে বাজারে সস্তা দামে বিক্রীত হয়, এবং এই সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজের প্রতি ১০ গ্রেনের মধ্যে ২½ গ্রেন করিয়া কুইনিডিন বর্ত্তমান থাকে। অতএব কুইনিনের পরিবর্ত্তে যদি সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ ১০ গ্রেন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, তবে তাহাতে কুইনিডিন ২½ গ্রেন করিয়া দেওয়া হইবে; ইহাতে দামেও কুইনিন অপেক্ষা যথেষ্ট সস্তা হইবে, অথচ পুরাতন পালাজ্বরাদিতে কুইনিন অপেক্ষা ভাল ফল হইবে। কুইনিডিনের পূর্ণ মাত্রা ৫ গ্রেন করিয়া, অতএব ১০ গ্রেন সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজে খাঁটি কুইনিডিন ২½ গ্রেন তো আছেই, উপরন্তু কুইনিন প্রভৃতি অন্যান্য উপক্ষারগুলিও কিছু কিছু পরিমাণে তাহার সহিত থাকায় উহার উপকারিতা বৃদ্ধি পাইবে। অ্যাক্‌টনের গবেষণায় এই সকল তথ্য জানা অবধি সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। তবে সকল প্রকার সিন্‌কোনাতে কুইনিডিনের অংশ সমান থাকে না, ভারত গভর্ণমেণ্ট যে দেশী সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ বিক্রয় করেন তাহাই এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অথচ উহার দাম খুব সস্তা। সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজের মিকশ্চার এইরূপ হইবে—

সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ (ভারতীয়)—		১০ গ্রেন
সাইট্রিক অ্যাসিড—	...	২০ গ্রেন
ম্যাগ্ সাল্‌ফ—	...	২০ গ্রেন
স্পিরিট অ্যানিসি—	...	১০ ফোঁটা
সিরাপ—	...	½ আউন্স
জল—	...	½ আউন্স

খালিপেটে অথবা আহারের দুই ঘণ্টা পরে প্রত্যহ তিনবার করিয়া ইহা প্রথম এক সপ্তাহ সেব্য, পরে দুইবার করিয়া আরো দুই সপ্তাহ সেব্য। ইহার একমাত্র দোষ এই যে ইহাতে সিন্‌কোনিন্ থাকায় খালিপেটে না খাইলে বমি হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, এবং কাহারো কাহারো ইহাতে পেট কামড়ায়; নতুবা ঔষধটি বড়ই উপকারী। দাতব্য ঔষধালয়ে ইহার

ব্যবহারে অনেক অর্থের সাশ্রয় হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যে কেবল ম্যালিগ্ন্যাণ্ট্ ম্যালেরিয়াতে কুইনিন ব্যবহার করা হইবে, এবং অন্যান্য ম্যালেরিয়ায়, বিশেষতঃ পুরাতন পালাজ্বর প্রভৃতিতে সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ ব্যবহার করা হইবে। এরূপ ব্যবস্থায় ফলও অনেক ভাল হয়, অর্থব্যয়ও অনেক কম হয়।

ম্যালেরিয়া বিশেষ-করিয়া দরিদ্রেরই রোগ, অথচ কুইনিন দুর্মূল্য ঔষধ। এ দেশে কত লোক যে ঔষধ কিনিতে অসমর্থ বলিয়াই বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তাহার সংখ্যা নাই। যতই উত্তম ঔষধ আবিষ্কৃত হউক, তাহা যদি সকল রোগীর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হয় তবে সে ঔষধের সার্থকতা কি? সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজের উপকারিতা নিতান্ত কম নয়, অথচ দামে ইহা সস্তা। একশত টাকার কুইনিন বিতরণ করিলে যত দরিদ্রের উপকার করা যায়, ঐ মূল্যের সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ বিতরণ করিলে তদপেক্ষা আরো অনেক লোকের উপকার হয়। ম্যালেরিয়ার ঔষধ বিতরণ করিয়া বা উহা সস্তা ও অনায়াসলভ্য করিয়া এদেশে যত বেশী সংখ্যক দরিদ্রকে রোগের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। সেই উদ্দেশ্যেই সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ প্রচলিত হইয়াছে। সম্প্রতি লীগ অফ নেশন্‌স্-এর দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাহাতে সস্তায় উপকারী ঔষধ প্রত্যেক দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারা যায় এবং কাহারও উহা বিদেশ হইতে আমদানি করিবার আবশ্যক না হয়, এজন্য নানারূপ চেষ্টা ও গবেষণা করা হইতেছে। এই কমিশন হইতে সম্প্রতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে সিন্‌কোনার চাষ সর্ব্বত্র করা হউক, এবং তাহার ছাল হইতে কুইনিনের অংশ বাদ না দিয়া এবং উহার অন্যান্য উপক্ষারগুলি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বজায় রাখিয়া তাহার নাম সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজের পরিবর্ত্তে **"টোটাকুইনা"** দেওয়া হউক, এবং ইহাই সর্ব্বত্র বিতরণের জন্য প্রচলিত হউক। সিন্‌কোনার সমস্ত স্বাভাবিক উপাদানগুলি টোটাকুইনাতে বর্ত্তমান থাকিবে, কেবল এই ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে সেগুলি সর্ব্বদাই উচিত পরিমাণে বজায় থাকে।

টোটাকুইনা

সিন্‌কোনার গাছ বিভিন্ন প্রকারের আছে, তন্মধ্যে C. ledgeriana নামক গাছেই কুইনিনের পরিমাণ অন্যান্য সিন্‌কোনা অপেক্ষা বেশী থাকে। এইজন্য এই জাতীয় গাছেরই অধিক চাষ করা হয়। কিন্তু এই গাছ সর্ব্বত্র জন্মায় না, ভারতবর্ষে মাত্র দার্জ্জিলিং অঞ্চলে এবং মাদ্রাজে ইহা জন্মাইতে পারা যায়। এই গাছ জাভায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে ও সহজে জন্মায়, সেইজন্য জাভাতেই ইহার রীতিমত চাষ করা হয় এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র জাভার কুইনিনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে ইহার ব্যবসা একচেটিয়া হওয়াতেই কুইনিনের দাম এত বেশী। কিন্তু সিন্‌কোনার আর যে দুই প্রকারের গাছ আছে, C. succirubra ও C. robusta, তাহা সর্ব্বত্রই জন্মিতে পারে। তাহাতে যদিও লেজেরিয়ানা অপেক্ষা কুইনিনের ভাগ কম, কিন্তু অন্যান্য উপক্ষারগুলির ভাগ বেশী, বিশেষতঃ কুইনিডিনের অংশ যথেষ্ট আছে। কুইনিন উহাতে কম থাকিলেও ম্যালেরিয়াতে উহা উপকারী কিনা তাহা লীগ অফ নেশন্‌স্ হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছে "টোটাকুইনা", এবং ইহা সম্প্রতি নূতন ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজের পরিবর্ত্তে ম্যালেরিয়া কমিশন এই টোটাকুইনা ব্যবহার করিতে বলিতেছেন। সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ ও টোটাকুইনাতে সিন্‌কোনার বিভিন্ন উপক্ষারগুলি কিরূপ পরিমাণে বর্ত্তমান তাহার তুলনা করিয়া দেখুন :—

উপাদান	সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজে	টোটাকুইনাতে
কুইনিন—	৭·৪ %	২৫·২৩ %
কুইনিডিন—	২২·৮৩ %	৬·২১ %
সিন্‌কোনিন্—	১৮·৫৮ %	২৭·৬৭ %
সিন্‌কোনিডিন্—	৫·৮৪ %	৩৪·১৩ %
অন্যান্য উপক্ষার—	২৯·১২ %	৮·৮৬ %
ভস্মাদি—	১৬·২৩ %	১·৬২ %

ইহাতে দেখা যায় যে টোটাকুইনাতে সিনকোনা-ফেব্রিফিউজ অপেক্ষা **কুইনিন, সিন্‌কোনিন ও সিন্‌কোনিডিনের পরিমাণ বেশী,** কিন্তু **কুইনিডিনের পরিমাণ কম।** ম্যালেরিয়া-কমিশন বলেন টোটাকুইনা ট্যাবলেট্‌রূপে সরবরাহ হউক, এবং ম্যালিগ্‌ন্যান্ট্‌ ম্যালেরিয়াতে ইহা দৈনিক ২০ গ্রেন হিসাবে ও বিনাইন-টার্শিয়ানে ১০ গ্রেন হিসাবে ব্যবহার করা হউক। উহাতে কতদূর সাফল্য হইবে বলা যায় না।

নূতন ঔষধ

পৃথিবীতে যে সকল স্বাভাবিক ধাতব ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় তাহা হইতে জটিল রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের দ্বারা নানারূপ অভিনব সামগ্রী উৎপন্ন হইতে পারে। তন্মধ্যে যেগুলি বিশ্লেষণের দ্বারা প্রস্তুত হয় সেগুলিকে ডেরিভেটিভ্‌ (derivatives) বলা হয়, আর যেগুলি রাসায়নিক সংমিশ্রনের দ্বারা প্রস্তুত হয় সেগুলিকে সিন্‌থেটিক্‌ (synthetics) বা যৌগিক পদার্থ বলা হয়। এই গুলি স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দ্রব্যগুণসম্পন্ন হয়, এবং একই মৌলিক দ্রব্য হইতে বিভিন্ন-গুণযুক্ত বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ঔষধের সৃষ্টি হইতে পারে। মহামতি এর্লিক (Ehrlick) তাঁহার বিখ্যাত স্যাল্‌ভারসান্‌ আবিষ্কার করিয়া উক্তরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রথম পথ দেখাইয়া দেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে এইরূপ উপায়ে আরো অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইবে। কেবল তাহাই নয়,—যে সকল পদার্থ ঔষধরূপে কখনও ব্যবহৃত হয় না,—সেইগুলি হইতেও অতঃপর রাসায়নিক উপায়ে নানারূপ ঔষধ প্রস্তুত করা যাইবে। তাঁহার দৃষ্টান্তে সেই অবধি কৃত্রিম উপায়ে ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা ধারাবাহিকভাবে চলিয়াছে। জার্ম্মান রাসায়নিকগণ সম্প্রতি কোল্‌টার (coaltar) অর্থাৎ আলকাৎরা হইতে নানারূপ রং (dye stuff) ও ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। আলকাৎরা খনিজ পদার্থ, এবং উহা হইতে অনেক অদ্ভুত জিনিষ সৃষ্ট হইতে পারে। জার্ম্মানি হইতে যতপ্রকার রং-এর আমদানি হয় তাহার অধিকাংশই আলকাৎরা

হইতে প্রস্তুত। ইহা ছাড়া নানারূপ ঘুমের ঔষধ (hypnotics) এবং ব্যথা-নিবারক (analgesic) ও উত্তেজনা-নিবারক (sedative) ঔষধ ইহা হইতে প্রস্তুত। আজকাল এই সকল ঔষধে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই আল্‌কাৎরা হইতেই ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা বহুদিন হইতে চলিতেছিল। প্রথমে চেষ্টা ছিল যে ইহা হইতে কৃত্রিম কুইনিন প্রস্তুত করা হইবে, তাহা হইলে গাছ জন্মাইয়া সিন্‌কোনা হইতে কুইনিন প্রস্তুত করিবার আর আবশ্যক হইবে না। সেই চেষ্টায় কুইনিনের গুণবিশিষ্ট অথচ তিক্ত নয় এমন কয়েকটি ঔষধ বাহির হইবার পর, পর্য্যায়ক্রমে এমন দুইটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইল, যাহা ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। একটির নাম **প্লাজ্‌মোকুইন,** আর একটির নাম **আটেব্রিন।** বলাবাহুল্য এগুলি সিন্‌কোনা হইতে প্রস্তুত নয়, এবং কুইনিনের সহিত ইহার কোনো সম্পর্কই নাই।

প্লাজ্‌মোকুইন

প্লাজ্‌মোকুইন্‌ (Plasmoquine) প্রস্তুত হইয়াছে মূলতঃ কুইনোলিন্‌ (Quinoline) নামক রঞ্জন-পদার্থ (dye stuff) হইতে,—জটিল রাসায়নিক সংশ্লেষণের (synthesis) দ্বারা। কুইনোলিন পূর্ব্বে ঔষধার্থে ক্বচিৎ ব্যবহৃত হইত এবং ইহা কিছু অ্যান্টিসেপটিক গুণবিশিষ্ট মাত্র বলিয়া জানা ছিল। এই কুইনোলিন হইতেই কিছুকাল পূর্ব্বে Atophan ও Yatren নামক দুইটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্লাজমোকুইন আবিষ্কৃত হয় ১৯২৫ সালে, শুলেমান্‌ প্রমুখ কয়েকজন (Schulemann, Schoenhoefer, and Wingler) বৈজ্ঞানিকের দ্বারা। ইহার রাসায়নিক আখ্যা alkyl-amino-6-methoxy-quinoline। ইহার আবিষ্কারের ইতিহাস রহস্যজনক। জার্ম্মানির বায়ার কোম্পানির ল্যাবরেটরিতে রোহল (Rohl) প্রথমে লক্ষ্য করেন যে মানুষের ম্যালেরিয়ার যে ঔষধ, পাখীর ম্যালেরিয়ারও (hæmoproteus infection of paddy birds) সেই ঔষধ, সুতরাং ঐরূপ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পাখীর শরীরে পরীক্ষার দ্বারা মানুষের ম্যালেরিয়ার ঔষধের

ক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করা সম্ভবপর। ইহাতে নানারূপ নূতন নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া একে একে ঐ-সকল পাখীর শরীরে তাহার প্রয়োগের ফলাফল তুলনা করিয়া দেখিবার বিশেষ সুবিধা হয়। এইরূপেই প্রথমে

জার্মান বৈজ্ঞানিক রোহল (Rohl)

জানা যায় যে প্লাজ্‌মোকুইন্ নামক সদ্য-আবিষ্কৃত জটিল রাসায়নিক পদার্থটি ঐ পাখীর-ম্যালেরিয়া নাশ করিতে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন। ইহার পরই ঔষধটি মানুষের ম্যালেরিয়াতে প্রয়োগ করা হয় এবং তাহাতেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। পরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ম্যালেরিয়াতে বৈজ্ঞানিকগণ

উহা ব্যবহার করিয়া ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে :—

(১) **ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে ইহার ক্রিয়া নাই।** ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে ইহাদ্বারা জরও বন্ধ হয় না, উক্ত জীবাণুর সাইজোণ্টগুলিও বিনষ্ট হয় না।

(২) কিন্তু **ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্ ম্যালেরিয়ার বীজ বা ক্রেসেণ্ট নাশ করিতে** ইহার ক্ষমতা অতি অদ্ভুত। ইহার অতি সামান্য মাত্রাতেই সমস্ত বীজ মরিয়া যায়। ইহার এমন শক্তি যে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় যদিও বীজগুলি বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায় তথাপি তাহার সংক্রামকত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়,—অর্থাৎ মশার পেটে গিয়াও তাহা বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না। ১/৬ গ্রেনের একমাত্রাতেই যে কোনো রোগীর রক্তে সহস্র ক্রেসেণ্টের জীবনীশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি অতি সামান্য ১/১২ গ্রেন মাত্রাতেও ক্রেসেণ্টগুলি তিন দিন পর্য্যন্ত নির্জ্জীব হইয়া থাকে, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। অতএব **ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্ ম্যালেরিয়ার সংক্রামণ নিবারণ** করিতে এমন ঔষধ আর নাই। কুইনিনের এগুণ মোটেই নাই,—অন্য কোনো ঔষধেরই নাই।

(৩) **বিনাইন্-টার্শিয়ান্ ম্যালেরিয়াতে** সকল অবস্থাতেই ইহা সমান উপকারী। এই ম্যালেরিয়ায় ইহার গুণ কুইনিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুইনিনের সহিত একত্রে ব্যবহার করিলে ইহার গুণ আরো বাড়ে। সকলেই তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন যে কেবল কুইনিন-চিকিৎসায় যেখানে শতকরা ৩০।৪০টি রিল্যাপ্স হইত, সে স্থলে প্লাজমোকুইনের সহিত কুইনিন মিশাইয়া দিলে ইহার গুণ অনেক বাড়িয়া যায়—তখন শতকরা ৪।৫টির অধিক রিল্যাপ্স হইতে দেখা যায় না।

(৪) **কোয়ার্টান্ ম্যালেরিয়াতে** ইহার ক্রিয়া খুবই চমৎকার,—এই-জাতীয় ম্যালেরিয়াতে সকল জীবাণুই একেবারে নিঃশেষ হইয়া মরে (Cent-per-cent cure)। পূর্ব্বকালে আমরা জানিতাম যে দুইদিন অন্তর যে পালাজর হয় (চতুর্থক জর), তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুশ্চিকিৎস্য। প্লাজমোকুইনের ক্রিয়া এই ম্যালেরিয়াতেই সর্ব্বাপেক্ষা

উত্তম আর কুইনিনের ক্রিয়া ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই প্রকারের **পালাজ্বর** মাত্রই প্লাজমোকুইনের বাধ্য।

মোটের উপর প্লাজমোকুইনের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ইহাই বুঝা যায় যে কুইনিনের যে কয়টি গুণের অভাব ছিল, ইহার ঠিক সেই কয়টি গুণই আছে, কিন্তু কুইনিনের যে বিশেষ গুণটি আছে সেইটি ইহার নাই। অর্থাৎ ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে কুইনিন একেবারে অব্যর্থ কিন্তু সেখানে ইহা নিষ্ক্রিয়,—আর পালাজরে বা পুরাতন জরে, যেখানে কুইনিন প্রায় নিষ্ফল হয়, সেখানে ইহা প্রায় অব্যর্থ। অধিকন্তু ইহার বীজনাশী ক্ষমতা অদ্বিতীয়, কিন্তু কুইনিনের সে ক্ষমতা নাই। দুই প্রকার গুণ একত্র করিবার জন্য সকলেই এখন কুইনিনের সহিত প্লাজমোকুইন প্রয়োগ করেন। ম্যালেরিয়ার সংক্রামণ নিবারণ করিতে ইহা অমোঘ। সেই জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহার আমদানি-শুল্ক গ্রহণ করা হয় না, এবং দেশে দেশে ম্যালেরিয়া নিবারণ করিবার জন্য ইহা বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্লাজমোকুইন্ লইয়া নানারূপ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। জেম্স্ (James) নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে দশজন ছাত্রকে পূর্ব্বদিন হইতে প্লাজমোকুইন খাওয়াইয়া পরে উহাদের প্রত্যেকের হস্ত বিনাইন্-টার্শিয়ান্ জীবাণুবাহী মশার খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রীতিমত মশকদংশন করাইবার পর আরো ছয় দিন প্লাজমোকুইন্ খাওয়ানো হইল,—ফলে দশজনের মধ্যে একজনেরও জর হইল না, এবং রক্তে জীবাণুর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। তুলনা করিবার জন্য ঐ সঙ্গে আরো কয়েকজনকে ঐরূপে দংশন করানো হইল এবং প্লাজমোকুইনের পরিবর্ত্তে তন্মধ্যে কয়েকজনকে আট দিন যাবৎ কুইনিন দেওয়া হইল, আর কয়েকজনকে কিছুই দেওয়া হইল না; ফলে উহাদের দুই দলের মধ্যেই অনেকের ম্যালেরিয়া হইতে দেখা গেল।

বিনাইন্-টার্শিয়ান্ ও কোয়ার্টান্ ম্যালেরিয়াতে প্লাজমোকুইনের ক্ষমতা কুইনিন অপেক্ষা অনেক বেশী। যদি রক্তপরীক্ষায় জানা যায় যে রোগটি খাঁটি বিনাইন্-টার্শিয়ান্ বা খাঁটি কোয়ার্টান্—অথবা রক্তপরীক্ষা

না করিলেও যদি দেখা যায় যে ঠিক নিয়মিতভাবে একদিন বা দুইদিন অন্তর পালাজর হইতেছে এবং এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হইতেছে না, তাহা হইলে শুদ্ধমাত্র প্লাজমোকুইনের দ্বারাও সে জর আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু যদি মিশ্রিত ম্যালেরিয়া বলিয়া সন্দেহ হয়, কিংবা রক্ত পরীক্ষার উপায় না থাকে, অথবা জরের কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকে, তাহা হইলে প্লাজমোকুইনের সহিত কুইনিনের একত্র প্রয়োগ করাই নিরাপদ।

পুরাতন ও পৌনঃপুনিক ম্যালেরিয়াতে এইরূপ কুইনিন-প্লাজমোকুইনের মিলিত-চিকিৎসা সবিশেষ ফলপ্রদ। সকলেই জানেন যে পুরাতন ম্যালেরিয়া অধিকাংশই বিনাইন্-টার্শিয়ান্ ঘটিত। কেবল কুইনিনে তাহাতে বিশেষ কাজ না হইতে পারে, কিন্তু প্লাজমোকুইন সঙ্গে থাকিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

নূতন জরে সিন্টনের প্রণালীতে কুইনিন মিকশ্চার দিয়া অধিকন্তু প্রত্যহ ১/৬ গ্রেনের একমাত্রা করিয়া প্লাজমোকুইন্ দেওয়াই ভাল। সাধারণ ম্যালেরিয়াতে **কুইনো-প্লাজমোকুইন্ ট্যাবলেট্** (Quino-plasmoquine) প্রত্যহ তিনটি করিয়া ব্যবহার করা চলিতে পারে। ইহার প্রত্যেক বড়িতে ৪½ গ্রেন কুইনিন্ ও ১/৬ গ্রেন প্লাজমোকুইন্ আছে। কুইনিন ও প্লাজমোকুইন্ একত্রে আছে বলিয়া এই ট্যাবলেটের আজকাল খুব কাট্‌তি হইয়াছে।

প্লাজমোকুইনের মাত্রা সম্বন্ধে কিছু সাবধানতার আবশ্যক, কারণ ইহা বিষাক্ত (toxic) ঔষধ, বেশী মাত্রায় দিলে অনিষ্ট হইতে পারে। পূর্ব্বে ইহার মাত্রা ছিল ১/৩ গ্রেন, কিন্তু এখনকার মাত্রা ১/৬ গ্রেন করিয়া প্রত্যহ তিনবার। অর্থাৎ ইহার দৈনিক মাত্রা ½ গ্রেন পর্য্যন্ত। অনেকে তিনবার না দিয়া দুইবারও দেন। বিরাম না দিয়া এইরূপ মাত্রায় দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইহা দেওয়া যাইতে পারে। আবিষ্কারকর্ত্তা বলেন যে অবিরাম না দিয়া, ইহা প্রথম এক সপ্তাহ প্রত্যহ দিবার পর চারদিন করিয়া বিশ্রাম দিয়া প্রতি দফায় তিনদিন করিয়া আরো পাঁচ দফা প্রয়োগ করা ভাল। কিন্তু সিন্টন্ তাহা অনুমোদন করেন না। তিনি একাদিক্রমে ইহা দুই সপ্তাহ হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিতে বলেন।

কুইনিনের সঙ্গে ব্যবহার হইলে ইহার দৈনিক মাত্রা আরো কম করিতে হইবে,—প্রত্যহ $\frac{১}{৬}$ গ্রেনের অধিক দিবার মোটেই আবশ্যকতা নাই।

ছেলেদের মাত্রা—এক বৎসরের নিম্নে হইলে দৈনিক মোট $\frac{১}{২৪}$ গ্রেন। তদূর্দ্ধে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত দৈনিক $\frac{১}{১২}$ গ্রেন। দশ বৎসর পর্য্যন্ত দৈনিক $\frac{১}{৬}$ গ্রেন। বয়স তদূর্দ্ধে হইলে পূর্ণমাত্রা। প্লাজমোকুইন্ খাইতে তিতা নহে, মাত্রাও অতি অল্প। সুতরাং ছেলেদের অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ণবয়স্কদের অপেক্ষা শিশুরা প্লাজমোকুইন্ উত্তমরূপে সহ্য করিতে পারে। ইহার সহিত ইউকুইনিন্ মিশাইয়া কন্‌ডেন্সড্-মিল্কের সহিত একত্রে দিলে ছেলেরা বুঝিতেই পারিবে না যে ঔষধ খাইতেছে। অথবা ঐ পুরিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া পরে কিছু জল মিশাইয়া তরল করিয়া অনায়াসে খাওয়ানো যায়।

প্লাজ্‌মোকুইনের উপকারিতা যথেষ্ট থাকিলেও ইহার কতকগুলি দোষ আছে, তাহা সকলের জানিয়া রাখা দরকার। ইহা বিষাক্ত ঔষধ, সুতরাং সাবধানতার সহিত ইহা প্রয়োগ করা আবশ্যক। অনেকেরই ইহাতে কোনোরূপ অনিষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু কাহারো কাহারো হঠাৎ অনিষ্ট হইতে দেখা যায়। ইহাতে কাহারো কাহারো গায়ের বর্ণ নীল হইয়া যাইতে দেখা যায়,—রক্তের মধ্যে methæmoglobin অধিক পরিমাণে জমাতে ঐরূপ রং হয়। ইহাতে অবশ্য তত অনিষ্ট হয় না, কারণ ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেই শীঘ্র স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসে। কিন্তু কাহারো কাহারো প্লাজ্‌মোকুইন্ খাইলেই অত্যন্ত পেটব্যথা করিতে থাকে, এবং কলিকের মত অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে। খালিপেটে প্লাজ্‌মোকুইন্ খাইলেই প্রায় এরূপ লক্ষণ হইতে দেখা যায়; ভরা পেটে খাইলে এবং ঔষধের পর অনেকটা জলপান করিলে ইহা হয় না। সেইজন্য রোগীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত,—**প্রত্যেক বার কিছু আহারের পর এই ঔষধ সেব্য,—খালিপেটে নয়।** যাহার পেটব্যথা আরম্ভ হইয়াছে তাহার ঔষধ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত,—এবং অল্প পরিমাণ অ্যাস্‌পিরিনের সহিত সোডা বাইকার্ব মিশাইয়া খাইতে দিলে ব্যথা কমে। **টিংচার হাইয়োসিয়েমাস্** (Tinct. Hyosciamus) ৩০ ফোঁটা মাত্রায় এই ব্যথা নিবারণের একটি চমৎকার

ঔষধ। কয়েক ফোঁটা **ক্লোরোডাইন্** খাইতে দিলেও ব্যথা তৎক্ষণাৎ কমিয়া যায়।

প্লাজ্‌মোকুইন্ আমরা অনেকেই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং সাবধান হইয়া দিলে যথেষ্ট উপকারও পাই। তবে আমরা প্রায়ই ইহা একক দিইনা, কুইনিনের সহিত মিলাইয়া প্রয়োগ করি। কিন্তু লীগ অফ নেশন্‌স্-এর ম্যালেরিয়া কমিশন এ ব্যবস্থা পছন্দ করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে ইহাতে দুইটি ঔষধ একত্রে দেওয়া হইতেছে বিবেচনায় প্লাজ্‌মোকুইন্ উচিত মাত্রা অপেক্ষা কম করিয়া দেওয়া হয়,—তাহাতে রিল্যাপ্স্ নিবারিত হইতে পারে না,—আর কুইনিন যে রিল্যাপ্স্ নিবারণ করিবে না ইহা তো জানা কথা। অতএব যেরূপ ভাবে দিতেছ দাও,—কিন্তু এ কথা ভাবিও না যে তাহাতে রিল্যাপ্স্ বন্ধ হইবে। তাঁহারা যাহাই বলুন,—আমরা সকলেই দেখিতে পাই ইহাতে অনেক পুরাতন ম্যালেরিয়া আরোগ্য হইয়াছে।

বিষাক্ত ঔষধ শুনিয়া কেহ কেহ ইহা মোটেই ব্যবহার করিতে চান না। সেই জন্যই ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু যতটা শোনা যায় বাস্তবিক বোধ হয় ততটা বিষাক্ত ইহা নয়। দৈবাৎ হয় তো কাহারো পেট কামড়াইয়াছে বা ভেদ-বমি হইয়াছে বটে,—কিন্তু মারাত্মক কিছু হইয়াছে বলিয়া ক্বচিৎ শুনা গিয়াছে। ইহা গর্ভাবস্থাতে দেওয়া গিয়াছে,—কচি শিশুদের দেওয়া গিয়াছে,—এবং ব্ল্যাক্-ওয়াটার ফিবারেও দেওয়া গিয়াছে,—তাহাতে অপকার হয় নাই।

অনেকে বলেন আসলে যখন ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্ ম্যালেরিয়াতেই ইহা কিছু করিতে পারে না, তবে আর ইহার বাহাদুরী কি? সত্য বটে যে ইহার গুণ সীমাবদ্ধ,—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কুইনিনের যে ক্ষমতা নাই, সেই অভাবটুকু পূরণ করিতে পারাই ইহার বিশেষত্ব। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ইহা আপন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। চারি প্রকার অবস্থায় ইহার ক্ষমতা অপ্রতিদ্বন্দী; যথা—

(১) পালাজ্বর গুলিতে।
(২) পুরাতন ম্যালেরিয়াতে (বিনাইন্)।
(৩) ম্যালেরিয়ার বীজ নাশ করিয়া সংক্রামণ নিবারণ করিতে।

(৪) কুইনিনের অক্ষমতাগুলি পূরন করিয়া আরোগ্যক্রিয়া সম্পূর্ণ করিতে।

আটেব্রিন্ (Atebrin)

ম্যালিগ্ন্যান্ট্ ম্যালেরিয়াতে প্লাজ্মোকুইন্ ব্যর্থ বলিয়া পুনরায় নূতন ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা হইতে থাকে। ফলে জার্ম্মানির বায়ার ল্যাবরেটরিতে (by Mauss and Mietzsch) ইহা ১৯২৯ সালে আবিষ্কৃত হয়। ইহা acridine নামক এক রঞ্জন-পদার্থ (dye) হইতে যৌগিক রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে (synthetically) প্রস্তুত, সেইজন্য ইহা দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ। ইহার জটিল রাসায়নিক আখ্যা dihydrochloride of 2-methoxy-6-chloro-9-diethyl-amino-pentyl-amino--acridine। acridine নামক পদার্থটি পূর্ব্বে ম্যালেরিয়াতে কেহ কেহ ব্যবহার করিতেন। আটেব্রিনের পূর্ব্বে জার্ম্মানি হইতে **মালার্কান্** (Malarcan) নামে একটি ঔষধ প্রস্তত হইত, কেহ কেহ ম্যালেরিয়াতে তাহা ব্যবহার করিতেন। উহাতে acridine ও কুইনিন দুই মিশ্রিত আছে,—কিন্তু acridine-এর মাত্রা খুব কম। উহার পর আটেব্রিনের আবিষ্কার হয়। আটেব্রিন আবিষ্কারের পর acridine-সংযুক্ত আরো একটি ঔষধ হাওয়ার্ডস্ এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রস্তত হইয়াছে, তাহার নাম **টেবেট্রেন** (Tebetren)। ইহাতে কুইনিন, কেফীন্ (caffeine) ও acridine,—তিন পদার্থ মিশ্রিত আছে। Acridine-এর মাত্রা ইহাতে অল্প,—মাত্র 0.65%। যাহাই হউক এই সকল acridine-সংক্রান্ত ঔষধের মধ্যে **আটেব্রিনই** যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। সকলেই এ-গুলির তুলনা করিয়া আটেব্রিনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

আটেব্রিন্ বর্ত্তমান জগতের এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার। ইহা কুইনিনেরই মত সমক্রিয়াবান, কিন্তু কুইনিন অপেক্ষা অনেকগুণে উৎকৃষ্ট। ইহার আশ্চর্য্য বিশেষত্ব এই যে **সকল প্রকার ম্যালেরিয়াতেই** ইহা সমান কাজ করে। বিনাইন-টার্শিয়ান ও কোয়ার্টান ম্যালেরিয়াতে ইহার ক্রিয়া কুইনিন অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ (প্লাজমোকুইনের সমান),

এবং ম্যালিগ্ন্যান্ট্ ম্যালেরিয়াতেও ইহার ক্রিয়া কুইনিন অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। সুতরাং এই ঔষধটির বিশেষ সুবিধা এই যে কোন প্রকারের ম্যালেরিয়া তাহা বিবেচনা করিবার কোনো প্রয়োজনই হয় না, যে-কোনো ম্যালেরিয়াতে ইহা দেওয়া যাইতে পারে। ইহার আর এক অদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে **মাত্র পাঁচদিনে** (অথবা উর্দ্ধসংখ্যা সাতদিনে) ইহার চিকিৎসা সম্পূর্ণ,—তাহার পর আর ঐ ঔষধ দিবার প্রয়োজন নাই। পাচ বা সাত দিনের চিকিৎসায় ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল করা সম্ভবপর হইবে তাহা কখনও কল্পনা করা যায় নাই,—কিন্তু আটেব্রিনের দ্বারা তাহাই হয়। পাঁচদিন বা সাতদিন মাত্র ঔষধ খাইয়া রোগী নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে যে তাহার আর জ্বর হইবে না, এবং ঔষধও আর খাইতে হইবে না। ম্যালেরিয়ার দেশের লোকের পক্ষে এ কথার মূল্য কত তাহা সহজেই অনুমেয়।

আটেব্রিনের সুখ্যাতি সকলেই একবাক্যে করেন। প্লাজ্মোকুইনের অনেক নিন্দা শুনা যায়, কিন্তু ইহার নিন্দা কেহই করেন নাই। ইহার আবিষ্কার হওয়াতে প্লাজ্মোকুইনের গুণও চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার কারণ ম্যালিগ্ন্যান্ট্ ম্যালেরিয়াতে ইহার চমৎকার সাফল্য। লীগ অফ নেশন্স্-এর ম্যালেরিয়া-কমিশনের সদস্যগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে তরুণ ম্যালিগ্ন্যান্ট্ ম্যালেরিয়াতে ইহা কুইনিন অপেক্ষা অনেক ভাল ("definitely superior to quinine")। বিলাতে জেম্স্ (James) স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন ম্যালিগ্ন্যান্ট্ ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ইহা যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে ("marks a new epoch in the therapeutics of malignant malaria")। ইটালির যে ম্যালেরিয়া মোটেই কুইনিনের বাধ্য নয়,—বরং কুইনিন দিলে যাহাতে উল্টা বিপত্তি হয়, সেই ম্যালেরিয়াতে আটেব্রিন দিয়া যে ফল তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—কুইনিনের সহিত তাহার তুলনা হয় না ("can not be justifiably included in the same category")। যে দেশের ম্যালেরিয়াতে কুইনিন প্রায় নিষ্ফল, সেখানেই আটেব্রিন সাফল্য লাভ করিয়াছে। মালাক্কা উপদ্বীপের হুপ্স্ (Hoops) বলেন, পাঁচদিনে ম্যালেরিয়া আরোগ্য করা ট্রপিক্যাল ব্যাধি-চিকিৎসার ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা ("an event in the history of tropical

medicine")। মালয় উপদ্বীপের ডান্‌কান্ (Duncan) বলেন ইহাতে শতকরা ৫০ জনের জ্বর ২০ ঘণ্টায় ছাড়িয়া যায়, তৎপরে পুনর্ব্বার আর হয় না,—বাকি ৫০ জনের সম্পূর্ণ জ্বরত্যাগ হইতে বড় জোর ৪৪ ঘণ্টা সময় লাগে। ইহা ব্যবহারের তৃতীয় দিন হইতে রক্তের মধ্যে একটিও জীবাণু পাওয়া যায় না। **বিনাইন-টার্শিয়ান** ম্যালেরিয়াতে আটেব্রিনের দ্বারা মাত্র পাঁচ দিনের চিকিৎসায় এখন শতকরা দশটির বেশী রিল্যাপ্স্ হয় না,—যেখানে বহুদিনের কুইনিন চিকিৎসাতেও পূর্ব্বে শতকরা পঞ্চাশটি করিয়া রিল্যাপ্স্ হইত। **ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্ ম্যালেরিয়াতে** আটেব্রিনের চিকিৎসায় রিল্যাপ্সের সংখ্যা শতকরা মাত্র পাঁচটি। মোটের উপর আটেব্রিনের দ্বারা শতকরা নব্বুইটি বিনাইন-টার্শিয়ান ও শতকরা পঁচানব্বুইটি ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া একেবারে আরোগ্য হয়, একথা অনেকেই বলেন।

আটেব্রিনের আস্বাদ কিছু তিক্ত বটে, তবে কুইনিনের মত তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুখে লাগিয়া থাকে না, জল খাইলেই সে তিক্ততা দূর হইয়া যায়। ইহার দ্বারা কানে তালা লাগা, মাথা ঘোরা, ক্ষুধামান্দ্য, গা বমি-বমি করা, দুর্ব্বল বোধ করা, প্রভৃতি কুইনিনের যত কিছু উপসর্গ তাহা কিছুই হয় না। বরং ইহা রোগীকে কিছু সবল করিয়া রাখে। আটেব্রিনের আর এক বিশেষত্ব এই যে ইহা খাইতে খাইতেই রক্তের সমৃদ্ধি (increase in haemoglobin percentage) লক্ষ্য করা যায়, এবং চিকিৎসা বন্ধ হইয়া গেলেও তাহা স্থায়ী হয়। প্লীহাও দেখিতে দেখিতে যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়। ইহা হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল করে না। হৃদ্‌রোগগ্রস্ত (myocarditis) রোগীকেও ইহা অনায়াসে দেওয়া গিয়াছে, কোনো অনিষ্ট হয় নাই।

ইহা গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দিতে কোনো আশঙ্কা নাই। ইহা সকল সময়েই দেওয়া যাইতে পারে। জ্বরের উপর দিতেও কোনো বাধা নাই। কুইনিন যাহার মোটে সহ্য হয় না—আটেব্রিন তাহাকে অনায়াসে দেওয়া চলে। বিশেষতঃ যে দেশে ব্ল্যাকওয়াটার-ফিবার হয়, সেখানে প্রথম হইতে ইহা ব্যবহার করিলে উক্ত রোগের সম্ভাবনা থাকে না। ব্ল্যাকওয়াটার-ফিবারে ইহাই এখন একমাত্র ঔষধ।

তবে ইহা যে একেবারে নির্দ্দোষ ঔষধ একথা বলা যায় না। ইহার

ব্যবহারে কাহারো কাহারো, বিশেষতঃ রক্তহীনতার দরুণ যাহাদের শরীর পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে, তাহাদের—গায়ের রং হরিদ্রাভ হইয়া যায়, যদিও তাহাতে শরীরের কোনো অনিষ্ট হয় না। কাহারো কাহারো ইহাতে কয়েক প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণও হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা খাইয়া কেহ কেহ শরীরে একপ্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, এবং যত দিন ইহা ব্যবহার করে ততদিন বিছানা হইতে মাথা তুলিতে পারে না—যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে। কাহারো কাহারো ইহাতে পেটও কামড়ায়। তবে এসকল লক্ষণ সংখ্যায় খুব কম দেখা যায়। প্লাজ্‌মোকুইনের অপেক্ষা ইহার বিষাক্ততা (toxicity) অনেক কম,—কিন্তু আটেব্রিন ও প্লাজ্‌মোকুইন্ একত্রে প্রয়োগ করিলে দুইয়ের মিশ্রণে বিষাক্ততা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। দুইটি ঔষধ একসঙ্গে ব্যবহারে পেটে দারুণ যন্ত্রণা, সমস্ত শরীর নীল হইয়া যাওয়া, অত্যধিক শ্বাসকষ্ট ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার কথা অনেক শুনা গিয়াছে। ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেও এই সকল লক্ষণ দূর হইতে এক সপ্তাহ বিলম্ব হয়। সেই জন্য দুইটি নূতন ঔষধ একত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

আটেব্রিনের মাত্রা ১½ গ্রেন। এইরূপ মাত্রায় তিনবার করিয়া ইহা প্রত্যহ সেব্য। ১৫ মাত্রায় চিকিৎসা সম্পূর্ণ। **ইহা প্রত্যেকবার কিছু আহারের পর সেব্য, খালিপেটে কখনও ব্যবহার করা হইবে না।** **ছেলেদের মাত্রা,**—এক বৎসরের নীচে হইলে সমস্ত দিনে মোট অর্দ্ধ-বড়ি। দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দৈনিক ১ বড়ি,—পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ১½ বড়ি,—এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত মোট দুই বড়ি সমস্ত দিনে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। দশ বৎসরের উপর হইলে পূর্ণ মাত্রা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পাঁচ দিনে ইহার চিকিৎসা সম্পূর্ণ, কিন্তু সাত দিন পর্য্যন্তও ইহা একাদিক্রমে ব্যবহার করা চলিতে পারে। আটেব্রিন ব্যবহারে যদি জ্বরত্যাগ হইতে কিছু বিলম্ব লাগিয়া যায়, কিংবা ম্যালেরিয়া যদি কিছুদিনের পুরাতন হয়, তবে পাঁচদিনের পরিবর্ত্তে ইহা সাত দিন ব্যবহার করিলেই ভাল হয় এবং আরোগ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

আটেব্রিন্ ইন্‌জেকশন

আটেব্রিন মুখ দিয়া খাওয়াইয়া উহার ক্রিয়া হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে; অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টার আগে উহার দ্বারা কোনোরূপ ফল প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং মারাত্মক ম্যালেরিয়াতে এত বিলম্বের সময় না থাকিলে ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করিতে হয়। যে সকল অবস্থায় আমরা ক্ষিপ্র ক্রিয়ার জন্য কুইনিন ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করিয়া থাকি, সেই সকল অবস্থায় আটেব্রিন ইন্‌জেকশনও আশু ফলপ্রদ। ইহাতে ব্যথা হয় না, সুতরাং ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন অনায়াসে দেওয়া যায়, এবং অনেকে বলেন কুইনিনের অপেক্ষা ইহাতে স্থায়ী উপকার দেখায়। ইহার ইন্ট্রাভেনাস ইন্‌জেকশন দিতেও বিশেষ আশঙ্কা নাই এ কথা লীগ অফ নেশন্‌স্ হইতেই বলা হইয়াছে। ট্রপিক্যাল হাঁসপাতালে আটেব্রিন ইন্‌জেকশন সম্বন্ধে নোল্‌স্, চোপরা ও বিরাজমোহন দাসগুপ্ত নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। এক জাতীয় বানর আছে (Silenus rhesus) যাহাদের শরীরে Plasmodium knowlesi নামক (নোল্‌সের আবিষ্কৃত) জীবাণুর দ্বারা ম্যালেরিয়া উৎপাদন করা যায়। এই ম্যালেরিয়া মানুষের ম্যালেরিয়ার মতই, বরং উহা অপেক্ষা অনেক ভীষণ, শীঘ্র চিকিৎসা না করিলে এ রোগে বানর কিছুতেই বাঁচে না। এই প্রকার ম্যালেরিয়ার কয়েকটিতে কুইনিন ইন্‌জেকশন দিয়া ও অপর কয়েকটিতে আটেব্রিন ইন্‌জেকশন দিয়া পরস্পরের ক্রিয়ার কিরূপ তারতম্য ঘটে তাহা তুলনা করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহাতে জানা গিয়াছে যে একদফায় ২ গ্রেনের অধিক কুইনিন বানরকে ইন্‌জেকশন দেওয়া চলে না, এবং ইহার একটি ইন্‌জেকশনেও কিছু ফল হয় না, উপর্য্যুপরি দুই তিনটি ইন্‌জেকশন দিবার পর রোগের কিছু দমন হয়,—তাহা না দিলে বানরের মৃত্যু নিবারণ করা যায় না। কিন্তু আটেব্রিন অতি অল্প মাত্রায় একটি মাত্র ইন্‌জেকশন দিলেই তৎক্ষণাৎ রোগের উপশম হয়, এবং দুইটি ইন্‌জেকশন দিলে রক্তে একটিও জীবাণু লক্ষিত হয় না। কিন্তু ইহার ১০।১৫ দিন পরে রক্তে আবার জীবাণু দেখা যায়, এবং তখন পুনরায় একটি আটেব্রিন না দিলে বানরটি এই পুনরাক্রমণের ফলে মরিয়া যাইতে পারে।

মানুষের ম্যালেরিয়াতে অবশ্য এরূপ হয় না। কিন্তু এই এক্সপেরিমেণ্ট হইতে জানা যায় যে জীবের পক্ষে আটেব্রিন ইন্‌জেকশন দেওয়া নিরাপদ এবং মানুষকে উহা অনায়াসে দেওয়া চলিতে পারে।

ইন্‌জেকশনের জন্য একরূপ স্বতন্ত্র আটেব্রিন ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম **আটেব্রিন্ মুসোনেট্** (atebrin-musonate)। ইহা 'ইন্‌জেকশনের আটেব্রিন্' (atebrin for injection) বলিয়া বিক্রীত হয়। ইহা দুইরূপ মাত্রায় কিনিতে পাওয়া যায়,—০·৩ গ্রাম ও ০·১ গ্রাম। প্রত্যেক মাত্রাই স্বতন্ত্র ভাবে গুঁড়া আকারে এক একটি কাচের আম্পূলের মধ্যে ভরা থাকে। আম্পূলের মাথাটি ভাঙিয়া দিয়া তাহারই মধ্যে বিশুদ্ধ (ষ্টেরাইল্) ডিস্‌টিলড্ জল ভরিয়া দিলে গুঁড়াটি তাহাতে গলিয়া যায় এবং তখন উহা পিচকারীতে টানিয়া লইয়া ইন্‌জেকশন দিতে হয়।

ইন্‌জেকশনের মাত্রা—পূর্ণবয়স্কের জন্য ০·৩ গ্রাম, ইহা ৯।১০ সি. সি. ডিস্‌টিল্‌ড্ জল দিয়া গুলিতে হয়। রোগী ৫ বৎসরের নিম্নবয়স্ক হইলে ০·১ গ্রাম মাত্রায় (৩ সি. সি. জলে গুলিয়া) ইন্‌জেকশন দেওয়া উচিত, এবং ৫ বৎসর হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের পক্ষে ০·২ গ্রাম মাত্রা (৬ সি. সি. জলে) ব্যবহার করা উচিত। আট বৎসরের উর্দ্ধে পূর্ণমাত্রা। এইগুলি কেবল **ইন্ট্রামাস্কুলার** ইন্‌জেকশনের মাত্রা, **ইন্ট্রাভেনাস** দিতে হইলে মাত্রা কম করিতে হইবে,—উহা ০·১ গ্রামের অধিক দেওয়া উচিত নয়। রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলেই ইন্ট্রাভেনাস ইন্‌জেকশন দিতে হয়, নতুবা ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশনেও খুব দ্রুত ফল হয়, এবং চার ঘণ্টার মধ্যেই তাহা বেশ প্রত্যক্ষ করা যায়।

এই ইন্‌জেকশন নিরাপদ হইলেও দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। ইন্‌জেকশন প্রয়োগের পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর দেহে সূর্য্যালোক লাগিতে দিতে নাই, কারণ আলো লাগিলে সে সময় গাত্রদাহ ঘটিবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কথা, ইন্‌জেকশনের পিচকারী অ্যাল্‌কোহলে ষ্টেরিলাইজ্ (sterilize) না করিয়া জলে ফুটাইয়া লওয়া ভাল। যদি অ্যাল্‌কোহলেই ধৌত করা হয়, তবে তাহাতে ঔষধ ভরিবার পূর্ব্বে একবার উহা ষ্টেরাইল্ ডিস্‌টিল্‌ড্ জলে উত্তমরূপে ধুইয়া লওয়া উচিত, তাহা হইলে ইন্‌জেকশনে একটুও ব্যথা

হয় না, নতুবা ঔষধের সহিত অ্যাল্‌কোহলের সংস্পর্শ হইলে কিছু ব্যথা হইতে পারে।

শুনা যাইতেছে, এই ইন্‌জেকশনের বিশেষ গুণ এই যে উপর্য্যুপরি দুইদিন পূর্ণমাত্রায় দুইটি ইন্‌জেকশন দিলেই তাহাতে ম্যালেরিয়া একেবারে আরোগ্য হইয়া যায়, আর কোনো পরবর্তী চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। সম্প্রতি ইহা পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। কলম্বোতে (১৯৩৫) ম্যালেরিয়ার ভীষণ এপিডেমিক হইতেছিল। তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ (Blazee and Simeons) এ সময় যাহাদের দুইটি করিয়া আটেব্রিন-মুসোনেট্ ইন্‌জেকশন দিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই ম্যালেরিয়া আরোগ্য হইয়া গিয়াছে, কেবল দুই একটি মাত্র শঙ্কটাপন্ন অবস্থার রোগী উহাতে বাঁচে নাই। ইহা যদি সত্য হয় তবে আমাদের দেশের পক্ষে তাহা বড়ই আশার কথা সন্দেহ নাই। অবশ্য এই ইন্‌জেকশনের গুণাগুণ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু বলিবার এখনও সময় হয় নাই, এবং উহাতে রিল্যাপ্স্ হইবার সম্ভাবনা একেবারে দূর হয় কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই, তবে অদূর ভবিষ্যতে সকলেই তাহা জানিতে পারিবেন।

কিন্তু আটেব্রিনেরও তিনটি দোষ আছে। প্রথমটি এই যে ইহা জীবাণু মারে কিন্তু তাহার বীজ মারিতে পারে না। সুতরাং রোগের সংক্রামণ বন্ধ করিতে হইলে ইহার পর আবার প্লাজমোকুইন দিতে হইবে। আরোগ্য ও সংক্রামণ নিবারণ করিতে দুই প্রকার ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন, অতএব দুইটি স্বতন্ত্র ঔষধ কিনিতে হইবে; এবং তাহা একত্রে ব্যবহার চলিবে না। দ্বিতীয় দোষ এই যে ইহা ম্যালেরিয়ার স্পোরোজয়েট নষ্ট করিতে পারে না। স্পোরোজয়েট নাশ করিতে পারে এরূপ কোনো ঔষধই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, তবে আশা করা যাইতেছে যে শীঘ্রই এরূপ ঔষধও আবিষ্কৃত হইবে। ইহার তৃতীয় দোষ এই যে ইহার দাম বেশী, আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা কিনিয়া খাওয়া কষ্টকর। ইহার বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে কোন ঔষধ সস্তা এবং কোনটি দামী তাহার বিচার করিতে হইলে একটি রোগের জন্য সম্পূর্ণ খরচ মোট কত হইল (what is the cost of the

disease) তাহাই খতাইয়া দেখা প্রয়োজন; অনেক দিন যাবৎ কুইনিন খাওয়ার যে খরচ, অল্পদিন আটেব্রিন খাইতেও সেই খরচ, অথচ ইহাতে বেশী-দিন অসুস্থ হইয়া থাকিতে হয় না, শীঘ্র আরোগ্য হইয়া আপন কাজে লাগা যায়, সুতরাং আপাততঃ দুর্মূল্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা সস্তা। কিন্তু সকলেই বুঝিবেন এ যুক্তি এদেশে অচল; যাহার সঞ্চয় বা সামর্থ্য নাই সে যুক্তি দিয়া কি বিচার করিবে? ইহা যথেষ্ট সুলভ হওয়া চাই, নতুবা লোকে ইহা ব্যবহার করিতে পারিবে না। তবে নূতন ঔষধ বলিয়াই ইহার দাম এখন বেশী। আশা করা যায় কালক্রমে ইহার দাম কমিবে। ইহা শুল্করহিত করিয়া দিলে দাম যে কতক কমিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আফ্রিকাতে, মালয় উপদ্বীপে এবং সিংহলেও ইহা শুল্করহিত করা হইয়াছে, আশা করা যায় ভারতেও সেইরূপ ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হইবে। আটেব্রিনের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আটেব্রিনের ক্রিয়ার চারিটি বৈশিষ্ট্য এই,—

(১) ম্যালেরিয়া মাত্রেই ইহা প্রয়োগ করা চলে, এবং সকল অবস্থাতেই ইহা দেওয়া যায়।

(২) ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে ইহা কুইনিনের সমান ক্রিয়া করে, অধিকন্তু রিল্যাপ্সের সম্ভাবনা কম হয়।

(৩) কুইনিন যেখানে অচল, সেখানে ইহা অনায়াসে দেওয়া চলে। ব্ল্যাক্‌ওয়াটার-ফিবারে ইহাই একমাত্র ঔষধ।

(৪) ইহা খাইতে কষ্ট নাই এবং পাঁচদিনে ইহার চিকিৎসা সমাপ্ত।

তিন ঔষধের তিনরূপ ক্রিয়া

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে একটির স্থলে এখন আমরা তিনটি ঔষধ হাতে পাইয়াছি,—**কুইনিন, প্লাজমোকুইন** ও **আটেব্রিন**। বিচার করিয়া এখন আমাদিগকে এইগুলি যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে। নূতনটির আবিষ্কারে পুরাতনটি যে একেবারে অচল হইয়া যাইবে, বা আটেব্রিন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কুইনিনের কোনো প্রয়োজন থাকিবে না, এরূপ কখনও হইতে পারে না। তিনটি ঔষধের পৃথক পৃথক গুণ আছে।

প্রথমটির যে গুণ আছে দ্বিতীয়টির তাহা নাই, এবং দ্বিতীয়ের যাহা আছে, তৃতীয়ের তাহা নাই। অতএব এখন প্রয়োজন অনুসারে তিনটিকেই আমাদের ব্যবহার করিতে হইবে। নূতন ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা শুলেমান নিজেই বলেন,—নূতন ঔষধ কুইনিনকে স্থানচ্যুত করার জন্য নয় (not to supplant quinine)। কুইনিন যাহা করিতে অক্ষম সেই কাজ করিবার জন্যই এ গুলির সৃষ্টি। বাস্তবিক ঔষধ মাত্রেরই সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে। প্রত্যেক ঔষধের এক-একটি বিশিষ্ট গুণ আছে, সেই গুণটি কেবল তাহারই নিজস্ব; অপর একটি ঔষধ কখনও তাহার অনুরূপ হইতে পারে না। তাহা যদি হইত তবে পৃথিবীতে এত বিভিন্ন ঔষধ থাকিবার কোনো আবশ্যকতা থাকিত না, মাত্র কয়েকটি ঔষধেই সমস্ত কাজ চলিয়া যাইত। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিতে রোগ-বিশ্লেষণ শক্তি যত বাড়িতেছে, ঔষধের সংখ্যাও তত বাড়িতেছে, চিকিৎসক ততই সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা যথাযথ স্থানে তাহার প্রয়োগ করিতেছেন। কেবল ম্যালেরিয়া কেন, কোনো রোগেরই যে একটি মাত্র ঔষধ আছে বা কখনও থাকিবে, ইহা মনে করাই ভুল। যাহাকে আমরা স্পেসিফিক্ ঔষধ বলি, অর্থাৎ কোনো বিশেষ রোগের বিশিষ্ট ঔষধ বলিয়া যাহাকে বুঝি, তাহার দ্বারা ঐ রোগ অধিকাংশই আরোগ্য হয় বটে, কিন্তু পূরাপূরি সাফল্য কোনো ঔষধেই পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য যে রোগের দুই তিনটি স্পেসিফিক্ থাকে, তাহাতে অবস্থা বিশেষে প্রত্যেকটিরই ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ম্যালেরিয়াতে উপস্থিত আমরা তিনটি স্পেসিফিক্ পাইয়াছি, তথাপি তাহার কোনোটিকে বর্জ্জন করা চলিবে না। নূতন ঔষধ পাইয়াছি বলিয়া কুইনিন একেবারে বর্জ্জন করিয়া যেখানেই ম্যালেরিয়া দেখিব সেখানেই কেবল সেইগুলিকেই প্রয়োগ করিব, ইহাও ঠিক নয়। আবার, নূতন জিনিষকে বিশ্বাস নাই, তদপেক্ষা পুরাতন ও পরিচিত পন্থাই ভাল মনে করিয়া কেবল মাত্র কুইনিনই ব্যবহার করিতে থাকিব, এরূপ একান্ত রক্ষণশীল মনোবৃত্তিও ঠিক নয়। যেখানে যাহা উপকারী সেখানে তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কুইনিন ও নূতন ঔষধ দুইটির মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটুকু মনে করিয়া রাখা আবশ্যক। কুইনিন স্বাভাবিক ভেষজ

দ্রব্য, আর নূতন ঔষধগুলি কৃত্রিম রসায়ন। স্বচ্ছন্দ বনজাত ওষধিবৃক্ষ হইতে কুইনিন আহরিত হয়, আর নূতন ঔষধগুলি গবেষণাগারে জটিল রাসায়নিক যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত। এগুলি অযথা ও অপরিমিত ব্যবহারে কিছু বিপদও আছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এমন অনেক অবস্থা আসিয়া পড়িতে পারে যেখানে মনে হইবে এগুলি অপেক্ষা কুইনিন দেওয়াই নিরাপদ।

মোটের উপর বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। সাধারণ ম্যালেরিয়াতে আমরা সাধারণতঃ কুইনিন দিব। যখন ম্যালেরিয়ার মরশুম দেখা দিয়াছে, তখন কুইনিনের সহিত একটু করিয়া প্লাজমোকুইন্ ব্যবহার করিব, কারণ যাহাতে সংক্রামণ নিবারিত হয় তাহাও আমাদিগকে করিতে হইবে। আর যদি অস্বাভাবিক কিছু ঘটে,—হয়তো কুইনিন পেটে তলাইবে না, বা কুইনিন খাইতে নারাজ, বা কুইনিন সহ্য হয় না, বা যে কারণেই হউক কুইনিন দেওয়া চলে না,—অর্থাৎ যেখানে কুইনিন দিতে গেলে মনে কিছুমাত্র "কিন্তু" উপস্থিত হইবে, সেখানে আটেব্রিন ব্যবহার করিব। যেখানে একটি মাত্রও ব্লাক-ওয়াটার ফিবার দেখা দিয়াছে সেখানে কুইনিনের বদলে আটেব্রিনের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইবে। পুরাতন জরে, এবং যেখানে কুইনিন সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ জর হইতেছে, সেখানে কুইনিনের সহিত প্লাজমোকুইন যোগ করিব। যেখানে তাহাও যথেষ্ট নয়, সেখানে অগ্রে আটেব্রিন পাঁচদিন অথবা সাত দিন ব্যবহার করিয়া তিন দিন রোগীকে বিশ্রাম দিব, অতঃপর টনিক হিসাবে অল্প মাত্রায় (দৈনিক ৬ গ্রেন হিসাবে) কুইনিন বহুদিন পর্য্যন্ত দিতে থাকিব। যে কোনো ম্যালেরিয়াই হউক, এইরূপে বুদ্ধিপূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন ও নিয়মমত প্রয়োগ করিলে তাহা নিশ্চয়ই দমন হইবে।

ম্যালেরিয়ার উপসর্গ চিকিৎসা

(১) **প্রবল জর**—জর অধিক হইলে মাথায় বরফ দেওয়া অথবা ওডিকলোনের জল দিয়া মাথা উত্তমরূপে ধোয়াইয়া দেওয়া উচিত, একটু জলপটি মাত্র দিয়া বিশেষ লাভ হয় না। উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর উপর

উঠিলে তৎক্ষণাৎ শীতল জলে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখা (Cold pack) উচিত, তাহাতে উত্তাপ কমিয়া যায়। একটি বড় বিছানার চাদর ঠাণ্ডাজলে জবজবে করিয়া ভিজাইয়া রোগীর গলা হইতে পা পর্য্যন্ত মুড়িয়া দিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার উপর শীতল জলের ছিটা দিতে হয়; দশ মিনিটকাল এইরূপ করিলে জ্বর নিশ্চয় কিছু কমিবে। ছোট ছেলেদের বেশী জ্বর হইলে তাহাকে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে কিছুক্ষণ গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা উচিত। ইতিমধ্যে মাথায় বরফ প্রভৃতিও দেওয়া হইবে। জ্বর মারাত্মক মনে হইলে ইহার পরই একটু ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া পূর্ণমাত্রায় একটি কুইনিন ইন্‌জেকশন দেওয়া দরকার।

(২) **বমি ও উকি ওঠা**—বমির জন্য ক্যালোমেল প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কুচা বরফ খাইতে দিলে উকি ওঠা বন্ধ হয়। হিক্কার জন্য **স্পিরিট ঈথর** ২০।৩০ ফোঁটা করিয়া দিলে উপকার হয়।

(৩) **গাত্রদাহ**—শীতল জলে পুনঃ পুনঃ গা মুছাইয়া দিলে গাত্রদাহ কমিয়া যায়। পিত্তদোষের নিবৃত্তি হইলেও গাত্রদাহ কমিয়া যায়। পূর্ব্বলিখিত "এ-মিকশ্চারেও" গাত্রদাহ দূর হইবে।

(৪) **মাথার যন্ত্রণা ও গায়ের ব্যথা**—অল্প পরিমাণে অ্যাস্‌পিরিন দিলেই এই সকল যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়, এবং জ্বরও কিছু কমে। ম্যালেরিয়াতেও অ্যাস্‌পিরিন দেওয়া যায়, তবে জ্বরের প্রথম দুই একদিন ব্যতীত উহা ব্যবহার করা উচিত নয়। ম্যালেরিয়ার মাথাধরার একটি উত্তম ঔষধ **টিংচার সিমিসিফিউগা** (Tinct. Cimicifuga)। ইহা ১০ ফোঁটা মাত্রায় কুইনিন মিকশ্চারে দেওয়া চলে। ইহা ম্যালেরিয়ার মস্তিষ্ক-বিকৃতিরও ঔষধ।

(৫) **তৃষ্ণা**—ডাবের জল, মৌরীর জল, তাল-শাঁসের জল প্রভৃতি তৃষ্ণা নিবারণের নানা ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত এবং উপকারী। রোগী যেরূপ জলীয় দ্রব্য পান করিতে চায় তাহাকে সেইরূপ অনুমতি দেওয়া উচিত। **গ্লুকোজের** জলও বিশেষ উপকারী, ইহাতে পানীয় ও পথ্য দুইই হয়। এক আউন্স গ্লুকোজ এক পাইন্ট জলে গুলিয়া উহাতে লেবুর রস দিয়া পান করিতে দিলে সুস্বাদু ও স্নিগ্ধ হয়। ম্যালেরিয়াতেও

গ্লুকোজের প্রয়োজন আছে; শরীরের অম্লাধিক্য (acidosis) ইহার দ্বারা দূর হয়। কম্পের সময় উষ্ণ পানীয় কিংবা চা পান করিতে দিলে বেশ উপকার হয়।

(৬) **উদরাময়**—ভগ্নাংশ মাত্রায় ক্যালোমেল প্রয়োগ করিলে পেটের দোষসমূহ প্রায়ই নিবৃত্ত হয়। উদরাময় অধিক হইলে **ক্লোরোডাইন** বা **টিঞ্চার ওপিয়ম** ১০ ফোঁটা মাত্রায় দেওয়া চলিতে পারে। ক্লোরোডাইন কিংবা টিঞ্চার ওপিয়ম কুইনিন-মিকশ্চারের সহিত একত্রেও মিশাইয়া দেওয়া যায়। উহাতে উদরাময় সারে, পেটের যন্ত্রণা দূর হয়, বমি নিবারণ হয় ও মাথার যন্ত্রণা কমে। এই সকল উপসর্গ থাকিলে কুইনিনের সহিত অল্প মাত্রায় আফিম দিতে দোষ নাই।

(৭) **আমাশা**—ম্যালেরিয়ার সহিত আমাশার লক্ষণ থাকিলে ক্যাষ্টর-অয়েল ইমাল্‌শনের সহিত কুইনিন প্রয়োগ করিলে উহা আরোগ্য হয়। ক্যাষ্টর-অয়েল ইমাল্‌শনের মধ্যেও কুইনিন মিশানো চলিতে পারে, অথবা কুইনিন পৃথক রূপেও দেওয়া যায়।

(৮) **ব্রঙ্কাইটিস্**—সিন্‌টনের প্রণালীতে "এ-মিকশ্চার" ও "কিউ-মিকশ্চার" একযোগে উপর্য্যুপরি প্রয়োগ করাই এই উপসর্গের উত্তম চিকিৎসা।

(৯) **লিভারে ব্যথা**—লিভারে রক্ত জমিয়া যে ব্যথা হয়, ক্যালোমেল প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে তাহা দূর হয়। পূর্ব্বে ইহার জন্য লিভারের উপর লিনিমেন্ট্‌ আইওডিনের প্রলেপ দেওয়া হইত। উহাও উত্তম ব্যবস্থা, কারণ লিভারের উপরকার চামড়ায় জ্বালা (counter-irritation) ধরিলে ভিতরকার রক্তজমা নিবারিত হয়। প্লীহা কামড়াইলে অথবা প্লীহার উপর ব্যথা হইলেও (perisplenitis) ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার প্রেসক্রিপ্‌শনের নমুনা

(১)
কুইনিন সাল্‌ফেট—১০ গ্রেন
অ্যাসিড সাইট্রিক—২০ গ্রেন
ম্যাগ্‌ সালফ্‌— ১০ গ্রেন
স্পিরিট এনিসি— ৫ ফোঁটা
গ্লুকোজ— ১ ড্রাম
জল— ১ আউন্স
প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য
(এই প্রেসক্রিপশন ট্রপিক্যাল হাঁসপাতালে ব্যবহৃত হয়।)

(২)
কুইনিন বাইহাইড্রোক্লোরাইড—৫ গ্রেন
অ্যাসিড হাইড্রোক্লোর্‌ ডিল—১০ ফোঁটা
অ্যাসিড কার্ব্বলিক— ১/২ গ্রেন
এক্‌ষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্সাসি লিকুইড—২০ ফোঁটা
ম্যাগ্‌ সালফ্‌— ৩০ গ্রেন
জল— ১ আউন্স

(ইহা সুবিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের প্রেস্‌ক্রুপশন। সাধারণ ম্যালেরিয়া ইহাতে অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়, পৌনঃপুনিক ম্যালেরিয়াও নিবারিত হয়।)

(৩)
কুইনিন বাইহাইড্রোব্রোমাইড—৬ গ্রেন
অ্যাসিড সাইট্রিক— ১০ গ্রেন
অ্যাসিড হাইড্রোব্রোমিক ডিল্‌—৩০ ফোঁটা
ম্যাগ্‌ সালফ্‌— ৩০ গ্রেন
লিমন সিরাপ— ১ ড্রাম
জল— ১ আউন্স
(কুইনিন খাইলে যাঁহাদের মাথা ঘোরে তাঁহাদের জন্য ইহা ব্যবহার্য্য)

(৪)
কুইনিন্‌ সাল্‌ফেট— ৩ গ্রেন
অ্যাসিড সাল্‌ফিউরিক্‌ ডিল—৪ ফোঁটা
লাইকার আর্সেনিক— ৩ ফোঁটা
ফেরি সাল্‌ফ— ৩ গ্রেন
ম্যাগ্‌ সালফ্‌— ৩০ গ্রেন
টিঙ্কার নক্স ভমিকা— ৫ ফোঁটা
জল— ১ আউন্স
প্রত্যহ আহারান্তে দুইবার সেব্য

(পুরাতন ঘুষ্‌ঘুষে ম্যালেরিয়ার পক্ষে এই ঔষধ উত্তম। মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য হাঁসপাতালে ইহা "স্প্‌লীন্‌-মিকশ্চার" নামে ব্যবহৃত হয়। টনিক হিসাবে ইহা বহুদিন ব্যবহার চলিতে পারে। ম্যালেরিয়ার প্রথম চিকিৎসার পর কিছু দিনের জন্য ব্যবহার করিলে পুনরায় ম্যালেরিয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং শরীর শীঘ্র সুস্থ হইয়া ওঠে। ইহাতে প্রত্যহ ৬ গ্রেন করিয়া কুইনিন পড়ে এবং লীগ অফ নেশনস্‌-ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য উহার এই মাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন।)

(৫)
কুইনিন ফ্লুয়োরাইড (Q. Fluoride) — ১/৪ গ্রেন
নার্কোটিন (Narcotin) — ১/২ গ্রেন
ফেরি সাল্‌ফ (Ferri Sulph.) — ১ গ্রেন
আর্গোটিন (Ergotin) — ১/৪ গ্রেন
সোডা সিনামেট (Soda Cinnamate)— ২ গ্রেন
এক্‌ষ্ট্রাক্ট নক্স ভমিকা (Ext. Nux Vom.)— ১/৮ গ্রেন
আর্হিন্যাল (Arrhenal) — ১/৮ গ্রেন
অ্যালোইন (Aloin) — ১/৪ গ্রেন
এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শিয়ন (Ext. Gentian) — প্রয়োজনমত (Q. S.)

(আহারাদির পর দৈনিক তিনটি করিয়া বড়ি সেব্য। অত্যন্ত পুরাতন ম্যালেরিয়াতে এবং ম্যালেরিয়ার ক্যাকেক্সিয়াতে এই বড়ি বিশেষ উপকারী। এই প্রেসক্রুপশনটি বহুকালের পুরাতন। ইহাতে মাত্র ১/৪ গ্রেন করিয়া কুইনিন আছে, ফ্লুয়োরাইড-কুইনিন ঐরূপ মাত্রাতেই ব্যবহার্য্য। ম্যালেরিয়া যখন ক্যাকেক্সিয়া অবস্থায় পরিণত হয় তখন কুইনিনের মাত্রা অতি অল্পই হওয়া উচিত।

(৬)
প্লাজমোকুইন— ১/১২ গ্রেন
ইউকুইনিন বা এরিষ্টোচিন— ৩ গ্রেন
হাইড্রার্জ কাম্‌ ক্রিটা— ১/৬ গ্রেন
ক্যালসিয়ম ল্যাক্‌টেট— ৩ গ্রেন
শুগার অফ মিল্ক— ৩ গ্রেন
প্রত্যহ তিনবার সেব্য

(ইহা দুই তিন বৎসরের শিশুর জন্য। এই পুরিয়া মধু ও জল মিশাইয়া গুলিয়া খাইতে দেওয়া যায়। বয়স অনুসারে ইউকুইনিনের মাত্রা বাড়াইতে হইবে। ছেলেদের পৌনঃপুনিক জ্বরে এই পুরিয়াতে সুন্দর ফল হয়। অবশ্য উহা খালিপেটে দিতে নাই।

(৭) ২নং মিকশ্চার ২১ মাত্রা ও ১/৬ গ্রেনের সাতটি প্লাজমোকুইন বড়ি। প্রত্যহ তিন মাত্রা ঐ মিকশ্চার ও মধ্যে একবার আহারান্তে একটি করিয়া প্লাজমোকুইন একত্রে সাত দিনের জন্য প্রয়োগ করিলে যে কোনো ম্যালেরিয়া আরোগ্য হইবে।

(৮) আটেব্রিন্ ১½ গ্রেন মাত্রার ১৫টি বড়ি। মাত্র পাঁচদিন আহারান্তে তিনবার করিয়া সেব্য। ইহাতেও সকল প্রকার ম্যালেরিয়া আরোগ্য হইবে।

পুরাতন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা

সাধারণতঃ যাহাকে পুরাতন ম্যালেরিয়া বলা হয়, অর্থাৎ ভাল চিকিৎসার অভাবে যাহার দীর্ঘকালযাবৎ স্থিতি হইয়াছে, তাহার চিকিৎসা প্রথমে নূতন ম্যালেরিয়ার মতই করিতে হইবে। পূর্ব্বে চিকিৎসাদি করানো সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ জ্বর হইতেছে, এমন রোগীর ভার লইয়া যদি সন্দেহ হয় যে ঐ চিকিৎসা উপযুক্ত হয় নাই, তবে সে স্থলেও প্রথমে নূতন ম্যালেরিয়ার মত একবার চিকিৎসা করিয়া দেখিয়া লওয়া দরকার তাহাতে উপকার হয় কি না। অর্থাৎ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী মাত্রেই অন্ততঃ সাতদিন পূর্ণমাত্রায় কুইনিন বা আটেব্রিন প্রভৃতি ঔষধ একদফা প্রয়োগ করিয়া লইতে হইবে। যদি ঠিক নিয়মে প্রয়োগ করা হয় এবং চিকিৎসার কিছু ব্যতিক্রম না হয় তবে দেখা যাইবে যে অনেক ম্যালেরিয়াই বাস্তবিক "পুরাতন" বা "পৌনঃপুনিক" নয়, নিয়মমত চিকিৎসা না হওয়াতেই উহা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে।

কিন্তু যাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করিবার পরও জ্বর পুনরায় হইতে দেখা যায়, তাহাকে পুরাতন ম্যালেরিয়া বলিয়াই ধরিতে হইবে এবং চিকিৎসার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

নূতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার কিছু পার্থক্য আছে। পুরাতন ম্যালেরিয়াতে কুইনিনের মাত্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

কেহ বলেন মাত্রা বাড়ানো উচিত, কেহ বলেন কমানো উচিত। কতদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিতে হইবে সে বিষয়েও মতভেদ আছে।

সিন্টন্ বলেন সাতদিন চিকিৎসার পরও যে ম্যালেরিয়া আরোগ্য না হইয়া আবার দেখা দিল, দ্বিতীয় বারে তাহাতে দুই সপ্তাহ কাল এবং তৃতীয়বারে তিন সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার সহিত উপরন্তু একমাত্রা করিয়া ১/৬ গ্রেন প্লাজমোকুইন প্রত্যহ আহারান্তে দেওয়া আরো উত্তম। এইরূপ ব্যবস্থায় অতি দুর্দ্ধর্ষ ম্যালেরিয়াও আরোগ্য হইবে।

কিন্তু সকল প্রকারের পুরাতন ম্যালেরিয়াতে এ ব্যবস্থা চলে না। যে রোগী কিছু সবল আছে তাহার পক্ষে ইহা চলিতে পারে। কিন্তু যে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল সে এত অধিক কুইনিন সহ্য করিতে পারে না, ইহাতে আরো দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আসল পুরাতন-ম্যালেরিয়াতে প্রয়োজন কেবল কুইনিনের নহে, প্রয়োজন অন্য প্রকার।

সম্প্রতি ম্যালেরিয়া-কমিশনের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে এইরূপ অধিক মাত্রায় দীর্ঘদিন কুইনিন ব্যবহার সমর্থন করা হয় না। কমিশন বলেন, ম্যালেরিয়ার জীবাণু যেখানে নিঃশেষে ধ্বংস করা যায় না, সেখানে অনর্থক জোর করিয়া লাভ কি? বেশী মাত্রায় কুইনিন দিলে জীবাণুর অনিষ্ট হউক বা না হউক, রোগীরই অধিক অনিষ্ট হইবে; তাহার স্বাভাবিক আরোগ্য-শক্তিটুকু নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে ঐ সকল ম্যালেরিয়ার রিল্যাপ্স্ আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং যাহাতে স্বাভাবিক ক্ষমতা বাড়ে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করাই তথায় কর্ত্তব্য।

লীগ-অফ-নেশনস্-এর ম্যালেরিয়া-কমিশনের সদস্যগণের এই মত যে পুরাতন রিল্যাপ্সিং ম্যালেরিয়াকেও জীবাণু-অনুযায়ী দুই বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া চিকিৎসা করা প্রয়োজন; অর্থাৎ আগে বুঝিয়া লওয়া উচিত উহা **ম্যালিগ্ন্যান্ট-রিল্যাপ্সিং** অথবা **বিনাইন-রিল্যাপ্সিং**।

ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণু কুইনিনের দ্বারা বাধ্য; রীতিমত কুইনিন প্রয়োগে তাহার অধিকাংশই নষ্ট হয়। সুতরাং ইহাদের মতে

পুরাতন ম্যালেরিয়া ম্যালিগন্যান্ট-জীবাণু কর্ত্তৃক হইয়াছে বুঝিলে পূর্ণমাত্রায় **সাতদিনের জন্য কুইনিন** দেওয়া হউক। অতঃপর চিকিৎসা বন্ধ থাক। ইহার পর পুনরায় জর দেখা দিলে **দ্বিতীয়বারে কুইনিনের বদলে আটেব্রিন** দেওয়া হউক,—তিন মাত্রা করিয়া পাঁচ দিন অথবা সাত দিন। আশা করা যায় ইহার পর আর রিল্যাপ্স হইবে না। কিন্তু তবুও যদি হয়,—তখন **আবার কুইনিন** দিতে হইবে। কিন্তু এবার মাত্রা খুব কমাইয়া,—এবং তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নতির অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিনাইনের পুরাতন জরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে প্রথমে একবার এক সপ্তাহের জন্য পূর্ণ মাত্রায় **কুইনিন-প্লাজ্‌মোকুইনের** সম্মিলিত চিকিৎসা করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর অপেক্ষা করা হউক যতদিন না পুনরায় জর দেখা দেয়। জর হইলে এবার কিছু বিলম্ব করিয়া এবং মাত্রায় কম করিয়া কুইনিন দেওয়া হউক। অর্থাৎ শরীরকে আপনা-আপনি রোগজয় করিবার কিছু সুযোগ দেওয়া হউক। এইরূপে যতবার পুনরাক্রমণ হইবে ততবার কুইনিন কম মাত্রায় দিতে থাকিলে দেখা যাইবে যে ক্রমে পুনরাক্রমণ আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। কমিশন বলেন,—"in such cases quinine, except in very small doses as a tonic rather than as a parasiticide, is less important than is a system of proper diet and other measures for improving general health,"—অর্থাৎ, এ-সকল অবস্থায় কুইনিন খুব অল্পমাত্রায় কেবল টনিক হিসাবেই ব্যবহার্য্য, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, পথ্যাদির দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি করা। এখানে ইহাই আসল কথা। কুইনিনাদি পূর্ব্বে যথেষ্টই দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু শরীর সে সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে নাই। তখন কেবল ঔষধের মাত্রা বাড়াইয়া কি লাভ? বরং যেটুকু শরীর সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে সেইটুকু মাত্রাতেই উহা দেওয়া উচিত। এদিকে স্বাভাবিক শক্তিকে নানাভাবে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করা হউক,—তাহা হইলে অল্প সাহায্য লইয়াই শরীর অনেক কাজ করিতে পারিবে। এখানে এই আদর্শেই চলা উচিত। এখানে জীবাণু কত আছে

সেই অনুসারে ঔষধের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইবে না,—কেবল শরীরের গ্রহণযোগ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই উহার মাত্রা স্থির করা হইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া কুইনিনাদি একেবারে বন্ধ করিলে চলিবে না,—কিছু ঔষধ এখানে অত্যন্তই আবশ্যক। জর হইলেই প্রত্যেকবার নূতন করিয়া সাতদিনের জন্য কুইনিনাদি দিতে হইবে,—অল্প মাত্রায়। পুনরায় জর বন্ধ হইয়া গেলে তখন স্বাস্থ্যোন্নতির অন্যান্য চেষ্টা চলিতে থাকিবে। এই সময়ে যদি কুইনিন দেওয়া প্রয়োজন হয় তবে অল্প মাত্রাতেই তাহা দেওয়া যাইবে, অর্থাৎ দৈনিক ৬ গ্রেনের অধিক নয়। আরো কম মাত্রায় দিলে তখন ইহা টনিকের কাজ করিবে,—সুতরাং ফল ভালই হইবে। তরুণ ম্যালেরিয়াতে কুইনিন অধিক মাত্রায় দিতে হয়, কিন্তু পুরাতন ম্যালেরিয়াতে উহা অল্পমাত্রাতেই দিতে হয়।

পুরাতন ম্যালেরিয়াতে অনেকে ডাক্তারের চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়া পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে। কয়েকটি পেটেণ্ট ঔষধে বাস্তবিক তখন উপকারও দেখা যায়। এমন কথা প্রায়ই শোনা যায় যে ডাক্তারি ঔষধ খাইতে খাইতে বিরক্ত হইয়া শেষে অমুক পেটেণ্ট ঔষধ কিনিয়া খাওয়া হইল, তাহাতেই জর বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই জানেন এই সকল পেটেণ্ট ঔষধ মাত্রেই কুইনিন থাকে, কিন্তু তাহা অতি অল্প পরিমাণে। উহার সহিত শরীরের শক্তিবর্দ্ধক নানাপ্রকার ঔষধ মিশ্রিত থাকে। অল্প মাত্রার কুইনিনের সহিত ঐ সকল ঔষধ একত্রিত থাকাতেই উহা এমন ফলদায়ক হয়। উহাতে প্রায়ই অল্পমাত্রার আর্সেনিক থাকে, পুরাতন ম্যালেরিয়ায় তাহা বিশেষ উপকারী। তৎসহ লৌহঘটিত কিছু ঔষধ, এবং পিত্তদোষ নাশক, কোষ্ঠপরিষ্কারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক কয়েকটি ঔষধও থাকে। সেই জন্যই এগুলির এমন কাট্‌তি। বলা বাহুল্য এ সকল কেবল পুরাতন ম্যালেরিয়াতেই উপকারী, তরুণ ম্যালেরিয়াতে নয়। পূর্ব্বকালে অনেকে "ডি. গুপ্ত" ব্যবহার করিত এবং বাংলা দেশে ইহার যথেষ্ট নামডাক ছিল। আজকাল 'এড্‌ওয়ার্ডস টনিক', 'পাইরেক্স' প্রভৃতির নাম শোনা যায়। ইটালীর প্রস্তুত **ইসানোফিল** (Esanofele) নামক ঔষধটিও পুরাতন জরের জন্য খুবই প্রচলিত। ইহাতে অনেক পুরাতন ম্যালেরিয়া আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, ইহার প্রত্যেক বড়িতে মাত্র অর্দ্ধ গ্রেন করিয়া

কুইনিন বাইসাল্‌ফেট আছে। তৎসঙ্গে কিছু আর্সেনিক (১/১৮ গ্রেন), কিছু লৌহ (ফেরি সাইট্রেট ১/৪ গ্রেন) ও অন্যান্য কয়েকটি ভেষজ ঔষধ আছে। এ বড়ি দৈনিক ছয়টি করিয়া খাওয়া নিয়ম, অর্থাৎ প্রত্যহ মাত্র ৩ গ্রেন কুইনিন। ইহাতেই কত দুর্দ্ধর্ব পৌনঃপুনিক ম্যালেরিয়া আরোগ্য হয়। আরো একটি উত্তম ইটালীয় পেটেন্ট ঔষধ আছে, তাহার নাম **ম্যালেরাণ্টি** (Malaranti)। ইহাতে কুইনিনের মাত্রা সামান্য কিছু বেশী, তৎসঙ্গে কিছু সিন্‌কোনাও আছে, কিছু লৌহও আছে, আর্সেনিকও আছে এবং জান্তব পিত্ত (bile) মিশ্রিত আছে।

আজকালকার নূতন ঔষধ প্লাজমোকুইন দিয়াও পুরাতন ম্যালেরিয়ার এইরূপ টনিক-বটিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার নাম **প্লাজমোকুইন সিল্‌ভার টনিক** (Plasmoquine Silver Tonic)। ইহার প্রত্যেক বড়িতে কুইনিন আছে ১৩/৫ গ্রেন, প্লাজমোকুইন ১/১২ গ্রেন, ও তৎসঙ্গে অল্প পরিমাণ আর্সেনিক, ষ্ট্রিকৃনিন (strychnine) ও লৌহ একত্রে মিশ্রিত আছে। ইহার দৈনিক ২টি করিয়া বড়ি দুইবার আহারের পর সেব্য। অর্থাৎ প্রত্যহ ৬ গ্রেন কুইনিন ও ১/৬ গ্রেন প্লাজমোকুইন পড়িবে। ইহা তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত পুরাতন ম্যালেরিয়াতে ব্যবহার চলিতে পারে, এবং পরে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্যও ইহা মধ্যে মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন ম্যালেরিয়াতে ইহা খুবই উপকার করে।

মাত্র কয়েকটি পেটেন্টের নাম করা হইল, যেগুলি উপকারী বলিয়া আমরা জানি। এইরূপ আরো অনেক পেটেন্ট ঔষধ পুরাতন ম্যালেরিয়াতে উপকার করে, তাহার কারণ কেবল ঐ অল্পমাত্রার কুইনিন ও আর্সেনিকাদির সংমিশ্রণ। পেটেন্ট ঔষধ না দিয়া ঐ সকল ঔষধ প্রেস্‌ক্রপশন করিয়াও দেওয়া চলিতে পারে।

আরো একটি বিষয় সকলে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন,—নানারূপ চিকিৎসা সত্ত্বেও যে ম্যালেরিয়া পুনঃপুনঃ হইতে থাকে, কোনো স্বাস্থ্যকর দেশে বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে অর্থাৎ 'চেঞ্জে' গেলে তাহা অল্প ঔষধে বা বিনা ঔষধে ক্রমে আপনিই আরোগ্য হইয়া যায়। কখনো কখনো ঐ সকল স্থানে গিয়াও কুইনিনাদির সাহায্য মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তখন অল্প ব্যবহারেই উহাতে এমন উপকার হয় যেন কুইনিনের ক্ষমতা দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, শরীরের রক্তবৃদ্ধি, ক্ষুধাবৃদ্ধি, তেজবৃদ্ধি।

স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে শরীর আপনিই জীবাণুদের দমন করিয়া ফেলে, ঔষধের সাহায্যের অল্পই আবশ্যক হয়। এই কথাটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। চেঞ্জে গেলে যেরূপভাবে স্বাস্থ্য ফেরে, চিকিৎসার দ্বারাও পুরাতন জ্বরে সেইরূপ ভাবে স্বাস্থ্য ফিরাইবার চেষ্টা করা উচিত,—তাহা করিতে পারিলে শীঘ্রই পুরাতন ম্যালেরিয়া দূর হইবে। তখন কুইনিন অল্প মাত্রাতেই রোগীকে সাহায্য করিবে,—কিন্তু কুইনিন এখানে মুখ্য নয়, গৌণ।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের ইহাই অভিমত। কুইনিনই হউক বা নূতন ঔষধই হউক, ম্যালেরিয়ার প্রথম অবস্থাতেই তাহা পূর্ণ মাত্রায় চলিবে। কিন্তু ম্যালেরিয়া যখন **পুরাতন** হইয়া যাইবে তখন এই সকল ঔষধের ব্যবহার ও মাত্রা **কম করা হইবে**,—এবং রোগী যাহাতে উপযুক্ত স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতে পারে সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে সকল ঔষধে শরীরের স্বাভাবিক শক্তির বৃদ্ধি করে, অতঃপর তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। এগুলি প্রত্যক্ষভাবে ম্যালেরিয়ার জীবাণুদের মারিতে পারে না, কিন্তু শরীরের তেজ বৃদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা উহাদের ধ্বংসের সহায়তা করে।

আর্সেনিক—পুরাতন ম্যালেরিয়ার ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এজন্য আমাদের দেশে বহুকাল হইতে পুরাতন জ্বরে হরিতালভস্ম প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে **ফাউলার্স সলিউশন্** (লাইকার আর্সেনিক) সচরাচর ব্যবহার করা হয়। তদ্ব্যতীত **আর্সেনিয়াস্ অ্যাসিড** (acid arseniosum) ১/৬০ গ্রেন মাত্রায় অনেকেই কুইনিনের বড়ির সহিত প্রয়োগ করেন। কেহ কেহ arrhenal, cacodylate of soda, প্রভৃতিও ব্যবহার করেন। আজকাল এই সকল ঔষধ অপেক্ষা **ষ্টোভার্‌সলের** (Stovarsol) সুখ্যাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সিন্‌টন্ বলেন, যাবতীয় আর্সেনিক-ঘটিত ঔষধের মধ্যে ষ্টোভার্‌সলই শ্রেষ্ঠ, এবং ইহা বিনাইন-টার্শিয়ান জীবাণুকেও ধ্বংস করিতে সক্ষম। তিনি বলেন ইহার দ্বারা জীবাণু ও তাহার বীজ দুইই বিনষ্ট হয়, এবং কেবলমাত্র ষ্টোভার্‌সল দিয়াই অনেক বিনাইন ম্যালেরিয়া আরোগ্য করা যায়। কুইনিনের সহিত ষ্টোভার্‌সল একত্রে দিলে পুরাতন ম্যালেরিয়াতে

খুব উপকার হয়, সেই জন্য তিনি দুই ঔষধ একত্রে প্রয়োগ করিতে বলেন। ইহাতে কেবল জ্বরই বন্ধ হয় না, শরীরেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়, এবং রক্তাল্পতা দূর হয়।

আর্সেনিক ইন্‌জেক্‌শন রূপেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। অনেকে **সোয়ামিন** (Soamin) ইন্‌জেক্‌শনের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাতে পুরাতন জ্বর শীঘ্রই সারে। ইহা ১ গ্রেন হইতে ৫ গ্রেন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত মাত্রায় অল্প ফুটন্ত জলে গুলিয়া লইয়া সপ্তাহে দুইটি বা তিনটি করিয়া ইন্‌জেকশন দেওয়া চলে। কেহ কেহ Optarson, Hypercytol প্রভৃতি কয়েকটি পেটেণ্ট ইন্‌জেক্‌শন ব্যবহার করেন। তবে ইন্‌জেকশনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম আর্সেনিক-ঘটিত ঔষধ **নিওস্যালভারসন** (Neosalvarsan), যাহা সিফিলিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে মাত্রায় উহা সিফিলিসে ব্যবহার হয়, এখানে সে মাত্রা নয়,—তাহার সিকি ভাগ বা অষ্টম ভাগ মাত্র ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেক্‌শন দিলেই যথেষ্ট। প্রথম ইন্‌জেক্‌শনে ০·১৫ গ্র্যাম মাত্রার নিওস্যালভারসন নিয়মিত ভাবে জলে গুলিয়া তাহার দুই ভাগ ফেলিয়া দিয়া মাত্র এক ভাগ (০·০৫ গ্র্যাম) প্রয়োগ করা উচিত। এক সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় ইন্‌জেকশনে ঐ মাত্রা দ্বিগুণ (০·১ গ্র্যাম) পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। ঐরূপ অল্প মাত্রাতে খুব শীঘ্র রক্তের উন্নতি হইতে দেখা যায়, এবং জ্বরও বন্ধ হয়। বেশী দিনের পুরাতন ম্যালেরিয়াতে ও ক্যাকেক্সিয়া অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী। কিন্তু ইহার মাত্রা খুবই কম রাখা উচিত, বেশী দিলে অনিষ্ট হইতে পারে। আর একটি উত্তম ঔষধ আছে,—ব্রহ্মচারীর নবাবিষ্কৃত **থিওসার্মিন** (Thiosarmine)। অতি অল্প মাত্রায় (০·১ গ্র্যাম) ইহা জলে গুলিয়া চামড়ার নীচে (subcutaneous) ইন্‌জেক্‌শন দিতে হয়।

আর্সেনিকের যে-কোনো ঔষধই ব্যবহার হউক, উহার দ্বারা জ্বর নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের পুষ্টি ও শরীরের উন্নতি হইতে দেখা যায়। কাশ্‌নি (Cushney) প্রভৃতি বলেন, রক্তের মধ্যে আর্সেনিক বর্ত্তমান থাকিলে লোহিত-কণিকা সকল ভঙ্গুর হইতে পারে না, ইহা যেন কণিকাগুলিকে আগুলিয়া রাখে, সেইজন্য ইহাতে কোনো জীবাণু প্রভৃতির

দ্বারা রক্তক্ষয় নিবারিত হয়। সাধারণতঃ রক্তের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিলিরুবিন্ (bilirubin) দেখিলেই বুঝা যায় যে রক্তকণিকা ভাঙিয়া গিয়া তাহার হিমোগ্লোবিন হইতেই ইহা নির্গত হইতেছে,—কিন্তু আর্সেনিক প্রয়োগ করিলেই রক্তের বিলিরুবিন্ অনেক কমিয়া যায়; তাহাতেই প্রমাণ হয় যে রক্তকণিকার বিনাশ (hæmolysis) নিবারিত হইয়াছে। কেবল ইহাই নয়, আর্সেনিক প্রয়োগে রক্তকণিকার সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতে দেখা যায়।

আইরণ বা লৌহ—ইহা আর একটি উত্তম ঔষধ। লৌহ যে পুরাতন জ্বরের পক্ষে বিশেষ উপকারী একথা সাধারণেও জানে। এমন কি আমাদের পাঁচালি গানেও আছে—"জ্বর গেলে পুরাতনে, লৌহ দিবে সযতনে।" লৌহ কেবল এনীমিয়া বা রক্তহীনতারই ঔষধ, কিন্তু ম্যালেরিয়া ও এনীমিয়ার সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ,—এক হইতে অন্যটি আসে। ম্যালেরিয়া হইলেই এনীমিয়া হয়, এবং এনীমিয়া হইলেই ম্যালেরিয়া আরো উত্তমরূপে চাপিয়া বসে। এইরূপ ঘটনাবর্ত্তনের দ্বারা (vicious circle) পুরাতন ম্যালেরিয়াতে রক্তের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় যে তখন ম্যালেরিয়াই প্রধান সমস্যা কি এনীমিয়াই প্রধান সমস্যা তাহা বিচার করা কঠিন হইয়া ওঠে। ম্যালেরিয়া না থাকিলেও কেবল এনীমিয়ার জন্যই প্রত্যহ রীতিমত জ্বর হইতে পারে। বস্তুতঃ এ সময় রক্তহীনতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া যদি ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাই করিয়া যাওয়া হয়, তাহাতে ফল ভাল হয় না; কিন্তু রীতিমতভাবে তখন যদি এনীমিয়া দূর করিবার চেষ্টা করা যায় তবে রক্তসমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া আপনিই দূর হইয়া যায়। সেই জন্য ম্যালেরিয়া পুরাতন হইলেই আগে লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত রোগীর রক্তের অবস্থা কেমন। অনেক সময় শুধু চোখে দেখিয়া রক্তাল্পতা ধরা যায় না, সেই জন্য রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় হিমোগ্লোবিনের হ্রাস বা লোহিত-কণিকার সংখ্যার অল্পতা ঘটিয়াছে কি না। পুরাতন ম্যালেরিয়াতে রক্তের যে অবনতি ঘটে তাহাকে সেকেণ্ডারি (secondary) বা নৈমিত্তিক-এনীমিয়া বলা হয়,—এবং লৌহই ইহার পক্ষে প্রকৃষ্ট ঔষধ। যাহাতে এরূপ এনীমিয়া না হইতে পারে সেজন্য পূর্ব্ব হইতে অনেকে কুইনিন মিকশ্চারের সহিত লৌহ

(Tinct. Ferri Perchlor.) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এনীমিয়া উপস্থিত হইলে ইহা আরো অন্যান্য প্রকারে প্রয়োগ করা উচিত।

লৌহ নানা আকারে দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণ পক্ষে **ব্লড্‌স্ পিল্** (Blaud's pill)-ই ভাল। উহা ব্যতীত Ferrum Redactum,—Ferri Sulph. (হিরাকষ),—Ferri et Ammon. Citras,—Ferri et Quinine Citras,—Ferri Carb. Sachharatus,—প্রভৃতি নানারূপ ঔষধের দ্বারা লৌহ দেওয়া যায়। তবে লৌহ হজম করা প্রায়ই কঠিন, বিশেষ দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে। যেটুকু লৌহ খাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়, অল্প মাত্রই রক্তের মধ্যে নীত হয়। ইহার দ্বারা হজম শক্তিরও নানা ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। সেইজন্য অনেকে Arseno-Ferratose, Peptiron with Arsenic, প্রভৃতি পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, যাহাতে লৌহ ও আর্সেনিক দুইই একসঙ্গে দেওয়া হয়, অথচ হজমের কোনো বিঘ্ন হয় না। কিন্তু যেখানে রক্তসম্পত্তি প্রায় অর্দ্ধেক বা সিকি পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যেখানে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ শতকরা ৮০।৯০-এর স্থলে ৩০।৪০-এর কাছাকাছি হইয়াছে, এবং লোহিতকণিকা-সংখ্যা ৫ মিলিয়নের স্থলে ২ মিলিয়ন বা তাহারও নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে এইরূপ অল্পমাত্রার উপর নির্ভর করা চলে না। সেখানে যথেষ্ট মাত্রায় লৌহের প্রয়োজন। এজন্য সেখানে **লৌহের ইন্‌জেকশনের** ব্যবস্থা করা উচিত। লৌহের ইন্‌জেকশন আমাদের দেশে এনীমিয়া মাত্রেই বিশেষ উপকারী। লৌহ ইন্‌জেকশনরূপে প্রয়োগ করিলে উহার একটুও অপচয় হয় না, সমস্তটাই শরীরে গৃহীত হয় এবং যকৃৎ পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হয়। তথা হইতে প্রয়োজন মত ইহা রক্তে সঞ্চারিত হইয়া হিমোগ্লোবিন প্রস্তত করে, এবং উদ্বৃত্ত অংশ মলাদির সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতে হজমের কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না। ইন্‌জেকশন দিবার উপযুক্ত লৌহ আজকাল নানা নামে (Iron Arsenite, Ferrugenous ampoules, Ferri Arsenas with Strychnine প্রভৃতি) কিনিতে পাওয়া যায়। এই ইন্‌জেকশন দৈনিক বা

একদিন অন্তর দেওয়া আবশ্যক, এবং একাদিক্রমে অন্ততঃ ১২টি অথবা ২৪টি ইন্‌জেকশন দেওয়া উচিত। অল্পে কিছু কাজ হয় না। দুই চারিটি দিতে দিতেই রক্তের সমৃদ্ধি আশা করা সম্ভব নয়, অন্ততঃ ১২টি ইন্‌জেকশন দিবার পর উহা বেশ লক্ষ্য করা যায়। অনেকে লৌহের সহিত সোয়ামিনও পাল্টাপাল্টি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ একদিন লৌহ, পরদিন সোয়ামিন, তৎপরে পুনরায় লৌহ, পুনরায় সোয়ামিন,—এইরূপ নিয়মে উপর্য্যুপরি এক একটি ইন্‌জেকশন দিতে থাকেন। ইহাও অতি উত্তম ব্যবস্থা, ইহাতে আর্সেনিক ও লৌহ দুই রক্ত-পুষ্টিকর ঔষধের সাহায্য পাইয়া উন্নতি দ্রুততর হইতে থাকে, এবং ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর থাকিলে তাহা অবিলম্বে বন্ধ হইয়া যায়। পুরাতন ম্যালেরিয়া ও ক্যাকেক্সিয়া অবস্থার ইহা অতি উত্তম চিকিৎসা।

হিমোগ্লোবিন সিরাপ, হিমোজেন সিরাপ, হিমোবিন্ সিরাপ প্রভৃতি বিভিন্ন নামের ঔষধগুলিও পুরাতন ম্যালেরিয়াতে প্রযোজ্য। উহাও রক্তহীনতা দূর করে। নিম্নজন্তুর তাজা রক্ত লইয়া তাহাতে পচন-নিবারক (preservative) ঔষধাদি মিশাইয়া সিরাপরূপে এইগুলি বাজারে বিক্রীত হয়। উহা খাইলে তাজা হিমোগ্লোবিন পেটে গিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা উহা হইতে লৌহ নির্গত হয়। ইহা ধাতব লৌহ নয়, জৈব (organic) লৌহ, সুতরাং জীবের শরীরে গিয়া তাহা সহজেই মিশিয়া যায়।

লিভার একষ্ট্রাক্ট (Liver Extract)—ইহাও রক্তহীনতার পক্ষে উৎকৃষ্ট। যকৃতের রস বা নির্য্যাস লইয়া ইহা প্রস্তত। ইহা সেকেণ্ডারি-এনীমিয়ার ঔষধ না হইলেও, লৌহের সহিত একত্র প্রয়োগে ইহা রক্তের তেজ বাড়ায়, যকৃতের দোষ দূর করে ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। আজকাল লিভার একষ্ট্রাক্ট ইন্‌জেকশনের উপযুক্ত করিয়াও প্রস্তত হইতেছে, খাইতে দেওয়া অপেক্ষা তাহাতে আরো বেশী কাজ হয়।

পথ্যাদি—পুরাতন ম্যালেরিয়াতে উত্তম পথ্যের ব্যবস্থা করাও এক বিশেষ চিকিৎসা। পথ্যের দ্বারা বলসঞ্চয় করিতে পারিলে যে-কোনো ঔষধই দেওয়া যাক, তাহা উপযুক্ত ক্রিয়া করিতে পারিবে। দুর্ব্বল শরীরে কেবল ঔষধ দিলেই চলিবে না, পথ্যের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে

হইবে। দুগ্ধ এ রোগে বিশেষ উপকারী, ম্যালেরিয়া মাত্রেই যথেষ্ট দুগ্ধ-
পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। মাংসের শুরুয়া বা ঝোল খাওয়ার ব্যবস্থা
করিতে পারিলে আরো উত্তম। উহাতেও রক্তের তেজ বাড়ে। **র' মিট**
যুষ (Raw meat-juice) প্রত্যহ পাওয়া সম্ভব হইলে সে সুযোগ
পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ ইহাতে বড়ই উপকার হয়। এতদ্ব্যতীত
অন্যান্য পথ্য সমস্তই দেওয়া যাইতে পারে, এবং হজম হইলে সব খাদ্যেই
উপকার হয়। তবে গুরুপাক দ্রব্য, বা অতিরিক্ত তেল, ঘি, ঝাল, মসলা
প্রভৃতি খাইতে দেওয়া উচিত নয়।

ক্যাকেক্সিয়ার চিকিৎসা

ম্যালেরিয়া বর্ত্তমানে নাই, কিন্তু থাকাকালীন শরীরকে একেবার নির্জ্জীব করিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসার দ্বারা স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনা বড় কঠিন। রোগী তখন একরূপ জীবন্মৃত হইয়া থাকে, ঔষধ যাহাই দেওয়া হউক, তাহা যেন নিতান্ত জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়, কোনো সাড়াই পাওয়া যায় না। ঔষধকে গ্রহণ করিয়া কাজে লাগাইবার জীবনীশক্তিই নিরুদ্যম, সুতরাং এ অবস্থায় প্রথম প্রয়োজন এই জীবনীশক্তিকেই জাগ্রত করা।

কুইনিনাদির স্থান এখানে প্রায় নাই বলিলেই হয়। এ সময় কুইনিন কেবল দুই-এক গ্রেন মাত্রায়, অথবা সিন্‌কোনার স্পর্শমাত্র দিয়া টনিক হিসাবে টিঞ্চার সিন্‌কোনা, ডিককৃশন সিন্‌কোনা, প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে। অনেকে সিকি গ্রেন মাত্রার **কুইনিন ফ্লুয়োরাইড** (Quinine fluoride) দিয়া থাকেন এই একই উদ্দেশ্যে। কেবল টনিক-হিসাবে ছাড়া কুইনিন এখানে রীতিমত ব্যবহার চলিতে পারে না।

পুরাতন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় যে আর্সেনিক ও লৌহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে তাহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। খুব অল্প মাত্রায় নিওস্যালভারসন ইন্‌জেকশনও ক্যাকেক্সিয়াতে বেশ কাজ করে। তৎসহ লৌহের ইন্‌জেকশনেও যথেষ্ট উপকার হয়। এইগুলি ধারাবাহিক ভাবে

অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে থাকিলে অল্পে অল্পে উন্নতি হইতে দেখা যায়।

যাহাদের এই সকল ব্যবস্থা করিয়াও কিছু উপকার পাওয়া যাইতেছে না, অর্থাৎ শরীরে রক্ত আসিতেছে না, জরও একটু লাগিয়া রহিল, প্লীহাও কমিল না,—নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে তাহাদের শরীরের সাড়া দিবার কোনোই ক্ষমতা নাই। তখন সুপ্ত জীবনীশক্তিকে একবার উত্তমরূপে নাড়া দিয়া আগে জাগাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার পর এই সকল ঔষধাদি দিলে উপকার হইবে। আজকাল অনেক পুরাতন রোগে সুপ্ত আভ্যন্তরিক-শক্তিকে এইরূপে উত্তেজিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া বেশ উপকার পাওয়া যাইতেছে,—ইহার নাম **প্রোটিন্‌-শক্‌ থেরাপি** (Protein-shock therapy)। এজন্য **দুধ-ইন্‌জেকশনই** (|milk protein) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। **খাঁটি গোদুগ্ধ** উত্তমরূপে পনেরো মিনিটকাল পর্য্যন্ত ফুটাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা হইলে ইন্‌জেকশনের ছুঁচের দ্বারা উপরকার সরটুকু ফুটা করিয়া ভিতর হইতে দুধ পিচ্‌কারীর মধ্যে টানিয়া লইতে হয়। এই কাজটি অতি সাবধানে করিতে হয়, যাহাতে কোনোরূপ বীজাণুর সংস্পর্শ তন্মধ্যে না আসিতে পারে। এই দুধ ৫ সি. সি. (প্রায় ৮০ ফোঁটা) মাত্রায় পাছার গভীর মাংসপেশীর মধ্যে ইন্‌জেকশন দিতে হয়। ইহাতে কিছু ব্যথা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়তো খুব কম্প দিয়া জর আসিয়া পড়ে। উহা শুভ লক্ষণ, কারণ ঐ জরে শরীরের ধাতু ও রক্ত-স্রোতের মধ্যে দ্রুত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। ঐ জরটি একদিনের মধ্যেই ছাড়িয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের পুরাতন ঘুষ্‌ঘুষে জরটিও প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, রোগী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, প্লীহা নরম ও সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায়, এবং শরীরেরও কিছু উন্নতি হয়। ইন্‌জেকশনের মাত্রা শরীরের অবস্থা বুঝিয়া নির্ণয় করা দরকার,—বেশী মাত্রায় দিলে জরের প্রাবল্য অত্যধিক হইয়া অনিষ্টও হইতে পারে। রোগী অতি দুর্ব্বল হইলে প্রথম মাত্রা খুব অল্প দিয়া পরখ করিয়া লওয়া ভাল। এই ইন্‌জেকশন সাধারণতঃ সপ্তাহে দুইটি করিয়া দিতে হয়, জর অধিক হইলে সপ্তাহে একটি করিয়া দেওয়া উচিত। মোটের উপর ৫।৬-টির অধিক ইন্‌জেকশনের প্রয়োজন হয় না,—অনেক সময় ৩।৪-টিতেও রোগীর অবস্থা ফিরিয়া যায়।

যাঁহারা দুধের রীতিমত বিশোধন দ্বারা উহা ইন্‌জেকশনের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে দুধ হইতে প্রস্তুত Aolan, Lactolan, প্রভৃতি তৈয়ারী-ঔষধগুলি ব্যবহার করাই নিরাপদ। দুধ-ইন্‌জেকশনে প্লীহার আকার যথেষ্ট কমিয়া যাইতে দেখা যায়। অনেক পুরাতন ও কঠিন প্লীহা ইহার দ্বারা সঙ্কুচিত করা সম্ভবপর হইয়াছে।

ক্যাকেক্সিয়ার জন্য আরো একরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, তাহার নাম **অটো-হিমো থেরাপি** (auto-hæmo therapy)। এই চিকিৎসায় রোগীর নিজেরই শিরা হইতে ৫ সি. সি. পরিমাণ রক্ত টানিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা উহারই শরীরের অন্যত্র কোনো গভীর মাংসপেশীর মধ্যে ইন্‌জেকশন দিয়া দিতে হয়। ইহাতে তাহার নিজেরই রক্তের প্রোটিন অস্বাভাবিক স্থানে প্রয়োগ করা হইল, এবং ফল উপরোক্ত মতই হয়। ইহাতেও বেশ জর আসে। এই সকল চিকিৎসার উদ্দেশ্য বেশী-জর দিয়া অল্প-জরকে তাড়ানো। বিজাতীয় পদার্থ শরীরের মধ্যে অস্বাভাবিক উপায়ে অকস্মাৎ প্রবেশ করাইয়া দেওয়াতে অবসন্নপ্রায় রসরক্তাদির প্রবাহে একটা বিপর্যয় উপস্থিত হয়, এই বিজাতীয় পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া দিবার জন্য শরীরের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য জাগিয়া ওঠে; সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে কম্প দিয়া জর আসে ও উহাতে সুপ্ত প্রকৃতি সচেতন হইয়া আবার পূর্ব্বতেজ প্রাপ্ত হয়। যে ঘোড়া চলিতে চায় না তাহাকে যেমন চাবুক মারা প্রয়োজন, এই চিকিৎসাও অনেকটা তদনুরূপ। এই ব্যবস্থায় কোনো কোনো পুরাতন ব্যাধি আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। অবশ্য সকল স্থানেই ইহাতে উপকার পাওয়া যাইবে এমন নিশ্চয়তা নাই, তথাপি উপযুক্ত ক্ষেত্রে এগুলি প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

Whole blood অর্থাৎ **তাজা রক্ত** কোনো সুস্থ ব্যক্তির শিরা হইতে ১০ সি. সি. বা ২০ সি. সি. পরিমাণ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা রোগীর মাংসমধ্যে (ইন্‌ট্রামাস্কুলার) ইন্‌জেক্‌শন দিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহাও কতকটা এই একই উদ্দেশ্যে। দুধ-ইন্‌জেকশন্ না দিয়া অনেকে এই তাজা রক্ত ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহাতেও বেশ উপকার হয় এবং রক্তেরও কিছু উন্নতি হইতে দেখা যায়। তবে কোন রোগীর পক্ষে

কোন উপায় প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত, বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে।

কালাজ্বরে মুইর (Muir) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত **টি. সি. সি. ও** (T.C.C.O.) ইন্‌জেকশনের যে ব্যবস্থা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল তাহারও উদ্দেশ্য এই একই, সুপ্ত প্রকৃতিকে জাগ্রত করা ও শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়ানো। কেবল কালাজ্বরের পুরাতন অবস্থায় নয়, ম্যালেরিয়ার ক্যাকেক্সিয়া অবস্থাতেও ইহার দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

এই সকল প্লীহোদর ক্যাকেক্সিয়ার মজ্জাগত রুগ্ন অবস্থায় চিকিৎসার কোনো বাঁধা রাস্তা নাই। এইরূপ একটি পুরাতন রোগীর কিরূপ বিভিন্নমুখী চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হইয়াছিল তাহার উদাহরণ দিলে বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

রোগী ৫।৬ বৎসর যাবৎ প্লীহাজ্বরে ভুগিতেছিলেন। প্লীহায় সমস্ত পেট জুড়িয়া গিয়াছে, তদুপরি পেটে রীতিমত জল জমিয়াছে। হাতে, পায়ে ও মুখে যথেষ্ট শোথ (œdema)। প্রস্রাব অতি অল্প হয়, এবং জর প্রত্যহ লাগিয়া থাকে। রক্ত-পরীক্ষায় দেখা গেল উহার হিমোগ্লোবিন-সম্পদ মাত্র ৫০%,—লোহিত-কণিকার সংখ্যা ২ মিলিয়ন, শ্বেতকণিকার সংখ্যা ৪০০। কালাজ্বরের বিশিষ্ট-রক্তপরীক্ষায় কালাজ্বরের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। তথাপি কালাজ্বরের সন্দেহে ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি ইউরিয়া ষ্টিবামিন ইন্‌জেকশনও দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। এখানে বর্ত্তমান সমস্যা হইল রোগীর শোথের নিবৃত্তি করা ও প্রস্রাব বৃদ্ধি করা। নানারূপ প্রস্রাববৃদ্ধিকারক ঔষধ দিয়া কিছু ফল হইল না, অথচ প্রস্রাব পরীক্ষায় দেখা গেল বিশেষ কিছুই দোষ নাই। তখন Salyrgan (Bayer) নামক প্রস্রাববৃদ্ধিকারক নূতন ঔষধ ইন্‌জেকশন দেওয়া হইল। ইহাতে বিশেষ উপকার হইল, প্রস্রাব হইয়া পেটের জল ও পায়ের ফুলা অনেকটা কমিয়া গেল। এই ইন্‌জেকশন ৩।৪টি দেওয়াতে শরীর শুকাইয়া গেল এবং প্রকাণ্ড প্লীহাটি ঠেলিয়া বাহির হইল। তখনও অল্প অল্প জর হইতেছে। অতঃপর তাহাকে একটি দুধের (Lactolan) ইন্‌জেকশন দেওয়া হইল। ইহাতে কম্প দিয়া নূতন জর আসিল এবং এই জর ২।৩ দিন যাবৎ চলিতে লাগিল। লক্ষণ দেখিয়া বুঝা গেল ইহা পুরাতন ম্যালেরিয়া নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে। তখন পাঁচদিন উপর্য্যুপরি তাহাকে আটেব্রিন দেওয়া হইল। ইহাতে জরটি ত্যাগ হইল বটে, কিন্তু প্লীহা কিছুই কমিল না। তৎপরে দুই-গ্রেন মাত্রার কুইনিন ও আইরন

ইত্যাদি মিশাইয়া একটি টনিক মিকশ্চার করিয়া দেওয়া হইল। তৎসহ একদিন অন্তর আইরন (ferrugenous) ইন্‌জেকশন চলিতে লাগিল—এবং মধ্যে মধ্যে এক একটি লিভার একষ্ট্রাক্ট (Campolon) ইন্‌জেকশনও দেওয়া হইতে থাকিল। মাসাবধি যাবৎ এইরূপ চিকিৎসায় রক্তের উন্নতি দেখা গেল বটে, কিন্তু প্লীহা কিছুই কমে না। তখন তাহাকে অতি অল্পমাত্রায় (·০৫ গ্র্যাম) একটি নিওস্যালভারসান দেওয়া হইল। ইহাতে বেশ উপকার পাওয়া গেল। প্লীহা কতকটা কমিল এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি দেখা গেল। তখন হইতে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া নিওস্যালভারসান ঐরূপ অল্পমাত্রাতেই দেওয়া হইতে লাগিল—এবং তাহার ব্যবধানে একদিন অন্তর আইরন্ ইন্‌জেকশন ধারাবাহিক ভাবে চলিতে লাগিল। খাইবার জন্য অল্পমাত্রায় কুইনিন ফ্লুয়োরাইড ও অন্যান্য ঔষধ মিশাইয়া একটি টনিক বড়ির ব্যবস্থা করা হইল। আরো একমাস এইরূপ চিকিৎসায় কাটিবার পর দেখা গেল রোগীর অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং প্লীহা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পাঠানো হইল। তিনমাস পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন স্বাস্থ্য একেবারে নূতন। এই উদাহরণ হইতেই দেখা যাইবে যে রোগীটির চিকিৎসায় প্রায় কোনো প্রকার ঔষধই বাদ যায় নাই। প্রস্রাবের জন্য ইন্‌জেকশন ও দুধের ইন্‌জেকশন হইতে আরম্ভ করিয়া কুইনিন, আইরন, আর্সেনিক, এবং আটেব্রিন প্রভৃতি সমস্তই একে একে প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং তাহার সমন্বয়েই রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যেখানে জীবনীশক্তি একেবারে ক্ষীণ হইয়া যায় সেখানে এইরূপ ব্যবস্থাই আবশ্যক হইয়া পড়ে।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়

চিকিৎসার কথা ছাড়িয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের (prophylaxis) কথা বলিতে গেলেই আমাদের নানারূপ ইতস্ততঃ করিতে হয়। এই সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। অবশ্য এ বিষয়ে কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম করা আছে এবং শুনিতেও তাহা নিতান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একদেশের যে ব্যবস্থা, অন্য দেশের জন্য তাহা নয়। কোথায় কোন ব্যবস্থা উপযুক্ত তাহাই ঠিক মত বিচার করিয়া নির্ণয় করা কঠিন, আর একটু ব্যতিক্রম হইলেই সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা কয়েকটি দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করা সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের সমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার আয়তনও যেমন বিশাল, সমস্যাও তেমনি জটিল, সেইজন্য চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত এখানে বিশেষ কিছু করা যায় নাই।

আমাদের দেশের প্রকৃতির মধ্যে ম্যালেরিয়া ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ অরণ্যেরই নামান্তর মাত্র। গ্রামগুলির মধ্যে এক বাড়ি হইতে আর এক বাড়ি দেখা যায় না, মাঝে গভীর জঙ্গল; প্রতি বাড়ির সহিত সংলগ্ন দুই চারিটি ডোবা কিংবা পানা-পুকুর। এত প্রকারের আবদ্ধ জল ও বৃথা ঝোপ-জঙ্গল বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও নাই। এইজন্যই এদেশের গ্রামগুলি এমন ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি। ম্যালেরিয়ার ভয় না থাকিলে, শহরে ঘনসন্নিবদ্ধ ভাবে বাস করা অপেক্ষা পল্লীগ্রামে বাস করিলে যে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়াশূন্য হইলে কেমন হয় তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন; ম্যালেরিয়াশূন্য গ্রাম যে ম্যালেরিয়াশূন্য শহর অপেক্ষা অনেক ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা গ্রাম হইতে পলাইয়া থাকি বলিয়া ইহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। কিন্তু মনে করুন এই দেশ যদি ইউরোপে হইত এবং সেখানে এরূপ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইত, তবে কি লোকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া শহরে আশ্রয় লইত? তাহারা সেইখানেই বাস করিয়া রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া এতদিনে একটা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিত। কিন্তু আমরা উদ্যোগী হইতে জানি না, কেবল পরের প্রত্যাশা

করিয়া থাকি। যাহা হউক সম্প্রতি গত মহাযুদ্ধের পর ম্যালেরিয়া ইউরোপের ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, রুমেনিয়া, আল্‌জিরিয়া, বুল্‌গেরিয়া প্রভৃতি নানাস্থানে কিছু কিছু ব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় ইউরোপের বৈজ্ঞানিক জগৎ এ বিষয়ে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে এইরূপ নূতন ভাবের সাড়া পড়াতে আশা করা যায় এতদিনে হয়তো আমাদেরও কিছু উপায় হইতে পারে।

এ সকল কথা চিকিৎসকের পক্ষে অবান্তর; ম্যালেরিয়া নিবারণের সমস্যা কেবল স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণেরই আলোচ্য। তথাপি চিকিৎসকের পক্ষে ম্যালেরিয়া নিবারণের মোটামুটি নিয়মগুলি জানিয়া রাখা দরকার, সেইজন্য সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল।

তিন রকম উপায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ করা যাইতে পারে:—

(১) এনোফিলিস্ মশার উচ্ছেদ সাধন করিয়া।

(২) ঐ মশা যাহাতে মানুষকে কামড়াইতে না পারে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া।

(৩) ম্যালেরিয়া যাহাতে না ধরিতে পারে এজন্য পূর্ব্ব হইতে প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া,—ম্যালেরিয়ার সূত্রপাত মাত্রেই উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা প্রত্যেক রোগীর রক্ত যথাসম্ভব জীবাণুশূন্য করিয়া,—এবং তাহাদের রক্তস্থ বীজগুলিকেও (gametocytes) যাহাতে ধ্বংস করা যায় এরূপ ব্যবস্থা করিয়া।

এই তিন প্রকার উপায় একসঙ্গেই প্রয়োগ করিতে হইবে, কারণ কোনো একটি মাত্র উপায় সম্পূর্ণরূপে সফল হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রথমে চেষ্টা হইবে দেশে মশা যেন না জন্মায়। এই চেষ্টাতে মশা কিছু কম পড়িবে মাত্র। দ্বিতীয়তঃ—মশা যাহাতে কামড়াইবার সুযোগ না পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে। ইহারা কেবল সন্ধ্যার পর হইতেই কামড়ায়, সুতরাং তখন হইতে যাহাতে তাহারা গায়ে বসিতে না পারে এরূপ ভাবে শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ইহাও সম্পূর্ণরূপে সফল হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তৃতীয় উপায়,—মশা কামড়াইলেও তাহারা যেন যথাসম্ভব ম্যালেরিয়ার বীজশূন্য হয়, অর্থাৎ রোগীর রক্ত পান করিলেও তাহাতে যেন রোগের বীজ না থাকে, এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে ঐ মশা কামড়াইলেও ম্যালেরিয়া হইবে না।

(১) মশার ধ্বংসসাধন করা দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। উড়ন্ত মশাকে মারা অতি কঠিন। কিন্তু ডিম ও লার্ভা অবস্থায় যখন ইহারা গতিশক্তিহীন, তখন অনায়াসে ইহাদের মারা যায়। আবদ্ধ জলের উপর যেখানে ঘাস. পাতা, পানা, শেহালার দল ঘেরিয়া জলটি স্থির হইয়া থাকে এবং তরঙ্গ উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ নিরাপদ স্থানেই মশা ডিম পাড়ে, কারণ জলে স্রোত থাকিলে ডিমগুলি ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং মাছে তাহা খাইয়া ফেলে। অতএব যাহাতে জল কোথাও আবদ্ধ না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নর্দ্দমায় যাহাতে জল না জমে, অনাবশ্যক ডোবা নালা প্রভৃতি বুজাইয়া ফেলা হয়, পতিত জলা জমি চাষ করিয়া ফেলা হয়, পুষ্করিণীগুলির যাহাতে সংস্কার হয়,—এই সকল ব্যবস্থা করিলে যথেষ্ট মশক-নিবারণ হইতে পারে। যেখানে জলা জমি বলিয়া চাষ আবাদ করা যায় না সেখানে কৃত্রিম উপায়ে বন্যার দ্বারা প্লাবিত করার ব্যবস্থা (Bonnification) করা যাইতে পারে।

যেখানে জল নিকাশের কোনো উপায় নাই,—যেমন পুষ্করিণীর জল, কুয়ার জল প্রভৃতি,—সেখানে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে মশা তথায় ডিম পাড়িলেও সেগুলি বাঁচিতে না পারে। মশার লার্ভাগুলির পক্ষে কেরাসিন তেল খুব বিষাক্ত,—এই জন্য রস্ সাহেবের আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব হইতেই মশা মারিবার জন্য জলের উপর **কেরাসিন তেল** ঢালার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। জলের উপর তেল ঢালিয়া দিলে তাহা ভাসিতে থাকে এবং মশার লার্ভাগুলি তাহার নীচে চাপা পড়িয়া থাকে,—এই তেলের স্তর ভেদ করিয়া তাহারা নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। নিঃশ্বাস লইতে গেলেই কিছু তেল খাইয়া ফেলে,—এবং কতকটা শ্বাসরোধ হইয়া ও কতকটা তেলের বিষে তাহারা শীঘ্রই মরিয়া যায়। সেইজন্য যেখানে যেখানে জল আবদ্ধ হইয়া আছে, সেখানে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া কেরাসিন তেল ঢালিয়া দেওয়া উচিত। আজকাল কেরাসিন তেল অপেক্ষাও মশার পক্ষে অধিক বিষাক্ত নানারূপ তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে। "ম্যালেরিয়ল্" (Malariol) নামে একপ্রকার তেল পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ ফলপ্রদ এবং দামেও কিছু সস্তা।

তেল ঢালা ব্যতীত আরো একরূপ ব্যবস্থা আছে। কপার আর্সেনাইটের (Copper arsenite) গুঁড়া অথবা প্যারিস গ্রীনের (Paris Green) গুঁড়া কাঠের-গুঁড়া বা ধূলার সহিত মিশাইয়া (শতকরা এক ভাগ) জলের উপর ছড়াইয়া দিলেও মশার লার্ভা মরিয়া যায়। আমেরিকা, ইটালি, প্রভৃতি দেশে এমন সব জলা আছে যেখানে মনুষ্য সমাগম দুঃসাধ্য, কিন্তু সেই সকল স্থানে এরোপ্লেনের সাহায্যে এই সকল গুঁড়া

আকাশ হইতে জলের উপর ছড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, এবং তথাকার মশা এইরূপে নিবারণ করা হয়।

পুকুরে বা ট্যাঙ্কে ছোট জাতের মাছ ছাড়িয়া দেওয়াও মশক নিবারণের এক উপায়। ইহারা মশার ডিমগুলি খাইয়া ফেলে, সুতরাং অনেক মশা এইরূপে বিনষ্ট হইতে পারে। সকল জাতীয় মাছে মশার ডিম খাইতে পারে না। নিম্নলিখিত মাছগুলি মশার ডিম খাইতে সুদক্ষ :—**কই, ল্যাঠা, খলিসা, মাগুর, সিঙ্গি, শোল, সাল, চ্যাং, ভেদে, দাঁড়কে, তেচোকো, চাঁদা, পুঁটি।**

জঙ্গল কাটানো—মশা নিবারণের অন্যতম উপায়, কিন্তু সর্ব্বত্র নয়। কোনো কোনো স্থানে ইহাতে মশা বেশ কমে, কিন্তু কোনো কোনো স্থানে আরো বাড়িয়া যায়। বড় বড় গাছ পালা কাটিয়া লাভ নাই, গ্রামের প্রান্তে বড় গাছের বন থাকিলে তাহা অনেক সময় মশা আটকাইয়া রাখে। তবে ঝোপ জঙ্গল কাটিয়া ফেলা উচিত; এই সকল জঙ্গলের নীচে প্রায়ই বৃষ্টির জল জমিয়া থাকে এবং সেখানে মশা অনায়াসে ডিম পাড়িতে পারে।

মশা নির্ম্মূল করিবার আরো নানারূপ উপায় আছে, তবে বহুকালের জন্য তাহার স্থায়ী বন্দোবস্ত করা দরকার। এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া পানামা ও ইস্‌লামিয়া হইতে ম্যালেরিয়া একেবারে বিতাড়িত হইয়াছে। সম্প্রতি মালয় প্রদেশেও এই সকল ব্যবস্থা করাতে ম্যালেরিয়া অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ছোট ছোট দেশের জন্য যে ব্যবস্থা ও যে পরিমাণ অর্থব্যয়, মহাদেশের পক্ষে তাহাতে কুলায় না। আমাদের দেশের একজন সাহিত্যিক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে একখানি মানোয়ারী জাহাজ প্রস্তুত করিতে যত খরচ হয় তাহাতেই আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি জানেন না যে বাস্তবিক ইহা এত সহজ নয়। কোনো বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমগ্র ভারতবর্ষে ইহার রীতিমত ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রথমেই প্রায় তিন সহস্র কোটি টাকার প্রয়োজন, এবং সে ব্যবস্থা বজায় রাখিতে গেলে বহুকাল যাবৎ তথোপযুক্ত বাৎসরিক খরচের প্রয়োজন।

এই সকল সংস্কারের কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্যক্তিগত ভাবেও আমরা মশা নিবারণের নানা উপায় করিতে পারি ও তাহাতেও যথেষ্ট ফল হইতে পারে। আপন আপন বসত বাড়ীর সীমানার মধ্যে কোথাও যাহাতে মশা জন্মিবার সুযোগ না পায় তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ কঠিন নয়। বাড়ীর

আশে পাশে কোথাও জল জমিয়া থাকিবে না, ড্রেনের জল আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না, জলপাত্র খোলা পড়িয়া থাকিবে না, ভাঙা হাঁড়ি কলসী বা টিনের মধ্যে জল জমিবার সুযোগ না দিয়া উহা নষ্ট করিয়া অথবা উবুড় করিয়া দেওয়া হইবে, জলের জালা এবং চৌবাচ্ছা বা ট্যাঙ্ক বা ইঁদারা কখনো অনাবৃত রাখা হইবে না, খিড়কির পুকুরের পাড়ে আগাছার ঝোপ জন্মিয়া জলের উপর আওতা করিয়া থাকিবে না এবং জলের উপর পাতা পড়িয়া বা পানা জমিয়া মশার ডিম পাড়ার আশ্রয় রচনা করিবে না, বর্ষাকালে বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে কোথাও যাহাতে জল জমিয়া থাকিতে না পারে এ জন্য ছোট ছোট খানা ডোবা ও নীচু জমি মাত্রেই মাটি ফেলিয়া ভরাট করিয়া দেওয়া হইবে,—এই সকল ব্যবস্থা যদি অধ্যবসায়ের সহিত করা যায় এবং প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ ভিটায় এই গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলে তবে নিশ্চয়ই মশা অনেক কমিয়া যায়। অতি অল্প অর্থব্যয়েই ইহা সম্ভব হইতে পারে, প্রয়োজন কেবল চেষ্টার ও অধ্যবসায়ের।

মশার ডিম ধ্বংস করা ছাড়া উড়ন্ত মশা মারিবার জন্যও কয়েকরূপ ব্যবস্থা আছে। মানুষের বাসগৃহে দিনের ভাগে প্রায় মশা আসে না, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইহাদের আমদানি হয়। সুতরাং ঐ সময় চেষ্টা করিলে অনেক মশা বিনষ্ট হইতে পারে। মশা আসিয়া ঘরের অন্ধকার কোণগুলি আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং পর্দ্দার অন্তরালে, কাপড়ের আলনার পিছনে, দেওয়ালে ছবির পিছনে, ট্রাঙ্ক আলমারি প্রভৃতির আড়ালে জমা হইয়া থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং শয়ন-গৃহে পারতপক্ষে এই সকল আসবাব না রাখাই উচিত। শয়ন-গৃহ সম্পূর্ণ রিক্ত করিয়া যদি সেখানে একটি **মশা-ধরা ফাঁদ** (trap) রাখা যায় তবে প্রত্যহ অনেক মশা তাহাতে আটক পড়ে।

ফাঁদটি আর কিছুই নয়, একটি বড় আকারের প্যাকিং বাক্স। এই বাক্সের ভিতর-দিকে আলকাৎরা দিয়া কালো রং করিয়া লইতে হয়। বাক্সের উপরকার ডালা অর্দ্ধেকটা খোলা থাকিবে এবং অর্দ্ধেকটা বন্ধ। ডালার মাঝামাঝি কব্জা দিয়া দুই অংশ যুক্ত করিয়া লইলে ভাল হয়, তাহাতে ইচ্ছামত বাক্সটি অর্দ্ধেক খোলা রাখিয়া আবার প্রয়োজনমত উহা সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাইতে পারে। এই বাক্সটি ঘরের একপাশে

প্রত্যহ সন্ধ্যায় খুলিয়া রাখিয়া দিলে অধিকাংশ মশা উহার ভিতর গিয়া প্রবেশ করে, কারণ উহা অন্ধকার এবং কোণ-বিশিষ্ট। রাত্রি ভোর হইবার পূর্ব্বে ডালাটি সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ইহাতে দেখা যাইবে বহু মশা উহার ভিতর জমা হইয়া আছে। অতঃপর কোনো ফাঁক দিয়া উহার মধ্যে একটু পেট্রোল ঢালিয়া দিলেই তাহার ঝাঁজে সমস্ত মশা মরিয়া যাইবে। এই উপায়েও প্রত্যহ অনেক মশা মারা যাইতে পারে, এবং প্রতি ঘরে এইরূপ একটি করিয়া ফাঁদ রাখা কিছুই কঠিন নয়।

তীব্র ধোঁয়াতেও অনেক মশা মরে। ক্রিজল্ (Liquor cresol saponificatus) চার আউন্স পরিমাণ একটি পাত্রে রাখিয়া তাহার নীচে আগুনের জাল দিলে অনেক ধোঁয়া হয়, তাহাতে সমস্ত গৃহ মশকশূন্য করা যায়। ধোঁয়া হইবার পূর্ব্বে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ রাখা উচিত। উহার দুই ঘণ্টা পরে এই গৃহ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তামাকপাতা পোড়াইলেও যে ধোঁয়া হয় তাহাতে মশা মরে। গন্ধক ও ধূনার ধোঁয়ায়, এবং কেটল (Katol stick) প্রভৃতি জ্বালাইয়া রাখিলে মশা কতক পলায় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসে। আজকাল "ফ্লিট্" প্রভৃতি কয়েক প্রকার তীব্রগন্ধী তৈল পাওয়া যায়, তাহা স্প্রে করিয়া দিলেও মশা বিনষ্ট হয়। ফ্লিট্ হাতে-পায়ে মাখিয়া শুইলেও মশা কামড়ায় না। এক গ্যালন কেরোসিন তৈলে দুই আউন্স কার্ব্বন টেট্রাক্লোরাইড (Carbon tetrachloride) মিশাইয়া দিলেই উত্তম "ফ্লিট্" প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

(২) মশা মারা ব্যতীত মশা যাহাতে কাছে আসিতে না পারে বা কামড়াইতে না পারে তাহারও নানাপ্রকার উপায় আছে। গৃহে মশার প্রবেশ রোধ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়, বাড়ীর সমস্ত জানলা দরজা তামার বা অন্য কোনো ধাতুর সূক্ষ্ম জাল দিয়া এমন ভাবে আবৃত করা, যাহাতে মশা প্রবেশ করিবার ফাঁক না পায় (mosquito-proof house)। ইটালিতে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় তিনজন চিকিৎসক তাঁহাদের বাসগৃহ এইরূপ জালে আচ্ছাদিত রাখিয়া কিরূপে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করিয়াছিলেন সে কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই অবধি অনেক দেশেই অবস্থাপন্ন লোকদের গৃহ ও সরকারী বাড়ীগুলি এইরূপ জালে আবৃত করা হয়। পানামার সমস্ত বাড়ীতেই এই ব্যবস্থা আছে। আসামের চা বাগানেও

কোনো কোনো বাড়ী এইরূপ জালে আবৃত করা হইয়াছে। ইহাতে কিছু অর্থব্যয় হইলেও তাহা খুব বেশী নয়, ইচ্ছা করিলে অনেকেই ইহা করিতে পারেন। মশা আটক করিবার উপযুক্ত তামার জাল বাজারে যথেষ্ট পাওয়া যায়। জানলা দরজাগুলির ফ্রেমে ঐ জাল আঁটিয়া তাহাতে এমন ভাবে স্প্রিং লাগাইতে হয় যাহাতে ঠেলিবা মাত্র তাহা বাহিরের দিকে খুলিয়া যায় (ভিতর-দিকে নয়) এবং ছাড়িবা মাত্র আপনি বন্ধ হইয়া যায়। আনা-গোনার পথে এক জোড়ার পরিবর্ত্তে দুইজোড়া দরজা রাখাই ভাল।

আর এক চিরন্তন উপায়, **মশারি**। Mcwalter বলিয়াছেন,—A good mosquito-net is the best preventive, অর্থাৎ ভাল একটি মশারি ম্যালেরিয়া নিবারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তবে যে ভাবে আমরা সচরাচর মশারি ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে বিশেষ লাভ হয় না। সন্ধ্যার সময়ই মশার আমদানি, সুতরাং সন্ধ্যা হইবামাত্র মশারির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, নতুবা সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নগ্নগাত্রে মশার কামড় খাইয়া কেবল মাত্র নিদ্রার সময়টুকু মশারির মধ্যে প্রবেশ করায় কিছু ফল নাই। মশার কামড় বাঁচাইতে হইলে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত মশারির অন্তরালে থাকিতে হইবে। ম্যালেরিয়ার দেশের লোকের পক্ষে প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রাম লওয়া এবং প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের অভ্যাস করাই শ্রেয়। যাহাদের সন্ধ্যার পর বাহিরে ঘোরাঘুরি করার প্রয়োজন তাহাদের গা-ঢাকা জামা ও পা-ঢাকা লম্বা পায়জামা ব্যবহার করা উচিত। বাংলা দেশে এরূপ পোষাকের প্রচলন নাই বটে কিন্তু পাঁচজনে ইহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেই ক্রমে প্রচলিত হইয়া যাইতে পারে। মশা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কামড়ায় পায়ের গোছে, সুতরাং পা দুটিই সর্ব্বদা আবৃত রাখা বিশেষ দরকার।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় সূর্য্যাস্ত হইবামাত্র মশারির আশ্রয়ে থাকা। বিশেষতঃ **ছোট ছেলে পুলেদের জন্য** এরূপ ব্যবস্থা নিতান্তই আবশ্যক,—কারণ ম্যালেরিয়া তাহাদেরই শীঘ্র ধরে এবং তাহাদের সাবধানে রাখাই বেশী প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর এ দেশের কোনো শিশুকেই মশারির বাহিরে রাখা উচিত নয়।

মশারি ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি সাবধানতা আবশ্যক। উহা কোথাও ছেঁড়া থাকিবে না। উহার ঝুল এবং ঘের খুব বড় হইবে, যেন কোনো দিকে টান না পড়ে এবং বিছানার নীচে গুঁজিয়া দিবার যথেষ্ট কাপড় থাকে। সূক্ষ্ম-ছিদ্রযুক্ত মজবুত নেটের মশারি ব্যবহার করাই ভাল; মশারির চালেও ঐ কাপড় থাকিবে,—তাহাতে বায়ু চলাচল রোধ হইবে না। মশারির নীচের দিকে অনেকটা পরিমাণ ছিদ্রবিহীন মোটা কাপড় দিয়া ঝালরের মত লাগানো থাকিবে। ঘুমের সময় হাত পা প্রায়ই মশারির গায়ে লাগিয়া থাকে; সুতরাং সেই অংশে যদি সামান্যও ছিদ্র থাকে তবে মশা বাহির হইতেই তন্মধ্য দিয়া হুল ফুটাইয়া রক্ত পান করিতে পারে। মশারি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব হইতেই খাটাইয়া রাখা উচিত, যে সময় ঘরে কোনো মশা থাকে না। মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় বাহিরের মশা পাখার দ্বারা তাড়াইয়া ক্ষিপ্র গতিতে ভিতরে ঢুকিয়া যাওয়া উচিত।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে মশারির ভিতর শুইলে তাঁহাদের নিদ্রা হয় না। ইহা কেবল মাত্র অভ্যাসের দোষ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। বাল্যকাল হইতে যাহাদের মশারির মধ্যে নিদ্রার অভ্যাস আছে, তাহাদের আবার মশারি ভিন্ন নিদ্রা হয় না। কয়েকদিন মাত্র কষ্ট করিলেই মশারি ব্যবহার অভ্যস্ত হইয়া যাইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার দেশে যদি কাহারো মশারির অভাব হয়, তবে মোটা চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেও মশক দংশন নিবারণ করা যায়; কেবল নাকের কাছে একটি ছিদ্র রাখা উচিত, তাহা হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কিছুই কষ্ট হয় না। গরমের সময় যাঁহারা উন্মুক্ত স্থানে বা ছাদের উপর শুইতে চান, তাঁহারা আপাদমস্তক ঢাকা একটি ঘেরাটোপ্ (Cloak) প্রস্তুত করাইয়া নাকের এবং চোখের জন্য ছিদ্র রাখিয়া (মুসলমানী বোরখার মত) রাত্রি কালে তাহা পরিধান করিয়া অনায়াসে নিদ্রা যাইতে পারেন,—ইহাতে একটিও মশা কামড়াইবে না।

ম্যালেরিয়ার দেশে সামর্থ্য থাকিলে দোতলা বা তিনতলা বাড়ীই নির্ম্মাণ করা উচিত। নীচের তলা অপেক্ষা উপর তলায় মশা অনেক কম হয়,—কারণ মশা সাধারণতঃ বেশী উপরে উড়িয়া যাইতে পারে না। বাড়ীর কাছে

গোহাল থাকা ভাল, যদি তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়; কারণ এনোফিলিস মশা গরু বাছুর পাইলে মানুষের রক্ত খাইতে চায় না।

(৩) ঔষধের দ্বারাও ম্যালেরিয়া যথেষ্ট নিবারণ করা যাইতে পারে। অনেকে বলেন, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীদের যদি সমগ্রভাবে রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাহাতেই রোগ-বিস্তার অনেকটা নিবারিত হইয়া যায়। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর বীজসম্ভাবনার অবসরই ঘটে না, সুতরাং একজনের রক্ত হইতে অন্যের রক্তে ম্যালেরিয়া সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। কিন্তু তর্কের দিক দিয়া ইহা সত্য হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই।

যুক্তিতে যে ফল আশা করা যায়, কার্য্যতঃ তাহা হয় না। রস্ (Ross) মশার উচ্ছেদ করিয়া ম্যালেরিয়া তাড়াইতে পারিলেন না। রবার্ট কক্ (Koch) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বলিলেন কুইনিনের দ্বারা ইহা হইবে, কিন্তু তাহাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আজকাল **প্লাজ্‌মোকুইনের** আবিষ্কার হওয়াতে ম্যালেরিয়া নিবারণের আর এক নূতন পন্থা পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন ইহার রীতিমত ব্যবহার হইলে ম্যালেরিয়া নিশ্চয় নিবারিত হইবে। এই ঔষধের ম্যালেরিয়ার বীজ নাশ করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ইহার গুণাগুণের কথা পূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। আল্‌জিয়ার্সের খ্যাতনামা চিকিৎসক Laget ইহার এই গুণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন—"In malaria Plasmoquine occupies the same position as the isolation hospital in contagious diseases." অর্থাৎ ছোঁয়াচে ব্যাধির রোগীকে পৃথক হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করিলে যে কাজ হয়, ম্যালেরিয়াতে শুধু প্লাজ্‌মোকুইনের দ্বারাই সে কাজ হইবে। এই ঔষধ আবিষ্কারে অনেকেরই মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে; ইহা যদি সর্ব্বত্রই সফল হয় কিংবা এইরূপ ধরণের আরো কোনো উৎকৃষ্টতর ঔষধ আবিষ্কৃত হয় তবে হয়তো ভবিষ্যতে কেবলমাত্র ঔষধের দ্বারাই ম্যালেরিয়া দূর করা যাইবে।

ম্যালেরিয়ার দেশে বসিয়া ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা পাইতে হইলে অন্যান্য

উপায় অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থব্যক্তিরও প্রত্যহ কুইনিন (অথবা সপ্তাহে তিনদিন করিয়া আটেব্রিন) খাওয়া আবশ্যক। প্রতিষেধক কুইনিন প্রভৃতি খাওয়া থাকিলে যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু শরীরে প্রবেশমাত্র মরিয়া যাইবে তাহা নয়। কিন্তু ইহাতে ভিতরে ভিতরে রোগ প্রবেশ করিয়া প্রচ্ছন্ন অবস্থাতেই তাহা চিকিৎসিত হইয়া যায় (early cure), রোগটি ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না। **প্রতিষেধক রূপে কুইনিনের প্রাত্যহিক মাত্রা** (preventive dose) **৬ গ্রেন,—(কাহারো কাহারো মতে ১০গ্রেন)।** প্রত্যহ সন্ধ্যায় জলযোগের সহিত ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই মাত্রায় ছয়মাস যাবৎ প্রত্যহ কুইনিন খাইলেও শরীরের কোনো অনিষ্ট হয় না। যাহারা অল্প দিনের জন্য ম্যালেরিয়ার দেশে যায় তাহারা প্রত্যহ ইহা ব্যবহার করিবে, এবং ফিরিয়া আসার পরেও ১৫ দিন পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করিতে থাকিবে,—তাহা হইলে ম্যালেরিয়া হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিবে না। যাঁহারা কুইনিন খাইতে চান না, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে **আটেব্রিন** ব্যবহার করিতে পারেন।

পরিশেষে এটুকুও বলিয়া রাখা দরকার যে স্বাস্থ্য ঠিক থাকিলে ম্যালেরিয়াকে ভয় নাই। খাদ্যই সাধারণের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় এবং অনিয়ম অত্যাচার করে না, তাহাদের ম্যালেরিয়া খুব কমই হয়,—ইহা আমরা নিত্যই দেখি। এ দেশে যাহাদের আহার জোটে ম্যালেরিয়া তাহাদের কম,—যাহাদের জোটে না তাহাদের মধ্যেই বেশী। যখন হইতে দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে তখন হইতে ম্যালেরিয়াও বাড়িয়াছে। দেশের অভাব দূর করিতে না পারিলে ম্যালেরিয়া দূর হইবে না। দারিদ্র্য ও ম্যালেরিয়া দুই যমজ ভাই,—একটি থাকিতে অপরটিকে তাড়ানো দুঃসাধ্য।

ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার

(এই অধ্যায়টি ট্রপিক্যাল মেডিসিনের কোনো খ্যাতনামা অধ্যাপক কর্ত্তৃক লিখিত।)

ম্যালেরিয়ার সহিত হিমোগ্লোবিন-যুক্ত প্রস্রাব হইতে থাকিলেই তাহাকে ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার বলা হয়। ইহার অপর নাম Malarial hæmoglobinuria।

যে-কোনো জ্বরের সঙ্গে রক্তপ্রস্রাব দেখিলেই তাহাকে ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার বলা যাইবে না। রক্তপ্রস্রাব-সংযুক্ত জ্বর অনেক রোগে হইতে পারে,—আবার প্রস্রাবে বাস্তবিক রক্তের সংস্রব না থাকিলেও উহার রক্তের মত গাঢ় রং হইতে পারে। ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের প্রস্রাব রক্তবর্ণ হইলেও উহাতে প্রকৃত রক্ত থাকিবে না, অর্থাৎ উহাতে কোনো রক্ত-কণিকা থাকিবে না,—সুতরাং মাইক্রোস্কোপ পরীক্ষায় একটিও রক্তকণিকা দেখা যাইবে না। ঐ প্রস্রাবে কেবল হিমোগ্লোবিন (রক্তমধ্যস্থ লোহিত পদার্থ) থাকিবে এবং রাসায়নিক পরীক্ষায় তাহাই মাত্র জানা যাইবে। এই হিমোগ্লোবিনই ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে রক্তবর্ণ-প্রস্রাব হওয়ার কারণ। সেইজন্য ইহাকে হিম্যাচুরিয়া (hæmaturia) না বলিয়া হিমোগ্লোবিনিউরিয়া (hæmoglobinuria) বলা হয়।

তবে রক্তবর্ণ-প্রস্রাব দেখিলেই তাহাকে হিমোগ্লোবিনিউরিয়া বলা চলে না। ম্যালেরিয়াতে কামলা (jaundice) হইলে, অথবা পিত্তপ্রধান ম্যালিগ্ন্যান্ট্ ম্যালেরিয়াতেও (Bilious remittent fever) প্রস্রাব গাঢ় রক্তের মত দেখিতে হয়—কিন্তু পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় যে উহা পিত্তে পরিপূর্ণ, হিমোগ্লোবিন আদৌ নাই। সুতরাং পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে অনেক সময় বলা যায় না বাস্তবিক হিমোগ্লোবিনিউরিয়া হইয়াছে কিনা। আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রস্রাবে পিত্তের রং ও হিমোগ্লোবিনের রং অনেক সময় একইরূপ হয়। পিত্ত ও হিমোগ্লোবিন একত্রে থাকিলে তাহা দেখিয়া চেনা আরো শক্ত।

পরীক্ষা।—হিমোগ্লোবিন চিনিবার একটি খুব সহজ পরীক্ষা আছে,

তাহা এই :—একটুকরা ব্লটিং কাগজ প্রস্রাবের মধ্যে ডুবাইয়া লইয়া দেখিতে হয় উহাতে কিরূপ রং ধরিল। যদি হিমোগ্লোবিন বা রক্ত থাকে তবে উহা লাল হইবে,—আর পিত্ত থাকিলে হরিদ্রাভ-সবুজ হইবে। ঐ সিক্ত ব্লটিং কাগজের উপর এক ফোঁটা ২০°/ₒ বেন্‌জিডিন্-সলিউশন (20°/ₒ Benzedene solution) ও এক ফোঁটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড (Acetic acid) দিয়া, তাহার উপর কয়েক ফোঁটা হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ফেলিলে যদি উহা তৎক্ষণাৎ গাঢ় নীলবর্ণ হইয়া যায়,—তবে বুঝিতে হইবে উহাতে নিশ্চয় রক্তসম্পর্ক আছে,—হয় আসল রক্ত আছে, নতুবা হিমোগ্লোবিন আছে।

কিন্তু এরূপ পরীক্ষাতেই যে বুঝা গেল এটি ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের প্রস্রাব, তাহা নয়। উহাতে কেবল হিমোগ্লোবিনই থাকা চাই, কিন্তু রক্তকণিকা আদৌ থাকিবে না। সুতরাং অতঃপর ঐ প্রস্রাব এক ফোঁটা স্লাইডে লইয়া মাইক্রোস্কোপে দেখিতে হইবে। যদি পরীক্ষায় রক্তকণিকা না পাওয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে উহা হিমোগ্লোবিনিউরিয়া। Spectroscope বা Micro-spectroscope যন্ত্র থাকিলে তাহা দ্বারাও হিমোগ্লোবিনের পরীক্ষা বিশিষ্টরূপে করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণ পক্ষে রাসায়নিক ও মাইক্রোস্কোপ পরীক্ষাই যথেষ্ট। যে প্রস্রাবে রাসায়নিক-পরীক্ষায় রক্তের চিহ্ন পাওয়া যাইবে কিন্তু মাইক্রোস্কোপ-পরীক্ষায় রক্তকণিকা দেখা যাইবে না,—তাহাই হিমোগ্লোবিনিউরিয়া।

হিমোগ্লোবিনিউরিয়ার অন্যান্য বহুবিধ কারণ চিকিৎসা-পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারই ইহার কারণ। অন্য কোনো কারণে হিমোগ্লোবিনযুক্ত প্রস্রাব আমাদের দেশে খুব কমই হয়। অতএব জ্বরের সঙ্গে এইরূপ প্রস্রাব দেখিলেই সাধারণতঃ তাহা ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার কিরূপে হয় ?

ম্যালিগ্‌ন্যান্ট্ ম্যালেরিয়াতে কুইনিন প্রয়োগ করিতে করিতে দৈবাৎ উহার দ্বারা ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের উৎপত্তি হয়,—এই কথাই সকলে

বলেন। কুইনিন-হিমোগ্লোবিনিউরিয়া ও ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার প্রামাণিক হিসাবে একই রোগ।

এ রোগের সঠিক কারণ যে কি তাহা এখনও আমরা জানি না। ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে কেন যে হঠাৎ রক্তকণিকা-সকল এত প্রচুর পরিমাণে ভাঙিয়া গিয়া হিমোলাইসিস্ (hæmolysis) হইতে থাকে,—এবং শরীরের ঠিক কোন প্রদেশেই বা ইহা সংঘটিত হয়, তাহা সবিশেষ জানা নাই। তবে যে সকল ঘটনাপরম্পরায় ইহার সূত্রপাত হয় এবং যেরূপ অবস্থা হইতে ইহার উৎপত্তি ঘটিতে বারবার লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে, সেইগুলি একে একে বিবৃত হইল :—

(১) যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া সংবৎসর যাবৎ এন্‌ডেমিক্ (endemic) বা স্থায়ী ভাবে লাগিয়া থাকে,—এবং যেখানে অন্যান্য ম্যালেরিয়ার তুলনায় ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ার সংখ্যা বেশী,—সেখানেই ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের প্রাদুর্ভাব। যে সকল দেশে ম্যালেরিয়া কেবল নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে অস্থায়ী এপিডেমিকের মত দেখা দেয়,—কিন্তু বৎসরের অন্যান্য সময় থাকে না,—সেখানে ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হয় না। যে সকল দেশে কয়েক বৎসর অন্তর এক-একবার আকস্মিক ম্যালেরিয়ার ঢেউ আসে,—(যেমন পঞ্জাব অঞ্চলে)—সেখানেও এ রোগ হয় না। জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চল ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের জন্য বিখ্যাত,—এবং ম্যালেরিয়াও সেখানে বারোমাস লাগিয়া থাকে।

(২) পূর্ব্ব হইতে ম্যালেরিয়া না থাকিলে কাহারো ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হয় না,—এবং ম্যালেরিয়ার প্রথম আক্রমণেই কখনও ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হয় না। পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া-জ্বরে ভোগার পর তবে ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের আবির্ভাব হয়। যে দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব আছে সে দেশে কেহ নূতন বাস করিতে গেলে প্রথম কয়েকমাসের মধ্যে তাহার ঐ রোগ হইতে দেখা যায় না; অন্ততঃ ছয়মাস বাস করিবার পর তবে তাহাকে এই রোগে আক্রমণ করিতে পারে। কাহারো কাহারো ৩।৪ বৎসর বাসের পরেও হয়।

(৩) ব্ল্যাকওয়াটারের দেশে অবস্থান কালেই যে ইহা ধরিবে, ও

সে স্থান হইতে অন্যত্র সরিয়া গেলে আর হইবে না,—এরূপ নয়; বরং ইহার উল্টা হয়। কলিকাতাতে এবং ইংলণ্ডেও ঐ সকল দেশ হইতে সদ্য প্রত্যাগত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যকর স্থানে পলাইয়া গিয়াও যাহারা মধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে থাকে, তাহাদের হঠাৎ একসময় ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার উপস্থিত হইতে পারে। এই রোগীদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায় যে ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের দেশে ইহারা পূর্ব্বে বাস করিয়াছিল।

(৪) স্থানীয় রোগ হইলেও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইহা অপেক্ষাকৃত কম হয়,—বিদেশী আগন্তুক যাহারা তথায় গিয়া কিছুকাল বাস করিতে আরম্ভ করে তাহাদের মধ্যেই ইহা বেশী হয়।

(৫) কুইনিনের সহিত ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে একথা নিশ্চয়। যাহারা অনিয়মিতভাবে কুইনিন খায় তাহাদেরই এই রোগ হয়। যাহারা কুইনিন খায় নাই তাহাদের এ রোগ হয় না। যাহারা প্রত্যহ নিয়ম করিয়া কুইনিন খাইতেছে তাহাদেরও প্রায় ইহা হয় না। যাহারা জ্বর হইলেই কয়েকমাত্রা কুইনিন খায়,—জ্বর বন্ধ হইলেই কুইনিনও বন্ধ করে,—আবার জ্বরভাব দেখিলেই দুই-একমাত্রা খাইয়া লয়,—অর্থাৎ যাহারা মধ্যে মধ্যে অনিয়মিতভাবে কুইনিন খায় এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধ করে, প্রায় তাহাদেরই ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হইতে দেখা যায়। রোগীর নিকট ইহার সূত্রপাতের ইতিহাস প্রায় এই একই রূপ শুনা যায়:—রোগীর মধ্যে মধ্যে অল্প-অল্প জ্বর হইতেছিল, কুইনিন খাইলেই তাহা আরোগ্য হইয়া যাইত। এবারেও তাহার অল্প জ্বর হইয়াছিল,—সেইজন্য সম্প্রতি ১০।১৫ গ্রেন কুইনিন খাইয়াছে। তাহার পরই হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব রক্তবর্ণ দেখা গেল। চিকিৎসককে কিছু বলিয়া দিতে হয় না, রোগী নিজেই বলে তাহার ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হইয়াছে। কুইনিন খাওয়ার পর হইতেই রক্তবৎ প্রস্রাব দেখা দিল, ইহাই অধিকাংশ স্থলে শুনা যায়। কেবল তাহাই নয়,—যাহাদের একবার ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হইয়া গিয়াছে,—তাহারা পুনরায় কুইনিন খাইলে পুনরায় উহা দেখা দেয়। ইহাতেই বুঝা যায় যে কুইনিনের

সহিত ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের কিছু সম্পর্ক আছে। কিন্তু ইহা যে একমাত্র কুইনিনের জন্যই হয় তাহা নয়, কারণ কুইনিন খাইয়া সকলের এরূপ দুর্ঘটনা হয় না। বারকয়েক ম্যালেরিয়াতে ভুগিয়া ও কুইনিন খাইয়া অসম্পূর্ণ ও অনিয়মিত চিকিৎসায় কাহারো কাহারো শরীরের মধ্যে ঐ প্রকার রক্তক্ষয় আসন্ন হইয়া থাকে,—তাহার উপর পুনর্ব্বার কুইনিন খাইবামাত্র উহা হঠাৎ আসিয়া পড়ে। এই জাতীয় প্রবণতা সকলের হয় না, কাহারো কাহারো ইহার বিশেষ ধাত আছে,—কুইনিন অনিয়মিত খাইলেই তাহাদের এরূপ হয়। নিয়মিত কুইনিন খাইলে উহা তাহাদের সহ্য হইয়া যাইতে পারে। টম্‌সন্ (Thomson) প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে যাহারা নিয়মিত কুইনিন খাইয়াছে তাহাদের মধ্যে কাহারো ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হইতে পারে নাই। সুতরাং রীতিমতভাবে কুইনিন খাওয়া ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার নিবারক, কিন্তু অনিয়মিত কুইনিন খাওয়া ইহার প্রবর্ত্তক।

(৬) ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া হইতেই এ রোগের উৎপত্তি হয়। ব্ল্যাক-ওয়াটারের সূত্রপাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে বহুলোকের রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে শতকরা ৭৫ হইতে ৯০ জনের রক্তে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট-জীবাণুই পাওয়া যায়। আক্রমণের পর রক্ত লইলে তখন আর এই সকল জীবাণু প্রায়ই দেখা যায় না, রক্তকণিকাগুলি ভাঙিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনেকগুলি আপনিই বিনষ্ট হয়। কিন্তু ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার আরোগ্য হইয়া গেলে পুনরায় কিছু দিন পরে রক্তের মধ্যে ইহাদের দেখা যাইতে পারে।

ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া ও ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে কি প্রভেদ?

ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া হইতেই ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের উৎপত্তি। ইহা ম্যালেরিয়া হইতে অন্যরোগে রূপান্তর নয়, ম্যালেরিয়ারই একরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা-পরিবর্ত্তন মাত্র। ম্যালেরিয়ার কিছু নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা আছে, এই সীমা অতিক্রম করিলেই ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার উপস্থিত হয়। কিন্তু ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া মাত্রেই এই সীমারেখা অতিক্রম হওয়া সম্ভব নয়। যে

ম্যালেরিয়াতে ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হওয়া সম্ভব তাহারও কিছু বিশেষত্ব আছে.—এবং যে অবস্থা-বৈগুণ্যে উহা ঘটিতে পারে তাহারও কিছু বিশেষত্ব আছে। অতএব বিশিষ্টরূপ ম্যালেরিয়াতে বিশিষ্টরূপ ঘটনা-সংযোগ হইলে তবে উহা ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে পরিণত হয়। ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে শরীরের মধ্যে যে সকল আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে তাহা ছাড়া অন্য কোনো পৃথক ক্রিয়া লক্ষিত হয় না, একইরূপ ক্রিয়ার কেবল মাত্রার আধিক্য হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়াতে রক্তের মধ্যে যে অনিষ্ট হইতে থাকে তাহা এত ধীরে ধীরে হয় যে বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে তাহা অতি দ্রুত ও অত্যধিক পরিমাণে হইতে থাকে, তাহারই ফলে হিমোগ্লোবিনিউরিয়া প্রভৃতি লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

ম্যালেরিয়া মাত্রেই জ্বর আসিবার সময় প্রত্যেক বার কিছু পরিমাণ রক্তের হিমোলাইসিস্ (hæmolysis) হয়, অর্থাৎ কতকগুলি কণিকা ভাঙিয়া হিমোগ্লোবিন বাহির হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়া মাত্রেই ইহা হইবে, জ্বর যতই সামান্য হউক না কেন। রক্ত ও প্রস্রাব বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এ কথা প্রমাণ করা যায়। ম্যালেরিয়ার রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায় হিমোগ্লোবিন ও লোহিত-কণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, এবং রক্তের সিরামে বিলিরুবিনের (bilirubin) মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। প্রস্রাবেও ইউরোবিলিনের (urobilin) মাত্রা বাড়িতে দেখা যায়। কণিকামুক্ত হিমোগ্লোবিন বিশ্লেষিত হইয়াই বিলিরুবিন ও ইউরোবিলিনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে হিমোলাইসিস্ অত্যধিক হওয়াতে তাহার এই সকল রূপান্তরের অবকাশ ঘটে না।

রক্তকণিকা ভাঙিয়া উহা হইতে হিমোগ্লোবিন বিচ্ছিন্ন হইবামাত্র প্রথমে উহা গ্লোবিন (globin) ও হিম্যাটিন (hæmatin)—এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। এই হিম্যাটিন (hæmatin) আবার লৌহযুক্ত হিমোসয়ডারিন্ (hæmosoiderin) এবং লৌহশূন্য বিলিরুবিনে (bilirubin) পুনর্বিভক্ত হয়। এই বিলিরুবিনের কতক অংশ যকৃতে গিয়া পিত্ত (bile-protein) প্রস্তুত করে এবং কতক অংশ ইউরোবিলিনে রূপান্তরিত হয়। এই সকল রূপান্তর

কতকগুলি বিশিষ্ট জীবকোষের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়, সেইগুলির নাম বলা হয় reticulo-endothelial cells। এই জাতীয় কোষ শরীরের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদমতে শুনা যাইত পিত্ত সমস্ত দেহেই হয় ও তাহার বিকারই নানারূপ অসুস্থতার কারণ। এখন আমরা বুঝিতেছি এ কথা খুব সত্য।

হিমোগ্লোবিনের রূপান্তর এইরূপে হয়ঃ—
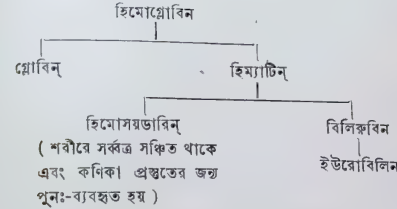
সাধারণ মানুষের দেহে প্রত্যেক রক্তকণিকার আয়ু-কাল শেষ হইয়া গেলে তাহা ভাঙিয়া গিয়া হিমোগ্লোবিনের এই সকল পরিবর্ত্তন নিত্যই ঘটিতে থাকে, কিন্তু তাহা অতি অল্প পরিমাণে। হিমোলাইসিসের মাত্রা যদি কোনো কারণে অধিক হয় তখন যকৃৎ তৎঘটিত অধিক মাত্রার বিলিরুবিন লইয়া স্বাভাবিক মত কাজে লাগাইতে পারে না, সেই জন্য তখন রক্তের সিরামে বিলিরুবিন ও প্রস্রাবে ইউরোবিলিন অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। যদি হিমোলাইসিস্ অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, তবে ইউরোবিলিন প্রস্রাবে বাহির হয় না, কারণ কিড্নি বা মূত্রগ্রন্থি তাহা ছাঁকিয়া ধরিয়া রাখে। যদি কিছু অধিক হয় তবে উহা ছাঁকিতে না পারিয়া প্রস্রাবের সহিত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। আর যদি অত্যধিক হিমোলাইসিস্ হয়, তবে আসল হিমোগ্লোবিনই অপরিবর্ত্তিতরূপে প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইতে থাকে।

সাধারণ ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে হিমোলাইসিস্ হইতে থাকিলেও উহা ধীরে ধীরে হয়, সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট কোষসমূহ (reticulo-endothelial cells) আপন কার্য্য করিবার সময় পায়; কেবল মাত্র বিলিরুবিন ও ইউরোবিলিনই মাত্রায় কিছু বাড়ে, এবং রক্তে ও প্রস্রাবে তাহা লক্ষিত হয়। কিন্তু ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে হিমোলাইসিস্ এত অধিক হয় যে কোষসমূহ কিছুই করিতে পারে না, ফলে হিমোগ্লোবিনই অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতে প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হইতে থাকে।

সেলার্ড ও মিনোট প্রমাণ করিয়াছেন যে, অন্ততঃ ১৭ সি. সি. পরিমাণ রক্তকণিকা একসঙ্গে ভাঙিলে তবে হিমোগ্লোবিনিউরিয়া প্রকাশ পাইবে। অতএব ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে হঠাৎ ঐ পরিমাণ বা ততোধিক রক্তকণিকার একসঙ্গে হিমোলাইসিস্ হওয়াতেই হিমোগ্লোবিনিউরিয়া দেখা দেয়। ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়াতেও তাহাই হয়, কেবল পরিমাণ অল্প,—অর্থাৎ একত্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত রক্তকণিকার পরিমাণ ১৭ সি, সি. অপেক্ষা কম।

ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের বিশিষ্ট লক্ষণ

জ্বর ইহার প্রধান লক্ষণ। কুইনিন খাওয়ার পরই এই জ্বর খুব কম্প দিয়া আসে এবং ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়, ও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়। প্রস্রাব রক্তবর্ণ হইবার পূর্ব্বেকার এই জ্বরটির কারণ ম্যালেরিয়া নয়, এবং ইহা কুইনিনের দ্বারাও দূর হয় না। ভিতরে যে হিমোলাইসিস্ হইতেছে তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, অথবা রক্তের মধ্যে বহু পরিমাণ গ্লোবিন (globin) উপস্থিত হওয়াতে ঐ জ্বর ও কম্প হয়। এই জ্বরের কোনো নিয়ম নাই ; প্রথমে ২।৪ দিন প্রবল জ্বর হইয়া তাহা ছাড়িয়াও যাইতে পারে, অথবা ২।৩ সপ্তাহ যাবৎ অল্প-অল্প সবিরাম জ্বরও লাগিয়া থাকিতে পারে।

প্রস্রাবের রং প্রথমে গোলাপী বা রক্তের মত লাল হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহা ঘোর রক্তবর্ণ, কিংবা ঘোর বাদামী (smoky brown), অথবা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণও হইতে পারে। ইউরোবিলিন প্রভৃতির জন্যই এরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রস্রাবের মধ্যে অ্যালবুমেন (albumen) যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এবং প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া গেলেও কয়েকদিন পর্য্যন্ত ইহা বর্ত্তমান থাকে। মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করিলে প্রস্রাবের মধ্যে কাষ্ট্-ও (casts) পাওয়া যায়।

রক্তবর্ণ প্রস্রাবেরও কোনো স্থিরতা নাই। ইহা যেমন হঠাৎ দেখা দেয় তেমনি হঠাৎ আরোগ্য হয়। অনেক স্থলে দুই এক দিন দেখা দিয়া ইহা আপনিই পরিষ্কার হইয়া যায়, কিন্তু আবার হয়তো অকস্মাৎ রক্তবর্ণ দেখা দেয়। কখনও বা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য এইরূপ প্রস্রাব হইয়া তাহা একেবারে আরোগ্য হইয়া যায়, এবং এমন ঘটনাও জানা আছে যেখানে

একবার মাত্র রক্তবর্ণ প্রস্রাব হইয়া আর হয় নাই। কখনও কখনও প্রস্রাব হঠাৎ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতেও দেখা যায়। ইহাই খারাপ লক্ষণ।

বেকার ও ডড্স্ (Baker and Dodds) দেখাইয়াছেন, যদি প্রস্রাবের রিঅ্যাক্শন (reaction) Ph6-এর উপর থাকে তাহা হইলে হিমোগ্লোবিনটি অক্সি-হিমোগ্লোবিন (Oxy-hæmoglobin) রূপে প্রস্রাবে নির্গত হয় ও দেখিতে তাহা টক্টকে লাল এবং স্বচ্ছ হয়। এরূপ লাল ও স্বচ্ছ থাকিলে প্রস্রাব বন্ধ হইবার ভয় নাই। কিন্তু যদি উহা Ph6-এর কম থাকে (অর্থাৎ অম্লগুণ বেশী থাকে) এবং উহাতে লবণের ভাগ ১০% বা তদতিরিক্ত থাকে, তাহা হইলে হিমোগ্লোবিন হিম্যাটিন্ (hæmatin) রূপে প্রস্রাবের তলদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহা ঘোলাটে হয়। ইহার দ্বারা মূত্রগ্রন্থির সূক্ষ্মনালিসমূহ (tubules) বন্ধ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

বমি—ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে নিত্যই থাকে। বমির সহিত পিত্ত থাকিতে দেখা যায় এবং রোগী প্রায়ই বমির সঙ্গে পেটে কিছু ব্যথা অনুভব করে। কখনো কখনো যথেষ্ট হিক্কাও থাকে।

কামলা (jaundice) ইহার আর একটি লক্ষণ। প্রথম হইতেই এই লক্ষণটি রীতিমত দেখা যায় এবং জ্বর আরোগ্য হইয়া যাইবার পরেও চোখের ও মুখের হরিদ্রাভা দূর হইতে বিলম্ব হয়।

প্লীহা—ইহাতে প্রায়ই বড় থাকে এবং প্লীহাতে অনেকে ব্যথার কথাও বলে। অবশ্য পূর্ব্ব হইতে ম্যালেরিয়ার জন্য প্লীহা-বৃদ্ধি থাকাও স্বাভাবিক।

নাড়ী দ্রুত ও সূক্ষ্মগতি (low tension) হয়। রক্তশূন্যতা ইহাতে যথেষ্টই হয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

রোগীর জ্ঞান বরাবরই থাকে, কিন্তু উদ্বেগ ও অস্থিরতা সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে। ইহাতে ভুলবকা ও অজ্ঞানভাব হওয়া বড়ই কুলক্ষণ। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেটে ব্যথা ও অধীর ভাব হওয়াও (uræmic symptoms) অত্যন্ত খারাপ লক্ষণ।

মৃত্যু সংখ্যা

ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা প্রায় কুড়ি হইতে চল্লিশ। ইহাতে তিনরূপ কারণে মৃত্যু ঘটিতে পারে ;—প্রবল জ্বর হইয়া, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া, এবং অত্যধিক দুর্ব্বলতা হেতু হার্টফেল করিয়া।

চিকিৎসা

এই রোগের দুই রকম অবস্থায় দুইরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন। যতক্ষণ হিমোগ্লোবিনিউরিয়া থাকে অর্থাৎ প্রস্রাবে রক্তবর্ণ থাকে, ততক্ষণ একরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে, এবং প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া গেলে ভিন্নরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় দ্রুত রক্তনাশ হইয়া শরীরের যে মারাত্মক ক্ষতি হইতেছে, প্রথমে তাহা হইতে রোগীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন উপস্থিত বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, তখন যাহাতে উহা পুনরায় না ঘটিতে পারে সেই বিষয়েই চেষ্টা করিতে হইবে।

হিমোগ্লোবিনিউরিয়ার অবস্থায়—

এ সময় কুইনিন বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কুইনিন খাওয়ার পর হইতেই এরূপ প্রস্রাব দেখা দেয়, অতএব পুনরায় কুইনিন দিলে উহার বৃদ্ধি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, হিমোল্যাইসিস্ (hæmolysis) হওয়াতে রক্তকণিকাগুলি ভাঙিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তন্মধ্যস্থ ম্যালেরিয়া-জীবাণুগুলি আপনিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব এই অবস্থায় কুইনিন দিবার কোনো সার্থকতা নাই।

কিন্তু কেহ কেহ এ মত সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে কুইনিন মুখে খাওয়ার জন্যই এরূপ হয়, কিন্তু কুইনিন ইন্‌জেকশন দিলে তাহা হইবে না। রক্ত ও প্রস্রাবাদি যদি ক্ষারগুণসম্পন্ন (alkaline) করিয়া লওয়া যায়,—তখন কুইনিন অনায়াসে ইন্‌জেকশন দেওয়া চলিবে ও তাহাতে অনিষ্ট না হইয়া উপকার হইবে, কারণ রোগটি আসলে ম্যালেরিয়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সেইজন্য তাঁহারা রোগীকে খুব বেশী মাত্রায় সোডা বাইকার্ব প্রভৃতি খাইতে দেন এবং প্রস্রাবের রিঅ্যাক্‌শন (reaction) পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে থাকেন। যখনই দেখা যায় সোডা খাইয়া প্রস্রাব অ্যাল্‌কালাইন হইয়াছে (লাল লিট্‌মাস্-কাগজ প্রস্রাবে ডুবাইয়া ধরিলে যখন তাহা নীল হইয়া যায়),—তখনই তাঁহারা কুইনিন ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করেন। এইরূপে প্রস্রাব অ্যাল্‌কালাইন রাখিয়া ও কুইনিন ইন্‌জেকশন্ দিয়া ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার আরোগ্য হইয়াছে সত্য। তবে

ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার যেগুলি আরোগ্য হইবার তাহা অনেকটা আপনিই আরোগ্য হয়, সুতরাং কুইনিন ইন্‌জেকশন না দিলে তাহারা যে আরোগ্য হইত না এ কথা বলা সম্ভব নয়।

মিগ' (Megaw) বলেন তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, এমন অনেক চিকিৎসক আছেন যাঁহারা পূর্ব্বে ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে কুইনিন প্রয়োগ করিতেন,—কিন্তু পরে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে শুনা যায় যে পূর্ব্বে কুইনিন ব্যবহারে যত মৃত্যুসংখ্যা দেখা যাইত,—কুইনিন না দেওয়াতে এখন তাহা অপেক্ষা কম দেখা যাইতেছে।

তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রথম অবস্থাতে উপস্থিত-বিপদ হইতে রক্ষা করিবার দিকেই আমাদের মনোনিবেশ করা উচিত। অবশ্য হিমোগ্লোবিনিউরিয়া যখন হইতে থাকে তখন কোনো ঔষধ দিয়াই তাহা নিবারণ করা যায় না,—উহা সময়মত আপনিই নিবারিত হয়। কিন্তু ইহার ফলে রক্তের মধ্যে যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় ও নানাদিক দিয়া যে সকল উপসর্গ ও বিপদ আসন্ন হইয়া থাকে, সেইগুলি হইতে রোগীকে রক্ষা করাই তখন বিশেষ প্রয়োজন।

(১) রোগীকে বিছানায় সর্ব্বদা শোয়াইয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। এই রোগে হঠাৎ **হার্টফেল** হইয়া মৃত্যুর যথেষ্ট সম্ভাবনা,—সেইজন্য হৃৎযন্ত্রকে যথাসম্ভব বিশ্রাম দেওয়া উচিত। রোগ ভাল হইবার উপক্রম হইয়াছে, প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়াছে, জর ও বমি কমিয়া গিয়াছে,—তথাপি হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া অনেক রোগীকে মরিতে দেখা গিয়াছে। এই সকল রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে গিয়া নাড়াচাড়া করিবার ফলেও মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

(২) রোগীকে **প্রচুর পরিমাণে জল** দিতে হইবে। প্রস্রাব যাহাতে প্রচুর হয় এজন্য যথেষ্ট পরিমাণে **ক্ষারযুক্ত পানীয়** প্রয়োগ করাই ইহার উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। প্রস্রাব সরল হইতে থাকিলে এ-রোগে জীবনের কোনোই আশঙ্কা নাই। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত মত পানীয় দিলেই বেশ উপকার হয়—

সোডা বাইকার্ব—	১২০ গ্রেন
শুগার অফ মিল্ক—	১ আউন্স
জল—	১ পাইন্ট

ইহা প্রত্যহ অন্ততঃ একবোতল করিয়াও খাওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়াও সোডা সাইট্রেট জলের সহিত অর্দ্ধড্রাম হইতে একড্রাম মাত্রায় প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই সকল পানীয় নিয়মিতরূপে খাওয়ানো যায় না,—খাইলেই রোগী তাহা বমি করিয়া ফেলে। তখন লেবুর রস দিয়া অথবা বরফ দিয়া নানা উপায়ে উহা খাওয়ানোর চেষ্টা করা উচিত। Tabloids Alkaline Co. (B. W. & Co.) নামে একরূপ ট্যাবলেট পাওয়া যায়, উহা জলে গুলিয়া খাইতে বেশ সুস্বাদু,—তাহাও প্রত্যহ ৪।৫টি করিয়া জলে গুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এরূপভাবে দিতে না পারিলে মিকশ্চার করিয়াও অ্যাল্‌কালাইন ঔষধগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে,—নিয়মিত সময় অন্তর ঔষধ-হিসাবে তাহা খাইতে অনেকের আপত্তি হয় না। ম্যানসন্ পূর্ব্বে Hearsley's mixture নামক একটি ঔষধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেন, অনেকেই বলেন তাহা ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে বিশেষ উপকারী। তাহা এইরূপ :—

সোডা বাইকার্ব—	৩০ গ্রেন
লাইকার হাইড্রার্জ পার্‌ক্লোরাইড—	১৫ ফোঁটা
জল—	১ আউন্স
	তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য

পূর্ব্বকালে অনেকেই ইহা ব্যবহার করিতেন। কেহ কেহ Langdon Brown's mixture নামক ঔষধটিও ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহা এইরূপ :—

সোডা বাইকার্ব—	৬০ গ্রেন
পটাস্ সাইট্রেট—	৩০ গ্রেন
ক্যালসিয়ম ল্যাক্‌টেট—	৫ গ্রেন
ম্যাগনিসিয়া কার্ব্বনেট—	৫ গ্রেন
ক্লোরোফরম জল—	১ আউন্স

যাহাই ব্যবহার করা হউক **পূর্ণমাত্রায় ক্ষার প্রয়োগ** করিতে হইবে; যাহাতে প্রস্রাব অ্যাল্‌কালাইন হইয়া যায়,—ইহাই মূল উদ্দেশ্য।

সম্পূর্ণ বিশ্রাম, প্রচুর পানীয়, ও অ্যাল্‌কালাইন ঔষধ দিয়া অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য হয়,—ইহার অধিক কিছু করিবার বড় প্রয়োজন হয় না।

(৩) যেখানে কিছুই পেটে তলায় না, পানীয় দিবা মাত্র বমি হইয়া যায়, সেখানে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? সেখানে **মলদ্বার দিয়া** সেলাইনের সহিত অ্যাল্‌কালি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এক পাইণ্ট জলে ৮০ গ্রেন লবণ, ১২০ গ্রেন সোডা বাইকার্ব, এবং ১ আউন্স গ্লুকোজ,—একত্রে গুলিয়া তাহার ৮ আউন্স বা ৪ আউন্স পরিমাণ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর রবারের নল দ্বারা ধীরে মলদ্বার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।

যদি প্রস্রাব অত্যন্ত কম হইতে থাকে, তাহা হইলে ক্ষারীয় ঔষধ একেবারে **ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশনের** দ্বারা রক্তের মধ্যে প্রবেশ করাইবার প্রয়োজন হইবে। ১২০ গ্রেন সোডা বাইকার্ব এক পাইণ্ট উত্তমরূপে ফুটানো জলে (sterile distilled water কিংবা sterile normal saline) গুলিয়া সমস্তটুকু শিরার মধ্যে ইন্‌জেক্‌শন দিতে হয়। এরূপ দুই একটি ইন্‌জেক্‌শনেই প্রস্রাব শীঘ্র পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহার সহিত ৫ গ্রেন ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড্ ও ১০ ফোঁটা অ্যাড্রেনেলিন সলিউশন মিশাইয়া দিলে আরো ভাল।

অনেকে **চর্ম্মনিম্নে সেলাইন** (subcutaneous saline, 0·85% to 0·9% solution, অর্থাৎ প্রতি পাইণ্ট জলে প্রায় ৮০ গ্রেন লবণ সহযোগে) দিতে উপদেশ দেন। এই সেলাইন প্রত্যহ একবার কিংবা দুইবার ৮ আউন্স মাত্রায় চর্ম্মনিম্নে ইন্‌জেকশন দিতে হয়। এ ছাড়া ক্ষারযুক্ত সেলাইন মলদ্বারেও দিতে হয়। দুই প্রকারে সেলাইন একত্রে প্রয়োগ করিতে থাকিলে অনেক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা যায়।

(৪) যেখানে হিমোগ্লোবিনিউরিয়া সহজে বন্ধ হইতেছে না, এবং নিত্য নিত্য হিমোলাইসিস্ হইয়া রক্তকণিকা সকল ধ্বংস হইয়া যাইতেছে দেখা যায়, সেখানে **অপর কোনো সুস্থ লোকের শরীর হইতে রক্ত লইয়া** রোগীর শরীরে প্রবেশ (blood transfusion) করাইয়া দিলে ভাল হয়। এ জন্য রক্তদাতার রক্ত রোগীর পক্ষে গ্রহণোপযুক্ত কি না তাহা আগে পরীক্ষা করিয়া দেখা (blood grouping) আবশ্যক, এবং তৎপরে ৩০০।৪০০

সি. সি. রক্ত লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। যেখানে এরূপ পরীক্ষাদি হওয়া সম্ভব নয়, সেখানে রোগীর কোনো নিকট-আত্মীয়ের শরীর হইতে ১০ সি. সি. বা ২০ সি. সি. পরিমাণ রক্ত লইয়া রোগীর শরীরে **ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন** (whole-blood injection) দিলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়। উপকার দেখা গেলে প্রত্যহ একটি করিয়া সর্ব্বসমেত এরূপ ৫।৬ টি ইন্‌জেকশন দেওয়া চলিতে পারে।

(৫) অত্যন্ত রক্তহীনতার জন্য Haemostyl ampoules (Roussel) ইন্‌জেকশন দেওয়া বেশ উপকারী।

ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক চিকিৎসা প্রত্যহ **লিভার একষ্ট্রাক্ট** (Liver extract) ইন্‌জেক্‌শন প্রয়োগ করা। ইহার উদ্দেশ্য এই যে রোগীর লিভার যে কার্য্য করিতে অপারগ হওয়ায় ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার ঘটিয়াছে, ইহা সেই কার্য্য কতক করিবে, অর্থাৎ বিলিরুবিনকে পিত্তে পর্য্যবসিত করিয়া হিমোলাইসিস্ বন্ধ করিবে, এবং মূত্র-রোধের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

লিভার একষ্ট্রাক্ট ইন্‌জেকশন দিয়া এইরূপ অনেক রোগী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আজকাল Campolon, Hepatex, Liverex, Hepatrat, Inhepton, প্রভৃতি দেশী বিদেশী লিভার একষ্ট্রাক্ট ইন্‌জেকশনের জন্য অনেক পাওয়া যায়। ইন্‌জেকশন ব্যতীত লিভার একষ্ট্রাক্ট খাইতে দেওয়াও চলিতে পারে।

(৬) প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে ইন্‌ট্রাভেনাস অ্যাল্‌কালাইন ইন্‌জেক্‌শন ছাড়া কিড্‌নির উপর কাপিং বা শিঙ্গা বসানো (dry cupping), ও মলদ্বারে একটি মোটা রবারের নল প্রবেশ করাইয়া তন্মধ্য দিয়া ক্রমাগত গরম জল ঢালিয়া **অন্ত্রধৌতি** করিতে থাকিলে মূত্রগ্রন্থির (কিড্‌নির) উপর গরম সেক লাগিয়া প্রস্রাব হইতে দেখা গিয়াছে। মূত্রকারক (diuretic) কোনো তেজী ঔষধ এ অবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত নয়। তবে **ইন্‌ট্রাভেনাস গ্ল্‌কোজ** (grape sugar 25 % solution 20 c. c.) প্রয়োগ করা অতি উত্তম ব্যবস্থা। একটি গ্ল্‌কোজ ইন্‌জেকশন দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যদি অল্প মাত্রার একটি ইন্‌সুলিন (insulin) ইন্‌জেকশন দেওয়া যায় তবে উহাতে অনেক মূত্ররোধ নিবারিত হইতে দেখা যায়।

(৭) এই রোগে প্রথম হইতে নিয়মিতরূপে **ক্যালসিয়ম** ব্যবহার করা খুবই ভাল। ক্যালসিয়মের সহিত প্যারাথাইরয়েড (Parathyroid extract) যোগ করিয়া দিলে উহার ক্রিয়া আরো উত্তম হয়। এই রোগ দেখিবামাত্র অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত নিম্নলিখিত মত পুরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য :—

ক্যালসিয়ম ল্যাক্‌টেট—১০ গ্রেন
প্যারাথাইরয়েড একষ্ট্রাক্ট—$\frac{১}{১০}$ গ্রেন

ঠাণ্ডা জলের সহিত একটি করিয়া এই পুরিয়া প্রত্যহ তিনবার খাইতে দিলে রক্তক্ষয় নিবারিত হয়, রক্ত-তারল্য দূর হয়, হৃৎপিণ্ড সবল হয় এবং মূত্র-গ্রন্থির ক্রিয়া ভাল হয়।

(৮) অন্যান্য উপসর্গের জন্য আরো কয়েক প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন। গাত্রদাহের জন্য প্রত্যহ দুই-একবার করিয়া উষ্ণজলে উত্তম রূপে গা মুছাইয়া দিলে বিশেষ আরাম হয়, এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও সবল হয়।

বমি নিবারণের জন্য—ভগ্নাংশ মাত্রায় **ক্যালোমেল** এবং তৎসহ ১ গ্রেন **ক্লোরিটোন** ও ২ গ্রেন **সোডা বাইকার্ব**—একত্রে বরফ-চূর্ণের সহিত পুনঃ পুনঃ খাইতে দিলে যথেষ্ট উপকার হয়। বমির জন্য সাধারণতঃ এই ব্যবস্থাই উত্তম ফলপ্রদ। ১০ ফোঁটা মাত্রায় **অ্যাড্রেনেলিন** অল্প জলের সহিত ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিলেও উপকার হয়। পেটের উপর **মাষ্টার্ড প্লাষ্টারও** (mustard plaster) দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে হিক্কা নিবারিত হয়।

যদি যকৃতে অত্যন্ত ব্যথা থাকে এবং কামলাও যথেষ্ট দেখা যায়, তবে **এমিটিন** $\frac{১}{২}$ গ্রেন করিয়া কয়েকটি ইন্‌জেকশন দিলে সময় সময় বেশ উপকার হইতে দেখা যায়।

(৯) পথ্যাদি—এ অবস্থায় প্রচুর পানীয়, বালির জল (পার্ল বার্লি), দুধ, হর্‌লিক, গ্ল্‌কোজ ও ফলের রস ছাড়া অন্য কিছুই দেওয়া উচিত নয়। মদ্যপান অত্যন্ত অভ্যাস থাকিলে অল্প অল্প শ্যাম্পেন দেওয়া যাইতে পারে, নতুবা নয়।

হিমোগ্লোবিনিউরিয়ার পরবর্ত্তী অবস্থায়—

হিমোগ্লোবিনিউরিয়ার অবস্থা কাটিয়া গেলে পুনরায় যাহাতে উহা **না** হয় সে বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত। ম্যালেরিয়াই ইহার মূল কারণ, অতএব অতঃপর **ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা** করিতে হইবে। প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া যাইবার পর পাঁচ দিন হইতে চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে প্রায়ই রক্তের মধ্যে আবার ম্যালেরিয়া-জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং হিমোগ্লোবিনিউরিয়া আরোগ্য হইবার পাঁচ দিন পরেই ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইবে।

এখানে কিছু চিন্তার কথা আছে। কুইনিন খাইয়াই যাহার এ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাকে কুইনিন দিতে গেলেই পুনরায় বিপদের সম্ভাবনা। অতএব এখন কুইনিন দিতে হইলে অতি সূক্ষ্ম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া ইহা **সহ্য করাইয়া** (desensitize) লইতে হইবে। এরূপভাবে সহ্য করাইয়া লইলে পরে উহার পূর্ণ মাত্রাতেও কোনোরূপ বিঘ্ন ঘটিবে না।

এস্থলে কুইনিন দিতে হইলে প্রথমে সিন্টনের প্রণালী অনুসারে কয়েকমাত্রা অ্যাল্‌কালাইন ঔষধ ("এ"-মিকশ্চার) খাওয়াইয়া লওয়া উচিত। পরে কুইনিন $\frac{১}{২৫}$ গ্রেন মাত্রায়,—অথবা কোনো সন্দেহ থাকিলে একেবারে $\frac{১}{১০০}$ গ্রেন মাত্রা হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। প্রথমে এইরূপ ভগ্নাংশ মাত্রার অনেকগুলি পুরিয়া প্রস্তত করাইয়া লইতে হয়। সুগার-অফ-মিল্কের সহিত মিশাইয়া কুইনিন অনায়াসে এরূপ সূক্ষ্ম ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইরূপ পুরিয়া প্রথমে একটি,—২ ঘণ্টা পরে ২টি,—আবার ২ ঘণ্টা পরে ৩টি,—আবার ২ ঘণ্টা পরে ৪টি,—এইরূপে দুই ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা করিয়া উহা বাড়াইতে হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে ৫।৬ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা করিয়া অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চারও প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে দেখা যায় যে কুইনিনের মাত্রা বাড়িতে থাকিলেও কোনো মন্দ উপসর্গ আসে না। চব্বিশ ঘণ্টা এইরূপে কাটিবার পর দ্বিতীয় দিনে কুইনিন $\frac{১}{২}$ গ্রেন মাত্রা হইতে আরম্ভ করা যায় এবং দুইঘণ্টা অন্তর ঐ অনুপাতেই

মাত্রা বাড়াইয়া যাইতে হয়। তৃতীয় দিনে ২ গ্রেন মাত্রা করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর সর্ব্বসমেত ৭।৮ মাত্রা দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থ দিনে ৩ গ্রেন মাত্রা করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর সর্ব্বসমেত পাঁচবার দেওয়া যাইতে পারে। পরে ৫ গ্রেন মাত্রায় উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ তিনবার করিয়া উহা দিতে পারা যায়।

একবার এই মাত্রায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তখন নিয়মিত রূপে ইহা ব্যবহার করা উচিত, **একদিনও যেন বাদ না যায়।** একদিন বাদ পড়িয়া গেলেই বিপদ,—তাহা হইলে পুনরায় স্বল্প মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। এইরূপ ১৫ গ্রেন দৈনিক মাত্রায় এক সপ্তাহ খাইয়া প্রত্যহ ১০ গ্রেন মাত্রায় আরো তিন সপ্তাহ কুইনিন খাওয়া উচিত। তাহার পর যত দিন ঐ দেশে বাস করা হইবে ততদিন **প্রত্যহ ৬ গ্রেন করিয়া প্রতিষেধক মাত্রায়** কুইনিন ব্যবহার করিতে হইবে।

এরূপ ভাবে কুইনিনের মাত্রা বাড়াইতে বাড়াইতে অকস্মাৎ কাহারো যে রক্তবৎ প্রস্রাব দেখা দিবে না, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। কখনো কখনো এমন হইতে পারে যে একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় আসিয়া উপস্থিত হওয়া মাত্র আবার প্রস্রাবের বর্ণ লাল হইল। তখন আবার কুইনিন বন্ধ রাখিয়া পুনরায় অতি সূক্ষ্ম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে আরো একটি জ্ঞাতব্য কথা আছে। যে কুইনিন রোগীকে এরূপ ভাবে সহ্য করানো হইয়াছে, প্রত্যহ সেই একই কুইনিন ব্যবহার করিতে হইবে। ঐ কুইনিনের কখনো যেন পরিবর্ত্তন না ঘটে। যাহাকে কুইনিন সাল্‌ফেট দেওয়া হইয়াছে তাহাকে যেন প্রতিবার সাল্‌ফেটই দেওয়া হয়,—তৎপরিবর্ত্তে হাইড্রোক্লোরাইড বা অন্য যে কোনো প্রকার কুইনিনই দেওয়া হউক, ঐ সহ্যগুণ উহার পক্ষে না খাটিতে পারে।

তবে আজকাল নূতন ঔষধ আবিষ্কারের পর হইতে এরূপ স্থলে কুইনিন দিবার আর প্রয়োজন নাই এবং ঐ সকল সাবধানতা অবলম্বন করিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। **আটেব্রিন** আবিষ্কার হওয়াতে এ সকল বিপদের ক্ষেত্রে কুইনিনের পরিবর্ত্তে এখন উহাই ব্যবহার করা হয়।

ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার যে দেশে হয়, সেখানে ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া হইলেই যদি কুইনিন না দিয়া প্রথম হইতে **আটেব্রিন** দেওয়া হয় তবে

সম্ভবতঃ ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার একেবারেই হইবে না ;—এ কথা যদিও এখনও খুব জোর করিয়া বলা যায় না, তথাপি অত্যন্ত কম হইবে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব ঐ সকল দেশে আটেব্রিনের ব্যবহার প্রচলিত হইলে ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার রোগটি আপনিই বিরল হইয়া আসিবে। ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে আটেব্রিন নির্ভয়ে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে,—অল্পে অল্পে মাত্রা বাড়াইবার কোনোই প্রয়োজন হয় না। রোগের প্রথম অবস্থায় ক্ষারীয় ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া যেমনি প্রস্রাব স্বাভাবিক হইতে দেখা যায় তখনি আটেব্রিন আরম্ভ করা যাইতে পারে। এখানেও উহা ১½ গ্রেন মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া পাঁচ দিন প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট,—তাহাতেই ম্যালেরিয়া দূর হইয়া যায় এবং পুনরায় ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ম্যানসন্-বার বলিয়াছেন—"Atebrin possesses all the properties which a malaria-remedy should have in order to be safely used in black-water fever." অর্থাৎ ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারে নির্ব্বিঘ্নে দিতে হইলে ঔষধের যে সকল গুণ থাকা দরকার আটেব্রিনের তাহা সমস্তই আছে।

রোগ নিবারণ

(১) যাঁহারা ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের দেশে নিত্য বাস করেন তাঁহাদের ম্যালেরিয়ার ঋতুতে প্রত্যহ প্রতিষেধক হিসাবে কুইনিন খাওয়া উচিত,—তাহা হইলে ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ৩।৪ মাস এইরূপ কুইনিন ব্যবহার করিতে হয়,—তাহাও করা উচিত। ৬ গ্রেন মাত্রায় কুইনিন বহুদিন যাবৎ খাইলেও শরীরের কোনো অনিষ্ট হয় না এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাঁহারা কুইনিন খাইবেন না, তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার করিয়া আটেব্রিন ও একবার করিয়া প্লাজমোকুইন খাইবেন।

(২) যাঁহাদের একবার ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের এই নিয়ম বিশেষ করিয়া প্রতিপালন করিতে হইবে। কিছুতেই যেন ম্যালেরিয়া না হয় সেই বিষয়েই তাঁহাদের সাবধান হইতে হইবে। যদি

ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের দেশে বাস করা একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ইহা যদি সম্ভব না হয় তবে নিত্যই তাঁহাদিগকে কুইনিনাদি প্রতিষেধক ব্যবহার করিতে হইবে এবং সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে। এই রোগে দ্বিতীয় বারের আক্রমণ প্রথম বার অপেক্ষা ভীষণ হয় এবং তৃতীয় বারের আক্রমণ আরো ভীষণ হয়, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। অতএব সাবধান না হইলে ইঁহাদের জীবন নিরাপদ নয়।

(৩) ঠাণ্ডা লাগানো, কোনোরূপ অত্যাচার করা, বিশেষতঃ মদ্যপান করা নিষিদ্ধ। মদ্যপানে ব্ল্যাকওয়াটার ফিবারের প্রবণতা বাড়াইয়া দেয়।

কালাজ্বর

কালাজ্বর রোগটি কতক বিষয়ে ম্যালেরিয়ার অনুরূপ হইলেও ইহা ম্যালেরিয়া হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাধি। সকলেই এখন জানিয়াছে যে ইহার জীবাণুও স্বতন্ত্র, লক্ষণাদিও স্বতন্ত্র এবং চিকিৎসাও স্বতন্ত্র। ম্যালেরিয়ার সহিত ইহার কোনো মূলগত সম্পর্ক নাই।

"কালাজ্বর" আসামী কথা। আসাম প্রদেশ হইতে ইহার প্রথম পরিচয় বলিয়া তথাকার স্থানীয় নামটিই এখন প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। মূল কথাটি হয়তো "কালা-হাজার"—কালা অর্থে কৃষ্ণবর্ণ, এবং হাজার অর্থে রোগ। এই রোগে দেহের বর্ণ কালো হইয়া যায় বলিয়া সম্ভবতঃ ঐ নামের উৎপত্তি। রস্ প্রমুখ অনেকে বলিতেন, তাহা নয়, কথাটি "কাল-জ্বর" বা কাল-ব্যাধি, অর্থাৎ যে ব্যাধি হইলে মানুষের আর রক্ষা নাই। পূর্ণিয়া অঞ্চলে ইহাকে "কালা-দুখ" বলিত, তাহাতেও এই অর্থই বুঝায়। ইহার জীবাণু আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইউরোপীয়ানগণ ইহাকে স্থানীয় ব্যাধি বিবেচনা করিয়া যিনি যে অঞ্চলে ইহা লক্ষ্য করিতেন তিনি সেই অঞ্চলের নামেই ইহার বর্ণনা করিতেন,—কেহ বলিতেন Burdwan fever, কেহ বলিতেন Dum-dum fever, কেহ বলিতেন Assam fever। জীবাণু আবিষ্কারের পর জানা গেল যে সর্ব্বত্র উহা একই ব্যাধি। অতঃপর কালা-জ্বর (Kala-azar) নামটিই এখন সকলে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহার নাম লিশ্‌ম্যানিয়াসিস্ (Leishmaniasis), অর্থাৎ যাহা লিশ্‌ম্যানিয়া-জাতীয় জীবাণু কর্ত্তৃক সৃষ্ট।

এই রোগ অল্পদিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা নূতন ব্যাধি কি পুরাতন ব্যাধি তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার উপায় নাই। হয় তো পূর্ব্বকালেও ইহার অস্তিত্ব ছিল, ইদানিং কোনো কারণে হঠাৎ অধিক মাত্রায় বাড়িয়া ওঠাতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং সেইজন্যই ইহার বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়িল। নতুবা প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে Goodall-এর ভাষায় বলিতে হয় "Never does a new disease occur",— অর্থাৎ

নূতন ব্যাধি কখনও জন্মায় না। যে কোনো ব্যাধিকেই আমরা নূতন বলিয়া মনে করি, ইতিহাসে সন্ধান করিলেই দেখা যাইবে পূর্ব্বকালে তাহার অস্তিত্ব ছিল। তথাপি যখন সম্প্রতি ইহার নূতন পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তখন ইহাকে নূতন রোগ বলিয়া নূতন নামে অভিহিত করিতে হইবে। কবিরাজ মহাশয়েরা হয় তো বলিবেন ইহা এক প্রকার পুরাতন 'বিষমজ্বর'। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগ-বিশেষের কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিচয় না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যাপক নামের দ্বারা তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন রোগটি সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া যায় তখন কোনো একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে পৃথক করিয়া লওয়া উচিত।

ইতিবৃত্ত

কালাজ্বরের উত্থান-পতনের ইতিহাস বড় চমকপ্রদ। ষাট বৎসর পূর্ব্বে ইহার পরিচয় বা প্রতাপের কথা শোনা যায় নাই। কিন্তু আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ইহাতে মৃত্যুর হার শতকরা ৯৫,—এমন কি ইহা যক্ষ্মা-রোগ অপেক্ষাও মারাত্মক। এই রোগের নাম শুনিলেই লোকে কিরূপ হতাশ হইয়া পড়িত, তখনকার চিকিৎসক মাত্রেরই তাহা স্মরণ আছে। সকলেই জানিত কালাজ্বর ধরিলে আর রক্ষা নাই। আসাম অঞ্চলে যে গ্রামে কালাজ্বর দেখা দিত তথাকার গ্রামবাসীরা বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দিয়া প্রাণভয়ে অন্যত্র পলায়ন করিত। এই মড়ক নিবারণ করিতে না পারিয়া কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ইহার জীবাণু আবিষ্কৃত হইল,—উহার দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যেই এন্টিমনি-ঘটিত ইন্‌জেকশন ব্যবহৃত হইতে লাগিল,—পরে ব্রহ্মচারী ইউরিয়া-ষ্টিবামিন আবিষ্কার করিলেন, তাহার পর আরো নানারূপ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল,—কালাজ্বর তখন অতি সহজে আরোগ্য হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রকোপও একেবারে কমিয়া গেল। পঞ্চাশ ষাট বৎসরের মধ্যেই ইহার এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। যাহা এক সময় অত্যন্ত আতঙ্কের বস্তু ছিল, এখন তাহা নির্ভাবনার বিষয় হইল। মানুষের চেষ্টায় যে কখনো কখনো প্রাকৃতিক অত্যাচার দমন করা সম্ভবপর হয়, এই

কালাজ্বরের ইতিহাসই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কালাজ্বর এখন আর সে মারাত্মক "কালা-জ্বর" নাই। পূর্ব্বে ইহার মৃত্যুসংখ্যা ছিল শতকরা ৯৫, কিন্তু এখন গণিতাঙ্ক উল্টাইয়া গিয়াছে—এখন ইহার আরোগ্য-সংখ্যা শতকরা ৯৫। এখন টাইফয়েড জ্বর শুনিলে মানুষ যতটা উদ্বিগ্ন হয়, কালাজ্বর শুনিলে তাহাও হয় না। বরং ম্যালেরিয়াতেও লোকের কিছু দুর্ভাবনা আছে যে হঠাৎ তাহা বাঁকিয়া মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু কালাজ্বরে সে ভয়ও নাই। সকলেই এখন জানে যে কালাজ্বরে কোনো চিন্তা নাই, চিকিৎসা করিলে ইহা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

বাংলাদেশে পূর্ব্বে কত কালাজ্বর হইত এবং উহার মৃত্যু-সংখ্যা কিরূপ ছিল তাহার সঠিক নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না: কেবল ১৯২৫ সাল হইতে উহার কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায় যে এণ্টিমনি চিকিৎসা আবিষ্কারের পূর্ব্বে বাংলাদেশের কালাজ্বরে বাৎসরিক মৃত্যুসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক ছিল। চিকিৎসা আবিষ্কৃত হইবার পর গত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশে কালাজ্বরের মৃত্যুসংখ্যা এইরূপ :—

১৯২৫—১৬,৭৬৬	১৯২৯—১০,৮২০
১৯২৬—১৪,২৭৫	১৯৩০—১০,৯১৪
১৯২৭—১১,৮৫৫	১৯৩১—১০,১৯৯
১৯২৮—১০,৭৪৬	১৯৩২—১০,৭২০

এই তালিকা হইতেও বুঝা যায় যে কালাজ্বরের মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ আরো কমিয়া আসিতেছে।

কালাজ্বর দমনের সেই বিচিত্র ইতিহাস চিকিৎসক মাত্রেরই জানা উচিত।

অন্যূন ষাট বৎসর পূর্ব্বে আসামের গারো পর্ব্বতে কালাজ্বরের মহামারী প্রবলরূপে দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। ১৮৮২ সালে ডাক্তার ক্লার্ক (Clarke) সর্ব্বপ্রথমে ইহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে—"গারোদিগের মধ্যে এক স্বতন্ত্র প্রকারের ম্যালেরিয়া দেখা যাইতেছে, স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাকে কালাজ্বর বলে; ইহাতে গাত্রবর্ণ অত্যন্ত মলিন হইয়া যায়। গারো প্রদেশের অনেক জেলা এই রোগে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে।" অতি শীঘ্র ইহা ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী নূতন নূতন স্থানে ছড়াইয়া

পড়িতে থাকে। তাহাতে অনেকেই ইহার তথ্য নিরূপণে প্রয়াসী হন। তখন সবেমাত্র ল্যাভেরাণ কর্ত্তৃক ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে (১৮৮০), সুতরাং প্লীহা-জ্বর মাত্রই ম্যালেরিয়া এই কথাই সকলের মনে জাগিতেছে। গাইল্‌স্ (Giles) বলেন হুকওয়ার্ম জনিত রক্তশূন্যতার উপর ম্যালেরিয়া হওয়াতে এইরূপ অবস্থা হয়। রজার্স (Rogers) আসামে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া মন্তব্য করেন যে ইহা ম্যালেরিয়ারই কোনো বিচিত্র সংস্করণ। রোণাল্ড রস্ (Ross) দার্জ্জিলিঙের টেরাই অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাব্যস্ত করেন যে ম্যালেরিয়ার সহিত অপর একটি রোগ যুক্ত হইয়া ইহা ঘটিতেছে। সুতরাং তখনও পর্য্যন্ত ইহাকে স্বতন্ত্র ব্যাধি বলিয়া কেহই চিনিতে পারেন নাই। ইহার চিকিৎসায় কেবল যথেষ্ট মাত্রায় কুইনিনই প্রয়োগ করা হইতে থাকে। রজার্স বলেন যে প্রত্যহ ৬০ গ্রেন হইতে ৯০ গ্রেন পর্য্যন্ত মাত্রায় ছয়মাস যাবৎ কুইনিন খাইলে এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে, এবং কয়েকটি রোগীকে তিনি এইরূপে সুস্থ করিয়াছেন। কালনা অঞ্চলে মুইর (Muir) বলেন যে কুইনিন ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন দিলে ইহা আরোগ্য হইবে এবং শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়িবে, তিনি অনেক রোগীকে এইরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। তবে খুব সম্ভব যেগুলি এই উপায়ে আরোগ্য হইয়াছিল সেগুলি কালাজ্বর নয়, পুরাতন ম্যালেরিয়া। যেগুলি আসল কালাজ্বর সেগুলিতে ইহার দ্বারা কোনোই ফল হইল না। ১৯০৩ সালে ম্যানসন্‌ই (Manson) প্রথমে বলিলেন যে ইহা ম্যালেরিয়া হইতে পারে না, কারণ ম্যালেরিয়ার মত নিয়মে এ জ্বর হয় না এবং কুইনিনের দ্বারা ইহাতে কোনো উপকার হয় না, এবং তিনিই প্রথমে সন্দেহ করিলেন যে ইহা সম্ভবতঃ ট্রিপানোসোম (Trypanosome) নামক জীবাণুর সম্পর্কিত ব্যাধি।

জীবাণু আবিষ্কার—ট্রিপানোসোম সম্বন্ধে সাধারণ পরিচয় এই যে, আফ্রিকাতে যে নিদ্রারোগ বা স্লীপিং-সিক্‌নেসের (sleeping sickness) কথা শুনা যায় তাহা এই জীবাণু কর্ত্তৃক উৎপাদিত হয়। সেই রোগ অতি মারাত্মক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী,—তাহাতে জ্বর হয়, প্লীহা বাড়ে, গ্রন্থিসকল স্ফীত হয় এবং রোগী ভুগিয়া ভুগিয়া অবশেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে। উহা সংক্রামক রোগ, এবং

এক স্থানে আরম্ভ হইলে ধীরে ধীরে উহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ রোগের সহিত কতক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই ম্যান্‌সন এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তখন লিশ্‌ম্যান্ (Lieshman) বলিলেন কালাজ্বরের এই ট্রিপানোসোম তিনি পাইয়াছেন। ১৯০০ সালে জনৈক সৈনিক দম্‌দমের জ্বরে ভুগিয়া বিলাতে গিয়া মারা যায়, তাহার প্লীহারস লইয়া পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যে উহাতে অসংখ্য পরিমাণে ছোট ছোট চক্রাকার দুই-অঙ্কুরবিশিষ্ট একরূপ অদ্ভুত পদার্থ রহিয়াছে; উহা নিশ্চয়ই ট্রিপানোসোম, তবে উহার লেজ নাই, সম্ভবতঃ মৃত্যুর পর লেজ খসিয়া গিয়াছে। তিনি তখন ইহার বিশদ বর্ণনা প্রকাশ করেন। মাদ্রাজে ডনোভান্-ও (Donovan) প্রায় একই সময়ে জনৈক রোগীর প্লীহা হইতে রস লইয়া পরীক্ষার দ্বারা অনুরূপ জীবাণু দেখিতে পান ও তাহার বর্ণনা প্রকাশ করেন। তবে তিনি বলেন ইহা ট্রিপানোসোম নহে, অন্য কোনোরূপ জীবাণু। আবার ঐ বৎসরেই একটি চীনা সৈনিক জার্ম্মানিতে গিয়া প্লীহাজ্বরে ভুগিয়া মারা যায়, তথায় মার্শাণ্ড (Marchand) তাহার প্লীহারস পরীক্ষা করিয়া এই জীবাণু দেখিতে পান এবং সকলকে উহা দেখান। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে একটি রোগী দার্জ্জিলিঙ হইতে বিলাতে যায় এবং তাহার প্লীহারস লইয়া পরীক্ষার দ্বারা ম্যান্‌সন্‌ও (Manson) এই জীবাণু দেখিতে পান! অতঃপর অনেকেই কালাজ্বর রোগীর প্লীহারস লইয়া পরীক্ষা করিয়া এই জীবাণু চক্ষুগোচর করেন, এবং প্রথম আবিষ্কারক দুইজনের নাম অনুসারে উহার নাম দেওয়া হয় **লিশম্যান্-ডনোভান্ বডি,** বা সংক্ষিপ্ত কথায় এল্. ডি. বডি (L. D. Bodies)।

এইরূপ নাম দিবার কারণ এই যে তখনও পর্য্যন্ত ইহাদের জাতিনিরূপণ করিতে পারা যায় নাই। নানা জনে নানারূপ সন্দেহ করিতে থাকেন এবং অনেকে এমন কথাও বলেন যে এগুলি ম্যালেরিয়া-জীবাণু ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, কোনোরূপে বিকৃত আকার পাইয়া ঐরূপ দেখাইতেছে।

অতঃপর ১৯০৪ সালে রজার্স (Rogers) কালাজ্বরের রক্ত লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিতে করিতে আবিষ্কার করেন যে সাইট্রেটযুক্ত লবণজলে (1·5% Sodium Citrate in normal saline) মিশাইয়া অপেক্ষাকৃত শীতল আবেষ্টনের মধ্যে (22°C) উহা রাখিলে কিছুকাল পরে তন্মধ্যস্থ কালাজ্বর-জীবাণুর বংশবৃদ্ধি বা কাল্‌চার

হয়, এবং তখন ইহারা আকার পরিবর্ত্তন করিয়া মাছের মত লম্বাকৃতি হয় ও প্রত্যেকের একটি করিয়া লেজ (flagellum) বাহির হয়। তখন ইহাদের আকৃতি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে কতকটা ট্রিপানোসোমের মত হইলেও ইহারা আসল ট্রিপানোসোম নহে। ট্রিপানোসোমের যে লেজ আছে তাহা তরঙ্গায়িত হইয়া (undulating membrane) গায়ের উপর লাগিয়া থাকে, ইহাদের তাহা থাকে না। ইহাদের আকৃতি অবিকল হার্পিটোমোনার (Herpetomona) মত, অতএব রজার্স বলিলেন এগুলি হার্পিটোমোনা। কিন্তু আসল হার্পিটোমোনা-নামক জীবাণু সাধারণ মশা ও মাছির পেটের মধ্যে সর্ব্বদাই বহুল পরিমাণে থাকিতে দেখা যায়, অথচ তাহারা কোনো জীবের অনিষ্ট করে না বা কোনোরূপ রোগের সৃষ্টি করে না। তদ্ভিন্ন কালাজ্বর-জীবাণুর কাল্‌চারে ও আসল হার্পিটোমোনার কাল্‌চারে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়, এবং হার্পিটোমোনা কখনও কালাজ্বর-জীবাণুর মত দুই অবস্থায় দুইরূপ আকার ধারণ করে না। সেইজন্য অবশেষে ইহাদের স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় এবং এই পর্য্যায়ের নাম দেওয়া হয় লিশ্‌ম্যানিয়া (Leishmania)। এই সকল লিশ্‌ম্যানিয়া দুইরূপ অবস্থায় দুই প্রকার মূর্ত্তি ধরে। মানুষের শরীরে ইহারা লেজবিহীন গোলাকার লিশ্‌ম্যানিয়ার আকারে (Leishmania form) থাকে, এবং কাল্‌চার করিলেই ইহারা লম্বমান লেজবিশিষ্ট হার্পিটোমোনার আকার (Herpetomonad form) গ্রহণ করে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে স্যাণ্ডফ্লাই (sandfly) নামক ক্ষুদ্র মক্ষীর পেটে প্রবেশ করিতে পারিলেও তথায় উহারা হার্পিটোমোনার অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জীবাণু পরিচয়

প্রাণী-জগতের প্রাথমিক স্তরে অবস্থিত এক-কোষ বিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র জীব প্রোটোজোয়াদিগের রাজ্যে কালাজ্বর-জীবাণুর স্থান। সমগ্র প্রোটো-জোয়ার চারিটি প্রধান বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেক বিভাগের নানারূপ পুনর্বিভাগ আছে। ম্যালেরিয়া-জীবাণু উহার যে বিভাগের অন্তর্গত, কালাজ্বর-জীবাণুর সে বিভাগের সহিত কোনোই সংশ্রব নাই। প্রোটোজোয়ার

বংশাবলীর মধ্যে কালাজর-জীবাণুর স্থান কোথায় তাহা দেখাইবার জন্য একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া গেল।

প্রোটোজোয়া (Protozoa)

- Sarcodina
  সার্কোডিনা =
  আমাশা রোগের এমিবা ইহার অন্তর্গত
- Mastigophora
  ম্যাষ্টিগোফোরা =
  লেজবিশিষ্ট প্রোটোজোয়া
  - Hæmoflagellata
    হিমোফ্ল্যাজেলেটা =
    রক্তজীবী এবং লেজবিশিষ্ট
    - Binucleata
      বাইনিউক্লিয়েটা = ঐ দুই অঙ্কুরবিশিষ্ট
      - ট্রিপানোসোম
        = আফ্রিকার নিদ্রারোগের জীবাণু
      - লিশ্‌ম্যানিয়া
        = কালাজ্বর ইত্যাদির জীবাণু
        - লিঃ ডনোভ্যানাই
          = নদীমাতৃক দেশের কালাজ্বর প্রসবকারী (Kala-azar)
        - লিঃ ইন্‌ফ্যাণ্টাম্
          = ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্ত্তী শিশুদিগের কালাজ্বর প্রসবকারী (Infantile Leishmaniasis)
        - লিঃ ট্রপিকা
          = মরুপ্রদেশের ওরিয়েণ্টাল সোর প্রসবকারী (Oriental sore)
        - লিঃ ব্রেজিলিয়েন্‌সিস্
          = দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যপ্রদেশের এস্‌পাণ্ডিয়া নামক রোগ প্রসবকারী (Espundia.)
      - হার্পিটোমোনা
        = নিরীহ জীবাণু
- Sporozoa
  স্পোরোজোয়া =
  লেজ নাই ও ডিম্ব প্রসবকারী
  (ম্যালেরিয়া-জীবাণু ইহারই অন্তর্গত)
- Ciliophora
  সিলিওফোরা =
  রোমবিশিষ্ট প্রোটোজোয়া

এই নির্ঘণ্ট হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে দুই-অঙ্কুর বিশিষ্ট কালাজ্বর-জীবাণুর সহিত ম্যালেরিয়া-জীবাণুর দূর জ্ঞাতি-সম্পর্ক আছে মাত্র। আর ইহাও বুঝা যাইবে যে লিশম্যানিয়া কেবল এক প্রকারের নাই এবং কেবল কালাজ্বর রোগেই ইহারা সীমাবদ্ধ নয়; ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহারা চারিপ্রকার বিভিন্নরূপ রোগের সৃষ্টি করে, এবং সেইজন্য আকৃতি ও প্রকৃতিতে একরূপ হইলেও রোগ অনুসারে ইহাদের চারিপ্রকার নাম দেওয়া হয়।

কালাজ্বর-জীবাণুর আবিষ্কারের পর বোষ্টন সহরে রাইট (Wright) ওরিয়েণ্টাল সোর্ (Oriental sore) নামক এক প্রকার ক্ষত হইতে ১৯০৪ সালে কালাজ্বরের জীবাণুর অনুরূপ লিশ্‌ম্যানিয়ার আবিষ্কার করেন। কিন্তু বলিতে গেলে ভারতবর্ষের এক প্রকার ক্ষতের মধ্যেই (Delhi boil) কানিংহাম বহু পূর্ব্বে (১৮৫৩ সালে) এ জীবাণু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন ইহাকে চিনিতে পারা সম্ভব ছিল না। কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলে অদ্যাপি তাঁহার আবিষ্কৃত জীবাণুর ছবি টাঙানো আছে। এই ঘা যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে শরীরের অনাচ্ছাদিত অংশে হইতে দেখা যায়। এই ঘা হওয়া ছাড়া এ রোগে শরীরের অন্য কোনো ক্ষতি হয় না। ঈজিপ্ট, দক্ষিণ আমেরিকা ও কয়েকটি মরুপ্রধান দেশেও এই প্রকার ঘা হইতে দেখা যায়।

ইটালি, উত্তর-আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে কেবল শিশুদের মধ্যে এক প্রকার জ্বর অনেক কাল হইতেই দেখা যাইত। এই জ্বর বহুদিন যাবৎ ভোগ হইত এবং ইহাতে প্লীহাও যথেষ্ট বাড়িত। ১৯০৫ সালে পিয়ানিজ্ (Pianese) ঐ সকল শিশুর প্লীহারস পরীক্ষা করিয়া লিশ্‌ম্যানিয়া দেখিতে পান। সেইজন্য এই রোগের নাম দেওয়া হইল শিশুদের কালাজ্বর (Infantile Kala-azar of the Mediterranean basin), এবং উহার জীবাণুর নাম হইল লিশ্‌ম্যানিয়া ইন্‌ফ্যাণ্টাম্ (L. infantum)। আশ্চর্য্য এই যে ভারতবর্ষে যে জীবাণু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই আক্রমণ করে, (বরং শিশুদের কালাজ্বর কমই হয়), ইটালি প্রভৃতি দেশে তাহাই কেবল দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ছাড়া অন্য কাহাকেও আক্রমণ করে না। একই জাতীয় জীবাণুর এই দুইপ্রকার পক্ষপাতিত্বের কারণ এখনও পর্য্যন্ত অজ্ঞাত।

দক্ষিণ-আমেরিকাতে ব্রেজিল, পেরু প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ কাঠুরিয়াদের মধ্যে একরূপ বিচিত্র ঘা হইতে দেখা যায়। ইহা বাহিরের চামড়া ও শরীর-বিবরের ঝিল্লীগাত্রের সংযোগস্থলে (muco-cutaneous junction) হইয়া থাকে। প্রায়ই ঠোঁটের কোণে ও চোখের কোলে এই ঘা হয়। এই রোগের নাম এস্‌পাণ্ডিয়া (Espundia)। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ইহাও একপ্রকার লিশ্‌ম্যানিয়া কর্ত্তৃক সৃষ্ট।

ফলে দেখা যাইতেছে যে চারিপ্রকার দেশে লিশ্‌ম্যানিয়া নামক জীবাণু চারিপ্রকার রোগ জন্মায়, যথা :—

(১) **লিশ্ম্যানিয়া ডনোভানাই**—নদীমাতৃক দেশে আধিপত্য। বাস—মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে। রোগ—কালাজ্বর।

(২) **লিশ্ম্যানিয়া ইন্ফ্যান্টাম্**—ভূমধ্যসাগরের উপকূলে আধিপত্য। বাস—শিশুর শরীরে। রোগ—শিশুদিগের কালাজ্বর।

(৩) **লিশ্ম্যানিয়া ট্রপিকা**—মরুপ্রধান দেশে আধিপত্য। বাস—চর্ম্মের উপর। রোগ—ওরিয়েণ্ট্যাল সোর।

(৪) **লিশ্ম্যানিয়া ব্রেজিলিয়েন্সিস্**—অরণ্যবহুল স্থানে আধিপত্য। বাস—চর্ম্মের সন্ধিস্থলে। রোগ—এস্পাণ্ডিয়া।

লিশ্ম্যানিয়া দেখিতে অতি ক্ষুদ্র, নাতিবিস্তর গোলাকৃতি, এবং আয়তনে প্রায় ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার রিং-এর মত। একটি পাৎলা আবরণের মধ্যে কতকটা নরম জৈব-বস্তু (cytoplasm) লইয়া ইহার দেহ গঠিত। তাহার মধ্যে দুইটি করিয়া অঙ্কুর থাকে। একটি অঙ্কুর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও গোলাকার, সেইটিই আসল নিউক্লিয়াস্ (nucleus) বা কেন্দ্রবিন্দু।
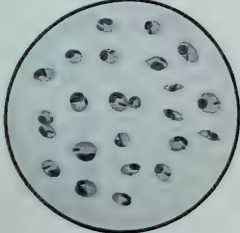
কালাজ্বর-জীবাণুর লিশ্ম্যানিয়া স্বরূপ। মনুষ্যদেহে ইহাদের এইপ্রকার এল্. ডি.বডি-রূপেই দেখা যায়।

কালাজ্বর-জীবাণুর হার্পিটোনা স্বরূপ। কাল্চার করিলেই ইহাদের এইরূপ লেজবিশিষ্ট মূর্ত্তি হয়।

অপরটি ক্ষুদ্র এবং লম্বাকৃতি, ইহা প্রায়ই এক পাশে আড়-ভাবে পড়িয়া থাকে; ইহাকে মাইক্রো-নিউক্লিয়াস্ (micro-nucleus) বলা যাইতে পারে। উহার দুইটি অংশ,—গোল অংশটির নাম parabasal, এবং তাহা হইতে লম্বমান রেখাটির নাম rhizoplast। কাল্চার করিলে এই রেখাটি হইতেই

লেজ বাহির হয়। ইহা ব্যতীত শরীরের মধ্যে দুই একটি ভ্যাকুয়োল্ (vacuole) বা শূন্য-বায়ুস্থানও দেখা যায়, উহা খাদ্যসঞ্চয়ের ভাণ্ডার। যখন ইহারা পুষ্ট হইয়া উঠে তখন ভ্যাকুয়োলের সংখ্যা বাড়ে এবং তখন নিউক্লিয়াসকে প্রথমে ভাগ করিয়া ক্রমে এক ভাগ হইতে দুই ভাগ, দুই ভাগ হইতে চার ভাগ, এইরূপে আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইহারা সর্ব্বদাই প্রায় কোনো জীব-কোষের মধ্যে অবস্থান করে, মুক্ত অবস্থায় বাহিরে পড়িয়া থাকিতে কদাচ দেখা যায়। ম্যালেরিয়া-জীবাণুর মত কালাজ্বর-জীবাণু কখনও রক্তের লালকণিকার মধ্যে প্রবেশ করে না; ইহারা কেবল দুই প্রকার শ্বেতকণিকার মধ্যে (পলিনিউক্লিয়ার ও লার্জ-মনোনিউক্লিয়ার) এবং রক্তশিরাগাত্রস্থ বৃহৎ এণ্ডোথিলিয়াল্ কোষের (endothelial cells) মধ্যে অবস্থান করে। লিশম্যানিয়া রূপে ইহাদের পরিচয় এই প্রকার।

কিন্তু কাল্চারে ইহাদের স্বতন্ত্র পরিচয়। তখন লেজবিশিষ্ট হইয়া ইহারা হার্পিটোমোনার রূপ গ্রহণ করে। কেবল কাল্চারে নয়, স্যাণ্ডফ্লাইয়ের পেটে গেলেও ইহাদের এই অবস্থা হয়। কালাজ্বর রোগীকে স্যাণ্ডফ্লাই দংশন করিলে রক্তের সহিত ইহারা তাহার পেটে গিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন হইতে ইহাদের কাল্চারের মতন অবস্থা ঘটিতে থাকে। অতএব দুইরূপ আশ্রয়ে ইহাদের দুইরূপ জীবনচরিত্র বর্ণনা করা আবশ্যক।

জীবন চক্র—

মানুষের শরীর হইতে স্যাণ্ডফ্লাইয়ের পেটে, এবং স্যাণ্ডফ্লাই হইতে মানুষের শরীরে,—কালাজ্বর-জীবাণুর আদান-প্রদানের দ্বারা উহাদের জীবন-চক্র কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা অনুসরণ করিয়া দেখা যাক।

স্যাণ্ডফ্লাইয়ের আশ্রয়ে—কালাজ্বর রোগীর দেহে কতকগুলি স্যাণ্ডফ্লাইকে দংশন করাইয়া তৎপরে প্রত্যহ উহার কয়েকটি করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলেই জীবাণুদের তথাকার জীবন-ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়। এইরূপে দংশনের একদিন পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে স্যাণ্ডফ্লাইয়ের পেটের ভিতর গিয়াই উহাদের আকার কিছু বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় দিনে দেখা যায় প্রত্যেকটির একটি করিয়া লেজ বাহির হইয়াছে, এবং উহারা দ্রুত সঞ্চরণশীল

হইয়াছে। তৃতীয় দিনে দেখা যায় উহারা লম্বাকৃতি হইয়াছে এবং লেজের তাড়নায় অন্ত্রের অগ্রভাগে আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছে। চতুর্থ দিনে দেখা যায় প্রত্যেকটি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় সংখ্যায় উহারা বহুগুণে বাড়িয়াছে
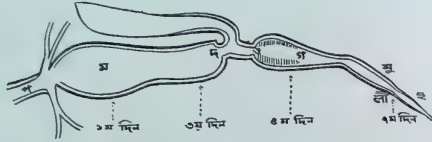
স্যাণ্ডফ্লাইয়ের আভ্যন্তরিক নক্সা। কালাজ্বর রোগীকে দংশন করিবার পর কালাজ্বর-জীবাণু উহার শরীরের মধ্যে কোথায় কোনদিন অবস্থান করে, তাহা তীরচিহ্নের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

প = পশ্চাৎ অন্ত্র	গ = গলদেশ
ম = মধ্য অন্ত্র	মু = মুখগহ্বর
দ = পাকাশয় দ্বার	লা = লালাপথ
ও = খাদ্যনালী (Œsophagus)	হু = হুল

(নেপিয়ারের পুস্তক হইতে সংগৃহীত)

এবং একত্রিত হইয়া পাকাশয়ের দ্বারে (pro-ventricular region) আসিয়া পৌছিয়াছে। এই অবস্থায় ইহারা পরস্পর গায়ে-গায়ে লাগিয়া

যেভাবে একটি সুন্দর বৃত্তাকার বাহিনী রচনা করে তাহা দেখিতে অতি মনোহর। উহারা লেজগুলিকে একস্থানে কেন্দ্রস্থ করে এবং শরীরাংশকে বহির্মুখী করিয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বৃত্তাকারে অবস্থান করে। কাল্চারেও ইহারা এই ভাবেই নিজেদের সাজাইয়া রাখে। এই জীবাণু-বাহিনী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে এবং পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে উহা স্যাণ্ডফ্লাইয়ের গলার মধ্যে উপস্থিত হয়। সপ্তম দিনে উহা মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নবম বা দশম দিনে বহুসংখ্যক জীবাণু হুলের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে হুলের ভিতরকার

সূক্ষ্মপথটি উহার দ্বারা সম্পূর্ণ বুজিয়া যায়। এখন যদি স্যাণ্ডফ্লাইটি হুল ফুটাইয়া রক্তপান করিতে চায়, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে উহা পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। এইজন্য জীবদেহে হুল ফুটাইয়া প্রথমেই সে ফুৎকার দিয়া জীবাণুগুলিকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করে, ও পরে রক্ত টানিয়া লয়।

জীবের আশ্রয়ে—জীবদেহে প্রবেশ করিয়া জীবাণু অধিকক্ষণ মুক্ত অবস্থায় থাকে না, রক্তশিরা ও লিম্ফশিরার কোষগুলি (endothelial cells) উহাদের আত্মস্থ করিয়া ফেলে (বা উহারাই স্বয়ং তাহার ভিতর প্রবেশ করে), এবং তখন হইতে সর্ব্বদা কোষের মধ্যেই ইহারা অবস্থান করে। কোষের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় প্রথমেই ইহাদের লেজ খসিয়া যায় এবং আকার গোলাকৃতি হইয়া লিশম্যানিয়াতে পরিণত হয়। এই সকল জীবাণুবাহী কোষ রক্তস্রোতে নীত হইয়া প্লীহাতে, যকৃতে ও অস্থি-মজ্জার মধ্যে গিয়া সমবেত হয়। অতঃপর কোষের মধ্যেই উহারা বিভক্ত হইয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কোষের মধ্যে স্থান সঙ্কুলান হয় ততক্ষণ ইহারা তাহার মধ্যেই থাকে, সংখ্যায় অধিক হইলে কোষটি ফুলিয়া এক সময় ফাটিয়া যায় এবং জীবাণুগুলি মুক্ত হয়। পুনরায় স্থানীয় নূতন নূতন কোষে ইহারা প্রবেশ করিতে থাকে এবং যথাকালে সেগুলিও ফাটিতে থাকে। কোষের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়িতে থাকে, এবং সেই জন্যই ক্রমশঃ প্লীহা ও যকৃতের আয়তন বাড়িয়া উঠে। ইহার মধ্য হইতে কতকগুলি জীবাণু বাহির হইয়া রক্তস্রোতে চলিয়া যায় এবং তথায় কেবল শ্বেতকণিকার মধ্যেই প্রবেশ করে। স্যাণ্ডফ্লাই যখন সেই রক্ত পান করে তখন সেই শ্বেত কণিকার মধ্যস্থ জীবাণুগুলি উহার পেটে গিয়া পুনরায় নবজীবন পরিগ্রহণ করে।

কালাজ্বরের বাহন

কালাজ্বরের বাহন কে, অর্থাৎ কাহার দ্বারা কালাজ্বরের জীবাণু মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়, অনেক কাল পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। প্রথমে মাছির উপর, মশার উপর, ছারপোকার উপর এবং আরো নানারূপ

কীটপতঙ্গের উপর সকলের সন্দেহ পড়িয়াছিল। এ সন্দেহের কারণও ছিল, এই যে মাছি মশা প্রভৃতির পেটের ভিতর কালাজ্বরের জীবাণুর মত একপ্রকার হার্পিটোমোনাড্ জীবাণু মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত, কিন্তু পরে বুঝিতে পারা গেল সেগুলি একেবারে নিরীহ। অবশেষে স্যাণ্ডফ্লাই নামক ক্ষুদ্র মক্ষীর উপর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা জানা যায় যে আসল কালাজ্বর-জীবাণু কেবল ইহাদের পেটেই স্ফূর্ত্তি পায়। এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এই স্যাণ্ডফ্লাইই কালাজ্বরের বাহন। চলিত কথায়

সাদা স্যাণ্ডফ্লাই (P. argentipes)

ইহাদের 'উন্‌কি-পোকা' বলা হয়। কিন্তু উন্‌কি-পোকা আমরা অনেক প্রকার পোকাকেই বলি। এদেশে সন্ধ্যার সময় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক্ষী আসিয়া মুখের চারিধারে উড়িয়া বেড়ায় এবং না তাড়াইলে দংশন করে, বিশেষতঃ গোহাল ঘরে যে সকল পোকা গরুর পিঠের উপর আসিয়া বসে এবং গরু লেজ দিয়া তাড়াইতে থাকে,—এইরূপ পোকাকেই আমরা সচারাচর উন্‌কি পোকা বলিয়া থাকি; কিন্তু উহার মধ্যে সাদা ও কালো দুই প্রকারের পোকা আছে। যে গুলি কালো সেগুলি স্যাণ্ডফ্লাই নয়, যে গুলি সাদা সেইগুলিই প্রকৃত স্যাণ্ডফ্লাই। স্যাণ্ডফ্লাইয়ের মধ্যেও আবার নানারকমের প্রভেদ

আছে,—যেমন Phlebotomus argentipes (silver-footed sandfly), P. minutus, P. papatasii,—প্রভৃতি। তন্মধ্যে কেবল **ফ্লেবোটোমাস্ আর্জেণ্টিপিস্** (P. argentipes) নামক বিশিষ্ট প্রকার স্যাণ্ডফ্লাই কালাজ্বরের বাহন, অন্যগুলি নয়।

কলিকাতার স্কুল-অফ-ট্রাপিক্যাল-মেডিসিনের নেপিয়ার, নোল্‌স্ ও স্মিথের দ্বারা (Napier, Knowles and Smith) ১৯২৪ সালে এই সত্য আবিষ্কৃত হয়। পূর্ব্ব হইতেই স্যাণ্ডফ্লাইয়ের উপর অনেকের সন্দেহ ছিল। ১৯১১ সালে ওয়েনিয়ন (Wenyon) দেখিয়াছিলেন যে স্যাণ্ডফ্লাইয়ের পেটে এক জাতীয় হার্পিটোমোনাড জীবাণু বাস করে। ১৯১৯ সালে অ্যাক্টন (Acton) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে স্যাণ্ডফ্লাইয়ের কামড়ে ওরিয়েণ্টাল সোর (Oriental Sore) নামক ক্ষত জন্মিতে পারে। ১৯২১ সালে সার্জেণ্ট ভ্রাতারা (Sergent brothers) ওরিয়েণ্টাল সোরের দেশ হইতে স্যাণ্ডফ্লাই ধরিয়া আনিয়া সেগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে উহার ইন্‌জেকশন প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহাতেও ঐরূপ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অতঃপর কালাজ্বর রোগীর গৃহেও এই স্যাণ্ডফ্লাইয়ের প্রাচুর্য্য দেখিয়া উহার উপর অধিক সন্দেহ জন্মে, এবং ঐ সকল স্যাণ্ডফ্লাই ধরিয়া পরীক্ষা-স্বরূপ উহাদিগকে কতকগুলি কালাজ্বর রোগীর শরীরে দংশন করানো হয়; কিছুকাল পরে উহাদের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া পেটের ভিতর কালাজ্বর-জীবাণু বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আসামের কালাজ্বর-কমিশনের তরফ হইতেও পুনঃ পুনঃ ইহা এক্সপেরিমেণ্ট করিয়া দেখা হয়। স্যাণ্ডফ্লাইয়ের পেটে গিয়া জীবাণুর জীবন-চক্র (life cycle) কি ভাবে চলে, শর্ট (Shortt) তাহা পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ইহার পর চীন, প্যালেষ্টাইন্ প্রভৃতি দেশেও স্যাণ্ডফ্লাই লইয়া নানারূপ এক্সপেরিমেণ্ট চলিতে থাকে, এবং সকলেই মানিয়া লন যে কালাজ্বরের বাহন স্যাণ্ডফ্লাই।

স্যাণ্ডফ্লাই অতি ক্ষুদ্র কীট, আয়তনে একটি মশার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। সেই জন্য যাঁহারা চেনেন না, তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিলেও ইহাদের দেখিতে পান না। একে তো ক্ষুদ্র, তাহাতে বর্ণও সাদা, সুতরাং ইহারা

প্রায় হাওয়ার সহিত মিলাইয়া থাকে। তবে ইহাদের পরিচয় জানা থাকিলে এবং কিরূপ স্থানে ইহাদের দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনা তাহা জানা থাকিলে খুঁজিবামাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বহু প্রকার পরীক্ষার দ্বারা এ-কথা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে যেখানে কালাজ্বর আছে (endemic area) সেখানে স্যাণ্ডফ্লাই নিশ্চয়ই আছে। এমন কোনো দেশ নাই যেখানে কালাজ্বর আছে অথচ স্যাণ্ডফ্লাই নাই। ইহারা নিম্নভূমিতে স্যাঁৎসেতে আবর্জ্জনার মধ্যে বাস করে। ডোবা-পুকুরের আশে পাশে, গোহাল ঘরের মধ্যে, ও মুর্গীর খোঁয়াড়ে খুঁজিলেই ইহাদের দেখা যাইবে। ভিজা মাটিতে যেখানে শেহালা জন্মিয়াছে, গোবরপচা জমা হইয়া আছে, গৃহপালিত পক্ষীরা যেখানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া অপরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে,—এই সকল স্থানেই ইহারা বাস করে। ইহারা ঐ সকল স্থানে ডিম পাড়ে এবং বর্ষা পাইলে ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। দুটি মাত্র ডানাতে ভর করিয়া ইহারা উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু উড়িয়া বেশী উপরে উঠিতে পারে না। শ্রাবণ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহাদের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইহারা রক্তপায়ী জীব, কিন্তু মানুষের রক্তেই যে ইহাদের বেশী লোভ তাহা নয়। বরং গরু ছাগল প্রভৃতি জন্তুর রক্তই ইহাদের অধিক প্রিয় এবং সেইজন্য উহাদের কাছেই সর্ব্বদা ঘোরে। ঐ সকল জন্তু পাইলে ইহারা যে মানুষকে দংশন করে না, এ-কথা পরীক্ষা করিয়া (by serological tests) দেখা হইয়াছে। সুতরাং যেখানে গরু ছাগল প্রভৃতি থাকে সেখানে কালাজ্বর হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইহাদের দংশন নিবারণ করিবার কোনো উপায় নাই। তবে দ্বিতল গৃহে বাস করিলে ইহারা তথায় উঠিতে পারে না, এবং ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার নীচেও ইহারা বায়ুর তাড়না সহ্য করিতে পারে না। কোনোরূপ ধোঁয়াও ইহারা সহ্য করিতে পারে না, সেই জন্য পল্লীগ্রামে গোহাল ঘরে খড়ের পালুই জ্বালাইয়া ধোঁয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ধুনার ধোঁয়া, গন্ধকের ধোঁয়া এবং কার্ব্বলিকের ধোঁয়া (vaporised cresol) দিলেও ইহারা দূর হইয়া যায়।

কালাজ্বর সংক্রমণের জন্য যে স্যাণ্ডফ্লাই দায়ী এ কথা নানারূপে প্রমাণিত। রোগীকে দংশন করাইলে ইহাদের পেটে জীবাণু মেলে। লিশ্‌ম্যানিয়া-ঘটিত

চর্ম্মরোগে দংশন করিলেও ইহারা তথা হইতে সংক্রমণ গ্রহণ করে। এই সংক্রামিত স্যাণ্ডফ্লাইয়ের দ্বারা পরে অন্য জীবকেও সংক্রামিত করা সম্ভবপর হইয়াছে। এমন কি আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীকেও দংশন করাইয়া কয়েকদিন পরে ইহাদের পেটে জীবাণু দেখা গিয়াছে (Smith)। কিন্তু তথাপি সংক্রামিত স্যাণ্ডফ্লাইয়ের দ্বারা সুস্থ মানুষকে দংশন করাইয়া পরীক্ষা-স্বরূপ এতাবৎ কালাজ্বর জন্মাইতে পারা যায় নাই। এরূপ এক্সপেরিমেণ্ট্ কখনও সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ মানুষ মাত্রেরই শরীরে যে প্রতিরোধ-শক্তি আছে তাহা স্বভাবতঃই কালাজ্বরের সংক্রমণ নিবারণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট, সেইজন্য জীবাণু প্রবেশ করিলেও সহজে তাহা রোগ জন্মাইতে পারে না। যেখানে কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব আছে, সেখানে সকলকেই স্যাণ্ডফ্লাই কখনও না কখনও দংশন করিতেছে এবং অনেকেরই শরীরে জীবাণু প্রবিষ্ট হইতেছে, তথাপি কালাজ্বর হয় মাত্র কয়েকজনের, অবশিষ্ট সকলেই সুস্থ থাকে। ম্যালেরিয়াতে কিন্তু এরূপ হয় না, মশা যাহাদের দংশন করে তাহাদের অধিকাংশেরই ম্যালেরিয়া হয়। ইহার কারণ, মানুষের শরীর ম্যালেরিয়া-জীবাণুর পক্ষে যেরূপ উর্ব্বর, কালাজ্বর-জীবাণুর পক্ষে সেরূপ নয়।

সাধারণতঃ স্যাণ্ডফ্লাইয়ের দ্বারাই কালাজ্বরের সংক্রমণ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যে এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে না সে-কথা জোর করিয়া বলা যায় না। একটি উদাহরণ এই যে, যেখানে স্যাণ্ডফ্লাই-দংশনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না, সেখানেও ভ্রূণ অবস্থায় শিশু জরায়ুর মধ্যে মাতৃরক্তের দ্বারা সংক্রামিত হইয়াছে। এই ঘটনার কথা নেপিয়ার তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে একজন গর্ভবতী ইংরেজ মহিলা কলিকাতায় অবস্থান কালে কালাজ্বরে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়া বিলাতে যান। সেখানে গিয়া তাঁহার একটি সন্তান হয় এবং আবার তিনি কিছুদিন তথায় এই রোগে ভুগিয়া আরোগ্য লাভ করেন। শিশুটির এক বৎসর বয়স হইলে দেখা যায় যে তাহারও কালাজ্বর হইয়াছে, এবং তাহার প্লীহারস লইয়া পরীক্ষা করিয়া কালাজ্বরের জীবাণু পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে অন্যরূপ উপায়ে রক্তসংস্পর্শের দ্বারাও কালাজ্বর সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নয়।

কালাজ্বরের সংঘটন

কৃত্রিম উপায়ে সংক্রমণ প্রচেষ্টা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কৃত্রিম উপায়ে একজীবের দেহ হইতে অন্য জীবের দেহে কালাজ্বর সংক্রামিত করা

অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহা বহু আয়াসসাধ্য। কালাজ্বরে মৃত ব্যক্তির এক টুকরা প্লীহা বা যকৃৎ লইয়া সেলাইনের সহিত নিষ্পেষিত করিয়া উহা সংক্রমণযোগ্য (susceptible) কোনো জীবের পেরিটোনিয়মের মধ্যে অথবা রক্তশিরার মধ্যে ইন্‌জেক্‌শন করিয়া দিলে তাহার কালাজ্বর জন্মিতে পারে। কালাজ্বর-জীবাণুর কাল্‌চার করিয়া কয়েকদিন যাবৎ উপযুক্ত জীবকে উহা খাওয়াইতে থাকিলেও এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। নোল্‌স্ (Knowles) এই উপায়ে জীবাণুর কাল্‌চার খাওয়াইয়া একটি বাঁদরকে সংক্রামিত করিয়াছিলেন। দেখা গিয়াছে ইঁদুরকে ঐরূপ কাল্‌চার খাওয়াইয়াও সংক্রামিত করা যায়। আবার জনৈক বৈজ্ঞানিক (Adelheim) একটি সংক্রামিত ইঁদুরের সহিত একটি সুস্থ ইঁদুরকে পাঁচমাস যাবৎ একত্রে রাখিয়া দেখিয়াছিলেন যে তাহাতেই সুস্থ ইঁদুরটি সংক্রমণ প্রাপ্ত হইল।

তবে স্যাণ্ড‌ফ্লাই কালাজ্বরের উপযুক্ত বাহন ইহা প্রমাণ হইয়া যাওয়াতে কালাজ্বর সংক্রমণের পরীক্ষা বর্ত্তমানে স্যাণ্ডফ্লাইয়ের দ্বারাই করা হইয়া থাকে। কালাজ্বরের সংক্রমণ সহজে ধরে না, এই জন্য দুই-একটি জন্তুকে লইয়া পরীক্ষা করিতে গেলে প্রায়ই বিফল হইতে হয়। সাফল্য লাভ করিতে হইলে এক সঙ্গে অনেকগুলি জন্তুকে লইয়া চেষ্টা করা উচিত, তবে উহার দুই-একটিতে সংক্রমণ ধরিতে দেখা যায়।

মানুষ ছাড়া অন্য কয়েকটি মাত্র জীব কালাজ্বর-জীবাণুর দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে সংক্রামিত হইতে পারে। গরু, ছাগল, বিড়াল, প্রভৃতি জন্তুকে আদৌ সংক্রামিত করা যায় না। চেষ্টা করিলে কুকুর এবং বাঁদর অনেক বিলম্বে সংক্রামিত হয়। গিনিপিগ্ বা খরগোসকে সংক্রামিত করা অতি কঠিন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে চীনদেশে হ্যাম্‌ষ্টার (Hamster) নামক গিনিপিগের মত এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু আছে (Cricetulus griseus), উহাই কালাজ্বরের সংক্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা সহজে গ্রহণ করিবার উপযোগী। তথাপি এতাবৎ সর্ব্বসমেত চার-পাঁচটি মাত্র হ্যাম্‌ষ্টারকে সংক্রামিত করিতে পারা গিয়াছে। প্রথমে ১৯৩১ সালে শর্ট, স্মিথ্, প্রভৃতি কয়েকজনে মিলিয়া স্যাণ্ডফ্লাই দংশনের দ্বারা এই চেষ্টা করেন, এবং সাতটি হ্যাম্‌ষ্টারের মধ্যে একটিতে সাফল্য লাভ করেন। অতঃপর কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলে

এতাবৎ ২৮টি হ্যাম্‌ষ্টারের মধ্যে তিনটিতে মাত্র সংক্রমণ-চেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছে।

এই সকল এক্সপেরিমেণ্টের ফলে অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। ইহাতে জানা গিয়াছে যে সংক্রমণ সফল করিতে হইলে বর্ষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত স্যাণ্ডফ্লাইয়ের দ্বারা পুনঃপুনঃ দংশন হওয়া আবশ্যক, এবং তৎপরে ৪০০ দিন পর্য্যন্ত (প্রায় ১৩ মাস) সংক্রামিত জীবকে বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক,—তবে উহার অনেকগুলির মধ্যে দুই-একটিতে রোগলক্ষণ দেখা যাইবে। মানুষের পক্ষেও সম্ভবতঃ তাহাই হয়।

কালাজ্বরের অনুকূল অবস্থা কি?—শরীরে কালাজ্বরের জীবাণু প্রবেশ করিলেই কালাজ্বর হয় না, ইহার সহিত আরো কিছু ঘটনা-সংযোগের প্রয়োজন, তবে উহাতে রোগের সম্ভাবনা হইতে পারে। নোল্‌স্ বলেন—"Man is very resistant to the infection of Kala-azar,"—অর্থাৎ মনুষ্য-শরীর কালাজ্বরের বীজকে সহজেই প্রতিরোধ করিতে পারে। কেবল অবস্থা-বৈগুণ্যে উহা কালাজ্বর ব্যাধির উপযোগী হইয়া ওঠে। সুস্থ শরীরে ঐ জীবাণু প্রবেশ করিলেও রোগ হয় না, বহুদিন পর্য্যন্ত নিষ্ক্রিয় থাকিয়া উহারা আপনিই বিনষ্ট হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কোনো কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস হয় ও সেই সঙ্গে উহার রোগপ্রবণতা বাড়িয়া যায়, তখন বহুদিনের আশ্রিত জীবাণু সজীব হইয়া ওঠে এবং তখনই কালাজ্বরের আবির্ভাব হয়। সুতরাং এ রোগের প্রচ্ছন্ন কাল (incubation period) যে কতদিন তাহার কোনো স্থিরতা নাই। ইহা দুই-তিন মাসও হইতে পারে, দুই-তিন বৎসরও হইতে পারে। এমনও শোনা গিয়াছে যে কাহারও চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার সংক্রমণ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, এবং তাহার চার পাঁচ বৎসর পরে সামান্য দুই দিনের জন্য ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা ম্যালেরিয়া হইয়া তখন হইতেই এই রোগ প্রকাশ পাইল। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায় যে কালাজ্বর সুস্থদেহে একেবারে প্রথমেই আসে না,—প্রথমে আসে অন্য কোনো রোগ, তারপর দেখা দেয় কালাজ্বর। অনেকে প্রায়ই দেখিয়া থাকিবেন যে প্রথমে হইল টাইফয়েড, রক্ত পরীক্ষাতেও ভিডাল্-চিহ্ন পাওয়া গেল, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইয়া গেলেও জ্বর ছাড়িল না,—ক্রমে সন্দেহ

হওয়াতে দেখা গেল টাইফয়েড কখন কালাজ্বরে রূপান্তরিত হইয়াছে। অথবা এমনও দেখিয়া থাকিবেন যে প্রথমে রীতিমত ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইল, উহার জীবাণুও রক্তের মধ্যে পাওয়া গেল, কুইনিনের দ্বারা সে জ্বরটিও কিছুদিন বন্ধ রহিল,—কিন্তু আবার জ্বর আসিল, এবার কুইনিনে তাহা নিবৃত্ত হইল না, পরীক্ষায় দেখা গেল উহা তখন কালাজ্বর। এইরূপে অনেক প্রকার সামান্য রোগই কালাজ্বর ঘটিবার পক্ষে অনুকূল। গর্ভাবস্থাও কালাজ্বর সংঘটনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কেবল যে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক কালাজ্বর দেখা যায় বলিয়াই এ-কথা বলা হইতেছে তাহা নয়, পরীক্ষার দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বহু ইঁদুরকে কালাজ্বর-জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত করিয়া ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে তন্মধ্যে যে-গুলি গর্ভবতী তাহারাই অতি শীঘ্র সংক্রামিত হয়। গর্ভাবস্থায় শরীরের মধ্যে যে রাসায়নিক বিপর্য্যয় ঘটে তাহাতেই হয়তো জীবাণুরা রোগ জন্মাইবার কিছু সুযোগ পায়। সুস্থ শরীরেও এরূপ কোনো বৈষম্য না ঘটিলে জীবাণু প্রবেশ সত্ত্বেও কালাজ্বর হয় না। তবে এই বৈষম্য যে কি প্রকারের তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

কালাজ্বর কোথায় হয়?

কালাজ্বর গ্রীষ্মপ্রধান-দেশের ব্যাধি। ভারতের মধ্যেও যে সকল প্রদেশে শীতের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম, প্রায় সেই সকল স্থানেই কালাজ্বর অধিক হয়,—যেমন বাংলা ও আসাম প্রদেশ। মাদ্রাজে কালাজ্বরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। বিহারেও কালাজ্বর হয়। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ ও উড়িষ্যাতে ইহা অনেক কম। এতদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কালাজ্বর দেখা যায় না।

বাংলাদেশের মধ্যে বাঁকুড়া ও বীরভূমে কালাজ্বর সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। আসামে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী সকল স্থানেই যথেষ্ট কালাজ্বর এবং শ্রীহট্টেও কালাজ্বর আছে, কেবল মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্যস্থানসমূহে ইহা একেবারে নাই। বিহারে নদীতীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে কালাজ্বর দেখা যায়, কিন্তু রাঁচি প্রভৃতি পার্ব্বত্যভূমিতে নাই।

ভারতবর্ষের বাহিরেও কালাজ্বর অপ্রতুল নয়। চীনদেশে নদীতীরবর্ত্তী

কয়েক স্থানে খুবই কালাজ্বর হয়। রুষীয় তুর্কীস্থানে ও সুদানে ইহার প্রকোপ আছে। আর ভূমধ্যসাগরের উপকূলে যে শিশুদের কালাজ্বর হয়, এ দেশের কালাজ্বরের সহিত তাহার অন্য কোনো বিষয়ে পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল রোগীদের বয়সের।

এই রোগ সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রাম অঞ্চলেই অধিক। সহরেও বস্তি অঞ্চলে স্যাঁৎসেঁতে নিম্নতলবাসী দরিদ্রদিগের মধ্যে ইহা যথেষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা মুর্গী হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষী বাসগৃহের নিকট রাখে তাহাদের মধ্যে যেন ইহা কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়।

কালাজ্বরকে এখন আর এপিডেমিক্ ব্যাধি বলা চলে না, ইহা এন্ডেমিক (endemic) ব্যাধি বলা যাইতে পারে। এক বাড়ীতে একাধিক লোক ইহাতে আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সকলকে একসময় আক্রান্ত হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। এমনও দেখা যায় যে স্বামী যে বৎসর আক্রান্ত হইল, স্ত্রী তাহার দুই এক বৎসর পরে আক্রান্ত হইল।

শীতের প্রারম্ভ হইতেই কালাজ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। হাঁসপাতালগুলিতে অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে (নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী) যত কালাজ্বরের আমদানি দেখা যায় অন্যান্য সময়ে তত হয় না। রজার্স বলেন, যে বৎসর বর্ষা কম হয় এবং শীত অধিকদিন পর্য্যন্ত টিঁকিয়া থাকে, সে বৎসর কালাজ্বরও বেশী হয়।

এতদ্দেশীয় কালাজ্বরের বয়স সম্বন্ধে কোনো পক্ষপাতিত্ব নাই। তবে অধিক-বয়স্কদিগের অপেক্ষা অল্পবয়স্কেরাই ইহাতে বেশী আক্রান্ত হয়, এবং ২০ বৎসর বয়সের নিম্নেই রোগীসংখ্যা অধিক। ছয় বৎসরের নিম্নেও অনেক শিশুকে কালাজ্বরে ভুগিতে দেখা যায়, কিন্তু ছয় মাসের নীচে এ দেশে কোনো শিশুর কালাজ্বর দেখা যায় নাই।

কালাজ্বরের লক্ষণাদি (Symptoms)

জ্বর—

জ্বরই কালাজ্বরের প্রধান লক্ষণ, এবং অনিয়মই এ জ্বরের বৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রকৃতির জ্বর ইহাতে দেখা যাইতে পারে। কতক জ্বর প্রথমে

টাইফয়েডের মত রূপ লইয়া (typhoid type) দেখা দেয়, অর্থাৎ প্রত্যহ ধাপে ধাপে বাড়িয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে স্থির হইয়া কিছুদিন এক ভাবে অবস্থান করে, কিন্তু তাহার পর হইতেই উহার গতি অনিয়মিত হইয়া পড়ে। কখনও বা উহা কিছুদিনের জন্য একেবারে ছাড়িয়া যায় ও তাহার পর হইতে পুনরায় আসিতে থাকে ; কখনও বা উহা একেবারে ছাড়ে না, রেমিটেণ্ট হইতে ক্রমে ইণ্টারমিটেণ্ট রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। কতক কালাজ্বর প্রথমে অবিকল ম্যালেরিয়ার মত (malarial type) হয়, অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার মত কম্প দিয়া উহা প্রত্যহ আসে ও প্রত্যহ ছাড়ে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার মত উহার নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে না, আজ যে সময় জ্বর আসে কাল তাহা আগাইয়া বা পিছাইয়া আসে।

কালাজ্বরের জ্বর প্রায় প্রত্যহ দুইবার করিয়া ওঠানামা করে, অর্থাৎ যদি সকালে একবার জ্বর আসে তো দ্বিপ্রহরে তাহা নামিয়া যায়, আবার রাত্রে একবার জ্বর ওঠে, তাহা ভোরের দিকে নামিয়া যায়। এই প্রকার দ্বৈকালীন জ্বর (double rise) প্রত্যহ হইতে থাকা কালাজ্বরের এক বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু কালাজ্বর মাত্রেই যে ইহা দেখা যাইবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই।

কালাজ্বরে কখনো কখনো কিছুকাল যাবৎ জ্বর হইবার পর উহা আপনিই ছাড়িয়া যায় ও কতকদিন বিজ্বর অবস্থায় কাটে। তৎপরে পুনরায় জ্বর হইতে আরম্ভ হয় এবং কিছুকাল ভোগের পর পুনরায় ঐরূপ বিজ্বর অবস্থা আসে। এইরূপে জ্বর ও বিজ্বরের অবস্থা ইহাতে উপর্য্যুপরি ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহা নিয়মিতরূপে হয় না, প্রতিবারেই জ্বরের নূতন নূতন ভাব দেখা যায়। কোনো-বারে বা উহা ইণ্টারমিটেণ্ট, কোনো-বারে রেমিটেণ্ট,—কোনো-বার অল্পকাল স্থায়ী, কোনো-বার দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহারই মধ্যে কচিৎ দ্বৈকালীন জ্বরও হইতে পারে, এবং কখনও বা দৈনিক তিনবার, এমন কি চারবার করিয়াও জ্বর ওঠানামা করিতে দেখা যায়।

অপর পক্ষে এমন কালাজ্বরও দেখা যায় যাহাতে বহুকাল যাবৎ কেবল সামান্য ঘুষ্‌ঘুষে জ্বরই (insidious type) হইতে থাকে, স্পষ্ট করিয়া জ্বর কখনও প্রকাশ পায় না। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে জ্বর

সে কখনও স্পষ্ট টের পায় নাই, তবে কয়েকমাস হইতে মধ্যে মধ্যে অসুস্থ বোধ করিতেছে, তাহা বিশেষ গ্রাহ্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় নাই,—হঠাৎ সম্প্রতি জ্বর স্পষ্টরূপে টের পাওয়াতে বা আমাশাদি কয়েকপ্রকার উপসর্গ ঘটাতে চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছে। তখন টেম্পারেচার লইয়া দেখা যায় যে উহার প্রত্যহ অল্প অল্প জ্বর হইতেছে।

আবার এমন কালাজ্বরও দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে জ্বর মোটেই নাই, পূর্ব্বেও কখনও জ্বর হয় নাই, কিন্তু প্লীহাটি কেবল উত্তরোত্তর বাড়িতেছে এবং শরীর ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে (apyrexial type)। চিকিৎসক যখন সন্দেহ করিয়া রক্ত পরীক্ষা করেন তখন জানিতে পারেন উহা কালাজ্বর। বিরল হইলেও এরূপ কালাজ্বর নিতান্ত অসম্ভব নয়।

কালাজ্বরের জ্বর সাধারণতঃ দীর্ঘকালব্যাপী, ইহার কোনো নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ নাই। উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে ইহার ভোগ দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে পারে। কিন্তু রোগ তেমন প্রবল হইলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে দুই চারি মাসের মধ্যেও মৃত্যু ঘটিতে পারে। আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে রোগী বিনা চিকিৎসায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ভুগিতেছে।

তবে নিয়ম না থাকিলেও ইহার জ্বরের কয়েক প্রকার বৈচিত্র্য আছে। অগ্রে টাইফয়েডের মত মূর্ত্তিতে হইয়া পরে অনিয়মিত জ্বর হইতে থাকা ইহার একপ্রকার বৈচিত্র্য। ম্যালেরিয়ার মত কম্প দিয়া জ্বর আসা ও ঘাম দিয়া ছাড়া, অথচ কুইনিন প্রভৃতির প্রয়োগে উহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না হওয়া আর একপ্রকার বৈচিত্র্য। দ্বৈকালীন জ্বর হইতে থাকা উহার তৃতীয় প্রকার বৈচিত্র্য। এবং ইহার আরো এক বৈচিত্র্য আছে প্রত্যহ রাত্রিকালে জ্বর হওয়া। এমন দেখা গিয়াছে যে রোগীর সমস্ত দিনই জ্বর নাই, সকলেই মনে করিতেছে উহার জ্বর হইতেছে না, কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রিত অবস্থায় রোগীর প্রত্যহই জ্বর হইতেছে, দৈবাৎ রাত্রে উঠিয়া টেম্পারেচার লইতেই তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তবে এই সকল বৈচিত্র্য সর্ব্বত্র মেলে না ; সুতরাং ইহার উপর কিছু নির্ভর করা চলে না।

প্লীহা ও যকৃৎ—

কালাজ্বরে প্লীহাবৃদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। ইহাতে জ্বরের প্রথম হইতেই প্লীহা শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে, অতঃপর লিভারটিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ম্যালেরিয়াতেও প্লীহা বাড়ে এবং টাইফয়েডেও প্লীহা বাড়িতে দেখা যায় বটে, কিন্তু কালাজ্বরের প্লীহা প্রথম অবস্থা হইতেই ম্যালেরিয়া অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে অনেকখানি বাড়িয়া ওঠে। অল্পদিনের জ্বরেই প্লীহা অনেকটা বাড়িয়াছে দেখিলে কালাজ্বর সন্দেহ করা অন্যায় নয়।

প্রথমে কতকদিন ভুগিবার পর যাহাদের জ্বর কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে, তাহাদের প্লীহা সেই সময় কিছু কমিতে পারে। কিন্তু অনেকের জ্বর না থাকা সত্ত্বেও উহা উত্তরোত্তর বাড়িতে দেখা যায়। ক্রমে দুই তিন মাস ভোগের পর উহা বর্দ্ধিত হইয়া নাভিদেশের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছায়। কালাজ্বরের প্লীহা পাঁজরের নীচে হইতে দৈর্ঘ্যে ৫।৬ ইঞ্চি পরিমাণ ও প্রস্থে নাভি অতিক্রম করিতে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু ইহার অধিক আর বড় বেশী অগ্রসর হয় না। যাহাকে আমরা "পেটজোড়া প্লীহা" বলি তাহা কালাজ্বরে কমই দেখা যায়, পুরাতন ম্যালেরিয়াতেই (chronic malaria) উহা অধিকাংশ স্থলে হয়। কালাজ্বরের প্লীহা তাড়াতাড়ি কতকদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া থামিয়া যায়, কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্লীহা অল্পে অল্পে বাড়িতে বাড়িতে শেষে অনেক দূর পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করে। সেইজন্য অতি প্রকাণ্ড ও কঠিন প্লীহা দেখিলে আগে ম্যালেরিয়ারই সন্দেহ করা উচিত।

প্লীহা দেখিয়া অনেকে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের পার্থক্য নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। ম্যালেরিয়ার প্লীহা আকারে বড় এবং কঠিন, কালাজ্বরের প্লীহা আকারে ছোট এবং নরম; কিন্তু এ কথা সত্য হইলেও ইহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। কালাজ্বরের প্লীহাও বড় এবং কঠিন হওয়া বিচিত্র নয়। আবার এমন কালাজ্বরও দেখা গিয়াছে যেখানে কয়েকমাস ভোগ হওয়াতেও প্লীহা দুই ইঞ্চির অধিক বড় হয় নাই। আসলে প্লীহার বৃদ্ধি নির্ভর করে উহার আভ্যন্তরিক কোষগুলির নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার উপর, যাহার প্লীহা যে ভাবে ক্রিয়া করে তাহার প্লীহা তদনুরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

সুতরাং প্লীহার আকার হইতে রোগের পরিচয় অনুমান করিয়া লওয়া ঠিক নয়।

প্লীহা বৃদ্ধির পরে লিভারের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কালাজ্বরের লিভারও ম্যালেরিয়ার অপেক্ষা অনেক দ্রুতগতিতে বাড়ে। প্রথম প্রথম লিভারটি নরম থাকে, তৎপরে উহাও শক্ত হইয়া ওঠে। শিশুদের কালাজ্বরে প্লীহা অপেক্ষাও লিভারের আয়তন অধিক বাড়িতে দেখা যায়। এমনও দেখা গিয়াছে যে প্লীহা প্রায় নাই বলিলেই হয়, কিন্তু লিভারটিই প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য লক্ষণ—

কালাজ্বরে প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি এবং জ্বর ব্যতীত, আর যে সকল লক্ষণ দেখা যায় সেগুলি রোগের পরিচায়ক নয়,—কোথাও তাহা থাকে কোথাও থাকে না। ঐ সকল লক্ষণ কি ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা অতঃপর বর্ণিত হইল।

জ্বরের বিকার—এই রোগে প্রবল জ্বরেও বিশেষ বিকার দেখা যায় না। প্রথম অবস্থায় টাইফয়েডের মত সমস্ত লক্ষণ থাকিলেও ইহাতে বিকার-লক্ষণ একেবারেই থাকে না, প্রবল জ্বরের সময়ও রোগী সজ্ঞানে কথাবার্ত্তা কহিতে থাকে। বিকার বলিতে যেরূপ টক্সিমিয়ার অবস্থা বুঝায়—কালাজ্বরে সেরূপ লক্ষণ কখনও দেখা যায় না।

পেটের দোষ—কালাজ্বরে জিভ পরিষ্কার থাকে, ক্ষুধাও উত্তম থাকে,—তবে হজমশক্তি কমিয়া যায়। পেটের দোষ, অর্থাৎ পেটফাঁপা বা উদরাময়ের লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় না; টাইফয়েডে ইহার বিপরীত। ম্যালেরিয়াতে কম্প দিয়া জ্বর আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বমি হইতে থাকে, কিন্তু কালাজ্বরে তাহাও প্রায়ই হয় না। কালাজ্বরের এক বিশেষত্ব এই যে ক্ষুধা যথেষ্ট থাকে অথচ হজম করিবার শক্তি নাই। রোগের পুরাতন অবস্থায় উদরাময় ও আমাশা নিত্য লাগিয়া থাকে। ইহার শেষ অবস্থায় মারাত্মক আমাশা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

শ্লেষ্মার দোষ—কালাজ্বরে অনেক সময় প্রথম হইতেই রীতিমত কাসির

লক্ষণ আসিয়া জুটে, এবং কখনও বা ব্রঙ্কাইটিস্‌ও হইয়া থাকে। যেখানে বুকে কোনো সর্দ্দির চিহ্ন নাই সেখানেও এক প্রকার শুষ্ক কাসি লাগিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন ইহা গলার কাসি, আবার কেহ কেহ বলেন প্লীহার দ্বারা ভেগাস্ স্নায়ুর উপর চাপ পড়াতে ইহা হয়। কালাজ্বরে নিউমোনিয়া হওয়াও নিতান্ত বিরল নয়। অনেক কালাজ্বরে নিউমোনিয়া হইয়া হঠাৎ রোগীর মৃত্যু হয়, কিছুতে তাহা আরোগ্য করা যায় না। আবার যাহারা নিউমোনিয়া হইতে আরোগ্যলাভ করে, তাহাদের কালাজ্বরও অতঃপর শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

প্রস্রাবের দোষ—কালাজ্বরে প্রস্রাবের দোষ বিশেষ হয় না, কিন্তু কখনো কখনো প্রস্রাবের মধ্যে সামান্য অ্যাল্‌বুমেন থাকিতে দেখা গিয়াছে।

শোথ—প্রথম অবস্থায় শোথের লক্ষণ হয় না, ইহা পরবর্ত্তী অবস্থায় হয়। ইহাতে কেবল পা ফুলিতেই অধিক দেখা যায়, হাত ও মুখ ক্বচিৎ ফোলে। পুরাতন অবস্থায় উদরীর লক্ষণ প্রায়ই হইয়া থাকে।

রক্তশূন্যতা—ম্যালেরিয়াতে রোগী যত শীঘ্র রক্তশূন্য হইয়া পড়ে কালাজ্বরে তাহা হয় না,—ইহা কালাজ্বরের এক বৈশিষ্ট। ইহার কারণ লোহিত-কণিকাগুলিকে কালাজ্বরের জীবাণু আক্রমণ করে না,—শ্বেত-কণিকাগুলিকেই করে। কিন্তু পুরাতন কালাজ্বরে রক্তশূন্যতা হইতে দেখা গিয়াছে। কালাজ্বরের সহিত হুকওয়ার্ম-পীড়া মিশ্রিত থাকিলেও এরূপ রক্তশূন্যতা আসিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের কালাজ্বর হইলে প্রায়ই ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পরে কালাজ্বর হইলে প্রায়ই কিছু অধিক রক্তশূন্যতা হয়।

রক্তপাত—এই রোগে রক্তের জমাট-বাঁধিবার স্বাভাবিক শক্তি (coagulability) প্রায়ই কমিয়া যায়, এইজন্য রোগীর নাক দিয়া, দাঁতের গোড়া দিয়া, মলদ্বার দিয়া, অর্শ দিয়া এবং চর্ম্মনিম্নে কাল্‌সিটা পড়িয়া (petichæ) নানারূপভাবে রক্তপাত হইতে পারে। স্ত্রীলোকদের ইহাতে অকস্মাৎ অত্যধিক ঋতুস্রাব হওয়া এবং গর্ভপাত হওয়াও বিচিত্র নয়। কালাজ্বরে প্রসব হইবার সময়ও অত্যধিক রক্তপাতের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

চর্ম্মদোষ—এ রোগে গাত্রচর্ম্ম প্রথম হইতেই শুষ্ক ও মলিন হইয়া এক

প্রকার কালিমা প্রাপ্ত হয়, তবে গায়ের বর্ণ যে একেবারেই কালো হইয়া যায় তাহা নয়। যাহারা গৌরবর্ণ তাহাদেরই এরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়, শ্যামবর্ণ ব্যক্তিদের দেহে মলিনতা ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য হয় না। কিন্তু অধিকাংশেরই মুখের উপর কালাজ্বরের ছাপ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই ইহাতে কপালের উপর ও ঠোঁটের চারিপাশে কালো কালো দাগ পড়ে এবং কাহারো বা সমস্ত মুখেই কালো দাগ পড়ে; কাহারো বা মুখেব স্থানে স্থানে একপ্রকার ছোপ ধরিয়া যায়। এইসঙ্গে মাথার চুলগুলি শুষ্ক ও বিরল হয়, অনেকের চুল উঠিয়া যায়। অনেক ছোট ছেলের মাথা প্রায় টাক-ওঠার মত দেখিতে হয়। কেহ কেহ বলেন অ্যাড্রিন্যাল্ গ্রন্থির (adrenal glands) আভ্যন্তরিক রসের অপ্রাচুর্য্য হেতু এই সকল ঘটে।

কালাজ্বর কিছুদিনের পুরাতন হইলে প্রায়ই চুলকানি, পাঁচড়া, খোস, প্রভৃতি চর্ম্মরোগ নিত্য লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। একবার যে ঘা হয় তাহা আর শীঘ্র শুকাইতে চায় না। এইসকল ঘায়ের রস লইয়া পরীক্ষা করিলে কখনো বা তাহার মধ্যেও লিশ্‌ম্যানিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু লিশ্‌ম্যানিয়ার দ্বারা এ সকল চর্ম্মরোগের সৃষ্টি নয়। কেহ কেহ বলেন বহুদিন স্নানাদি না করায় ও অপরিষ্কার থাকার ফলে এইগুলি হয়। আবার অনেকে বলিয়া থাকেন এরূপ চর্ম্মরোগ হওয়া আরোগ্যের স্বাভাবিক প্রচেষ্টার লক্ষণ, ইহাতে শ্বেত-কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া আরোগ্যের সহায়তা করে। এমন রোগীও দেখা গিয়াছে যাহাদের চর্ম্মরোগ হওয়ার পর কালাজ্বর আরোগ্য হইয়া গিয়াছে।

বাহ্যিক অবস্থা—কিছুকাল রোগ ভোগ হইলেই কালাজ্বরের একপ্রকার বিশিষ্টমূর্ত্তি প্রকাশ পায়। রোগী দেখিতে শীর্ণকায়, শুষ্ক মুখে কালো কালো দাগ, মাথার চুল রুক্ষ ও পাৎলা, হাত-পা গুলি সরু সরু, কেবল ডাগর উদর প্লীহা ও যকৃতে পূর্ণ। পেটের উপরকার শিরাগুলি (veins) ফুলিয়া উঠিয়াছে, গলার শিরাগুলি (carotids) স্ফীত হইয়া দ্রুততালে ধক্ ধক্ করিতে দেখা যাইতেছে, পায়ে কিছু শোথ নামিতেছে, পেটেও হয়তো কিছু জল জমিয়াছে। ইহাই কালাজ্বরের স্বরূপ। তবে পুরাতন ম্যালেরিয়াতেও এইরূপ মূর্ত্তি হইতে পারে।

কালাজ্বরের উপসর্গ (Complications)

কয়েক প্রকার উপসর্গও কালাজরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সকল গুলি বিবৃত করা সম্ভব নয়, যেগুলি সাধারণতঃ দেখা যায় সেই গুলিরই মাত্র উল্লেখ করা হইল।

(১) ক্যাংক্রাম্ ওরিস্ (Cancrum oris), অর্থাৎ গালের ভিতর ঘা হইয়া উহা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকা কালাজরের উপসর্গরূপে পূর্ব্বে অনেক দেখা যাইত, এখন ইহা ক্বচিৎ দেখা যায়। এই ঘা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে গালের মাংস খসিয়া পড়িতেও দেখা গিয়াছে। রোগের পুরাতন অবস্থাতেই ইহা হয়।

(২) কানে ঘা, গলায় ঘা, বিস্ফোটক, পাঁচড়া প্রভৃতি অনেক সময় উপসর্গরূপে দেখা যায়।

(৩) শরীরের নানাস্থান হইতে অকস্মাৎ রক্তপাত ইহাতে প্রায়ই হয়।

(৪) উদরাময় ও আমাশা ইহার সাধারণ উপসর্গ। আমাশা এমিবা-ঘটিতও হইতে পারে, ব্যাসিলারিও হইতে পারে,—এবং কালাজ্বরের বিষ হইতেও একপ্রকার আমাশার সৃষ্টি হয়। রোগের শেষ অবস্থাতেই প্রায় ইহা দেখা যায়।

(৫) ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া ও প্লুরিসি হওয়া ইহাতে বিচিত্র নয়।

(৬) প্লীহা ও যকৃতের উপর প্রদাহজনিত ব্যথা (perisplenitis and perihepatitis) কখনো কখনো ঘটিতে পারে ।

(৭) শোথ প্রভৃতি উপসর্গ পুরাতন অবস্থায় হয় বটে, কিন্তু প্রস্রাবের দোষ (nephritis) ক্বচিৎ দেখা যায়।

(৮) কালাজরের সহিত ম্যালেরিয়া, কোলাই-বীজাণুর জর এবং হুকওয়ার্ম-পীড়াও উপসর্গরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে।

কালাজ্বরের সহিত অন্যান্য রোগের তুলনা
(Differential Diagnosis)

কালাজ্বর রোগের আবিষ্কারের পর আমাদের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, প্লীহা-জর কুইনিনে আরোগ্য না হইলেই উহা কালাজ্বর। কিন্তু এখন আমরা

দেখিতে পাইতেছি যে এ ধারণা অনেক সময়ে সত্য হয় না,—এমন অনেক প্রকার পুরাতন জর আছে যাহাতে প্লীহা বৃদ্ধি হয়, অথচ তাহা ম্যালেরিয়াও নয় কালাজরও নয়। তদ্ভিন্ন অনেক নূতন জরও আরোগ্য হইতে বিলম্ব করিলে কালাজ্বর বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। অতএব কি কি রোগের সহিত কালাজ্বরের ভ্রান্তি ঘটিতে পারে তাহা বিবৃত করা আবশ্যক।

(১) **ম্যালেরিয়া**—প্লীহাযুক্ত জরের চরিত্র যেমনই হউক, প্রথমে তাহাকে ম্যালেরিয়া বলিয়াই সন্দেহ হইবে। ম্যালেরিয়াকে কালাজ্বর হইতে পৃথক করার উপায় কুইনিন প্রয়োগ, এবং উহা নিষ্ফল হইলে রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা। যে জর ম্যালেরিয়ার মত, অথচ সাতদিন পূর্ণমাত্রায় কুইনিন দিয়াও আরোগ্য হয় না, সে জরকে কালাজ্বর সন্দেহ করিয়া রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ম্যালেরিয়ার লক্ষণের সহিত কালাজরের লক্ষণের যে সকল পার্থক্য আছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুরাতন ম্যালেরিয়া ও কালাজরের পার্থক্য নির্ণয় করা অতি কঠিন, রক্ত পরীক্ষা ব্যতীত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আবার ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর একত্র হইয়াও থাকিতে পারে, তাহা স্মরণ রাখা উচিত।

(২) **টাইফয়েড্**—কালাজরকে প্রথমে টাইফয়েড মনে করা খুবই স্বাভাবিক ; এ ভুল প্রত্যেকেই করিয়া থাকেন এবং ইহাতে দোষের কিছুই নাই। টাইফয়েডের প্রথম লক্ষণগুলি কালাজরেও বর্ত্তমান ; কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে টাইফয়েডের সহিত কালাজরের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। (ক) টাইফয়েডে যেমন বিকারের লক্ষণ থাকে, কালাজরে তাহা থাকে না। (খ) টাইফয়েডে জিভ ময়লা হয়, কিন্তু কালাজরে জিভ অত্যন্ত পরিষ্কার থাকে। (গ) টাইফয়েডে প্রায়ই যেমন পেটফাঁপা ও নানাপ্রকার পেটের দোষ হয়, কালাজরে তাহা দেখা যায় না। (ঘ) টাইফয়েডে নাড়ীর বেগ মন্দ হয়, কিন্তু কালাজরে নাড়ীর বেগ দ্রুত হয়। (ঙ) টাইফয়েডের জর অধিকক্ষণ যাবৎ প্রায় এক ভাবেই লাগিয়া থাকে, কিন্তু কালাজরের জর প্রায় ওঠানামা করে। (চ) টাইফয়েডে প্লীহা অল্পই বাড়ে কিন্তু কালাজরে প্লীহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে থাকে। তথাপি এই সকল চিহ্নের উপর অধিক নির্ভর

করা যায় না, সম্ভব হইলে রক্তের ভিডাল্ পরীক্ষা (Widal test) ও কালাজরের জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা, দুইই করাইয়া লওয়া উচিত।

(৩) **কোলাই-বীজাণুর জ্বর**—এই জাতীয় জরও কম্প দিয়া আসে, অকস্মাৎ বাড়িয়া ওঠে, জরের ওঠানামার বিশেষ কোনো নিয়ম থাকে না, দীর্ঘকালীন জরও ইহাতে হইতে পারে, প্লীহাও কিছু বাড়িতে পারে, এবং বহুদিন পর্য্যন্তও এ জরের ভোগ চলিতে পারে। এই জর প্রায়ই শিশুদের ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে হয়,—তবে ইহাতে প্লীহা কালাজরের মত অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় না, আর বিশেষতঃ শ্বেতকণিকার সংখ্যা ইহাতে বাড়িয়া যায়। স্থতরাং ইহা চিনিতে বিশেষ বিলম্ব না, এবং রক্ত পরীক্ষাতেও বুঝিতে পারা যায়।

(৪) **এণ্ডোকার্ডাইটিস্** (Endocarditis)—এক প্রকার ক্রনিক্ এণ্ডোকার্ডাইটিস্ আছে, তাহাকে প্রথমে প্রায়ই কালাজর বলিয়া ভ্রম হয়। হৃৎপিণ্ডের রোগ হইলেও ইহাতে হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি প্রথমে ধরিতে পারা যায় না, এবং জরের সঙ্গে সঙ্গে প্লীহাও কিছু বৃদ্ধি পায়। ইহাতে নূতন অবস্থায় শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু পুরাতন হইয়া গেলে তাহাও আর থাকে না। এরূপ স্থলে রক্ত পরীক্ষায় যখন বুঝা যায় যে ইহা কালাজর নয়, তখন রক্তের কাল্চার করিয়া দেখা উচিত।

(৫) **রিল্যাপ্সিং ফিবার** (Relapsing fever)—আপাতঃ-দৃষ্টিতে এই জরকে কালাজরের মতই মনে হয়, এবং কখনো কখনো কালাজরকে রিল্যাপ্সিং ফিবার বলিয়া ভুল হইতেও দেখা গিয়াছে। কিন্তু কেবল ইঁদুরে-কামড়ানোর জর (rat-bite fever) ছাড়া আর কোনো প্রকৃত রিল্যাপ্সিং ফিবার বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে নাই। মাদ্রাজে কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু রিল্যাপ্সিং ফিবারের লক্ষণের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহার জর-বিজরের পুনরাবর্ত্তনের একটা সুনির্দ্দিষ্ট পর্ব্বকাল (disease period) বা নিয়মিত পালা থাকে, একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই তাহা ধরিতে পারা যায়। কিন্তু কালাজরে কোনো নিয়মই থাকে না। আর রিল্যাপ্সিং ফিবারে শ্বেতকণিকার হ্রাস না হইয়া কিছু বৃদ্ধি হয়। ইহা ছাড়া রক্ত পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায় উহা কালাজর নয়।

(৬) **যক্ষ্মা**—পুরাতন কালাজরকে যক্ষ্মা সন্দেহ করা বিচিত্র নয়,

কারণ উহাতেও জরের সঙ্গে বুকে শ্লেষ্মার লক্ষণ কিছু থাকে এবং অতিসারের লক্ষণও প্রায় দেখা যায়; আর যক্ষ্মাতেও কিছু প্লীহাবৃদ্ধি হইতে পারে। স্থতরাং এ-স্থলে রক্ত পরীক্ষার দ্বারাই সন্দেহের মীমাংসা করিতে হয়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে কালাজরে বহুদিন ভুগিলে তৎপরে যক্ষ্মা ধরিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়। স্থতরাং সেরূপ সন্দেহ-স্থলে কেবল রক্ত পরীক্ষা করিলেই হইবে না, গয়ার প্রভৃতিও পরীক্ষা করা দরকার। এমনও দেখা যায় যে কালাজরের চিকিৎসা করিয়া প্লীহা কমিয়া যাইতেছে, রক্তেরও উন্নতি হইতেছে, অথচ জরটুকু ত্যাগ হইতেছে না বা শরীরের উন্নতি হইতেছে না। এরূপ স্থলে যক্ষ্মার কথা মনে করা উচিত এবং বুক পিঠ পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

(৭) **ক্যান্সার**—লিভার বা পেটের অন্য কোনো স্থানে ক্যান্সার জন্মিলে উহা শক্ত এবং বৃহদাকার হইয়া উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জরও থাকে। প্লীহাও ইহাতে বৃদ্ধি পায়, স্থতরাং অনেক সময় ইহাকে কালাজর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। রক্ত পরীক্ষা করিলেই তাহার মীমাংসা হয়।

(৮) **সিফিলিস্** (Visceral Syphilis)—এই রোগের বিষ হইতেও কখনও কখনও জরের সহিত প্লীহা-বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়, বিশেষতঃ যদি পিতামাতার দোষ হইতে শিশুদের (congenital) এই ব্যাধি হয়। এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নয়। সিফিলিসের অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া ও রক্ত পরীক্ষা করিয়া এ রোগ অনায়াসে ধরা পড়ে।

(৯) **রিকেট্স্** (Rickets)—শিশুদের এই পীড়াতেও জরের সঙ্গে প্লীহা ও লিভারের বৃদ্ধি থাকে, স্থতরাং ইহাকেও কালাজর বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু অস্থি গুলির অবস্থা দেখিয়া ও শ্বেতকণিকার সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় ইহা কালাজর নয়।

(১০) **ইন্ফ্যান্টাইল্ লিভার** (Infantile Cirrhosis)—শিশুদের এই রোগ আমাদের দেশে অনেক দেখা যায়। ইহাতে বহুদিন ধরিয়া জর হইতে থাকে এবং লিভারের সঙ্গে প্লীহাও কিছু বৃদ্ধি পায়, স্থতরাং কালাজরের সহিত ইহার ভ্রম সহজেই হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট

কামলা (jaundice) থাকে এবং শীঘ্রই পেটে জল জমে। ইহাতেও শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(১১) **লিউকীমিয়া** (Leukæmia)—রক্তের এক প্রকার বিকৃতি হইতে এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ইহাতে অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকে, প্লীহা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ইহাতে শরীরের নানাস্থান হইতে যখন-তখন রক্তপাত হইতে থাকে। প্রথমে এইরূপ বৃহৎ প্লীহা দেখিলে কালাজ্বর বলিয়াই সন্দেহ হয় কিন্তু শ্বেতকণিকার সংখ্যা গণনা করিলেই সে সন্দেহ দূর হয়। ইহাতে শ্বেতকণিকার যেরূপ অসাধারণ সংখ্যাবৃদ্ধি দেখা যায়, অন্য কোনো রোগেই তাহা হইতে পারে না। ছয় হাজারের স্থলে উহার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও উপরে উঠিয়া যায়, এবং তাহার অধিকাংশই লিম্ফোসাইট। সুতরাং একবার রক্ত পরীক্ষা করিলেই এই রোগ ধরা পড়ে।

(১২) **ব্যান্টিস্ ডিজীজ্** (Banti's disease)—এই রোগও কখনো কখনো এ দেশে দেখা যায় এবং কালাজ্বর বলিয়া ইহাকে সহজেই ভ্রম হয়। ইহাতেও প্লীহা অত্যন্ত বাড়িয়া ওঠে, এবং রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যাও ইহাতে কমিয়া যায়, শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, পেটে জল জমে এবং পুরাতন কালাজ্বরের সকল প্রকার লক্ষণই ইহাতে থাকে। তবে এই রোগে দ্বৈকালীন জ্বর কখনো হয় না এবং শরীরে কষ্টও বিশেষ থাকে না। ইহাতে রোগীকে ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্তও ভুগিতে দেখা যায়। কেবল রক্ত পরীক্ষার দ্বারা ইহাকে কালাজ্বর হইতে পৃথক করা সম্ভব।

(১৩) **হ্যানোস্ ডিজীজ্** (Hypertrophic biliary cirrhosis) —ইহা শিশুদের ব্যাধি, বহু বৎসর ইহার ভোগ,—ইহাতে জ্বর হয় ও প্লীহা-যকৃতের বৃদ্ধি হয়, পুরাতন অবস্থায় উদরীর লক্ষণও হয়। ইহাতে শিশুর আকৃতি খুব খর্ব্ব হইয়া যায়, বহুকাল পর্য্যন্ত কামলা (jaundice) লাগিয়া থাকে এবং শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি থাকে।

(১৪) **ভন্ জ্যাক্স্ ডিজীজ্** (Infantile pseudo-leukæmia)—এই রোগ দুই বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদের মধ্যেই হয়। ইহাতেও জ্বর হয়, প্লীহা-যকৃৎ বাড়ে, নানাস্থান হইতে রক্তপাত হয় এবং উদরী জন্মায়। কিন্তু

রক্ত পরীক্ষায় শ্বেতকণিকার অত্যধিক বৃদ্ধি ও লিম্ফোসাইটের আধিক্য দেখিয়া ইহা ধরিতে পারা যায়।

(১৫) **ষ্টিল্স্ ডিজীজ্** (Still's disease)—ইহাতে শিশুর জ্বর ও প্লীহা থাকে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে শরীরের নানাস্থানে গণ্ড সকল স্ফীত হইয়া ওঠে এবং অস্থির গাঁঠগুলিও আক্রান্ত হয়। গাঁঠের অবস্থা দেখিয়াই ইহা ধরা যায়।

(১৬) **গচার্স ডিজীজ্** (Gaucher's splenomegaly)—ইহাও শৈশবের ব্যাধি, কিন্তু ইহা বংশগত রোগ। প্লীহা ও যকৃৎ দুইই ইহাতে বাড়ে, শ্বেতকণিকার সংখ্যাও ইহাতে কমিতে পারে।

বলা বাহুল্য শেষোক্ত রোগগুলি অত্যন্ত বিরল, তথাপি এই সকল রোগ যে একেবারেই হয় না তাহা নয়। সুতরাং প্লীহাযুক্ত পুরাতন জ্বর দেখিলেই ম্যালেরিয়া অথবা কালাজ্বর মনে করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। সর্ব্বত্রই রক্ত পরীক্ষা করিয়া সন্দেহ দূর করিয়া লওয়া উচিত।

কালাজ্বরের রক্তাদি পরীক্ষা

(Laboratory tests)

কালাজ্বর হইয়াছে কি না ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বহু প্রকারের পরীক্ষা আছে। তবে উহার সকল পরীক্ষারই কিছু কিছু দোষ-গুণ আছে; সুতরাং কোন রূপ পরীক্ষার কি মূল্য ধার্য্য করা উচিত এবং কোন পরীক্ষার কি অর্থ, সর্ব্বাগ্রে তাহাই আমাদের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

কালাজ্বরের যতপ্রকার ল্যাবরেটরি-পরীক্ষা আছে সেগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—**প্রত্যক্ষ পরীক্ষা** (direct evidence), ও **চিহ্ন-জ্ঞাপক পরীক্ষা** (indirect evidence)। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা গুলির দ্বারা কালাজ্বরের জীবাণু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; আর চিহ্নজ্ঞাপক পরীক্ষা গুলির দ্বারা জীবাণু সাক্ষাৎ-গোচর হয় না বটে, কিন্তু রোগীর শরীরে তাহারা যে সকল বিশিষ্টরূপ চিহ্নের সৃষ্টি করে সেইগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহা হইতেই উহাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ যে পরোক্ষ-প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষাগুলি

কষ্টসাধ্য এবং উত্তম ল্যাবরেটরি ব্যতীত তাহা করা অসম্ভব, সেইজন্য সহজসাধ্য চিহ্নজ্ঞাপক পরীক্ষা গুলিই সর্ব্বত্র প্রচলিত। তবে তাহা যতই সুস্পষ্ট হউক, রোগ বিচারের সময় এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে যাহার উপর নির্ভর করিতেছি তাহা পরোক্ষ চিহ্ন মাত্র, সুতরাং ভ্রান্তির সম্ভাবনা তাহাতে থাকিতেও পারে। অতএব ঐ সকল পরীক্ষায় রোগের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে পরীক্ষার ফল তাহার সহিত মিলিতেছে কি না।

পরীক্ষাগুলি এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

প্রত্যক্ষ পরীক্ষা—

(১) রক্তের কাল্‌চার—(Blood culture) ইহার জন্য উৎকৃষ্ট ল্যাবরেটরি ও নানারূপ সরঞ্জামের আবশ্যক, এবং ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতিরিক্ত সাবধানতা আবশ্যক, নতুবা সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা বিফল হয়। প্রথমে রক্ত গ্রহণ করিবার সিরিঞ্জ প্রভৃতি নিখুঁৎ ভাবে শোধিত (sterilize) করিয়া লইতে হয়। ঐ সিরিঞ্জের দ্বারা রোগীর শিরা হইতে ২ সি. সি. পরিমাণ রক্ত লইয়া উহা তৎক্ষণাৎ সাইট্রেটযুক্ত সেলাইন জলে (standard saline containing 1·5% soda citrate) মিশাইয়া ঠাণ্ডা ইন্‌কিউবেটরের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা রাখিতে হয়। পরে রক্তকণিকাগুলি নীচে উত্তমরূপে থিতাইয়া পড়িলে উপরকার জলটি ফেলিয়া দিয়া নীচেকার অংশটুকু অতি সাবধানে কাল্‌চার-টিউবের মধ্যে প্রয়োগ করিয়া পুনরায় উহা ঠাণ্ডা-ইন্‌কিউবেটরের মধ্যে রাখিতে হয়। কাল্‌চার-টিউবের মধ্যে N. N. N.-medium থাকে, উহাই লিশ্‌ম্যানিয়ার উপযুক্ত খাদ্য, জীবাণু গুলি উহার মধ্যে কালক্রমে আপনাদের বংশবৃদ্ধি করে, তখন মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করিলেই অসংখ্য কালাজ্বর জীবাণু (হার্পিটোমোনাড্‌ আকারে) দেখিতে পাওয়া যায়। এই N. N. N.-medium প্রস্তুত করাও কিছু কঠিন, খরগোসের হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত লইয়া তাহা আগারের (agar) সহিত মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। কালাজ্বরের জীবাণু শৈত্য ভিন্ন স্ফূর্ত্তি পায় না, সুতরাং ইন্‌কিউবেটরের তাপ সর্ব্বদা ২০-২২ ডিগ্রী

সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখা উচিত। এইরূপ রাখিলে রোগীর রক্তে যদি কালাজ্বরের জীবাণু থাকে তবে সাধারণতঃ ছয়দিন হইতে দশদিনের মধ্যে কাল্‌চার হইয়া উহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাদের কাল্‌চার

খ্যাতনামা জীবাণুবিদ্‌ ওয়েনিয়ন (Wenyon)

হইতে বিলম্বও ঘটিতে পারে, সুতরাং তিন সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে রক্তে কালাজ্বরের জীবাণু নাই। এই পরীক্ষা প্রায়ই বিফল হয় না, রক্তে কিছুমাত্র জীবাণু থাকিলেও এ পরীক্ষায় তাহা ধরা পড়ে। রোগের খুব প্রথম অবস্থাতেও এ পরীক্ষা চলিতে পারে। সুতরাং এই পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারা যায় রোগটি কালাজ্বর কি না।

(২) প্লীহারস পরীক্ষা (Spleen-puncture test)—প্লীহা হইতে রস লইয়া মাইক্রোস্কোপে দেখিলেও উহাতে বহু কালাজ্বর জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরীক্ষাতেও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কারণ কালাজ্বর হইলে প্লীহারসে নিশ্চয়ই তাহার জীবাণু পাওয়া যাইবে। তবে প্লীহা অনেকটা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত উহা বিদ্ধ করা চলিতে পারে না, সুতরাং রোগের প্রথম অবস্থায় এ পরীক্ষার উপায় নাই। এ পরীক্ষা পূর্ব্বে হাঁসপাতালে যথেষ্ট করা হইত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ পরীক্ষা আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্ত্তমানে ইহা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষার জন্য একটি সূক্ষ্ম ইন্‌জেকশনের সূচ দিয়া প্লীহা বিদ্ধ করিয়া পিচ্‌কারীর সাহায্যে কয়েক ফোঁটা রক্ত তন্মধ্য হইতে টানিয়া লইতে হয়। এই রক্ত স্লাইডে লইয়া রং করিলে (Leishman or Giemsa stain) তাহাতে কালাজ্বরের
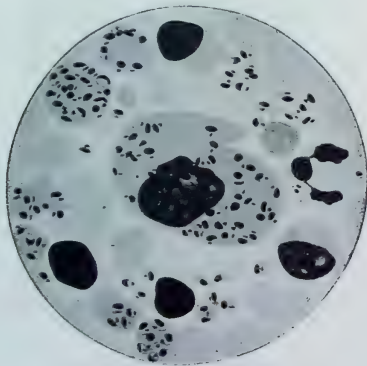
প্লীহারসের কোষগুলির মধ্যে অসংখ্য লিশ্‌ম্যানিয়া (এল্‌. ডি. বডি)

জীবাণু যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু ইহার বিঘ্ন অনেক। রোগটি কালাজ্বর না হইয়া যদি টাইফয়েড অথবা লিউকীমিয়া হয় তাহা হইলে প্লীহা ছেদ করা অতি বিপজ্জনক। রক্তের অবস্থা যদি অত্যন্ত তরল

হইয়া উহার জমাট-বাঁধিবার শক্তি (coagulability) কমিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বিদ্ধ প্লীহা হইতে অনবরত রক্তপাত হইতে থাকে, কিছুতে তাহা নিবারণ করা যায় না। এইজন্য প্লীহা-ছেদে বিস্তর সাবধানতার আবশ্যক। রোগীর রক্তশূন্যতার লক্ষণ থাকিলে, কাসি থাকিলে, পেটের অসুখ থাকিলে, উদরী থাকিলে এ পরীক্ষা চলিবে না।

(৩) রক্তের স্লাইডে জীবাণু অন্বেষণ (Blood-film examination)—ম্যালেরিয়াতে কেবল লোহিত-রক্তকণিকার মধ্যেই জীবাণু থাকে সুতরাং রক্তের স্লাইড পরীক্ষা করিলেই তাহা শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কালাজ্বরে অধিকাংশ জীবাণু প্লীহা-যকৃতের মধ্যে থাকে, কেবল অল্পসংখ্যক

দাস গুপ্ত (B. M. Das Gupta)

নোল্‌স্ (Col. Knowles).

ট্রপিক্যাল স্কুলের বিখ্যাত জীবাণুবিদ্ যুগল,

জীবাণু লার্জ-মনোনিউক্লিয়ার ও পলিনিউক্লিয়ার জাতীয় শ্বেতকণিকার মধ্যে আসিয়া রক্তস্রোতে বিচরণ করে। সুতরাং রক্তের স্লাইডে অনেক অনুসন্ধান করিলে কখনো কখনো তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য নোল্‌স্ ও দাসগুপ্ত স্লাইডের উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত লইয়া তাহার দ্বারা একটি মোটা ফিল্‌ম্ করিয়া উহার মধ্যে জীবাণু খুঁজিবার এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন (Thick-film method)। রক্তের ফিল্‌মটি উত্তমরূপে শুকাইয়া গেলে উহার উপর অ্যাসিডের জল ঢালিয়া দেওয়া হয় (ডিস্‌টিল্‌ড্ জলে ২½% অ্যাসিটিক অ্যাসিড ৪ ভাগ, ও ২% টার্টারিক অ্যাসিড ১ ভাগ একত্র করিয়া); ইহাতে লোহিত কণিকাগুলি গলিয়া গিয়া হিমোগ্লোবিনের

অংশ একেবারে ধুইয়া যায়, কেবল শ্বেতকণিকাগুলিই একত্র হইয়া থাকে। তখন উহাতে জীম্‌সা-ষ্টেন দিয়া রং করিয়া শ্বেতকণিকার মধ্যে জীবাণু
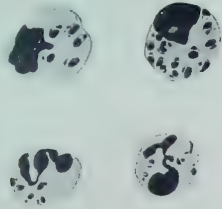
শ্বেতকণিকার মধ্যে এল্. ডি. বডি

খুঁজিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ব্যতীত এ পরীক্ষা সম্ভব নয় এবং অনেক স্থলে অনুসন্ধান করিয়াও ইহাতে জীবাণু পাওয়া যায় না। সুতরাং এই পরীক্ষা সকলের পক্ষে নহে।

চিহ্নজ্ঞাপক পরীক্ষা—

পূর্ব্বে যে তিনপ্রকার প্রত্যক্ষ পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঐগুলিই অভ্রান্ত পরীক্ষা, কারণ চাক্ষুষ জীবাণু দেখিতে পাওয়ার মত রোগের প্রত্যক্ষপ্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু ঐ তিনপ্রকার পরীক্ষাই কঠিন, সাধারণ চিকিৎসকের দ্বারা উহার কোনোটিই হওয়া সম্ভব নয়। তৎপরিবর্ত্তে চিহ্ননির্দ্দেশক পরীক্ষাগুলি অনেক সহজ, এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার অর্থ বিচার করিয়া লইলে উহাতেই কাজ চলিয়া যায়। এ পরীক্ষাগুলির কেবল এই দোষ যে বিনা বিচারে উহার উপর নির্ভর করা যায় না, রোগের অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া উহার অর্থ বুঝিয়া লইতে হয়, এবং তাহা না করিলেই ভুলপথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যে সকল পরীক্ষায় কালাজ্বরের বিশিষ্ট চিহ্ন নির্দ্দেশ করে সেইগুলি অতঃপর একে একে উল্লেখ করা হইল।

(১) শ্বেতকণিকার সংখ্যাগণনা (Total and differential count of leucocytes)—কালাজ্বরে প্রথম হইতেই শ্বেতকণিকার সংখ্যা

অত্যন্ত কমিয়া যায়। অন্যান্য কয়েকটি রোগেও শ্বেতকণিকার সংখ্যা কিছু কমে বটে (যেমন টাইফয়েড, ডেঙ্গু, ইত্যাদিতে) কিন্তু কালাজ্বরে ইহার সংখ্যা যেমন উত্তরোত্তর কমিতে থাকে, অন্য কোনো রোগে তাহা হয় না। শ্বেতকণিকার স্বাভাবিক সংখ্যা রক্তের প্রতি বর্গ-মিলিমিটারে ৬,০০০ (6,000 per cubic millimeter)। যদি দেখা যায় যে প্লীহাসংযুক্ত কোনো জ্বরে প্রথম সপ্তাহে শ্বেতকণিকার মোট সংখ্যা ৫,০০০ হইল,—দ্বিতীয় সপ্তাহে তাহা ৪,৫০০ বা ৪,০০০ হইল—তৃতীয় সপ্তাহে তদপেক্ষাও কম হইল, এবং ক্রমে ক্রমে আরো সংখ্যা কমিতেছে বলিয়া বোধ হইল, তবে বুঝিতে হইবে রোগটি কালাজ্বর। অবশ্য কেবল এই সংখ্যা-গণনা হইতেই রোগ ধার্য্য হইবে না,—রোগের বাহ্যিক লক্ষণ যদি কালাজ্বরের মত হয় এবং শ্বেতকণিকার সংখ্যা-গণনাতেও তাহাই নির্দ্দেশ করে, তবেই কালাজ্বর সাব্যস্ত করা হইবে, নতুবা নয়।

উপসর্গহীন কালাজ্বর মাত্রেই শ্বেতকণিকার সংখ্যার হ্রাস হয়, এ নিয়মের ব্যতিক্রম প্রায় হয় না। ৬,০০০-এর স্থলে উহা ৩,০০০ বা ৪,০০০ হইতে প্রায়ই দেখা যায়, এবং অনেক স্থলে ৬।৭ শত পর্য্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে যদি ব্রঙ্কাইটিস্ বা নিউমোনিয়ার মত কোনো উপসর্গ থাকে তবে ইহার প্রত্যাশা করা উচিত নয়।

তবে শ্বেতকণিকাগুলিমাত্র গণনা করিলেই রক্তের মধ্যে উহাদের সংখ্যাহ্রাস ধার্য্য করা যায় না, শ্বেতকণিকার সহিত লোহিতকণিকারও গণনা করা আবশ্যক এবং পরস্পরের মধ্যে কি অনুপাত (ratio) বর্ত্তমান তাহাও হিসাব করিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ কোনোরূপ রক্তশূন্যতা ঘটিলে দুইপ্রকার কণিকাই একযোগে কমিয়া যায়, সুতরাং একপ্রকার মাত্র কণিকার গণনায় বিচারের ভ্রান্তি ঘটিতে পারে। স্বাভাবিক রক্তে প্রতি বর্গ-মিলিমিটারে শ্বেত কণিকার সংখ্যা গড়ে ৬,০০০ এবং লোহিত কণিকার সংখ্যা গড়ে ৬,০০০,০০০ (ষাট লক্ষ)। সুতরাং এখানে শ্বেতকণিকার সহিত লোহিত কণিকার অনুপাত ১ : ১০০০,—অর্থাৎ প্রতি সহস্র লোহিত কণিকার মধ্যে একটি শ্বেতকণিকা। কিন্তু কালাজ্বরে শ্বেতকণিকার সংখ্যা যত কমিতে থাকে লোহিতকণিকার সংখ্যা তত কমে না, অতএব সে স্থলে

লোহিতকণিকার সহিত শ্বেতকণিকার অনুপাত হইয়া যায় ১ : ১৫০০ হইতে ১ : ২০০০,—বা তাহারও কম। এই অনুপাতের অঙ্ক কালাজ্বর চিনিবার এক বিশেষ সঙ্কেত। রজার্স, ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য সকলেই এই কথা বলেন যে কালাজ্বরের মত লক্ষণযুক্ত কোনো জ্বরে যদি দেখা যায় যে শ্বেতকণিকার অনুপাত লোহিতকণিকার তুলনায় ১ : ১৫০০ বা তাহারও নিম্নে গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রোগটি নিশ্চয় কালাজ্বর।

চারিপ্রকার শ্বেতকণিকার যে তুলনামূলক সংখ্যা-পার্থক্য (differential count of leucocytes) স্বাভাবিক অনুপাতে থাকে, কালাজ্বর হইলে তাহারও পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তাহা হইতেও কালাজ্বরের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। আমরা জানি যে শ্বেতকণিকাগুলির মধ্যে পলিনিউক্লিয়ার জাতীয় (polymorphonuclear) কণিকার সংখ্যাই স্বভাবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং কোনো সংক্রামক ব্যাধি হইলে তাহা আরও বাড়িয়া যায়; কিন্তু কালাজ্বরে ইহারই সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়। উহার পরিবর্ত্তে লিম্ফোসাইট (Lymphocytes) ও লার্জমনোনিউক্লিয়ার (Large mononuclears) দুইয়েরই সংখ্যা অল্পবিস্তর বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কালাজ্বরে পলিনিউক্লিয়ারের সংখ্যা যত, লিম্ফোসাইট ও লার্জমনোনিউক্লিয়ারের সংখ্যা একযোগে তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে; সুস্থ অবস্থায় ইহা কখনই হয় না। এরূপ বৈচিত্র্য কেবল কালাজ্বর এবং কখনো কখনো টাইফয়েড, ডেঙ্গু প্রভৃতি দুই-একটি রোগ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। স্বাভাবিক গণনার সহিত কালাজ্বরের গণনার পার্থক্য কতকটা এইরূপ হইবে :—

	সুস্থ অবস্থায়		কালাজ্বরে
পলিনিউক্লিয়ার—	৬০%	—	৩৫%
লিম্ফোসাইট—	৩৫%	—	৫০%
লার্জমনোনিউক্লিয়ার—	৩%	—	১৫%
ইওসিনোফিল্—	২%	—	০%

(কালাজ্বরে আরো একটি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় এই যে যাহাদের পূর্ব্ব হইতে ইওসিনোফিলের কিছু বৃদ্ধি থাকে, কালাজ্বর হইলে উহার সংখ্যাও অত্যন্ত কমিয়া যায়। আবার চিকিৎসার দ্বারা যখন রোগ আরোগ্য হইতে থাকে তখন সঙ্গে সঙ্গে ইওসিনোফিলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।)

অতএব যেখানে কালাজ্বরের সন্দেহ হইতেছে সেখানে শ্বেতকণিকার মোট গণনা (total count) কত,—লোহিতকণিকার গণনার সহিত উহার অনুপাত (ratio) কত,—এবং চারিপ্রকার শ্বেতকণিকার মধ্যে কোনটি শতকরা কত অনুপাতে আছে (differential count), সমস্ত একত্রে বিচার করিলে রোগটি কালাজ্বর কিনা অধিকাংশ স্থলেই বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য কেবল মাত্র এই পরীক্ষার উপরই একান্ত নির্ভর করা উচিত নয়। কালাজ্বরের অন্যান্য পরীক্ষাগুলিও তৎসঙ্গে করিয়া দেখা আবশ্যক।

(২) অ্যাল্ডিহাইড্ পরীক্ষা (Aldehyde test)—

এই পরীক্ষা নেপিয়ার (Napier) আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা অতি সহজে করা যায়। ইহার জন্য রোগীর রক্তের মধ্য হইতে কিছু পরিষ্কার সিরাম (serum) পৃথক করিয়া লওয়া প্রয়োজন। রোগীর শিরা হইতে ৪।৫ সি.সি. (৬০।৭০ ফোঁটা) রক্ত, বিশুদ্ধ ও শুষ্ক পিচ্কারীর দ্বারা টানিয়া লইয়া, উহা একটি পরিষ্কার শুষ্ক কাচের টিউবের মধ্যে ঢালিয়া, টিউবটি কিছুক্ষণের জন্য ঢালু ভাবে কাৎ করিয়া কোথাও ঠেসাইয়া রাখিতে হয়। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইভাবে রাখিলেই রক্তটি ঐরূপ ঢালু অবস্থায় টিউবের গায়ে জমাট বাঁধিয়া যায়। এখন টিউবটি সম্পূর্ণ খাড়া করিয়া আরো এক ঘণ্টা অবধি কোথাও রাখিতে হয়; তাহাতে রক্ত-মধ্যস্থ সিরামটি জমাট-রক্তের গা বাহিয়া গড়াইয়া ধীরে ধীরে টিউবের তলদেশে আসিয়া জমা হয়। অতঃপর ঐ টিউবটি অন্য একটি পরিষ্কার টিউবের মুখে সাবধানে উবুড় করিয়া ধরিলেই সঞ্চিত সিরামটুকু তন্মধ্যে চলিয়া আসে। সাবধানের সহিত ইহা করিলে এবং অযথা নাড়াচাড়া না করিলে সিরামটুকু স্বচ্ছ ভাবেই পাওয়া যায়। পরীক্ষার জন্য মাত্র ১৫ ফোঁটা বা ১ সি. সি. সিরাম হইলেই যথেষ্ট, তাহার অধিক আবশ্যক নাই।

অতঃপর উক্ত ১ সি. সি. সিরামের মধ্যে এক ফোঁটা ফর্ম্মালীন্

(Formaline, 30 %) দিয়া টিউবটি একবার ঝাঁকিয়া কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। যদি রোগটি প্রকৃত কালাজ্বর হয়, তবে ৫।১০ মিনিটের মধ্যেই দেখা যাইবে যে সিরামটি আর পূর্ব্বের মত তরল নাই, টিউবের তলায়

নেপিয়ার (Napier)

উহা শক্ত হইয়া (jelly-like) জমিয়া গিয়াছে, এবং উহার স্বচ্ছতা নষ্ট হইয়া একরূপ অস্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে,—অর্দ্ধ-সিদ্ধ ডিমের উপরের খোলা ছাড়াইয়া ফেলিলে তাহা যেমন সাদা ও জমাট দেখিতে হয়, অনেকটা সেইরূপ।

ফর্ম্মালীন মিশাইবার পর হইতে কতক্ষণের মধ্যে যে সিরামটি ঐরূপে জমিয়া সাদা হইয়া উঠিবে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই, তাহা নির্ভর করে রোগের নূতনত্ব বা পুরাতনত্বের উপর; অর্থাৎ রোগ যত নূতন হইবে এই চিহ্ন প্রকাশ পাইতে তত বিলম্ব হইবে, এবং রোগ যত পুরাতন হইবে ইহা তত শীঘ্র প্রকাশ পাইবে। রোগটি যদি ৫।৬ মাসের বা ততোধিক পুরাতন হয়, তবে ফর্ম্মালীন দিবামাত্র দেখিতে দেখিতে ২।৪ মিনিটের মধ্যে

উহা কঠিন হইয়া জমিয়া একেবারে দুধের মত সাদা হইয়া যাইবে, টিউব উবুড় করিয়া ঝাঁকিতে থাকিলেও উহা গড়াইয়া পড়িবে না। যদি ৩।৪ মাসের রোগ হয়, তবে এইরূপ অবস্থা ঘটিতে অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগিতে পারে। যদি দুই মাসের অধিককালের রোগ না হয়, তবে পরীক্ষায় এই ফল প্রকাশ পাইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্তও সময় লাগিতে পারে; কিন্তু দুই মাসের অপেক্ষা কম দিনের রোগ হইলে এ চিহ্ন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সেইজন্য এই পরীক্ষায় ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহার পর মতামত ব্যক্ত করা উচিত, এবং পরীক্ষার ফল কতক্ষণের মধ্যে দেখা দিয়াছে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত, কারণ ইহার উপরও রোগ বিচার অনেকটা নির্ভর করে।

এই পরীক্ষাতে কোনো বিশিষ্ট সরঞ্জামাদির আবশ্যক নাই, ১ সি. সি. সিরাম ও ১ ফোঁটা ফর্ম্মালীন লইয়া ইহা সকলের দ্বারাই করা সম্ভব; কিন্তু ইহার কতকগুলি দোষ আছে। প্রথমতঃ, রোগের প্রথম অবস্থায় এ পরীক্ষার কোনোই মূল্য নাই; কারণ অন্ততঃ দুইমাস কাল রোগভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীর রক্ত এই পরীক্ষার পক্ষে উপযোগী হয় না। দ্বিতীয়তঃ, উহার ফলাফল চিনিয়া লইতেও অনেকের ভ্রান্তি জন্মায়। বহু রোগের সিরামেই ফর্ম্মালীন সহযোগে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কোন বিশেষ চিহ্নটি দেখিয়া তাহা "কালাজ্বর" (Positive) বলিব, এবং সেইটির অভাব দেখিলে উহা "কালাজ্বর নয়" (Negative) বলিব,—এ সম্বন্ধে অনেকের স্পষ্ট ধারণা থাকে না, ফলে মতভেদ প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। যেগুলি ৫।৬ মাসের পুরাতন কালাজ্বর তাহাতে মতভেদের সম্ভাবনা নাই, কারণ ২।৪ মিনিটের মধ্যে তাহার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পায়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত নূতন কালাজ্বরে ইহাতে দ্বিধা উপস্থিত হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে জানিয়া রাখা দরকার যে কালাজ্বরের সিরাম ফর্ম্মালীনের সংস্পর্শে কেবল জমিয়া গিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, জমিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা অস্বচ্ছ হইয়া দুধের মত বা ডিমের মত স্পষ্ট সাদা রং (opaque and white) ধরিবে। যদি এই বিশিষ্ট সাদা-রংটুকু না দেখা যায় এবং সিরামটি কেবল স্বচ্ছ হইয়া জমিয়া থাকে, তবে রোগটি কালাজ্বর নয়।

অবশ্য সাদা রংএরও নানারূপ তারতম্য আছে, এবং কতক্ষণের মধ্যে সিরাম অস্বচ্ছ ও সাদা হইতে দেখা গেল তাহাও বুঝিয়া দেখিবার আবশ্যকতা আছে। অনেকগুলি পুরাতন রোগে,—যেমন পুরাতন ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা,
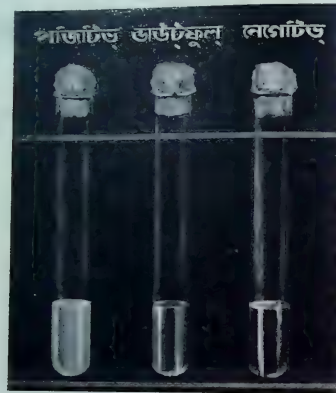
অ্যাল্‌ডিহাইড্‌ পরীক্ষার চিহ্ন। প্রথমটিতে কালাজরের স্পষ্ট চিহ্ন (Positive) রহিয়াছে, দ্বিতীয়টিতে অস্পষ্টচিহ্ন (Doubtful) মাত্র আছে, এবং তৃতীয়টিতে এই রোগের কোনো চিহ্ন নাই (Negative)।

এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌, রক্তশূন্যতা প্রভৃতিতে—অ্যাল্‌ডিহাইড্‌ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে সিরাম তাহাতেও বেশ জমাট বাঁধে এবং কখনও কখনও তাহাতে ঈষৎ সাদা আভাও দেখা যায়; বিশেষতঃ পুরাতন ম্যালেরিয়াতে ইহা প্রায়ই হয়। অতএব যেখানে রোগটি পুরাতন ম্যালেরিয়া কি কালাজর তাহা চেনা যাইতেছে না, সেখানেই এইরূপ চিহ্ন লইয়া পরীক্ষকের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ এই দুই রোগের সীমান্ত স্থলেই (border-line cases) সকলের চেয়ে অধিক ভ্রান্তি ঘটে। এখানে সিরামটি জমাট বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে অল্প একটু সাদা আভা দেখিলেই তাহাকে কালাজর বলা চলিবে না,

ইহা ঘটিতে কতক্ষণ সময় লাগিল তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। কালাজর অধিক দিনের হইলে এই চিহ্ন অতি সত্বর প্রকাশ পাওয়ার কথা। যেখানে রোগী ৩।৪ মাসের অধিক কাল ভুগিতেছে, সেখানে ২।৪ মিনিটে না হউক, অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে উহা নিশ্চয় শক্ত হইয়া দুধের মত দেখিতে হইবে, তবেই উহা কালাজর বলা চলিবে। ইহাই কালাজরের সুস্পষ্ট চিহ্ন (strongly positive), এবং তিন মাসের অধিক কালের কালাজরে ইহা নিশ্চয় থাকা উচিত। কিন্তু যদি দেখা গেল যে রোগী ৫।৬ মাস যাবৎ জরে ভুগিতেছে, অথচ সিরামটি জমিয়া ঈষৎ সাদা হইতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগিল, তবে এই অস্পষ্ট (weakly positive) চিহ্ন বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও উহা নিশ্চয় কালাজর নয়। অপরপক্ষে এইরূপ অস্পষ্ট চিহ্নই যদি এক মাসের বা দেড় মাসের জরে দেখা যায়, তখন আবার উহাতেই তাহাকে কালাজর বলা যাইবে। অতএব এই পরীক্ষার "স্পষ্ট চিহ্ন" অভ্রান্ত হইলেও "অস্পষ্ট চিহ্নের" কোনো নিশ্চয়তা নাই, রোগের ভোগকাল ও লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া ইহার মূল্যের বিচার করিতে হইবে।

এই সকল কারণে কেহ কেহ বলেন এই পরীক্ষার উপর বিশেষ নির্ভর করা যায় না। তাঁহারা বলেন কালাজর ব্যতীত অন্যান্য রোগে যখন ইহার কিছুমাত্র চিহ্নও পাওয়া যায় তখন ভুল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা, এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া যে রোগ কালাজর নয় তাহারও কালাজরের মত চিকিৎসা করায় রোগীর ক্ষতি হয়। এমন ভুল হইতে সত্যই অনেক দেখা গিয়াছে। সেই জন্য কোনো কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া থাকেন যে এই পরীক্ষা প্রচলিত হওয়াতে আমাদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক হইয়াছে। এই পরীক্ষার ফল দেখিয়া এখন আমরা চোখ বুজিয়া কালাজরের চিকিৎসা করি এবং অনেক সময় তাহাতে ঠকিতে হয়। এ কথা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও ইহাতে পরীক্ষার কোনো দোষ নাই, উহার অর্থ বুঝিবার দোষে এইরূপ ভ্রান্তি ঘটে। যথোচিত ভাবে অর্থ করিতে জানিলে ইহার উপর নিশ্চয় নির্ভর করা যায়। কয়েকটি কথা এ স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক :—(১) রোগের ভোগ অন্ততঃ ২।৩ মাস পূর্ণ না হইলে এ পরীক্ষার কোনো সার্থকতা নাই। (২)

সিরামের সহিত ফর্ম্মালীন মিলাইবার আধ-ঘণ্টার মধ্যে যদি উহা দুধের মত সাদা হইয়া জমাট বাঁধে (strongly positive) তবে রোগটি নিশ্চয় কালাজ্বর। (৩) যদি সম্পূর্ণ সাদা রং না ধরে, এবং অস্পষ্ট-চিহ্ন (weakly positive) বা সাদার আভাস মাত্র দেখা যায়, তখন নির্ব্বিচারে ইহার উপর নির্ভর করা চলিবে না, অন্যান্য পরীক্ষার দ্বারা ইহার সমর্থন আবশ্যক হইবে।

চিকিৎসায় কতদূর ফল হইতেছে এ পরীক্ষার দ্বারা তাহাও কতক বুঝিতে পারা যায়। রোগ যত আরোগ্য হইতে থাকে, ইহার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেও তত বিলম্ব দেখা যাইতে থাকে। কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পরেও ছয়মাস পর্য্যন্ত ইহার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, তাহার পর আর দেখা যায় না।

(৩) গ্লোবিউলিন্ পরীক্ষা—ইহা ডাঃ ব্রহ্মচারীর আবিষ্কার। কালাজ্বর হইলে রক্তস্থ গ্লোবিউলিন্-পদার্থ বৃদ্ধি পায় এবং জলের সহিত রক্ত-সিরামের সংস্পর্শ ঘটিলেই উহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কালাজ্বর-রোগীর সিরামেই ইহা স্পষ্ট দেখা যায়, অন্য কোনো রোগে ইহা তদ্রূপ হয় না। ইহাতে প্রথমে রক্তের সিরামটিকে যথেষ্ট পাৎলা করিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ ১ ভাগ সিরামের সহিত ৯ ভাগ সেলাইন (Normal saline) মিশাইতে হয়। ইহারই কতকটা পরিমাণ একটি সরু কাচের টিউবের মধ্যে লইয়া একটি সরু পিপেটের (pipette) দ্বারা অতি ধীরে ধীরে টিউবের গা দিয়া গড়াইয়া উহার উপর কতক পরিমাণ ডিস্‌টিল্‌ড্ জল ঢালিয়া দিতে হয়। তাহাতে দেখা যায় যে সিরাম ও জলের সঙ্গমস্থানে একটি সাদা স্তর (white ring) পড়িয়াছে।

(৪) এণ্টিমনি পরীক্ষা (Chopra's Antimony test)—

ইহা কর্ণেল চোপ্‌রার আবিষ্কার। কালাজ্বর-রোগীর সিরামের সহিত ইউরিয়া ষ্টিবামিনের সলিউশন (4 % solution of Urea Stibamine in distilled water) মিশাইলে একরূপ গুঁড়া-গুঁড়া পদার্থ (flocculent precipitate) তৎক্ষণাৎ ঝরিয়া পড়িতে থাকে, ইহাই এ পরীক্ষার বিশেষ চিহ্ন। এই পরীক্ষাটি অতি সূক্ষ্ম, এবং নিখুঁৎভাবে ইহার প্রক্রিয়াগুলি করিতে হয়।

এই পরীক্ষার জন্য খুব সরু আকারের কতকগুলি টিউবের (Dryer's tube) আবশ্যক,—তাহার মাপ দৈর্ঘ্যে ২½ ইঞ্চি ও ভিতরের ব্যাস ৫ মিলিমিটার বা ⅕ ইঞ্চি হইবে,—এবং এই টিউবের উপযুক্ত কতকগুলি তদপেক্ষা সূক্ষ্ম কাচের পিপেটের (capillary pipettes) আবশ্যক।

চোপ্‌রা (Col. Chopra)

প্রথমে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে রোগীর রক্তের সিরাম পৃথক করিয়া লও। পরে একটি পরিষ্কার শিশিতে ইউরিয়া ষ্টিবামিনের ৪% সলিউশন প্রস্তুত কর (একটি ০·১ গ্র্যাম মাত্রার ইউরিয়া ষ্টিবামিনের আম্পুল ভাঙিয়া উহার-সমস্ত ঔষধটুকু একটি শিশির মধ্যে ঢালিয়া দিয়া তাহাতে ২½ সি. সি. বা ৩৮ ফোঁটা ডিস্‌টিলড্ জল মিশাইয়া দিলেই উহা ৪ % সলিউশন হইল)।

(১) এখন রোগীর সিরাম একটি পিপেটের দ্বারা অল্প পরিমাণে তুলিয়া উপরোক্ত একটি সরু টিউবের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দাও, এবং স্বতন্ত্র পিপেটের দ্বারা সম পরিমাণ ইউরিয়া ষ্টিবামিনের সলিউশন লইয়া উহার উপর ঢালিয়া দাও। টিউবটি নাড়াচাড়া না করিয়া ৫ মিনিটের জন্য কোথাও খাড়া করিয়া রাখ।

(২) আর এক স্থানে ১ ভাগ সিরামের সহিত ৯ ভাগ ডিস্‌টিল্‌ড্‌ জল মিশাইয়া সিরামটিকে দশগুণ পাৎলা করিয়া লও। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত উপায়ে এই জলমিশ্রিত সিরামও একটি স্বতন্ত্র সরু টিউবে ঢাল এবং তাহার উপরও ইউরিয়া ষ্টিবামিনের সলিউশন ঢালিয়া দাও। এই টিউবটিও উপরোক্ত টিউবের পাশে পাঁচ মিনিটের জন্য রাখিয়া দাও।

পাঁচ মিনিট পরে (১) ও (২)-প্রক্রিয়ার টিউব দুইটি তুলিয়া আলোর দিকে ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখ উহার মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি সিরামটি কালাজ্বরের হয় তবে দুই টিউবের মধ্যে দুই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে। যে (১)-টিউবে 'অমিশ্র' (undiluted) সিরামের সহিত ইউরিয়া ষ্টিবামিনের সংযোগ ঘটিয়াছে, উহাতে পরস্পরের সংযোগস্থলে দেখা যাইবে যেন কতকগুলি ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা সূতা একত্রে জমিয়া শুভ্র জমাট-তুলার মত একটি স্বতন্ত্র পদার্থের (a solid plug of coagulum) সৃষ্টি হইয়াছে। আর যে (২)-টিউবে 'জলমিশ্রিত' (diluted) সিরাম লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যাইবে ইউরিয়া ষ্টিবামিনের সলিউশন উহা অপেক্ষা ভারী বলিয়া তাহা তলায় চলিয়া গিয়াছে ও সিরামটি উপরে উঠিয়াছে,—আর ঐ দুইয়ের সংমিশ্রণে টিউবের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা গুঁড়া (coarse white flocculation) উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছে। রোগটি যদি কালাজ্বর হয়, তবে দুই টিউবে এই দুইপ্রকার চিহ্ন পাঁচ মিনিট হইতে দশ মিনিটের মধ্যেই দেখা দিবে। অতএব এই প্রক্রিয়ার পর পাঁচ মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া, তখন হইতে পরবর্ত্তী পাঁচ মিনিট কাল পর্য্যন্ত টিউবগুলি লইয়া বার বার দেখিতে হইবে উহাতে উপরোক্ত পরিবর্ত্তন সকল দেখা যাইতেছে কিনা। দশ মিনিট অতিক্রম হইয়া গেলে এ পরীক্ষার আর কোনো মূল্য নাই,—ঐ সকল চিহ্ন যদি

দশ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত না হইয়া উহার পরে হয়, তথাপি তাহাকে কালাজ্বর বলা চলিবে না।
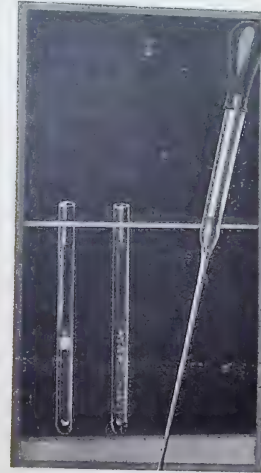
এন্টিমনি পরীক্ষার সাফল্যের চিহ্ন (পাশে একটি পিপেট্‌ রহিয়াছে)

এই পরীক্ষা অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং সাবধানতার সহিত ইহা করিতে হয়। কিছুমাত্র ক্রটি ঘটিলেই ইহাতে ভুল চিহ্ন প্রকাশ পাইতে পারে, সুতরাং উত্তম রূপে না শিখিয়া ইহা করা উচিত নয়। ইহাতে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করিলে পরীক্ষা নির্ভুল হইবে তাহাও জানা দরকার,—এবং কোন প্রকার চিহ্ন দেখিলে পরীক্ষার ফল "হাঁ" (positive) বলিতে হইবে, ও কিরূপ অবস্থাতে "না" (negative) বলিতে হইবে, সে সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। কয়েকবার চাক্ষুষ না দেখিলে এ ধারণা জন্মায় না।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। (১) টিউব ও পিপেট মাত্রই নিখুঁৎ ভাবে পরিষ্কার রাখা দরকার এবং প্রত্যেকবার

পরীক্ষার পরেই সেগুলি ডিস্‌টিল্‌ড্ জল দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া রাখা উচিত। পরীক্ষার পূর্ব্বেও সেগুলি পুনরায় ধুইয়া লইতে হইবে। ধুইবার জন্য ডিস্‌টিল্‌ড জল ব্যতীত অন্য জল ব্যবহার করা চলিবে না। (২) পরীক্ষার সময় যাহাতে টিউবের মধ্যে বায়ু-বুদ্‌বুদ প্রবেশ না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; সাবধানে পিপেট্ ব্যবহার করিতে জানিলেই ইহা হয় না। (৩) সিরাম ও সলিউশন অতি ধীরে ধীরে একটির উপর একটি ঢালিতে হইবে, যেন সজোরে পড়িয়া পরস্পর একত্রে মিশিয়া না যায়। (৪) সিরামটি পৃথক করিবার সময় যেন উহা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে। (৫) ইউরিয়া ষ্টিবামিনের সলিউশনটি টাটকা হওয়া প্রয়োজন, ১৫ দিনের অধিক কালের পুরাতন সলিউশন ব্যবহার করা উচিত নয়।

এই পরীক্ষার ফলাফল দেখিবার সময় আসল কালাজ্বরের চিহ্ন কাহাকে বলা যাইবে (standard of positivity), সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকার প্রয়োজন, কারণ কালাজ্বর ব্যতীত অন্য কয়েকটি রোগে ইহাতেও কিছু কিছু ভুল চিহ্ন প্রকাশ পায়। সিরাম ও সলিউশনের সংযোগ-স্থলে একটু ধোঁয়ার মত ঘোলাটে ভাব বা অল্প সাদা রিং-এর মত আভাস অনেক রোগেই হয়,—কিন্তু তাহা কালাজ্বর বলা চলিবে না। আসল কালাজ্বরে (১)-টিউবের মধ্যে শক্ত জমাট-তুলার মত পদার্থ ও (২)-টিউবের মধ্যে দানার মত সাদা গুঁড়া ঝরিয়া পড়িতে এক সঙ্গেই দেখা যাইবে। অস্পষ্টরূপ ধোঁয়াটে চিহ্ন ও কালাজ্বরের এই স্পষ্ট চিহ্নের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

'অমিশ্র' ও 'জলমিশ্রিত' সিরাম লইয়া দুই টিউবে দুইবার পরীক্ষা করার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কালাজ্বর ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি রোগে (১)-টিউবের অমিশ্র সিরামে নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন দেখা গেলেও (২)-টিউবের জলমিশ্রিত সিরামে কোনোই চিহ্ন প্রকাশ পায় না। সেই জন্য ইহার একপ্রকার মাত্র পরীক্ষার উপর কিছু নির্ভর করা যায় না,—যদি দুই প্রকার পরীক্ষাতেই চিহ্ন পাওয়া যায় তবে রোগটি কালাজ্বর। এ পরীক্ষার ফলাফল বিচার করিবার সময় (১)-টিউবের 'অমিশ্র' (undiluted) সিরামের চিহ্নের অপেক্ষা (২)-টিউবের 'জলমিশ্রিত' (diluted) সিরামের চিহ্নটির উপরই অধিক নির্ভর করা হয়। তথাপি এখানেও রোগের নূতন অথবা পুরাতন অবস্থা অনুসারে এই

পরীক্ষার দুই প্রকার বিচার আবশ্যক হয়। অর্থাৎ রোগ যদি পুরাতন হয়,—এবং দুইরূপ পরীক্ষাতেই স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে উহা কালাজ্বর; কিন্তু যদি কেবল (১)-টিউবের সিরামে চিহ্ন দেখা যায় এবং (২)-টিউবের সিরামে চিহ্ন না মেলে, তবে রোগটি কালাজ্বর নয়, উহা অন্য কিছু। আবার রোগ যদি নূতন হয়,—অর্থাৎ একমাসের অধিক পুরাতন না হয়, এবং পরীক্ষার ফল উপরোক্ত প্রকার হয়, তখন উহাকে কালাজ্বর বলিয়াই সন্দেহ করা যাইতে পারে; কারণ আসল কালাজ্বরেও (১)-টিউবের চিহ্নটি শীঘ্র প্রকাশ পায়, কিন্তু (২)-টিউবের চিহ্ন কিছু বিলম্বে আসে। পনেরো দিনের কালাজ্বরেও প্রথম চিহ্নটি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্ততঃ একমাস অতিক্রান্ত না হইলে দ্বিতীয় চিহ্ন প্রকাশ পাইতে দেখা যায় নাই। অতএব এই পরীক্ষাতেও রোগের ভোগকাল অনুসারে ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে হয়।

অ্যাল্‌ডিহাইড্-পরীক্ষা অপেক্ষা এন্টিমনি-পরীক্ষা সূক্ষ্ম ও জটিল বটে, কিন্তু ইহার দুইটি বিশেষ গুণ আছে। অল্প দিনের কালাজ্বর কেবল এই পরীক্ষাতেই ধরিতে পারা যায়, অ্যাল্‌ডিহাইড্ পরীক্ষার জন্য তিনমাস কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। রোগ ভোগের ১৫ দিন পর হইতে একমাসের মধ্যেই ইহার নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। আর অতি শীঘ্র এই পরীক্ষার চিহ্ন দেখিতে পারা যায়; দশ মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ হইয়া যায়, অ্যাল্‌ডিহাইড্ পরীক্ষার মত ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যাঁহারা এই পরীক্ষা করিতে জানেন তাঁহাদের পক্ষে কালাজ্বরের চিকিৎসা করা যে কিরূপ সহজ হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। ল্যাবরেটরি-বিহীন সুদূর পল্লীগ্রামে বসিয়াও ইহাতে এক মাসের মধ্যে কালাজ্বর ধরিতে পারা যায় এবং উহা রীতিমত চিকিৎসিত হইতে পারে। কিন্তু এই পরীক্ষার কিছু দোষও আছে। যদিও কালাজ্বর ছাড়া অন্য কোনো রোগে ইহা ভুল চিহ্ন (false positive) প্রকাশ করে না, তথাপি কালাজ্বর মাত্রেই যে ইহা সফল হইবে সে কথা জোর করিয়া বলা যায় না। রক্তের কাল্‌চার করিয়া জীবাণু পাওয়া গিয়াছে এমন নিশ্চিত কালাজ্বরেও এ পরীক্ষা কখনো কখনো বিফল হইতে দেখা গিয়াছে। আসলে এই পরীক্ষাগুলি

রোগের চিহ্নজ্ঞাপক মাত্র, স্বতরাং সন্দেহস্থলে এরূপ একটি মাত্র পরীক্ষার উপর একান্ত নির্ভর করা উচিত নয়; 'অ্যাল্‌ডিহাইড্' ও 'এন্টিমনি' দুই প্রকার পরীক্ষাই একসঙ্গে করা উচিত, এবং তাহার সহিত শ্বেতকণিকার সংখ্যাগণনার বিচার করিয়া ও রোগের লক্ষণাদি দেখিয়া সর্ব্বসমেত যে সিদ্ধান্ত হয় তাহাই ধার্য্য করিয়া লওয়া উচিত। যেখানে রোগের লক্ষণের সহিত পরীক্ষার ফল মিলিতেছে না, সেখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর পুনরায় ঐ সকল পরীক্ষা দেখা উচিত। একবারের পরীক্ষায় যে সন্দেহের মীমাংসা হয় না, দুইবারের পরীক্ষায় তাহা হইতে পারে।

(৫) **আঙুলের রক্ত হইতে** (Chopra's finger-blood test)—এন্টিমনি-পরীক্ষার আরো এক সহজ উপায় চোপ্‌রা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার জন্য শিরা হইতে রক্ত লইবার আবশ্যক নাই, আঙুলের প্রান্ত হইতে এক ফোঁটা মাত্র রক্ত লইয়া অতি সহজে ২০ মিনিটের মধ্যে ইহার ফলাফল জানিতে পারা যায়, এবং এ পরীক্ষার সাফল্যও নিতান্ত মন্দ নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন, দুইটি কাচের টিউব,—তন্মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত মোটা (লম্বায় ২ ইঞ্চি ও ভিতরের ব্যাস ¼ ইঞ্চি), এবং অপরটি তদপেক্ষা সরু (লম্বায় ২ ইঞ্চি ও ভিতরের ব্যাস ⅛ ইঞ্চি),—একটি সূক্ষ্ম পিপেট্ (capillary pipette),—একটি শিশিতে কিছু পটাসিয়ম অক্সালেট্ সলিউশন (2% solution of Pot. Oxalate in Distilled water),—আর একটি শিশিতে ইউরিয়া ষ্টিবামিন সলিউশন (4% Urea stibamine solution)। মোটা টিউবটিতে ৪ ফোঁটা (⅛ সি. সি.) অক্সালেট্ সলিউশন লও। রোগীর আঙুলের ডগা সূচে বিঁধিয়া বড় এক ফোঁটা রক্ত টিপিয়া বাহির কর। রক্তের ফোঁটাটি যাহাতে টিউবের মধ্যে প্রবেশ করে এই ভাবে আঙুলের বিদ্ধ স্থান টিউবের মুখে চাপিয়া ধরিয়া সলিউশন সমেত টিউবটি তাহার উপর উল্টাইয়া দিয়া রক্তবিন্দুর সহিত উহাকে মিশাইয়া লও। সলিউশনের মধ্যে রক্ত মিশিয়া গেলে টিউব সোজা করিয়া একস্থানে কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে দেখা যাইবে রক্তের লাল-কণিকাগুলি তলায় থিতাইয়া সিরাম-মিশ্রিত সলিউশনটি উপরে পরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে। ঐ পরিষ্কার অংশটুকু পিপেটের দ্বারা তুলিয়া লইয়া সরু টিউবের অর্দ্ধাংশ

পর্য্যন্ত উহা ভরিয়া দাও, এবং পিপেট্‌টি উত্তমরূপে ডিস্‌টিল্‌ড্ জলে ধুইয়া তদ্দ্বারা এবার ইউরিয়া ষ্টিবামিন সলিউশন লইয়া সরু টিউবের বাকী অর্দ্ধাংশ ভরিয়া দাও। অতঃপর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর। রোগটি যদি কালাজ্বর হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে দানা-দানা সাদা গুঁড়ায় (coarse flocculent precipitate) টিউবের অভ্যন্তর স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে কেবল ধোঁয়ার মত চিহ্ন থাকিলে চলিবে না, স্পষ্ট দানার মত গুঁড়া থাকা চাই, নতুবা উহা কালাজ্বর নয়। পাঁচ মিনিট হইতে দশ মিনিটের মধ্যে যদি ঐরূপ গুঁড়া ঝরিতে দেখা যায় তবে রোগটি নিশ্চয় কালাজ্বর। এই পরীক্ষা অতি সহজ এবং যে কোনো চিকিৎসকই ইহা করিতে পারিবেন। যাহারা শিরা হইতে রক্ত দিতে অস্বীকৃত হয় তাহাদের পক্ষে, এবং বিশেষ করিয়া ছোট শিশুদের পক্ষে এই পরীক্ষা অতি উত্তম। ইহার সাফল্যও প্রায় উপরোক্ত এন্টিমনি পরীক্ষার অনুরূপ। অ্যাল্‌ডিহাইড ও এন্টিমনি পরীক্ষায় শতকরা ৮৫ হইতে ৯৫টি কালাজ্বরে সাফল্য পাওয়া যায়, আর এই পরীক্ষায় শতকরা ৮০ হইতে ৮৬-টিতে সাফল্য পাওয়া যায়।

কালাজ্বরের প্যাথলজি
(Pathology)

কালাজ্বর হইলে শরীরের অভ্যন্তরে কিরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তাহা ঐ রোগে মৃত বহু মনুষ্যের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া জানা গিয়াছে, এবং কৃত্রিম উপায়েও অন্যান্য জন্তুর শরীরে রোগ সংক্রামিত করিয়া তৎপরে জীবন্ত অবস্থাতেই উহাদের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। এই দুই উপায়ে যে সকল তথ্য জানা গিয়াছে তাহাই এখানে বিবৃত হইল।

কালাজ্বর জীবদেহের তাবৎ রক্তশিরাসমূহের কোষগুলিরই বিশিষ্ট ব্যাধি—(essentially an infection of the vascular endothelium)। এই রোগের জীবাণু কেবল এই এণ্ডোথিলিয়ম্-জাতীয় কোষগুলি ছাড়া অন্য কোথাও অবস্থান করে না। শরীরের মধ্যে যেখানে যত এণ্ডোথিলিয়ম্-

কোষ আছে, এবং reticulo-endothelial system বলিতে যে জৈবকোষ সমূহকে বুঝায় (রক্তমধ্যস্থ শ্বেতকণিকাগুলি সমেত), তাহার সমস্তই এই জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। অতএব ইহা শরীরের কোনো স্থানীয় অংশ-বিশেষের পীড়া নয়। শরীরের সর্ব্বত্রই এই সকল কোষ আছে, এবং সর্ব্বত্রই এই রোগ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অতএব ইহার দ্বারা একপ্রকার সর্ব্বাঙ্গীন ব্যাধি (generalised infection) হয়, এ কথা বলা যাইতে পারে। তবে প্লীহা, যকৃৎ, ও অস্থিমজ্জার মধ্যে ঐ জাতীয় কোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকায় ঐ সকল অংশেই উক্ত জীবাণুর প্রাচুর্য্য ঘটে। কালাজ্বরে ঐ সকল যন্ত্রের প্রায় প্রত্যেক কোষের মধ্যে এই জীবাণু লক্ষ্য করা যায়।

প্লীহা—কালাজ্বরের প্লীহা আকারে খুব বৃহৎ হয় কিন্তু ইহার প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। রোগ অধিক পুরাতন না হইলে প্লীহা স্বাভাবিকমত নরম ও রক্তবর্ণ থাকে। কিন্তু পুরাতন অবস্থায় প্লীহা কঠিন হইয়া হইয়া যায় এবং উহার আবরণটিও কঠিন হয়। প্লীহার কোষগুলি অধিকাংশই লিশ্ম্যানিয়াতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এই সকল কোষ ফুলিয়া এমন বিকৃতি প্রাপ্ত হয় যে দেখিলে মনে হয় এখনই বুঝি ফাটিয়া যাইবে। প্লীহার উপরকার আবরণেও কখনো কখনো প্রদাহ চিহ্ন (perisplenitis) দেখা যায়।

যকৃৎ—যকৃতের নানারূপ বিকৃতি ঘটে। ইহার উপরকার আবরণে স্থানে স্থানে প্রদাহের চিহ্ন দেখা যায়। আকারে ইহা বৃহৎ এবং অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, আঙুল দিয়া টিপিলে আঙুল বসে না। মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ইহার যে-কোনো অংশ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তন্মধ্যস্থ এণ্ডোথিলিয়ম কোষগুলি জীবাণুতে পরিপূর্ণ।

অস্থিমজ্জা—অস্থিমজ্জার মধ্যেও এই অবস্থা। কালাজ্বরে মজ্জাগুলি কচি শিশুর মজ্জার মত ফ্যাকাশে হইয়া যায়। মজ্জার ভিতর যে সকল এণ্ডোথিলিয়ম কোষ থাকে, এবং যে সকল শ্বেতকণিকা তথায় জন্মলাভ করে, প্রায় তাহার সমস্ত গুলির মধ্যেই জীবাণু দেখা যায়।

অন্ত্র—অন্ত্রগুলির মধ্যেও প্রদাহের চিহ্ন থাকে এবং স্থানে স্থানে ঘা দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিনের পুরাতন রোগ হইলে বৃহদান্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘায়ে পূর্ণ হইয়া যায় এবং সেইজন্যই প্রায় আমাশা ও উদরাময়ের

লক্ষণ দেখা দেয়। এই সকল ঘায়ের চতুষ্পার্শে রক্তশিরাগুলিতে যে সকল এণ্ডোথিলিয়ম্ কোষ থাকে, এবং ঘায়ের মধ্যেও যে সকল বৃহৎ কোষ (macrophages) থাকে, তাহাতে বহু জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়।

কিড্‌নি—এই যন্ত্রও কখনো কখনো আক্রান্ত হয় এবং উহাতে প্রদাহ (nephritis) ঘটিতে দেখা যায়। এখানকার রক্তশিরার কোষ মধ্যেও জীবাণু পাওয়া যায়। শর্ট (Shortt) প্রস্রাব কাল্‌চার করিয়াও তন্মধ্য হইতে কালাজ্বরের জীবাণু বাহির করিয়াছেন। কালাজ্বরের প্রস্রাবে প্রায়ই ইউরোবিলিন্ (urobilin) পাওয়া যায়, ইহাও জ্ঞাতব্য বিষয়।

চর্ম্মাদি—লিম্ফ্যাটিক্ গ্রন্থির মধ্যেও কখনো কখনো জীবাণু দেখা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চর্ম্মস্থ অতি সূক্ষ্ম রক্তশিরার এণ্ডোথিলিয়মের মধ্যেও জীবাণু প্রবেশ করে। কালাজ্বরে যে সকল চর্ম্মক্ষত হয় তাহার আশেপাশে অনুসন্ধান করিলে জীবাণু পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কালাজ্বর আরোগ্য হইবার পর যাহাদের শরীরে লিশ্ম্যানয়েড্ নামক গুটি বাহির হয় (dermal lieshmanoids), তাহার মধ্যে বহু কালাজ্বর-জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্ত—পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে কালাজ্বরে রক্তের ক্ষারীয় গুণ (alkalinity of blood) কমিয়া যায়। রক্তের ক্যাল্‌সিয়মের মাত্রাও (calcium content) ইহাতে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। রক্তের ক্যাল্‌সিয়মের স্বাভাবিক মাত্রা ১০·২ হইতে ১০·৪ মিলিগ্রাম (10·2 to 10·4 mgrms. per 100 c. c. of serum)। কালাজ্বরে উহার মাত্রা কমিয়া ৯ হইতে ৮ মিলিগ্রাম পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। রক্তের শর্করার অংশও (blood sugar) ইহাতে কমিয়া প্রায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি হইয়া যায়।

চিকিৎসা

চিকিৎসা আবিষ্কারের ইতিহাস

যতদিন পর্য্যন্ত কালাজ্বরের জীবাণুর আবিষ্কার না হইয়াছে ততদিন পর্য্যন্ত ইহার চিকিৎসারও কোনোরূপ বিশিষ্ট সূত্র ধরিতে পারা যায় নাই। তৎপরে অনেকে অনেকরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং নানারূপ ভাবে ইহার চিকিৎসা করিয়াছেন। চিকিৎসা আবিষ্কারের সেই সকল ইতিহাস বর্ত্তমান যুগের ছাত্রের পক্ষে কৌতূহলপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই।

প্রথমে ম্যালেরিয়া বিবেচনায় এই রোগে কুইনিনেরই প্রয়োগ করা হইত। তাহাতে ফল না হওয়ায় আর্সেনিক লইয়াও কিছুকাল নানারূপ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আর্সেনিক হইতে প্রস্তুত এটক্সিল্ (Atoxyl) নামক ঔষধ আফ্রিকার স্লিপিং-সিক্‌নেসে উপকার দেখাইতেছে শুনিয়া প্রথমে ম্যান্‌সন্ প্রভৃতি অনেকে ইহা কালাজ্বরে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহা তেমন সন্তোষজনক না হওয়াতে পরে অনেকে গ্যালিল্ (Galyl) ব্যবহার করিলেন, অনেকে নিওস্যালভারসন্ (Neo-salvarsan) ব্যবহার করিলেন, কিন্তু তাহাও তেমন সন্তোষজনক দেখা গেল না।

অতঃপর আর্সেনিক ব্যতীত অন্যান্য ঔষধও প্রয়োগ করিয়া দেখা হইয়াছে। রবার্টসের মত ছিল যে নার্কোটিন্ (Narcotin) শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়াইয়া দেয়, সুতরাং তাহাও ইন্‌জেকশন দেওয়া হইয়াছে, এবং বার্বেরিন্ (Berberine sulph.) পুরাতন প্লীহাজ্বরের ভাল ঔষধ বলিয়া তাহাও ইন্‌জেকশন দেওয়া হইয়াছে। দেখা গেল ইহার কোনোটিই ফলপ্রদ নয়।

আমাদের দেশে বহু পূরাকাল হইতে পুরাতন প্লীহা-রোগে **"গুল্ বসানোর"** প্রথা ছিল, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহাকে "অগ্নিকর্ম্ম" বলা হইত। ইহাতে শরীরের কোনো বিশিষ্ট স্থানে জলন্ত লোহার ছেঁকা দিয়া কৃত্রিম ঘা করিয়া তাহার উপর একখণ্ড ছোট কাঠের টুকরা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষতটিকে বহুকাল স্থায়ী করিয়া রাখা হইত। কোথাও কোথাও প্লীহার উপর রাংচিতার আঠা দিয়া ঘা করিয়া তাহার উপর কাঠ-কয়লা বাঁধিয়া রাখা হইত। কোথাও বা প্লীহার উপরকার চামড়া

বহুস্থানে চিরিয়া দেওয়া হইত, অথবা উত্তপ্ত লোহার দ্বারা প্লীহা ও যকৃতের উপর দাগিয়া দেওয়া হইত। কোথাও বা হাতের অথবা পায়ের চামড়া বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে তাগা পরাইয়া দেওয়া হইত। এই সকল প্রথা এখনও পল্লীগ্রামে কোথাও কোথাও প্রচলিত দেখা যায় এবং লোকে বলে পুরাতন প্লীহা কিছুতে আরোগ্য না হইলে ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এই প্রকার চিকিৎসার গুণ এই যে ইহাতে একটা প্রদাহের (chronic inflammation) সৃষ্টি করা হয় এবং শ্বেতকণিকার সংখ্যা তাহাতে বৃদ্ধি পায়। এইরূপ প্রথার অনুকরণেই সম্ভবতঃ মিউর (Muir) কর্ত্তৃক T. C. C. O. ইন্‌জেকশনের উদ্ভাবনা হয়। কালনা অঞ্চলে এইরূপ T. C. C. O.-র ইন্‌জেকশন দিয়া তিনি অনেক কালাজ্বর (পুরাতন ম্যালেরিয়া ?) আরোগ্য করিয়াছিলেন।

রজার্সের উদ্ভাবিত ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস্ ভ্যাক্সিনের (Sensitized Staphylococcus Vaccine) কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। এই ভ্যাক্সিনের দ্বারা তিনি শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়াইতেন, এবং কালাজ্বরে রক্তের ক্ষারীয় গুণ কমিয়া যায় বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সোডা সাইট্রেট্ ও সোডা ফস্‌ফেট্ ১ ড্রাম মাত্রায় তিনবার করিয়া খাইতে দিতেন। এন্টিমনির আবিষ্কারের পূর্ব্বে এ চিকিৎসার বিশেষ প্রচলন ছিল।

এই সকল বহুবিধ ব্যর্থ চিকিৎসার পর এন্টিমনির দিকে দৃষ্টি পড়ে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এন্টিমনিকে রসাঞ্জন বলে। এন্টিমনি হইতে প্রস্তুত একপ্রকার লবণের নাম টার্টার এমিটিক্। প্লিমার ও টম্‌সন্ (Plimmer and Thomson) প্রথমে আবিষ্কার করেন যে ইহা ট্রিপানোসোমদিগের পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত, এবং মার্টিন ও লিবোফ (Martin and Leboeuf, 1908) কর্ত্তৃক ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয় আফ্রিকার ট্রিপানোসোম্-ঘটিত স্লিপিং-সিক্‌নেস্ রোগে। অতঃপর, লিশ্‌ম্যানিয়ার সহিত ট্রিপানোসোমের সাদৃশ্য আছে বিবেচনা করিয়া, ব্রেজিলের গ্যাস্পার ভিয়ানা (Gasper Vianna, 1913) ইহা এস্‌পাণ্ডিয়া রোগে ব্যবহার করেন, ও তাহাতে বিশেষ উপকার পান। ইহার পর ক্যারোনিয়া ও ডিক্রিষ্টিনা (Caronia and Dicristina, 1915) ইটালীর শিশুদিগের কালাজ্বরে ইহা ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল পান। ইহারা ১% সলিউশন প্রস্তুত করিয়া উহা ২ সি. সি. মাত্রায় একদিন অন্তর শিরামধ্যে ইন্‌জেকশন দিতেন। ইহাদের দৃষ্টান্তে রজার্স ঐ চিকিৎসা আমাদের দেশে প্রথম প্রচলিত করেন (Rogers, 1915)। তৎপরে ব্রহ্মচারী, মিউর, নোল্‌স্,

ক্যাষ্টিলানি, ডড্‌স্‌-প্রাইস্‌, ম্যাকি, হরিনাথ ঘোষ প্রভৃতি অনেকে ইহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে টার্টার এমিটিক্‌ কিছু উগ্র দেখিয়া ইঁহারা অনেকে তৎপরিবর্ত্তে সোডা এন্টিমনি টার্ট্রেট্‌ (Sodium antimonyl tartrate) ব্যবহার

রজার্স (Sir Leonard Rogers)

করিতে থাকেন। ইঁহারা সকলেই ২% সলিউশন ব্যবহার করিতেন (১ আউন্স জলে ৯ গ্রেন পরিমাণ মিশাইয়া), এবং ১ সি. সি. হইতে ৫ সি. সি. পর্য্যন্ত মাত্রায় সপ্তাহে দুইবার করিয়া ইন্‌জেক্শন দিতেন। প্রায় আট বৎসর যাবৎ কালাজ্বরের এই চিকিৎসাই চলে।

কিন্তু শীঘ্রই সকলে লক্ষ্য করিলেন যে ইহাতেও নানারূপ দোষ-ত্রুটি আছে। দেখা গেল যে অনেকেই এই ইন্‌জেকশন সহ্য করিতে পারে না,—প্রায়ই ইন্‌জেক্শনের পর তীব্র কাসির বেগ, অথবা অত্যধিক বমন, অথবা বুকে ও গাঁঠে গাঁঠে যন্ত্রণা হইতে থাকে। বিশেষতঃ সর্দ্দিকাসি বা শোথের লক্ষণ বা পেটের দোষ থাকিলে ইহা ব্যবহার করা বিপজ্জনক হয়। আর এই চিকিৎসা বহু সময়সাপেক্ষ, ৩০।৩৫ টি ইন্‌জেকশনের দ্বারা দুই তিন মাস ব্যাপী চিকিৎসার কম ইহাতে রোগ আরোগ্য হয় না। সকলেই বুঝিলেন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধের আবশ্যক।

কিছুকাল পূর্ব্বে প্রফেসর স্মিড্‌ট্‌ (Schmidt, 1911) এন্টিমনি হইতে এক রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। দেখা গেল যে টার্টার এমিটিক্‌ তিনশক্তিবিশিষ্ট বা ট্রাইভ্যালেণ্ট্‌ (trivalent) ঔষধ, এবং ইহার রাসায়নিক সংগঠন সম্পূর্ণ নয় (not a true organic compound)। এন্টিমনি হইতে যে পঞ্চ-শক্তি বিশিষ্ট বা পেণ্টাভ্যালেণ্ট (pentavalent) রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করা যাইতে পারে (an organic stibinic acid by the action of antimony oxide on diazo compounds), স্মিড্‌ট্‌ তাহার প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন।

তখন যে উপায়ে আর্সেনিক-অ্যাসিড হইতে সোয়ামিন (Soamin) প্রস্তুত হয়, সেই উপায়ে জার্ম্মানিতে এই ষ্টিবিনিক্‌ অ্যাসিড হইতে লবণ প্রস্তুত করা হইল, তাহার নাম হইল **ষ্টিব্যাসিটিন** (Stibacetin) ও পরে ষ্টিবেনিল্‌ (Stibenyl)। কিন্তু কালাজ্বরের চিকিৎসায় ইহার দ্বারা কিছুই উপকার পাওয়া গেল না, বরং ইহা ব্যবহার করাতে বিপজ্জনক ফল হইতে লাগিল।

অতঃপর ১৯২১ সালে ব্রহ্মচারী ঐ ষ্টিবিনিক্‌ অ্যাসিড হইতে ইউরিয়া (Urea) সহযোগে অন্য এক লবণ আবিষ্কার করিলেন, তাহারই নাম **ইউরিয়া ষ্টিবামিন্‌** (Urea Stibamine)। এই প্রথম পেণ্টাভ্যালেণ্ট্‌ এণ্টিমনি ঘটিত লবণ পাওয়া গেল যাহা কালাজ্বরের পক্ষে বাস্তবিকই অব্যর্থ (Specific)। ইহার দ্বারা কতকগুলি রোগীকে আরোগ্য করিয়া ব্রহ্মচারী ১৯২২ সালে তাহার প্রথম বিবরণ প্রকাশ করেন। পরে শর্ট (Shortt) আসামে ইহা ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য উপকার পান এবং ১৯২৩ সালে তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন। কলিকাতার বিভিন্ন হাঁসপাতালেও ইহা ব্যবহার করা হয় এবং সকলেই ইহার সুখ্যাতি করেন। তখন ইউরিয়া ষ্টিবামিন অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতে থাকে এবং বাজারে বিক্রীত হইতে থাকে। বাতাস লাগিলে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহা বদ্ধ আম্পুলের মধ্যে (ampoules) স্বতন্ত্র মাত্রায় বিক্রীত হয়।

ইউরিয়া ষ্টিবামিনের মধ্যে শতকরা ৩৬·৯৫ ভাগ এণ্টিমনি আছে। টার্টার এমিটিকের দোষ এই ছিল যে উহা বিষাক্ত বলিয়া অধিক মাত্রায় দেওয়া যাইত না, অল্পমাত্রা করিয়া বহুদিন যাবৎ উহা প্রয়োগ করিতে হইত। কিন্তু ইউরিয়া ষ্টিবামিন কম বিষাক্ত বলিয়া উহা অধিক মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। গিনিপিগের শরীরে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে একটি গিনিপিগ্‌ যতখানি টার্টার এমিটিক সহ্য করিতে পারে, ইউরিয়া ষ্টিবামিন তাহার ২৩ গুণ অধিক সহ্য করিতে পারে। রোগীকে

২'৬ গ্র্যাম পরিমাণ টার্টার এমিটিক দিতে ৩০।৪০-টি ইন্‌জেকশনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু ২'৬ গ্র্যাম ইউরিয়া ষ্টিবামিন দিতে মাত্র ১২টি ইন্‌জেকশন লাগে। অধিকন্তু ইহার ফলও অতি শীঘ্র প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহাতে শীঘ্র জ্বর বন্ধ হয়, শীঘ্র প্লীহা

ব্রহ্মচারী (Sir U. N. Brahmachari)

ছোট হয় ও শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি হয়, এবং একমাসের মধ্যেই চিকিৎসা সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ব্রহ্মচারী বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। দেশে বিদেশে ইহার ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে এবং কালাজ্বরের ইতিহাসে ইহার নাম অমর হইয়া থাকিবে।

ইউরিয়া ষ্টিবামিনের পর ফন্ হেডেনের **ষ্টিবোসান** (Von Heyden 471 = Stibosan) আবিষ্কৃত হয়, এবং ১৯২৩ সালে নেপিয়ার ইহা ট্রপিক্যাল হাঁসপাতালে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পান। ইহাও ইউরিয়া ষ্টিবামিনের মত উপায়ে প্রস্তুত করা হয়, তবে ইহার রাসায়নিক সঙ্কলন ইউরিয়া ষ্টিবামিন হইতে কিছু ভিন্ন।

অতঃপর **অ্যামিনো ষ্টিবিউরিয়া** (Amino-Stiburea) আবিষ্কৃত হয়। ইহা ইউরিয়া ষ্টিবামিনের অনুকরণে কলিকাতার ইউনিয়ন ড্রাগ কোং কর্ত্তৃক প্রস্তুত, উহার সহিত অধিকন্তু কেবল গ্লুকোজ (Glucose) যোগ করা থাকে। নেপিয়ার বলেন ইহাও বিশেষ ফলপ্রদ। উক্ত কোম্পানি পরে আরো একটি ঔষধ প্রস্তুত করে, তাহার নাম **নোভো-ষ্টিবিউরিয়া** (Novo-Stiburea)। চোপ্‌রা বলেন ইহা রাসায়নিক গুণে অপরগুলি হইতে উত্তম এবং স্থায়ী।

বেঙ্গল কেমিক্যালেও এখন এই ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে, উহার নাম দেওয়া হইয়াছে ষ্টিবিউর‍্যামিন (Stiburamine)।

বিলাতের বারোজ্ ওয়েল্‌কম্ কোং-ও একটি ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাহার নাম **ষ্টিবামিন্ গ্লুকোসাইড্** (Stibamine Glucoside)। ট্রপিক্যাল হাঁসপাতালে নেপিয়ার ইহা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন।

সর্ব্বশেষে আবিষ্কৃত হইয়াছে **নিওষ্টিবোসান্** (Neostibosan = Von Heyden 693b)। নেপিয়ার এবং অন্যান্য অনেকে এখন ইহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে শতকরা ৪২ ভাগ এন্টিমনি আছে। নেপিয়ার পূর্ব্বোক্ত ঔষধগুলির সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম সংখ্যক ইন্‌জেকশনের দ্বারা চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়। সর্ব্বাপেক্ষা কম বিষাক্ত বলিয়া পূর্ব্বোক্তগুলি অপেক্ষা ইহা আরো অধিক মাত্রায় এবং আরো শীঘ্র শীঘ্র দিতে পারা যায়, এমন কি দৈনিক একটি ইন্‌জেকশন দিলেও অনিষ্ট হয় না।

এণ্টিমনির ক্রিয়া কিরূপে হয় ?

এণ্টিমনির ইন্‌জেকশন-চিকিৎসা আবিষ্কারের পূর্ব্বেও কালাজ্বর কিছু কিছু আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে, এবং এখনও দু' একটি দেখা যায়। তবে সংখ্যায় তাহা অত্যন্ত কম, শতকরা প্রায় পাঁচটি হইবে। আর এই প্রকারের চিকিৎসা প্রয়োগ করিয়া শতকরা ৯৫-টি বা তাহারও অধিক কালাজ্বর এখন আরোগ্য হইতেছে। কিন্তু রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম হইলেও

লিশ্ম্যানিয়া-জীবাণুর উপর এণ্টিমনির সাক্ষাৎ-ক্রিয়া (direct action in vitro) বিশেষ কিছুই নাই। কালাজ্বর জীবাণুর কাল্‌চারের মধ্যে ইউরিয়া ষ্টিবামিন সলিউশন প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে দশ মিনিটের মধ্যেও উহারা মরে না। অতএব ইহা যে প্রত্যক্ষভাবে জীবাণুর পক্ষে বিশেষ বিষাক্ত এ কথা বলা যায় না। তথাপি রোগীর শরীরে প্রয়োগ করিলেই দেখা যায় যে ইন্‌জেকশন দিতে দিতে রোগ আরোগ্য হইতে আরম্ভ হয়। অথচ চিকিৎসা সম্পূর্ণ হইয়া যাইবার পরেও রক্তের কাল্‌চার করিলে বা প্লীহারস পরীক্ষা করিলে কোনো কোনো স্থলে তখনও পর্য্যন্ত জীবাণু বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু কিছুদিন পরে উহারা ক্রমে আপনিই অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাতেই মনে হয় যে যদিও এই সকল ঔষধ সাক্ষাৎভাবে জীবাণুর বিনাশ করে না, তথাপি উহা শরীরের মধ্যে এমন কিছু পরিবর্ত্তন আনে যাহার দ্বারা অতঃপর শরীরের আপন ক্ষমতাতেই জীবাণুর ধ্বংস হয়। কিরূপে ইহা ঘটে সে সম্বন্ধে নানারকম মত আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়াইতে পারিলে কালাজ্বর আপনিই আরোগ্য হইতে পারে। অনেকে বলেন এণ্টিমনিও এই উপায়েই কালাজ্বর আরোগ্য করে। অ্যাক্টন ও চোপ্‌রা (Acton and Chopra) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই সকল এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধ সুস্থ জীবের উপর প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ উহার প্লীহার আয়তন বাড়িয়া ওঠে এবং দ্বিতীয়তঃ শ্বেতকণিকার সংখ্যাও বাড়ে। তাঁহারা বলেন যে ইহার দ্বারা প্লীহা ও যকৃতের কোষগুলি ফুলিয়া ওঠে, সুতরাং রোগীর শরীরে উহা প্রয়োগ করিলে ঐ সকল স্থানের অসুস্থ কোষ ফুলিয়া উঠিয়া অবশেষে ফাটিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে জীবাণুগুলি মুক্ত হইয়া পড়ে; এদিকে শ্বেতকণিকার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়াতে সেই সকল কণিকা মুক্ত জীবাণুগুলিকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত এণ্টিমনির দ্বারা প্লীহা ও যকৃতের রক্তশিরাগুলিও স্ফীত হয়, এবং তত্রত্য এণ্ডোথিলিয়াম কোষের মধ্যে খাদ্য প্রবেশ করিতে পারে না (due to diminished cell permeability), এবং খাদ্যের অভাবে জীবাণুরা বংশবৃদ্ধি করিতে না পারায় কোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমে ক্রমে মরিয়া যায়।

নেপিয়ার বলেন কালাজ্বরে রক্তের সিরামে এমন কোনো রাসায়নিক শক্তি বা পদার্থ জন্মায় যাহার সহিত এণ্টিমনি-ঘটিত ঔষধগুলির সংযোগ হইবামাত্র আরোগ্যজনক প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। এই অজ্ঞাত পদার্থ জন্মানো কিছু সময়সাপেক্ষ,—এবং অ্যাল্‌ডিহাইড ও এণ্টিমনি পরীক্ষাদির দ্বারা রক্তে যে চিহ্নগুলি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও সম্ভবতঃ এই পদার্থের উপস্থিতির জন্যই হয়। এই পদার্থ যাহাই হউক, রোগের কিছুকাল ভোগ না হইয়া গেলে উহা জন্মায় না। কেবলমাত্র রোগ ভোগের দ্বারাই উহা রক্তের মধ্যে আসে, তৎপরে ঔষধ দিলে উহা তৎসহিত যুক্ত হইয়া ক্রিয়া করে,—সম্ভবতঃ কালাজ্বর চিকিৎসার ইহাই গূঢ়তত্ত্ব। অতএব নেপিয়ারের মত এই যে কালাজ্বর হইলে প্রথমে কিছুদিন নির্ব্বিরোধে রোগের ভোগ হইতে দেওয়া উচিত। এণ্টিমনির ক্রিয়া গ্রহণের উপযুক্ত হইবার জন্য রোগীর রক্তকে কিছু সময় দিতে হইবে, নতুবা কালাজ্বরের সূত্রপাত মাত্রে এণ্টিমনি দিলে বিশেষ ফল হইবে না। সেইজন্য নেপিয়ার বলেন যে অন্ততঃ কয়েকদিন যাবৎ ভোগ না হইয়া গেলে এণ্টিমনি প্রয়োগ করা উচিত নয়।

ব্রহ্মচারী বলেন যে ট্রাইভ্যালেণ্ট্ অপেক্ষা পেণ্টাভ্যালেণ্ট্ এণ্টিমনির উপকারিতা এইজন্য অধিক যে,—ট্রাইভ্যালেণ্ট্ এণ্টিমনি শরীরে প্রবেশ করিয়া উহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটিতে বিলম্ব হয়, এবং অতি ধীরে ধীরে উহা শরীর হইতে নির্গত হইতে থাকে,—সুতরাং উহার ক্রিয়াও অল্প হয় এবং রক্তে অধিককাল সঞ্চিত হইয়া থাকাতে উহার বিষাক্ততাও অধিক হয়; কিন্তু পেণ্টাভ্যালেণ্ট্ এণ্টিমনি শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার দ্রুত বিশ্লেষণ ঘটিতে থাকে, এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার শতকরা ৩০।৪০ ভাগ বিশ্লেষিত হইয়া শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। ইহা শরীরের অভ্যন্তরে গিয়া প্রথমে পেণ্টাভ্যালেণ্ট্ অবস্থা হইতে ট্রাইভ্যালেণ্ট্ এণ্টিমনি-অক্সাইড্ রূপে পরিণত হয়,—তাহাতে এণ্টিমনির অনেকগুলি সত্তা (radicals) বিযুক্ত হইয়া যায়, এবং সেইগুলি শরীরস্থ clasmatocyte tissue নামক পদার্থের সহিত মিশিয়া stiboxyl রূপে পরিণত হয়, এবং তাহাই জীবাণুদের বিনাশ করে। এই clasmatocyte tissue

সকলের দেহে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না,—ইহা কেবলমাত্র কালাজ্বরেই reticulo-endothelial system হইতে জন্মায়। অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বিশিষ্ট পদার্থের সৃষ্টি না হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এণ্টিমনির রোগনাশক ক্রিয়া নাই।

চিকিৎসার আরম্ভ

রোগ নির্দ্ধারণ না হওয়া পর্য্যন্ত এণ্টিমনি-ঘটিত ইন্‌জেকশন দেওয়া যাইতে পারে না। সুনিশ্চিত রূপে রোগ না চিনিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে নানারূপ বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। ম্যালেরিয়ার সন্দেহ মাত্রেই যেমন "ফলেন পরিচীয়তে"-যুক্তি অনুসারে কুইনিন প্রয়োগের দ্বারা রোগ চিনিয়া লইতে (therapeutic test) কোনো বাধা নাই, এণ্টিমনি সে জাতীয় ঔষধ নয়। এক পক্ষে যেমন এই ধাতুঘটিত ঔষধ একেবারে রক্তস্রোতের মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়, অপর পক্ষে তেমনি ইহার ফলও দেখা যায় বিলম্বে। পাঁচটি ইন্‌জেকশন না দেওয়া পর্য্যন্ত ইহাতে অনেক স্থলে জ্বরই ত্যাগ হয় না, অথচ দশটি ইন্‌জেকশনেই ইহার চিকিৎসা সমাপ্ত। অতএব দুই-একটি মাত্র ইন্‌জেকশন দিয়া যে ইহার ফলাফল জানা যাইবে এরূপ সুযোগ সর্ব্বদা না ঘটাই সম্ভব। চিকিৎসা আরম্ভ করিবার সময় এই কথাগুলি স্মরণ করিতে হইবে। চিকিৎসার মধ্যপথে গিয়া যাহাতে কোনোরূপ দ্বিধায় পড়িতে না হয় সেজন্য পূর্ব্ব হইতে রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া ইন্‌জেকশন আরম্ভ করা উচিত।

এখানে নূতন-কালাজ্বর (early case) সম্বন্ধে কিছু বলিবার কথা আছে। যেখানে রক্তের কাল্‌চার হওয়া সম্ভব এবং তদ্দ্বারা রোগ জন্মিবার দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই জানিতে পারা যায় উহা কালাজ্বর, সে স্থলে হয়তো তৎক্ষণাৎ ইন্‌জেকশন আরম্ভ করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে কাল্‌চারের উপায় নাই সেখানে এরূপ আশু চিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়। কালাজ্বরের নির্দ্দিষ্ট কোনো কিছু চিহ্ন না পাওয়া পর্য্যন্ত সেখানে সত্বর ইন্‌জেকশন দিতে পারা যাইবে না।

রক্তে কালাজ্বরের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে সাধারণতঃ মাসাধিক বিলম্ব ঘটে। এস্থলে পরীক্ষার উপযুক্ত সময় আসিবার পূর্ব্বেই যদি স্পষ্ট প্রতীতি জন্মায় যে

রোগটি কালাজ্বর, তখন কি করা উচিত? অনেকেই এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হইলে কোনো জ্বরকেই কালাজ্বর মনে করা উচিত হইবে না। প্রথম হইতে উহাকে কালাজ্বর মনে হইলেও তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত সাধারণ ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হইবে এবং তাহার পর রক্ত পরীক্ষা করিয়া ইন্‌জেকশন আরম্ভ করিতে হইবে।

বিনা পরীক্ষায় কালাজ্বরের বিশিষ্ট-চিকিৎসা করা উচিত নয়। মিউর ও নেপিয়ার বলিয়াছেন—"Diagnosis on clinical grounds only is seldom, if ever, justifiable"—অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া কিছুতেই কালাজ্বর সাব্যস্ত করা উচিত নয়; ইহাতে ভ্রান্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

রোগ নির্ণয় হইয়া গেলেই এণ্টিমনি-ঘটিত ইন্‌জেকশন আরম্ভ করা যাইবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, তবে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া তেজস্কর ঔষধ-পথ্যাদির প্রয়োগের পর ইন্‌জেকশন আরম্ভ করা যাইতে পারে। এ রোগে বিশেষ তাড়াতাড়ি চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। যেখানে কালাজ্বরের সহিত কোনো সাময়িক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে আগে উহা দূর করিয়া লইয়া এবং রোগীকে কয়েকদিন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইন্‌জেকশন আরম্ভ করা যাইতে পারে। ইন্‌জেকশনগুলি যাহাতে নির্ব্বিঘ্ন হয় এবং মধ্যপথে কোনোরূপে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেই ব্যবস্থাই পূর্ব্ব হইতে করিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু রোগটি যদি বহুদিনের পুরাতন হয় এবং সেইজন্যই কোনোরূপ উপসর্গ বা দুর্ব্বলতা থাকে, সে স্থলে বিলম্ব করিয়া কিছু লাভ হয় না; সে স্থলে বরং অতি অল্প মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্‌জেকশন দেওয়াই সুযুক্তি। এখনকার পেণ্টাভ্যালেণ্ট্ ঔষধগুলির ব্যবহারে কোনো অবস্থাতেই বিশেষ আশঙ্কা নাই; সর্দ্দির লক্ষণ বা প্রস্রাবের দোষ থাকিলে ২।৪ দিন উহার জন্য উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অল্প মাত্রা হইতে ইন্‌জেকশন দিতে থাকিলে কোনো অনিষ্ট হয় না।

ঔষধ নির্ব্বাচন

ব্রহ্মচারীর ইউরিয়া ষ্টিবামিন আবিষ্কারের পূর্ব্বে কালাজ্বরের কোনো পেণ্টাভ্যালেণ্ট্ (pentavalent) ঔষধ ছিল না, সেইজন্য সকলে ট্রাইভ্যালেণ্ট্ (trivalent) ঔষধগুলিই ব্যবহার করিতেন। ইউরিয়া ষ্টিবামিনের পর আরো অনেকগুলি পেণ্টাভ্যালেণ্ট্ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সবগুলিরই গুণ ট্রাইভ্যালেণ্ট্ এণ্টিমনি অপেক্ষা অধিক; সেইজন্য ট্রাইভ্যালেণ্ট্ এণ্টিমনির পরিবর্ত্তে সকলেই এখন যে-কোনো একটি পেণ্টাভ্যালেণ্ট্ ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মচারীর **ইউরিয়া ষ্টিবামিন** ও বেয়ারের **নিওষ্টিবোসান্** (৬৯৩ বি), এই দুইটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। কেহ বলেন ইউরিয়া ষ্টিবামিন ভাল, কেহ বলেন নিওষ্টিবোসান ভাল। এই মতভেদের কোনোরূপ মীমাংসা করা কঠিন। এই দুইয়ের মধ্যে রাসায়নিক পার্থক্যও অতি সামান্য। দুই ঔষধই para-amino-phenyl stibinic acid-এর দ্বারা প্রস্তুত। উহার সহিত ইউরিয়া (urea) সংযোগ করিলে হয় ইউরিয়া ষ্টিবামিন,—এবং ইউরিয়ার পরিবর্ত্তে একপ্রকার amine সংযোগ করিলে হয় নিওষ্টিবোসান। এই দুইটির মধ্যে কোনটিকে নির্ব্বাচন করিতে হইবে তাহা চিকিৎসকের ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে।

কেহ কেহ বলেন যে ইউরিয়া ষ্টিবামিন দিয়া যে রোগীতে ফল পাওয়া যায় নাই, নিওষ্টিবোসান দিয়া তাহার উপকার হইয়াছে। কেহ কেহ আবার উল্টা কথাও বলেন। পূর্ব্বেও এরূপ দেখা যাইত যে টার্টার-এমিটিকে যাহার উপকার হয় নাই, তাহার সোডা এণ্টিমনি-টার্টের দ্বারা উপকার হইয়াছে, এবং তাহার উল্টা ফলও হইতে দেখা দিয়াছে। ইহাতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে একই ঔষধ সকলের পক্ষে সমান উপকারী না হওয়া সম্ভব, এবং যেখানে এরূপ হয় সেখানে একটির বদলে অন্যটি দিতে হইবে। অতএব দুই প্রকার ঔষধ পাওয়াতে আমাদের সুবিধাই হইয়াছে, প্রয়োজন অনুসারে দুইই ব্যবহার করা চলিবে।

ইউরিয়া ষ্টিবামিনের মাত্রা নিওষ্টিবোসান অপেক্ষা অল্প। কিন্তু

নিওষ্টিবোসানের এক সুবিধা আছে যে উহা শিরার মধ্যে না দিয়া ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন রূপেও ব্যবহার করা যাইতে পারে,—সুতরাং যাহাকে ইন্ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশন দিবার উপায় নাই সে রোগীর পক্ষে ইহা উপযুক্ত।

ইন্‌জেকশনের মাত্রা, কাল ও সীমা

(১) **ইউরিয়া ষ্টিবামিন**—ইহাতে এণ্টিমনির অংশ শতকরা ৩৬·৯৫। ইহার প্রথম মাত্রা ·০৫ গ্র্যাম, দ্বিতীয় মাত্রা ·১ গ্র্যাম, তৃতীয় মাত্রা ·১৫ গ্র্যাম, চতুর্থ মাত্রা ·২ গ্র্যাম, ও পরবর্ত্তী মাত্রাগুলি সমস্তই ·২ গ্র্যাম করিয়া। ইহার অধিক মাত্রা সাধারণতঃ দেওয়া উচিত নয়, তবে প্রয়োজন বোধ করিলে ·২৫ গ্র্যাম পর্য্যন্তও দেওয়া যাইতে পারে। ১২ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের বয়স পর্য্যন্ত ইহার অর্দ্ধমাত্রা দেওয়া যাইবে। ৫ বৎসর হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে তাহারো অর্দ্ধেক মাত্রা। ·০৫ গ্র্যাম ও ·১ গ্র্যাম এই দুই মাত্রা ১ সি. সি. ষ্টেরিলাইজ্-করা ডিস্‌টিল্‌ড্ জলে,—এবং ·১৫ গ্র্যাম ও ·২ গ্র্যাম মাত্রাগুলি ৩ সি. সি. হইতে ৪ সি. সি. পর্য্যন্ত জলে গুলিয়া দেওয়া যায়। ষ্টেরিলাইজ্-করা শীতল জলেই ইউরিয়া ষ্টিবামিন গুলিয়া লওয়া উচিত, গরম জলে ইহা মিশ্রিত করা নিষিদ্ধ। এই ইন্‌জেকশন দুই দিন অন্তরও দেওয়া যায়, একদিন অন্তরও দেওয়া যায়, যেখানে যেরূপ প্রয়োজন। সর্ব্বসমেত ১০ টি হইতে ১২ টি ইন্‌জেকশনেই চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়। সাধারণতঃ তাহার অধিক ইন্‌জেকশনের প্রয়োজন নাই। অতএব তিন সপ্তাহ হইতে এক মাসের মধ্যেই ইহার দ্বারা চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়।

(২) **নিওষ্টিবোসান**—ইহাতে এণ্টিমনির অংশ শতকরা ৪২। ইহার প্রথম মাত্রা সাধারণতঃ ·২ গ্র্যাম, পরবর্ত্তী মাত্রাগুলি প্রত্যেকটি ·৩ গ্র্যাম করিয়া। অল্পবয়স্কদের জন্য পূর্ণ মাত্রা ·২ গ্র্যাম পর্য্যন্ত। যে সকল শিশুর ওজন ১২।১৩ সেরের অধিক নয়, তাহাদের উর্দ্ধমাত্রা ·১ গ্র্যাম পর্য্যন্ত। ইহা ৫% সলিউশন করিয়া ইন্ট্রাভেনাস ইন্‌জেকশনরূপে দিতে হয়, অর্থাৎ ·২ গ্র্যাম-মাত্রা ৪ সি. সি. জলে এবং ·৩ গ্র্যাম-মাত্রা ৬ সি. সি. জলে গুলিতে হইবে। এই ইন্‌জেকশন কিছু ঘন ঘন দেওয়া যাইতে পারে,—একদিন অন্তর দেওয়াই সাধারণ নিয়ম, তবে অবস্থা বিশেষে প্রাত্যহিকও প্রয়োগ

করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সর্ব্বসমেত ৮টির অধিক ইন্‌জেকশন দিবার প্রয়োজন হয় না। অতএব ১৬ দিনে ইহার দ্বারা চিকিৎসা সম্পূর্ণ, এমন কি ৮ দিনেও চিকিৎসা শেষ করা যাইতে পারে। তবে সাধারণ পক্ষে একদিন বা দুইদিন অন্তর ইন্‌জেকশন দেওয়াই উচিত। কেবল যে-সকল রোগীকে একবার চিকিৎসা করা সত্ত্বেও রোগটি পুনরায় দেখা দিয়াছে (relapse), তাহাদের পক্ষে ঐরূপ প্রাত্যহিক ইন্‌জেকশন (intensive treatment) উপকারী হইতে পারে। এই ঔষধ ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশনের দ্বারাও দেওয়া যাইতে পারে, এবং তাহাতেও ফল একই প্রকার হয়। ইনট্রামাস্কুলার দিবার সময় জলের মাত্রা কম করিয়া দেওয়া উচিত; তখন ইহার ২৫% সলিউশন করিতে হইবে, অর্থাৎ ·২ গ্র্যাম-মাত্রা ১ সি. সি. জলে এবং ·৩ গ্র্যাম-মাত্রা ১½ সি. সি. জলে গুলিতে হইবে, কারণ এইরূপ গাঢ় সলিউশন করিলেই উহা রক্তের সহিত সম-ঘনত্ববিশিষ্ট (blood-isotonic) হইবে, এবং রোগী তাহাতে বিশেষ ব্যথা পাইবে না। নেপিয়ার বলেন, এইরূপ গাঢ় করিয়া ইন্‌জেকশন দিলে ইহাতে এমিটিন অপেক্ষাও কম ব্যথা পাওয়া যায়। এই ঔষধ অল্প জলে অনায়াসে গলিয়া যায়, সুতরাং অসুবিধা কিছু নাই। পাছার মাংসের মধ্যে এই ইন্‌জেকশন প্রয়োগ করা উচিত। কেহ কেহ বলেন যে-সকল রোগীর হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহাদের এই ঔষধ একেবারে ইন্‌ট্রাভেনাস্ না দিয়া প্রথমে দুই চারিটি ইন্‌ট্রামাস্কুলার দিয়া পরে ইন্‌ট্রাভেনাস প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশনের নিয়ম—এন্টিমনিঘটিত ঔষধের ইন্‌জেকশন খালিপেট অবস্থাতেই দেওয়া উচিত, আহারের অব্যবহিত পরে ইন্‌জেকশন দিলে বমি হওয়ার সম্ভাবনা। রোগীকে বসাইয়া এই ইন্‌জেকশন দেওয়া নিরাপদ নয়, শোয়াইয়া দেওয়া উচিত। বাহুমধ্যে যে শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায় তাহারই কোনো একটি শিরা বাছিয়া লওয়া উচিত। ইন্‌জেকশনস্থলের কিছু উপরে বাহুটি রবারের নল দিয়া একটু চাপিয়া বাঁধিলেই শিরাগুলি স্পষ্ট দাঁড়াইয়া ওঠে; তবে বাঁধিবার সময় অত্যধিক চাপ দিতে নাই। যে শিরা আঁকাবাঁকা নয় এবং সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহাতেই ইন্‌জেকশন দিতে হয়। যদি বাহুতে উপযুক্ত শিরা না পাওয়া যায় তবে কব্জির কাছে যে শিরাগুলি আছে তাহাতেও

দেওয়া যাইতে পারে। হাতের শিরা না পাওয়া গেলে পায়ের শিরাতেও ইন্‌জেকশন প্রয়োগ করা যায়। যে শিরা সুস্পষ্ট নয় তাহাতে চেষ্টা না করাই ভাল। শিরাটি বাছিয়া লইয়া উহার উপরের চামড়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। অ্যাল্‌কোহলে বা টিঞ্চার আইওডিনে তুলা ভিজাইয়া উহার দ্বারা ঘষিলেই চামড়া পরিষ্কার হইয়া যায়।

ঔষধ গুলিয়া সিরিঞ্জের মধ্যে তাহা ভরিয়া লইয়া সযত্নে উহার বায়ু-বুদ্বুদগুলি নিষ্কাশিত করিয়া দিতে হয়, যেন সূচের মুখ হইতে সিরিঞ্জের ভিতর পর্য্যন্ত কোথাও বিন্দুমাত্র বায়ু না থাকে। সূচের মুখ উপর দিকে করিয়া পিষ্টন্ ঠেলিতে ঠেলিতে যখন দেখা যাইবে মুখের কাছে পর্য্যন্ত সলিউশনটি আসিয়া পৌঁছিয়াছে,—তখন ঐ অবস্থায় পিচ্‌কারী সংলগ্ন সূচটি শিরার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। শিরার উপরের চামড়া প্রায়ই শিথিল অবস্থায় থাকে, এবং সূচ ঢুকাইতে গেলেই চামড়াটি শিরার নিকট হইতে সরিয়া যায়। এইজন্য বামহস্ত দ্বারা নীচেকার চামড়া একটু টান করিয়া ধরা উচিত, অথবা
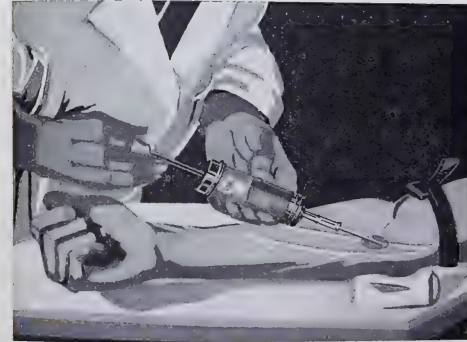
রোগীর বাহুর পিছনের অংশ বাম হাত দিয়া ধরিয়া দুই পাশ হইতে চামড়াটি টান করিয়া রাখা উচিত, তাহা হইলে বিদ্ধ করিবার সময় চামড়াটি স্থিরভাবে

থাকে। সূচটি এমন তির্য্যক্‌ভাবে চালিত করা দরকার যাহাতে সূচের মুখ শিরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তাহা শিরার অপরদিক বিদ্ধ (counter-puncture) না করে।

সূচ ঢুকিবামাত্র ইন্‌জেকশন দেওয়া উচিত নয়, আগে সিরিঞ্জের পিষ্টন্ (piston) টানিয়া দেখিতে হইবে সিরিঞ্জের মধ্যে রক্ত আসিতেছে কিনা। রক্তের পরিবর্ত্তে তখন যদি সিরিঞ্জের মধ্যে বুদ্‌বুদ হইতে দেখা যায় তবে বুঝিতে হইবে শিরার মধ্যে সূচ প্রবেশ করে নাই। তখন উহা বাহির করিয়া লইয়া পুনরায় অন্যত্র চেষ্টা করিতে হইবে। যতক্ষণ সিরিঞ্জের মধ্যে রক্ত আসিতে না দেখা যায় ততক্ষণ ইন্‌জেকশন দিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ এই ঔষধ শিরার বাহিরে একটুমাত্র পড়িলে ঐ স্থান তৎক্ষণাৎ ফুলিয়া উঠিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইবে এবং উহা পাকিয়া উঠিবারও সম্ভাবনা। এইজন্য একবারের স্থলে বরং পাঁচবার চেষ্টা করাও ভাল, কিংবা যেদিন বিঘ্ন হইবে সেদিন ইন্‌জেকশন না দেওয়াও ভাল, কিন্তু শিরার মধ্যে গিয়াছে ইহা স্থির না জানিয়া কখনই উহা প্রয়োগ করা উচিত নয়।

সিরিঞ্জের মধ্যে রক্ত আসিতে দেখা গেলেই আগে রবারের বাঁধনটি খুলিয়া দিতে হইবে। পরে ইন্‌জেকশন ধীরে ধীরে দিলে বিপদের সম্ভাবনা কম হয়। ইন্‌জেকশন শেষ হইয়া গেলে সূচ বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্ধস্থানের উপর তুলা দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়, অতঃপর কলোডিয়ন (collodion) বা টিঞ্চার বেঞ্জোইন্ কম্পাউণ্ডের দ্বারা একটু তুলা তথায় আঁটিয়া দিতে হয়।

চিকিৎসার ফল কি প্রকারে লক্ষিত হয়

এই রোগে ইন্‌জেকশন দিতে দিতেই তৎক্ষণাৎ উহার ফল প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্য চিকিৎসা আরম্ভ করিবার সময় রোগীর আত্মীয়দের স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া ভাল যে ইন্‌জেকশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত রোগটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে না, এবং সম্ভবতঃ পাঁচটি ইন্‌জেকশন না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বর বন্ধ হইবে না। আরো বলিয়া দেওয়া উচিত যে ইন্‌জেকশন নিয়মমত লওয়া দরকার, অনিয়ম ঘটিলে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। তবে ইন্‌জেকশন কয়েকটি মাত্র হইলেই রোগী ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারে। অনেক সময় দুই তিনটিতেই জ্বর ছাড়িয়া যায়, অথবা না ছাড়িলেও যথেষ্ট কমিয়া

যায়। পাঁচটি ইন্‌জেকশনের পর অধিকাংশ স্থলেই জ্বর একেবারে ত্যাগ হইয়া যায়। কাহারও কাহারও শেষ ইন্‌জেকশন পর্য্যন্ত অল্প জ্বর লাগিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ ঘটনা খুব কমই হয়। জ্বর ছাড়িবার পূর্ব্বে হইতেই রোগী সুস্থ বোধ করিতে আরম্ভ করে। প্রথম কয়েকটি ইন্‌জেকশনে অনেকের রিঅ্যাক্‌শন্ (reaction) হয়, অর্থাৎ হঠাৎ জ্বর বাড়িয়া ওঠে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহা আপনিই কমিয়া যায়। এরূপ রিঅ্যাক্‌শনে কোনো ক্ষতি নাই, তবে অধিক হইলে পরবর্ত্তী ইন্‌জেক্‌শনের মাত্রা না বাড়ানোই ভাল। এই চিকিৎসার আরম্ভ হইতেই প্লীহাটি অল্পে অল্পে কমিতে আরম্ভ করে, এবং চিকিৎসা শেষ হইলে প্লীহা প্রায় একেবারেই কমিয়া যায়। অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কাহারো কাহারো ইন্‌জেকশন দিবামাত্র প্লীহা যেন হঠাৎ একটু বাড়িয়া ওঠে এবং তাহার পরেই আবার কমিয়া যায়। কেহ কেহ ইন্‌জেকশনের পরে প্লীহার উপর ব্যথা অনুভব করিতে থাকে, তাহার কারণও এই। কাহারো কাহারো প্লীহা খুব ধীরে ধীরে কমে, এবং ইন্‌জেক্‌শন শেষ হইয়া গেলেও অনেকটা প্লীহা থাকিয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে উহা আপনিই কমিয়া যায়। তবে যদি কাহারো পুরাতন ম্যালেরিয়ার জন্য প্লীহা পূর্ব্ব হইতেই কঠিন হইয়া থাকে এবং তাহার উপরই কালাজ্বর হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে প্লীহা তত কমে না। প্লীহার সঙ্গে লিভারও কমিতে আরম্ভ করে এবং কিছুদিন পরে তাহা আর টের পাওয়া যায় না।

প্রথম কয়েকটি ইন্‌জেক্‌শনে রোগীর শরীরের কোনো উন্নতি দেখা যায় না, বরং ওজন একটু কমিয়া যায়। কিন্তু ইন্‌জেকশনের শেষের দিকে শরীরের দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। এই সময় মাথার চুলের এবং গাত্রচর্ম্মের রুক্ষতাও দূর হইয়া যায়।

এই চিকিৎসার ফলে রক্তের মধ্যেও পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। শ্বেতকণিকার সংখ্যা ইহাতে উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে এবং চিকিৎসার শেষে উহার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু অধিকই (Leucocytosis) হয়, এবং কিছু ইওসিনোফিলের বৃদ্ধিও (Eosinophilia) তখন লক্ষিত হয়।

কিন্তু যাহাদের প্রাত্যহিক ইন্‌জেকশন দিয়া (intensive treatment) ৮।১০ দিনের মধ্যে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাদের আরোগ্য-

চিহ্ন এভাবে লক্ষিত হয় না। তাহাদের হয়তো ইন্‌জেকশনগুলি শেষ হইয়া যাইবার পর হইতে আরোগ্যের প্রথম আরম্ভ হয় এবং আপনিই তাহা কালক্রমে সম্পূর্ণ হয়। যতদিন ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় ততদিন পর্য্যন্ত জ্বর হয়তো লাগিয়াই থাকে, শেষ ইন্‌জেকশনের পর জ্বর ছাড়ে। প্লীহাটিও তখন কমে না, কিন্তু পরে আপনিই ক্রমশঃ কমিয়া যায়। শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়িতেও তখন বিলম্ব হয়, চিকিৎসা-শেষের ২।৩ সপ্তাহ পরে উহা স্বাভাবিক অবস্থায় আসে। অর্থাৎ চিকিৎসা করিয়া রোগীকে ছাড়িয়া দিবার পর সে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতে থাকে এবং প্রায় একমাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠে। অতএব ৮।১০ দিনে চিকিৎসা শেষ করিয়া দিলেও রোগী সেরূপ শীঘ্র সুস্থ হয় না, বিলম্বিত চিকিৎসার মতই তাহার সুস্থ হইতে প্রায় একমাস সময় লাগিয়া যায়।

ইন্‌জেকশন কখন বন্ধ করা উচিত

চিকিৎসা সম্পূর্ণ না করিয়া রোগীকে মধ্যপথে ছাড়িয়া দিলে রিল্যাপ্স (relapse) হইবার খুবই সম্ভাবনা। এইজন্য প্রত্যেক স্থলে সম্পূর্ণ চিকিৎসাই করা উচিত। কিন্তু কিরূপে জানা যাইবে যে চিকিৎসা সম্পূর্ণ হইল? এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন নির্দ্দেশ করেন। কেহ বলেন যতক্ষণ প্লীহা পাঁজরের নীচে অন্ততঃ ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত কমিয়া না যায় এবং শ্বেতকণিকার সংখ্যা ৬০০০ পর্য্যন্ত না হয়, ততক্ষণ ইন্‌জেকশন দিতে হইবে। কেহ বলেন চিকিৎসার যে মাত্রা ধার্য্য করা আছে তাহাই পূরা করিয়া ইন্‌জেকশন বন্ধ করা উচিত, অর্থাৎ সেই হিসাবমত দিতে হইলে ইউরিয়া ষ্টিবামিন ১৪টি এবং নিওষ্টিবোসান ১১টি দেওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ এত ইন্‌জেকশনের প্রয়োজন হয় না। তবে এমন এক-একটি দুর্দ্ধর্ষ (resistant) কালাজ্বর দেখা যায় যাহাতে ইহারও অধিক ইন্‌জেকশনের প্রয়োজন হইতে পারে; বিশেষতঃ অতি পুরাতন ও পুনরাক্রান্ত (relapse) কালাজ্বরে অধিক মাত্রাই প্রয়োজন হয়। অতএব কোন রোগীর পক্ষে কতগুলি ইন্‌জেকশন আবশ্যক, চিকিৎসকই তাহা স্থির করিবেন। সেরূপ সন্দেহস্থলে দুই একটি ইন্‌জেকশন বেশী দিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু কম দেওয়া উচিত নয়। ইন্‌জেকশন বন্ধ করিবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে রোগী নিরাপদের গণ্ডীর মধ্যে

আসিয়াছে কি না। কয়েক প্রকার চিহ্নের দ্বারা তাহা বুঝা যায়,—যেমন,—প্লীহা কত বড় হইতে কতটা পর্য্যন্ত কমিয়াছে, শ্বেতকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক হইয়াছে কি না, ইত্যাদি। তবে বলা বাহুল্য যে, সম্পূর্ণ চিকিৎসাতেও সমস্ত কালাজ্বর আরোগ্য হয় না,—কয়েকটিতে ইহা সত্ত্বেও পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে তখন পুনরায় সম্পূর্ণ চিকিৎসার আবশ্যক এবং তখন মাত্রার আধিক্যেরও প্রয়োজন হয়।

ইন্‌জেকশনের বিপত্তি ও তাহার নিবারণ

ইউরিয়া ষ্টিবামিনই হউক বা নিওষ্টিবোসানই হউক, কখনও কখনও এণ্টিমনির ইন্‌জেক্‌শনে কয়েক প্রকার বিপত্তি ঘটিতে দেখা যায়। কাহারও কাহারও ইন্‌জেকশন লইবার ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে মাথা ঘোরে এবং বমি হইতে থাকে। যাহাদের এরূপ হয় তাহাদের মাত্রা কমাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাতেও যদি এরূপ কোনো লক্ষণ হয় তাহা হইলে ইন্‌জেকশন দিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একটি অ্যাড্রেনেলিন্ ইন্‌জেকশন (৫ ফোঁটা) দিয়া লইলে ইহা হইতে পারে না। এই সকল রোগীকে ইন্‌জেকশনের পর উঠিতে দেওয়া উচিত নয়, কিছুক্ষণ শোয়াইয়া রাখা প্রয়োজন।

দৈবাৎ এক একটি ইন্‌জেকশনে এক প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়, ইহার নাম Nitrioid crisis। ইহাতে ইন্‌জেকশন দিবার কয়েক মিনিটের মধ্যে রোগীর চোখমুখ হঠাৎ অত্যন্ত ফুলিয়া ওঠে, গায়ে চাকা চাকা আমবাত বাহির হইয়া পড়ে, গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসে এবং নিশ্বাস লইতে কষ্ট হইতে থাকে; নাড়ী এ সময় অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, রোগী অচৈতন্যবৎ হইয়া পড়ে, মুখের বর্ণ পাংশু হইয়া যায়, হঠাৎ বমি করিতে থাকে এবং অসাড়ে মলত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে আরম্ভ করে এবং প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

এরূপ দুর্ঘটনা প্রথম ইন্‌জেকশনের সময় দেখা যায় না, প্রায়ই ৫।৬টি ইন্‌জেকশন হইয়া গেলে ষষ্ঠ বা সপ্তম ইন্‌জেকশনে ইহা দেখা যায়। যাহারা একদিন বা দুইদিন অন্তর নিয়মিত ইন্‌জেকশন লইতে থাকে তাহাদের মধ্যে

ইহা কমই হয়। যাহারা ইন্‌জেকশন লইতে অনিয়ম করে, অর্থাৎ দুইদিনের পরিবর্ত্তে ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া ফেলে তাহাদেরই মধ্যে ইহা অধিক ঘটে। সৌভাগ্যের বিষয় ইহাতে কাহারো মৃত্যু হয় না, সকলেই সুস্থ হইয়া ওঠে। তথাপি যাহারা বিলম্বে ইন্‌জেকশন লইতেছে তাহাদের তৎপূর্ব্বে কিছু ক্যাল্‌সিয়ম (Calcium Lactate) খাওয়াইয়া লওয়া বোধ হয় ভাল। এই অবস্থার উপস্থিত চিকিৎসার জন্য অ্যাট্রোপিন ও অ্যাড্রেনেলিনের মিলিত ইন্‌জেক্‌শন উপকারী, এবং ঐ সকল লক্ষণের সূত্রপাত মাত্রেই উহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আর যে ঔষধটির দ্বারা এই অবস্থা একবার ঘটিয়াছে, অতঃপর তাহা বদল করিয়া নূতন প্রকারের ঔষধ অল্প মাত্রা হইতে পুনরায় আরম্ভ করা উচিত।

কাহারো কাহারো ইন্‌জেক্‌শন দিতে দিতে একপ্রকার লিভারের পীড়ার উপক্রম দেখা যায়। উহাতে লিভারটি হঠাৎ বড় হইয়া ওঠে, লিভারের উপর বেদনা হইতে থাকে, রোগীর তন্দ্রার মত একপ্রকার ভাব হয়, জ্বর বাড়ে, এবং চক্ষু হরিদ্রাভ হয়। এইরূপ লক্ষণ দেখিবামাত্র ইন্‌জেক্‌শন বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত এবং ইহার জন্য যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। লিভারের উপর একটি বেলেডোনা-প্লাষ্টার দিলে উপস্থিত যন্ত্রণার লাঘব হয়, এবং ভগ্নাংশ মাত্রায় ক্যালোমেল্ ও অ্যাস্‌পিরিন্ একত্রে ঘন ঘন খাইতে দিলে কিছু উপকার হয়। এতদ্ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে জল খাইতে দেওয়া ও অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চারের ব্যবস্থা করাও উচিত।

দুরারোগ্য ও রিল্যাপ্সিং কালাজ্বরের চিকিৎসা

ইউরিয়া ষ্টিবামিন প্রভৃতি ঔষধগুলি কালাজ্বরের পক্ষে অমোঘ হইলেও শতকরা দুইএকটি কালাজ্বর ইহার পক্ষেও দুরারোগ্য হইতে পারে। আবার চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইয়া গেলেও কয়েকটি কালাজ্বরের পুনরাক্রমণ হইতে দেখা যায়; এইগুলিকে কালাজ্বরের রিল্যাপ্স্ বলে। ম্যালেরিয়াতে উপযুক্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও যেমন রিলাপ্স্ ঘটিতে দেখা যায়, কালাজ্বরেও তাহা হয়, তবে সংখ্যায় উহা অনেক কম। প্রোটোজোয়া-ঘটিত ব্যাধি মাত্রেই এই প্রকার রিল্যাপ্স্ হওয়ার প্রবণতা আছে।

এন্টিমনির ক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুসারে ব্রহ্মচারী কালাজ্বর রোগীদের চারভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—(১) যাহারা এন্টিমনির দ্বারা সত্বর উপকৃত হয়। (২) যাহারা বিলম্বে উপকৃত হয়, অর্থাৎ সংখ্যাতিরিক্ত ইন্‌জেক্‌শনের পর ধীরে ধীরে উপকার দেখা যাইতে থাকে। (৩) অনেকগুলি ইন্‌জেক্‌শনেও যাহাদের বিশেষ উপকার হয় না। (৪) যাহারা চিকিৎসা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাড়িয়া দেয় এবং সেইজন্য রিল্যাপ্স্ হয়,—অতঃপর তাহাদের পুনরায় ইন্‌জেক্‌শন দেওয়াতে তন্মধ্যে কতকগুলিতে উহার দ্বারা আর কোনোই উপকার হয় না। এই বিভাগ হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে-কোনো কারণেই হউক, এন্টিমনির ঔষধগুলি সব সময় সমান ভাবে কার্য্যকরী হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপকার হইলেও,—কতকস্থলে উহা গোড়া হইতেই কাজ করে না, এবং কতকস্থলে রোগীর শরীর বা জীবাণু কোনোরূপে ঔষধে অভ্যস্ত হইয়া পড়ায় উহার দ্বারা আর তেমন ফল পাওয়া যায় না। কেন এরূপ হয় তাহা বলা কঠিন। ব্রহ্মচারী বলেন কালাজ্বরে যে clasmastocyte tissue নামক পদার্থের সৃষ্টি হয়, এন্টিমনি তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া জীবাণুর বিনাশ করে। যাহাদের শরীরে এই প্রকার রাসায়নিক সংযোগ না ঘটে তাহাদের শরীরে উহার কোনোই ক্রিয়া হয় না। কাহার কিরূপে এই সংযোগ ঘটিবে ইহার স্থিরতা নাই। যাহার অল্প মাত্রাতে না ঘটে তাহার অধিক মাত্রায় ঘটিতে পারে। যাহার এক ঔষধে ফল হয় না, তাহার ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যটি দিলে ফল হইতে পারে।

রিল্যাপ্সের চিকিৎসায় এই সকল কথা স্মরণ করিতে হইবে। যাহার অল্প ইন্‌জেকশনে কাজ হয় নাই তাহাকে অধিক দিতে হইবে,—যাহার এক ঔষধে উপকার হয় নাই তাহার পক্ষে ঔষধ বদলাইয়া দিতে হইবে,—যাহার ইন্ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেক্‌শনে কাজ হয় নাই তাহাকে ইন্ট্রামাস্কুলার (নিওষ্টিবোসান) ইন্‌জেক্‌শন দিয়া দেখিতে হইবে,—যাহার ২।৩ দিন অন্তর ইন্‌জেক্‌শন দিয়া উপকার হয় নাই তাহাকে প্রাত্যহিক ইন্‌জেক্‌শন (intensive treatment) দিয়া দেখিতে হইবে। চিকিৎসার এইসকল পরিবর্ত্তনের দ্বারা অনেক দুরারোগ্য ও রিল্যাপ্সিং কালাজ্বর আরোগ্য হইতে পারে।

যেখানে এন্টিমনি কোনোরূপেই ক্রিয়া করিতেছে না,—ব্রহ্মচারী বলেন সেখানে এন্টিমনির সাহায্য করিতে অন্য একটি দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন। এই দ্বিতীয় বস্তু যে কিরূপ হওয়া উচিত তাহা কেহই নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না।

মিউর বলেন,—টি. সি. সি. ও. (T.C.C.O.) ইন্‌জেক্‌শন দিবার পর এন্টিমনি দিলে অধিক উপকার হইবে। টি. সি. সি. ও. প্রস্তুতের নিয়ম এই :— টার্পেন্টাইন্ (১ ড্রাম), ক্যাম্ফর (১ ড্রাম), ক্রিয়োজোট (১ ড্রাম) ও ওলিভ অয়েল (২½ ড্রাম),—একত্রে মিলাইলেই টি. সি. সি. ও. প্রস্তুত হয়। ইহারই ½ সি. সি. মাত্রায় দুই পাছার মাংসমধ্যে দুইটি ইন্‌জেক্‌শন একযোগে দিতে হয়। এই প্রকার দুই দফা ইন্‌জেক্‌শন দিবার পর এন্টিমনি প্রয়োগ করিতে হয়।

কেহ কেহ বলেন কয়েকটি তাজা-রক্তের (whole blood) ইন্‌জেকশন দিলে তাহার পর এন্টিমনির ক্রিয়া উত্তম হইতে পারে। এই জন্য কোনো সুস্থ লোকের শিরা হইতে রক্ত লইয়া তৎক্ষণাৎ উহা রোগীর মাংসমধ্যে ইন্‌জেক্‌শন করিয়া দিতে হয়। ৫ সি. সি. হইতে আরম্ভ করিয়া ২০ সি. সি. পর্য্যন্ত মাত্রায় উহা দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যহ বা একদিন অন্তর এইরূপ চার পাঁচটি ইন্‌জেক্‌শন দিয়া পরে এন্টিমনির ব্যবস্থা করিতে হয়।

এলিক (Ehrlick) বলিয়াছিলেন,—একটি ধাতু ক্রিয়া করিতে অক্ষম হইলে তাহার সাহায্য করিতে দ্বিতীয় ধাতুর আবশ্যক হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে নিওস্যাল্‌ভারসনের সাহায্য করিতে বিস্‌মাথের (Bismuth) আবশ্যক হয়। এই উদাহরণ অনুসারে এন্টিমনির সহকারীরূপে আর্সেনিক ব্যবহার করিলে কখনও কখনও কালাজ্বরে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এইজন্য রিল্যাপ্স-কালাজ্বরে কয়েকটি সোয়ামিন্ (Soamin) ইন্‌জেক্‌শন দিয়া পরে এন্টিমনি দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় (ব্রহ্মচারী ও চারুব্রত রায়)। কেহ কেহ বলেন সোয়ামিন ও এন্টিমনি পান্টাপান্টি ইন্‌জেক্‌শন দিলে রিল্যাপ্স্ আরোগ্য হয়। ব্রহ্মচারী বলেন যেখানে কিছুতে উপকার না হয়, সেখানে তিন ধাতু একত্র করিলে

উপকার হইবে। তিনি এন্টিমনির সহিত আর্সেনিক ও বিস্‌মাথ পর্য্যায়ক্রমে দিবার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে বিস্‌মাথের দ্বারাও তিনি কয়েকটি কালাজ্বর আরোগ্য করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য এই সকল অতিরিক্ত ব্যবস্থা কেবল দুরারোগ্য কালাজ্বরের জন্য। আজকাল ইহার সেরূপ দুরারোগ্য প্রকৃতি অত্যন্ত বিরল। তাহার কারণ এখন কালাজ্বর শীঘ্রই চিনিতে পারা যায় এবং শীঘ্রই তাহার বিশিষ্টরূপ চিকিৎসা করা হয়, সুতরাং উহা তৎপ্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবার কোনো সুযোগই পায় না।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা

কালাজ্বরে পূর্ব্বে নানাপ্রকার উপসর্গ ঘটিত এবং সেজন্য তাহার অনেকরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে উহার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। ইন্‌জেক্‌শন দিতে আরম্ভ করিলেই রোগের সঙ্গে উপসর্গ সকল দূর হইয়া যায়। সুতরাং এখন আর ইন্‌জেক্‌শন ব্যতীত অন্য কোনো ঔষধ দিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না। তবে আনুষঙ্গিক ঔষধ হিসাবে একটি অ্যাল্‌কালাইন্ মিকশ্চার দিতে থাকিলে ফল ভালই হয়। এতদ্ব্যতীত যদি রোগীর শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা যায় তাহা হইলে হিমোগ্লোবিন ও লৌহঘটিত কোনো ঔষধ এবং লিভার এক্সট্র্যাক্ট্ (Liver Extract) প্রভৃতির ব্যবস্থা করা উচিত। যদি রক্তশূন্যতা অধিক হয় তাহা হইলে আইরন ও আর্সেনিক সংযুক্ত (Iron arsenite) ইন্‌জেক্‌শনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

যদি সর্দ্দিকাসির লক্ষণ থাকে তাহা হইলে অ্যাল্‌কালাইন্ মিকশ্চার ছাড়াও কিছু ক্যাল্‌সিয়ম্ (Calcium Lactate) দেওয়া উচিত। কালাজ্বরে রক্তের ক্যাল্‌সিয়মের অংশ কিছু কমিয়া যায় সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাহাদের এন্টিমনি ইন্‌জেক্‌শন তেমন সহ্য হয় না, বা সর্দ্দির লক্ষণ থাকায় যাহাদের এন্টিমনি দিতে দ্বিধা হয়, তাহাদের আগে কয়েকটি ক্যাল্‌সিয়ম্ ইন্‌জেক্‌শন দিয়া পরে এন্টিমনি দিলে ভাল ফল হইতে দেখা গিয়াছে। যাহাদের পায়ে শোথের লক্ষণ দেখা যাইতেছে

তাহাদের পক্ষেও উহা উপকারী। এই রোগে শোথের জন্য পুনর্ণবাও উপকারী।

যাহাদের শোথের সঙ্গে রক্তশূন্যতা আছে, এবং হৃৎপিণ্ডও দুর্ব্বল, তাহাদের জন্য ব্রহ্মচারী এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন :—

লাইকার অ্যামন্ অ্যাসিটেট্— ১ ড্রাম
(Liqr. ammon acetatis)
টিঙ্কার ফেরি পার্ক্লোর্— ১০ ফোঁটা
(Tinct. ferri perchlor.)
টিঙ্কার ডিজিটেলিস্— ৫ ফোঁটা
(Tinct. Digitalis)
অ্যাসিড্ ফস্ফরিক্ ডিল্— ১০ ফোঁটা
(Acid phosphoric dil.)
গ্লিসিরিন (Glycerine)— ২০ ফোঁটা
জল (Aqua)— ১ আউন্স
প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

কালাজ্বরে নাড়ীর গতি সাধারণতঃই কিছু দ্রুত হয়; যাহাদের হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল এবং নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত, তাহাদের জন্য নেপিয়ার অধিক মাত্রায় ডিজিটেলিস্ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার মতে ১৫ ফোঁটা করিয়া টিঙ্কার ডিজিটেলিস্ প্রত্যহ ৩।৪ বার দেওয়া যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে উহার সহিত ষ্ট্রিক্‌নিয়াও দেওয়া যায়।

ম্যালেরিয়ার দেশের রোগী হইলে কালাজ্বরের চিকিৎসা হইতে থাকিলেও উহার সঙ্গে সঙ্গে কুইনিন ব্যবহার করা উচিত। কারণ অনেক সময় ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর দুই রোগই প্রায় একসঙ্গে বর্ত্তমান থাকে; অথচ যতক্ষণ কালাজ্বরের আধিপত্য প্রবল থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ার কোনো চিহ্নই দেখা যায় না, এবং রক্তপরীক্ষাতেও তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু যেমনি কালাজ্বরটি চিকিৎসার দ্বারা কিছু আরোগ্য হইয়া আসে, অমনি ম্যালেরিয়াটি হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে এবং তখন রক্ত পরীক্ষাতেও ম্যালেরিয়ার জীবাণু বাহির হইয়া পড়ে। প্রায়ই এইরূপ
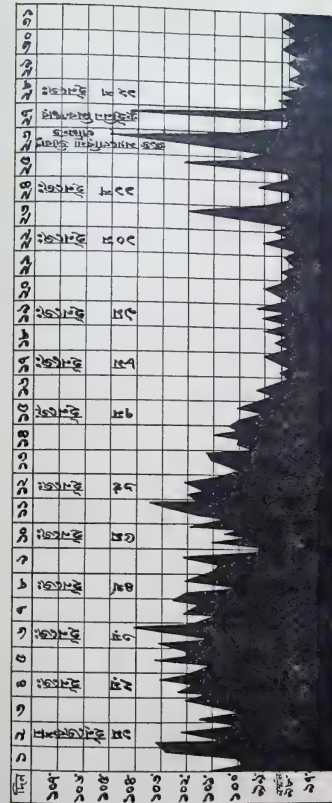
একটি কালাজ্বর রোগীর টেম্পারেচার চার্ট : ইহার কালাজ্বরের সহিত ম্যালেরিয়া মিশ্রিত ছিল, সেইজন্য ইন্‌জেকশন সত্ত্বেও আরোগ্য বিলম্ব ঘটিতেছিল। চিকিৎসার শেষভাগে হঠাৎ একদিন কম্প দিয়া প্রবল জ্বর হয় এবং রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া পাওয়া যায়। কুইনিন দিলে সে জ্বর একেবারে ত্যাগ হয়।

দেখা গিয়াছে যে ইন্‌জেক্‌শন দিতে দিতে যখন জর একেবারে ছাড়িয়া গেল এবং পুনরায় জর হইবার আর কোনোই সম্ভাবনা নাই, তখন

চিকিৎসার শেষের দিকে হঠাৎ পুনরায় কম্প দিয়া জর আসিল; ইহাতে রোগী স্বভাবতঃই মনে করে যে তাহার কালাজর এখনও আরোগ্য হয় নাই, এবং এই ভাবিয়া আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু কুইনিন বা আটেব্রিন দিলেই এ জর দুই একদিনের মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং কালাজর-চিকিৎসার শেষের দিকে নূতন জর দেখা গেলে তাহাকে কালাজর মনে না করিয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত এবং সন্দেহস্থলে কুইনিন প্রয়োগ করা উচিত। অগ্রে যাহাদের পুনঃপুনঃ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইয়া গিয়াছে তাহাদেরই যে কালাজর হওয়ার অধিক সম্ভাবনা, এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব ম্যালেরিয়ার দেশের লোকের কালাজর হইলে ম্যালেরিয়ার জীবাণুও তাহার শরীরে বর্ত্তমান আছে এ-কথা মনে করিতে দোষ নাই, এবং কুইনিন দিতেও দোষ নাই। ট্রপিক্যাল হাঁসপাতালে এইরূপ রোগীদের জন্য কুইনিন ৪ গ্রেন মাত্রায় ও ফেরি-এট্ কুইনিন সাইট্রাস্ (Ferri et quinine citras) ৫ গ্রেন মাত্রায় একত্রে মিশাইয়া প্রত্যহ তিন মাত্রা করিয়া একটি ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়।

কালাজরে আমাশার উপসর্গ থাকিলে তাহার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হয়। যদি এমিবিক্ আমাশা হয় তবে এমিটিন্ প্রয়োগ করা উচিত। নতুবা ডোভার্স পাউডার (Dover's powder), ক্রিটা পাউডার (Pulv. creta aromat), ডাইমল্ (Dimol), ট্যানিজেন্ (Tannigen), প্রভৃতি মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত। পথ্যেরও যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন করা উচিত।

ক্যাঙ্ক্রাম ওরিস্ (Cancrum oris) নামক মুখের ঘায়ের উপসর্গ পূর্ব্বে অনেক দেখা যাইত, এখন তাহা অত্যন্ত বিরল। যদি হঠাৎ এরূপ ঘা হইবার সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে ফট্‌কিরির জলের কুল্লি করা উত্তম ব্যবস্থা। ফট্‌কিরি ও বোরিক অ্যাসিড (Alum and Boric acid) সমপরিমাণে একত্রে মিশাইয়া সেই গুঁড়া ঘায়ের উপর লাগাইয়া দিলেও বেশ উপকার হয়। ঘা যদি পচিবার উপক্রম হয় তবে ট্রাইক্লোর-অ্যাসিটিক অ্যাসিড সলিউশন (Trichloracetic acid 1 in 8) লাগাইয়া দিলে শীঘ্র উহা পরিষ্কার হইয়া যায়।

কালাজর হইতে চর্ম্মরোগ
Dermal Leishmaniasis
Dermal Leishmanoids

কালাজরের জীবাণু বা লিশ্‌ম্যানিয়ার দ্বারা কখনো কখনো একপ্রকার চর্ম্মরোগ জন্মায়,—ইহার নাম ডার্ম্যাল্ লিশ্‌ম্যানিয়াসিস্। ১৯২২ সালে ব্রহ্মচারী ইহার প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং ইহার নাম দেন ডার্ম্যাল্ লিশ্‌ম্যানয়েড্। জনৈক কালাজর-রোগী চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইয়া যাইবার একবৎসর পরে তাহার মুখে এবং সর্ব্বশরীরে একপ্রকার সাদা সাদা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং স্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট শক্ত গুটি উঠিতে থাকে। এইসকল গুটি ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার রসের মধ্যে বহু লিশ্‌ম্যানিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ রোগীর শরীরে তখন কালাজরের কোনোই চিহ্ন নাই। তাহার প্লীহা হইতে রস লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় উহাতে লিশ্‌ম্যানিয়ার অস্তিত্বই নাই। শিরার রক্ত লইয়া কাল্‌চারের দ্বারাও লিশ্‌ম্যানিয়া পাওয়া যায় না। রোগীর শরীর সর্ব্ববিষয়েই সুস্থ, কেবল ঐ গুটিগুলির মধ্যেই লিশ্‌ম্যানিয়া আবদ্ধ হইয়া আছে ইহাই দেখা যায়। ঐ সকল লিশ্‌ম্যানিয়ার কাল্‌চার প্রভৃতি করিয়া দেখা হয় যে উহারা সর্ব্ববিষয়েই কালাজর-জীবাণুর সমান। এই সকল লিশ্‌ম্যানিয়া লইয়া অন্য প্রাণীর শরীরে প্রয়োগ করিয়াও দেখা যায় যে তাহাতে কালাজরের মতই অবস্থা ঘটে। স্যাণ্ড্‌ফ্লাইয়ের দ্বারা এই সকল গুটির রক্তপান করাইয়াও উহাদের পেটের ভিতর লিশ্‌ম্যানিয়া দেখা গিয়াছে এবং ঐ সকল স্যাণ্ড্‌ফ্লাইয়ের দ্বারা দংশন করাইয়া হ্যাম্‌ষ্টারকেও সংক্রামিত করা সম্ভব হইয়াছে (নেপিয়ার)।

এই সকল চর্ম্মগুটির ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে চর্ম্মের সর্ব্বোপরিস্থ যে কঠিন-স্তর (epidermis), উহার নীচেই যে বর্ণস্তর (cutis-vera) থাকে তাহাতেই যথেষ্ট বিকৃতি ঘটে। উহা স্বাভাবিক অপেক্ষা

অনেক পুরু হইয়া উপর দিকে ঠেলিয়া ওঠে এবং বড় বড় নানা আকারের কোষে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তন্মধ্যে স্ফীত ও বৃহত্তম কোষগুলির (giant cells) ভিতরেই লিশ্‌ম্যানিয়ারা আশ্রয় লইয়া থাকে।

ডার্ম্ম্যাল লিশ্‌ম্যানিয়াসিস্

কালাজ্বর আরোগ্য হইয়া পুনরায় এরূপ চর্ম্মরোগ কেন হয় তাহা বলা কঠিন। এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে কালাজ্বরের চিকিৎসার সময় যে সকল জীবাণু সুযোগ পায় উহারা শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে পলাইয়া চর্ম্মের এমন স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে যেখানে এন্টিমনি আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। একবার এরূপ স্থানে আশ্রয় লইতে পারিলে উহারা পুনরায় শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না।

ব্রহ্মচারী যখন প্রথম ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তখন মনে

হইয়াছিল দৈবাৎ এরূপ ঘটে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ইহা নিতান্ত বিরল নয়। এদেশে কালাজ্বর যতই কমিয়া আসিতেছে ততই যেন এইপ্রকার চর্ম্মরোগ বাড়িতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাংলা দেশে অনেক দেখা গেলেও আসামে ইহা এখনও খুব বিরল, যদিও কালাজ্বর সেখানে যথেষ্টই হইয়া থাকে। মাদ্রাজেও এই চর্ম্মরোগ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার লক্ষণ অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। কালাজ্বর আরোগ্য হইবার অনেক দিন পরে কাহারো কাহারো গালে ও কপালে একরূপ

ডার্ম্ম্যাল লিশ্‌ম্যানিয়াসিস্

লাল লাল দাগ হয়, কাহারো বা হাতের ও পায়ের কতকস্থানে বড় বড় ছোপধরার মত দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার উপরে আলুগোছে

হাত বুলাইলে বোঝা যায় যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু,—এইগুলি ডার্ম্মাল্ লিশ্ম্যানয়েডের অন্তর্গত, উহার রস লইয়া পরীক্ষা করিলে লিশ্ম্যানিয়া পাওয়া যাইবে। শক্ত গুটি না উঠিয়াও এরূপ প্রকৃতির এক প্রকার ডার্ম্মাল্ লিশ্ম্যানয়েড্ হইয়া থাকে। চর্ম্মরোগ হইলেও ইহাতে চর্ম্ম সর্ব্বদা অক্ষত অবস্থায় থাকে, কোনো প্রকার ঘা ফুটিয়া বাহির হয় না। কিন্তু ইহাতে চর্ম্মনিম্নে সর্ব্বদা জীবাণু বর্ত্তমান থাকে এবং স্যাণ্ড্ফ্লাইয়ের দ্বারা এই সকল রোগীর নিকট হইতে কালাজ্বর সংক্রামিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

কেবল কালাজ্বর আরোগ্যের পরেই যে এরূপ চর্ম্মরোগের সৃষ্টি হয় তাহা নয়। এই জীবাণুর দ্বারা আরো দুইপ্রকারে এই চর্ম্মরোগ হইতে দেখা যায়। একরূপ দেখা যায় যে সকল কালাজ্বর রোগী ভালরূপ চিকিৎসা করায় না তাহাদের শরীরে। তাহাদের কালাজ্বর ও ডার্ম্মাল্ লিশ্ম্যানয়েড্ একসঙ্গেই থাকিতে পারে; অর্থাৎ কতক জীবাণু থাকে শরীরের অভ্যন্তরে, কতক থাকে চর্ম্মে। এণ্টিমনি চিকিৎসায় ইহারা শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

আরো একরূপ দেখা যায় যাহাদের কখনও কালাজ্বর হয় নাই, তাহাদের শরীরে। ইহাদের কালাজ্বর না হইয়া একেবারেই ডার্ম্মাল্ লিশ্ম্যানয়েড্ জন্মায়। সম্ভবতঃ ইহাদের শরীরে যথেষ্ট প্রতিরোধ-শক্তি থাকায় জীবাণু কেবল চর্ম্মেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। যে সকল দেশে কালাজ্বরের রীতিমত প্রাদুর্ভাব, সেই সব দেশেই এরূপ চর্ম্মরোগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কালাজ্বর নাই সেখানে ডার্ম্মাল্ লিশ্ম্যানয়েড্ও নাই।

এই চর্ম্মরোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী বলেন যে যাহাদের পূর্ব্বে কালাজ্বর হয় নাই এবং এণ্টিমনি-চিকিৎসাও কখনো করা হয় নাই, অথবা যাহাদের কালাজ্বর ও ডার্ম্মাল্ লিশ্ম্যানয়েড্ দুইই একত্রে দেখা যাইতেছে, তাহাদের ইউরিয়া ষ্টিবামিন দিলে শীঘ্রই উহা আরোগ্য হয়। কিন্তু যাহাদের একবার ইউরিয়া ষ্টিবামিন্ প্রভৃতির দ্বারা কালাজ্বর আরোগ্য হইয়া পরে এই চর্ম্মরোগ দেখা দিয়াছে, তাহাদের পুনরায় ইউরিয়া ষ্টিবামিন দিয়া উহা আরোগ্য করা কঠিন। নেপিয়ার বলেন, এই সকল চর্ম্মরোগে ইউরিয়া ষ্টিবামিন বা নিওষ্টিবোসান প্রভৃতি পেণ্টাভ্যালেণ্ট ঔষধের পরিবর্ত্তে **ফুয়াডিন্** (Fouadin) নামক নবাবিষ্কৃত ট্রাইভ্যালেণ্ট্ ঔষধ ব্যবহার করিলে অধিক

উপকার হইতে পারে। ফুয়াডিন্ তরল ঔষধ (7% solution of an antimony compound of pyrocatechin-sodium-disulphonate)। ইহা ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্জেকশন রূপে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার প্রথম মাত্রা ১½ সি. সি., দ্বিতীয় মাত্রা ৩ সি. সি.,—ও পরবর্ত্তী মাত্রাগুলি ৫ সি. সি. করিয়া। একদিন অন্তর এই ইন্জেকশন ১২টি দিয়া রোগীকে দুই সপ্তাহ বিশ্রাম দিতে হয়, পরে প্রয়োজন হইলে আরো ১২টি দেওয়া যাইতে পারে। এই ইন্জেকশন যন্ত্রণাদায়ক নয়।

এই সূত্রে **ওরিয়েণ্টাল্ সোর** বা দিল্লী-বয়েলের (Delhi boil) বিষয় কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই রোগের জীবাণু লিশ্ম্যানিয়া ট্রপিকা (L. tropica),—সুতরাং ডার্ম্মাল্ লিশ্ম্যানয়েডের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য। দক্ষিণ আমেরিকাতে যে এস্পাণ্ডিয়া নামক চর্ম্মরোগ হয়, ইহা তাহারই অনুরূপ। ইহা এদেশে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দেখা যায়, যে সকল দেশে আদৌ কালাজ্বর নাই। ইহাতে প্রথমে মুখে বা হাতে একটি শক্ত গুটি উঠিতে দেখা যায়, উহা ক্রমশঃ বাড়িয়া ও ফুটিয়া ঘা হইয়া যায়, এবং ঐ ঘা চর্ম্মতল হইতে উঁচু হইয়া ওঠে। আজকাল এই রোগের চিকিৎসা সহজসাধ্য। **বার্বেরিন্ সাল্ফ্** (Orisol) নামক ঔষধ ⅙ গ্রেন মাত্রায় ১ সি. সি. জলে গুলিয়া ক্ষতের চারিপাশে একসপ্তাহ অন্তর ২।৩টি ইন্জেকশন দিলেই ইহা আরোগ্য হয়।

বীজাণুজাত ও সংক্রামক জ্বর সমূহ

অতঃপর সংক্রামক বীজাণুদিগের দ্বারা যে সকল জ্বর সাধারণতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাই পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত হইবে। বহুপ্রকার বীজাণুর দ্বারাই জ্বরের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে সকল বীজাণু-ঘটিত জ্বরের প্রাদুর্ভাব আছে, কেবল সেইগুলির আলোচনা করিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বলা বাহুল্য এই সকল বীজাণু-ঘটিত ব্যাধি সর্ব্বদেশেই বিদ্যমান, এগুলি ট্রপিক্যাল বা গ্রীষ্মপ্রধানদেশ-সুলভ ব্যাধি নয়। তথাপি উহার মধ্যে যেগুলি ভারতবর্ষে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এবং যেগুলিকে লইয়া আমাদের নিত্য কারবার করিতে হয়, অর্থাৎ সার্ব্বভৌম ব্যাধি হইলেও যেগুলি আমাদের দেশেও প্রচুর পরিমাণে ঘটিয়া থাকে, সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের বিশিষ্টরূপ আলোচনা করা আবশ্যক। অপরপক্ষে গ্রীষ্মপ্রধানদেশীয় রোগ হইলেও এই দেশে যেগুলি বর্ত্তমানে বিরল (যেমন প্লেগ) তাহার সম্বন্ধে আলোচনা এই পুস্তকে প্রয়োজন নাই। ভারতে আধুনিক কালের রোগ সমস্যা লইয়াই এই পুস্তক রচিত।

যে রোগগুলির বিষয় অতঃপর আলোচিত হইতেছে, তাহার নামকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পূর্ব্বকালে রোগের লক্ষণানুযায়ী উহার নামকরণ হইত, কিন্তু এখনকার দিনে রোগের বীজাণুর নামে উহার নামকরণ করাই বিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক পাঠ্যপুস্তক মাত্রেই ঐরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত সংক্রামক রোগের বীজাণু এখনও স্পষ্টরূপে ধরা যায় নাই এবং কোনো কোনো স্থলে বীজাণু জানা সত্ত্বেও সন্দেহের কিছু অবকাশ আছে। সে স্থলে রোগের নাম এখনও পূর্ব্বমতই আছে। অতএব বর্ত্তমানে দুই প্রকার নামের ব্যবহারই দৃষ্ট হইবে।

টাইফয়েড-জাতীয় জ্বর বা এন্‌টেরিক ফিবার

Enteric Group of Fevers

গত শতাব্দীতে যাহাকে 'রেমিটেণ্ট্ ফিবার' বলা হইত এবং ইদানিং সাধারণতঃ 'টাইফয়েড' বলা হয়, অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে জ্বরগুলিকে লক্ষণবৈচিত্র্য অনুসারে কখনও বা সন্নিপাত জ্বর কখনও বা জ্বরাতিসার বলা হইয়া থাকে, সেই কয়েকপ্রকার জ্বরকে একত্র করিয়া বর্ত্তমানে **এন্‌টেরিক ফিবার** আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'এন্‌টেরিক্' কথার আভিধানিক অর্থ 'অন্ত্র সম্পর্কীয়'—সুতরাং অন্ত্রের দোষজনিত জ্বর মাত্রকেই এন্‌টেরিক্ ফিবার বলা যাইতে পারে। তথাপি টাইফয়েডের মত বিকারের সহিত অবিরাম জ্বরযুক্ত যে কয়েকপ্রকার সমধর্ম্মী ব্যাধি দেখা যায়, সেইগুলিকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিবার জন্য উহা 'এন্‌টেরিক' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার কারণ, আজকাল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে টাইফয়েডের মত লক্ষণ লইয়া যে সকল জ্বর হয় তাহার সবগুলিই আসল টাইফয়েড নয়। 'টাইফয়েড' কেবল তাহাকেই বলা যাইতে পারে যাহাতে টাইফয়েড-বীজাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাকথিত টাইফয়েড মাত্রেই এ বীজাণু পাওয়া যায় না, অন্যপ্রকার বীজাণুর দ্বারাও টাইফয়েডের মত জ্বর হইতে পারে। লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারে উহাকে টাইফয়েড বলা চলিবে না। সাধারণের মধ্যে এইরূপ এক ধারণা আছে যে রোগ কঠিন হইলেই উহা টাইফয়েড, এবং মৃদু হইলেই উহা প্যারা-টাইফয়েড। বলা বাহুল্য এ কথাও একেবারে ভ্রান্ত, কারণ টাইফয়েড-বীজাণু (B. typhosus) ব্যতীত যে তিনপ্রকার প্যারাটাইফয়েড-বীজাণু আছে (B. paratyphosus A, B, and C),—তাহার কোনো একটির সন্ধান পাওয়া গেলে তবেই উহা টাইফয়েড অথবা প্যারাটাইফয়েড, নতুবা রোগের প্রকৃতি যেমনই হউক, কেবলমাত্র তাহা দেখিয়া ঐ সকল নাম ব্যবহার করা উচিত নয়। টাইফয়েড বা প্যারাটাইফয়েড বলিলে

উহাতে এমন বিশিষ্ট বীজাণুর নাম করা হইল যাহার অস্তিত্ব প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত অনুমান করিয়া নওয়া অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু এন্‌টেরিক্ ফিবার বলিলে তদ্দ্বারা কোনো বিশিষ্ট বীজাণুর নাম করা হয় না। সেইজন্য রক্তাদি পরীক্ষার দ্বারা রোগ নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল জ্বরকে সাধারণভাবে 'এন্‌টেরিক্ ফিবার' বলাই ভাল।

সুতরাং এন্‌টেরিক ফিবার একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যাধি নয়। বর্ত্তমান কালের বিখ্যাত বীজাণুবিদ্ টপ্‌লি (Topley) বলেন যে এন্‌টেরিক ফিবার বহুপ্রকার আছে,—('Enteric Fever is not one but many')। টাইফোসাস্ এবং প্যারাটাইফোসাস্ নামক বীজাণু ছাড়াও যে নানা-জাতীয় বীজাণুর দ্বারা এন্‌টেরিক্ প্রকৃতির জ্বর হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে কোলাই বীজাণু (B. coli) একটি, ব্যাসিলাস্ ফীকেলিস্ অ্যাল্‌কালিজেনিস্ (B. fæcalis alkaligenes) একটি, ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ (Streptococcus) একটি, এবং আরো অনেক আছে। এই সকল বীজাণুর অধিকাংশই যদিও টাইফয়েড বীজাণু অপেক্ষা অনেক নিরীহ, তথাপি ইহারা রক্তমধ্যে প্রবেশ করিলে অবিকল টাইফয়েডের মত বিষাক্ত জ্বরের সৃষ্টি করিতে পারে। আবার কখনো কখনো এই সকল বীজাণু টাইফয়েড বা প্যারাটাইফয়েড-বীজাণুর সহিত একযোগে মিলিয়াও এন্‌টেরিক্ ফিবারের বিষাক্ততা বৃদ্ধি করিতে পারে। বস্তুতঃ যে গুলিকে আমরা টাইফয়েড বলি তাহার মধ্যে খাঁটি টাইফয়েডের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

এন্‌টেরিক্ বা টাইফয়েড প্রকৃতির জ্বর আমাদের দেশে অনেক হয়। সকল সময়ে খাঁটি টাইফয়েড-বীজাণু তাহার কারণ না হইলেও সেজন্য চিকিৎসার বিশেষ তফাৎ হয় না,—ঐরূপ যাবতীয় জ্বরের চিকিৎসা এখনও পর্য্যন্ত প্রায় একই প্রকার। কারণ বীজাণু পৃথক্‌জাতীয় হইলেও এই সকল জ্বরের লক্ষণ এবং নিদান প্রায় একই প্রকারের। কর্ণেল জে. সি. দে একবার এই জাতীয় কয়েকটি জ্বরের প্রত্যেকটির বীজাণু অনুসন্ধানে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন (I. M. G., 1926) যে অতি নিরীহ প্রকৃতির বীজাণুও কখনো কখনো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবিকল টাইফয়েডের মত রোগ ঘটাইয়া থাকে।

এই রোগ পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশেই অধিক হইত, কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নতির ফলে ঐসকল সভ্য দেশে এখন আর ইহার সেরূপ প্রাদুর্ভাব নাই। আমেরিকার বিখ্যাত অধ্যাপক McCrae বলিয়াছেন—"Typhoid fever has become so infrequent in cities that our students have no proper opportunity to learn to know the disease,"—অর্থাৎ সে দেশের সহরে এই রোগ এত অল্প যে ছাত্রেরা শিখিবার জন্যও ইহা যথেষ্ট দেখিতে পায় না। কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো সহর সম্বন্ধেই একথা বলা চলে কি? এখন বরং ইহা ভারতবর্ষেরই সাধারণ রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের মৃত্যুসংখ্যার সঙ্গে কেবল বাংলা দেশের মৃত্যুসংখ্যার তুলনা করিয়া দেখুন। গত ১৯৩১ সালে টাইফয়েড রোগে ইংলণ্ডের মৃত্যুসংখ্যা মাত্র ২৫১, আর উহাতে বাংলাদেশের মৃত্যুসংখ্যা ১২,৬০৮। বস্তুতঃ এরোগ কোনো দেশের পক্ষে একচেটিয়া নয়, স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবই (want of sanitary intelligence) ইহার বিস্তৃতির একমাত্র কারণ।

আমাদের দেশে টাইফয়েড প্রায় সকল ঋতুতেই হয়, তবে বর্ষার সময়ই ইহার আধিক্য দেখা যায়। পাঁচ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুরা ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয় না, দশ বৎসর হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে এই রোগের অত্যধিক প্রাচুর্য্য। ত্রিশ বৎসর বয়সের পর এই রোগ কমই হয়, এবং পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বয়সে ইহা প্রায় দেখা যায় না। আমাদের দেশে দেখা যায় যে রোগীর বয়স যত কম হয়, টাইফয়েডের প্রকোপ এবং মৃত্যুসংখ্যা তত বেশী,—বয়স যত অধিক হয় রোগের প্রকোপও তত কম। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে এরূপ ঘটে না। সেখানে প্রাপ্তবয়স্কদেরই টাইফয়েড বেশী হয়। রজার্স বলিতেন, তখনকার দিনে তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে বিলাত অপেক্ষা এখানে ১৫ বৎসরের নীচে টাইফয়েড সংখ্যায় চারগুণ বেশী, এবং ২৫ বৎসরের উপর উহা তিনগুণ কম।

রোগের সংক্রমণ

পানীয় দ্রব্যের মধ্য দিয়াই টাইফয়েড রোগের বীজাণু মানুষের দেহে সর্ব্বাপেক্ষা সহজে প্রবেশ করে। এই বীজাণু জলে বা মাটিতে পড়িয়া

সুযোগ পাইলে এমন কি ৪৫৬ দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। জলাশয় বা কূপের জল এই বীজাণুর দ্বারা একবার সংক্রামিত হইলে তদ্দ্বারা পল্লীস্থ অনেকেই একে একে রোগে আক্রান্ত হয়, সেইজন্য ইহা সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে পরিগণিত। সহরে পানীয় জলের সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই রোগ যথেষ্ট দেখা যায়। জলের পাইপ ফাটিয়া গিয়া বা অন্য উপায়ে দূষিত জলের সংস্পর্শের দ্বারা এই সকল বীজাণু পানীয়জলে আসিয়া প্রবেশ করে, এইজন্য মধ্যে মধ্যে সহরের কোনো বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে টাইফয়েড অত্যন্ত সংক্রামক ভাবে ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন টিউবওয়েলের জল পান করিলে টাইফয়েড হইতে পারে না, কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। টিউবওয়েলের পাইপ পুরাতন হইলেই ফাটিয়া যায় এবং দূষিত জল চুঁইয়া চুঁইয়া উহার মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, বাহির হইতে তাহার কিছুই জানা যায় না।

পানীয় জল ছাড়া গোয়ালার দুধের সহিত এবং বাজারের খাবারের ভিতর দিয়াও এই সকল বীজাণু পেটে যাইতে পারে। দুধের দ্বারা এ রোগ প্রায়ই সংক্রামিত হয়। অনেকে মনে করেন দুধ যখন একবার ফুটাইয়া লওয়া হয় তখন বীজাণু উহাতে জীবিত থাকে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুধ সর্ব্বত্র উত্তমরূপে ফোটানো হয় না। একটু ধোঁয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেই অনেকে মনে করেন দুধ ফুটিয়াছে। কিন্তু দশ মিনিট যাবৎ উত্তমরূপে না ফুটাইলে বীজাণু মরে না, বরং অল্প উত্তাপে উহারা বৃদ্ধি পায়।

খাদ্য-পানীয়ের মধ্য দিয়া ব্যতীত মাছির দ্বারা নীত হইয়া এবং রোগীর সহিত ছোঁয়াছুঁয়ির দ্বারাও (food, finger, and flies) এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। টাইফয়েড রোগীর যাঁহারা পরিচর্য্যা করেন তাঁহারা খাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হইলেও অন্যমনস্কতাহেতু কাপড়ে লাগিয়া থাকাতে কিংবা রোগীর সহিত সংস্পর্শের পর হাত না ধুইয়া নিজের মুখে হাত দেওয়াতে বীজাণু পেটের ভিতর প্রবেশলাভ করিতে পারে। হাঁসপাতালের নার্স এবং কুলীদিগের মধ্যে এইরূপে টাইফয়েড হইতে অনেক দেখা গিয়াছে।

ইহা ছাড়া টাইফয়েড-রোগীরা আরোগ্য হইবার পরেও টাইফয়েডের বীজাণু

বহুদিন পর্য্যন্ত শরীরে বহন করে (carriers), তাহাদের দ্বারাও রোগের সংক্রমণ বহুপ্রকারে হইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান হইলেও যে ঐরূপ কেরিয়ারদিগের সংস্পর্শের দ্বারা রোগ জন্মিতে পারে, 'টাইফয়েড মেরী' তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিলাতের কোনো হোটেলে মেরী নামে জনৈক পরিচারিকা ছিল। তাহার একবার টাইফয়েড হয় এবং আরোগ্য হইবার পর পুনরায় সে হোটেলে খাদ্য পরিবেশনাদির কার্য্য করিতে থাকে। তৎপরে কয়েকবৎসর যাবৎ লক্ষ্য করিয়া দেখা যায় যে সেই হোটেলে যাহারা খাদ্যগ্রহণ করিত তাহাদের অনেকেরই টাইফয়েড হইল। অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে মেরীই তাহাদের রোগের কেরিয়ার, এবং পরে আরো লক্ষ্য করিয়া দেখা যায় যে তাহার হাতে খাইয়া দুইশত ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইল। এইজন্য তাহাকে 'টাইফয়েড মেরী' নামে অভিহিত করা হয়।

বীজাণুবৃত্তান্ত

বীজাণু-সংক্রমণই যে টাইফয়েড রোগের কারণ সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রোগীর শরীরে উহাদের দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই এ-কথা বলা হইতেছে না। এই বীজাণু লইয়া গিনিপিগ বা খরগোসের দেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহারা প্রায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায় এবং তাহাদের অন্ত্রে টাইফয়েডের মত ঘা দেখিতে পাওয়া যায়। বনমানুষের (chimpanzee) শরীরে এই বীজাণু সংক্রমণ করাইয়াও টাইফয়েড রোগ জন্মিয়াছে। তদ্ভিন্ন আরো নানারূপ প্রমাণ আছে। টাইফয়েড বীজাণু লইয়া ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করিতে করিতে দৈবাৎ মুখে হাত দেওয়ার ফলে পরীক্ষক কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, এরূপ ইতিহাসও অনেক জানা আছে। প্যারিস হাঁসপাতালের জনৈক নার্স একবার আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়া টাইফয়েড-বীজাণু খাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহার ফলে উহারও প্রবল টাইফয়েড হইতে দেখা গেল।

টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড বীজাণু আকারে-প্রকারে দেখিতে একই রূপ এবং মাইক্রোস্কোপে দেখিলে সঞ্চরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠির মত দেখায়, এবং কাল্‌চার করিলে উভয়েরই গাত্র হইতে শিকড়ের মত বহু লেজ (flagella) বাহির হয়। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে চরিত্রগত পার্থক্য আছে, তাহা কাল্‌চারের দ্বারা

প্রকাশ পায়। সেই অনুসারে ইহারা দুই বিভিন্ন শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত। টাইফয়েড বীজাণুগুলি Eberthella group-এর অন্তর্গত, এবং প্যারাটাইফয়েড বীজাণু সকল Salmonella group-এর অন্তর্গত। এই Salmonella group-এর বীজাণুরা নানাবিধ পেটের পীড়া সৃষ্টি করিবার জন্য প্রসিদ্ধ।

টাইফয়েড-জাতীয় বীজাণুগুলি হইতে কোনো বহির্বিষ বা এক্সোটক্সিন্ (exotoxin) ক্ষরিত হয় না,—কিন্তু ইহাদের দেহের মধ্যে যথেষ্ট এণ্ডোটক্সিন্ (endotoxin) থাকে। ঐ দেহ যত বিভক্ত বা বিলয়প্রাপ্ত হয়, ততই সেই অন্তর্বিষ মুক্ত হইয়া আশ্রয়দাতার শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং তাহাই নানারূপ অনিষ্ট করে। হান্ (Hahn) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক বিশিষ্ট প্রকার চাপ-যন্ত্রের দ্বারা (Buchner press) টাইফয়েড বীজাণুকে পিষ্ট করিয়া এই এণ্ডোটক্সিন নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন,—এবং ইহার নাম দিয়াছেন typhoplasmin। ইহা সূক্ষ্মতম ছাঁকুনিতে ছানিয়া লইয়া খরগোসকে ইন্‌জেকশন করিয়া দেখা হইয়াছে যে তাহাতে খরগোস অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দারুণ উদরাময়ের লক্ষণ সহ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। অতএব চিকিৎসার সময় এ-কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে টাইফয়েড রোগে কেবল বীজাণুর ধ্বংস করিয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই, বরং উহাতে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা।

রোগের প্যাথোলজি

টাইফয়েড-জাতীয় রোগের বীজাণু প্রথমে ক্ষুদ্র অন্ত্রের শেষভাগে ইলিয়ম্ (Ileum) নামক অংশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐ স্থানই উহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। সেখানে ক্ষত প্রস্তুত করিয়া অন্ত্রকূপগুলির (lymphoid follicles) মধ্য দিয়া উহারা শরীরের অন্যান্য স্থানে সঞ্চারিত হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রথমেই অন্ত্রস্থ গণ্ডগুলির (mesenteric glands) মধ্যে আসিয়া উহারা বাধা পায়। সংখ্যায় কম থাকিলে অথবা বাধা প্রবল হইলে উহারা সেইখানেই বিনষ্ট হয়, নতুবা তথা হইতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে রক্তের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে, এবং রক্তের প্রতিরোধ-শক্তির সহিত সংগ্রামে যতই উহারা ধ্বংস হইতে থাকে, ততই উহাদের বিষ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে থাকে। এ দিকে অন্ত্রস্থ ক্ষতগুলিও উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে এবং তথা হইতেও বিষ নিত্য সরবরাহ হইতে

থাকে। এই বিষ শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া পড়িলেই টাইফয়েডের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের প্রথম অবস্থায় বীজাণুগুলি স্বয়ং রক্তের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলেও অধিক দিন পর্য্যন্ত তথায় ইহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তথা হইতে ইহারা শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়, কিন্তু উহার বিষটি তথায় থাকিয়া যায়। সেইজন্য রোগের প্রথম সপ্তাহে রক্তের কাল্‌চার করিলে তাহাতে বীজাণু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এক সপ্তাহ অতীত হইবার পর রক্তের কাল্‌চার করিয়া কোনো বীজাণু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু রক্তের মধ্যে না থাকিলেও ইঁহারা অন্ত্রগাত্রে আশ্রয় লইয়া নিত্যই আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং তথায় আশ্রয়দাতার অণুপরমাণুর সঙ্গে ইহাদের নিত্য সংগ্রাম চলিতে থাকে। ফলে ক্ষতও উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে, এবং সংগ্রামে ইহারা যতই বিনষ্ট হয় ততই ইহাদের বিষ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। রোগী যদি জীবিত থাকে তবে তৃতীয় সপ্তাহের পর হইতে ইহাদের সংখ্যারও হ্রাস হইতে থাকে এবং ইহাদের বিষও কমিয়া আসে; অতঃপর চতুর্থ সপ্তাহ হইতে ঘা গুলি শুকাইতে আরম্ভ হয়। রোগী মৃত হইলে রোগের যে অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে, শব-ব্যবচ্ছেদ করিলে অন্ত্রস্থ ঘা গুলি সেই অবস্থার অনুযায়ী রূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ **প্রথম সপ্তাহে** মৃত রোগীর অন্ত্রগাত্র সমূহ কেবল লাল দগ্‌দগে হইয়া ফুলিয়া আছে দেখা যায়। **দ্বিতীয় সপ্তাহে** দেখা যায় যে অন্ত্রের স্থানে স্থানে স্পষ্ট ঘা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। **তৃতীয় সপ্তাহে** দেখা যায় যে ঘায়ের তলদেশে পচন ধরিয়াছে এবং ঘা গুলি অন্ত্রগাত্র ভেদ করিবার উপক্রম করিতেছে; রোগ অধিক হইলে সম্পূর্ণ অন্ত্র ঘায়ে ভরিয়া যায় এবং কখনও বা ক্ষুদ্র অন্ত্র ছাড়াইয়া উহা বৃহৎ অন্ত্রে পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। কোনো কোনো ঘা অন্ত্রগাত্র ছিন্ন (perforation) করিয়া ফেলে এবং উহার মধ্য দিয়া অন্ত্রস্থ বিষ উদরগহ্বরে প্রবেশ করে ও পেরিটোনাইটিসের সূত্রপাত করিতে পারে। **চতুর্থ ও পঞ্চম সপ্তাহে** দেখা যায় যে ঘা গুলি শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং কতকগুলি ঘা আরোগ্য হইয়া স্থানে স্থানে কালো দাগ হইয়া আছে। যে সকল রোগী উপর্য্যুপরি দুইবার আক্রমণ বা **রিল্যাপ্সের পর** মৃত হয় তাহাদের অন্ত্রে দেখা যায় যে কতকগুলি পুরাতন ঘা শুকাইয়া গিয়াছে এবং

কতকগুলি নূতন ঘা বাহির হইয়াছে। এইরূপে ঘায়ের অবস্থা সর্ব্বদাই রোগের অবস্থার সহিত মিলিয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত অন্ত্রের ঘা গুলি একেবারে না সারে ততদিন পর্য্যন্ত পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে; সেই জন্যই পঞ্চম সপ্তাহ পার না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে বিছানা হইতে উঠিতে দেওয়া এবং কোনোরূপ কঠিন খাদ্য খাইতে দেওয়া বিপজ্জনক।

লক্ষণাদি

পূর্ব্বরূপ—রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবার প্রায় ১০।১৫ দিন পরে প্রথম রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অন্তরালবর্ত্তী প্রচ্ছন্নকালের (incubation period) মধ্যে রোগের কোনোরূপ লক্ষণ থাকে না। তৎপরে মাথাধরাই অধিকাংশ টাইফয়েড জরের সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ। এই মাথাধরা কখনো কখনো অত্যন্ত প্রবল হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণও আসিতে পারে,—যেমন অঙ্গপীড়া, কোমর ব্যথা, পেট ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, অস্বস্থবোধ ইত্যাদি।

জর—দুই একদিন মাথাধরা প্রভৃতি অস্বস্থতার লক্ষণের পর জর দেখা দেয়, এবং ক্রমশই উহা দৈনিক বাড়িতে থাকে। প্রথম কয়েকদিন হয়তো প্রত্যহ কিছুক্ষণের জন্য জর ত্যাগ হইতে থাকে, কিন্তু শীঘ্রই উহা অবিরাম জরে পরিণত হয়। টাইফয়েডের জর সাধারণতঃ দৈনিক ধাপে ধাপে বাড়িতে থাকে, এবং ৪।৫ দিনের মধ্যেই উহা উচ্চ সীমায় উপস্থিত হয়। ইহার পর হইতে প্রত্যহ জরের বেগ ঠিক ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে, কেবল প্রাতে উহা দুই এক ডিগ্রী মাত্র নামে (কন্টিনিউড অথবা রেমিটেন্ট জরের প্রকৃতি অনুযায়ী),—কিন্তু একবারও ত্যাগ হয় না।

কিন্তু শিশুদের টাইফয়েডে এইরূপ ধাপে ধাপে না বাড়িয়া এমনও দেখা যায় যে জর একেবারে প্রথম দিন হইতেই প্রবল আকার ধারণ করিল। যে ভাবেই জর বাড়িয়া উঠুক, তদবধি উহা প্রায় ১০৪ অথবা ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ওঠে, এবং প্রায় ১০২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামে। এই ভাবে সাধারণতঃ **দুই সপ্তাহ হইতে পাঁচ সপ্তাহ** পর্য্যন্ত সমান ভাবে কাটিয়া যাইবার পর উহা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে থাকে। এই জর

কখনই অকস্মাৎ একদিনে ছাড়িয়া যায় না, ধীরে ধীরে কমিতে কমিতে কয়েকদিন পরে এই জর ত্যাগ হয়। জর কমিবার প্রথম সূত্রপাত দেখা যায় এই যে, যদিও উহার দৈনিক বৃদ্ধির হ্রাস হয় নাই, তথাপি প্রাতে জর কমিবার সময় পূর্ব্বদিন অপেক্ষা উহা প্রত্যহ প্রায় এক ডিগ্রী করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ইহাই রোগ উপশমের প্রথম চিহ্ন। দুই চারদিন এইরূপ ভাবে প্রাতঃকালীন জরের মাত্রা কমিতে থাকার পর তখন দুই বেলাই উহা উত্তরোত্তর কমিতে আরম্ভ করে, এবং প্রায় সপ্তাহ কাল পরে একদিন প্রাতে জরটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হয়; বৈকালের জরও ইহার কয়েকদিন পরে সম্পূর্ণ ত্যাগ হইয়া যায়। তখন হইতে প্রতিদিন প্রাতে শরীরের উত্তাপ নর্ম্যাল্ অপেক্ষাও নীচে নামিয়া যায়, এবং কয়েকদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থাই হইতে থাকে। কাহারো কাহারো এ সময় ৯৫ ডিগ্রী পর্য্যন্তও টেম্পারেচার বহুক্ষণ থাকিতে দেখা যায়। ইহাকে persistent hypothermia of convalescence বলে, এবং ইহাতে ভয়ের কোনো কারণ নাই। শিশুদের টাইফয়েড আরোগ্য হইবার পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যার সময় টেম্পারেচারের অল্প বৃদ্ধি হইতেও দেখা যায়, তাহাতেও ভয়ের কারণ কিছু নাই।

টাইফয়েড জরের ভোগকাল প্রায় তিন সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত। অবশ্য ইহা কেবল আমাদের দেশ সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। রজার্স বলেন ভারতবর্ষের টাইফয়েড বিলাতের টাইফয়েড অপেক্ষা প্রবল ও দীর্ঘকালস্থায়ী।

জরের সঙ্গে অন্যান্য যে সকল বিশিষ্ট লক্ষণ ইহাতে দেখা যায়, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

জিহ্বার অবস্থা—রোগের প্রথম হইতেই জিভের উপর সাদা ছাল পড়ে, কিন্তু উহার দুই প্রান্ত ও অগ্রভাগটুকু প্রায় লাল হইয়া থাকে। রোগ কঠিন হইলে পুরু ছালে জিভের সমস্তটাই ঢাকিয়া যায়। সেই সঙ্গে রোগীর মুখে একরূপ বিচিত্র গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা নাকে লাগিলেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন উহা টাইফয়েডের গন্ধ।

পেটের অবস্থা—টাইফয়েডে কাহারো কাহারো প্রথম হইতে শেষ

পর্য্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, কাহারো বা তৎপরিবর্ত্তে উদরাময়ের লক্ষণ থাকে, এবং কাহারো বা পর্য্যায়ক্রমে একবার কোষ্ঠবদ্ধতা ও একবার উদরাময় দেখা যায়। উদরাময়যুক্ত টাইফয়েডের মল কালো রংএর সহিত গাঢ় সবুজবর্ণ মিশ্রিত, অনেক সময় উহা দেখিলেই চেনা যায়। ইহাতে পেট প্রায় ফাঁপিয়া থাকে (tympanitis) এবং পেটের উপর চাপ দিলে ব্যথা অনুভব হয়। যতদিন জর না কমে ততদিন কিছুতে এই পেটফাঁপার নিবৃত্তি হয় না।

ফুস্‌ফুসের অবস্থা—টাইফয়েডে অনেক সময় বুকে শ্লেষ্মার লক্ষণ প্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে শেষ পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে। এইজন্য এই অবস্থায় দেখিয়া অনেক সময় স্থির করা যায় না—উহা নিছক ব্রঙ্কাইটিস্ রোগ অথবা উহা টাইফয়েডের আনুষঙ্গিক ব্রঙ্কাইটিস্। টাইফয়েডে ব্রঙ্কোনিউ-মোনিয়ার উপসর্গও কখনো কখনো হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই রোগে নিউমোনিয়ার উপসর্গ অতি বিরল।

হার্টের অবস্থা—এই রোগে হার্টের কোনো বিকৃতি প্রায়ই ঘটে না, তবে কঠিন অবস্থায় myocarditis এবং endocarditis হইতেও দেখা যায়। টাইফয়েড-নাড়ীর বেগ জরের তুলনায় প্রায়ই কম থাকে। প্রবল জর সত্ত্বেও নাড়ীর এরূপ মন্দগতি হইতে সাধারণতঃ অন্য কোনো রোগে দেখা যায় না, তবে রোগের শেষের দিকে আবার নাড়ী দ্রুত হয়। এ রোগের আর এক বিশেষত্ব এই যে আরোগ্যের পর নাড়ীর গতি অত্যন্ত কমিয়া যায়, এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত উহা অনিয়মিত ভাবে (irregular) চলিতে থাকে। ইহা এই রোগে স্বাভাবিক।

প্লীহা—প্লীহাও ইহাতে কিছু বর্দ্ধিত হয়। সেইজন্য ইহাকে প্রথম অবস্থায় ম্যালেরিয়া বলিয়া সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মস্তিষ্ক লক্ষণ—টাইফয়েডের তন্দ্রাজড়িত ঘোর-ভাব সর্ব্বজনবিদিত। রোগীর এই বিশিষ্টপ্রকার বিকারের লক্ষণ দেখিয়া টাইফয়েড অনুমান করিতে বিচক্ষণ ব্যক্তির বিলম্ব হয় না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহাকেই সন্নিপাত অবস্থা বলে, এবং আমরা ইংরেজীতে ইহাকে টাইফয়েড-ষ্টেট্ (typhoid state) বলি। 'তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ' প্রভৃতি নিদানবর্ণিত সন্নিপাতজরের

সমস্ত লক্ষণই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী যেন সর্ব্বদা বিঘোরে পড়িয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে অস্পষ্টভাবে (low muttering delirium) কি বকে তাহা বুঝা যায় না। কখনো কখনো রোগী হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ওঠে, তখন তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখা কঠিন হয়। বহুপ্রকার মস্তিষ্ক বিকারের লক্ষণ এই রোগে দেখা যায়,—যেমন বিছানা হাৎড়াইয়া কোনো অদৃশ্য বস্তুর অনুসন্ধান করা, কোনো কল্পিত দ্রব্য হাতে আছে এরূপভাবে ক্রমাগত আঙুল নাড়িতে থাকা, কাপড় ধরিয়া টানিতে থাকা, মুঠা বাঁধিয়া হাত পা গুটাইয়া শক্ত করিয়া থাকা (subsultus tendinum), নাক খোঁটা, ঠোঁট খোঁটা ইত্যাদি।

টাইফয়েডের প্রকারভেদ

সকল টাইফয়েডেই বিষম লক্ষণগুলি থাকে না। অবস্থা অনুসারে ইহার লক্ষণেরও নানারূপ তারতম্য হয়। রোগের প্রাবল্য হিসাবে অনেকে ইহাকে তিনপ্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা :—

অতি কঠিন প্রকার—প্রথম সপ্তাহ অতীত হইলেই অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় রোগের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে। অতি কঠিন অবস্থার রোগ হইলে নাড়ীর গতি মন্দ না হইয়া দ্রুত হয়, জর ১০৪° বা ১০৫° পর্য্যন্তই অধিকাংশ সময় লাগিয়া থাকে,—উদরাময়ের লক্ষণ প্রায়ই দেখা দেয়, জিভ শুষ্ক হইয়া থাকে ও উহাতে ফাটা দাগ দেখা যায়, দাঁতের উপর ও ঠোঁটের উপর কালো কালো ছাল (sordes) পড়ে, আহার একেবারেই বন্ধ হইয়া যায় এবং গালের ভিতর জোর করিয়া কিছু ঢালিয়া দিলেও উহা কষ্ বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে। রোগী মধ্যে মধ্যে গোঙানি শব্দ করিতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া ওঠে,—অথচ এগুলি তাহার জ্ঞানকৃত নয়। ইহাই প্রকৃত টাইফয়েড-ষ্টেট্ অর্থাৎ সন্নিপাত অবস্থা। এই অবস্থাতে রোগী শীঘ্রই অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায়। যদি ইহা আরোগ্য হয় তবে জরত্যাগ হইতে ৫।৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া যায়। এরূপ টাইফয়েডে জীবনরক্ষা হওয়া কঠিন। ইহাতে নানারূপ কঠিন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়।

মাঝারি প্রকার—ইহাতে জর প্রায় ১০৩°-এর কাছাকাছি থাকে, এবং বিকারের লক্ষণগুলি অনেক কম থাকে। তবে ইহাতে উদরাময়ও থাকে এবং কিছু ভুল বকাও থাকে। জিভে ছাল পড়িয়া গেলেও উহার ধারগুলি পরিষ্কার থাকে। অনেক সময় ইহাতে গায়ে লাল লাল টাইফয়েডের র‍্যাশ্ (typhoid rash) বাহির হইতে দেখা যায়। তিন সপ্তাহ পরে এই জর ছাড়া সম্ভব, তবে ইহাতে চার সপ্তাহও লাগিতে পারে। এইপ্রকার টাইফয়েড সাধারণ চিকিৎসায় অধিকাংশই আরোগ্য হয়।

সহজ প্রকার—টাইফয়েড কখনো কখনো এমন সামান্যরূপেও দেখা দিতে পারে যে আপাতঃ দৃষ্টিতে তাহা টাইফয়েড বলিয়া সন্দেহই হয় না। এরূপ মৃদুভাবের টাইফয়েড অল্পবয়স্কদিগের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না, অধিক বয়স্কদিগের মধ্যেই এরূপ হইতে পারে। ইহাতে জর দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবিরাম লাগিয়া থাকে তৎপরে ছাড়ে, কিন্তু উহাতে জরের কষ্ট ছাড়া অন্য কোনোপ্রকার উপসর্গ হইতে দেখা যায় না। এমন টাইফয়েডও কখনো কখনো দেখা গিয়াছে যাহাতে জর মধ্যে মধ্যে একেবারে ত্যাগ হইয়া যাইতেছে, সুতরাং টাইফয়েড বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই, কিন্তু রক্ত পরীক্ষায় জানা গিয়াছে উহা টাইফয়েড। এই প্রকার টাইফয়েড খুবই বিরল, এবং ইহা কখনও মারাত্মক হয় না। প্যারা-টাইফয়েডও অনেক সময় এইরূপ সহজপ্রকারের হইয়া থাকে।

শিশুদের টাইফয়েড—অল্পবয়স্ক দুগ্ধপোয্য শিশুদের টাইফয়েড প্রায়ই অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রকারের হয়। সেইজন্য অনেক সময় উহাকে টাইফয়েড বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয়। শিশুদের টাইফয়েডে প্রায়ই বুকে সর্দ্দি লাগিয়া থাকে, সুতরাং প্রথমে উহাকে ব্রঙ্কাইটিস্ বলিয়া সন্দেহ হয়, পরে জর দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকিলে অন্যরূপ ধারণা হয়। শিশুদের টাইফয়েডে উদরাময়ের লক্ষণ খুব কমই হয়, বরং কোষ্ঠকাঠিন্য হইতেই প্রায় দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে টাইফয়েডে শিশুদের অন্ত্রে ঘায়ের পরিমাণ অল্পই হইয়া থাকে।

উপসর্গাদি (Complications)

এই রোগে উপসর্গ বহুপ্রকারের হইতে পারে;—তন্মধ্যে যেগুলি সাধারণ সেইগুলিই এখানে সংক্ষেপে উক্ত হইল।

(১) **রক্তভেদ**—কঠিন প্রকার টাইফয়েডে, এবং সময়ে সময়ে সহজ টাইফয়েডেও রক্তদাস্ত হইয়া থাকে। মলের সহিত দুই একবার কিঞ্চিৎ পরিমাণে রক্তক্ষরণ হইলে তাহাতে বিশেষ কিছুই আশঙ্কা নাই, কিন্তু বারে বারে অধিক মাত্রায় রক্ত নির্গত হইতে থাকা বিপজ্জনক, তাহাতে জীবনসংশয় হইতে পারে। কোথা হইতে এই রক্ত আসে তাহা ঠিক বলা যায় না, কারণ মৃত্যুর পরে ব্যবচ্ছেদের দ্বারাও ইহার কোনো কারণ সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সূক্ষ্ম উপশিরাগুলি হইতেই রক্ত ঝরিতে থাকে। যখন অন্ত্রের অভ্যন্তরে এইরূপ রক্তপাত হয় তখন উহা দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার লক্ষণ এই যে জরটি হঠাৎ নামিয়া যায়, নাড়ী দমিয়া গিয়া দ্রুতগতি হইয়া পড়ে, মুখের চেহারা পাংশু হইয়া যায় এবং রোগী ছট্‌ফট্ করিতে থাকে ও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস লইতে থাকে। উহার কিছুকাল পরেই মলের সহিত রক্ত নির্গত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) **অন্ত্রচ্ছেদ** (perforation)—এই উপসর্গ অতি ভয়ানক, ইহা হইলে আর রোগীর রক্ষা নাই। অন্ত্রের ক্ষত গভীরতর হইতে হইতে উহার তলদেশ ফুটা হইয়াই এই অবস্থা ঘটে, সুতরাং তৃতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বে এই উপসর্গ প্রায় উপস্থিত হয় না। চিকিৎসার দোষে এবং শুশ্রূষার দোষে কখনো কখনো এই উপসর্গ ঘটিতে পারে। যদি টাইফয়েড-রোগীকে জোলাপ প্রয়োগ করা যায়, রোগী যদি হঠাৎ বিছানা হইতে লাফাইয়া ওঠে এবং অত্যধিক বলপ্রয়োগ করিতে থাকে, অথবা যদি মলত্যাগের সময় অতিরিক্ত জোর দিয়া কুন্থন করিতে থাকে, সেই সকল অবস্থায় এই প্রকার উপসর্গ হওয়া সম্ভব। অন্ত্রে ছিদ্র হইবামাত্র তাহার প্রথম লক্ষণ, পেটে অকস্মাৎ দারুণ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাবোধ। পেটের ডানদিকে তলপেটের কাছেই প্রায় এইরূপ ব্যথা ধরে, তবে উহা অন্যত্রও হওয়া সম্ভব। এই সময় রোগীর হঠাৎ জর ছাড়িয়া যায়, এবং

একপ্রকার কম্প উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে পেটের মাংসপেশী সকল শক্ত হইয়া ওঠে, হাঁটু মুড়িয়া যায় এবং পা ছড়াইতে কষ্টবোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো দুইতিনবার উপর্য্যুপরি পাৎলা দাস্ত ও বমি হইয়া যাইতে পারে। মুখের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়। এ অবস্থা সত্বর এবং নির্দ্ধারিত রূপে চিনিয়া লওয়া প্রায় কঠিন। ছিদ্র হইয়াছে কি না এবং কোথায় ছিদ্র হইয়াছে ইহার মীমাংসা করিতে করিতেই বিলম্ব হইয়া যায়, ততক্ষণে রোগীর অকস্মাৎ প্রাণনাশ হয়। ইহার একমাত্র চিকিৎসা তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা সম্ভব হয় না।

(৩) **পেরিটোনাইটিস্**—ছিদ্র না হইলেও ইহা ঘটিতে পারে।

(৪) **ব্রঙ্কাইটিস্**—ইহা সাধারণ উপসর্গ। প্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহেই ইহা দেখা যায়।

(৫) **কানের ভিতর পূঁজ** হওয়া (otitis media)।

(৬) শরীরের নানাস্থানে **ফোঁড়া** হওয়া (pyæmia)।

(৭) **প্রস্রাবের দোষ**—এইরোগে প্রস্রাবের সহিত অ্যাল্‌বুমেন ও কাষ্ট্ (casts) নির্গত হইতে প্রায় দেখা যায়।

টাইফয়েডের সহিত কি কি রোগের ভুল হয়

অনেক টাইফয়েড প্রথম হইতে চিনিতে পারা যায় না, কারণ ইহা বিভিন্নরূপ মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হইতে পারে। ইহাকে যে সকল রোগ বলিয়া সাধারণতঃ ভ্রম হইয়া থাকে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

(১) **ম্যালেরিয়া**—আমাদের দেশে এই ভ্রমটাই প্রথমে হয়। টাইফয়েডকে ম্যালেরিয়া মনে করা এবং একজরি ম্যালেরিয়াকে টাইফয়েড মনে করা,—এরূপ ভুল প্রায় প্রত্যেকেই করিয়া থাকেন; পরে কুইনিন বা আটেব্রিন্ ব্যবহারের দ্বারা অথবা রক্তপরীক্ষার দ্বারা সেই ভ্রমের সংশোধন হয়। চিকিৎসক মাত্রেই জানেন যে যদিও টাইফয়েডকে প্রথমে ম্যালেরিয়া সন্দেহ করাতে দোষের কিছুই নাই, কিন্তু ম্যালেরিয়াকে অধিকদিন পর্য্যন্ত টাইফয়েড বিবেচনা করিলে যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

(২) **কালাজ্বর**—ইহার প্রথম অবস্থা অনেকটা টাইফয়েডের মত,

সুতরাং ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। তবে এ ভুলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ প্রথম অবস্থায় দুইরোগের চিকিৎসা প্রায় একপ্রকারই চলিতে পারে। পরে সময়মত রক্ত পরীক্ষা করিলেই রোগ নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। উহা যদি কালাজ্বর না হয় তবে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলেই উহা আরোগ্য হইয়া যায়। আর এক কথা, কালাজ্বরে টাইফয়েডের মত বিকার কখনই হয় না।

(৩) **ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা**—প্রথমে টাইফয়েডকে উক্ত রোগ বলিয়া ভ্রম হইলেও তাহার সংশোধন হইতে বিলম্ব হয় না।

(৪) **নিউমোনিয়া**—অনেক সময় টাইফয়েডের সহিত ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ার উপসর্গ থাকে বলিয়া উহা টাইফয়েড কি নিউমোনিয়া, ইহা লইয়া দ্বিধা উপস্থিত হয়। ইহার মীমাংসার সহজ উপায় রক্তের শ্বেত-কণিকার সংখ্যা গণনা করা। নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াতে শ্বেত-কণিকার সংখ্যা নিশ্চয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, এবং টাইফয়েড হইলে উহার সংখ্যা কমিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া নিউমোনিয়ার জ্বর অধিকদিন অগ্রসর হয় না, এবং শীঘ্রই নিউমোনিয়ার স্পষ্ট চিহ্নসকল প্রকাশ পায়, সুতরাং লক্ষণ দেখিয়াও ভ্রম সংশোধনে বিলম্ব হয় না।

(৫) **মেনিঞ্জাইটিস্**—মস্তিষ্ক রোগের লক্ষণ দেখিলে প্রায় প্রথম হইতেই উহা চিনিতে পারা যায়। তবে টাইফয়েডের মস্তিষ্কবিকৃতি দেখিয়া উহাকে কখনো কখনো মেনিঞ্জাইটিস বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু মেনিঞ্জাইটিসের মস্তিষ্কবিকৃতি একপ্রকার এবং টাইফয়েডের মস্তিষ্ক-বিকৃতি অন্যপ্রকার। টাইফয়েডে কিছু কিছু মস্তিষ্ক-পীড়ার লক্ষণ (meningismus) থাকিলেও আসল মেনিঞ্জাইটিস্ টাইফয়েডে কখনও হয় না।

(৬) **অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্ বা পেরিটোনাইটিস্**—এই সকল রোগকেও প্রথমে টাইফয়েড বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু পেটে টাটানি ব্যথার সহিত উহার অন্যান্য বিশিষ্ট লক্ষণগুলি আসিতে দেখিলে শীঘ্রই সে সন্দেহ দূর হয়।

(৭) **কোলাই বীজাণুর জ্বর**—ইহাও অনেক সময় টাইফয়েডের মত লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু টাইফয়েডের মত বিকারের চিহ্ন এ রোগে মোটেই থাকে না। ইহার জ্বরও অনেকটা এলোমেলো প্রকৃতির হয়, টাইফয়েডের

মত একভাবে (কন্টিনিউড্ ফিবার) সর্ব্বদা থাকে না। রক্ত পরীক্ষা করিলেও ইহা কতকটা ধরা যায়, কারণ কোলাই বীজাণুর জ্বরে শ্বেত কণিকার সংখ্যা হ্রাস না হইয়া কিছু বৃদ্ধি পায়। প্রস্রাব কাল্চার করাইলে এই রোগ নিশ্চিতরূপে ধরিতে পারা যায়।

(৮) পাইমিয়া (Pyæmia)—শরীরের অভ্যন্তরে কোথাও বিস্ফোটকের সূচনা হইয়াছে এবং ভিতরে ভিতরে পূঁজ জমিতেছে, অথচ বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় নাই,—এরূপ অবস্থায় অনেক সময় দীর্ঘদিনব্যাপী জ্বর দেখিয়া টাইফয়েড বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই এ ভ্রমের সংশোধন হয়, এবং রক্ত পরীক্ষাতে শ্বেতকণিকার অতিবৃদ্ধি দেখিয়া ইহা অনুমান করিতেও পারা যায়।

(৯) যক্ষ্মা—ইহার প্রথম অবস্থাকে টাইফয়েড বলিয়া ভুল হইতে পারে। বিশেষতঃ অল্পবয়স্কদিগের এই রোগ হইলে প্রথমে তাহার সহিত টাইফয়েডের মত লক্ষণও থাকে। এই জন্য সন্দেহক্ষেত্রে যত্ন সহকারে শ্বাসযন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

(১০) রক্তামাশা—ব্যাসিলারি ডিসেন্টেরির প্রথম অবস্থায় পেটের অসুখ ও জ্বর দেখিয়া উহা টাইফয়েড বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু রোগের আসল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। এরূপ সন্দেহ মাত্রেই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য রোগীর মল আনাইয়া স্বয়ং উহা প্রত্যক্ষ করা, নচেৎ পরের কথা শুনিয়া রোগ বিচার করিলে ভ্রম সংশোধনে বিলম্ব ঘটিতে পারে।

টাইফয়েডের রক্তাদি পরীক্ষা

টাইফয়েড সন্দেহ হইলে কয়েক প্রকার ল্যাবরেটরি পরীক্ষার দ্বারা রোগ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সেই সকল পরীক্ষা এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

(১) রোগীর শিরা হইতে রক্ত লইয়া সেই **রক্তের কাল্চার করা** (blood culture) টাইফয়েড চিনিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, কিন্তু উপযুক্ত ল্যাবরেটরি ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়। মফঃস্বলের অধিকাংশ স্থলেই এ পরীক্ষা করানো সম্ভব হয় না, কিন্তু যেখানে ল্যাবরেটরি আছে সেখানে এ সুযোগ

ত্যাগ করা উচিত নয়। টাইফয়েড-জাতীয় জ্বর হইলে প্রথম অবস্থাতে রক্তের কাল্চারে নিশ্চয়ই উহার বীজাণু বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু জ্বর প্রকাশ পাইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব রক্তের কাল্চার করানো উচিত, কারণ উহার কেবল প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই রক্তমধ্যে বীজাণু পাওয়া যায়, তৎপরে তথা হইতে উহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। সুতরাং জ্বরের সাত দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেলে আর কাল্চার করিয়া কোনোই ফল হয় না। কাল্চার করিতে হইলে শিরার মধ্য হইতে ৫ সি. সি. পরিমাণ রক্ত টানিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ উহা ষ্টেরাইল্ গ্লুকোজ ব্রথে (glucose broth) মিশাইয়া দিতে হয়, এবং তাহা অতঃপর ইন্‌কিউবেটরের (incubator) মধ্যে রাখিতে হয়। রক্তে বীজাণু থাকিলে তাহা ঐ ব্রথের মধ্যে দুই তিন দিনে বর্দ্ধিত হইয়া ওঠে; পরে উহা নানারূপ শর্করা-মিডিয়ার (sugar media) মধ্যে পুনরায় কাল্চার (sub-culture) করিয়া, এবং উহার গতিশীলতা (motility) প্রভৃতি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় উহা কোন জাতীয় বীজাণু। কিন্তু রক্ত লইবার সময় অতিরিক্ত সাবধানতার আবশ্যক, কারণ বাহিরের বীজাণু কোনোরূপে উহার সংস্পর্শে আসিলেই উহার মধ্যে তাহারই কাল্চার হইতে থাকে এবং রক্ত কাল্চারের যে উদ্দেশ্য তাহা বিফল হয়। অতএব যাঁহারা কাল্চার কার্য্যে দক্ষ তাঁহাদের দ্বারাই রক্তাদি লইবার ব্যবস্থা করা উচিত। যে জ্বর প্রথম হইতেই স্পষ্ট টাইফয়েড বলিয়া বুঝা যাইতেছে, সুযোগ থাকিলে তাহারও রক্তের কাল্চার করানো উচিত,—কারণ টাইফয়েডের লক্ষণ থাকিলেও উহা আসল টাইফয়েড বা প্যারাটাইফয়েড বা অন্য কোনো বীজাণুর রোগ, তাহা যত নিশ্চিতরূপে জানা যায় ততই সুবিধা, এবং তাহাতে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে অভ্রান্ত নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।

(২) **শ্বেত কণিকার মোট সংখ্যা ও তুলনামূলক সংখ্যা গণনা** (Total and differential count of leucocytes)—টাইফয়েডে শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু কমিয়া যায়, সুতরাং ইহা দেখিয়াও টাইফয়েড বলিয়া কতকটা ধারণা করিতে পারা যায়। অতএব যেখানে রক্ত কাল্চার বা ভিডাল্ পরীক্ষার কোনো উপায় নাই, সেখানে শ্বেত কণিকার গণনার দ্বারাই কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। তবে ইহা খুব নির্ভরযোগ্য

পরীক্ষা নয়, কারণ সকল টাইফয়েডেই শ্বেতকণিকার সংখ্যাহ্রাস হয় না। শ্বেত কণিকার তুলনামূলক সংখ্যা-তারতম্য (differential count) দেখিয়া রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে আরো কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। এই রোগে পলিনিউক্লিয়ার কণিকার (polynuclear leucocytes) সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু হ্রাস হয় এবং সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মনোনিউক্লিয়ার কণিকার (small and large mononuclears) সংখ্যা কিছু বাড়ে। তবে তুলনামূলক গণনার এই প্রকার সংখ্যাবৈচিত্র্য কালাজ্বর প্রভৃতি আরো কয়েকটি রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কতকটা অনুমান ছাড়া ইহাতে রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে অধিক সাহায্য পাওয়া যায় না।

(৩) ভিডাল্ পরীক্ষা (Widal test)—ভিডাল্ (Widal) কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ভিডাল্ পরীক্ষা। জ্বরের দশদিন অথবা অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাটিয়া যাওয়ার পর এই পরীক্ষা করা বিধেয়, কারণ তৎপূর্ব্বে রোগীর রক্ত এই পরীক্ষার উপযোগী হয় না। অল্প পরিমাণ রক্ত হইতেই এ পরীক্ষা করা যাইতে পারে, এবং উহা হইতে যে সিরাম (serum) নির্গত হয় তাহা লইয়াই এই পরীক্ষা করিতে হয়। কেহ কেহ শিরা হইতে রক্ত লইয়া এক প্রকারে চাক্ষুষ পরীক্ষা করেন (Dryer's macroscopic test), কেহ কেহ আঙুল ফুটাইয়া কয়েক ফোঁটা রক্ত লইয়াই (microscopic test) মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এই পরীক্ষা অন্যপ্রকারে করেন। টাইফয়েড জাতীয় বীজাণুর (অ্যান্টিজেন্) দ্বারা রোগীর রক্তের সিরামে এমন এক নূতন শক্তি (অ্যান্টিবডি) জন্মলাভ করে, যাহার ফলে পুনরায় কতকগুলি টাইফয়েড বীজাণু উহার সংস্পর্শে আসিলেই ঐ সকল বীজাণু একত্রে গাত্রসংলগ্ন হইয়া জুড়িয়া যায় এবং গুচ্ছে গুচ্ছে তাল পাকাইয়া অবস্থান করে। অ্যান্টিজেন্ ও অ্যান্টিবডির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উৎপন্ন এইরূপ ক্রিয়াকে agglutination বলা হয়। যে জাতীয় বীজাণু কর্তৃক রোগ জন্মিয়াছে, রোগীর সিরামের মধ্যে কেবল ঐ জাতীয় বীজাণু মিশাইয়া দিলেই উহারা এইরূপে তাল পাকাইয়া যাইবে, অন্য কোনো বীজাণু নয়। কারণ রোগীর সিরাম ঐ বিশিষ্ট-জাতীয় বীজাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই এই বিশিষ্ট-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে রোগীর সিরাম পৃথক

পৃথক টিউবে অথবা স্লাইডে লইয়া পর্য্যায়ক্রমে টাইফয়েড ও কয়প্রকার প্যারাটাইফয়েডের বীজাণুর কাল্‌চার উহার সহিত মিশাইয়া পাশাপাশি
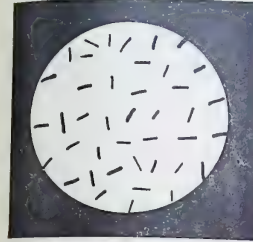
নেগেটিভ

পজিটিভ

মাইক্রোস্কোপিক ভিডাল্ পরীক্ষায় বীজাণুগুলিকে এইরূপ অবস্থায় দেখা যায়

সাজাইয়া রাখা হয়, এবং কিছুকাল উহাতে অল্পাধিক তাপ প্রয়োগ করা হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে যদি দেখা যায় যে উহার মধ্যে কোনোটিতে বীজাণুর তাল পাকাইয়া গিয়াছে, তখন জানা যায় যে ঐ নির্দ্দিষ্ট প্রকার বীজাণুর দ্বারাই রোগটি সৃষ্ট হইয়াছে। (টাইফয়েড বীজাণুর দুই প্রকার অ্যান্টিজেন আছে। লেজবিশিষ্ট বীজাণুর অ্যান্টিজেন স্বতন্ত্রপ্রকার, উহার নাম H-অ্যান্টিজেন। লেজবিহীন বীজাণুর অ্যান্টিজেনের নাম O-অ্যান্টিজেন। অতএব দুই প্রকার অ্যান্টিজেন দিয়াই পরীক্ষা করা আবশ্যক।) এই পরীক্ষা এতই নিশ্চিত যে ইহাতে কোনো প্রকার ভুল বা ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই ভিডাল্ পরীক্ষার ফলাফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারা যায়। সাধারণ চিকিৎসকের পক্ষে ইহার ব্যবস্থা করাও বিশেষ কঠিন নয়, তবে ইহার পদ্ধতি কিছু শিক্ষা করা আবশ্যক। ম্যাক্রোস্কোপিক (macroscopic) বা চাক্ষুষ ভিডাল্ পরীক্ষা করা অতি সহজ এবং ইহার জন্য মাইক্রোস্কোপের আবশ্যক নাই। ইহার জন্য টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড বীজাণুর জীবন্ত-কাল্‌চারেরও আবশ্যক নাই, মৃত কাল্‌চারের দ্বারাই এ পরীক্ষা করা হয়, সুতরাং তাহাতে অসাবধানতা হেতু পরীক্ষকের

রোগ সংক্রমণ হইবারও সম্ভাবনা নাই। এইরূপ মৃত-কাল্‌চার নিজে প্রস্তত করিয়া লইবারও আবশ্যক নাই,—টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েডের স্বতন্ত্র মৃত-কাল্‌চার "Typhoid and Paratyphoid emulsions for Widal test" নামে বাজারে আজকাল কিনিতে পাওয়া যায়। কসৌলি সেণ্ট্র্যাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিট্যুটে অর্ডার দিলেও তাহারা সস্তা দরে উহা সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহা আনাইয়া লইলে অতঃপর কয়েকটি ভিডাল্-টিউব, কিছু সেলাইন জল, একটি পিপেট, একটি থার্ম্মোমিটার, একটি ভিডাল্-বাথ (Widal bath) ও একটি ভিডাল্ টিউব-র‍্যাক্ হইলেই অনায়াসে ইহা করা যাইতে পরে।

রোগীর সিরাম অল্প পরিমাণে লইয়া উহা সেলাইন জলের সহিত দশগুণ ও তাহার উর্দ্ধতন হিসাবে মিশাইয়া পাৎলা করিয়া, অতঃপর উহার ভিন্ন
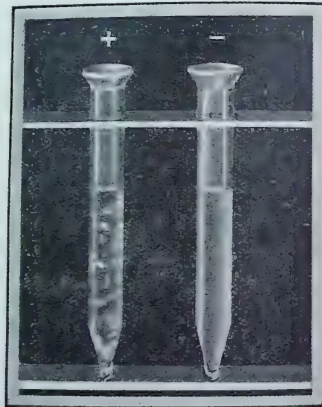
পজিটিভ নেগেটিভ

ম্যাক্রোস্কোপিক বা চাক্ষুব ভিডাল্ পরীক্ষার ফল এইরূপ দেখা যায়

ভিন্ন ডাইলিউশনের সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বীজাণু-ইমাল্‌শন মিশাইয়া সারি

সারি টিউব সাজাইয়া ৫৬ ডিগ্রী (56°C.) উত্তাপে দুই ঘণ্টাকাল বাথের মধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। যদি সমজাতীয় বীজাণুর সহিত রোগীর সিরাম মিশিয়া থাকে তবে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে ঐ ইমাল্‌শন দধির মত ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ বীজাণু তাল পাকাইয়া আছে (agglutinated)। ইহাকেই বলে ভিডাল্ পজিটিভের (Widal positive) চিহ্ন। একবার দেখিয়া লইলেই এই পরীক্ষা প্রণালী সকলে আয়ত্ত করিতে পারেন। এই পরীক্ষার দ্বারা রোগের কিরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া যায় তাহাও জানা প্রয়োজন। অনেক সময় বিনা কারণেও সিরামের সহিত মিশিলে বীজাণুগুলি তাল পাকাইয়া যায়, সেইজন্য সিরামের সহিত সেলাইন মিশাইয়া যথেষ্ট পাৎলা করিয়া এই পরীক্ষা করা হয়; কারণ আসল রোগটি ভিন্ন অন্য কোনো অবস্থায় অধিক পাৎলা ডাইলিউশনের উপর উক্তপ্রকার ক্রিয়া হইতে পারে না। এইজন্য যদি ভিডাল্ পরীক্ষায় মাত্র $\frac{১}{২০}$ বা $\frac{১}{৪০}$ ডাইলিউশনে টাইফয়েড বীজাণুর agglutination হয় তবে তাহার কোনো মূল্য দেওয়া হয় না, কিন্তু যদি $\frac{১}{৮০}$ (1 in 80) বা আরো অধিক ডাইলিউশনে উহার চিহ্ন দেখা যায়, তবে তাহা নিশ্চিত চিহ্ন বলিয়া ধার্য্য করা হয়। ইহা কেবল টাইফয়েডের সম্বন্ধেই বলা হইল। প্যারাটাইফয়েডগুলির ডাইলিউশন বিচার অন্যরূপ। প্যারাটাইফয়েড 'এ' হইলে $\frac{১}{৩০}$ (1 in 30) ডাইলিউশনেই তাহা 'পজিটিভ্' বুঝিতে হইবে, কিন্তু প্যারাটাইফয়েড 'বি' হইলে $\frac{১}{১২০}$ (1 in 120) ডাইলিউশনের নিম্নে চিহ্ন দেখা গেলে উহা গ্রাহ্য হইবে না।

ভিডাল্ পরীক্ষায় যদি রোগের কোনো নির্দ্দেশ না পাওয়া যায় অথচ রোগটি যদি টাইফয়েডেরই মত হয়, তবে একবার পরীক্ষায় নিশ্চিন্ত না হইয়া কয়েকদিন অপেক্ষার পর পুনরায় পরীক্ষা করানো আবশ্যক, কারণ রোগীর রক্তে ঐরূপ বিশিষ্ট শক্তি বিলম্বেও আসিতে পারে।

(8) রোগ কিছুদিনের পুরাতন হইলে রোগীর মল ও মূত্রের কাল্‌চার করিলেও তন্মধ্যে বীজাণু পাওয়া যাইতে পারে। যখন অন্যান্য পরীক্ষায় কিছু নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না, তখন এই ব্যবস্থার আবশ্যক হইতে পারে। ইহার জন্যও উত্তম ল্যাবরেটরি আবশ্যক।

চিকিৎসা

"Typhoid fever is not a disease to be treated mainly with drugs"—কেবল ঔষধের দ্বারা টাইফয়েডের চিকিৎসা হয় না। এ রোগের কোনো বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র ঔষধ নাই, কিন্তু ইহার চিকিৎসার কতকগুলি নির্দ্ধারিত পন্থা আছে। আমাদের দেশে সাধারণ লোকে ইহাকে বলে "মেয়াদী জ্বর"—অর্থাৎ যতদিন ইহার মেয়াদ ততদিন পর্য্যন্ত নিশ্চয় থাকিবে, তাহার পর আরোগ্য হইবে। অদ্যাপি এমন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার দ্বারা মেয়াদের পূর্ব্বে ইহা আরোগ্য করা যাইতে পারে। অতএব এই রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থায় কেবল ইহাই করিতে হয় যাহাতে উহার মেয়াদের শেষ পর্য্যন্ত রোগীকে নানারূপ দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় এবং তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে ঐ মেয়াদ-সীমা অতিক্রম করাইয়া নিরাপদের সীমায় আনিতে পারা যায়। কেবল মাত্র ঔষধের দ্বারা ইহা সম্ভব নয়,—ঔষধ, পথ্য, পরিচর্য্যা প্রভৃতি সকল দিয়াই তাহাকে সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। কেবল ঔষধেই ইহার চিকিৎসা নয়, উপযুক্ত পথ্যেও ইহার চিকিৎসা, উপযুক্ত পরিচর্য্যাতেও ইহার চিকিৎসা। সম্পূর্ণ অসহায় ব্যক্তি বিপদে পড়িলে যেমন সমবেত শক্তির দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করিতে হয়, টাইফয়েড হইলে রোগী সেইরূপই অসহায় হইয়া পড়ে, এবং এখানে সমবেত সাহায্যের প্রয়োজন। এইজন্য চিকিৎসক অপেক্ষাও পরিচর্য্যাকারীর কর্ত্তব্য এখানে অনেক, এবং এইজন্যই ইহাতে পরিচর্য্যার নানাপ্রকার বাঁধাবাঁধি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই রোগে পেটের ভিতর ঘা জন্মায় ও তাহার বিষ হইতেই জ্বরবিকারের সূত্রপাত হয়, এবং ঐ ঘা যতদিন না শুকায় ততদিন রোগ আরোগ্য হয় না। অতএব,—**প্রথমতঃ**, এই চেষ্টাই করা উচিত যাহাতে বিষ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা নানাপথ দিয়া নির্গত হইয়া যায়, শরীরের মধ্যে উহা জমিয়া থাকিতে না পারে; **দ্বিতীয়তঃ**, যাহাতে ঘা গুলি কোনোরূপ অযত্নে অথবা পথ্যের দোষে হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্ত না হয় ও রক্তপাতাদি না হইতে পারে; **তৃতীয়তঃ**,

যাহাতে অতিরিক্ত জ্বরভোগ হেতু অথবা উপযুক্ত পথ্যাদির অভাবে রোগী দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া রোগের সহিত সংগ্রামে অবসন্ন হইয়া না পড়ে; এবং **চতুর্থতঃ**, যাহাতে কোনোরূপ আনুষঙ্গিক উপসর্গ উপস্থিত না হয়, অথবা উপস্থিত হইবামাত্র তাহা লক্ষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকার করা হয়। টাইফয়েড চিকিৎসার ইহাই সারকথা। এই সূত্রগুলি মনে রাখিয়া সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিতে হইবে। বিভিন্ন পর্য্যায়ে এই সকল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সেইজন্য পর্য্যায়ক্রমে তাহা উল্লিখিত হইল। এগুলি সমস্তই চিকিৎসার অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পরিচর্য্যার দ্বারা (Nursing)—টাইফয়েড-পরিচর্য্যার নানাপ্রকার নিয়ম আছে, তাহা রীতিমত শিক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু অশিক্ষিত হইলেও অনেকের এ সম্বন্ধে অসাধারণ পটুত্ব থাকিতে দেখা যায়। এ রোগের পরিচর্য্যা সকলে করিতে পারে না, অনেক চিকিৎসকও উহা পারে না। তবে পরিচর্য্যা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন, এবং চিকিৎসকই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; তাঁহাকে কেবল এই কথাই বুঝাইয়া দিতে হইবে যে এই রোগে পরিচর্য্যার মূলমন্ত্র রোগীকে **নিজের দ্বারা কিছুই করিতে না দেওয়া**, অর্থাৎ সকল প্রকারের প্রয়াস হইতে তাহাকে বিরত রাখা। রোগী স্বচেষ্টায় কেবলমাত্র নিশ্বাস গ্রহণ করিবে, খাদ্যাদি গলাধঃকরণ করিবে, এবং প্রয়োজন হইলে শুইয়া শুইয়া মল মূত্রাদি ত্যাগ করিবে; তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু আবশ্যক তাহা সমস্তই পরিচর্য্যাকারী করাইয়া দিবে। পরিচর্য্যার এই মর্ম্মটুকু জানা থাকিলে আর কিছুই শিখাইবার আবশ্যক নাই। কেবল ঔষধপথ্য দেওয়া, এবং জ্বর দেখা বা পাখার বাতাস করাই রোগের পরিচর্য্যা নয়, রোগী যাহাতে দেহ মনে সর্ব্বতোভাবে বিশ্রাম পায় তাহাই দেখা প্রধান কর্ত্তব্য। কঠিন রোগীকে আপন চেষ্টায় পাশ ফিরিতে পর্য্যন্ত দেওয়া নিষেধ, তাহাও পরিচর্য্যাকারী করাইয়া দিবে। ইহা ছাড়া প্রত্যহ নিয়মিত মুখ ধোয়ানো, গা মোছানো, ইত্যাদি বহু কর্ত্তব্য তাহাকে করিতে হইবে। যেখানে এরূপ পরিচর্য্যা হওয়া সম্ভব নয় সেখানে এ সকল রোগীকে বাড়ীতে রাখিয়া চিকিৎসা করাই বিড়ম্বনা,—সে স্থলে তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু

পল্লীগ্রাম অঞ্চলে যেখানে হাঁসপাতাল নাই, সেখানে চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে পরিচর্য্যার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা এবং কোথাও কোনো ত্রুটি বা অবহেলা হইতেছে কিনা সে বিষয়ে নিয়ত লক্ষ্য রাখা।

জলপ্রয়োগের দ্বারা (Hydrotherapy)—জল-চিকিৎসা এ রোগে বড়ই উপকারী। কেবলমাত্র জলের দ্বারাই বহু টাইফয়েড রোগীর প্রাণরক্ষা করা যায়। নির্ভয়ে রোগীর ভিতরে এবং বাহিরে (inside and outside) প্রচুর পরিমাণে জলপ্রয়োগ করিতে পারিলে রোগের বিষ অনেক নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে ঠাণ্ডা লাগার ভয় নাই, নিউমোনিয়ার আশঙ্কা নাই,—আর যাহার সন্নিপাত উপস্থিত হইয়াছে তাহার একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই বা ক্ষতি কি? টাইফয়েডে কিছু শ্লেষ্মার লক্ষণ উপস্থিত হইলে অনেকে মনে করেন যে গা মোছাইয়া বা মাথায় বরফ দিয়া বুঝি ঠাণ্ডা লাগিয়া গেল। ইহা ভুল ধারণা। সর্দ্দি-কাসি এই রোগের অবশ্যম্ভাবী উপসর্গ মাত্র, এবং তাহাতে যে আরোগ্যের আশা কিছু কমিয়া যায় এমনও নয়। ঠাণ্ডা লাগিলেও এ রোগে কিছু অতিরিক্ত অনিষ্ট হয় না। বিলাতে এই লইয়া বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এবং ইহা অনিষ্টকারী নয় বুঝিয়াই ঐরূপ শীতপ্রধান দেশে টাইফয়েড মাত্রেই রোগীকে স্নানাদি করানোর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শীতের দেশেও যদি কোনো ভয়ের কারণ না থাকে তবে এই গরম দেশে নিশ্চয়ই উহাতে ভয়ের কোনো কারণ নাই।

বিলাতে কিরূপে এই চিকিৎসা প্রথম প্রচলিত হইল তাহার ইতিহাস অতি বিস্ময়কর। ১৭৯৮ সালে এডিনবার্গের জনৈক চিকিৎসক জেম্‌স্ কারি (James Currie) দৈবাৎ ইহা লক্ষ্য করেন যে টাইফয়েড-রোগীকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইলে তাহারা শীঘ্র আরোগ্য হয়। তখন জাহাজের নাবিকদের মধ্যে টাইফয়েডের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। তন্মধ্যে যাহারা কেবিনের ভিতর আশ্রয় পাইত তাহারাই বেশী ভুগিত, কিন্তু যাহারা আশ্রয় না পাইয়া খোলা ডেকের উপর পড়িয়া থাকিত এবং সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিত, তাহাদেরই শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হইতে দেখা যাইত। ইহা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এ সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করেন। তৎপরে ১৮৬১ সালে ব্র্যাণ্ড্ (Brand) নামক চিকিৎসক টাইফয়েডে

জল-চিকিৎসার রীতিমত প্রতিষ্ঠা করেন, সেইজন্য তাঁহার নির্দ্দেশিত প্রণালীতে স্নান করানোর নাম ব্র্যাণ্ড্‌বাথ্ (Brand bath)। ব্র্যাণ্ড্‌বাথ্ দিতে হইলে একটি জলভরা টবের মধ্যে (৭০ হইতে ৮০ ডিগ্রী টেম্পারেচার) রোগীকে নিমজ্জিত করিয়া ১৫ মিনিট কাল বসাইয়া রাখিতে হয় এবং হস্তপদাদির মার্জ্জনা করিয়া দিতে হয়; তৎপরে উহাকে বিছানায় লইয়া শুকবস্ত্রের দ্বারা গা মুছাইয়া দিতে হয়। আজকাল ব্র্যাণ্ড্ বাথের নানারূপ উন্নতি হইয়াছে।

ইউরোপের হাঁসপাতাল মাত্রেই এখন এই নিয়ম আছে যে টাইফয়েড-রোগী হইলেই তাহাকে ৪ ঘণ্টা অন্তর একবার করিয়া ১০।১৫ মিনিট যাবৎ স্নান করানো হইবে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত জ্বর না ছাড়ে ততদিন পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রত্যহ বজায় থাকিবে, রোগীর অবস্থা যেমনই হউক। জলের তাপের পরিমাণ হইবে ৮০ হইতে ৮৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের গায়ের যেরূপ উত্তাপ তাহা অপেক্ষা জল কিছু শীতল হইবে, কিন্তু এমন শীতল নয় যাহাতে স্পর্শমাত্রে উহা ছাঁৎ করিয়া গায়ে লাগে। আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকে হয় তো মনে করেন যে কেবল জ্বরের উত্তাপ কমাইবার জন্যই রোগীকে স্নান করানো বা স্পঞ্জ্ করা হয়। কিন্তু তাহাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, ইহার নানাপ্রকার উপকারিতা আছে এবং সেইজন্যই ইহার এত প্রচলন। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ এই যে ইহার দ্বারা হৃৎপিণ্ড এবং রক্তশিরাগুলি যথেষ্ট সামর্থ্য পায় (cardio-vascular tonic)। ক্লেন্‌ডেনিং (Clendening) লিখিয়াছেন যে স্নানের মত উত্তম হার্ট-ষ্টিমুল্যাণ্ট্ আর দ্বিতীয় নাই, কোনো ঔষধে ইহার মত উপকার করিতে পারে না—('No drug in the world is so valuable as a stimulant to the heart and as a tonic to the blood-pressure as is the proper application of hydrotherapy)। স্নান করানোর আরো অনেক গুণ আছে। স্নানের রীতিমত ব্যবস্থা করাতেই এখন টাইফয়েডের মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে ইহাতে ২০% মৃত্যু হইত, সেখানে জল-চিকিৎসার ফলে এখন আর ১০%-এর অধিক মৃত্যু হয় না।

জলচিকিৎসায় চর্ম্মস্থ লোমকূপগুলি পরিষ্কৃত হইয়া রোগের বিষ নির্গমনে যথেষ্ট সাহায্য করে; ইহাতে উত্তপ্ত ও তদ্দরুণ প্রসারিত (dilated) রক্তশিরাসকল সঙ্কুচিত হইয়া হার্টের পরিশ্রমের যথেষ্ট লাঘব করে, এইজন্য ইহার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াও যথেষ্ট স্বাভাবিক হইয়া আসে;

তদ্ব্যতীত ইহা স্নায়ুগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া রোগীর মস্তিষ্ক অবিকৃত রাখে। রোগের প্রথম অবস্থা হইতে রোগীকে রীতিমত স্নান করাইতে থাকিলে পরে আর ষ্টিমুল্যাণ্ট বা ব্রাণ্ডি প্রভৃতির দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে হার্টকে সবল করিবার কোনোই আবশ্যক হয় না। কেবল তাহাই নয়, ইহাতে জ্বর কমে, ভুল বকা বন্ধ হয়, হাতের ও পায়ের খিঁচুনি দূর হয়, পেটের উপকার হয়, জিভ পরিষ্কার হইয়া আসে, মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। যে রোগীকে কোনোমতে পথ্য দেওয়া যাইতেছে না, তাহাকে স্নান করাইয়া পথ্য খাইতে দিলে তখন আর সে আপত্তি করে না। অতএব টাইফয়েড মাত্রেই প্রত্যহ দুইতিনবার বাথ বা স্পঞ্জিং প্রভৃতির ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

টাইফয়েডে সকল অবস্থাতেই স্নান করানো যাইতে পারে, কেবল যাহাদের রক্তদাস্ত হইতেছে অথবা যাহাদের পেরিটোনাইটিসের লক্ষণ দেখা দিয়াছে তাহাদের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ। এখানে বার বার 'স্নান' শব্দের প্রয়োগ করা হইতেছে এইজন্য যে উহা কেবলমাত্র গামছা ভিজাইয়া গা মুছিয়া দেওয়া নয়, গায়ে রীতিমত জলের সংস্পর্শ হওয়া চাই এবং অন্ততঃ ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত জব্‌জবে ভিজা কাপড় গায়ের সহিত লাগিয়া থাকা চাই, ও তদ্দ্বারা এক একটি অঙ্গ পৃথক পৃথকভাবে মার্জ্জনা করা চাই। বলা বাহুল্য স্পঞ্জিংএর পূর্ব্বে বিছানায় অয়েলক্লথ পাতিয়া লইতে হইবে এবং ঘরে সে সময় যেন ঠাণ্ডা বাতাস না আসে সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। অন্যান্য ব্যবস্থা কিরূপ করিতে হইবে পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

টাইফয়েডে মাথায় বরফ দেওয়ার প্রথা আজকাল সর্ব্বত্রই প্রচলিত। একটি রবারের থলির মধ্যে বরফ ভরিয়া তাহা মাথার উপর অনবরত ধরিয়া রাখা হয়, ইহাতে উত্তেজনাও কিছু নিবৃত্ত থাকে এবং জরেরও কিছু উপশম হইতে পারে। তবে মাথায় বরফ দেওয়া সম্বন্ধে দুইমত আছে। একদল বলেন ইহাতে উপকার হয়, আর একদল বলেন অনবরত বরফ লাগাইলে মস্তিষ্কের স্নায়ুসকল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। মোটের উপর এই কথা বলা চলে যে টাইফয়েড হইলেই সর্ব্বদা মাথায় বরফ দিতে হইবে এমন কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। যদি মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ

থাকে বা জ্বর অত্যন্ত অধিক থাকে, এবং রোগী মাথায় বরফ দিতে ইচ্ছা করে অথবা উহাতে আপত্তি না করে, তাহা হইলে উহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনবরতই বরফ দিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। রোগী বিরক্ত বোধ করিলে অথবা জ্বরের কিছু উপশম দেখিলে উহা মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করা উচিত। মাথায় বরফ দেওয়া অপেক্ষা পেটের উপর বরফ দেওয়া আরো ভাল। এ সকল প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

পানীয়ের দ্বারা (Liquids)—টাইফয়েড রোগীর সকলপ্রকার পথ্যই পানীয়, কোনোরূপ কঠিন খাদ্য এই রোগে বহুদিনের জন্য নিষিদ্ধ। আর ইহাতে জল প্রচুর পরিমাণে পান করাইতে থাকা নিতান্তই আবশ্যক; রোগী তাহাতে আপত্তি করিলে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা সুগন্ধ ও সুস্বাদু নানাপ্রকার পানীয় বারে বারে পরিবর্ত্তন করিয়া কোনোরূপে যথেষ্ট জল পান করাইতে হইবে। পরিচর্য্যাকারীর বাহাদুরী এইখানেই। তাহাকে দেখিতে হইবে যেন কোনো উপায়ে প্রত্যহ ৪।৫ পাইণ্ট বা ২।৩ সের জল রোগীকে পান করানো হয়। জলের সহিত গ্লুকোজ মিশাইয়া দেওয়া অতি উত্তম ব্যবস্থা। আজকাল অনেকরকম সুস্বাদু **গ্লুকোজ** বা **ডেক্স্‌ট্রোজ্‌** (Dextrose) পাওয়া যায়। গ্লুকোজে প্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং হৃৎপিণ্ডকে সবল করে। গ্লুকোজের খাদ্যগুণও যথেষ্ট। উত্তম শর্করাজাতীয় খাদ্য বলিয়া জ্বরের দাহের মুখে ইহা ইন্ধন যোগাইবার কার্য্য করে এবং শরীরের অতিরিক্ত ক্ষয় নিবারণ করে। রোগের বিষকেও ইহা কতক পরিমাণে নষ্ট করিতে পারে। সেইজন্য জ্বরে গ্লুকোজ যত ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। প্রত্যহ ৩।৪ আউন্স পরিমাণ গ্লুকোজ রোগীমাত্রকেই অনায়াসে দেওয়া যায়। কেবল জলের সহিত নয়, সকলপ্রকার খাদ্যের সহিত গ্লুকোজ মিশাইয়া দেওয়া চলিতে পারে। যদি গ্লুকোজে পেট ফাঁপে, তবে **ল্যাক্‌টোজ** (Lactose) অথবা সুগার অফ মিল্ক (Milk sugar) দেওয়া যাইতে পারে। রোগী অশিক্ষিত হইলে অনেক চিকিৎসক এক আউন্স গ্লুকোজ এক বোতল জলে মিশাইয়া ঔষধের মত তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পান করাইতে আদেশ দিয়া যান। অনেকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র এইপ্রকার পানীয়ের মধ্য দিয়া ঔষধেরও ব্যবস্থা করেন,

অর্থাৎ এক বোতল জলে ১ আউন্স গ্লুকোজের সহিত সোডা সাইট্রেট্ ২ ড্রাম, ও ইউরোট্রোপিন (Urotropine) ৩০ গ্রেন একত্রে মিশাইয়া সমস্ত দিনে কেবল উহাই ঔষধ হিসাবে পান করিতে দেন, অন্য কোনো স্বতন্ত্র মিকশ্চারের ব্যবস্থা করেন না। ইহাতে ঔষধ ও পথ্য দুইই চলিতে থাকে, এবং রোগী বিশেষ আপত্তি করে না। যেখানে গ্লুকোজের অভাব সেখানে তালের মিছরির জল ফুটাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

পূর্ব্বে Acetozone water (Acetozone $2\frac{1}{2}$ grains per pint of water) পান করিতে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, ইহাতে পেটের পক্ষে উপকার হইত ও পেটের ফাঁপ কমিত। কিন্তু Acetozone আজকাল দুষ্প্রাপ্য।

অনেক রোগী বরফ খাইতে চায়, কারণ উহাতে কিছুক্ষণের জন্য দাহ ও পিপাসা নিবারণ হয়। দুই এক টুক্‌রা বরফ মধ্যে মধ্যে দিতে আপত্তি নাই, কিন্তু বরফ দেওয়া অপেক্ষা বরফের মধ্যে রাখিয়া বা Refrigerator-এর মধ্যে জল ও পানীয় ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া খাইতে দেওয়াই সর্ব্বোত্তম উপায়। পল্লীগ্রামে জল ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য নানারূপ প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। যেখানে বরফের অভাব সেখানে রোগীর জন্য ঐ সকল ব্যবস্থা করা উচিত। পল্লীগ্রামে রোগীর পানীয় জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া বীজাণুমুক্ত করিয়া পরে তাহা শীতল করিয়া রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।

এই রোগে কচি ডাবের জল অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। ডাব পূর্ব্ব হইতে জলে ডুবাইয়া রাখিলে উহার ভিতরকার জল শীতল হয়।

পথ্যের দ্বারা (Diets)—টাইফয়েড-রোগীর পথ্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। এই রোগে পথ্য সম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ দেখা যায়, কারণ যিনি যেমন পথ্য দিয়া উপকার পাইয়াছেন, তিনি আপন অভিজ্ঞতা অনুসারেই উহার ব্যবস্থা করিতে চান; কিন্তু পথ্য সম্বন্ধে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ আছে।

আমাদের দেশের কোনো কোনো চিকিৎসক এই কথা বলেন যে যেহেতু এই রোগে পেটের ভিতরেই ঘা হয় এবং হজমশক্তিও ইহাতে যথেষ্ট বিকৃত হইয়া যায়, সেই হেতু রোগীকে জলবার্লি ছাড়া আর কিছুই খাইতে দেওয়া উচিত নয়; ইহাতে

রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে বটে কিন্তু মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা সেকালের কথা; ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ ধারণাই সকলের ছিল, তৎপরে শরীরতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার ফলে এখন এই ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে ডাব্‌লিন শহরে গ্রেভ্‌স্ (Graves) নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন, তিনি জ্বর মাত্রেই প্রচুর পথ্য দিতেন, এবং মৃত্যুকালেও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার সমাধির উপর যেন লেখা হয়, তিনি জ্বরের রোগীকে খাইতে দিতেন—('He fed fevers')। বর্ত্তমানের চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাঁহার পন্থাই অনুমোদন করিয়াছে। এখন জ্বরে রীতিমত পথ্য দিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করিয়া টাইফয়েড রোগীর পথ্য সম্বন্ধে বহু প্রকার এক্সপেরিমেণ্ট্ (metabolism experiments) হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে টাইফয়েডে পথ্যের পরিমাণ বাড়াইবার অনেক বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। উচিত পরিমাণ পথ্য না দিলে টাইফয়েড-রোগীর ওজন প্রায় সিকি ভাগ কমিয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন কোনো লাভ নাই। টাইফয়েড রোগীর নিম্নস্থ অন্ত্রে ক্ষত হইলেও উহার পাকাশয়ের হজমশক্তি কিছুই নষ্ট হয় না, উচিত প্রকারের পথ্য দিলে সে সুস্থ ব্যক্তির মতই উহা হজম করিতে পারে। এখন সেই জন্য টাইফয়েড রোগে রীতিমত পথ্যের ব্যবস্থা করা হয়।

এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—টাইফয়েডে নিরবচ্ছিন্ন দাহ হইবার ফলে শরীরের সার বস্তুগুলি শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, অতএব সেই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য সুস্থ অবস্থা অপেক্ষা তখন পথ্যের অধিক প্রয়োজন। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে এ অবস্থায় প্রোটীন (protein) ও শর্করা জাতীয় (carbohydrate) খাদ্য সুস্থাবস্থা অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ অধিক পরিমাণে (40% more) দিলে তবে সেই ক্ষতির পূরণ হওয়া সম্ভব। প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা দেখান যে বিলাতের হাঁসপাতালে এই ভাবে খাদ্য দেওয়াতে টাইফয়েড রোগীর অনিষ্ট না হইয়া বরং উপকার হয়;—উপযুক্ত খাদ্য দানে জ্বর সত্ত্বেও রোগীর শরীরের ওজন খুব কমে না, এবং জ্বর ছাড়িবার পর শরীর সারিতে অধিক বিলম্ব হয় না। নতুবা দীর্ঘকালযাবৎ রোগীকে অল্পাহার করাইয়া রাখিলে একদিকে জ্বরের দাহ, অন্যদিকে পুষ্টির অভাব, দুইয়ে মিলিয়া তাহাকে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। মস্তিষ্ক বিকৃতি, হাত পায়ের খিঁচুনি, শ্লেষ্মার অধিকার, নানারূপ অঙ্গহানির লক্ষণ, প্রভৃতি যে সকল উপসর্গ এই রোগের শেষের দিকে উপস্থিত হইতে প্রায়ই দেখা যায়, ইঁহাদের মতে খাদ্যের অভাব-জনিত দুর্ব্বলতা হইতেই এগুলি ঘটিবার সুযোগ পায়। টাইফয়েডে বহুদিন

যাবং ভুগিয়া শেষ অবস্থায় যে সকল রোগী মারা যায়, ইহারা বলেন উপযুক্ত পথ্যের অভাবই তাহার অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ। অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে যেমন তাহাতে অ্যাসিটোন (acetone) নামক অস্বাভাবিক পদার্থ জন্মিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, টাইফয়েড-রোগীর প্রস্রাবেও কখনো কখনো উহা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। অনশন ঘটিলেই অ্যাসিটোনের উৎপত্তি হয়। অতএব প্রস্রাবে অ্যাসিটোনের চিহ্ন পাওয়া গেলে এবং নাড়ীর গতি চঞ্চল ও হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল দেখিলে বুঝিতে হইবে রোগীর খাদ্যের অভাব ঘটিতেছে, গ্লুকোজ প্রভৃতি শর্করাজাতীয় খাদ্য তথায় অধিক মাত্রায় দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

এ সকল প্রমাণসিদ্ধ কথা, সুতরাং সন্দেহের কোনো কারণ নাই। পথ্যাদির রীতিমত ব্যবস্থার পর হইতে টাইফয়েডের মৃত্যুসংখ্যা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। পূর্ব্বে প্রায়ই দেখা যাইত যে টাইফয়েডের পর অনেকের কিছু অঙ্গহানি হইত,—কাহারো বা অন্ধত্ব, কাহারো বা মস্তিষ্কবিকৃতি প্রভৃতি উপস্থিত হইত; আজকাল রীতিমত পথ্য পানীয় ও স্নানের ব্যবস্থা হওয়াতে তাহার সংখ্যাও অনেক কমিয়া গিয়াছে, এবং মৃত্যুসংখ্যাও কমিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে শতকরা ১০-টির অধিক টাইফয়েড-রোগী মরিলে তাহা চিকিৎসকের পক্ষে অপযশের কথা।

যাহা হউক আমাদের সকল দিক বিচার করিয়াই পথ্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। টাইফয়েড জ্বরের উপর মাংসের শুরুয়া প্রভৃতি দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া রোগীকে দিনের পর দিন কেবল জলবার্লি খাওয়াইয়া রাখাও ঠিক নয়। রোগীর শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পথ্য দিতে হইবে, আবার যাহাতে অযথা খাদ্যের দ্বারা কোনো প্রকার অপচার না ঘটে, বা পেটের দোষ উপস্থিত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রধানতঃ দুই প্রকার খাদ্যই রোগীকে দেওয়া প্রয়োজন,—**প্রোটীন ও কার্ব্বোহাইড্রেট**। দুধ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য। কিন্তু টাইফয়েডে দুধ প্রায়ই হজম হয় না, এবং উহা পেটে গিয়া যেরূপ কঠিন ছানায় পরিণত হয় তাহাতে উহার দ্বারা অন্ত্রমধ্যে অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা আছে। এইজন্যই এ রোগে দুধের পরিবর্ত্তে ছানা-কাটা দুধের (milkwhey) ব্যবস্থা করা হয়; ফুটন্ত দুধে লেবুর রস দিয়া ছানা কাটাইয়া যে জলটুকু ছাঁকিয়া লওয়া হয় তাহাই ছানাকাটা দুধ বা 'ছানার

জল'। প্রোটীন-খাদ্য হিসাবে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু কার্ব্বোহাইড্রেট-খাদ্য ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেওয়া প্রয়োজন। কার্ব্বোহাইড্রেটই শরীরের নিজস্ব প্রোটীনকে বাঁচাইয়া রাখে (carbohydrates are the great sparers of protein), সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণে উহা দিতে থাকিলে আর প্রোটীন দিবার কোনোই আবশ্যক নাই। জ্বরকালে কার্ব্বোহাইড্রেট্ অতি সহজে হজম হয় এবং উপস্থিত অবস্থানুযায়ী শরীর রক্ষার প্রয়োজন সিদ্ধ করে। গ্লুকোজ, ল্যাক্‌টোজ্, মেলিন্‌স্ ফুড, নেস্‌ল্‌স্ ফুড, হর্লিক, বার্লি, মিছরির জল, প্রভৃতি সবই কার্ব্বোহাইড্রেট খাদ্য। প্রতি দফায় অদল বদল করিয়া এইগুলি স্বচ্ছন্দে একটির পর একটি ব্যবহার করা চলিতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত হজমের কোনো ব্যতিক্রম না দেখা যায় ততক্ষণ এই সকল খাদ্যে কোনোই বাধা নাই। রোগের অবস্থা যেমনই হউক, এই সকল খাদ্য নিয়মিতরূপে দিতে থাকা উচিত। অক্ষুধা থাকিলেও সময়মত পথ্য দিতে কোনো দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়, মনে রাখা উচিত যে রোগী খাইতে না চাহিলেও তাহার হজমশক্তি অটুট আছে। কিন্তু কোনো কোনো রোগী খাইতে এমন প্রবল আপত্তি করে যে তখন নিয়মিত পথ্য দেওয়া সত্যসত্যই কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ছেলেদের টাইফয়েডে পথ্য দেওয়া এক সমস্যার বিষয়। শুশ্রূষাকারী পটু হইলে ধৈর্য্যসহকারে নানারূপ উপায় অবলম্বন করেন এবং পথ্যের নিয়ম বজায় রাখিতে পারেন। নিয়ম এই যে, যতক্ষণ পথ্য হজম হইতেছে ততক্ষণ জোর করিয়াও তাহা দিতে হইবে; কিন্তু হজমের ব্যতিক্রম দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, তখন রোগী খাইতে চাহিলেও ঐ অনিষ্টকারী পথ্যটি তাহাকে দেওয়া হইবে না।

ঘড়ি ধরিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে পথ্য দিতে হইবে। কিন্তু অধিক পেটফাঁপা বা হজমের ব্যতিক্রম দেখা গেলে পথ্যের পরিমাণ কমাইতে হয়, তালিকা হইতে দুই এক প্রকার পথ্য বাদ দিতে হয়, কোন পথ্য হজম হইতেছে না তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হয়, এবং তেমন অবস্থা হইলে কয়েকদিনের জন্য বার্লির জল ছাড়া আর কিছুই হয়তো দেওয়া যায় না। আবার দুই একদিন পরে যেমনি পেটের অবস্থা ভাল হয়, তেমনি পুনরায়

ধীরে ধীরে পথ্যের তালিকা বাড়াইয়া দিতে হয়। টাইফয়েডে এইরূপ নিয়মেই কার্য্য করিতে হইবে। গ্লুকোজ ও জলের পরিমাণ প্রত্যহ কতটা দেওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন। উহার কোনো নির্দ্ধারিত মাপ নাই, তবে গ্লুকোজ নানারূপে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোট ২ আউন্স হইতে ৪ আউন্স পর্য্যন্ত ওজনে দেওয়া যায়, এবং জল প্রত্যহ অন্ততঃ ছয় পাইণ্ট্ বা তিন সের পর্য্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন। 'বার্লি' বলিতে যবের দানা বা পার্ল-বার্লিই বুঝাইবে, উহা জলের সহিত ১৫ মিনিট হইতে আধঘণ্টা পর্য্যন্ত ফুটাইয়া লইতে হইবে,—তাহার অধিক ফুটাইলে উহার কয়েকটি আবশ্যকীয় গুণ নষ্ট হয়।

রোগের শেষের দিকে যখন জর ছাড়িয়া আসিতে থাকে, তখন পথ্য লইয়া নূতন বিভ্রাট উপস্থিত হয়। রোগী তখন পুরাতন পথ্য খাইতে চায় না, নূতন পথ্য ও কঠিন দ্রব্য খাইবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়া ওঠে; এই সময় অতি সাবধানে তাহার খাদ্যের তালিকা বাড়াইতে হইবে, নতুবা পুনরায় জর বাড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা। আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গেলে প্রথমে অল্প দুধ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার মাত্রা ক্রমশঃ বাড়াইতে হয়, এবং সম্পূর্ণ জরত্যাগের পর সাবধানে কঠিন-খাদ্য হিসাবে হয়তো দুই এক টুকরা মিছরি চুষিতে দেওয়া যাইতে পারে, অথবা দুই একখানি মেলিন্স্-ফুড বিস্কুটও দেওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত জর সম্পূর্ণ ত্যাগ হইয়া যাইবার পরেও দশদিন (অথবা এক সপ্তাহ) পর্য্যন্ত তরল পথ্য ভিন্ন অন্য কিছুই দেওয়া উচিত নয়,—কারণ তখন কঠিন খাদ্য দিলেই রোগ পুনরায় রিল্যাপ্স করিতে পারে। জরত্যাগের দশদিন পরে অন্নপথ্য দেওয়া যায়।

ঔষধের দ্বারা (Drugs)—টাইফয়েডের ঔষধ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিভিন্ন চিকিৎসকের বিভিন্নরূপ অভিমত আছে। বলা বাহুল্য কোনো ঔষধেই টাইফয়েড আরোগ্য হয় না, অর্থাৎ মেয়াদের পূর্ব্বে উহার জর বন্ধ করিতে পারা যায় না,—কিন্তু সব ঔষধেই কিছু না কিছু উপকার হয়। অতএব কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব না করিয়া টাইফয়েডে যে কয়েক-প্রকারের ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় বলিয়া জানা আছে, এবং

সেগুলির দ্বারা যেরূপ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা, এখানে তাহার কয়েকটি প্রেস্‌ক্রুপশন উল্লেখ করা হইল। কেবল বক্তব্য এই, যে-রোগের কোনো 'স্পেসিফিক' ঔষধ নাই, তাহার পক্ষে ধারাবাহিকভাবে একটিমাত্র ঔষধ সর্ব্বত্র ব্যবহার করা অপেক্ষা প্রতি স্থলে অবস্থানুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে অভ্যাস করিলে অপেক্ষাকৃত অধিক সুফল পাওয়া সম্ভব।

১। অ্যাল্‌কালাইন্ ডায়াফোরেটিক্ মিকশ্চার—

লাইকার অ্যামন অ্যাসিটেট্—২ ড্রাম
Liq. Ammon. Acetatis dil.
পটাস্ অ্যাসিটেট্—১৫ গ্রেন
Pot. Acetas
সোডা বাইকার্ব—১৫ গ্রেন
Soda Bicarb
লিমন সিরাপ—১ ড্রাম
Lemon Syrup
দারচিনির জল—৪ ড্রাম
Aqua Cinnamomi

পূর্ণবয়স্কদের জন্য এইরূপ প্রতিমাত্রা তিনঘণ্টা অন্তর সেব্য। এই ঔষধে প্রস্রাব বৃদ্ধি করে ও ঘর্ম্ম বৃদ্ধির দ্বারা শরীরের ক্লেদ নির্গত করিয়া দেয়। ইহা অতি সাধারণ ঔষধ, কিন্তু ওস্‌লার (Osler) বলেন যে যেখানে জর ছাড়া অন্য কোনো উপসর্গ নাই সেখানে সাধারণতঃ এই প্রকার সহজ ঔষধ প্রয়োগ করাই ভাল।

অন্যরূপ প্রেস্‌ক্রুপশন—

লাইকার অ্যামন অ্যাসিটেট্—২ ড্রাম
Liq. Ammon. Acetatis dil.
সোডা স্যালিসিলেট্ ন্যাচুর‍্যাল—১০ গ্রেন
Soda Salicylas nat.
সোডা বেঞ্জোয়েট্—১০ গ্রেন
Soda Benzoas

পটাস্ সাইট্রেট্—২০ গ্রেন
Pot. Citras
লিমন সিরাপ—১ ড্রাম
Syrup Lemon
কর্পূর জল—১ আউন্স
Aqua Camphor

এই মিকশ্চারটিতে গায়ের ব্যথা কমায়, প্রস্রাব বৃদ্ধি করে, এবং লিভারের কিছু গ্লানি থাকিলে তাহা দূর করে। যেখানে রোগটি টাইফয়েড বলিয়া ঠিক মনে হইতেছে না, হয়তো লিভারের দোষ বা গাঁঠের ব্যথার জ্বরও হইতে পারে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে, সেরূপ স্থলে এই ঔষধটিতে বেশ কাজ হয়।

২। অ্যাসিড্ সিনামন্ মিকশ্চার—

অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক্ ডিল্—১০ ফোঁটা
Acid Hydrochlor. dil.
এসেন্স্ অফ্ সিনামন্—৫ ফোঁটা
Essence of Cinnamon
স্পিরিট্ ক্লোরোফরম্—৫ ফোঁটা
Spt. Chloroform
দারচিনির জল—১ আউন্স
Aqua Cinnamomi

ইহা পূর্ণবয়স্কের মাত্রা এবং তিনঘণ্টা অন্তর সেব্য। টাইফয়েড জ্বরে এই ঔষধ বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে পেটের দোষ কমে। যে রোগীর জিভ অত্যন্ত ময়লা অথচ প্রস্রাব সরলভাবেই হইতেছে, অথবা যাহাদের বহুদিন অ্যাল্কালাইন মিকশ্চার দিয়া বিশেষ কিছু উপকার দেখা গেল না, তাহাদের ঔষধ বদল করিয়া ইহা দিলে সময়ে সময়ে বেশ ফল পাওয়া যায়। যাহাদের প্রস্রাবের পরিমাণ আপনা হইতেই যথেষ্ট আছে, তাহাদের জন্য এই ঔষধ চলিতে পারে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে টাইফয়েডে দারচিনির তেলের বিশেষ

ক্রিয়া আছে, সেইজন্য ইহাতে এসেন্স সিনামন্ বা অয়েল সিনামন্ দেওয়া হয়। যদি ম্যালেরিয়ার কিছু সন্দেহ থাকে তবে এই মিকশ্চারের সহিত কেহ কেহ অল্পমাত্রায় কুইনিনও মিশাইয়া দেন।

৩। ক্লোরিন্ মিকশ্চার (Burney Yeo's)—

বহু চিকিৎসক এই ঔষধের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাতে কখনো কখনো বেশ উপকার হইতে দেখা যায়, তবে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী ঠিকমত জানা আবশ্যক। একটি ১২ আউন্স শিশিতে ৪০ ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (বিশুদ্ধ) ও ৩০ গ্রেন ক্লোরেট অফ পটাস্ (Pot. Chloras) একত্র করিয়া উহাতে অল্প অল্প জল ঢালিতে থাক এবং শিশিটি মধ্যে মধ্যে উত্তমরূপে ঝাঁকিতে থাক। ইহাতে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হইয়া তাহা ঐ জলের সহিত মিশিয়া যাইবে। শিশিটি প্রায় পূর্ণ হইলে উহার মধ্যে ২৪ গ্রেন কুইনিন সাল্ফেট মিশাইয়া দিবে এবং সমস্তটি উত্তমরূপে ঝাঁকিয়া জল দিয়া শিশির বাকী অংশ পূর্ণ করিয়া উহাতে ১২টি দাগ কাটিয়া দিবে। ইহারই এক এক দাগ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। ইহা অল্প ব্যয়েই প্রস্তুত হয় এবং খাইতে কিছু বিস্বাদ হইলেও ইহা পেটের পক্ষে উপকারী। ইহাতে জিভের ময়লা কাটিয়া যায় এবং পেটের ফাঁপ কমিয়া যায়। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে ম্যালেরিয়ার উপরই প্রায় টাইফয়েড হইতে দেখা যায় এবং যেখানে ডিস্পেনসারিতে নানারূপ মূল্যবান ঔষধ পাওয়া যায় না, সেখানকার পক্ষে এই ঔষধই উত্তম।

৪। আইরন-ডিজিটেলিস্ মিকশ্চার—

টিঙ্চার ফেরি পার্ক্লোরাইড—১০ ফোঁটা
Tinct. Ferri Perchlor.
টিঙ্চার ডিজিটেলিস— ১০ ফোঁটা
Tinct. Digitalis
গ্লিসিরিন— ৩০ ফোঁটা
Glycerine
জল (Aqua)— অর্দ্ধ আউন্স

ইহা তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য। মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল বার্ণার্ডো (Bernardo) এই ঔষধ ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিতেন যে কেবলমাত্র এই ঔষধের দ্বারা তিনি শতকরা ৯০টি টাইফয়েড রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। এই ঔষধ খাইতে খাইতে যখন জিভের উপর লোহার কালো কষ্ ধরে, তখন বুঝিতে হয় যে ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে উদরাময় ও টক্সিমিয়ার লক্ষণ দূর হইতে দেখা যায়।

৫। হাইড্রার্জ মিকশ্চার—

লাইকার হাইড্রার্জ পার্ক্লোরাইড—২০ ফোঁটা	
Liq. Hydrarg Perchlor.	
টিঙ্কার বেলেডোনা—	২ ফোঁটা
Tinct. Belladonna	
জল (Aqua)—	অর্দ্ধ আউন্স

এই ঔষধ অ্যান্টিসেপ্টিক (antiseptic) গুণসম্পন্ন। কোনো কোনো চিকিৎসক ইহা ব্যতীত টাইফয়েডে অন্য প্রকার ঔষধ দেন না। যে রোগীর নিত্য নিত্য দুর্গন্ধযুক্ত তরল মল নির্গত হইতেছে ও তাহাতে আমের চিহ্নও কিছু দেখা যায়, এবং যেখানে মস্তিষ্ক-বিকারের লক্ষণ আছে, সেখানে এই ঔষধে কখনো কখনো উত্তম উপকার হইয়া থাকে।

৬। ক্যাল্সিয়ম-ইউরোট্রোপিন—

ক্যাল্সিয়ম ও ইউরোট্রোপিনের সংযোগে পুরিয়া করিয়া প্রত্যহ দুইবার বা তিনবার স্বতন্ত্র ভাবে দেওয়া অনেকে পছন্দ করেন। ক্যালসিয়ম ল্যাক্টেট্ ১০ গ্রেন মাত্রায়, ও তৎসহ ইউরোট্রোপিন (Schering) ৭॥০ গ্রেন মাত্রায় মিলাইয়া এক একটি পুরিয়া প্রস্তুত হয়। উহা জলের সহিত বা সরবতের সহিত মিলাইয়া পান করিতে দেওয়া হয়। ক্যালসিয়ম প্রয়োগে উহা শরীরের টিস্থগুলির মধ্যে কতকটা ক্ষতিপূরণের সাহায্য করে এবং ইউরোট্রোপিনে রোগের বিষ নাশ করে। কেহ কেহ ইউরোট্রোপিনের পরিবর্ত্তে স্যালোল্ (Salol) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা ছেলেদের টাইফয়েডে উপকারী।

ভ্যাক্সিন চিকিৎসার দ্বারা—(Vaccine therapy)—টাইফয়েডের বিষ প্রধানতঃ এণ্ডোটক্সিন (endotoxin) জাতীয়, সুতরাং ভ্যাক্সিন দিয়া ইহাতে বিশেষ কোনো ফল নাই। কিন্তু একপ্রকার ভ্যাক্সিন আছে যাহাতে কিছু উপকার হইতেও পারে। ইটালির Bruschettini কর্ত্তৃক Typho-paratypho-coli curative vaccine এই বিষয়ে উত্তম। উহা ½ সি. সি. হইতে ২ সি. সি. পর্য্যন্ত মাত্রায় দুই একদিন অন্তর ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশনের দ্বারা প্রথম অবস্থা হইতে দিতে পারিলে কখনো কখনো বেশ উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও ইহাতে জ্বরের মেয়াদ কমে না, তথাপি রোগের উপসর্গগুলি ইহাতে ঘটিতে পারে না, এবং টক্সিমিয়ার লক্ষণ কিছু কমিতেও দেখা যায়।

সিরাম চিকিৎসার দ্বারা (Serum therapy)—কোনো কোনো টাইফয়েডে **অ্যান্টি-ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্ সিরাম** (Anti-streptococcus Serum) দিয়া বিশেষ উপকার হয়। টাইফয়েডের অতি খারাপ অবস্থায় এই সিরাম প্রয়োগ করিলে অনেক সময় রোগের গতি ফিরিয়া যায়। তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে টাইফয়েড বীজাণুর সঙ্গে প্রায় ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস আসিয়া যোগ দেওয়াতে রোগটি শঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে, এবং তখন ষ্ট্রেপ্টোকক্কাসের বিরুদ্ধে সিরাম বিশেষ উপকার করে। যেখানে রোগীর পূর্ণ বিকারের লক্ষণ রহিয়াছে, নাড়ীর অবস্থা ভাল নয়, পেটের অবস্থাও খারাপ, এবং বুকে শ্লেষ্মার চিহ্ন (ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া) দেখা যাইতেছে, এই প্রকার টক্সিমিয়ার (toxæmia) অবস্থাতেই ইহা প্রযুজ্য। এই সিরামের মাত্রা ২০ সি. সি., এবং একবার দিতে আরম্ভ করিলে ইহা উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন দেওয়া প্রয়োজন। অনেকে এই সিরাম ইন্‌জেকশন দিবার পরিবর্ত্তে খাওয়াইয়া (oral) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতেও সিরামের ক্রিয়া উত্তম হয়। প্রত্যহ একমাত্রা করিয়া সিরাম খাইতে কোনোই কষ্ট নাই, উপরন্তু ইহাতে খাদ্য ও ঔষধ দুইই এক সঙ্গে সরবরাহ হয়। আজকাল অনেকেই ইহা টাইফয়েডে ব্যবহার করিতেছেন।

ব্যাক্‌টিরিওফাজের দ্বারা (Bacteriophage therapy)—ব্যাসিলারি আমাশার মত টাইফয়েডেও উহার উপযুক্ত ব্যাকটিরিওফাজ দেওয়া আজকাল

প্রচলিত হইয়াছে। অন্ত্রস্থ বীজাণুগুলিকে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যবহৃত হয়। যুক্তি হিসাবে ইহা প্রয়োগ করা উত্তম, কিন্তু সর্ব্বত্র ইহার ক্রিয়া আশানুরূপ হয় না। তবে কোনো কোনো স্থলে ইহার দ্বারা আশ্চর্য্যপ্রকার উপকার হইয়াছে এবং প্রকৃত টাইফয়েডের জরও মাত্র ৩।৪ দিনের মধ্যেই ইহার দ্বারা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। এ দেশের প্রস্তুত নানারূপ টাইফয়েড-ফাজের মধ্যে ক্লিনিক্যাল রিসার্চ্চ অ্যাসোসিয়েশনের ডাক্তার জে. এম্. দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রস্তুত ব্যাকৃটিরিওফাজ্ই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার দ্বারা কয়েকটি প্রকৃত টাইফয়েড রোগীকে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্যলাভ করিতে দেখা গিয়াছে। উক্তরূপ ব্যাকৃটিরিওফাজ সাধারণ গোবর হইতে আহরিত। গোবরের মধ্যে টাইফয়েডের বিরোধী ব্যাকৃটিরিওফাজ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। তবে এই ফাজ্ আন্দাজে সর্ব্বত্র ব্যবহার করিয়া লাভ নাই, এবং ইহা বিলম্বে দিলেও তেমন ফল হয় নাই। প্রথম সপ্তাহেই রোগনির্দ্ধারণ করিয়া যদি এই ফাজ্ ব্যবহার করিতে পারা যায় তবে দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়িবার পূর্ব্বেই তাহা আরোগ্য করা সম্ভব হইতে পারে। ফাজ্ চিকিৎসার বিশেষত্ব এই যে ইহা যত দিন ব্যবহার হইবে ততদিন কোনো-প্রকার অ্যান্টিসেপ্টিক্ ঔষধ খাইতে দেওয়া চলিবে না, কারণ উহার সংস্পর্শে আসিলে ফাজের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। সেইজন্য যেখানে ফাজ্ প্রয়োগ করা মনস্থ হইয়াছে, সেখানে অন্য কোনো ঔষধ না দিয়া প্রথমে কয়েকদিন কেবল উহারই ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অতএব প্রথম অবস্থায় অন্যান্য ঔষধ দিবার পূর্ব্বে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত কেবল ফাজ্ দেওয়াই ভাল। তাহাতে যদি কিছু ফল না হয় তখন উহা বন্ধ করিয়া অন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

উপসর্গ নিবৃত্তির দ্বারা (Treating complications)—টাইফয়েডে যদি কোনোরূপ উপসর্গ না থাকে, তবে উহার চিকিৎসা করা কঠিন নয়। অবশ্য প্রথম হইতে রীতিমত যত্ন লইতে থাকিলে ইহাতে উপসর্গ কমই হয়; কিন্তু অনেক সময় তাহা সত্ত্বেও উহা নিবারণ করা যায় না, এবং অকস্মাৎ এমন এক একটি অভাবনীয় উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহা লইয়া চিকিৎসককে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। টাইফয়েডের কথা জোর করিয়া

কিছু বলা যায় না, কারণ উপসর্গবিহীন টাইফয়েডেও আরোগ্যের মুখে বিনা কারণে হঠাৎ মৃত্যু (sudden death) ঘটিতে দেখা যায়; তবে তাহা অত্যন্ত বিরল। সাধারণতঃ উপসর্গগুলিকে কোনো মতে দমন করিয়া রাখিতে পারিলে টাইফয়েড রোগ নিয়মিত সময়ে আপনি আরোগ্য হইতে পারে। সুতরাং চিকিৎসকের দৃষ্টি সর্ব্বদাই উপসর্গ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। উপসর্গ নানাপ্রকারের হইতে পারে, তন্মধ্যে যেগুলি সচরাচর দেখা যায় সেইগুলির বিষয়ই এ স্থলে আলোচিত হইল।

(১) জ্বরাধিক্য (Hyperpyrexia)—সাধারণতঃ টাইফয়েডের জ্বর খুব বেশী ওঠে না, প্রায় উহা ১০৪ ডিগ্রীর মধ্যেই থাকে। সুতরাং প্রত্যহ ২।৩ বার স্পঞ্জিং করা বা নিয়মিত গা মুছাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যেখানে ১০৫°-এর উপর জ্বর উঠিয়া উহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়, এবং যেখানে স্পঞ্জিং ইত্যাদি করিয়াও উহা বিশেষ কমে না, সেখানে জ্বর কমাইবার জন্য অন্য উপায় চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে অনেকে এই অবস্থায় অ্যান্টিফেব্রিন্ (Antifebrin) ব্যবহার করিতেন। আজকাল তৎপরিবর্ত্তে **পাইরামিডন্** (Pyramidon) ব্যবহৃত হয়। ইহা অল্প মাত্রায় (½ গ্রেন হইতে ১ গ্রেন পর্য্যন্ত) উপর্য্যুপরি দুই তিনবার দিলেই জ্বরের প্রাবল্য কিছু কমে, অথচ শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হয় না। প্রয়োজন হইলে ইহা পুনঃ পুনঃ দেওয়া যায়। যদি ইহাতে কিছু দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় বা অতিরিক্ত ঘাম হইতে থাকে, তখন কয়েক ফোঁটা স্পিরিট অ্যারোম্যাটিক্ অ্যামোনিয়া (Spt. ammon. aromat.) দিলেই সে ভাব দূর হয়। অত্যধিক জ্বরকে ঔষধের দ্বারা দমন করিলে কোনো ক্ষতি নাই, বরং তাহাতে উপকার আছে। অধিক জ্বর বেশীক্ষণ থাকিলেও রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; তাহা নিবারণ করিতে অবস্থা বিশেষে পাইরামিডন্ অবশ্য ব্যবহার করা উচিত।

(২) পেটফাঁপা (Tympanitis)—এ উপসর্গ টাইফয়েডে সাধারণতঃই দেখা যায়। ইহা অনেক সময় পথ্যের দোষেও ঘটিয়া থাকে, সুতরাং পথ্যের পরিবর্ত্তনের দ্বারা ইহা দূর হইতে পারে। অনেকে ইহার জন্য পেটের উপর অ্যান্টিফ্লোজিস্টিন (Antiphlogistine)-জাতীয় ঔষধগুলির প্রলেপ লাগাইতে

উপদেশ দেন, তাহাতেও পেটফাঁপা ও ব্যথার নিবৃত্তি হইতে পারে। আগেকার চিকিৎসকেরা ঠাণ্ডা জলের সহিত অল্প ভিনিগার মিশাইয়া ঐ জলে গামছা ভিজাইয়া তাহা পেটের উপর প্রয়োগ করিতেন। ভিজা তোয়ালে বা গামছা পাট করিয়া কিছুক্ষণের জন্য পেটের উপর জড়াইয়া রাখা মন্দ ব্যবস্থা নয়। উহাতে জ্বরেরও কিছু উপশম হয়।

কিন্তু অত্যধিক পেটফাঁপা নিবারণ করিতে অন্যান্যরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, কারণ পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠিলে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া যাইতে পারে। এ অবস্থার জন্য turpentine stupe বা তার্পিনের সেঁক (গরমজলে কিছু তার্পিন ঢালিয়া দিয়া ঐ জলে কাপড় ডুবাইয়া তদ্দ্বারা সেঁক দিতে থাকা) উত্তম উপায়। ঐ সঙ্গে খুব অল্প মাত্রায় **পিটুইট্রিন্** (Pituitrin ½ c.c.) অথবা **পিট্রেসিন্** (Pitressin ½ c.c., P.D. & Co.) ইন্‌জেকশন দেওয়া বিশেষ উপকারী। ইহাতে পেটফাঁপা সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। এই সময় যদি মলদ্বারে একটি মোটা রবারের নল (flatus tube) কিছুক্ষণ প্রবিষ্ট করিয়া রাখা যায় তবে উহার সাহায্যে শীঘ্র বায়ু নিঃসরণ হইয়া যায়, নতুবা মলদ্বার সঙ্কুচিত থাকা হেতু বাধা জন্মিতে পারে। প্রয়োজন হইলে পিটুইট্রিন্ ইন্‌জেকশন ২।৩ ঘণ্টা অন্তরেও কয়েকবার দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে ক্ষতি নাই। পেটফাঁপা যতক্ষণ না কমে ততক্ষণ কেবল জল ব্যতীত অন্য সকল প্রকার পথ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

(৩) **বিকার**—ইহা টাইফয়েড রোগের বিশিষ্ট উপসর্গ। কিন্তু বিকার উপস্থিত হইলেই যে রোগটিকে মারাত্মক মনে করিতে হইবে তাহা নয়, কারণ দারুণ বিকার থাকা সত্ত্বেও রোগ আরোগ্য হইতে যথেষ্ট দেখা যায়। তবে বিকারগ্রস্ত রোগীর শুশ্রূষা করা কঠিন, তাহাকে নিয়মিত পথ্যাদি দেওয়াও কঠিন, সেইজন্য এই সকল রোগী শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। টাইফয়েডের বিকার উহার বিষ-ক্রিয়ার ফল মাত্র, ইহা মস্তিষ্ক-রোগ নয়। সেইজন্য মেনিঞ্জাইটিসের মত লক্ষণ থাকিলেও তাহাকে মেনিঞ্জাইটিস্ বলা যায় না। এই অবস্থায় রোগীর নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডের দিকে নিত্য দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী সবল থাকে ততক্ষণ কোনো আশঙ্কা

নাই, কিন্তু ইহাতে হঠাৎ নাড়ী দমিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। যে বিষের জন্য বিকার হইতেছে সেই বিষের দ্বারাই হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডও বিকল হইতে পারে।

ভিয়ার-হজ্ (Vere-Hodge) বলেন, শিশুদের টাইফয়েডে বিকার নিবৃত্তির জন্য **ক্যাল্‌সিয়াম** (Colloidal Calcium) ১ সি. সি. মাত্রায় প্রত্যহ একটি করিয়া ছয়টি ইন্‌জেকশন দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এবং হাত ও পায়ের খিঁচুনি বা ঘাড় শক্ত হওয়ার লক্ষণাদি শীঘ্রই দূর হয়। বলা বাহুল্য রীতিমত **স্পঞ্জিং ও বাথ্** প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেও বিকারযুক্ত লক্ষণের অনেক উপশম হয়।

টাইফয়েড-রোগীর কখনো কখনো হঠাৎ অত্যধিক মস্তিষ্ক-উত্তেজনা (irritability and excitement) হইতে দেখা যায়। উহাতে রোগী অযথা চীৎকার করে ও নানারূপ বলপ্রকাশ করিতে থাকে। এরূপ উত্তেজনা অধিকক্ষণ থাকিতে দেওয়া উচিত নয়, তাহাতে রোগীর যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি স্পঞ্জিং ও মাথায় বরফ প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা উহা শান্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত। রোগীকে তখন কয়েকমাত্রা ব্রোমাইড খাইতেও দেওয়া যাইতে পারে। খুব অল্প মাত্রায় আইওডাইড্ (Pot. Iodide) খাইতে দিলেও কখনো কখনো ইহাতে উপকার হয়। এ অবস্থার জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত ৫নং হাইড্রার্জ মিকশ্চারের সহিত অল্প আইওডাইড্ ও ব্রোমাইড্ একত্রে যোগ করিয়া দিলে কখনো কখনো সুফল পাওয়া যায়। যদি তাহাতে উপকার না হয়, তবে অল্প মাত্রায় লুমিন্যাল্ (Luminal) দিয়া দেখা যাইতে পারে। যদি তাহাতেও কোনো ফল না হয় তবে অগত্যা মর্ফিয়া (Morphine) বা হাইওসিন (Hyoscine) প্রভৃতির ইন্‌জেকশন দিয়া রোগীকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে হয়। Hyoscine Compound A (Boots') নামক একটি ইন্‌জেকশনের ঔষধ আছে, তাহাতে মর্ফিয়া হাইওসিন্ এবং অ্যাট্রোপিন্, তিনটী ঔষধ অল্প মাত্রায় একত্রে মিশ্রিত আছে, অত্যধিক উত্তেজনা নিবারণ করিতে উহা উপকারী।

(৪) ব্রঙ্কাইটিস্ ও ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া—ছেলেদের টাইফয়েডে এই উপসর্গ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার উপসর্গ নিবারণ করিবার জন্যই

রোগীকে এক ভাবে এক অবস্থায় অধিকক্ষণ পড়িয়া থাকিতে দেওয়া উচিত নয়, মধ্যে মধ্যে তাহার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; একরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ পড়িয়া থাকিলে ফুস্‌ফুসের তলদেশে রক্ত জমিয়া তাহা হইতে প্রায়ই শ্লেষ্মা ঘটিবার সূত্রপাত হয়। অনেকে বলেন পূর্ব্ব হইতে ক্যাল্‌সিয়াম দিতে থাকিলে বুকে সর্দ্দি জমিতে পারে না। শ্লেষ্মার লক্ষণ দেখা গেলে তখন কফনিঃসারক ঔষধাদি দেওয়া প্রয়োজন। যদি কোনোরূপ শ্বাসকষ্ট দেখা যায় ও নাড়ীর অবস্থা দমিয়া যাওয়ার মত বোধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ অ্যাট্রোপিন (Atropine Sulph.) ইন্‌জেকশন দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশুদিগকে ইহা ১/৫০০ গ্রেন মাত্রায় দেওয়া যায়। অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া (Cheyne Stokes breathing) হইতে থাকিলে উহার সহিত ষ্ট্রিক্‌নিন্ মিশাইয়া দেওয়া উচিত।

(৫) **হার্টফেলের লক্ষণ**—নাড়ীর গতি অকস্মাৎ দ্রুত হইলে হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা অনুমান করিতে হয়। এইরূপ লক্ষণের সূত্রপাত মাত্রেই সাবধান হওয়া উচিত। ইহার আশঙ্কাতেই পূর্ব্বকালে রোগীকে প্রথম হইতে ষ্টিমুল্যাণ্ট্ দিবার প্রথা ছিল। এখন তাহার প্রচলন নাই, এখন কোনো বিকৃতির সম্ভাবনা দেখিলে কেবল তখন হইতে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার জন্য **ডিজিটেলিস্** অতি উত্তম ঔষধ। টিঞ্চার ডিজিটেলিস্ ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ৩।৪ বার দিতে থাকিলে হার্ট অধিক দুর্ব্বল হইতে পারে না। আগেকার যুগে টাইফয়েডে **ব্রাণ্ডি** দিবার উপদেশ ছিল, কিন্তু আজকাল আর তাহাও কেহ বলেন না। তবে কখনো কখনো ব্রাণ্ডির প্রয়োজন যে হইতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। অল্প মাত্রায় বহু পুরাতন ব্রাণ্ডি (Old liquor brandy) দেওয়াতে কিছু অনিষ্ট নাই; উহাতে দুর্ব্বলতা কমে এবং সুনিদ্রা আনে; প্রত্যহ রাত্রিকালে উহা ২।৩ ড্রাম পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। হার্টের দুর্ব্বলতায় অধুনাতন ব্যবহৃত উত্তম ষ্টিমুল্যাণ্ট্ **টিঞ্চার এফিড্রা** (Tinct. Ephedra vulgaris)। ইহাতে হৃদ্‌পিণ্ডের বল বাড়ে। ইহার ক্রিয়া অ্যাড্রেনেলিনের অনুরূপ; তবে অ্যাড্রেনেলিন্ (Adrenaline) অধিক মাত্রায় অধিক দিন দেওয়া যায় না, কিন্তু টিঞ্চার এফিড্রা দিতে সেরূপ কোনো বাধা নাই। ইহা ২০।৩০

ফোঁটা মাত্রাতেও প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যায়। চোপ্‌রা বলেন হার্টের পক্ষে দেশী-প্রস্তুত টিঞ্চার এফিড্রাই উৎকৃষ্ট। উহাতে Ephedrine ও Pseudo-ephedrine নামক দুইরূপ অ্যাল্‌কালয়েড আছে, তন্মধ্যে পরবর্ত্তীটির গুণ এই যে উহার উত্তেজক ক্রিয়া অধিকক্ষণ যাবৎ স্থায়ী হইয়া থাকে। সেইজন্য আজকাল ইহা বহুস্থলে ব্যবহৃত হইতেছে। হার্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দেখিলে তৎক্ষণাৎ **কার্ডিয়াজল্** (Cardiazol) প্রভৃতির ইন্‌জেকশন্ করা উচিত। অধিকন্তু **ইন্‌ট্রাভেনাস্ গ্লু্কোজ** (10 to 20 c. c. of 25 % solution) দিলেও বিশেষ উপকার হয়, এবং অতি খারাপ অবস্থা হইতেও হার্টকে ইহার দ্বারা বাঁচাইয়া তোলা যায়। হার্টফেলের জন্য আর একটি উত্তম আধুনিক ঔষধ **ষ্ট্রোফ্যান্‌থোন** (Strophanthone, P. D. & Co.)। ষ্ট্রোফ্যান্‌থিন্ ইন্‌ট্রাভেনাস ব্যতীত ব্যবহারে ফল হয় না, কিন্তু ষ্ট্রোফ্যান্‌থোন ইন্‌ট্রামাস্কুলার এবং চর্ম্মনিম্নে ইন্‌জেকশন দিলেও উত্তম ক্রিয়া হয় এবং তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। ইহার মাত্রা ১ সি. সি. করিয়া। ইহা গ্লু্কোজের সহিত (10 c. c. of 12 % solution) একত্রে মিলাইয়াও ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন দেওয়া যাইতে পারে।

(৬) **উদরাময়**—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পথ্যের পরিবর্ত্তন করিলে অনেক উদরাময় আপনিই আরোগ্য হয়। উদরাময় নিবারণ করিতে ধারক ঔষধাদির সত্বর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়, কারণ কতকটা বিষ ঐভাবে নিষ্কাশিত হইয়া যাওয়াই মঙ্গল। সেইজন্য প্রত্যহ ৪।৫ বার পর্য্যন্ত দাস্ত হইলে উহা অগ্রাহ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু যেখানে বহুবার দাস্ত হওয়াতে রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে সেখানে উহা ঔষধের দ্বারা নিবারণ করা আবশ্যক। ইহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ **বিস্‌মাথ**। **বিস্‌মাথ সাব্‌নাইট্রেট** (Bismuth subnitrate) অথবা **বিস্‌মাথ সাব্‌গ্যালেট্** (Bismuth subgallate) অথবা **অর্ফল** (Orphol) ১০ গ্রেন মাত্রায়, এবং **ট্যানিজেন্** (Tannigen) ৫ গ্রেন মাত্রায়, একত্রে মিশাইয়া কয়েক পুরিয়া দিলেই উদরাময়ের উপশম হয়। অনেকে ইহার সহিত ৫ গ্রেন মাত্রায় **স্যালোল্** (Salol) ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহাও টাইফয়েডের

উত্তম অ্যান্টিসেপ্‌টিক্‌ ঔষধ, এবং উহাতে পেটের নানাবিধ উপসর্গ দূর হয়। কিন্তু উদরাময়ের লক্ষণ দূর হওয়া মাত্র এই সকল ঔষধ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা কোষ্ঠকাঠিন্য আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

(৭) কোষ্ঠবদ্ধতা—ইহা টাইফয়েডের অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু যতই কাঠিন্য হউক, এই রোগে কোনোরূপ জোলাপ ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেইজন্য প্রয়োজন হইলে **গ্লিসিরিনের পিচকারী** দেওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই ঔষধ প্রয়োগ করা হয় না। গ্লিসিরিন ও গরম জল, কিংবা গ্লিসিরিন ও অলিভ অয়েল, প্রত্যেকটি এক আউন্স পরিমাণে লইয়া একত্রে মিশাইয়া উহা একদিন অন্তর পিচকারী দিলে কতক পরিমাণে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়। প্রত্যহ পিচকারী দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, সেইজন্য উহা একদিন অন্তর প্রয়োগ করিবার নিয়ম আছে। এ রোগে এমনই কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয় যে আরোগ্য হইয়া অন্ন-পথ্যাদি করার পরেও তাহা দূর হইতে চায় না, তখনও গ্লিসিরিনের পিচকারী দিবার প্রয়োজন হয়। সে স্থলে রোগের শেষের দিকে প্রত্যহ দুই চামচ করিয়া **লিকুইড্‌ প্যারাফিন** (Liquid Paraffin) খাইতে দিলে দাস্ত ক্রমে সরল হইয়া আসে। প্যারাফিন আহারের পরে না দিয়া **আহারের পূর্ব্বে** দেওয়াই ভাল, নতুবা পেট ফাঁপিতে পারে। অনেকে আরোগ্যের পর কিছুদিনের জন্য প্যারাফিনের ইমাল্‌সন (Angier's Emulsion জাতীয়) টনিক হিসাবে দিয়া থাকেন, ইহাতে দাস্তও পরিষ্কার হয় এবং শরীরেরও কিছু উন্নতি হয়।

(৮) বমনোদ্বেগ ও হিক্কা—কখনো কখনো এই উপসর্গে রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায়। একবার আরম্ভ হইলে ইহা থামানো বড় কঠিন। খুব অল্প মাত্রায় **অ্যাট্রোপিন** (Atropine sulph. $\frac{1}{100}$ to $\frac{1}{200}$ gr.) ইন্‌জেকশন দিলে অনেক সময় উপকার হয়। পেটের উপর পাৎলা করিয়া মাষ্টার্ড-প্লাষ্টার (mustard plaster) লাগাইলেও কিছু ফল হইতে পারে। ইহা ছাড়া এক ফোঁটা বা অর্দ্ধফোঁটা মাত্রায় **টিঞ্চার আইওডিন,** কিংবা ঐ মাত্রায় **ভাইনাম্‌ ইপিকাক,**—কিংবা দুইই একত্রে মিশাইয়া অল্প জলের সহিত ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দিলে কোনো কোনো

স্থলে হিক্কা বন্ধ হয়। **অ্যাড্রেনেলিন সলিউশন** খাইতে দিয়াও অনেক সময় উপকার দেখা যায়।

(৯) প্রস্রাবের দোষ—টাইফয়েড রোগে, এবং বিশেষতঃ উহার সহিত কোলাই বীজাণুর সংক্রমণ মিশ্রিত থাকিলে নানারূপ প্রস্রাবের দোষ ঘটিতে পারে ; তখন প্রস্রাব ঘোলা হয় এবং উহাতে অ্যালবুমেন ও কাষ্ট্‌ (casts) প্রভৃতি পাওয়া যায়। প্রস্রাব পরিমাণে যথেষ্ট না হইলে প্রচুর **অ্যাল্‌কালাইন** ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রস্রাবের দোষের সহিত জ্বরের অনিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি হইতে থাকিলে খুব অল্প মাত্রায় **কোলাই ভ্যাক্সিন্‌** ($\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ million) ইন্‌জেকশন দিলে কখনো কখনো উপকার পাওয়া যায়।

এই রোগে হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। মূত্রাশয়ে যথেষ্ট প্রস্রাব জমিয়াছে অথচ রোগী তাহা ত্যাগ করিতে না পারায় কষ্ট পাইতেছে, এরূপ অবস্থা প্রায় ঘটিতে দেখা যায়। তখন তলপেটে জলপটি বা বরফের ব্যাগ লাগাইয়া প্রথমে প্রস্রাব করাইবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। যদি তাহাতে ফল না হয় তখন অগত্যা রবার-ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইতে হয়। ক্যাথিটার উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইয়া উহা অতি সাবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

(১০) বেড্‌সোর (Bed sore)—রোগীর পিঠের চামড়া প্রথম হইতে প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া স্পিরিট মাখাইয়া দিলে এই উপসর্গ ঘটিতে পারে না। যদি চামড়া লাল হইয়া বেড্‌সোরের পূর্ব্বাভাস দেখা যায়, তবে Liq. Plumbi Subacetatis ১ ভাগ ও Collodion ২৫ ভাগ একত্রে মিশাইয়া উহা সেই স্থানে লেপন করিয়া দিলে উপকার হইতে পারে। বেড্‌সোরের ক্ষত হইলে অনেকে নানারূপ ঔষধ ব্যবহার করেন কিন্তু রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত উহা আরোগ্য করা কঠিন।

রোগ নিবারণের উপায়

যে পল্লীতে টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব বা যে বাড়ীতে টাইফয়েড দেখা দিয়াছে, সেখানে প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায় করা

কর্ত্তব্য। আজকাল টাইফয়েড ভ্যাক্সিনের (Prophylactic typhoid vaccine) প্রচলন হওয়াতে এ বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। এই ইন্‌জেকশনের দ্বারা টাইফয়েডের কবল হইতে অন্ততঃ একবৎসরের জন্য রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হইতে, অর্থাৎ ইন্‌জেকশনের পর রোগনিবারণের শক্তি দেহের মধ্যে সঞ্চিত হইতে প্রায় ১০।১৫ দিন সময় লাগে, এই কথা মনে রাখা আবশ্যক। যে বাড়ীতে টাইফয়েড হইয়াছে সেই বাড়ীর সকলকে ইন্‌জেকশন দিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি এবং তাহাদিগকে রোগীর সংস্পর্শে আসিতে আর নিষেধ করি না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইন্‌জেকশন দিবার পরই ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত আরো অতিরিক্ত সাবধানতার আবশ্যক; কারণ ঐ সময় তাহারা সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকে এবং ঐ সময় শরীরে প্রতিরোধশক্তি (resistance) অত্যন্ত হ্রাস পাওয়াতে তখনই রোগ সংক্রামিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। অতএব ইন্‌জেকশনের পর ১০।১৫ দিন গত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিকে রোগীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখা উচিত।

ইন্‌জেকশন দিলেই যে টাইফয়েড একেবারে হইতে পারিবে না, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। কাহারো কাহারো ইন্‌জেকশন লইবার পরেও টাইফয়েড হইতে দেখা গিয়াছে।

কেহ কেহ ইন্‌জেকশন লইবার বিরোধী। তাঁহারা রোগনিবারণের জন্য বেস্‌রেড্‌কার প্রস্তুত টাইফয়েড বিলিভ্যাক্সিন (Bilivaccine) ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফরাসী চিকিৎসকেরা ইহার প্রতিরোধশক্তির যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন, কিন্তু বিলিভ্যাক্সিন খাওয়া সত্ত্বেও টাইফয়েড হইতে দেখা গিয়াছে।

অতএব কেবল এই সকল প্রতিষেধক লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। সর্ব্বপ্রকারে উপস্থিত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

রোগীর মলমূত্রাদির সম্বন্ধে অতিরিক্ত সাবধানতা আবশ্যক, কারণ ঐগুলিই রোগসংক্রমণের মূল, এবং কোনোরূপে খাদ্যদ্রব্যের সহিত উহার সামান্যমাত্র সংস্পর্শ ঘটিলে একজন রোগী হইতে বহুজনের রোগ জন্মিতে পারে। ইহার সম্ভাবনা দূর করিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও উত্তম ব্যবস্থা রোগীর সমস্ত মলমূত্রাদি একস্থানে কোনো গামলা বা টিনের মধ্যে তুঁষের গাদার ভিতর

ফেলিয়া উহা ঢাকিয়া রাখা এবং দিনান্তে তাহার মধ্যে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া দেওয়া। ইহাতে তুঁষের সহিত রোগের বীজ সমস্ত পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। রোগীর বিছানা ও যে সকল কাপড় চোপড় মলমূত্রের দ্বারা দূষিত, তাহা যদি পুনরায় ব্যবহারের জন্য রক্ষা করিতে হয়, তবে ঐ গুলি কোনো তেজী অ্যান্টিসেপ্‌টিক ঔষধাক্ত জলে বহুক্ষণ ডুবাইয়া রাখা উচিত। এ জন্য কোনো বড় গামলায় বা টিনে জল ভরিয়া উহাতে কিছু পরিমাণ কার্ব্বলিক অ্যাসিড্, কিংবা লাইজল্ (Lysol), অথবা পটাস্ পার্ম্মাঙ্গানেট (Pot. Permanganate) মিশাইয়া কাপড়গুলি তন্মধ্যে দিলেই চলিতে পারে। অতঃপর সেগুলি উঠাইয়া লইয়া অন্ততঃ এক ঘণ্টা জলে সিদ্ধ করিয়া পরে সাধারণ জলে কাচিয়া লওয়া যাইতে পারে। নতুবা পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া এই সকল কাপড় মোটেই কাচিতে দেওয়া উচিত নয়। পুষ্করিণীর ত্রিসীমানার মধ্যেও রোগীর মল মূত্রাদি নিক্ষেপ করিতে দেওয়া উচিত নয়। কাঁথা, ছেঁড়া ন্যাকড়া, তুলা প্রভৃতি যাহা কিছু পরিত্যক্ত দ্রব্য থাকে, তাহা কোথাও ফেলিয়া না দিয়া একেবারে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া ফেলাই নিরাপদ।

যাহারা রোগীর সেবা করে তাহাদের সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। বিশেষ করিয়া তাহাদের হাত দুটি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। রোগীর নিকট হইতে উঠিয়া আসিবার সময় প্রত্যেকবার সাবান দিয়া উত্তমরূপে হাত ধোওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধারণ সাবানে হাত ধুইলে উহা পরিষ্কার হয় বটে কিন্তু বীজাণুবর্জ্জিত (aseptic) হয় না। কার্ব্বলিক সাবান ব্যবহার করিলে তাহা কতকাংশে হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা সাইনল্ বা প্রক্ষাল্ (Synol or Proxal Soap)-জাতীয় সাবান অথবা নিকো সাবান (Neko Soap) ব্যবহার করা। অভাব পক্ষে লাইজল্ প্রভৃতি ঔষধের লোশন প্রস্তুত করিয়া রাখা যাইতে পারে, এবং উহাতে হাত ডুবাইয়া কিছুক্ষণ পরে সাধারণ সাবান দিয়া হাত ধুইয়া লইলেও কাজ চলিতে পারে।

টাইফয়েডের সময় খাদ্যাদি সম্বন্ধেও সকলের সাবধান হওয়া উচিত। স্বগৃহে প্রস্তুত অগ্নিসিদ্ধ খাদ্য ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত নয়। বাহির

হইতে পাক করা দ্রব্য আনাইয়া খাওয়া একেবারে বর্জ্জন করা উচিত। গৃহস্থের পক্ষে নিয়ম করিয়া দেওয়া উচিত যে সমস্ত খাদ্যই গৃহপক্ক হইবে, এবং ব্যঞ্জনাদি পদের সংখ্যা যথাসম্ভব কম হইবে। আহার্য্যের সংখ্যা যতই অধিক হয় ততই উহা সন্দেহজনক, কারণ পঞ্চব্যঞ্জন একটির পর একটি রাঁধিতে হইলেই উহা জুড়াইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, অনাবৃত অবস্থায় অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকার সম্ভাবনা, এবং মক্ষিকাদির দ্বারা উহা সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা। চিংড়ি মাছের কাট্‌লেট বা চপ প্রভৃতি জটিল খাদ্য এ সময় বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, কারণ নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ সকল প্রস্তুত করিতে করিতে জুড়াইয়া গিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনাবৃত পড়িয়া থাকে এবং সংক্রমণের সম্ভাবনা তাহাতে খুবই অধিক। অতএব অন্নের সহিত এমন ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করা উচিত যাহা সহজসিদ্ধ এবং যাহা গরম অবস্থায় খাইতে পারা সম্ভব।

পানীয় জল না ফুটাইয়া লইয়া কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। পানীয়, আচমনীয়, ও ব্যবহার্য্য জল মাত্রই উত্তমরূপে ফুটাইয়া রাখা উচিত। গৃহস্থের সংসারে ইহার প্রথম ব্যবস্থা করাই কঠিন, কিন্তু একবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে উহা আর কিছুই কঠিন নয়, প্রত্যহ নিয়মিতরূপে তাহা চলিতে থাকে। আহার্য্যের বাসন ও তৈজসপত্র পরিষ্কার করা আর এক সমস্যা। থালা, বাটী, গেলাস, হাতা, খুন্তি, চামচ সমস্তই মাজিয়া লইবার পর শেষকালে ফুটন্ত জলে প্রত্যেকটি একবার করিয়া ডুবাইয়া লইয়া ব্যবহার করা উচিত। ফুটন্ত জলে না ধুইয়া কোনো বাসন ব্যবহার করা উচিত নয়।

বাজার হইতে যে সকল ফলমূল ও তরকারী কিনিয়া আনা হয়, তাহা প্রথমে পার্ম্মাঙ্গানেট লোশনে (এক পাইণ্ট জলে ½ গ্রেন পার্ম্মাঙ্গানেট দিয়া) ডুবাইয়া লইয়া পরে গরম জলে উহা উত্তমরূপে ধুইয়া লইতে হয়। এইরূপে না ধুইয়া কোনো ফলমূলাদি খাওয়া নিরাপদ নয়।

কোলাই বীজাণুর জ্বর
Bacillus Coli Infection

কোলাই-ব্যাসিলাই নামক কতকগুলি অন্ত্রাশ্রয়ী স্বাভাবিক বীজাণুর দ্বারাও যে একপ্রকার সংক্রামক জ্বর এবং প্রদাহের সৃষ্টি হইয়া থাকে এ কথা আমরা এদেশে প্রথম জানিতে পারি ১৯১০ সালে। কেবল ইউরোপ এবং আমেরিকাতে নয়, ভারতবর্ষেও এই বীজাণু কর্ত্তৃক জ্বর যথেষ্ট হইয়া থাকে; এমন কি টাইফয়েড-জাতীয় জ্বর এদেশে যত দেখা যায়, কোলাই বীজাণুর জ্বর তাহা অপেক্ষা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। পূর্ব্বে এই প্রকৃতির জ্বরগুলির কারণ না জানাতে অনির্দ্দিষ্ট জ্বরের পর্য্যায়ে উহার স্থান ছিল। কলিকাতায় রজার্স এবং অন্যান্য কয়েকজনে প্রথম আবিষ্কার করেন যে এই বিশিষ্ট প্রকার সংক্রামক জ্বর কোলাই-বীজাণু কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোলাই-বীজাণুর জ্বর বর্ত্তমানে এদেশে এতই বেশী যে সচরাচর-দৃষ্ট অন্যান্য ব্যাধির সহিত ইহাকে সাধারণ জ্বরতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া উচিত। Dudgeon বলেন,—"This is one of the commonest infections to which the human body is liable, and the amount of ill health caused in men, women and children by these infections is a much more serious question than is usually recognised." অর্থাৎ মানুষের সাধারণ ব্যাধির মধ্যে এই কোলাই বীজাণুর সংক্রমণ অন্যতম, এবং যতটা মনে করা যায় তাহা অপেক্ষা বহুসংখ্যক লোকে এই বীজাণুর দ্বারা পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে।

কোলাই-জ্বর পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগেরই অধিক হয়, এবং প্রাপ্তবয়স্ক অপেক্ষা শিশুরাই ইহাতে অধিক ভোগে। প্রসবের পর স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই এই কোলাই বীজাণুর জ্বরে পীড়িত হয়; শিশুদিগের অনেক সময় পেটের দোষ হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়; এবং বৃদ্ধদিগের

প্রস্রাবের দোষ হইতেও (prostatic obstruction) এই সংক্রমণ উপস্থিত হইতে পারে। টাইফয়েড প্রভৃতি কয়েক প্রকার রোগের সহিত মিশ্রিত হইয়াও (mixed secondary infection) এই বীজাণুর সংক্রমণ উহার পরবর্ত্তীরূপে ঘটিতে পারে।

বীজাণু পরিচয়াদি

কোলাই-বীজাণু সর্ব্বদাই মানুষের অন্ত্রে নিরীহ ভাবে বাস করিয়া থাকে। প্রাণী মাত্রেরই পেটের ভিতর কোলাই-বীজাণু আছে, এবং পচন ক্রিয়ার দ্বারা ইহারা খাদ্য হজম করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। যখন হইতে শিশু প্রথম মাতৃস্তন্য পান করে তখন হইতেই ইহারা তৎসহিত অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তথায় নিত্য বাস করিতে থাকে। যে-কোনো সুস্থ ব্যক্তির মল লইয়া কাল্‌চার করিলেই তন্মধ্যে কোলাই-বীজাণু (Lactose fermenters) যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যতক্ষণ অন্ত্রে থাকে ততক্ষণ ইহারা উপকারী, কিন্তু অন্ত্র হইতে কোনোরূপে রক্তের মধ্যে সংক্রামিত হইলে তখন ইহারা রোগের সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র রক্তদুষ্টি (septicæmia) নয়, তখন ইহারা শরীরের নানা অংশে নীত হইয়া নানারূপ ব্যাধি জন্মাইতে পারে। এইরূপে ইহাদের দ্বারা পাঈমিয়া (Pyæmia), মূত্রাশয় প্রদাহ (Cystitis), মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ (Pyelitis), পিত্তাশয় প্রদাহ (Cholecystitis), অস্থিপ্রদাহ (Arthritis) প্রভৃতি অনেক রোগের সূত্রপাত হইতে পারে।

কোলাই-ব্যাসিলাই সাধারণতঃ বিষাক্ত নয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইহারা অত্যন্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে। একপ্রকার কোলাই-বীজাণু দেখা যায়, উহারা রক্তক্ষয়কারী অর্থাৎ hæmolytic। স্ত্রীলোকদিগের যে প্রবল কোলাই-ঘটিত পীড়া দেখা যায় তাহা অনেক সময় এই hæmolytic coli কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা পূঁজোৎপাদক (pyogenic) বীজাণু, সুতরাং সময়ে সময়ে পূঁজেরও সৃষ্টি করে।

কোলাই-ব্যাসিলাই সংক্রামিত রোগ হইলে দুইরূপে তাহা ধরিতে পারা যায়। এক প্রস্রাবের কাল্‌চারের দ্বারা, আর এক রক্তের কাল্‌চারের দ্বারা।

রক্তের কাল্‌চারে বীজাণুর সন্ধান পাওয়া বা না পাওয়ার কোনো স্থিরতা নাই, কিন্তু প্রস্রাবের কাল্‌চারে অধিকাংশ স্থলেই বীজাণু মিলিয়া যায়। প্রস্রাবে অধিক বীজাণু থাকিলে (Bacilluria) উহা দেখিতে ঘোলাটে হয়; কিন্তু তাহা না হইলে এই রোগে প্রস্রাবের কোনো চক্ষুগোচর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না; কেবল উহার কাল্‌চারেই বীজাণু ধরা পড়ে। তবে কোনো অ্যান্টিসেপ্‌টিক ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে কাল্‌চারেও উহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। কাল্‌চারের প্রয়োজন হইলে এই কথা স্মরণ করিয়া রাখা আবশ্যক। কাল্‌চার করিবার জন্য প্রস্রাব লইতে হইলে ক্যাথিটারের দ্বারা উহা সাবধানে (with aseptic precautions) গ্রহণ করা আবশ্যক, নতুবা কাল্‌চারে কোনোই ফল হয় না।

জ্বরের লক্ষণ

এই রোগে জ্বরের কোনো বাঁধা নিয়ম নাই এবং ইহার ভোগের কোনো নির্দ্ধারিত সীমাও নাই। ইহা সাধারণতঃ অবিকল ম্যালেরিয়ার মত প্রবল শীত করিয়া আসে এবং হয়তো বা ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্তও তাপ উঠিয়া যায়, পরে তাহা প্রায়ই ঘাম দিয়া ছাড়িয়া যায়। জ্বর আসিবার সময় কখনো কখনো বমি হইতেও দেখা যায়। জ্বর কখনো বা সবিরাম হয়, কখনো বা অবিরাম হয়। কখনো বা ইহার প্রকৃতি ম্যালেরিয়ার মত, আবার কখনো বা টাইফয়েডের মতও হইতে পারে। টাইফয়েডের মত হইলে উহা ধাপে ধাপে উঠিতে থাকে এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত উহার ভোগ থাকে। তখন উহা প্রথমে আপাতঃদৃষ্টিতে টাইফয়েড বা প্যারাটাইফয়েড বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু শীঘ্রই উহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং ক্রমশঃ জ্বর আপনিই ছাড়িয়া যাইতে থাকে। আবার একমাস দেড়মাস পর্য্যন্তও একাদিক্রমে উহার ভোগ চলিতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী হইলে এই জ্বর প্রায়ই ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়; প্রায়ই উহা প্রাতঃকালে ছাড়িয়া যায় এবং বৈকালে বা সন্ধ্যায় শীত করিয়া আসে। তবে ইহার কিছু নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, কোনো দিন বা ছাড়ে, কোনোদিন ছাড়ে না। কখনো কখনো ইহাতে দ্বৌকালীন জ্বর হইতেও দেখা যায়।

কোলাই-বীজাণুর জর সাধারণতঃ দুইপ্রকার হইয়া থাকে :—**তরুণ** ও **পুরাতন**,—অর্থাৎ acute, এবং subacute বা chronic।

তরুণ অবস্থাতে ইহা ম্যালেরিয়া অথবা এনটেরিক্ জরের মত দেখায়। সবিরাম জর হইলে ইহাকে ম্যালেরিয়া মনে করা খুব স্বাভাবিক, কারণ ইহাতে একটু প্লীহাও বাড়িতে দেখা যায়। কিন্তু কুইনিন বা আটেব্রিন দিলে এ জরের কিছুই উপশম হয় না, রক্ত পরীক্ষা করিলেও ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায় না, এবং শ্বেতকণিকার সংখ্যা গণনা করিলেই দেখা যায় তাহা স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যেখানে ম্যালেরিয়া নাই, সেখানেও মাঝে মাঝে শিশুদের যে ম্যালেরিয়ার মত হঠাৎ জর হইতে দেখা যায়, তাহা অধিকাংশই কোলাই-বীজাণুর জর। আবার ম্যালেরিয়ার সঙ্গেও এই জর একত্র হইয়া থাকিতে পারে, আর শিশুরাই তাহাতে প্রায় ভোগে। তখন রক্তেও ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়, কুইনিনও যথেষ্ট দেওয়া হয়, অথচ জর সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না। অতঃপর কোলাই ভ্যাক্সিন দিলে উহা আরোগ্য হয়।

কোলাই-বীজাণুর জর টাইফয়েডের মত হইলেও উহাতে জিহ্বা প্রায়ই পরিষ্কার থাকে এবং প্রবল জরেও বিকারের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। জর ব্যতীত উহাতে অন্যান্য অসুস্থতার লক্ষণ থাকে না, রোগীকে দেখিলে মনে হয় ইহার কোনো অসুখ নাই। এ রোগের ইহাই এক বিশিষ্টতা। সন্দেহস্থলে যখন ভিডাল্ পরীক্ষায় টাইফয়েডের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না, উপরন্তু দেখা যায় যে শ্বেত কণিকার সংখ্যা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখনই বুঝা যায় উহা এনটেরিক নয়। পরে প্রস্রাবের কাল্চার করিলেই রোগ ধরা পড়ে।

পুরাতন অবস্থায় কোলাই জরকে কালাজর অথবা যক্ষ্মা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কালাজর বলিয়া ভ্রম হইবার হেতু এই যে ইহার সহিত প্লীহা ও যকৃতের কিছু বৃদ্ধি দেখা যায়; এবং যক্ষ্মা মনে করিবার হেতু এই যে দীর্ঘদিন ব্যাপী অনিশ্চিত প্রকৃতির জর দেখিলেই ঐরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রক্তাদি পরীক্ষা করিলে, এবং তৎপরে প্রস্রাবের কাল্চার করিলে কি রোগ তাহা সঠিক জানিতে পারা যায়।

পুরাতন হইলে এই জরে অতিরিক্ত ঘাম হয়। এই অবস্থায় সকল দিন যে জর থাকিবে তাহার কোনো স্থিরতা নাই। এমনও দেখা যায় যে, কয়েকদিন রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া রহিল, পুনরায় হঠাৎ একদিন জর আসিল এবং দিন কতক পর্য্যন্ত তাহার ভোগ চলিল। ম্যালেরিয়ার যেমন মধ্যে মধ্যে রিল্যাপ্স্ হয়, কোলাই-জরেরও তেমনি মধ্যে মধ্যে বহুবার রিল্যাপ্স্ হইতে পারে। এইরূপে অধিক দিন ভুগিলে রোগী ক্রমে ক্রমে রক্তশূন্য হইয়া পড়ে। এমন রোগী দেখা গিয়াছে যাহার তিন চার মাস হইতে জর ভোগ হইতেছে, রোগ ধরা পড়ে নাই অথবা উহার উপযুক্ত চিকিৎসা হয় নাই বলিয়া কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না। আবার এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে কিছুকাল ভুগিতে ভুগিতে রোগী আপনিই আরোগ্যলাভ করিল।

অন্যান্য লক্ষণ

সাধারণতঃ কোলাই-বীজাণুঘটিত জরে অন্য কোনো উপসর্গ নাই। তবে কোনো আভ্যন্তরিক প্রদেশ বিশেষভাবে সংক্রামিত হইলে স্থানীয় প্রদাহের লক্ষণগুলি ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—পিত্তথলিতে প্রদাহ হইলে ঐ স্থানে ব্যথা অনুভব হয় এবং চোখে কামলার চিহ্ন (jaundice) দেখা যায়। মূত্রগ্রন্থিতে (kidney) হইলে প্রস্রাবে অ্যালবুমেন এবং রক্তও দেখা যাইতে পারে। এই রোগে পেটের দোষের লক্ষণও প্রায় দেখা যাইতে পারে।

কোলাই-বীজাণু কোথায় প্রদাহ জন্মায়

জর হওয়া ব্যতীত এই বীজাণুর দ্বারা শরীরের যে সকল অংশে প্রদাহ ঘটিতে পারে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

(১) **অন্ত্রে**—আমরা যাহাকে colitis, intestinal intoxication প্রভৃতি বলি, এবং যাহার কারণ অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় না, তাহার কতকগুলি হয়তো অন্ত্রস্থ কোলাই-বীজাণু দোষাক্ত হইয়া (sub-infection) উৎপন্ন হয়। শিশুদের একপ্রকার বহুদিনব্যাপি উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যায় যাহা কিছুতে আরোগ্য হইতে চায় না,

কিন্তু কয়েকটি কোলাই ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করিলেই তাহার উপশম হইতে দেখা যায়। তদ্ব্যতীত অর্শপ্রদাহ, অর্শ-পাকা (suppurative piles) প্রভৃতি পীড়াও এই বীজাণু কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়।

(২) **পিত্তকোষে**—এই বীজাণুর দ্বারা প্রায়ই cholangitis, cholecystitis (পিত্তকোষ প্রদাহ) প্রভৃতি পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(৩) **অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস্ ও পেরিটোনাইটিস্**—এই সকল রোগ যে কখনো কখনো কোলাই-বীজাণু কর্ত্তৃক ঘটিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৪) **কিড্‌নিতে**—কোলাই বীজাণুর দ্বারা নেফ্রাইটিস্ (nephritis) রোগও উৎপন্ন হইতে পারে। শিশুদের নেফ্রাইটিস্ রোগের অনেক সময় ইহাই অন্যতম কারণ। উহাতে শিশুদের হঠাৎ রক্তপ্রস্রাব হইতে থাকে এবং প্রস্রাবের মধ্যে পূঁজ ও অ্যাল্‌বুমেন দেখা যায়। ঐ সঙ্গে প্রবল জরও হইতে থাকে।

(৫) **মূত্রাশয়ে**—ইহার দ্বারা মূত্রাশয় আক্রান্ত হইলে মূত্রাশয়প্রদাহ (cystitis) জন্মায়। এই অবস্থায় যন্ত্রনার সহিত ঘন ঘন প্রস্রাব হইতে থাকে, মূত্রকৃচ্ছতা উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জরও দেখা যায়। প্রস্রাব তখন দেখিতে ঘোলা হয়, অত্যন্ত অ্যাসিড হয়, এবং এক প্রকার আঁসটে-গন্ধযুক্ত হয়। এই cystitis রোগে কোলাইয়ের সহিত ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাই ও ষ্ট্যাফিলোকক্কাই মিশ্রিত থাকিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের এবং বৃদ্ধদিগের এই রোগ যথেষ্ট হইয়া থাকে।

(৬) **রক্তে**—এই বীজাণু রক্তের মধ্যে সংক্রামিত হইলে তাহাকে coli septicæmia বলা হয়। ইহা সময়ে সময়ে মারাত্মকও হইতে পারে।

চিকিৎসা

কোলাই সংক্রান্ত রোগের সর্ব্বোত্তম ঔষধ **অ্যাল্‌কালাইন্ মিকশ্চার**। প্রচুর পরিমাণে **পটাস্ সাইট্রেট্** (Pot. Citras) দিতে থাকিলেই অধিকাংশ কোলাই-বীজাণুর জর আরোগ্য হইয়া যায়। তবে ইহা অল্পমাত্রায় দিয়া কিছু লাভ নাই। ইহার পূর্ণমাত্রা ৩০ গ্রেন হইতে ৬০ গ্রেন; সেইমত হিসাব করিয়া রোগীর বয়স ও শরীরায়তন অনুসারে ইহার মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হয়। শিশুদের পক্ষে ইহার ন্যূন মাত্রা

১০ গ্রেন। ইহার দ্বারা অ্যাসিড-প্রস্রাব অ্যাল্‌কালাইন হইয়া যায় এবং ইহাতে মূত্রবৃদ্ধি (diuresis) করে; তাহাতেই যথেষ্ট উপকার হয়। পটাস্ সাইট্রেটের পরিবর্ত্তে সোডা সাইট্রেটও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার সহিত অল্পমাত্রায় সোডা স্যালিসিলেট্‌ও যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কারণ তাহাও বীজাণুনাশ করিতে সক্ষম। এইজন্য ছোট ছেলেদের জর হইলে অধিকাংশ স্থলেই আমরা লাইকার অ্যামন অ্যাসিটেট্ (Liq. Ammon Acetatis), পটাস্ সাইট্রেট (Pot. Citras), সোডা স্যালিসিলেট (Sodi Salicylas) প্রভৃতি একত্রে মিলাইয়া মিকশ্চার দিয়া থাকি।

কোলাই-বীজাণুঘটিত রোগ মাত্রেই অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ **হেক্সামিন** (Hexamine), অথবা **ইউরোট্রোপিন** (Urotropine), অথবা **হেল্‌মিটল্** (Helmitol)। নামে বিভিন্ন হইলেও এই তিনটি একই ঔষধ। বীজাণু সম্পর্কিত প্রস্রাবের রোগ ও পিত্তথলির রোগ মাত্রেই ইহা উপকারী। ইহার মাত্রা ৫ গ্রেন হইতে ১৫ গ্রেন পর্য্যন্ত, তবে ৭৷৷০ গ্রেন মাত্রাতেই ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন ইহা অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চারের সহিত একত্রে মিলাইয়া দিতে দোষ নাই, এবং পটাস্ সাইট্রেট ও সোডা স্যালিসিলেটের সহিত একই মিকশ্চারের মধ্যে তাঁহারা ইউরোট্রোপিন প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেকে তাহা সমর্থন করেন না। অতএব মূত্রাশয়-সম্পর্কীয় রোগে অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চার ও ইউরোট্রোপিন স্বতন্ত্ররূপে ও বিভিন্ন সময়ে দিবার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ইহা প্রচুর জলের সহিত গুলিয়া দিলেই ভাল হয়। কেহ কেহ বলেন স্যালিসিলেটের সাহায্য পাইলে ইউরোট্রোপিনের ক্রিয়া আরো ভাল হয়। এইজন্য কেহ কেহ হেক্সামিন-স্যালিসিলেটও (Hexamine salicylate) ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইউরোট্রোপিনের ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশনও (5 c.c. of 40% solution) অনেকে এই রোগে প্রয়োগ করেন। ইন্‌জেকশনের জন্য Urotropine ampoules (Schering) সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কিন্তু মূত্রাশয়প্রদাহ বা পিত্তকোষ-প্রদাহ না থাকিলে সাধারণতঃ এই ইন্‌জেকশনের প্রয়োজন নাই।

এই সকল ঔষধে উপকার না হইলে **কোলাই বীজাণুর ভ্যাক্সিন** (B. coli vaccine) ইন্‌জেকশন করিলে নিশ্চয় উপকার হয়। এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগের দ্বারা অধিকাংশ স্থলে আশ্চর্য্যরূপ সাফল্যলাভ হয়। তবে এই ভ্যাক্সিন অধিক মাত্রায় দিতে নাই, কারণ তাহাতে জ্বর হঠাৎ প্রবলভাবে বাড়িয়া ওঠে (reaction)। যেখানে অল্পমাত্রাতেই কাজ হয় সেখানে অধিক মাত্রা দিবার কোনো আবশ্যক নাই,—ভ্যাক্সিন মাত্রেরই এই নিয়ম। সুতরাং এস্থলে পূর্ণবয়স্কদের অর্দ্ধ মিলিয়ন (১/২ million) এবং অল্প বয়স্কদের সিকি মিলিয়ন (১/৪ million) মাত্রাতেই ইহা প্রথমে প্রয়োগ করিতে হয়। পরে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে উহার মাত্রা বাড়াইতে হয়, এবং দুই তিন দিন অন্তর এক একটি ইন্‌জেকশন দিতে থাকিতে হয়। অর্থাৎ প্রথম মাত্রা ১/২ মিলিয়ন, দ্বিতীয় মাত্রা ১ মিলিয়ন, তৃতীয় মাত্রা ২ মিলিয়ন, চতুর্থ মাত্রা ৫ মিলিয়ন, পঞ্চম মাত্রা ১০ মিলিয়ন,—কতকটা এই হিসাবে উহার মাত্রা বাড়ানো উচিত। ৫০ মিলিয়নের অধিক মাত্রা দিবার কখনই প্রয়োজন হয় না। কোলাই-ভ্যাক্সিনের মত উপকারিতা খুব কম ভ্যাক্সিনেই হইতে দেখা যায়। প্রকৃত কোলাই বীজাণুর জ্বর বহুদিনের পুরাতন হইলেও একটিমাত্র ভ্যাক্সিন প্রয়োগে প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উপকার প্রত্যক্ষ করা যায়। অধিকাংশ স্থলে ৩।৪টি ইন্‌জেকশন দিতে দিতেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। তথাপি আরো দুই একটি অতিরিক্ত ইন্‌জেকশন দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা রোগটির পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

প্রথমত রোগীর শরীরস্থ বীজাণু হইতেই অটোভ্যাক্সিন (auto-vaccine) প্রস্তুত করাইয়া ব্যবহার করা উচিত, এবং সেজন্য উহার প্রস্রাব হইতে কাল্‌চারের দ্বারা বীজাণু সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অন্যথা বাজারে যে ভ্যাক্সিন (stock vaccine) কিনিতে পাওয়া যায় তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে দোষের কিছু নাই, বরং ভালই ফল হয়। অনেকে বলেন যে বিশ্বস্ত ল্যাবরেটরি ব্যতীত অন্য কোথাও অটোভ্যাক্সিন প্রস্তুত করা অপেক্ষা বিশ্বস্ত কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রস্তুত ষ্টক্‌-ভ্যাক্সিন অনেক ভাল। রজার্স বলিয়াছেন,—কোলাই বীজাণুর রোগ সাব্যস্ত হইলে

তৎক্ষণাৎ ষ্টক্‌-ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করিয়াই উহা আরোগ্য করা যাইতে পারে, অটোভ্যাক্সিন করাইতে অযথা বিলম্বের আবশ্যক নাই; কেবল যেখানে সাধারণ ভ্যাক্সিনে ফল হইতেছে না সেখানে অটোভ্যাক্সিন করাইবে।

স্থানবিশেষে কেবলমাত্র কোলাই ভ্যাক্সিনে সম্পূর্ণ ফল হয় না, উহার সহিত ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্‌ এবং ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্‌ ভ্যাক্সিন মিশাইয়া দিবার প্রয়োজন হয়; যেমন প্রসূতির জ্বরে (Puerperal fever) প্রায়ই মিশ্রিত ভ্যাক্সিনের ব্যবহার হয়। ঐ অবস্থায় অনেকে Van Cott's mixed vaccine ব্যবহার করিয়া থাকেন। ছোট ছেলেদের কয়েকপ্রকার পুরাতন জ্বরেও এইরূপ মিশ্রিত ভ্যাক্সিনে (mixed infection vaccine) ফল পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত আজকাল অনেক অনির্দ্দিষ্ট জ্বরেও এই জাতীয় মিশ্রিত ভ্যাক্সিন দেওয়া হয় এবং কখনো কখনো তাহাতে বেশ উপকার পাওয়া যায়। লিভারের দোষ হইয়া যে একপ্রকার ঘুষ্‌ঘুষে জ্বরের উৎপত্তি হয়, অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাহাতে অল্পমাত্রার এমিটিনের সহিত কোলাই-ভ্যাক্সিন একত্রে মিশাইয়া ব্যবহার করিতে বলেন, এবং তাহাতে উপকারও হয়। ভ্যাক্সিনের সহিত এমিটিন প্রভৃতি ঔষধ মিলাইলে যে উহার গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে একথা মনে করার কোনো কারণ নাই।

মূত্রপ্রদাহের (Cystitis) চিকিৎসা

প্রস্রাবে অ্যাল্‌বুমেন এবং পুঁজ দেখা গেলে সকল ক্ষেত্রে অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চারে উপকার না হইতে পারে, কখনো কখনো স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। গনোরিয়া ব্যতীত আরো দুইরূপ ভাবে মূত্রাশয়ের প্রদাহ ঘটিতে পারে, এবং তাহাতে রোগীর প্রস্রাব অ্যাল্‌কালাইন অথবা অ্যাসিড, এই দুইরূপ স্বতন্ত্র চরিত্রের হয়। এস্থলে প্রথমে লিট্‌মাস কাগজ (Litmus paper) দ্বারা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন যে প্রস্রাবটি **অ্যাসিড্‌** (acid in reaction) কিংবা **অ্যাল্‌কালাইন্‌** (alkaline in reaction)। যদি দেখা যায় উহা অ্যাল্‌কালাইন্‌,—তবে বুঝিতে হইবে যে ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাই বা ষ্ট্যাফিলোকক্কাই প্রভৃতি কর্ত্তৃক এই প্রদাহ উৎপন্ন

হইয়াছে,—কারণ ঐ সকল কক্কাইজাতীয় (gram positive) বীজাণুর দ্বারা প্রস্রাব অ্যাল্‌কালাইন্ হওয়াই স্বাভাবিক। নতুবা যদি কেবলমাত্র কোলাই-বীজাণু কর্ত্তৃক মূত্রাশয়প্রদাহ (cystitis) হয়, তবে প্রস্রাবে অ্যালবুমেন প্রভৃতি থাকিলেও উহা সাধারণতঃ অ্যাসিড হইবে।

অতএব এই দেখিয়াই মূত্রাশয়প্রদাহের চিকিৎসার ধারা কোথায় কিরূপ হইবে তাহা কতক বুঝিতে পারা যায়। তখন যে প্রস্রাব অ্যাসিড আছে তাহাকে অ্যাল্‌কালাইন করিতে হইবে, এবং যে প্রস্রাব অ্যাল্‌কালাইন আছে তাহাকে অ্যাসিড করা প্রয়োজন। কারণ মূত্রাশয়ে যে কোনো বীজাণুই প্রবেশ করুক, উহারা যখন অ্যাসিড প্রস্রাবের মধ্যে থাকিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছে তখন তাহা অ্যাল্‌কালাইন করিতে পারিলেই উহারা বিনষ্ট হইবে,—এবং তৎপরিবর্ত্তে উহারা যদি অ্যাল্‌কালাইন প্রস্রাবেই স্ফূর্ত্তি পায় তবে সে অবস্থারও পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে উহারা বিনষ্ট হইবে,—সাধারণভাবে চিকিৎসার এই সূত্র ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রস্রাব **অ্যাল্‌কালাইন** করিবার জন্য **পটাস্ সাইট্রেট** প্রভৃতির কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

প্রস্রাব **অ্যাসিড** করিবার জন্য সাধারণতঃ **অ্যাসিড সোডিয়াম ফস্‌ফেট্** (Acid Sodium Phosphate) দিতে হয়। কিন্তু কক্কাই-ঘটিত সিষ্টাইটিস্ (cystitis) রোগের পক্ষে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ **বোরিক অ্যাসিড** (Boric Acid)। যে রোগীর প্রস্রাব অ্যাল্‌কালাইন, ও যাহাতে পূঁজ দেখা যাইতেছে, তাহাকে ১০ গ্রেন মাত্রায় বোরিক অ্যাসিড ২০ ফোঁটা টিঞ্চার হাইওসিয়েমাসের সহিত একত্রে মিকশ্চার করিয়া প্রত্যহ তিনবার খাইতে দিলে শীঘ্রই উহা আরোগ্য হয়।

কোলাই-বীজাণুঘটিত মূত্রপ্রদাহের আর একটি উত্তম ঔষধ **টিঞ্চার মনসোনিয়া** (Tinct. Monsonia)। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার একপ্রকার ফুলগাছ হইতে প্রস্তুত। জন্ মোবার্লি (John Moberley) বলেন ইহা নাকি ইউরোট্রোপিন অপেক্ষাও উত্তম। ইহার মাত্রা ৩০ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ তিনবার। তবে প্রদাহের সহিত জ্বর না থাকিলে এ

ঔষধে বিশেষ ফল হয় না। ইহা তরুণ অবস্থার ঔষধ, পুরাতন অবস্থায় ইহার বিশেষ ক্রিয়া নাই।

কোলাই-বীজাণুর বিরুদ্ধে অপর একটি নূতন অ্যান্টিসেপটিক্ ঔষধ Hexyl-resorcinol (S. T. 37)। আমেরিকাতে ইহা আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই জ্বরে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রস্রাববৃদ্ধি এবং আরোগ্যের যথেষ্ট সহায়তা করে। এই রোগে গ্লুকোজ (Glucose) অথবা সুগার অফ মিল্ক্ (Milk sugar) ব্যবহার করাও উত্তম; উহাতে প্রস্রাববৃদ্ধির সহায়তা করে।

স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ কর্তৃক বিষাক্ত জ্বরাদি
Streptococcal Infections

স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস নামক বীজাণুর দ্বারা যে সকল রোগের উৎপত্তি হয় সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহাদের দ্বারা মানুষের যে বিভিন্নপ্রকার অসুস্থতার সৃষ্টি হয়, সাধারণভাবে প্রদাহ অথবা বিষদুষ্টি (inflammation and sepsis) ছাড়া তাহার আর কোনোই নাম দেওয়া হয় না; কিন্তু যে ব্যাধিসকল একই নির্দ্দিষ্ট বীজাণু কর্তৃক সৃষ্ট, উহার নির্দ্দিষ্ট নামটি তাহার প্রত্যেকের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। আমাদের দেশে এই বীজাণুকর্তৃক পীড়াসমূহ নিতান্ত অল্প হয় না, বিশেষতঃ অনেক প্রকার প্রদাহযুক্ত জ্বর উহার দ্বারা হয়, সুতরাং এতদ্দেশীয় রোগতালিকার মধ্যে উহার উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

বীজাণু পরিচয়

স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ প্রধানতঃ দুই প্রকার। একপ্রকার সাধারণ বা non-hæmolytic, আর একপ্রকার রক্তক্ষয়কারী বা hæmolytic। কেবলমাত্র কাল্‌চারের দ্বারাই ইহাদের এই পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। Blood-agar নামক মিডিয়ার (media) মধ্যে ইহারা উত্তমরূপে দল (colony) বাঁধে। কাল্‌চারের মধ্যে বীজাণুর দ্বারা ঐ মিডিয়ার রক্তাংশ যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সাদা হইয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে উহারা hæmolytic, আর যদি দেখা যায় যে মিডিয়ার লালবর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছে, তবে বুঝিতে হইবে কাল্‌চার-মধ্যস্থ বীজাণুগুলি সাধারণ বা non-hæmolytic। সাধারণ স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্‌দের মধ্যেও আর এক স্বতন্ত্র জাতি আছে, যাহাদের দল বা colonyর চতুর্দ্দিকে ঈষৎ সবুজ রংএর আভা (due to methæmoglobin) দেখা যায়,—তাহাদের নাম Strepto. viridans।

স্ট্রেপটোকক্কাস্ মাত্রেই বিষাক্ত। তন্মধ্যে হিমোলিটিক্ স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষাক্ত। সাধারণ স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ সুস্থ মানুষের দেহেও

নিরীহ অবস্থায় কখনো কখনো থাকিতে পারে, কিন্তু হিমোলিটিক্ স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ তাহা থাকে না।

ইহাদের অন্তর্বিষও (endotoxin) আছে, কিন্তু বহির্বিষই (exotoxin) ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর। এই বিষ রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অনেক সময় মারাত্মক অবস্থার (toxæmia) সৃষ্টি করে। ইহাদের দ্বারা রক্তদুষ্টিও (septicæmia) ঘটিতে পারে,—কিন্তু এই বীজাণুদের স্বয়ং সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে সর্ব্বদা দেখা যায় না। কখনো কখনো ইহারা শরীরের কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানবিশেষে (focus of infection) আশ্রয় লইয়া তথা হইতে বিষ সরবরাহ করিয়া রক্তকে দূষিত করিতে পারে। সুতরাং রক্তদুষ্টি হইলেও রক্তের কাল্‌চার করিয়া সকল সময় ইহাদের সাক্ষাৎ না পাওয়া যাইতে পারে।

স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ কর্তৃক কি কি ব্যাধি হয়

বিষাক্ত ব্যাধিগুলির অধিকাংশই স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ কর্তৃক উৎপন্ন। যে সকল আকস্মিক প্রবল জ্বরে রোগী দেখিতে দেখিতে বিকারগ্রস্ত ও অচৈতন্য হইয়া পড়ে, এবং যাহার কোনো কারণ না ধরা পড়িলেও রক্তপরীক্ষায় জানা যায় যে শ্বেতকণিকার সংখ্যার অতিশয় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে,—এই প্রকারের অধিকাংশ মারাত্মক সেপ্‌টিসিমিয়ার জ্বর (septicæmia) স্ট্রেপ্‌টোকক্কাই কর্তৃক সৃষ্ট। এতদ্ভিন্ন বহু প্রকার শারীরিক স্থানীয় প্রদাহও স্ট্রেপ্‌টোকক্কাই কর্তৃক উৎপন্ন হয়। ইহারা বিভিন্নরূপ প্রদাহের সৃষ্টি করিতে পারে, এবং সামান্য ক্ষতকেও বিষাক্ত করিয়া তুলিতে পারে। ইহারা যে কোনো তুচ্ছ রোগের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাকে অকস্মাৎ দারুণ মারাত্মক করিয়া তুলিতে পারে। সাধারণতঃ স্ট্রেপ্‌টোকক্কাই কর্তৃক যে সকল ব্যাধি সচরাচর ঘটিতে দেখা যায়, এস্থলে তাহা বিবৃত হইল:—

(১) **কণ্ঠপ্রদাহ** (Sorethroat, Tonsillitis প্রভৃতি)—ইহাদের দ্বারা এই-জাতীয় পীড়া উৎপন্ন হওয়া অতি সাধারণ। সেই জন্য প্রায় দেখা যায় যে সামান্য গলায় ব্যথা হইলেও তৎসহ প্রবল জ্বর হয়, এবং তাহাতেও শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। উহা যদিও সামান্য অবস্থাতেই

প্রায় আরোগ্য হইয়া যায় বটে, কিন্তু কখনো কখনো উহা হইতে নানারূপ কঠিন রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা হইতে প্রস্রাবের রোগ (Nephritis) এবং বাতজ্বর (Rheumatic fever) প্রভৃতির প্রায়ই সূত্রপাত হইয়া থাকে। ষ্ট্রেপ্টোকক্কাই টন্‌সিলের মধ্যে আশ্রয় করিলে মধ্যে মধ্যে প্রদাহ জন্মায় এবং কোনো সময় সুযোগ পাইলে উহা হইতে এক মারাত্মক রোগ আনিয়া উপস্থিত করে। যে সকল সেপ্‌টিসিমিয়া (septicæmia) বা এণ্ডোকার্ডাইটিস্ (endocarditis) প্রভৃতি ব্যাধি আমরা দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ স্থলেই অনুসন্ধান লইলে জানা যায় যে রোগীর পূর্ব্ব হইতে টন্‌সিলের দোষ ছিল।

(২) **ঘা বিষাইয়া ওঠা**—কোনো কাটা ঘা বা খোস-পাঁচড়া অত্যন্ত লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিলে আমরা চলিত কথায় বলি ঘা বিষাইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ স্থলে ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ কর্ত্তৃক সংক্রামিত হওয়াই তাহার কারণ।

(৩) **রক্তদুষ্টি** (Septicæmia or Bacteræmia)—ইহারা রক্তে প্রবেশ করিলে তাহা অতি মারাত্মক, শতকরা ২০টির অধিক তাহাতে বাঁচে না।

(৪) **ইরিসিপেলাস্** (Erysipelas)—বিষাক্ত ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্‌দের দ্বারাই ইহার উৎপত্তি।

(৫) **ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া**—এই রোগের বীজাণুদের মধ্যে প্রায়ই ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ আসিয়া যোগ দেয়।

(৬) **এণ্ডোকার্ডাইটিস্** (Septic endocarditis)—হৃদ্‌যন্ত্রের এই মারাত্মক রোগ ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্‌দের দ্বারাই সৃষ্ট হয়।

(৭) **নেফ্রাইটিস্** (Nephritis)—মারাত্মক মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহের কারণও এই বীজাণু। কখনো কখনো দেখা যায় শিশুদের সামান্য চর্ম্মরোগ হইতে হঠাৎ মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং হাত মুখ ফুলিয়া মূত্ররোধ অবধি ঘটিতে পারে। এই বীজাণুই তাহার মূল কারণ।

(৮) **প্রসূতির জ্বর** (Puerperal fever)—প্রসবের পর প্রসূতিদের যে প্রবল জ্বর ও রক্তদুষ্টি হইতে দেখা যায়, তাহাও সাধারণতঃ ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ সংক্রমণের দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

(৯) **মেনিঞ্জাইটিস্**—কখনো কখনো এই রোগও ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইতে পারে।

(১০) **চর্ম্মরোগ**—এই বীজাণুর দ্বারা কয়েক প্রকার সাধারণ চর্ম্মরোগ হইতেও দেখা যায়। ইহারা পূঁজোৎপাদনকারী (cyogenic), সুতরাং ক্ষতের মধ্যে পূঁজেরও সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা

ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ সংক্রমণের চিকিৎসা স্থানবিশেষে অতি কঠিন। রোগ সামান্য হইলে **ভ্যাক্সিন্** (বা Immunogen, বা Serobacterin) প্রভৃতির প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু প্রবল রক্তদুষ্টির অবস্থায় ভ্যাক্সিন্ দেওয়া বিপজ্জনক। তখন প্রচুর পরিমাণে **সিরাম** প্রয়োগ করাই (প্রত্যহ ২০ সি. সি. হইতে ৪০ সি. সি.) উপযুক্ত চিকিৎসার উপায়। আর এক উত্তম উপায় **নন্-স্পেসিফিক্ থেরাপি** (non-specific therapy)। দুধ হইতে প্রস্তুত ঔষধগুলি (Aolan, Lactolan, Omnadin প্রভৃতি) কখনো কখনো ইহাতে বেশ উপকার করে। বিশেষতঃ ইরিসিপেলাস, সেলিউলাইটিস্ প্রভৃতি স্থানীয় প্রদাহগুলি ঐ জাতীয় ইন্‌জেকশনে উত্তমরূপে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

অনেকে **আইওডিন্** (৫ ফোঁটা লাইকার্ আইওডিন্ ৫ সি. সি. ডিস্‌টিল্‌ড জলে) ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেক্‌শন দিয়া থাকেন, স্থানবিশেষে তাহাতেও উপকার হয়। আজকাল ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্-জনিত বিষাক্ত (septic) রোগে কেহ কেহ আইওডিনের পরিবর্ত্তে **ট্রাইপাফ্লেভিন্** (Trypaflavine) ইন্‌ট্রাভেনাস ইন্‌জেকশন দিতেছেন। ইহা ½% সলিউশন করিয়া ৫ সি. সি. মাত্রায় ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়।

কেহ কেহ আইওডিন্ খাইতে দিবার ব্যবস্থা করেন। ৫ ফোঁটা করিয়া লাইকার আইওডিন কিছু দুধের সহিত মিলাইয়া প্রত্যহ তিন চার বার খাওয়াইয়া কোনো কোনো স্থলে কিছু কাজ পাওয়া যায়; বিশেষতঃ ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্-জনিত কয়েকরূপ পুরাতন রোগে ইহা ফলপ্রদ।

কেহ কেহ ইহাতে **ইউরোট্রোপিন** ইন্‌জেকশনও দিয়া থাকেন, কিন্তু উহাতে তেমন ফল হয় না।

ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্‌ কর্ত্তৃক কোনো স্থানীয় ক্ষত হইলে অ্যান্টিসেপ্‌টিক (antiseptic) ঔষধের দ্বারা তাহার স্থানীয় চিকিৎসা প্রয়োজন। ফিনল্‌ বা লাইজল্‌ লোশন (Phenol or Lysol lotion, 1 in 500) প্রভৃতি ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। আজকাল অ্যাক্রিফ্লেভিন্‌ (Acriflavine 1 in 4,000), মার্কিউরোক্রোম্‌ (Mercurochrom ½%), হেক্সিল্‌-রিসর্সিনল্‌ (Hexyl-resorcinol) প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট অ্যান্টিসেপ্‌টিক্‌ ঔষধ ইহাতে ব্যবহৃত হইতেছে।

ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাসের বিরুদ্ধে এইগুলি বিশিষ্ট চিকিৎসা। বলা বাহুল্য ইহা ব্যতীত রোগের বিভিন্ন লক্ষণ অনুসারে তাহার অন্যান্যরূপ সাধারণ চিকিৎসাও করিতে হইবে এবং উপযুক্ত পরিচর্য্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্‌-জনিত ব্যাধি

Staphylococcal Infections

ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্‌ অপেক্ষা এই বীজাণু অনেক নিরীহ। প্রধানতঃ ইহারা দুই প্রকার ;—Staphylococcus albus অর্থাৎ শ্বেত ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্‌, এবং Staphylococcus aureus অর্থাৎ সোনালি রংএর ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্‌। কাল্‌চারের দ্বারা সাদা অথবা সোনালি কলোনি (colony) দেখিয়া ইহাদের পৃথক করিয়া চিনিতে পারা যায়। ঐ দুইয়ের মধ্যে ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্‌ অরিয়াস্‌ বা সোনালি বীজাণুগুলিই অপেক্ষাকৃত বিষাক্ত। ইহাদের সাধারণতঃ অন্তর্বিষ বা endotoxin-এর পরিমাণই অধিক এবং অধিকাংশ স্থলে ইহারা কেবল স্থানীয় প্রদাহেরই সৃষ্টি করে। ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্‌ যাবতীয় ক্ষত রোগের উৎপাদক বীজাণু। তবে কিছু কিছু exotoxin বা বহির্বিষও ইহাদের আছে, সেই জন্য কখনো কখনো রক্তদুষ্টিও ইহাদের দ্বারা ঘটিতে পারে।

ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্‌ মানুষের নিত্য সহচর। সর্ব্বদা ধুলা মাটির সঙ্গে ইহারা অঙ্গের সহিত লাগিয়া থাকে এবং নিত্য মুখের ভিতর দিয়া পেটের ভিতরেও প্রবেশ করে। মানুষের দেহের সহিত ইহারা এমন ঘনিষ্ঠ যে কোনো ব্যক্তির চামড়া হইতে অল্প ময়লা লইয়া কাল্‌চার করিলেই তাহাতে ষ্ট্যাফিলোকক্কাই দেখিতে পাওয়া যাইবে। তথাপি সহজে ইহারা কিছু রোগ জন্মায় না। কিন্তু দৈবাৎ যদি কখনো চর্ম্মের আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং তথায় অনুকুল ক্ষেত্র পায়, তবে সুযোগ অনুযায়ী ইহারা নানারূপ প্রদাহজনিত রোগ জন্মাইতে পারে। ইহারা প্রধানতঃ পূঁজ সৃষ্টিকারী (pyogenic) বীজাণু। যেখানেই পূঁজ আছে, সেখানেই ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্‌ বর্ত্তমান আছে। ইহাদের কাজই এই। শরীরের কোথাও কাটিয়া ছিঁড়িয়া গেলে ইহারা তৎক্ষণাৎ ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করে

এবং পূঁজ তৈয়ারী করে। এই জন্যই কোথাও কাটিয়া গেলে শীঘ্র সেখানে পূঁজ জন্মায়। মানুষের দেহে যে সকল ঘা, ফোড়া, খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি দেখা যায়, তাহার অধিকাংশেরই কারণ ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্।

সাধারণতঃ ইহারা শরীরের কোথাও প্রবেশলাভ করিলে একস্থানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র অগ্রসর হয় না। কিন্তু কখনো কখনো ইহারা রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোটকের সৃষ্টি করিয়া সমস্ত শরীরকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে পারে। সেইরূপ অবস্থাকে বলা হয় **পাঈমিয়া** (Pyæmia)। এই পাঈমিয়া রোগে শরীরের সর্ব্বত্র ফোড়া উঠিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে প্রবল জ্বর, বিষের লক্ষণ এবং রক্তশূন্যতা হইতেও দেখা যায়।

কোনো কারণে শরীর দুর্ব্বল হইলে ষ্ট্যাফিলোকক্কাই তখন সুযোগ পাইয়া সহজে রক্তের ভিতর প্রবেশ করে এবং তাহা বিষাক্ত করে। যাহাদের ডায়াবিটিস্ রোগ হইয়া স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের শরীরে ঘা-ফোড়া হইলে প্রায়ই এই অবস্থা ঘটে। কার্ব্বাঙ্কল্ (Carbuncle) হইতেই সচরাচর উহাদের মারাত্মক রক্তদুষ্টি (septicæmia) ঘটিতে দেখা যায়।

ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্-সংক্রামিত ঘা ফোড়া প্রভৃতিতে প্রদাহের মাত্রা কিছু অধিক হইলে জ্বরও হইতে দেখা যায়। ইহাকেই লোকে চলিত কথায় 'ঘায়ের তাড়সে' বা 'ফোড়ার তাড়সে' জ্বর হইয়াছে বলিয়া থাকে। উহাতে ক্ষতস্থানের সমীপবর্ত্তী গ্রন্থিগুলিও স্ফীত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। এইরূপ জ্বর ও গ্রন্থিস্ফীতি দেখিলে বুঝা যায় যে ষ্ট্যাফিলোকক্কাই তথায় প্রবল ক্রিয়া করিতেছে।

ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্ কর্ত্তৃক পাঈমিয়া রোগে যে জ্বর হইতে থাকে উহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র প্রকার। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে প্রলেপক জ্বর বলে। এই জ্বর নিত্য ছাড়ে এবং নিত্য বৃদ্ধি পায় (hectic fever), অর্থাৎ একবার করিয়া শীতের সহিত প্রবল জ্বর হয়, আবার কিছুক্ষণ পরে উহা ঘাম দিয়া ছাড়ে। এইরূপে প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া এই জ্বর ওঠানামা করে। একমাস দুইমাস পর্য্যন্তও এই প্রকার জ্বর ভোগ হইতে পারে, তাহাতে রোগী

অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য হইয়া পড়ে। অবশেষে এই বীজাণু কিড্নি, লিভার, ফুস্ফুস্ প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্রও আক্রমণ করিতে পারে।

চিকিৎসা

ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্-জনিত ব্যাধির চিকিৎসা সাধারণতঃ কঠিন নয়, কিন্তু ইহাদের দ্বারা রক্তদুষ্টি হইলে তাহার চিকিৎসা করা সময় বিশেষে কঠিন।

ঘা-ফোড়া প্রভৃতির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রতিষেধমূলক চিকিৎসা **ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্ ভ্যাক্সিন**। সাধারণ বাজারের ষ্টক্-ভ্যাক্সিনেই বেশ কাজ হয়, কিন্তু অটোভ্যাক্সিন (auto-vaccine) প্রস্তুত করাইয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে আরো ভাল হয়। এতদ্ব্যতীত স্থানবিশেষে ব্যাক্টিরিওফাজ্ প্রয়োগ করিলেও উপকার হইতে পারে; লাগাইবার ঔষধ হিসাবে অ্যান্টিভাইরাস (antivirus) প্রভৃতি স্থানীয় ক্ষতে প্রয়োগ করিলেও উত্তম ফল হয়।

ষ্ট্যাফিলোকক্কাসের বিরুদ্ধে কয়েকপ্রকার ধাতুঘটিত ঔষধও ইন্জেকশনের জন্য পাওয়া যায়, তাহাতেও বেশ ফল হয়। ম্যাঙ্গানীজ্ (Manganese) ধাতু এই বীজাণুর বিরুদ্ধে উপকারী, এবং উহা হইতে প্রস্তুত **ম্যাঙ্গানীজ্ বিউটিরেট্** (Manganese Butyrate), অথবা টিন্ ও ম্যাঙ্গানীজ একত্রে মিলাইয়া প্রস্তুত **ষ্ট্যানো-ম্যাঙ্গানীজ্** (Stanno-manganese) কয়েকটি ইন্জেকশন দিলেও চমৎকার ফল হয় এবং ঘা-ফোড়া সত্বর আরোগ্য হয়। কিন্তু রক্তদুষ্টি উপস্থিত হইলে এই সকল চিকিৎসায় বিশেষ কিছু হয় না,—তখন অ্যান্টি-ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্ সিরাম পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে হয়।

ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্ কর্ত্তৃক স্থানীয় প্রদাহেরও যথোচিত চিকিৎসার প্রয়োজন। কোথাও ফুলিয়া উঠিয়া ফোড়া হইবার উপক্রম হইলে আমরা কেবল **বোরিক্ কম্প্রেসের** (Hot Boric compress) দ্বারা সেঁক দিবার ব্যবস্থা করি, কিন্তু এই চিকিৎসা সকল অবস্থার পক্ষে উপযুক্ত নয়। যেখানে পূঁজ তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেখানে ফোড়া শীঘ্র ফাটাইবার জন্য কম্প্রেস দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ফোড়ার প্রথম অবস্থা হইতে কম্প্রেস না দেওয়াই ভাল। তখন চেষ্টা করা উচিত যাহাতে প্রদাহের

নিবৃত্তি হয় ও পাকিয়া উঠিবার সুযোগ না হয়। এইজন্য প্রথম অবস্থায় প্রলেপ ব্যবহার করা ভাল। প্রলেপের ঔষধের মধ্যে **ইক্‌থিয়লের** (Ichthyol) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমান পরিমাণে ইক্‌থিয়ল ও স্পিরিট মিশাইয়া উহার প্রলেপ লাগাইলে অনেক সময় ফোড়া না পাকিয়া বসিয়া যায়। আজকালকার দিনে ফোড়া যাহাতে না কাটিতে হয় সেই চেষ্টা করিবার অনেক উপায় আছে। প্রথম হইতে যদি ইক্‌থিয়ল প্রভৃতি ঔষধ লাগাইয়া তৎসঙ্গে ভ্যাক্সিন বা উপরোক্ত ইন্‌জেকশনগুলি রীতিমত প্রয়োগ করা যায় তবে অনেক ফোড়া না পাকিয়াই আরোগ্য হইতে পারে।

ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্‌-জনিত উন্মুক্ত ক্ষতের জন্য মৃদু অ্যান্টিসেপ্‌টিক্ ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। ইউজল্ লোশন (Eupad 4 dr. to a pint) এবং লাইজল, অ্যাক্রিফ্লেভিন্ প্রভৃতি ঔষধগুলির লোশন ইহার পক্ষেও উত্তম। অ্যান্টিসেপ্‌টিক্ যাহাই ব্যবহার করা হউক, কোনো কড়া ঔষধ ঘায়ের ভিতর লাগানো উচিত নয়, কারণ কড়া ঔষধে কেবল বীজাণুগুলি মরিয়াই ক্ষান্ত হয় না, স্থানীয় কোষগুলিও তাহাতে নষ্ট হয় এবং তথাকার স্বাভাবিক আরোগ্যশক্তি লোপ পায়। অ্যান্টিসেপ্‌টিক্ ঔষধ এমন মৃদু হওয়া উচিত যাহা কেবলমাত্র বীজাণুকে নষ্ট করিবে কিন্তু টিস্থগুলির অনিষ্ট করিবে না। যে-কোনো অ্যান্টিসেপ্‌টিক্ অতি অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলেই তাহা হইতে পারে। টিঞ্চার আইওডিন বা আইওডোফর্ম প্রভৃতি কড়া ঔষধ ঘায়ের ভিতর প্রয়োগ করা যে আজকাল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, তাহার কারণই এই। কেবল বীজাণু মারিয়া কোনো লাভ নাই, তদপেক্ষা শরীরের স্বাভাবিক শক্তিকে উত্তেজিত করাই রোগ-আরোগ্যের উত্তম পন্থা।

এই-জাতীয় রোগে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি বাড়াইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে লৌহঘটিত ও আর্সেনিকঘটিত ঔষধ-সকল, এবং লিভার এক্সট্রাক্ট্, মাংসের শুরুয়া প্রভৃতি উত্তম পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত।

রিউম্যাটিক্ ফিবার
Rheumatic Fever

অকস্মাৎ জ্বরের সঙ্গে একাধিক গাঁঠে ব্যথা হইতে থাকিলে, এবং সেই সঙ্গে হার্ট আক্রান্ত হইলে (myocarditis) বা উহার সম্ভাবনা থাকিলে সেই প্রকার জ্বরকে রিউম্যাটিক্ ফিবার বলা হইয়া থাকে। ইহা ঠিক বাত রোগ নয় অথবা বাতসংক্রান্ত জ্বরও নয়। ইহা এক স্বতন্ত্র প্রকারের ব্যাধি। ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধিও ইহাকে বলা যায় না, কারণ রোগীর শরীর হইতে অপর ব্যক্তির শরীরে এই রোগ কখনো সংক্রামিত হয় না; তবে ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্‌-ঘটিত সংক্রমণ হইতেই কোনো উপায়ে যে এই রোগের সৃষ্টি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ওস্‌লার (Osler) বলিতেন ইহা শীতপ্রধান দেশের ব্যাধি এবং গ্রীষ্মপ্রধানদেশে ইহা অতি বিরল। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে ইহা প্রকৃতপক্ষে এদেশে নিতান্ত বিরল নয়। রিউম্যাটিক্ ফিবার এদেশেও যথেষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ষার শেষে ও হেমন্ত ঋতুতেই এই রোগের আধিক্য দেখা যায়। প্রায়ই বৃষ্টিতে ভিজিবার পর বা অত্যধিক পরিশ্রমের পর ইহা ঘটিতে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু বিনা কারণেও ইহা হইতে পারে। ইহা এক হিসাবে বংশগত ব্যাধিও বলা যাইতে পারে, কারণ কোনো কোনো বংশে একবার করিয়া কৈশোরে ও যৌবনকালে (adolescence) এই রোগে অনেককেই আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। শৈশবকালেও এ রোগ হয় না, এবং ৩০ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও ইহা আর হয় না। কিন্তু তন্মধ্যে যাহাদের একবার ইহার আক্রমণ হয় তাহাদের প্রায়ই পুনরাক্রমণ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণতঃ টন্‌সিলাইটিস্ হইতে এ-রোগের সূত্রপাত দেখা যায়। টন্‌সিলের মধ্যে যে সকল ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাই প্রবেশ করিয়া থাকে তাহারাই অনেক সময়

ইহার হেতু। কিন্তু এই ষ্ট্রেপ্টোকক্কাই hæmolytic বা রক্তনাশী নয়। কেহ কেহ বলেন, ঐ বিশিষ্টরূপ স্থানীয় ষ্ট্রেপ্টোকক্কাই হইতে বিষ রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া এই রোগ জন্মায়,—কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা তাহার কোনোরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেইজন্য এখন অনেকে স্থির করিয়াছেন যে ইহা একপ্রকার allergy,—অর্থাৎ বিজাতীয় ষ্ট্রেপ্টোকক্কাই কর্তৃক শরীরের মধ্যে একরূপ প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেই প্রতিক্রিয়ার অবস্থাই রিউম্যাটিক্-ফিবাররূপে অভিব্যক্ত হয়।

লক্ষণাদি

ইহাতে প্রথমে হঠাৎ শীত করিয়া জর হয় ও সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি গাঁঠে গুরুতর ব্যথা উপস্থিত হয়। ইহার প্রথম আক্রমণ প্রায় হাঁটুতে এবং পায়ের নীচেকার গাঁঠগুলিতেই হইয়া থাকে। ক্রমে ২।৩ দিনের মধ্যে অন্যান্য গাঁঠসকল পর্য্যায়ক্রমে আক্রান্ত হইতে থাকে,—কব্জি, কনুই, কাঁধ, বন্ধন-গ্রন্থিগুলি, আঙুলের গাঁঠগুলি,—কোনোটিই প্রায় বাদ যায় না। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে সব গাঁঠগুলি একত্রে আক্রান্ত হয় না বা সবগুলিতে সমান পরিমাণ ব্যথা থাকে না,—পর্য্যায়ক্রমে একটি গাঁঠের ব্যথা কমে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটির ব্যথা বাড়ে। গাঁঠগুলি এই সময় রীতিমত ফুলিয়া ওঠে, কিন্তু কোনোটিতে পূঁজ জন্মায় না। গাঁঠের ব্যথা এমন প্রবল হইয়া ওঠে যে একটু পাশ ফিরিতে হইলেও রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে, কিন্তু নড়াচড়া না করিলে ব্যথা অধিক টের পাওয়া যায় না।

ইহাতে জর প্রায় ১০২ বা ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ওঠে, এবং প্রত্যহই উহা কিছু ওঠানামা করে। জরের সঙ্গে প্রচুর ঘাম হইতে থাকে, ও উহাতে একপ্রকার টক্ গন্ধ (acid sweats) পাওয়া যায়। প্রস্রাব খুব কম হয় এবং তাহার মধ্যে অ্যাসিটোন (acetone) পাওয়া যাইতে পারে; এই রোগে কোষ্ঠকাঠিন্যও থাকে, এবং জিহ্বা অত্যন্ত ময়লা হয়। ইহার সঙ্গে টন্‌সিলাইটিস্ প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে।

অতঃপর রোগভোগের প্রায় ৮।৯ দিনের মধ্যে হার্ট আক্রান্ত হয়। হার্টের তলদেশে হৃৎস্পন্দনের প্রথম শব্দটি ক্রমে কোমল (soft
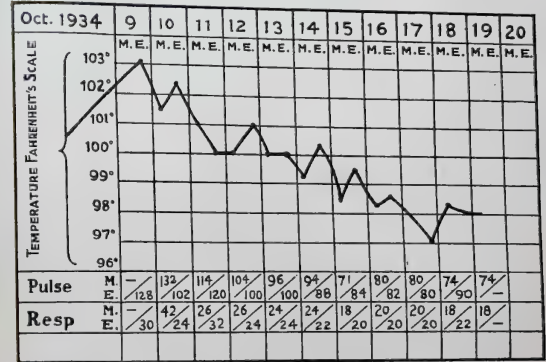
রিউম্যাটিক ফিবারের টেম্পারেচার চার্ট

first sound) হইয়া আসে, এবং ধক্ ধক্ শব্দের পরিবর্ত্তে একটা ফাঁকা আওয়াজ (bruit) পাওয়া যায়। এই আওয়াজ যদি বগলের দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে এবং হৃদ্‌পিণ্ড আকারে বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া পরীক্ষার দ্বারা অনুমিত হয়, ও সেই সঙ্গে যদি দেখা যায় যে জর আরো বাড়িয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে যে এণ্ডোকার্ডাইটিস্ (endocarditis) জন্মিতেছে; এ-রোগে ঐ উপসর্গটি নিতান্ত বিরল নয়।

রিউম্যাটিক ফিবারে রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় (১৫,০০০ হইতে ২০,০০০ পর্য্যন্ত) এবং শীঘ্রই যথেষ্ট রক্তশূন্যতা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে নাড়ী সর্ব্বদাই দ্রুতগতি হইয়া থাকে।

চিকিৎসা না করিলে এ-রোগের মেয়াদ ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত, তৎপরে উহা আপনিই আরোগ্য হইতে পারে। চিকিৎসা করিলে প্রায় ১০ দিন হইতে

তিন সপ্তাহের মধ্যে ইহা আরোগ্য হয়। জ্বর তৎপূর্ব্বেই ছাড়িয়া যায়। রোগ সম্পূর্ণ সারিতে না সারিতে অসাবধান হইলে বা চলাফেরা করিলে পুনরাক্রমণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, এবং তখন হার্ট আরো অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ-রোগে মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায় না, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা না করিলে হার্ট চিরকালের জন্য বিকল হইয়া যায়, এবং কোনো কোনো গাঁঠ চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতে পারে। পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইলে ছেলেদের শরীরে একরূপ শক্ত গুটি (nodules) উঠিতে দেখা যায়, এগুলি প্রায়ই মাথার চামড়ার নীচে অথবা পিঠে হয়।
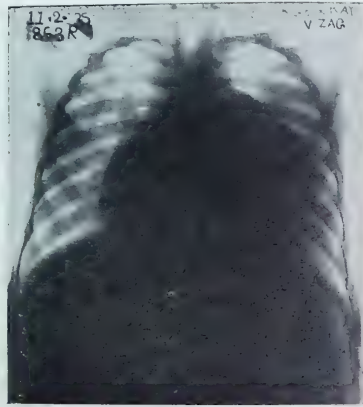
রিউম্যাটিক ফিবার হইতে একটি ১৪ বৎসরের ছেলের হার্ট কিরূপ ভাবে বিকৃত হইয়াছে (Mitral stenosis and dilatation) তাহারই এক্স্-রে চিত্র (এই চিত্র দুইখানি ডাক্তার কে. সি. চৌধুরীর সৌজন্যে Indian journal of Pediatrics হইতে সংগৃহীত)

রিউম্যাটিক্ ফিবার কখনো কখনো পুরাতন (sub-acute) হইতেও দেখা যায়। উহাতে রোগী মধ্যে মধ্যে ভাল থাকে, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, এবং হার্ট উত্তরোত্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। গাঁঠের ব্যথাও উহাতে

নিত্য লাগিয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও জ্বর একেবারেই না থাকিতে পারে।

চিকিৎসা

প্রথম হইতেই রোগীকে শয্যাগত করিয়া রাখা উচিত এবং যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় ততদিন বিছানা হইতে নামিতে দেওয়া উচিত নয়। বিছানাতেই মলমূত্রাদি ত্যাগের ব্যবস্থা করা উত্তম, তবেই হার্টকে বাঁচাইতে পারা যায়। জ্বর যতদিন ত্যাগ না হয় ততদিন বার্লির জল, দুধ, মিছরির সরবৎ, গ্লুকোজের জল প্রভৃতি নানারূপ পানীয় পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। দাস্ত পরিষ্কার রাখিবার জন্য ইহাতে মধ্যে মধ্যে জোলাপ দেওয়া যাইতে পারে।

সোডা স্যালিসিলেট্ এই রোগের বিশিষ্ট (specific) এবং একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা জ্বর কমায়, ব্যথা নরম করে, এবং হার্টকে রক্ষা করে। একবার এণ্ডোকার্ডাইটিস্ ধরিয়া গেলে সোডা স্যালিসিলেট তাহা আরোগ্য করিতে পারে না, কিন্তু প্রথম হইতে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ঐ উপসর্গ ঘটিবার সম্ভাবনাই থাকে না। হার্টের উপসর্গ রোগভোগের ৭।৮ দিন পরে দেখা দেয়, কিন্তু প্রথম হইতে স্যালিসিলেট ব্যবহার করিতে থাকিলে ততদিনে রোগটিই প্রায় আরোগ্য হইয়া যাইতে পারে।

স্যালিসিলেট্ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা প্রয়োজন, অল্প মাত্রাতে কোনো ফল হয় না। এই রোগে ৫ গ্রেন বা ১০ গ্রেন মাত্রায় স্যালিসিলেট্ দেওয়া বৃথা। পাঠ্য পুস্তকাদিতে পূর্ণ বয়স্কের জন্য ইহা **দৈনিক ১৮০ গ্রেন** করিয়া দিতে বলা হয়। ওস্‌লার বলেন **দৈনিক ১২০ গ্রেন** দিতে। আমাদের দেশের রোগীকে এতটা পরিমাণে না দিলেও প্রতি মাত্রায় অন্ততঃ ১৫ গ্রেন হইতে ২০ গ্রেন করিয়া স্যালিসিলেট্ দিয়া প্রত্যহ উহা ৫।৬ মাত্রা সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত,—অর্থাৎ দিবাভাগে তিনঘণ্টা অন্তর চারবার এবং রাত্রে একবার বা দুইবার দিলেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়। রোগী ১২ বৎসরের নিম্নবয়স্ক হইলে উহার অর্দ্ধমাত্রা দিতে হইবে। দুই দিনের মধ্যে আশানুরূপ উপকার না দেখা গেলে উহার মাত্রা বাড়াইয়া দিতে হইবে। উপকার হইতে থাকিলে

ক্রমে ক্রমে মাত্রা কমাইয়া আনিতে হইবে। মাত্রা কমাইলে যদি পুনরায় রোগ বৃদ্ধি পায় তবে পুনরায় উহা বাড়াইতে হইবে। রিউম্যাটিক্ ফিবারে ইহার ফল অবশ্যম্ভাবী। যদি পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়াও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনো উপকার না পাওয়া যায় এবং ব্যথা ও জর কিছুমাত্র না কমে, তবে বুঝিতে হইবে উহা রিউম্যাটিক্ ফিবার নয়, রোগ চিনিতে ভুল হইয়াছে। রোগটি প্রকৃত রিউম্যাটিক্ ফিবার কি না, তুইদিন স্যালিসিলেট্ প্রয়োগ করিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সোডা স্যালিসিলেট্ উত্তম ও অকৃত্রিম হওয়া উচিত, নতুবা আশানুরূপ ফল না হইতে পারে। সেইজন্য সর্ব্বদা natural স্যালিসিলেট্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং প্রেস্ক্রপ্‌শনে বিশেষ করিয়া natural কথাটির উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। স্যালিসিলেট মাত্রই পেটের ভিতর গিয়া সাধারণতঃ অম্লবৃদ্ধি করে, এই জন্য উহার সহিত প্রচুর ক্ষারীয় ঔষধ মিশাইয়া দিতে হয়। যত পরিমাণ স্যালিসিলেট্ দেওয়া হইবে তত পরিমাণ বা তাহার দ্বিগুণ **সোডা বাইকার্ব** মিকশ্চারের সহিত যোগ করিতে হয়। উহার সহিত **স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারোম্যাটিক্** (Spt. ammon. aromat.) ১৫।২০ ফোঁটা মাত্রায় মিশাইয়া দিলে আরো উত্তম হয়।

রোগের প্রথম অবস্থায় ব্যথার সাময়িক নিবৃত্তির জন্য কিছু স্বতন্ত্র ঔষধেরও প্রয়োজন হইতে পারে। তখন মধ্যে মধ্যে অল্প মাত্রায় **আস্‌পিরিন** খাইতে দিলে অনেক সময় আশু উপকার হয়। **নোভ্যাল্‌জিন্** (Novalgin) খাইতে দিলেও ব্যথার যথেষ্ট নিবৃত্তি হয়।

গাঁঠের উপর ব্যথার জন্য কোনোরূপ মালিশ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। **অয়েল উইণ্টারগ্রীন্** (Ol. Wintergreen) গাঁঠের উপর কেবল মাখাইয়া দিয়া তথায় তুলা জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলেই বেশ উপকার হয়। ফ্লানেলের টুকরাতে কয়েক ফোঁটা অয়েল উইণ্টারগ্রীন ছিটাইয়া তাহার দ্বারাও গাঁঠটি বাঁধিয়া রাখা যাইতে পারে।

গলায় ব্যথা না থাকিলেও টন্‌সিলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক এবং সন্দেহ স্থলে টন্‌সিলে প্রত্যহ **পেণ্ট্** (throat paint) প্রভৃতি লাগাইবার ব্যবস্থা করা উচিত।

যাহাদের রোগ দীর্ঘস্থায়ী (sub-acute) ভাব ধারণ করিয়াছে, অথবা যাহাদের স্যালিসিলেট দিয়াও সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে, তাহাদের **আইওডিন্** দেওয়া উত্তম। সাধারণ **টিঞ্চার** (লাইকার্) **আইওডিন্** ৫ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় কিঞ্চিৎ দুধের সহিত মিশাইয়া তিনবার করিয়া খাইতে দিলে বেশ উপকার হয়। ইহার পরিবর্ত্তে **ফ্রেঞ্চ্ টিঞ্চার আইওডিন্** (French codex) ব্যবহার করা আরো উত্তম, কারণ তাহাতে লেশমাত্র আইওডাইড নাই। এই রোগে আইওডাইডের কোনো প্রয়োজন নাই, সেইজন্য অনেকে উহা বাদ দিয়া শুদ্ধ আইওডিন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই রোগের তরুণ অবস্থায় কোনো সিরাম বা ভ্যাক্সিন ব্যবহার করা অনাবশ্যক। রোগ সারিতে বিলম্ব দেখিলে বা টন্‌সিলাইটিসের সহিত রিউম্যাটিক্ ফিবারের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ সকল পুনঃ পুনঃ ঘটিতে দেখিলে **ষ্ট্রেপ্‌-টোকক্কাস্ ইমিউনোজেন্** (Strepto. Immunogen) কিংবা **রিউম্যাটিক্-ষ্ট্রেপ্‌টো ভ্যাক্সিন্** (Strepto. Rheumaticus Vaccine) প্রয়োগ করিলে কখনো কখনো উপকার হইতে পারে।

হার্ট আক্রান্ত হইলে আরোগ্যের পরেও ৪ সপ্তাহ হইতে ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোগীকে শয্যাগত রাখা উচিত। এ সময় হার্টের জন্য নানাপ্রকার টনিকের ব্যবস্থা করা উচিত। এই রোগে প্রায়ই রক্তশূন্যতা আসে, সুতরাং **লৌহ-ঘটিত** ঔষধসকল রীতিমত মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত। এইজন্য Ferrous Sulphate tablets, Ferri et Quinine Citras প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে **ক্যালসিয়াম** প্রয়োগ করিলেও হার্টের পক্ষে উপকার হয়, এবং ক্যালসিয়ামের ইন্‌জেকশনও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন **লিভার এক্সট্রাক্টের** ব্যবস্থা করিলে রক্তশূন্যতা দূর হইয়া হার্ট সবল হইতে দেখা যায়, এবং Radiostoleum, Adexolin প্রভৃতি ভাইটামিনযুক্ত ঔষধেও আরোগ্যের সাহায্য করে।

ডেঙ্গু জ্বর
Dengue Fever

ডেঙ্গু রোগ দুই রকমের আছে ; এক রকম ডেঙ্গু মশার কামড়ে হয়, আর এক রকম ডেঙ্গু হয় স্যাণ্ডফ্লাইয়ের দ্বারা। আমাদের দেশে মশাজাত ডেঙ্গুরই প্রাধান্য; দিল্লী লাহোর প্রভৃতি অঞ্চলে সাধারণতঃ স্যাণ্ডফ্লাই-ডেঙ্গু হইয়া থাকে। তবে এই দুই প্রকার ডেঙ্গুকে পৃথক করিয়া চেনা অসম্ভব, কারণ দুইয়েরই লক্ষণ প্রায় এক প্রকার। তদ্ব্যতীত কেবল লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করা ব্যতীত ডেঙ্গু-রোগ চিনিবার কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় নাই, কারণ কোনোরূপ ল্যাবরেটরি-পরীক্ষার দ্বারা ডেঙ্গুর অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া যায় না।

ডেঙ্গুকে চলিত কথায় 'হাড়-ভাঙা জ্বর' বলে। আমেরিকাতেও ইহাকে বলে 'break-bone fever'। ইহা সচরাচর গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহেই হয়। সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী ও নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশেই ডেঙ্গুর অধিক প্রকোপ, কারণ ঐ সকল স্থানেই ডেঙ্গু-বাহী মশার (stegomyia mosquitoes) আধিক্য।

ডেঙ্গু অল্পকালস্থায়ী জ্বর,—ইহার মেয়াদ একদিন হইতে সাতদিন পর্য্যন্ত। সাতদিনের অধিক ভোগ ইহার কখনই হয় না, এবং সাতদিনের মধ্যে ইহা আপনিই আরোগ্য হইয়া যায়। এই রোগে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয় না। জ্বরের সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হওয়া ইহার বিশেষত্ব।

প্রতিবৎসর বর্ষার প্রারম্ভে যখন ষ্টেগোমায়া-মশার আধিক্য হয় তখনই ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সংক্রামক ব্যাধি ; একবার আরম্ভ হইলে ইহা ঘরে ঘরে হইতে থাকে এবং এককালীন অনেক লোককে শয্যাগত করিয়া ফেলে। কিন্তু এক বৎসরের ডেঙ্গু যেমন হয় অন্য বৎসরের ডেঙ্গু প্রায়ই সেরূপ হয় না, সেইজন্য ইহাকে চিনিতে ভুল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এক-একবার ইহার চরিত্র দেখিয়া মনে হয় বুঝি অন্য কোনো নূতন রোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

যে ব্যক্তির একবার ডেঙ্গু হইয়াছে তাহার পুনরায় উহা হইতে পারে,

কিন্তু প্রথমবারের আক্রমণ হইতে দ্বিতীয়বারের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত মৃদু হয়। এক ব্যক্তির শরীরে তিনবার পর্য্যন্তও ইহার আক্রমণ ঘটিতে পারে, কিন্তু তিনবারের অধিক আক্রান্ত হইতে কাহাকেও দেখা যায় নাই।

ডেঙ্গুর কারণ

ষ্টেগোমায়া-জাতীয় (stegomyia) মশার কামড়েই যে ডেঙ্গু-বীজ সংক্রামিত হয় তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ১৯০৩ সালে গ্রেহাম কয়েকটি ডেঙ্গুরোগীকে মশার দ্বারা দংশন করাইয়া পরে ঐ মশার দ্বারা কয়েকজন সুস্থব্যক্তিকে দংশন করাইয়াছিলেন,—তাহাদের সকলেরই ডেঙ্গু হইল। ১৯১৬ সালে ক্লেল্যাণ্ড ও ব্র্যাড্‌লি (Cleland and Bradley) ডেঙ্গু-সংক্রামিত দেশ হইতে মশা আনাইয়া অষ্ট্রেলিয়ার ডেঙ্গুশূন্য স্থানে কয়েকটি ব্যক্তিকে উহার দ্বারা দংশন করাইলেন,—তাহাদের অনেকের ডেঙ্গু হইল। ষ্টেগোমায়া ব্যতীত অন্য কোনো মশার দ্বারা এ পরীক্ষা সফল হইল না। এই প্রকারে নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা আরো জানা গিয়াছে যে :—(১) ডেঙ্গু-জ্বরের প্রথম তিন দিনই সংক্রামক, তিন দিন পরে রোগীকে মশা কামড়াইলে উহা সংক্রামিত হয় না। (২) মশা একবার সংক্রামিত হইলে শীঘ্র উহার সংক্রমণ নিঃশেষিত হয় না, যতদিন মশা জীবিত থাকে প্রায় ততদিনই উহা বহন করে। (৩) মশা সংক্রামিত হইবার পর আট দিন হইতে এগারো দিন পর্য্যন্ত গত না হইলে দংশন করা সত্বেও উহার দ্বারা রোগ জন্মিতে পারে না। (৪) যাহাদের একবার ডেঙ্গু হইয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জনের শরীরে উহা পুনরায় সংক্রামিত হইতে পারে না।

ডেঙ্গু-রোগের যে একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট বীজ (virus) আছে, এবং উহা যে মাইক্রোস্কোপের অগোচর (ultra-microscopic), ও উহা বীজাণু-ছাঁকুনির মধ্য দিয়াও গলিয়া যাইতে পারে (filter passing),—তাহাও প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ডেঙ্গু-রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া কিছুই পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ঐ রক্ত অতি সূক্ষ্ম ছাঁকুনির (Berkefeld filter) দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া Ashburn and Craig কয়েকটি সুস্থ ব্যক্তির শরীরে উহা ইন্‌জেকশন করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলেরই ডেঙ্গু হইয়াছিল।

লক্ষণাদি

জ্বর এবং অঙ্গপীড়াই ইহার প্রধান লক্ষণ। জ্বর একেবারে অকস্মাৎ উপস্থিত হয় এবং দেখিতে দেখিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ১০৩ বা ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্তও উঠিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ও চক্ষুতে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হইতে থাকে। ঐ সময় অনেকেরই মুখ হইতে গলা পর্য্যন্ত শরীরাংশটুকু রক্তিম হইয়া ওঠে এবং চক্ষুদুটিও রক্তবর্ণ হয়। জ্বরের সঙ্গে অল্প অল্প শীতও থাকে।

জ্বর আসার পরেই শরীরের সর্ব্ব অঙ্গে কামড়ানি ও পীড়া অনুভব হইতে থাকে, তন্মধ্যে কোমরের ব্যথাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক। সমস্ত শরীরে অথবা কোমরে কখনো কখনো এমন ব্যথা হয় যে রোগী যন্ত্রণায় কাঁদিতে থাকে। জ্বর যখনই বাড়ে তখনই এই ব্যথা বাড়ে, এবং জ্বর কমিলে ব্যথাও কমে।

কিন্তু সকল এপিডেমিকে বা সকলের পক্ষে এই ব্যথা সমান নয়। কাহারো কাহারো অতি অল্পই ব্যথা হয়, এবং কাহারো বা এমনও দেখা যায় যে ডেঙ্গু হইয়াছে অথচ গায়ে কিছু ব্যথা নাই। এই বৈচিত্র্যের কথা মনে রাখা উচিত।

ডেঙ্গুর জ্বরেরও নানারূপ বৈচিত্র্য আছে। দুই দফা জ্বর হওয়াই ইহাতে স্বাভাবিক। অর্থাৎ প্রথমে একদফা দুই-তিন দিন জ্বর ভোগ হইয়া উহা কমিয়া যায় অথবা ছাড়িয়া যায়। তখন শরীরের কষ্টও খুব কমিয়া যায় এবং মনে হয় যে এইবার বুঝি রোগ আরোগ্য হইল। কিন্তু চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে আবার নূতন করিয়া জ্বর বাড়িয়া ওঠে এবং একদিন বা দুইদিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয়দফা ভোগের পর উহা একেবারে ত্যাগ হয়। এই প্রকার দুইদফা জ্বরকে স্যাডল্-ব্যাক্ টাইপ্ (saddle-back type) জ্বর বলা হয়, কারণ টেম্পারেচারের চার্টে জ্বররেখা দুইবার উর্দ্ধে ঠেলিয়া ওঠে এবং মাঝে একবার নামিয়া যায়।

অনেকের উক্তরূপ জ্বর না হইয়া অবিচ্ছেদ জ্বর হয় (continued-fever type); তাহাদের উহা পাঁচদিন হইতে সাতদিন পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে লাগিয়া থাকে, পরে ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে উহা হঠাৎ একবার কিছু বাড়িয়া উঠিয়া (terminal rise) পরক্ষণেই ত্যাগ হইয়া যায়।

কিন্তু যাহাদের পূর্ব্বে একবার ডেঙ্গু হইয়া গিয়াছে তাহাদের পুনরায় উহার আক্রমণ হইলে প্রায়ই দেখা যায় যে দুই দিন বা একদিন মাত্র জ্বর ভোগ হইয়াই তাহা একেবারে ছাড়িয়া যায়। কাহারো বা জ্বর পূর্ণ একদিনও থাকে না, কয়েক ঘণ্টা মাত্র থাকিয়াই উহা ছাড়িয়া যায় (evanescent type)।

ডেঙ্গুতে কখনো কখনো একপ্রকার র‍্যাশ্ (rash) বাহির হইয়া থাকে। জ্বরের দ্বিতীয় বারের বৃদ্ধিতে, অর্থাৎ রোগভোগের চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে হাতে পায়ে ও বুকে একপ্রকার লাল লাল দাগ বাহির হয়, তাহা দেখিতে কতকটা হামের মত। হাতের চেটোতেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। জ্বর ছাড়িয়া গেলে এই র‍্যাশ্ শুকাইয়া গিয়া রীতিমত ছাল উঠিতে থাকে।

ডেঙ্গুর অন্যান্য কোনো লক্ষণ নাই। তবে কখনো কখনো ইহাতে বমনোদ্বেগ থাকে, এবং কখনো বা শুষ্ক কাসির লক্ষণও দেখা যায়। আরোগ্যের সময় কাহারো কাহারো উদরাময় হইয়া থাকে। অন্যান্য উপসর্গও ইহাতে দৈবাৎ আসিতে পারে, যথা—প্রস্রাবের দোষ, রক্তপাত, গ্রন্থিস্ফীতি প্রভৃতি,—তবে এ সকলের সম্ভাবনা খুবই কম।

ডেঙ্গুর নাড়ীর কিছু বৈচিত্র্য আছে। জ্বরের প্রথম দুইদিন নাড়ীর গতি দ্রুতই থাকে, কিন্তু তাহার পর উহা হঠাৎ মন্দীভূত হয়। তৎপরে জ্বর থাকিলেও নাড়ীর বেগ খুব কমিয়া যায় এবং জ্বর ছাড়িয়া গেলে আরো কমে। তখন গণনা করিলে দেখা যায় উহা প্রতি মিনিটে ৫০ কিংবা ৬০-এর অধিক হয় না। ইহা ডেঙ্গু রোগের এক বিশেষত্ব।

ডেঙ্গুতে রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যাও অনেক কমিয়া যায় (leukopenia),—এমন কি তাহা ৬,০০০-এর স্থলে ৪,০০০ বা ৩,০০০ পর্য্যন্তও হইতে পারে। এই সঙ্গে পলিনিউক্লিয়ার কণিকাগুলির সংখ্যা কমিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে মনোনিউক্লিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জ্বর ত্যাগ হইবার পর এই রোগে ইওসিনোফিলের সংখ্যা অনেক সময় বাড়িয়া যায় (eosinophilia)।

কি কি রোগের সহিত ইহার ভুল হইতে পারে

ম্যালেরিয়া—একবার জ্বর ছাড়িয়া দুই-একদিন পরে পুনরায় জ্বর হইতে দেখিলে ইহাকে ম্যালেরিয়া মনে করা খুব স্বাভাবিক। গায়ের ব্যথা প্রভৃতি

ম্যালেরিয়াতেও হইতে পারে। সেইজন্য দ্বিতীয় বারের জর ত্যাগের সঙ্গে অনেকে কুইনিনের ব্যবস্থা করেন, এবং তৎপরে আর জর আসিল না দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে ইহা ম্যালেরিয়াই হইয়াছিল। তথাপি ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর পার্থক্য চেনা বিশেষ কঠিন নয়। ম্যালেরিয়াতে কম্পজর ব্যতীতও যে-সকল বিশিষ্ট প্রকার লক্ষণ থাকে, ডেঙ্গুতে তাহা থাকে না। আর ডেঙ্গুতে যেমন নাড়ীর বেগ কমিয়া যায়, ম্যালেরিয়াতে তাহা হইতে পারে না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—ডেঙ্গুর সহিত কোনো সর্দ্দির লক্ষণ থাকে না, কিন্তু শুষ্ক কাসির লক্ষণ থাকিতে পারে এবং তখন উহাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা মনে হইতে পারে। কিন্তু ডেঙ্গুর জরের দুইবার আক্রমণের যে বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সাতদিনের মধ্যে উহা নিশ্চয় আরোগ্য হয়, তাহা হইতেই রোগটি চিনিতে পারা যায়।

এন্টেরিক্ বা টাইফয়েড—যাহাদের ছয় দিন পর্য্যন্ত জর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহাদের উহা টাইফয়েড বা প্যারাটাইফয়েড বলিয়া অনেক সময় সন্দেহ হয়। কিন্তু ডেঙ্গু হইলে উহা সাতদিনে নিশ্চয় ছাড়িয়া যাইবে, সেইজন্য সাতদিন পর্য্যন্ত না দেখিয়া কোনো মতামত ব্যক্ত করা উচিত নয়। এরূপ ঘটনা দেখা গিয়াছে যে ষষ্ঠ দিনে হঠাৎ জর কিছু বাড়িতে দেখিয়া চিকিৎসক বলিলেন উহা সম্ভবতঃ টাইফয়েড দাঁড়াইল, কিন্তু সপ্তম দিনে জরটি একেবারে ছাড়িয়া গেল।

রিউম্যাটিক্ ফিবার—এই রোগে নির্দ্দিষ্ট রূপে গাঁঠেই ব্যথা হয়, অন্যান্য অঙ্গে নয়,—এবং গাঁঠের উপর কিছু ফোলাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে জরও সাত দিনের অধিক লাগিয়া থাকিতে পারে।

হাম—ইহাতে যেমন সর্দ্দির লক্ষণ থাকে, ডেঙ্গুতে সেরূপ হয় না। ইহা অল্পবয়স্ক শিশুদের মধ্যেই অধিক হয়, কিন্তু ডেঙ্গু শিশুদের মধ্যে প্রায়ই হয় না।

বসন্ত—প্রথম অবস্থায় ডেঙ্গু হইতে ইহাকে পৃথক করা কঠিন, কিন্তু চতুর্থ দিনেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

চিকিৎসা

ডেঙ্গুর বিশেষ কোনো চিকিৎসা নাই, এবং ইহার চিকিৎসার তেমন আবশ্যকও হয় না, কারণ অল্প দিনে ইহা আপনিই আরোগ্য হয়। তবে

কষ্ট লাঘবের জন্য কিছু ঔষধ দেওয়া আবশ্যক। এই জন্য রোগের প্রথম অবস্থায় **আস্পিরিন্, গার্ডান্** (Gardan) প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহাতে উপস্থিত যন্ত্রণার কিছু লাঘব হয় এবং জরও কিছু নরম পড়ে। কিন্তু শেষের দিকে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়, তাহাতে হার্টের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইতে পারে। ডেঙ্গুতে কুইনিন না দেওয়াই ভাল, উহাতে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। রাত্রে ঘুম না হইলে কিছু ব্রোমাইড্ দেওয়া যায় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য মৃদু জোলাপ দেওয়া চলিতে পারে। কিন্তু ঔষধ ইহাতে যত কম দেওয়া হয় ততই ভাল। তরল পথ্য সকল প্রকারই ইহাতে দেওয়া যাইতে পারে।

সর্দ্দি-কাসির জ্বর ও নিউমোনিয়া

Catarrhal Fevers and Pneumonia

'সর্দ্দি' শব্দটি আমরা ফার্সীভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছি, ইহার অর্থ 'ঠাণ্ডা'। সংস্কৃত ভাষায় সর্দ্দিকে 'প্রতিশ্যায়' বলা হয়।

সর্দ্দি সার্ব্বভৌমিক ব্যাধি। ইহা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে মানুষকে আক্রমণ করে। সর্দ্দিকে আমরা "ঠাণ্ডা লাগা" বলি, এবং ইংরেজীতেও চলিত কথায় ইহাকে "common cold" বলে, কিন্তু বাস্তবিক কেবল মাত্র ঠাণ্ডা বাতাস বা শীত লাগা হইতে সর্দ্দি রোগ জন্মায় না। তাহা যদি হইত তবে দারুণ শীতল মেরু প্রদেশে কিংবা হিমালয়ের উপর যাহারা বাস করে, নিত্যই তাহাদের সর্দ্দি হইতে থাকিত। কিন্তু অনুসন্ধান লইলে জানা যাইবে যে ঐ সকল শীতপ্রধান দেশে যত সর্দ্দি কাসির পীড়া হয়, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে তাহা অপেক্ষা উহা কম তো নয়ই, বরং বেশী। শীতপ্রধান লণ্ডন ও গ্রীষ্মপ্রধান কলিকাতা, এই দুইটি সহরের মৃত্যুহারের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে লণ্ডনে যে-বৎসর নিউমোনিয়াতে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ৪·২, কলিকাতায় সে বৎসর উহার মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ১৬·০৩, অর্থাৎ লণ্ডনের প্রায় চার গুণ! বস্তুতঃ ভারতবর্ষে সর্দ্দি, কাসি, নিউমোনিয়া, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ এত বেশী যে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি কারয়া ট্রপিক্যাল স্কুলে ঐ সকল রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিবার জন্য এক স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইয়াছে।

নাক হইতে আরম্ভ করিয়া ফুস্‌ফুস্ পর্য্যন্ত শ্বাসযন্ত্র-প্রণালীর যে কোনো অংশে সর্দ্দির প্রদাহ উপস্থিত হইয়া জ্বর হইতে পারে। শ্লেষ্মাঘটিত জ্বর হওয়া আমাদের দেশে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। ম্যালেরিয়া যেমন এদেশের সাধারণ রোগ, সর্দ্দি-কাসির জ্বরও তেমনি সাধারণ রোগ, এ কথা অত্যুক্তি নয়। সেই জন্য জ্বরের রোগী মাত্রেই প্রথমে পেটে হাত দিয়া দেখিতে হয় প্লীহা আছে কি না, পরে ষ্টিথোস্কোপ বুকে দিয়া দেখিতে হয় সর্দ্দির চিহ্ন আছে কি না। আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ জ্বরের কারণ এই দুই পরীক্ষাতেই ধরা পড়িয়া যায়।

সর্দ্দির কারণ

কেবল ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয় না; তাহার এক সহজ প্রমাণ এই যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন দারুণ গরম পড়ে তখনও অনেকের সর্দ্দির আক্রমণ হইতে দেখা যায়, অথচ তখন হয়তো ঠাণ্ডা লাগিবার কোনোই সম্ভাবনা থাকে না।

আয়ুর্ব্বেদমতে প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দিকে ঋতুপীড়া বলে, অর্থাৎ ঋতুবিপর্য্যয় কালে শরীরস্থ বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মার বৃদ্ধি করে, তাহাতেই সর্দ্দি উৎপন্ন হয়; অপিচ নাসারন্ধ্রে ধূলি ও ধুম প্রবেশ করিলে এবং রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি অত্যাচার করিলে সর্দ্দি জন্মায়, আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে এই সকল কথা লিখিত আছে।

আর এখনকার বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে আমরা জানিয়াছি যে নাসিকাদি শ্বাস-যন্ত্রের ঝিল্লীগাত্রে বীজাণু কর্ত্তৃক যে প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহারই বিশিষ্ট লক্ষণ সর্দ্দি।

এই দুই প্রকার কথাই আংশিক ভাবে সত্য। কেবল সর্দ্দি কেন, একটি মাত্র কারণের দ্বারা কোনো রোগই জন্মায় না, প্রত্যেক রোগেরই কতকগুলি কারণ-পরম্পরা থাকে। সর্দ্দি সামান্য হইলেও তাহার বহুপ্রকার কারণ-পরম্পরা আছে।

মূলতঃ বীজাণুর দ্বারাই যে নাসিকা প্রভৃতির মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হইয়া সর্দ্দি জন্মায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-সকল বীজাণু সর্দ্দি সৃষ্টি করে, তাহারা যে কেবল সর্দ্দির সময়ই তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, এরূপ না হইতেও পারে। সুস্থ ব্যক্তিদের নাকের বা গলার রস লইয়া যদি কাল্‌চার করিয়া দেখা যায় তবে অধিকাংশ স্থলেই নানারূপ সর্দ্দি-বীজাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। অতএব তাহারা সর্ব্বদাই যদি মানুষের নাসিকাদির মধ্যে বাস করে, তবে সর্ব্বদাই তাহারা প্রদাহ জন্মায় না কেন? তাহার কারণ উহাদের ক্রিয়া সুযোগ-সাপেক্ষ, সুযোগ না পাইলে উহারা নিষ্ক্রিয় (commensal) অবস্থায় থাকে। যতক্ষণ বাহিরের পারিপার্শ্বিকের সহিত মানুষের স্বাস্থ্য আপন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে, ততক্ষণ উহাদের সে সুযোগ হয় না। কোনো কারণে এই সামঞ্জস্য বিপর্য্যস্ত হইলে তখনই বীজাণু-

সকল প্রদাহ জন্মাইবার সুবিধা পায়। যখনই দেহের প্রতিরোধ-শক্তি কিছু নিস্তেজ হয়, তখনই প্রদাহের সূত্রপাত হইতে পারে। এই শক্তির ব্যক্তিগত ইতরবিশেষ আছে; কাহারো বা উহা সহজে নষ্ট হয় না, সেইজন্য তাহাদের সহজে 'ঠাণ্ডা'ও লাগে না, সহজে সর্দ্দিও হয় না; আবার কাহারো বা উহা অল্পেই নষ্ট হয়, সেইজন্য তাহাদের পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি হইতে দেখা যায়। এইরূপ প্রকৃতিকে আমরা চলিত কথায় 'সর্দ্দির ধাত' (diathesis) বলি।

যাহাদের এইরূপ সর্দ্দির ধাত (diathesis) আছে, তাহারা ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় আবহাওয়ার উত্থান-পতনের সহিত স্বাস্থ্যের সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। শীতের প্রারম্ভে, বসন্তের প্রারম্ভে, গ্রীষ্মের এবং বর্ষার প্রারম্ভে যে অনেকের সর্দ্দি হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই। আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা শীতকালেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেইজন্য এই ঋতুতেই সর্দ্দির অধিক প্রাদুর্ভাব। এই সময় সর্ব্বদাই আমরা বন্ধ ঘরে থাকি, হঠাৎ এক-একবার বাহিরে আসি। এইরূপে গরমের মধ্য হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডায় আসিলে, বা ঠাণ্ডা ঘরের মধ্য হইতে হঠাৎ রৌদ্রে গিয়া উপস্থিত হইলে, অথবা হঠাৎ একদিন একটু বৃষ্টিতে ভিজিলেই সর্দ্দির সম্ভাবনা হয়। সর্ব্বপ্রকার আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে অভ্যাস করিলে ইহা হইতে কতক নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে।

আবহাওয়া বলিতে কেবল গরম বা ঠাণ্ডা হাওয়া বুঝায় না। হাওয়াতে বাষ্পের পরিমাণ (humidity) কত আছে, তাহার উপরেই উহা অধিক নির্ভর করে। যেখানে শীত অত্যন্ত অধিক অথচ বায়ু খুব শুষ্ক (যেমন সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে), সেখানে সহজে ঠাণ্ডা লাগে না। কিন্তু যেখানে শীত অল্প হইলেও বায়ু বাষ্পসিক্ত, সেখানে সহজেই ঠাণ্ডা লাগে।

সর্দ্দির ধাতও অনেক বিচিত্র প্রকার আছে। কেহ বা সর্দ্দি হইলে রীতিমত স্নানাদি করিতে থাকে, তাহাতেই উহা আরোগ্য হইয়া যায়। কাহারো বা সর্দ্দি হইলে অতিরিক্ত সাবধানে থাকা প্রয়োজন, একটু অসাবধান হইলে আর রক্ষা নাই; একটু অনিয়মেই উহাদের ব্রঙ্কাইটিস্ হয়, এমন কি নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হইতে পারে। কাহারো বা সর্দ্দি হইলেই একেবারে হাঁপানি রোগ উপস্থিত হয়। এ সমস্তই নাসিকাদি যাবতীয় শ্বাসযন্ত্রের ঝিল্লীর

অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। যাহার যেমন ঝিল্লীর অবস্থা সে তদনুসারে শীতোষ্ণ এবং ধূলা বালি ও বীজাণু প্রভৃতির সংস্পর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, এবং তখন তথাকার রক্তস্রোতে হঠাৎ বিপর্য্যয় (sudden change in the vascularity) ঘটিয়া সর্দ্দি প্রভৃতি রোগ জন্মায়।

অতএব বীজাণু সর্দ্দির মূল সৃষ্টিকারী হইলেও ক্ষেত্র তাহাদের ক্রিয়ার উপযোগী অবস্থায় না থাকিলে সর্দ্দি জন্মায় না। সেইজন্য কাহার কখন সর্দ্দি হইবে তাহা বলা যায় না। নানারূপ নৈমিত্তিক কারণের দ্বারা সহজ মানুষের শরীরও সময় বিশেষে অকস্মাৎ উহার উপযোগী হইয়া পড়ে।

কিছুকাল পূর্ব্বে অনেকেই বলিয়াছিলেন যে খাদ্যে ভাইটামিন 'এ'-র অভাবে সর্দ্দির ধাত জন্মায়। ভাইটামিন 'এ'-কে বলা হয় anti-infective vitamin, এবং সর্দ্দির ধাত বদলাইবার জন্য তাহা অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি জানা যাইতেছে যে সে ধারণা ভ্রান্ত, কারণ যাহারা ভাইটামিন 'এ' যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদেরও সর্দ্দি নিবারিত হয় না।

যাহা হউক ধাতের কথা বলিলেই সর্দ্দি সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইল না। সর্দ্দি রীতিমত ছোঁয়াচে রোগ, এবং অতি সহজে ইহা একজন হইতে পাঁচজনের মধ্যে সংক্রামিত হয়। যাহাদের পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি লাগিয়া থাকে তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিরও যে হঠাৎ সর্দ্দি হইতে দেখা যায়, উহা কেবল পরস্পর সংক্রমণের দ্বারাই হয়। ঠাণ্ডালাগা প্রভৃতি ঘটনা বীজাণু-ক্রিয়ার প্ররোচক মাত্র। পরের সর্দ্দির বীজাণু নাকের মধ্যে প্রবেশ করিলে সহজেই সর্দ্দি হয়। সর্দ্দিগ্রস্ত প্রতিবেশীর সংস্পর্শে আসিলে তাহার হাঁচি-কাসির দ্বারাই ঐ রোগ সংক্রামিত হয়। কেহ তিন ফুট দূর হইতে হাঁচিলে বা কাঁসিলেও তাহার বীজাণু বায়ুর মধ্য দিয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়া অপরের নাকে নিঃশ্বাসের সহিত প্রবেশ করিতে পারে। সেই জন্যই হাঁচি-কাসির সম্বন্ধে এত নিষেধ। ইহা কেবল বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের কথা নয়, অতি প্রাচীন যুগের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বাগ্ভটের গ্রন্থে স্পষ্টরূপে

নিষেধ আছে—"হস্তাদি দ্বারা মুখ আচ্ছাদন না করিয়া সভাতে বসিয়া কাসিবে না, হাঁচিবে না, হাসিবে না, উদ্গার তুলিবে না।" তাহার কারণ সভাতে মানুষ কাছাকাছি বসিয়া থাকে, এবং হাঁচি-কাসির দ্বারা একজনের রোগ অন্যের শরীরে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক কথা।

নিঃশ্বাসের ভিতর দিয়া যত প্রকার রোগ সংক্রামিত হয়, সভাস্থলই তাহার উপযুক্ত সংক্রমণ ক্ষেত্র। কিন্তু আজকাল সর্ব্বত্রই এইরূপ সভাস্থল। আফিসে, মেসে, হোটেলে, থিয়েটার-বায়স্কোপে, রেলে, স্কুলে, সর্ব্বত্রই মানুষ ঘন-সন্নিবদ্ধ হইয়া থাকে, সেই জন্য লোক-বহুল স্থানে এই সকল রোগের এত প্রাদুর্ভাব। সর্দ্দি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বাসযন্ত্রের যত প্রকার রোগ আছে তাহা এই জন্যই সহরে এত অধিক, এবং পল্লীগ্রামে তাহা অনেক কম। সহরের বদ্ধ বায়ুতে ধূলা ও ধোঁয়ার সহিত ঐ সকল রোগের বীজাণু নিত্য ভাসিয়া বেড়ায়।

অতএব সর্দ্দি প্রভৃতি রোগের দুইরূপ কারণ। প্রথম কারণ বীজাণু; দ্বিতীয় কারণ মানুষের ব্যক্তিগত রোগপ্রবণতা ও অক্ষমতা লইয়া পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ ভাবে বাস করিবার প্রথা।

সর্দ্দির বীজাণু

সর্দ্দি কাসির রোগে যে সকল বীজাণু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের নাম :—B. influenza, Micrococcus catarrhalis, Pneumococci, B pneumonia, Streptococcus, Staphylococcus ইত্যাদি। ইহার সবগুলিই যে সর্ব্বত্র দেখা যায় তাহা নয়, কিন্তু প্রায়ই একাধিক প্রকার বীজাণু একত্রে মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। অনেকে বলেন ইহারাই রোগের সৃষ্টি করে, আবার অনেকে বলেন এগুলি আনুষঙ্গিক মাত্র,—পশ্চাতে কোনো অদৃশ্য বীজ (filterable virus) আছে, এবং তাহাই সর্দ্দির প্রথম কারণ। ১৯১৪ সালে ক্রুজ (Kruse) ইহা প্রমাণ করিয়া দেখান যে সর্দ্দি-রোগীর নাক হইতে রস লইয়া তাহা উত্তমরূপে ফিল্টার পূর্ব্বক বীজাণুশূন্য করিয়া ও অতঃপর সুস্থব্যক্তির নাকের মধ্যে প্রয়োগ করিলে তাহার সর্দ্দি হয়।

আরো অনেক বৈজ্ঞানিক ইঁহার কথা পরীক্ষার দ্বারা সমর্থন করেন। কিন্তু পরে ওয়েবষ্টার (Webster) প্রমাণ করেন যে উপরিউক্ত দৃশ্য-বীজাণুসকল লইয়া সুস্থব্যক্তির নাকে প্রয়োগ করিলে তাহাতেও সর্দ্দি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোনো নির্দ্দিষ্ট বীজ বা বীজাণুর দ্বারা সর্দ্দি হয় না, কয়েক প্রকার বীজ-বীজাণু একত্রে মিলিয়া এই রোগ জন্মায়।

সর্দ্দিতে নাক ও গলার ভিতর এই সকল বীজাণু পাওয়া যায় :—

(১) ষ্ট্যাফিলোকক্কাই (গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে সজ্জিত)
(২) ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাই (সারি গাঁথিয়া সজ্জিত)
(৩) নিউমোকক্কাই (জোড়ে জোড়ে ক্যাপ্‌সুলের মধ্যে থাকে)
(৪) ডিপ্‌থীরয়েড্‌ ব্যাসিলাই (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিযুক্ত)
(৫) টেট্রাজেনাস্‌ বীজাণু (চারিটি করিয়া একত্রে)
(৬) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ব্যাসিলাই (ক্ষুদ্রাকৃতি)
(৭) নিউমো-ব্যাসিলাই (বৃহদাকৃতি)
(৮) মাইক্রোকক্কাস্‌ ক্যাটারেলিস্‌ (অতি ক্ষুদ্রাকারে কক্কাই)
(৯) ও (১০) দুইটি পুঁজ-কণিকা (Pus cells)

লক্ষণাদি

সর্দির আক্রমণ শ্বাসযন্ত্রের ঝিল্লীসমূহের যে কোনো প্রদেশে হইতে পারে। নাসিকার স্থানীয় প্রদাহকেই আমরা সাধারণতঃ সর্দি বলি। তদ্ব্যতীত শ্বাসযন্ত্রপ্রণালীর অন্যান্য অংশে প্রদাহ হইলে বিভিন্ন নামে তাহা ব্যক্ত করা হয় এবং তাহার লক্ষণাদিও বিভিন্ন হয়। পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল প্রদাহ ও তাহার লক্ষণাদি বিবৃত হইল :—

(১) **নাকের সর্দ্দি** (Nasal catarrh)—ইহাতে প্রথমে শুষ্ক প্রদাহ হয়, তাহার পর তরল সর্দি দেখা দেয়। সেইজন্য প্রথমে নাক ও টাক্‌রা অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়, এবং সেই সঙ্গে শরীর অসুস্থ হয়। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে অল্প অল্প শীত বোধ হইতে থাকে, হাত পা ও কোমর কামড়াইতে থাকে, চোখ জ্বালা করিতে থাকে, এবং গলার স্বর ভারী হইয়া আসে। কাহারো কাহারো অত্যধিক শিরঃপীড়া হয় এবং অল্প জ্বরও দেখা দেয়। এই সময় শরীরে অত্যন্ত গ্লানি অনুভব হয় ও নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। তৎপরেই চোখ মুখ ফুলিয়া ওঠে এবং নাক দিয়া ও চোখ দিয়া অনবরত জল ঝরিতে থাকে। তখন ঘন ঘন হাঁচি হয় এবং কাহারো কাহারো নাক মুছিতে মুছিতে নাকের প্রান্ত পর্য্যন্ত রক্তিমাভ হইয়া ওঠে। দুই তিন দিন পরেই উহা আরোগ্য হয়, অথবা সর্দ্দি গাঢ় হইয়া উহা অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে।

(২) **টন্‌সিলাইটিস্ ও কণ্ঠপ্রদাহ** (Tonsillitis and sore throat)—ইহাতে প্রথমে গলায় শুষ্কতা বোধ হয় এবং কাঁটা বেঁধার মত ব্যথা লাগে। এই সময় গলার ভিতর লক্ষ্য করিলে উহা লাল দগ্‌দগে দেখায়। কখনো কখনো একদিকের বা দুইদিকের টন্‌সিল্ ফুলিয়া ব্যথায় আড়ষ্ট হয় এবং কিছু গিলিতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। ইহাতে প্রায়ই জ্বর হয়, এবং শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কখনো কখনো টন্‌সিলের উপর ঘা (ulcerative sorethroat) হইয়া উহাতে খণ্ড খণ্ড পুঁজ জমে। গলদেশের গণ্ডসকল ইহাতে স্ফীত হয়, গলায় অত্যন্ত ব্যথা হয় এবং কঠিন খাদ্য গিলিয়া খাওয়া অসম্ভব হয়। ইহাতে শরীরের গ্লানিও যথেষ্ট

থাকে এবং জ্বরও হয়। টন্‌সিল সর্ব্বসমেত পাকিয়া উঠিলে তাহাকে quinsy বলা হয়।

(৩) **কর্ণপ্রদাহ** (Otitis media)—সর্দ্দি ও টন্‌সিলাইটিস্ হইতে অনেক সময় কর্ণপ্রদাহের সূত্রপাত হয়। ইহা শিশুদের মধ্যেই সচরাচর দেখা যায়। গলার ভিতর টন্‌সিলের কাছে দুইদিকে দুইটি সরু টিউবের মুখ আছে। এই টিউবের নাম ইউস্‌টেশিয়ান্ টিউব (Eustachian or auditory tubes), ইহা গলা হইতে কানের মধ্যকুহর (middle ear) পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া কানের ভিতর কিছু বায়ু প্রবেশ করে। গলার ভিতর প্রদাহ হইলে অনেক সময় ঐ টিউবের মুখ তাহাতে ফুলিয়া এবং বুজিয়া যায়; অনেক সময় বীজাণুর সংক্রমণও ঐ টিউবের মধ্য দিয়া কানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং কানের ভিতর পুঁজ জন্মায়। ইহাতে কানে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এবং তৎসঙ্গে জ্বরও প্রবল হয়।

(৪) **লেরিঞ্জাইটিস্** (Laryngitis)—স্বরযন্ত্রে প্রদাহ হইলে তাহাকে লেরিঞ্জাইটিস্ বলে। শুষ্ক কাসি ও স্বরভঙ্গ হওয়াই ইহার প্রধান লক্ষণ। একবার স্বরভঙ্গ হইলে উহা প্রায়ই অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকে।

(৫) **ব্রঙ্কাইটিস্** (Bronchitis)—ফুস্‌ফুসের শ্বাসনালীগুলির মধ্যে প্রদাহ হইয়া শ্লেষ্মা জন্মিলে উহাকে ব্রঙ্কাইটিস্ বলে। তথায় বায়ু অবাধে প্রবেশ করিতে না পারায় তন্মধ্যে কপোতধ্বনির ন্যায় শব্দ (rales and rhonchi) হইতে থাকে, ষ্টিথোস্কোপের সাহায্যে বুক পরীক্ষা করিলেই তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাতে রোগীর প্রত্যহ রীতিমত জ্বর হইতে থাকে, এবং আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সম্পূর্ণরূপে ছাড়ে না। উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে এই রোগ পুরাতন (chronic) ও কষ্টদায়ক হওয়ার সম্ভাবনা।

(৬) **ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া** (Broncho-pneumonia)—ব্রঙ্কাইটিসের সহিত মূল ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হইলে তাহাকে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া বলে। ইহা শিশুদের এবং বৃদ্ধদের মধ্যেই অধিক হয়। ষ্টিথোস্কোপে ব্রঙ্কাইটিসের শব্দ একপ্রকার, কিন্তু ইহার শব্দ কিছু অন্যপ্রকার শুনা যায়। বায়ুকোষের মধ্যে বায়ুর আদান প্রদানের বিঘ্ন হওয়ায় শ্বাস লইবার সময় উহার মধ্যে স্থানে স্থানে একরূপ চিট্ চিট্ শব্দ

(crepetations) হইতে থাকে। তদ্ব্যতীত বায়ুকোষগুলি সর্ব্বত্র ফাঁপা না থাকায় বুকের উপর ঠুকিয়া দেখিলে (by percussion) কয়েক স্থানে উহা নিরেট (patches of consolidation) বলিয়া অনুমিত হয়। এই অবস্থায় জ্বর ব্রঙ্কাইটিস্ অপেক্ষা কিছু অধিক হয়, এবং অন্যান্য গ্লানিও অধিক হয়।

(৭) **নিউমোনিয়া** (Pneumonia)—এই রোগে মূল ফুস্‌ফুসের একটি বা একাধিক নির্দ্দিষ্ট অংশবিশেষে প্রদাহ ঘটে। কিন্তু ইহা কেবল ফুস্‌ফুস্ আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, ইহার বিষ এবং বীজাণু রক্তের মধ্যে গিয়াও প্রবেশ করে। সর্দ্দি হইতে নিউমোনিয়ার ক্রমশঃ উৎপত্তি প্রায় দেখা যায় না। নিউমোনিয়া হইলে উহা একেবারেই প্রথম হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির সংক্রামক ব্যাধি। যেখানে নিউমোনিয়ার এপিডেমিক হয় সেখানে উপর্য্যুপরি অনেক লোককে কেবল ইহাতেই আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং সর্দ্দি প্রভৃতি রোগের সহিত ইহাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেখা উচিত নয়। কিন্তু যে নিউমোকক্কাই (Pneumococci) কর্ত্তৃক নিউমোনিয়ার সৃষ্টি হয়, সেই নিউমোকক্কাই কর্ত্তৃক সময়ান্তরে সর্দ্দি, টন্‌সিলাইটিস্, কর্ণপ্রদাহ, এবং অন্যান্য বহুপ্রকার রোগ হইয়া থাকে। অতএব নিউমোকক্কাই দ্বারা যখন রক্তদুষ্টি (septicæmia) জন্মায় এবং সেই সঙ্গে বিশিষ্টরূপে ফুস্‌ফুসেও প্রদাহ ঘটিয়া থাকে, তখনই তাহা নিউমোনিয়া। রক্তদুষ্টির জন্যই এই রোগ মারাত্মক, ফুস্‌ফুসের প্রদাহটুকু উহার স্থানীয় অভিব্যক্তি মাত্র। নিউমোকক্কাই এক রকমের নয়; উহার চারিটি টাইপ্ আছে (types I, II, III and IV)। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন টাইপের বীজাণুর প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়। নিউমোকক্কাই ব্যতীত অন্য বীজাণুর দ্বারাও নিউমোনিয়া হইতে পারে,—যেমন ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাই, প্লেগ-বীজাণু, ইত্যাদি! ঐ সকল বীজাণুর সংক্রমণপ্রসূত নিউমোনিয়া হইলে তাহাকে 'সেপ্‌টিক্ নিউমোনিয়া' বলে।

নিউমোনিয়াতে প্রবল জ্বর হয় এবং সন্নিপাত বা বিকারের লক্ষণও যথেষ্ট থাকে। এই জ্বর অবিচ্ছিন্ন ভাবে ৯ দিন বা ১১ দিন বা ১৫ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে, তাহার পর একদিন হঠাৎ একেবারে (by crisis) ত্যাগ হইয়া যায়। ঐ জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে একদিকের বা দুইদিকের ফুস্‌ফুসের অংশবিশেষ

অপেক্ষাকৃত নিরেট (consolidated) হইয়া থাকে, অর্থাৎ তন্মধ্যস্থ বায়ুকোষগুলি প্রদাহজনিত রসে পরিপূর্ণ হওয়াতে তথায় রীতিমত বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য ষ্টিথোস্কোপ দিয়া শুনিলে তথায় বায়ু প্রবেশের শব্দের পরিবর্ত্তে একরূপ চিট্ চিট্ আওয়াজ (crepetations) শুনা যায়, এবং পাঁজরের উপর ঠুকিয়া দেখিলে অন্যান্য অংশের তুলনায় ঐ নির্দ্দিষ্ট অংশটি হইতে ফাঁপা আওয়াজের (resonance) পরিবর্ত্তে নিরেট বস্তুর ন্যায় ঠক্ ঠক্ শব্দ (dullness) উত্থিত হইতে থাকে। তবে সকল নিউমোনিয়াতে এরূপ বিশিষ্ট লক্ষণসকল স্পষ্টরূপে নাও থাকিতে পারে। নিউমোনিয়াকেও মেয়াদী রোগ (self limited disease) বলা যায়, কারণ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইয়া গেলে আপনিই ইহা আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহাতে রক্তদুষ্টির জন্য প্রায়ই হার্ট আক্রান্ত হয় (cardiac dilatation and pericarditis), এবং তজ্জন্য হার্টফেল হইয়াই অধিকাংশ রোগীর মৃত্যু ঘটে। এই রোগে রক্তের শ্বেত-কণিকার সংখ্যা প্রায়ই ২০ হাজারের অধিক হইয়া থাকে, এবং শ্বেত-কণিকার সংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া এই রোগের ভবিষ্যৎ ফলাফলও অনেকটা নির্দ্ধারণ করা যায়। নিউমোনিয়া হওয়া সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে শ্বেতকণিকার সংখ্যা ১০,০০০-এর অধিক হয় নাই, তবে বুঝিতে হয় যে রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন। এ-রোগে শ্বেত-কণিকার যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু ৬০,০০০-এর মধ্যেই তাহা থাকা বাঞ্ছনীয়; যদি উহা ৬০,০০০-এর সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তবে তাহাতেও রোগীর মৃত্যু একপ্রকার সুনিশ্চিত।

চিকিৎসা

সর্দ্দি—সর্দ্দির সম্ভাবনা হইবামাত্র যদি প্রতিকারের চেষ্টা করা হয় তবে অনেক সময় উহাকে অঙ্কুরে বিনাশ করিতে পারা যায়। এ জন্য নানারূপ প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আমরা উহার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি। **টিঞ্চার আইওডিন** (বা লাইকার আইওডিন) সর্দ্দির এক উত্তম ঔষধ। খ্যাতনামা জার্ম্মান সার্জ্জন বিয়ার (Bier) একটি প্রবন্ধে

লিখিয়াছিলেন যে যতবারই তাঁহার সর্দ্দি হইবার উপক্রম হইয়াছে ততবারই তিনি টিঞ্চার আইওডিন খাইয়া উহা নিবৃত্ত করিয়াছেন। এক ফোঁটা মাত্র টিঞ্চার আইওডিন্ এক আউন্স ডিস্টিল্ড্ জলে দিয়া দুই-তিন ঘণ্টা অন্তর পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে থাকিলে শীঘ্রই সর্দ্দি নিবৃত্ত হয়। অনেকের মতে (Martindale) সর্দ্দি রোগের ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

পূর্ব্বকালের চিকিৎসকগণ বলিতেন যে সর্দ্দি হইলেই গরম জলে উত্তমরূপে স্নান কর অথবা ফুট্‌বাথ (foot bath) লও, এবং ১০ গ্রেন **ডোভার্স পাউডার** খাইয়া শয্যাগ্রহণ কর। আজকাল অনেকে ইহা সমর্থন করেন না।

সর্দ্দি হইলে এখন অনেকে **আস্‌পিরিন** ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে তৎক্ষণাৎ কিছু সাময়িক উপকার হয়, এবং শরীরের কষ্টের লাঘব হয়। কেহ কেহ ইহার সহিত অল্প মাত্রায় **ফেনাল্‌জিন্** (Phenalgin), **নোভাল্‌জিন্** (Novalgin) প্রভৃতি ব্যবহার করিতে বলেন ; তাহাতেও অনেক কষ্টলাঘব করে। কেহ কেহ এগুলির পরিবর্ত্তে **টিঞ্চার কুইনিন অ্যামোনিয়া** ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং কেহ বা **কুইনিন স্যালিসিলেট** খাইতে দেন। এই সকল ঔষধের দ্বারাও সাময়িক উপকার যথেষ্ট হয়।

সর্দ্দির প্রাথমিক চিকিৎসার আর এক ব্যবস্থা আছে। সূত্রপাতেই যদি পূর্ণমাত্রায় (৩০ গ্রেন করিয়া) **ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট** উপর্য্যুপরি দুই তিনবার খাওয়া যায় তবে একদিনেই নূতন সর্দ্দি আরোগ্য হইতে পারে। কাহারো কাহারো ইহাতে আশ্চর্য্য উপকার হইতে দেখা যায়। ছোট শিশুদের সর্দ্দিতেও ইহা খুব উপকার করে। **টিঞ্চার বেলেডোনা** ১ ফোঁটা, ও **ক্যাল্‌সিয়াম ল্যাক্‌টেট্** ৫ গ্রেন,—একত্রে কিছু ডিস্টিল্ড্ জলের সহিত মিকশ্চার করিয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলে ছেলেদের সর্দ্দি-জরও শীঘ্র আরোগ্য হয়, এবং সূত্রপাতে প্রয়োগ করিলে ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। নিউমোনিয়াতেও প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অনেকে সর্দ্দিতে **ইউক্যালিপটাস্ অয়েল** ব্যবহার করিতে বলেন। কেহ কেহ উহা ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় চিনির সহিত মিলাইয়া খাইতে উপদেশ

দেন। কেহ কেহ Vapex প্রভৃতি রুমালে দিয়া আঘ্রাণ করিতে বলেন। কেহ কেহ নাকের ভিতর Mistol প্রয়োগ করিতে বলেন।

নাক দিয়া অনবরত জল ঝরার এক ঔষধ **ফেরিয়ার্স নস্য** (Ferrier's snuff)। এই নস্য নিম্নলিখিত ঔষধগুলি মিলাইয়া প্রস্তুত করিতে হয় :— বিস্‌মাথ সাব্‌নাইট্রেট্ ৬ ড্রাম, গাম্ অ্যাকেশিয়া ২ ড্রাম, মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোর্ ২ গ্রেন, ও কোকেন হাইড্রোক্লোর্ ২ গ্রেন।

যাহাদের নিত্য নিত্য সর্দ্দি হয় তাহাদের প্রত্যহ **নাক ধোলাইয়ের** (nasal wash) অভ্যাস করা অতি উত্তম। নাক ধুইবার জন্য কয়েক প্রকার ডুশ্ (nasal douche) পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবহার করা উচিত। কোনো প্রকার মৃদু অ্যান্টিসেপ্‌টিক লোশন দিয়া (Hexyl-resorcinol অথবা Electrolytic chlorine জলের সহিত মিশাইয়া) নাক ধৌত করিতে হয়। অভাবপক্ষে লবণ-জল (saline) দিয়াও নাক ধুইতে পারা যায়। প্রত্যহ নাক ধুইলে বীজাণু বিনষ্ট হয় এবং সহজে প্রদাহ জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বকালে অনেকে এই জন্য নাক দিয়া জল টানিয়া পান করার অভ্যাস রাখিতেন।

আর এক প্রকার উত্তম ব্যবস্থা নাকের মধ্যে ঔষধের **স্প্রে** (spray) দেওয়া। নাকের ও গলার ভিতর স্প্রে দিবার যে যন্ত্র, উহার নাম অ্যাটোমাইজার (atomizer)। যাহাদের বার বার সর্দ্দি হওয়ার ধাত, তাহাদের এইরূপ একটি অ্যাটোমাইজার রাখা উচিত এবং সর্দ্দির উপক্রম হইলেই তাহার ব্যবহার করা উচিত। ঐ অ্যাটোমাইজারের মধ্যে ক্লোরেটোন্ ইন্‌হেল্যান্ট (Chloretone inhalant), অথবা মিষ্টল (Mistol), বা তদনুরূপ কোনো তৈলাক্ত অ্যান্টিসেপটিক ঔষধ ভরিয়া তাহাতে রবারের পাম্প্ লাগাইয়া নাকের এবং গলার মধ্যে স্প্রে দিলে কষ্টেরও নিবৃত্তি হয় এবং বীজাণুও বিনষ্ট হয়। যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীতও নাকে এক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে,—তাহার নাম **গ্লেগ্‌স্ মিকশ্চার** (Glegg's mixture)। ইহার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন :—

মেন্থল— ১ গ্রেন
সাদা ভ্যাসেলিন্—২ ড্রাম
প্যারাফিন্ তৈল—৬ ড্রাম

তিনটি একত্রে মিশাইয়া তুলির সাহায্যে বা আঙুল দিয়া প্রত্যহ

রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে নাকে লাগাইলে উহাতে কতক পরিমাণে স্প্রে দিবার মতই কাজ হয়। সরিষার তৈল প্রয়োগ করাও মন্দ ব্যবস্থা নয়।

সর্দ্দিজ্বরের জন্য যে কোনো ঔষধই ব্যবহার করা হউক, তৎপূর্ব্বে প্রথমে একবার জোলাপ দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। তাহাতে প্রদাহের অনেক নিবৃত্তি হয়।

কিন্তু সর্দ্দি-রোগে লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা ব্যতীত উহার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রতিষেধমূলক চিকিৎসা **মিক্স্‌ড্‌ ক্যাটারাল্‌ ভ্যাক্সিন** (mixed Catarrhal vaccine) ইন্‌জেকশন দেওয়া। সর্দ্দি হইবামাত্রই যদি এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা যায় তবে উহা আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে না, এবং উহা হইতে অন্য কোনো দীর্ঘস্থায়ী রোগও জন্মিতে পারে না। একটি ইন্‌জেকশনে আরোগ্য না হইলে দুই একদিন অন্তরে আরো একটি বা দুইটি ইন্‌জেকশন দিলেই উহা নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়। যাহাদের সর্দ্দি অধিকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, অথবা যাহাদের পুনঃ পুনঃ সর্দ্দির সহিত জ্বর দেখা দেয়, কিংবা যাহাদের সর্দ্দি হইলেই ব্রঙ্কাইটিস্‌ বা হাঁপানি প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা,—তাহাদের সর্দ্দির সূত্রপাত মাত্রেই কয়েক মাত্রা ভ্যাক্সিন লওয়া উচিত, তাহা হইলে আর অধিক ভুগিবার ভয় থাকে না। কিন্তু একবার কয়েকটি ইন্‌জেকশন লইলে আর যে কখনও সর্দ্দি হইবে না, এরূপ মনে করা উচিত নয়। ইহাতে উপস্থিত রোগটি আরোগ্য হইলেও উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দূর হয় না। অতএব পুনরায় সর্দ্দি প্রভৃতির আক্রমণ হইলে পুনরায় ভ্যাক্সিন্‌ লওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কোনো অনিষ্ট নাই। সর্দ্দি রোগের ইমিউনিটি (immunity) ভ্যাক্সিনের দ্বারা জন্মাইয়া দিলেও উহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সেই জন্যই অনেকের বহুবার ভ্যাক্সিন ইন্‌জেকশন লইবার প্রয়োজন হইতে পারে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্দ্দিরোগে ভ্যাক্সিন চিকিৎসার যথেষ্ট প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে এখনও ইহার তেমন বহুল প্রচলন হয় নাই। অনেক চিকিৎসক এখনও ইহা প্রয়োগ করিতে নানা রকম আশঙ্কা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে কোনোরূপ বিপত্তির আশঙ্কা নাই। আমাদের দেশে ইহার রীতিমত প্রচলন হওয়া উচিত। ইহার একটি বা দুইটি ইন্‌জেকশনেই সর্দ্দি

ও ব্রঙ্কাইটিস্‌ প্রভৃতি অতি সহজে আরোগ্য করিতে পারা যায়। ইহার প্রথম মাত্রা অতি সামান্য, ষ্ট্রেপ্‌টো প্রভৃতি কয়েক প্রকার বীজাণুর সংখ্যা ১ মিলিয়ন হিসাবে (বা ষ্টক্‌-ভ্যাক্সিনের দুইফোঁটা মাত্র) দিলেই যথেষ্ট। বাজারে যে সর্দ্দির ভ্যাক্সিন বিক্রীত হয় তাহাতেই সাধারণতঃ উত্তম কাজ হয়। তবে বাজারের সাধারণ ক্যাটারাল্‌ ভ্যাক্সিনে (Catarrahal vaccine) যে সকল পুরাতন রোগীর তেমন উপকার হয় না, তাহাদের অটোভ্যাক্সিন প্রস্তুত করাইয়া দিলে অধিক উপকার হয়। ভ্যাক্সিনের দ্বারা সর্দ্দিরোগের চিকিৎসা যে অতি উত্তম হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাসি—সর্দ্দি এবং কাঁসি (throat cough) কিছু দিনের পুরাতন হইয়া গেলে তখন উহা তরল করিবার ঔষধ দেওয়াই উত্তম। সর্দ্দি পুরাতন হইলে, অর্থাৎ বসিয়া গেলে বা পাকিয়া গেলে একরূপ কষ্ট হয়; ইহাতে মাথা কট্‌ কট্‌ করিতে থাকে, নাকের ভিতর টন্‌ টন্‌ করে, মনে হয় সর্দ্দি কোথাও আবদ্ধ হইয়া আছে। কাসি পুরাতন হইলেও এইরূপ কষ্ট হয়, ক্রমাগত নিষ্ফল কাসি হইতে থাকে, অথচ বহু চেষ্টাতেও কফ নির্গত হয় না। এই সঙ্গে অল্প অল্প জ্বরও হইতে পারে। অনেকে এইরূপ পুরাতন সর্দ্দিকাসির জন্য অল্পমাত্রায় **পটাস্‌ আইওডাইড্‌** (Pot. Iodide) ব্যবহার করেন। কিন্তু **শুদ্ধ আইওডিন্‌** গলার শুষ্ক কাসির পক্ষে আরো উত্তম। উহা দিতে হইলে নিম্নলিখিতমত একটি মিকশ্চার প্রস্তুত করিতে হয়:—

আইওডিন্‌ (Pure Iodine)—	১ গ্রেন
অ্যাল্‌কোহল্‌ অ্যাব্‌সোলিউট্‌—	১১০ ফোঁটা
স্পিরিট ক্লোরোফরম্‌—	১১০ ফোঁটা
গ্লিসিরিন—	১১০ ফোঁটা

এই মিকশ্চার হইতে ৩০ ফোঁটা করিয়া মাত্রা অল্প দুধের মধ্যে মিলাইয়া প্রত্যহ তিনবার হিসাবে খাইতে দিলে পাকা ও বসা-সর্দ্দি এবং শুষ্ক কাসি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

সর্দ্দিকাসির আর একটি উত্তম ঔষধ **ক্রিয়োজোট** (Creosote)। ছেলেদের পক্ষে ইহা বড়ই উপকারী। যাহাদের সর্দ্দিরোগ অনেক দিন যাবৎ

লাগিয়া থাকে, এবং নাকঝরা বা শ্লেষ্মার দোষ কিছুতে সারিতে চায় না, তাহাদের নিম্নলিখিতরূপ মিকশ্চার দিলে শীঘ্রই উহা আরোগ্য হয়ঃ—

ক্রিয়োজোট—	২ ফোঁটা
ক্যাম্ফর—	২ গ্রেন
ক্যাল্‌সিয়াম্ ল্যাক্‌টেট—	১০ গ্রেন
সিরাপ টোলু—	৪ ড্রাম

ইহা পূর্ণবয়স্কের মাত্রা, দৈনিক তিনবার করিয়া অল্প জল মিশাইয়া ইহা খাইতে হয়। নিউমোকক্কাই প্রভৃতি বীজাণুর বিরুদ্ধে ক্রিয়োজোটের ক্রিয়া অতি উত্তম। পুরাতন সর্দ্দিকাসিতে ইহার দ্বারা আশু উপকার হয়। নিউমোনিয়ার শেষের দিকে অনেকে ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যক্ষ্মা রোগেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে।

টন্‌সিলাইটিস্—কণ্ঠপ্রদাহ হইলে অনেকে গলার ভিতর লাগাইবার জন্য গ্লিসিরিনের সহিত ট্যানিক্ অ্যাসিড বা আইওডিন মিলাইয়া থ্রোট্-পেণ্ট (throat paint) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু নূতন প্রদাহের অবস্থায় উহা না দেওয়াই ভাল; তৎপরিবর্ত্তে লিষ্টারিন্ বা হেক্সিল্-রিসর্সিনল জলের সহিত মিলাইয়া, অথবা সাধারণ লবণ-জলের দ্বারা কুল্লি (gargle) করাইলে ভাল হয়। টন্‌সিলাইটিস্ হইলে সাধারণতঃ **সোডা স্যালিসিলেটের** (Soda Salicylas) মিকশ্চার দেওয়া উচিত। **টিঞ্চার অ্যাকোনাইট** (১ ফোঁটা বা ২ ফোঁটা মাত্রায়) টন্‌সিলাইটিসের একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ছেলেদের টন্‌সিলাইটিসের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ক্যালসিয়াম ও টিঞ্চার বেলেডোনার মিকশ্চার অতি উত্তম। বলা বাহুল্য এই সকল ঔষধ দিবার পূর্ব্বে একটি জোলাপ দেওয়া উচিত।

ছেলেদের টন্‌সিলের উপর কোনো প্রকার ঘা দেখিলে বা ছাল পড়ার মত (membranous) দেখিলে তৎক্ষণাৎ উহা পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করা উচিত, কারণ উহাদের ডিফ্‌থীরিয়া হইবার খুবই সম্ভাবনা। যদি পরীক্ষার উপায় না থাকে এবং ছালটি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে, তবে কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটি ৮০০০-ইউনিট্ মাত্রার **ডিফ্‌থীরিয়া সিরাম** (Anti-diphtheretic serum 8,000 units) ইন্‌জেকশন দেওয়া

উচিত। যদি উহা ডিফ্‌থীরিয়া নাও হয়, তথাপি কোনো ক্ষতি নাই, বরং উহাতে কিছু উপকারই হইবে। টন্‌সিলে ছালপড়ার মত কোনো লক্ষণ দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা কিছুতেই উচিত নয়।

কর্ণপ্রদাহ—কানে পুঁজ হইলে উহার উত্তম ঔষধ **কার্ব্বলিক গ্লিসিরিন** (Gutta Glycerine-carbolic)। উহাতে গ্লিসিরিনের সহিত খুব অল্প মাত্রায় কার্ব্বলিক দিতে হয়,—এক আউন্সে ২ গ্রেন পরিমাণ। অ্যাক্রিফ্লেভিন্ এবং মার্কিউরোক্রোম্-ও কানের পুঁজের উত্তম ঔষধ, খুব অল্প মাত্রায় (১ আউন্সে ১ গ্রেন) উহা অর্দ্ধেক স্পিরিট ও অর্দ্ধেক জলের সহিত মিশাইয়া কানের মধ্যে দিতে হয়। কানের ঔষধ কিছু গরম করিয়া প্রয়োগ করাই ভাল। কানের যন্ত্রণার উপস্থিত নিবৃত্তির জন্য **ভেরামন্** (Veramon), **কম্প্রাল্** (Compral) প্রভৃতি বেদনা-নিবারক ঔষধ খাইতে দেওয়াও প্রয়োজন, উহাতে উপস্থিত যন্ত্রণার উপশম হয়। ইহা ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী কর্ণপ্রদাহ আরোগ্য করিবার পক্ষে উত্তম চিকিৎসা **ভ্যাক্সিন** (Catarrhal vaccine) প্রয়োগ করা।

কানে পুঁজ না হইয়াও অনেকের সর্দ্দি-কাসির সহিত হঠাৎ কান কট্‌কট্ করিতে থাকে এবং কানের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে। বিশেষতঃ শিশুদের সর্দ্দিতে ইহা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। সর্দ্দিতে ইউস্‌টেশিয়ান্ টিউবের মুখ ফুলিয়া বা বুজিয়া যাওয়াতে এইরূপ যন্ত্রণার উদয় হয়। ইহার উত্তম চিকিৎসা লবণ-জলের কুল্লি করিয়া গলার ভিতর অনবরত ধৌত (gargling) করিতে থাকা। তাহাতে গলার ভিতরকার শ্লেষ্মা তরল হইয়া টিউবের মুখ খুলিয়া যায় এবং শীঘ্রই কানের যন্ত্রণার লাঘব হয়। উপস্থিত যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য কানে সেঁক দেওয়াও উত্তম।

ব্রঙ্কাইটিস্—ব্রঙ্কাইটিস্ হইলে অ্যাল্‌কালাইন্ কফনিঃসারক (expectorant) ঔষধ দেওয়া আবশ্যক। এজন্য **অ্যামোনিয়া কার্বনেট** (Ammon. carb.) অতি উত্তম ঔষধ। তদ্ব্যতীত **ভাইনাম্ ইপিকাক্**, উত্তম কফনিঃসারক, এবং **সেনেগাও** (Tincture কিংবা Infusion Senega) উপকারী। এই সকল ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন দেওয়া যাইতে পারেঃ—

অ্যামোনিয়া কার্ব (Ammon. carb.)— ৪ গ্রেন
পটাস্ বাইকার্ব (Pot. bicarb.)— ১৫ গ্রেন
ভাইনাম্ ইপিকাক্ (Vin. Ipecac)— ৫ ফোঁটা
বাসক সিরাপ (Syrup Vasak)— ১ ড্রাম
ইনফিউশান সেনেগা (Inf. Senega)—১ আউন্স
তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

ব্রঙ্কাইটিসের ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন। প্রয়োজন হইলে ইহার সহিত টিঞ্চার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড্ (Tinct. Cinchona Co.) ৩০ ফোঁটা মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে।

ব্রঙ্কাইটিস্ পুরাতন হইয়া গেলে এই মিকশ্চারের সহিত প্রতি মাত্রায় ২৷৩ গ্রেন করিয়া **পটাস্ আইওডাইড্** (Pot. Iodide) দেওয়া আবশ্যক। আইওডাইড্ প্রয়োগ সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা দরকার। কেবল পুরাতন অবস্থায় ছাড়া তরুণ সর্দ্দি-কাসিতে বা নূতন ব্রঙ্কাইটিসে ইহা কখনই দেওয়া উচিত নয়, দিলে রোগ বাড়িয়া যাইতে পারে। অতএব আইওডাইড্ দিবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া জানিয়া লওয়া উচিত যে রোগটি পুরাতন কি নূতন। যেখানে আরোগ্যের বিলম্ব হইতেছে সেখানেই ইহার প্রয়োগ আবশ্যক।

ব্রঙ্কাইটিসে **বুকে মালিশের** ব্যবস্থাও অতি উত্তম, উহাতে সর্দ্দি সরল হয়। যে-কোনো মালিশ এজন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ **ভ্যাক্সিনের** (Catarrhal vaccine) দ্বারা সত্বর আরোগ্য হয়, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

নিউমোনিয়া—এই রোগে প্রথম হইতে পূর্ণ মাত্রায় **অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চার** ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু কফনিঃসারক (expectorant) কোনো ঔষধ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই। তাহার কারণ ইহাতে ফুস্‌ফুসের অংশবিশেষের বায়ুকোষগুলির (alveoli) মধ্যেই প্রদাহ হইয়া রস (exudates) জমিয়াছে, কিন্তু উহার শ্বাসনালীর (bronchi) মধ্যে কোনোই প্রদাহ নাই, সুতরাং এস্থলে শ্বাসনালীগুলির মধ্যে রসক্ষরণ করাইয়া কোনোই লাভ নাই। ইহাতে কেবল রোগের বিষ নষ্ট করিবার জন্য প্রচুর

অ্যাল্‌কালাইন ঔষধ (অ্যাসিটেট্, সাইট্রেট্ বা বাইকার্বনেট দৈনিক সর্ব্বসমেত দুই-তিন ড্রাম পরিমাণ) দেওয়া প্রয়োজন; তৎসহ হার্টের উপকারের জন্য ডিজিটেলিস্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্থানীয় প্রদাহ নিবৃত্তির জন্য অনেকে ইহাতে **অ্যাণ্টিফ্লোজিস্‌টিন্** (Antiphlogistine) অথবা উহার অনুরূপ অন্যান্য নামের কেওলিনের প্রলেপ (Cataplasma kaolin) পুল্‌টিশের মত গরম করিয়া বুকে লাগাইয়া দেন। ইহাও উত্তম ব্যবস্থা, ইহাতে প্রদাহও কিছু কমে এবং জ্বরও কমে।

কিন্তু এই রোগে কেবল লক্ষণনিবৃত্তিমূলক ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয় না। যেহেতু ইহা বিশিষ্ট বীজাণুর সংক্রমণ হইতে সৃষ্ট, সেই হেতু উহার বিরুদ্ধে বিশিষ্ট চিকিৎসারও আবশ্যক। আজকাল নিউমোনিয়াতে **ভ্যাক্সিন চিকিৎসার** উপকারিতা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন এবং সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে ইহার এই প্রকার চিকিৎসা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে। নিউমোনিয়ার ভ্যাক্সিন কেবলমাত্র নিউমোকক্কাই হইতে প্রস্তুত হয় না, উহার সহিত ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্-ভ্যাক্সিন এবং কখনো কখনো ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ব্যাসিলাস্-ভ্যাক্সিনও মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এই রোগে ভ্যাক্সিন-চিকিৎসার সাফল্য সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অনেকেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। প্রফেসার ওয়াইন্ (W. H. Wynn, Birmingham University) কয়েক বৎসর যাবৎ এই চিকিৎসার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিকেল জর্ণালে (B M. J., January 1936) অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন রোগের প্রথম অবস্থাতেই যদি প্রত্যহ এক মাত্রা করিয়া তিনদিন উপর্য্যুপরি ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা যায়, তবে অনেক সময় উহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট (aborted) হয়, এবং অনেকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জ্বর ছাড়িয়া যায়। যে স্থলে তাহা না হয় সে স্থলে উহা অন্ততঃ প্রবল হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু রোগের তৃতীয় দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেলে তখন আর এই ভ্যাক্সিনে তেমন ফল হয় না। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ১৮০টি রোগীকে তৃতীয় দিনের মধ্যে ভ্যাক্সিন দেওয়াতে তন্মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৫টি হইল,—কিন্তু অপর ১৪০টি রোগীকে তৃতীয় দিনের পর ভ্যাক্সিন দেওয়াতে তন্মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ২০টি হইল। ওয়াইন বলেন প্রথম তিন

দিনের মধ্যে ভ্যাক্সিন দেওয়ায় কোনো আশঙ্কা নাই, কারণ তখন উহার দ্বারা কেবল non-specific immunity জন্মায়, সুতরাং কোনো রিঅ্যাকৃশন হয় না।

আমাদের দেশে এখনও এরূপ ভ্যাক্সিন চিকিৎসার প্রচলন হয় নাই,—তবে আজকাল **ইমিউনোজেনের** (Pneumococcus Immunogen) খুব প্রচলন হইয়াছে। প্রথম অবস্থা হইতে প্রয়োগ করিলে ইহার দ্বারাও খুব উপকার হইতে দেখা যায়। এই ইন্‌জেকশনের মাত্রা কেবল ২ ফোঁটা করিয়া। শীঘ্র জ্বর ত্যাগ না হইলে ইহা কয়েক দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ঐ মাত্রাতেই ইন্‌জেকশন দেওয়া উচিত। শিশুদের নিউমোনিয়াতেও ইহা বিশেষ উপকারী। এতদ্ব্যতীত রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে **সিরাম** (Felton's anti-pneumococcic serum) প্রভৃতিও স্থানবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নিউমোনিয়াতে প্রচুর **গ্লুকোজ** খাইতে দেওয়া উচিত। এই রোগে শীঘ্রই হার্ট আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা, এবং হার্টকে রক্ষা করিতে পারিলে ইহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপনিই আরোগ্য হইতে পারে। সেইজন্য ইহাতে প্রথম হইতেই হার্ট সতেজ রাখিবার ষ্টিমুল্যাণ্ট ঔষধসকল (diffusible stimulants) প্রয়োগ করা আবশ্যক, এবং হার্টে কিছুমাত্র দুর্ব্বলতার চিহ্ন প্রকাশ পাইতে দেখিলে ঐ সকল বলকারক ঔষধের পরিমাণ ও সংখ্যা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বাড়াইতে থাকা আবশ্যক। অধিকন্তু ইহাতে প্রচুর কার্ব্বোহাইড্রেট পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকে বলেন রোগের বিষের (toxin) আধিক্য যেমন হার্ট আক্রান্ত হইবার কারণ, রক্তের অম্লাংশ বৃদ্ধি (acidosis) হওয়াও তাহার অন্যতম কারণ। অতএব একদিকে যথেষ্ট ক্ষারীয় ঔষধ (alkalies), এবং অন্যদিকে পথ্য হিসাবে গ্লুকোজ বা মিছরির সরবৎ প্রভৃতি কার্ব্বোহাইড্রেট দিবার ব্যবস্থা করিলে অনেক সময় দুইই নিবারিত হইতে পারে।

নিউমোনিয়াতে রক্তের লবণাংশ কমিয়া যায়,—এ জন্য পথ্য ও ঔষধের সহিত কিছু কিছু **লবণ** (Sodium Chloride) খাইতে দিবার ব্যবস্থা করা উত্তম। রোগের শেষের দিকে শ্লেষ্মা গাঢ় হইয়া চাপিয়া বসিয়া

থাকিলে কেবল তখনই উহাকে সরল করিবার জন্য **অ্যামোনিয়া ক্লোরাইড্‌** (Ammon Chloride) প্রভৃতি প্রয়োগ করা উচিত।

রোগীকে সর্ব্বদা মুক্ত বায়ুতে রাখা উচিত। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে দরজা জানলা বন্ধ রাখা বা রোগীর গায়ে অনাবশ্যক কাপড়-জামা জড়ানো অত্যন্ত অন্যায়। এই রোগে **অক্সিজেনের** ব্যবহার করা খুব ভাল। প্রথম হইতে মধ্যে মধ্যে অক্সিজেন দিতে থাকিলে খুব উপকার হয়। নিঃশ্বাসের গতি দ্রুত (মিনিটে ৫০-এর উপর) হইতে থাকিলে নিশ্চয় অক্সিজেন দিতে হইবে।

নিউমোনিয়াতে পথ্যের বিশেষ কোনো নিষেধ নাই, বরং যথেষ্ট পরিমাণে সুপথ্য দেওয়াই ইহাতে প্রয়োজন। ইহাতে মাংসের শুরুয়া প্রভৃতিও দেওয়া যাইতে পারে, এবং জ্বর ত্যাগ হইলেই অন্নপথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা
Influenza

সাধারণ সর্দ্দি-কাসিযুক্ত জ্বরকে আমরা প্রায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া মনে করি, কিন্তু সর্দ্দিরোগের সহিত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার অনেক পার্থক্য। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্দ্দির লক্ষণ লইয়াই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা উপস্থিত হয়, তথাপি ইহা যে এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির বিষাক্ত এবং সংক্রামক রোগ, তাহা ইহার আচরণ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সর্দ্দির আক্রমণ সাধারণতঃ ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়েই হইতে দেখা যায়, কিন্তু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার কোনো নির্দ্দিষ্ট ঋতু নাই, একবার কোথাও আরম্ভ হইলে ইহা অতি দ্রুতবেগে সংক্রামিত হইয়া ঘরে ঘরে আক্রমণ করে এবং শীঘ্রই এক দেশ হইতে অন্যদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এবং ডেঙ্গুকে এক-জাতীয় রোগ বলিয়াও ভুল করেন, কিন্তু তাহাও ঠিক নয়; ডেঙ্গু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাধি। ডেঙ্গুতে কাহারো মৃত্যু হয় না, কিন্তু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে মৃত্যুসংখ্যা অসংখ্য।

'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা' ইটালীয় কথা। ইহার ইংরেজী অর্থ influence বা influence of heavens, অর্থাৎ দেবতার প্রকোপ। ১৭৪৩ সালে ইহা ইটালীতে একবার অতি প্রবলরূপে দেখা দিয়াছিল, সেই সময় হইতে উহা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া অভিহিত হয়। ফরাসীরা ইহাকে বলে la grippe। ইংরেজরা চলিত কথায় বলে 'ফ্লু'।

ইতিপূর্ব্বে অন্য কোনো এপিডেমিক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মত বিশ্বব্যাপী হইতে দেখা যায় নাই। ইহাকে এপিডেমিক না বলিয়া প্যান্‌ডেমিক (pandemic) ব্যাধি বলা হয়, কারণ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ইহার বিস্তৃতি।

১৯১৮ সালের পৃথিবীব্যাপী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার কথা সকলেই জানেন। প্রথমে আমেরিকাতে আরম্ভ হইয়া ইহা ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া

পড়ে,—কেবল মাত্র সেণ্ট্‌ হেলেনার ক্ষুদ্র দ্বীপটি ছাড়া পৃথিবীর কোনো স্থান ইহার কবল হইতে রক্ষা পায় না। আঠারো মাস যাবৎ ঐ এপিডেমিকের আধিপত্য থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই আঠারো মাসের মধ্যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় দুই কোটি লোক মরিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্যান্‌ডেমিক দেখা দেয়,—এবং পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে যত লোক নিহত হয়, ঐ আঠারো মাসের মহামারীতে তদপেক্ষা অনেক বেশী লোকের মৃত্যু হয়।

কেবল এই একবার মাত্র নয়, পৃথিবীতে এই রোগের এপিডেমিক বহুবার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বোধ হয় ১৯১৮ সালের পূর্ব্বে ইহার এরূপ প্রবাল্য হইতে দেখা যায় নাই। ঐ বৎসর জুন মাসে প্রথমে বিলাত হইতে বোম্বাইয়ে এই রোগের আমদানি হয়। তৎপরেই ইহা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সেই অবধি ইহা ভারতবর্ষে স্থায়ীরূপে রহিয়া গিয়াছে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার বীজ

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-ব্যাসিলাস্ নামক একপ্রকার বীজাণু প্রথমে ফাইফার (Pfeiffer) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এই বীজাণু অতিশয় বিষাক্ত এবং ইহারা রক্তনাশী বীজাণু-গোষ্ঠির (hæmophilic group) অন্তর্গত। কিন্তু এই বীজাণুই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মূল হেতু কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হইলেও অনেক স্থলে এই বীজাণু পাওয়া যায় না; অপর-পক্ষে সাধারণ সর্দ্দিতে এবং নিউমোনিয়াতেও কখনো কখনো ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সকল কারণে অনেকে বলেন ইহা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের সহকারী (secondary) বীজাণু মাত্র, কিন্তু উহার মূল কারণ অন্য কোনোরূপ অদৃশ্য ভাইরাস্ (filterable virus)। তদ্ব্যতীত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ব্যাসিলাস্-ই একক দেখা যায় না, উহার সহিত অনেক সময় ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্, ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্, মাইক্রোকক্কাস্ ক্যাটারেলিস্, এবং নিউমোকক্কাস্ প্রভৃতিও আনুষঙ্গিকরূপে দেখা যায়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে মৃত ব্যক্তির রক্তে অনেক সময় বিষাক্ত ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ও

(Streptococcus hæmolytic) পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই সকল সহকারী বীজাণুর দ্বারাই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগটি অধিক মারাত্মক হইয়া পড়ে। তথাপি এইগুলি ব্যতীত ইনফ্লুয়েঞ্জার যে আরো কোনো প্রকার অদৃশ্য বীজ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা যে একপ্রকার অদৃশ্য বীজের (filterable virus) দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন রিভিয়ারে (Riviere)। ইনফ্লুয়েঞ্জা-রোগীর রক্ত উত্তমরূপ বীজাণু-ফিল্টারে ছাঁকিয়া লইয়া বীজাণুশূন্য করিয়া নিজের শরীরে তিনি তাহার ইন্‌জেকশন লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

এখন প্রায় সকলেই বলেন যে ঐ অদৃশ্য বীজ বায়ুর সহিত মিশিয়া আমাদের নাকে আসিয়া প্রবেশ করে, তাহাতেই এই রোগ এমন দ্রুতবেগে সংক্রামিত হয়। অতঃপর অন্যান্য আনুষঙ্গিক বীজাণু উহার সহিত যোগ দেয় এবং রোগটিকে নানারূপে জটিল করে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ যে কেবল বায়ুতে ভাসিয়া আসিয়া নাকে প্রবেশ করে তাহা নয়, এমন কি চিঠির ভিতর দিয়াও ইহার সংক্রমণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষণাদি

ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি যে উহা সর্দ্দিকাসির লক্ষণযুক্ত আকস্মিক জ্বর এবং তৎসহ বিশিষ্টরূপে সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা ও শিরঃপীড়া, আর কোনো কোনো স্থলে উহার উপসর্গ রূপে ব্রঙ্কাইটিস্ ও ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, কিংবা পেটের দোষ, কিংবা মস্তিষ্কবিকার। তবে ইহাতে প্রথমে সর্দ্দি হইয়া পরে জ্বর হয় না। প্রথমেই অকস্মাৎ কিছু শীত করিয়া জ্বর আসে, অত্যন্ত শিরঃপীড়া হয়, কোমরে ব্যথা অনুভব হয়, চোখের মধ্যে যন্ত্রণাবোধ হইতে থাকে, এবং কাহারো কাহারো বমি হয়; সর্দ্দির লক্ষণ কিছু বিলম্বে দেখা যায়। কোনো কোনো স্থলে ইহাতে সর্দ্দির লক্ষণ নাও থাকিতে পারে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কতকগুলি বৈচিত্র্য আছে। ইহাতে শরীরের নানাস্থানের আভ্যন্তরিক ঝিল্লীগাত্রে প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম শিরাগুলিতে রক্ত জমে (capillary congestion)। কিন্তু বিশেষ বিশেষ এপিডেমিকে এই প্রকার প্রদাহ শরীরের কোনো একটি বিশেষ অংশ লইয়াই নূতন এবং বিচিত্র রূপে অভিব্যক্ত হয়। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনো বৎসর বা ইহাতে সকলেরই কেবল সর্দ্দি ও হাঁচি হইতে থাকে, কোনো বারে বা তাহা না হইয়া কেবল গলার মধ্যেই নানারূপ পীড়া উপস্থিত হয়, কখনো বা স্বরযন্ত্রের (larynx) মধ্যে আক্রমণ হওয়াতে সকলেরই অনবরত শুষ্ক উচ্চকাসি হইতে থাকে, কখনো বা চোখের মধ্যে প্রদাহ হইয়া অধিকাংশ ব্যক্তির চোখ-ওঠার (conjunctivitis) লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই প্রকার স্থানীয় প্রদাহ হইতেই এই রোগে কাসির সঙ্গে এক-একবার রক্তের ছিট্ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কখনো কখনো নাক দিয়াও রক্ত পড়িতে দেখা যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বরের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে উত্তাপ যথেষ্ট থাকিলেও রোগীর গায়ের চামড়া প্রায় শুষ্ক থাকে না, ক্ষণে ক্ষণে ঘাম দিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে মনে হয় এইবার বুঝি জ্বর কমিবে, কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায় যে ঘাম কমিয়া গিয়াছে এবং উত্তাপ যেমন ছিল তেমনই আছে। বারে বারে ঘাম হইতে থাকা এই রোগের এক বিচিত্র লক্ষণ। তদ্ব্যতীত জ্বরের তাপ যত থাকে নাড়ীর বেগ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না, উহা স্বভাবতঃই কিছু মন্দগতি হয়।

ইহাতে রক্তের চাপ (blood pressure) কিছু কমিয়া যায়, এবং শ্বেতকণিকার সংখ্যাও স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু কমিতে দেখা যায় (leukopenia); এমন কি ইহার সহিত ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার উপসর্গ উপস্থিত হইলেও শ্বেতকণিকার সংখ্যা ১০,০০০-এর অধিক উঠিতে বড় দেখা যায় না।

ইনফ্লুয়েঞ্জার আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা হার্টকে প্রথম হইতেই অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণেও হার্টফেল হইয়া মরা বিচিত্র নয়। কেহ কেহ বলেন ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষের (toxin) জন্যই

হার্ট এরূপ দুর্ব্বল হয়, আবার কেহ কেহ বলেন যে অ্যাড্রেনাল-গ্রন্থির (suprarenal glands) ক্রিয়া হঠাৎ হ্রাস পাওয়াতেই এই অবস্থা ঘটে।

সকল ইনফ্লুয়েঞ্জা সমান নয়। অধিকাংশ সময়ে ইহা সামান্যের উপর দিয়াই আরোগ্য হইয়া যায়; তখন মনে হয় এ ব্যাধি কিছুই ভয়ের নয়। কিন্তু কাহার কখন যে ইহা সামান্য হইতে হঠাৎ মারাত্মক হইয়া উঠিবে তাহার কোনোই স্থিরতা নাই।

এপিডেমিকের সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা চিনিতে পারা খুবই সহজ, কিন্তু তদ্ভিন্ন সময় বিশেষে ইহা চিনিতে পারা অত্যন্ত কঠিন। তাহার কারণ, এই রোগের কোনো নির্দ্দিষ্ট স্বরূপ নাই, বিচিত্র প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহা উপস্থিত হয়। এমন কোনো ল্যাবরেটরি-পরীক্ষাও নাই যাহার দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে রোগটি নিশ্চয় ইনফ্লুয়েঞ্জা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা এক প্রকার নয়, এপিডেমিক অনুযায়ী ইহার পাঁচ রকম 'টাইপ্' দেখিতে পাওয়া যায়। যথাক্রমে তাহা উল্লিখিত হইল :—

(১) **সর্দ্দি-প্রধান** (Catarrhal type)—ইহাতে জ্বরের সঙ্গে স্পষ্ট সর্দ্দি হয়, নাক মুখ জ্বালা করিতে থাকে, নাক দিয়া জল ঝরে, এবং চোখ লাল হইয়া ওঠে। গলার ভিতরকার ঝিল্লী এবং টন্‌সিল্‌গুলিও ফুলিয়া রক্তবর্ণ হয়। কখনো বা এই সর্দ্দি নাকে ও গলায় সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, কখনো বা উহা বুক পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

(২) **জ্বর-প্রধান** (Febrile type)—ইহাতে কেবল জ্বরেরই প্রাধান্য। লক্ষণের মধ্যে জিভ ময়লা, অক্ষুধা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে; ক্ষণে ক্ষণে এক প্রকার শুষ্ক কাসি হইতে থাকে, কিন্তু কিছুই কফ নির্গত হয় না, এবং গলায় বা বুকে শ্লেষ্মার চিহ্ন পাওয়া যায় না। জ্বরের সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হয়, কিন্তু উহা কোনো গাঁঠে নয়। রোগী নিতান্ত অসুস্থ বোধ করে, অনবরত ছট্‌ফট্ করে ও অনিদ্রায় কষ্ট পায়। ইহাতে এক-একবার খুব ঘাম হয়, আবার তখনই শীত বোধ হয়। রক্তপরীক্ষায় দেখা যায় শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়ে নাই, বরং কম। তিন দিন ভোগের পর এই জ্বর সাধারণতঃ কমিয়া আসে, কিন্তু কখনো কখনো দুই সপ্তাহ পর্য্যন্তও একাদিক্রমে লাগিয়া থাকে। জ্বর ছাড়িবার পর রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এমন কি তখন

নড়িতেও কষ্ট বোধ হয়। আরোগ্য হইয়া গেলেও শরীরে তেজ থাকে না, মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না, মুখে রুচি থাকে না, এবং সামান্য জ্বর হইলেও উহার জের মিটিতে বহুদিন পর্য্যন্ত সময় লাগে।

(৩) **ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া-প্রধান** (Broncho-pneumonic type)—এই প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রায়ই মারাত্মক। জ্বরের সঙ্গে খুকখুকে কাসি, বুকে শ্বাসরোধের মত লক্ষণ, ও নিঃশ্বাসের কষ্ট হইতে থাকা ইহাতে অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহাতে কাসির সঙ্গে ফেনার মত অল্প শ্লেষ্মা ওঠে এবং অনেক সময় তাহাতে রক্তের ছিট্ দেখা যায়। বুকে ষ্টিথোস্কোপ দিয়া শুনিলে স্থানে স্থানে ঘড়্ ঘড়্ ও সাঁই সাঁই শব্দ (rales and rhonchi) শোনা যাইতে পারে। নিউমোনিয়ার মত লক্ষণও ইহাতে পাওয়া যায়, তবে উহা আসল নিউমোনিয়ার মত কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নয়, দুই দিকের ফুস্‌ফুসেই স্থানে স্থানে নিউমোনিয়ার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। রোগী প্রলাপ বকে এবং মুখের ও নখের বর্ণ নীলাভ (cyanosis) হয়। রোগ কঠিন হইলে রোগীর মুখ হইতে প্রায়ই একরূপ মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়।

(৪) **উদরাময়-প্রধান** (Gastro-intestinal type)—এই প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা সচরাচর হয় না। ইহাতে জ্বরের সঙ্গে অতিরিক্ত উদরাময় ও বমি হইতে থাকে। কখনো কখনো ইহা কলেরার মতও লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।

(৫) **বিকার-প্রধান** (Cerebral type)—এই প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জাতে মস্তিষ্ক হঠাৎ আক্রান্ত হইতে পারে, এবং ইহাতে জ্বরের আবির্ভাব তৎপূর্ব্বে নাও থাকিতে পারে। ইহাতে রোগীর অকস্মাৎ অতিশয় শিরঃপীড়া হইতে থাকে, তৎপরে ফিটের মত খিঁচুনি ও আক্ষেপ আরম্ভ হয়, এবং অনতিবিলম্বে কোনো বিশেষ অঙ্গ অবশ হইয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কাহারো কাহারো এরূপ হইবার পূর্ব্বে কয়েকবার বমি হয়, এবং প্রলাপের লক্ষণও দেখা যায়। কখনো বা ইহার সূত্রপাতে মুখমণ্ডলে পক্ষাঘাতের চিহ্নও (facial paralysis) দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিকে প্রায়ই মেনিঞ্জাইটিস্ বলিয়া ভ্রম হয়। এই প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা অধিকাংশই মারাত্মক, কিন্তু কখনো কখনো ইহা আরোগ্যও হইয়া থাকে।

উপসর্গ (Complications)

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রধান উপসর্গ **ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া।** অসাবধান হইলে ইহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতে অনেক সময় **ব্রঙ্কাইটিসের** (post-influenzal bronchitis) উদ্রেকও হইয়া থাকে, এবং কখনো কখনো **হাঁপানির** (asthma) সূত্রপাত হইতেও দেখা গিয়াছে। এই রোগ হইতে **প্লুরিসিরও** (pleurisy) সূত্রপাত হইতে পারে।

কর্ণ প্রদাহ (otitis media) ইহার আর একটি সাধারণ উপসর্গ।

এই রোগে **কিড্‌নিও** (kidneys) আক্রান্ত হইতে পারে, এবং প্রস্রাবের সহিত অ্যালবুমেন, কাষ্ট (casts), এবং রক্তও কখনো কখনো দেখা যায়।

কিন্তু ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় **হার্ট**; বিশেষতঃ যদি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-রোগীকে চলাফেরা করিতে দেওয়া হয় তবে অধিকাংশ স্থলেই হার্টে নানারূপ দোষ জন্মাইতে পারে। ইহাতে হার্ট আয়তনে বাড়িয়া (dilated) যায়, সেই জন্য রোগীর শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে, নাড়ীর গতি অনিয়মিত হয়, এবং মুখের বর্ণ নীলাভ হয়। এই অবস্থার সংশোধন হইতে অনেক সময় লাগে। রোগ অধিক বিষাক্ত হইলে হার্টের ভিতরে ও বাহিরে রীতিমত প্রদাহের (pericarditis and endocarditis) সৃষ্টি হয়। এইগুলি অতি মারাত্মক উপসর্গ।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে **চর্ম্মেও** কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। ইহাতে কখনো কখনো সর্ব্বাঙ্গে হামের মত লাল লাল দাগ (petechial rashes) উঠিতে দেখা যায়। কখনো কখনো 'জর ঠুঁটো' (herpes) হইতেও দেখা যায়।

মস্তিকে এবং স্নায়ুতেও নানাপ্রকার বিকৃতি ঘটিতে পারে। কিছু কিছু মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও প্রলাপ ইহাতে অনেক সময় দেখা যায়। স্নায়ু বিকৃত হওয়াতে কোনো কোনো অঙ্গে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হইতেও (neuralgia) প্রায় দেখা গিয়া থাকে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পরিণাম (Sequelæ)

অন্যান্য ব্যাধি আরোগ্য হইবার পর রোগীর শরীর সাধারণতঃ শীঘ্রই সুস্থ হইয়া ওঠে, কিন্তু একবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইলে তৎপরে বহুদিন পর্য্যন্ত অসুস্থ করিয়া রাখে। সামান্য আক্রমণ হইলেও উহাতে শরীর এমন দুর্ব্বল করিয়া ফেলে যে তাহা কাটিয়া উঠিতে প্রায় একমাস সময় লাগিয়া যায়। কিছু প্রবল ভাবের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইলে, শরীরের মাংসপেশী এবং স্নায়ুসমূহ তাহাতে একেবারে নির্ব্বীর্য্য (debilitated) হইয়া পড়ে। অনেকে বলেন অ্যাড্রেনাল্-গ্রন্থি (suprarenals) বিকল হওয়াতেই এই সকল দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখা দেয়।

ইহাতে হার্ট যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনেকের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পর হার্টের স্থায়ী রোগ জন্মিতে দেখা গিয়াছে।

ইহা হইতে অনেকের হাঁপানি এবং যক্ষ্মারোগ জন্মিতেও দেখা গিয়াছে, এবং অনেকের স্নায়ুদৌর্ব্বল্য (neurasthenia) ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইতেও দেখা গিয়াছে। এমন কি কাহারো কাহারো ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পর উন্মাদ রোগেরও সূত্রপাত হইয়াছে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইবার পর শরীরে যে প্রতিরোধশক্তি জন্মায় তাহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং একবার এই রোগ হইলে আর হইবে না এমন কথা বলা চলে না। বরং যাহাকে এই রোগে ধরে তাহার **পুনঃপুনঃ** উহার আক্রমণ হইতে দেখা যায় এবং সহজে তাহা আরোগ্য হইতে চায় না। সেই জন্য এইরূপ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার নাম দেওয়া হয় lingering influenza।

চিকিৎসা

এই রোগের সূত্রপাত হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ শয্যাগ্রহণ করা, এবং যতদিন না উহা আরোগ্য হয় ততদিন পর্য্যন্ত একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া থাকা। এ সম্বন্ধে একজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"We are always being asked how to

cure a cold. An old practitioner of my childhood used to say, 'Yes, I can tell you how to cure a cold, but you won't do it.' And when urged,—'Go to bed for three days,'—was the answer." (Clendening)

শরীরকে বিশ্রাম দিলে ভিতরকার শক্তিসকল নির্ব্বিরোধে আপন ক্রিয়া করিবার অবকাশ পায়, তাহাতে আরোগ্য হইবার পক্ষে অনেক সাহায্য করা হয়। যাহাদের রোগ সামান্য তাহারা এ কথা গ্রাহ্য করিতে চায় না, কিন্তু অধিকাংশ ইনফ্লুয়েঞ্জাই যে উপযুক্ত বিশ্রাম না দেওয়াতে সামান্য হইতে হঠাৎ মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাও বিশেষরূপে দেখা গিয়াছে যে যাহারা রোগের প্রথম হইতেই শয্যাগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম, প্রায় নাই বলিলেই চলে। সেইজন্য এই রোগে চিকিৎসকের প্রথম কর্ত্তব্য রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে আদেশ করা। এ বিষয়ে অবহেলা করিলে সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জাতেও হার্ট বিকল হইয়া যাইতে পারে। প্রথম দিন হইতে বিশ্রাম লইলে হার্টেরও কোনো ক্ষতি হইতে পারে না এবং ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া প্রভৃতি উপসর্গও সহজে জন্মিতে পারে না।

চিকিৎসার প্রথমে একবার জোলাপ দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে শরীরের অনেক গ্লানি দূর হয়। রাত্রে একমাত্রা ক্যালোমেল দিয়া পরদিন প্রাতে সিড্‌লিজ্ পাউডার (Seidlitz powder) দিলে রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়।

অতঃপর সর্দ্দিতে যে সকল চিকিৎসার প্রয়োগ করা হয়, ইহার প্রথম অবস্থায় তাহাই করা যাইতে পারে। কেহ কেহ ইহাতে **আস্‌পিরিন, গার্ডান্** (Gardan) প্রভৃতি ঔষধসকল ব্যবহার করিয়া থাকেন,—কেহ বা আস্‌পিরিন, কুইনিন স্যালিসিলেট্, ফেনালজিন্ প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ (প্রত্যেকটি ২ গ্রেন মাত্রায়) একত্রে মিলাইয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে উপস্থিত কষ্টের কিছু লাঘব হয় বটে, কিন্তু এই সকল ঔষধ কেবল প্রথম দুই-একদিনই দেওয়া যায়, তৎপরে এগুলি দেওয়া উচিত নয়, কারণ ইহাতে হার্টকে দুর্ব্বল করিতে পারে। দুর্ব্বলকারক

কোনো ঔষধই ইহাতে দেওয়া উচিত নয়। অনেকে **ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট্** খাইতে দেন, তাহা মন্দ ব্যবস্থা নয়। কেহ কেহ **টিঞ্চার কুইনিন অ্যামোনিয়া** ১ ড্রাম মাত্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেন। কেহ কেহ ব্রাণ্ডির সহিত অল্প মাত্রায় কুইনিন খাইতে বলেন।

বাজারে যে **ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্** কিনিতে পাওয়া যায় তাহাও সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য। ইউরোপীয়দের অনেককে এক প্রকার ট্যাবলেট ব্যবহার করিতে দেখা যায় তাহার নাম **ব্রোমোকুইনিন্** (Bromoquinine); ইহা অল্প সময়ান্তর ৩।৪টি খাইয়া ফেলিলে বেশ উপকার হয়। অল্পমাত্রায় কুইনিন সর্দ্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জার পক্ষে উত্তম।

ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের কয়েকটি প্রেস্‌ক্রপ্‌শন নিম্নে লিখিত হইল :—

১।	টিঞ্চার কুইনিন অ্যামোনিয়া—	৩০ ফোঁটা
	স্পিরিট অ্যামন অ্যারোম্যাটিক্—	১৫ ফোঁটা
	স্পিরিট ক্লোরোফরম্—	১০ ফোঁটা
	সোডা স্যালিসিলেট্—	১০ গ্রেন
	জল—	১ আউন্স

তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য

২।	সোডা স্যালিসিলেট্—	১০ গ্রেন
	সোডা সাইট্রেট্—	১৫ গ্রেন
	সোডা বেঞ্জোয়েট্—	১০ গ্রেন
	ইউরোট্রোপিন্—	৭।০ গ্রেন
	সিরাপ—	১ ড্রাম
	জল—	১ আউন্স

তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য

৩।	ইউক্যালিপ্‌টাস অয়েল—	২ ফোঁটা
	সিনামন্ অয়েল—	২ ফোঁটা
	স্পিরিট অ্যামন্ অ্যারোমেটিক্—	১৫ ফোঁটা
	স্পিরিট ক্লোরোফরম্—	১০ ফোঁটা
	মিউসিলেজ্ ও জল—	১ আউন্স

এই রোগে নাক ও গলার ভিতর প্রত্যহ গ্লাইকোথাইমোলিন্ প্রভৃতি ঔষধের লোশন দ্বারা কয়েকবার করিয়া ধোলাই করিবার ব্যবস্থা করা অতি উত্তম। তাহাতে স্থানীয় প্রদাহের শীঘ্র উপশম হয় এবং রোগটি অধিক অগ্রসর হইতে পারে না।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে অনেক রোগী শুষ্ক কাসির জন্য বড় কষ্ট পায়, তাহা নিবারণ করার উত্তম ব্যবস্থা **টিঞ্চার বেঞ্জোইন কম্পাউণ্ডের** (Tinct. Benzoine Co.) ভাপ লওয়া। এক পাইন্ট্ ফুটন্ত জলে এক ড্রাম পরিমাণ টিঞ্চার বেঞ্জোইন ঢালিয়া দিয়া তাহার বাষ্প গলার মধ্যে গ্রহণ করিতে থাকিলে অনেক সময় কাসির কষ্ট দূর হয়। এইরূপ ভাপ গ্রহণের ব্যবস্থা করা কিছুই কঠিন নয়।

ঔষধাক্ত জলের বাষ্প বা ভাপ্‌রা লইবার (steam inhalation) এই সহজ উপায়। ইহার জন্য একরূপ কেট্‌লিও (bronchitis kettle) পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার অভাবে একটি সঙ্কীর্ণমুখ সাধারণ জলপাত্রে ফুটন্ত জলের মধ্যে কিছু টিঞ্চার বেঞ্জোইন কম্পাউণ্ড (Tinct. Benzoine Co.) দিয়া উহার মুখ ঢাকিয়া,

তন্মধ্যে একটি নল প্রবেশ করাইয়া তাহার সাহায্যে তামাকুসেবনের মত গলার ভিতর বাষ্প টানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই রোগে কখনো কখনো একপ্রকার অবিরাম কাসি হইতে থাকে, এবং সহজে তাহা নিবারণ করা যায় না। তখন কোডীন্ (Codiene) বা মর্ফিন্-ঘটিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয়। কাসি নিবারণের একটি উত্তম ঔষধ সিরাপ কোডীন্ (প্রতি মাত্রায় ১ ড্রাম)। তদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি পেটেণ্ট ঔষধ আছে যাহা কাসি প্রশমন করিবার পক্ষে উপকারী। এস্থলে কতকগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে :—অ্যালোন্যাল্ (Allonal), ওম্‌নোপন্ (Omnopon), গ্লাইকো-হিরোইন্ (Glykeron), সিরাপ কোসিলানা কম্পাউণ্ড (Syrup Cocillana Co.), সিরাপ কোসোম্ (Cosome), ব্যাল্‌সামল্ (Balsamol), পাইন্ এণ্ড সোমনস্ কর্ডিয়াল (Pine and Somnos cordial), নিক্যান্ ড্রপ্‌স্ (Nican drops), ইত্যাদি। তবে কাহার পক্ষে কোনটি সফল হইবে তাহা বলা যায় না, একে একে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হয়, অথবা দুই তিনটি ঔষধ একত্রে মিশাইয়া দিবারও আবশ্যক হয়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সূত্রপাত হইতেই অল্প মাত্রায় **ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন** (mixed influenza vaccine) প্রয়োগ করিলে অনেক সময় উপকার হয় এবং রোগটি অধিক বাড়িতে পারে না। কেহ কেহ ইহাতে ভ্যাক্সিন দিতে ভয় পান, কিন্তু অল্প মাত্রায় দিলে ভয়ের কোনোই কারণ নাই। রোগের অবস্থা অনুসারে দুই-এক দিন অন্তর এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথম হইতেই উহা প্রয়োগের দ্বারা রোগটিকে সাধ্যমত দমন করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিশেষতঃ বুকে সর্দ্দি আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিলে উহা তখনই প্রয়োগ করা উচিত। তবে রোগ কঠিন অবস্থায় পরিণত হইলে তখন আর ভ্যাক্সিন দেওয়া বিধেয় নয়।

এই রোগে ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ থাকিলে সাধারণতঃ অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চার দেওয়া উচিত। বুকের সর্দ্দি সরল করিবার জন্য কফনিঃসারক ঔষধ সকলও প্রয়োজনমত দিতে হয়। **অ্যামোনিয়া কার্বনেট্** (Ammon Carb.) ইহার পক্ষে অতি উত্তম। ইহা ৫ গ্রেন মাত্রায় মিকশ্চারের সহিত অথবা দুধের সহিত মিশাইয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে। রোগ প্রবল

হইবার উপক্রম দেখিলে **টিঞ্চার ডিজিটেলিসের** ব্যবহার করা ভাল, ১০ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ ৩।৪ মাত্রা দিতে থাকিলে উহা হার্টকে সবল রাখে।

হার্টফেলের উপক্রম দেখিলে অ্যাড্রেনেলিন $\frac{১}{২}$ সি. সি. মাত্রায়, ও পিটুইট্রিন্ (Pituitrin) $\frac{১}{২}$ সি. সি. মাত্রায়,—একত্রে ৬ ঘণ্টা অন্তর একটি করিয়া ইন্‌জেকশন দেওয়া যাইতে পারে। অত্যন্ত ঘাম হইতেছে, বা মুখের বর্ণ নীলাভ হইয়াছে দেখিলে অ্যাট্রোপিন্ (Atropine sulph.) $\frac{১}{১০০}$ গ্রেন ও ষ্ট্রিক্‌নিন্ (Strychnine sulph.) $\frac{১}{৬০}$ গ্রেন একত্রে মিলাইয়া ইন্‌জেকশন দেওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে **অক্সিজেন** (Oxygen) দেওয়া যাইতে পারে। হার্টের উপস্থিত দুর্ব্বলতা নিবারণ করিবার জন্য **কার্ডিয়াজল্** (Cardiazol) ১ সি. সি. বা ২ সি. সি. মাত্রায় ইনট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন দেওয়া বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা কর্পূর (camphor) হইতে প্রস্তুত, এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে ইহার ক্রিয়া হয়। ইহা বড়ি রূপে এবং তরল-আকারেও পাওয়া যায়। হার্টের দুর্ব্বলতার সহিত শ্বাসকষ্ট থাকিলে Cardiazol-ephedrine drops দিলে আশু উপকার হয়।

হার্টের অবস্থা খারাপ ও প্রস্রাবের পরিমাণ কম হইতেছে দেখিলে ২৫% **গ্লুকোজ্** ২০ সি. সি. হইতে ৫০ সি. সি. পর্য্যন্ত মাত্রায় (intravenous glucose) ইনট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশনের দ্বারা প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। কেহ কেহ গ্লুকোজের সহিত **ইউরোট্রোপিন** মিশ্রিত করিয়া ইন্‌জেকশন দেন। ইহাও সময়বিশেষে বেশ উপকারী।

মস্তিষ্কের অত্যন্ত উত্তেজনা থাকিলে উহা নিবারণের জন্য **হায়োসিন্** (Hyoscine hydrobrom. gr. $\frac{1}{100}$ to $\frac{1}{50}$) ইন্‌জেকশন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই রোগ কঠিন হইলে উহার সহিত ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাসের যোগ আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সেইজন্য কঠিন অবস্থায় ইহাতে কেহ কেহ **অ্যাণ্টিষ্ট্রেপ্‌টো সিরাম** ইন্‌জেকশন দিয়া থাকেন। কখনো কখনো তাহাতে উপকারও হয়। ইহা ব্যতীত সুস্থ লোকের শরীর হইতে অন্যূন ২০ সি. সি. তাজা রক্ত লইয়া তৎক্ষণাৎ উহা রোগীকে ইনট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন

(whole-blood injection) দিয়াও কোনো কোনো স্থলে আশ্চর্য্য উপকার হইতে দেখা গিয়াছে।

আইওডিন্ ইন্‌জেকশনও (intravenous iodine) এই রোগের অবস্থা-বিশেষে উত্তম চিকিৎসা। ৫ ফোঁটা করিয়া টিঞ্চার (লাইকার) আইওডিন ৫ সি. সি. ডিস্‌টিল্‌ড্ জলের সহিত মিশাইয়া ইনট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশন দিয়া অনেক ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া-যুক্ত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে **ওম্ন্যাডিন্** (Omnadin) এবং **ক্যালসিয়াম** ইন্‌জেকশনও কেহ কেহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা পুরাতন হইয়া গেলে **ভ্যাক্সিন্** ব্যবহার করা উচিত এবং **আইওডাইড্** অল্প মাত্রায় খাইতে দেওয়া উচিত।

রোগীকে সর্ব্বদা খোলা হাওয়াতে রাখা প্রয়োজন। টাইফয়েড রোগের পরিচর্য্যার সমস্ত নিয়ম এই রোগেও প্রতিপালিত হওয়া দরকার। পথ্যের মধ্যে গ্লুকোজ, ফলের রস, দুধ, বার্লি, প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এই রোগ আরোগ্য হইবার পরেও কিছুকাল বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দুর্ব্বলতার জন্য অ্যাসিড-টনিক মিকশ্চার ও ষ্ট্রিক্‌নিন্ প্রভৃতি দেওয়া উচিত। **অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির একষ্ট্রাক্ট** (Suprarenal gland extract) ইহার দুর্ব্বলতা দূর করিবার উত্তম ঔষধ।

মেনিঞ্জাইটিস্

Cerebro-spinal Fever

চলিত কথায় এই রোগটিকে আমরা কেবল মেনিঞ্জাইটিস্ বলিয়া থাকি, কিন্তু ইংরেজীতে ইহাকে এক প্রকার 'জ্বর' বলিয়াই অভিহিত করা হয়, এবং ইহার নানারূপ আখ্যা দেওয়া হয় ; যথা,—Cerebro-spinal fever, Spotted fever, Stiffneck fever, Cerebral typhus, ইত্যাদি।

ইহাকে বিংশশতাব্দীর নূতন-আগন্তুক ব্যাধি বলা যাইতে পারে। যদিও ইহার অনেক পূর্ব্বসংঘটনের ইতিহাস পাওয়া যায়, এবং যদিও ইহার বীজাণু (meningococcus) Weichselbaum কর্ত্তৃক ১৮৮৭ সালেই আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে, তথাপি এ রোগ বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে খুবই কম সংখ্যায় দেখা যাইত। ১৯০৪ সালের পর হইতেই ইহা অতি অধিক মাত্রায় সংক্রামক ভাবে দেখা যাইতেছে।

কেবল এই রোগটি নয়,—মেনিঞ্জাইটিস্, পোলিওমায়েলাইটিস্, এন্‌কেফালাইটিস্, ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা,—এই চারিটি সংক্রামক ব্যাধি বিংশ শতাব্দীতে একযোগে যেন নূতন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই ব্যাধিগুলি বর্ত্তমান সভ্যতার বিষময় ফল (one of the penalties of civilization)। Hamer ও Crookshank এই সকল নূতন রোগের এপিডেমিওলজির বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিকের সহিত অপর তিনটি রোগের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, কারণ যেখানেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিক হয় সেখানেই তাহার অব্যবহিত পরে অপরগুলির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রক্তকে বিষাক্ত করে, কিন্তু পরবর্ত্তী তিনটি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসকলকে আক্রমণ করে। **মেনিঞ্জাইটিস্** মস্তিষ্ক ও স্পাইন্যাল-কর্ডের (spinal cord) বা সুষুম্নার উপরকার আবরণগাত্রে (meninges) প্রদাহ উপস্থিত করে।

পোলিওমায়েলাইটিস্ মস্তিষ্কনিম্নস্থ স্পাইন্যাল্-কর্ডের ভিতরের অংশকে (grey matter) আক্রমণ করে। **এন্‌কেফালাইটিস্** আক্রমণ করে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে।

ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে কখনই বোধ হয় এই মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। কোনো প্রকার কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হইলে যে আনুষঙ্গিক মস্তিষ্ক-বিকৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে,—যেমন ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ইত্যাদি কয়েকটি রোগের উপসর্গ-স্বরূপ মেনিঞ্জাইটিস্,—বর্ত্তমান যুগের সংক্রামক মেনিঞ্জাইটিস্ তাহা হইতে অনেক পৃথক। এরূপ মারাত্মক ব্যাধি অল্পই আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে প্লেগ যেমন এদেশে ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল, বর্ত্তমানে এই মেনিঞ্জাইটিস্‌ও সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে সঙ্গে ইহা আমাদের দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

প্রতি বৎসর শীতকাল হইতে বসন্তকাল পর্য্যন্ত এই রোগের প্রাদুর্ভাব। অল্পবয়স্কেরাই ইহাতে সচরাচর আক্রান্ত হয় এবং কৈশোর ও যৌবন বয়সে (১৬ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত) ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকোপ। ক্বচিৎ দুই-এক বৎসরের শিশুকে ইহাতে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে, এবং চল্লিশ বৎসরের উপরেও ইহা খুব কম ঘটিতে দেখা যাইতেছে।

ইহা দারুণ সংক্রামক রোগ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বয়ং রোগীর দ্বারাই যে ইহার সংক্রমণ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে তাহা নয়। অধিকাংশ স্থলে এ রোগের সংক্রমণ হয় সুস্থ কেরিয়ার্ (healthy carriers) বা অজানিত বীজাণু-পোষণকারীদিগের দ্বারা। ইহাতে রোগী প্রথম হইতেই শয্যাগত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার দ্বারা সংক্রমণের অধিকদূর বিস্তৃতি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এমন সুস্থ ব্যক্তি অনেক দেখা যায় যাহাদের নাকের মধ্যে এই রোগের বীজাণু নিত্যই বাস করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের শরীরে প্রতিরোধশক্তি থাকা হেতু রোগটি জন্মে না। তাহারাই ইহার কেরিয়ার্, এবং অধিকাংশ স্থলে তাহারাই অজানিত ভাবে এই রোগের সংক্রমণ ছড়ায়। *

* এই রোগের বীজাণু যে সুস্থব্যক্তিদের নাকের ও মুখের মধ্যে বাস করিয়া থাকে, এবং তথা হইতে নিঃশ্বাসবায়ুর সহিত প্রক্ষিপ্ত হইয়া অপর ব্যক্তির নাকে গিয়া

উহাদের সর্দ্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হইলে হাঁচি-কাসির দ্বারা নির্গত হইয়া ঐ সকল বীজাণু নিঃশ্বাসবায়ুর সহিত অন্যের নাকে গিয়া প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ সেইজন্যই যেখানে মেনিঙ্গাইটিসের প্রাদুর্ভাব হয় সেখানে তৎপূর্ব্বে অনেকেরই সর্দ্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে দেখা যায়।

কিন্তু বীজাণু প্রবেশ করিলেই এ-রোগ জন্মায় না, ইহা বাছিয়া বাছিয়া এক-একজনকে আক্রমণ করিয়া থাকে। নানা কারণে যাহাদের স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি অল্প, তাহাদেরই শরীরে ইহাদের দ্বারা রোগের সৃষ্টি হয়। যাহারা বহুলোকের সহিত একত্রে বদ্ধগৃহে বাস করে, অস্বাস্থ্যকরভাবে জীবন যাপন করে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে না, এবং যাহাদের স্বভাবতঃই দুর্ব্বল শরীর, তাহাদেরই এই রোগ সহজে আক্রমণ করিবার সুযোগ পায়।

বীজাণু পরিচয়

মেনিঙ্গাইটিস রোগের বীজাণুর নাম মেনিঙ্গোকক্কাস্ (Diplococcus intracellularis meningitidis)। ইহারা সর্ব্বদাই জোড়ে জোড়ে থাকে, অর্থাৎ দুইটি করিয়া বীজাণু একত্রে পরস্পর-সন্নিবদ্ধ হইয়া থাকে। এই বীজাণু ষ্ট্রেপ্টোকক্কাসের মত গোলাকৃতি নয়, একদিকে ঈষৎ চ্যাপ্টা, এবং রং করিলে

প্রবেশ করে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নাসিরাবাদ, বোরিষ্টাল্, প্রভৃতি কয়েকটি সৈন্যনিবাসে তরুণ সৈনিকদের মধ্যে কয়েক বৎসর এই রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সেখানে গিয়া নূতন ভর্ত্তি হইবার ৩।৪ মাসের মধ্যেই অনেকে এই রোগে আক্রান্ত হইতে থাকে। তখন অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে যে-সকল প্রবীন সৈনিক তাহাদের শিক্ষা দিয়া থাকে, উহাদের কয়েকজনের নাকে এই বীজাণু বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের পৃথক করিয়া রাখিবার পর হইতে ঐ সকল সৈন্যনিবাসে এই রোগের প্রাদুর্ভাব একেবারে কমিয়া গিয়াছে। এখনও সেখানে নিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় কাহারো নাসিকাদির মধ্যে ঐ বীজাণু আছে কি না। কিন্তু সৈন্যনিবাসে যে ভাবে এ রোগ নিবারণ করা সম্ভব হইয়াছে, জনসাধারণের মধ্যে সেরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। যাহা হউক, ঐ প্রকার সুস্থ কেরিয়ারদিগের দ্বারাই যে এই রোগ অধিকাংশই সংক্রামিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেখিতে অনেকটা গনোরিয়া-বীজাণুর মত (gram-negative)। সাধারণতঃ ইহারা পলিনিউক্লিয়ার শ্বেতকণিকার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বাহিরেও কখনো কখনো ইহাদের মুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর মেরুদণ্ডের মধ্য হইতে জল (meningeal fluid) বাহির করিলে উহার কণিকাগুলির মধ্যে এই বীজাণু প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

এই বীজাণু অতিশয় ক্ষীণজীবী, অল্পেই ইহারা মরিয়া যায়। মানুষের নাকের মধ্যে থাকিলে ইহারা অনেকদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, কিন্তু বাহিরে কোথাও শুষ্ক অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে একদিনের বেশী বাঁচিতে পারে না।
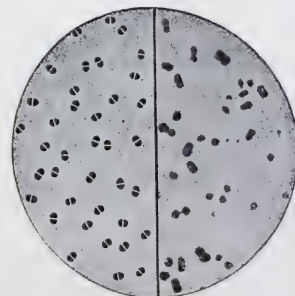
মেনিঙ্গোকক্কাস্-দিগের স্বাভাবিক মূর্ত্তি কিরূপ এবং কয়েকদিন কাল্চার করিলেই উহাদের কিরূপ বিকৃত ভঙ্গপ্রবণ মূর্ত্তি (involution forms) হইয়া যায়, এই চিত্রে তাহাই দেখানো হইয়াছে। (চিত্রখানি প্রফেসর এম্. এন্. দে ও কে. ডি. চ্যাটার্জী প্রণীত Bacteriology পুস্তক হইতে অনুমতিক্রমে সংগৃহীত)

অল্প উত্তাপেই (৬০ ডিগ্রী) ইহারা মরে, এবং সামান্য কিছু অ্যান্টিসেপ্টিক ঔষধ প্রয়োগ করিলেও শীঘ্র মরিয়া যায়। সযত্নে কাল্চার করিয়াও ইহাদের অধিকদিন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা যায় না, কয়েকদিন কাল্চারের মধ্যে থাকিলে নিজের বিষে আপনিই মরিয়া যায়। মেনিঙ্গোকক্কাস্ চারিপ্রকারের আছে (Types I to IV)। সম্ভবতঃ ইহাদের বহির্বিষ (exotoxin) কিছু নাই,

কিন্তু ইহাদের অন্তর্বিষ (endotoxin) অতি তীব্র। মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়াও অধিকাংশ বীজাণু নিজের বিষে নিজেই মরে, এবং তখন এই অন্তর্বিষ মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়।

এই বীজাণু কিরূপে নাক হইতে মস্তিষ্ক সান্নিধ্যে গিয়া উপস্থিত হয় সে সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের মতে ইহারা প্রথমে নাক হইতে ঝিল্লীগাত্র ভেদ করিয়া রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু রক্তের মধ্যে ইহারা অধিকক্ষণ টিঁকিতে পারে না, তথায় অ্যাণ্টিবডির প্রভাবে শীঘ্রই দলে দলে মরিতে থাকে। সেইজন্য ইহারা তখন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিতে থাকে এবং রক্তের সহিত choroid plexus-এর মধ্য দিয়া ventricles-এর ভিতর প্রবেশ করিয়া এমন ঝিল্লীতে (meninges) উপস্থিত হয় যেখানে অ্যাণ্টিবডি সহজে পৌঁছিতে পারে না। স্পাইন্যাল কর্ড ও মস্তিষ্কের চতুষ্পার্শ্বস্থ মেনিঞ্জিস্-গাত্রে ইহারা নির্ব্বিঘ্নে আপন সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে থাকে, এবং রোগীর মৃত্যুর পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ঐ সকল স্থানে প্রদাহ হইয়া রসে ও পুঁজে ভরিয়া গিয়াছে, এবং মস্তিষ্কপদার্থ উহার চাপে চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে।

লক্ষণাদি

বীজাণুপরিচয়ে জানা গেল যে মেনিঙ্গোকক্কাস্ মনুষ্যদেহের মধ্যে দুইরূপ আশ্রয় অতিক্রম করিয়া তৎপরে তৃতীয় আশ্রয়স্বরূপ মেনিঞ্জিস্ সমূহের (meninges) গাত্রে গিয়া উপস্থিত হয়। অতএব উহাদের তিনরূপ অবস্থান অনুযায়ী রোগীরও পর্য্যায়ক্রমে তিনরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইবার কথা।

প্রথমে যখন ইহারা নাকের মধ্যে প্রবেশ করে তখন কিছু সর্দ্দির লক্ষণের (catarrhal) উপক্রম হয়, কিন্তু প্রায়ই তাহা বিশেষ লক্ষিত হয় না। কাহারো কাহারো প্রথমে ইহাতে সর্দ্দির সহিত টন্‌সিলাইটিস্ এবং চোখ-ওঠাও (conjunctivitis) দেখা যায়, এবং উহা স্বভাবতঃই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া বিবেচিত হয়।

অতঃপর বীজাণু রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই প্রথম জ্বর দেখা দেয়। এ সময় মস্তিষ্ক-লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। এই জ্বর প্রায়ই এলোমেলো

ভাবের হইতে থাকে। প্রথমে জ্বরটি খুব প্রবল ভাবেই আসে, কিন্তু দুই-একদিনের মধ্যে হয়তো তাহা একবার কমিয়া যায়, আবার হয়তো হঠাৎ ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়। এইরূপে কাহারো বা এই জ্বর অবিরাম লাগিয়া থাকে, কাহারো বা ছাড়িয়া ছাড়িয়া জ্বর হয় (তখন ইহাকে ম্যালেরিয়া বলিয়াও সন্দেহ হইতে পারে)। তাহার পর হঠাৎ এক সময় তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্ক-লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়।

কিন্তু সকলের পক্ষে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইতে এত অধিক সময় লাগে না। বিভিন্ন রোগীর প্রাথমিক জ্বরের অবস্থা হইতে মেনিঞ্জাইটিসের অবস্থায় আসিতে সময়ের বিভিন্নরূপ তারতম্য ঘটে। কাহারো কাহারো জ্বর হইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মস্তিষ্ক-লক্ষণ দেখা দেয়, অর্থাৎ প্রবল শিরঃপীড়ার সহিত জ্বর আসিয়া দুই একবার কম্প ও বমি হইবার পর তাহারা অচিরে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কাহারো বা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইতে ২।৩ দিন বিলম্ব ঘটে,—অর্থাৎ তখন ঐ ২।৩ দিন বীজাণুসকল কেবল রক্তের মধ্যেই অবস্থান করে। এইরূপ বিলম্বিত-প্রকৃতির রোগে প্রায়ই রোগীর সর্ব্বাঙ্গে একপ্রকার লাল লাল গুটি (rashes) বাহির হয়, তাহা অনেকটা মশার কামড়ের মত দেখিতে। কখনো বা স্থানে স্থানে রক্তজমার মত লাল লাল ছোপধরা দাগ দেখা যায়, তাহাতে উহা রক্তজ বসন্ত (hæmorrhagic small-pox) বলিয়া সন্দেহ হয়। জ্বর হইবার দুই একদিনের মধ্যেই এগুলি বাহির হয়, কিন্তু কখনো কখনো দেখা দিয়াই আবার অনতিকাল পরে তাহা মিলাইয়া যায়। ইহার জন্যই এই রোগের অপর নাম স্পটেড্ ফিবার (Spotted fever)।

অতঃপর রোগের প্রাবল্য অনুসারে কাহারো বা মেনিঞ্জাইটিসের অপরাপর লক্ষণগুলি একে একে প্রকাশ পায়, কাহারো বা তৎপূর্ব্বেই মৃত্যু উপস্থিত হওয়াতে উহার সুযোগ থাকে না; অপরপক্ষে কাহারো বা হয়তো সামান্যই মস্তিষ্ক-লক্ষণ ঘটিয়া রোগটি শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া যায়,—এবং কাহারো বা উহা দীর্ঘস্থায়ী ক্রনিক্ অবস্থায় পরিণত হয়।

অতএব এই বীজাণুর আক্রমণে রোগের কেবল যে একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি দেখা যাইবে এমন কথা নাই। এই রোগের কয়েক প্রকার বিভিন্ন স্বরূপ আছে। যথাক্রমে সেগুলি উল্লিখিত হইল :—

(১) **আসল মেনিঞ্জাইটিসের স্বরূপ** (Typical form)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কাহারো বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মেনিঞ্জাইটিস্ উপস্থিত হয়, কাহারো বা দুই তিন দিন বিলম্ব ঘটে। মেনিঞ্জাইটিসের সূত্রপাতের লক্ষণ—জ্বর, শিরঃপীড়া, বমি এবং কম্প। তাহার পরেই ঘাড়ের দিকে যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় শক্ত হইয়া ওঠে। মাথার পশ্চাৎভাগে যন্ত্রণা ও ঘাড়ের ব্যথা কখনো কখনো এত অধিক হয় যে রোগী তাহার তাড়নায় চীৎকার করিতে থাকে এবং অনবরত গোঙানির মত শব্দ করিতে থাকে। অতঃপর শীঘ্রই প্রলাপ আরম্ভ হয়, রোগী বারে বারে উত্তেজিত হইয়া এবং চম্‌কাইয়া উঠিতে থাকে, থাকিয়া থাকিয়া অযথা চীৎকার করে, আলোকের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারে না (photophobia), এবং মধ্যে মধ্যে সম্পূর্ণ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। রোগ অতিশয় প্রবল হইলে চৈতন্য একেবারেই আসে না, অজ্ঞান অবস্থায় প্রায় ২৪ ঘণ্টা বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রকৃতির রোগ হইলে সম্পূর্ণ চৈতন্যলোপ হয় না, প্রলাপ ও উত্তেজনাপূর্ণ অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় ৫।৬ দিন হইতে ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভোগ হইবার পর ধীরে ধীরে জ্ঞান হইতে থাকে।

ইহাতে সর্ব্ব শরীরের মাংসপেশীসমূহের একপ্রকার কাঠিন্য (stiffness) উপস্থিত হয়। প্রথমেই ঘাড়ের মাংস শক্ত হয় এবং ঘাড়টি সর্ব্বদা যেন টান হইয়া থাকে, রোগীর মাথা তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মাথা ধরিয়া তুলিতে গেলে উহার সহিত সমস্ত শরীরটিও দণ্ডবৎ উঠিয়া পড়ে। ক্রমে অন্যান্য অঙ্গের মাংসগুলিও একে একে শক্ত হইয়া যায়। রোগী তখন এমন ভঙ্গিতে বিছানায় পড়িয়া থাকে যে দেখিলেই উহা মেনিঞ্জাইটিস্-অবস্থা বলিয়া চিনিতে পারা যায়। একপাশে ফিরিয়া ঘাড় টান রাখিয়া পেটের কাছে হাত-পা গুটাইয়া কঠিন হইয়া শুইয়া থাকা মেনিঞ্জাইটিস্ রোগীর বিশিষ্ট ভঙ্গি, এরূপ অবস্থা হইতে তাহাকে সহজে নড়ানো যায় না।

এই রোগে পরীক্ষার দ্বারা **কার্নিগ্‌ চিহ্ন** (Kernig's sign) নামক একটি বিশেষ রোগনির্দ্ধারক-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর এক পায়ের জানু পেটের নিকট মুড়িয়া আনিয়া পরে পায়ের গোছ ধরিয়া যদি

তাহা উপর দিকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করা যায় তবে ঐ চেষ্টা বিফল হয়, হাঁটু অত্যন্ত শক্ত হইয়া মুড়িয়াই থাকে। আরো একপ্রকার চিহ্ন এই রোগে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম Brudzinski's sign। রোগীর কোনো একটি পা ধরিয়া মুড়িয়া দিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে তাহার অন্য পা-টিও ঐ সঙ্গে আপনা আপনি মুড়িয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকিলেও উহার মাংসপেশীগুলির মধ্যে যথেষ্ট ব্যথা থাকে, জোর করিয়া হাত-পা সোজা করিবার চেষ্টা করিতে গেলে চীৎকার করিয়া ওঠে।

এই রোগে কখনো কখনো গায়ের চামড়া অতিচেতন (hyperæsthetic) হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিঠে হাত দিয়া বা আঙুল দিয়া ঈষৎ স্পর্শ করা মাত্র রোগীর সমস্ত শরীর চম্‌কাইয়া ওঠে।

মেনিঞ্জাইটিস্ রোগে চক্ষুতেও নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। রোগের প্রথম হইতেই চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইবার পর অনেক সময় চক্ষুতারকা টেরা (nystagmus) হইয়া থাকে, এবং কখনো কখনো চোখের মণি বিস্ফারিত (pupils dilated) হইয়া থাকে। আবার কখনো কখনো এমন দেখা যায় যে রোগী পরিষ্কার চাহিয়া আছে, অথচ তাহাতে কোনো পলক নাই বা চেতনা নাই; চোখে আঙুল দিলেও তাহার পাতা পড়ে না, ডাকিলেও কোনো সাড়া মেলে না, অচৈতন্য অবস্থায় অপলক নেত্রে কেবল চাহিয়া থাকে। এই অবস্থার নাম coma vigil।

মেনিঞ্জাইটিস্ হইলে নাড়ীর বেগও যথেষ্ট দ্রুত হয় এবং সেই সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসও দ্রুততর হয়। ইহাতে জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া থাকে এবং উহাতে কাঁটা ওঠার মত চিহ্ন দেখা যায়। কোষ্ঠবদ্ধতাই ইহাতে স্বাভাবিক, উদরাময়ের লক্ষণ কমই দেখা যায়। প্রস্রাবে প্রায়ই অ্যাল্‌বুমেন থাকে।

এই রোগে শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। প্রায়ই উহা ২০,০০০ হইতে ৪০,০০০ বা ৫০.০০০ পর্য্যন্তও বাড়িতে দেখা যায়। পলিনিউক্লিয়ার কণিকার সংখ্যাও ইহাতে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়।

(২) **সেপ্‌টিসিমিয়ার স্বরূপ** (Septicæmic form)—এই রোগের বীজাণু মস্তিষ্ক আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে রক্তের মধ্যে

প্রবেশ করে। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে রক্তের মধ্যেই ইহারা স্থান পাইল, স্থতরাং মেনিঞ্জিস্‌গুলিতে আদৌ প্রবেশ করিল না। অনেকে বলেন যে বীজাণুর টাইপ্‌ অনুসারেই ইহা হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মেনিঞ্জাইটিসের অবস্থায় অধিকাংশ স্থলে Types I এবং II-বীজাণু পাওয়া যায়, এবং সেপ্‌টিসমিয়ার অবস্থায় অধিকাংশ স্থলে Types III এবং IV-বীজাণু পাওয়া যায়। যাহা হউক এই সেপ্‌টিসিমিয়ার অবস্থায় মেনিঞ্জাইটিসের কোনো লক্ষণ থাকে না, স্থতরাং উহাকে মেনিঞ্জাইটিস্‌ রোগ বলিয়া কোনোপ্রকার সন্দেহই হয় না। এরূপ অবস্থায় জরের সহিত কেবল সন্নিপাত বা বিষাক্তরোগের অন্যান্য লক্ষণগুলিই দেখা যায়। প্রায়ই ইহাতে চামড়ার উপর লাল লাল গুটি (petechial rash) বাহির হইতে দেখা যায়। ইহাতে জর অত্যন্ত প্রবল হয় এবং ১২ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যুও ঘটিতে পারে। আক্রমণ অপেক্ষাকৃত মৃদু হইলে জর ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসিতে থাকে, গাঁঠে গাঁঠে অত্যন্ত ব্যথা (arthritis) হইতে দেখা যায়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে কিছুদিন পরে রোগী আরোগ্যলাভ করিতে পারে। কখনো কখনো এই সেপ্‌টিসিমিয়া ক্রনিক হইতেও দেখা যায়, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার ভোগ চলিতে থাকে।

(৩) মৃদুতর স্বরূপ (Abortive form)—মৃদু হইলেও ইহা প্রথমে প্রবল মূর্ত্তি লইয়াই উপস্থিত হয়, এবং জরের সহিত রীতিমত মাথার যন্ত্রণা, ভুলবকা, ঘাড় শক্ত হওয়া প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু দুই-একদিন পরে হঠাৎ সমস্ত লক্ষণ দূর হইয়া যায় এবং রোগী অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করে। এরূপ অবস্থায় চিকিৎসক মনে করেন তাঁহার চিকিৎসার গুণেই ঐরূপ হইল, কিন্তু বাস্তবিক উহা আপন স্বভাবেই আরোগ্য হয়। আরো একপ্রকার মৃদু ভাবের (ambulant form) মেনিঞ্জাইটিস্‌ দেখা যায়, তাহাতে অল্প জরও হয়, অল্প মাথাও ধরে, অল্প ঘাড়ও শক্ত হয়, কিন্তু দুই-চারিদিন পরে ইহা আপনিই আরোগ্য হইয়া যায়। এপিডেমিকের শেষের দিকে এইরূপ মৃদু আক্রমণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে প্রায়ই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া সন্দেহ করা হইয়া থাকে।

(৪) ক্রনিক স্বরূপ (Chronic form)—ইহাতে জর ও মেনিঞ্জাইটিসের লক্ষণ বহুকাল অবধি বর্ত্তমান থাকে, এমন কি কোনো কোনো স্থলে দুই তিন মাস পর্য্যন্তও ইহার ভোগ হইতে দেখা যায়। ইহাতে জর ও মস্তিষ্ক-লক্ষণ মধ্যে মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে, রোগী ক্রমশঃ অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়ে, বেড্‌সোর দেখা দেয়, অন্ধত্ব ও বধিরত্ব ঘটিবার উপক্রম হয়, এবং ভুগিয়া ভুগিয়া অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়। যদি বা কেহ আরোগ্য লাভ করে তবে চিরদিনের জন্য মস্তিষ্ক বিকৃত থাকিয়া যায়।

(৫) **শিশুদের বেস্যাল্‌ মেনিঞ্জাইটিস্‌** (Posterior basal meningitis)—ইহা তিন বৎসরের বা তন্যূন বয়স্ক শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। নামে বিভিন্ন হইলেও ইহা এপিডেমিক মেনিঞ্জাইটিসেরই অন্য রূপ। ইহাতে প্রথমে সর্দ্দিকাসির সহিত জর হয়, এবং দুই-এক সপ্তাহ পরে হাত-পায়ের খিঁচুনী হইতে আরম্ভ হয়, ঘাড় শক্ত হয়, ঘন ঘন বমি হইতে থাকে, এবং হাত ও পায়ের আঙুলগুলি শক্ত করিয়া মুড়িয়া শিশু সর্ব্বদা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে। রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখা যায় শ্বেতকণিকার সংখ্যা ২০।৩০ হাজার পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ক্রমে রোগীর মাথার মধ্যে জল জমে (hydrocephalus)। ইহাতেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ভোগ হয়, কিন্তু শতকরা ৪০।৫০টি রোগী আরোগ্যলাভ করে। মস্তিষ্কের নিম্নে কেবল উহার পশ্চাৎভাগের অংশ মাত্র ইহাতে আক্রান্ত হয়, সেই জন্য ইহার ঐরূপ নাম।

রোগ চিনিবার উপায়

মেনিঞ্জাইটিস্‌ চেনা বিশেষ কঠিন নয়। প্রবল জরের সহিত ঘাড়ে ব্যথা, ঘাড় শক্ত করিয়া থাকা, ভুলবকা ও অজ্ঞান অবস্থা, কার্নিগ্‌ চিহ্ন, প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখিলেই বুঝা যায় উহা মেনিঞ্জাইটিস্‌। তবে উহা মৃদু প্রকৃতির হইলে অথবা সেপ্‌টিসিমিয়া-স্বরূপ হইলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি অন্যান্য রোগের সন্দেহ আসিতে পারে। অপরপক্ষে মেনিঞ্জাইটিস্‌ বুঝা গেলেও অনেক সময় উহা আসল সেরিব্রো-স্পাইন্যাল্‌ মেনিঞ্জাইটিস্‌ অথবা অন্য কোনো

রোগের উপসর্গরূপে উৎপন্ন মেনিঞ্জাইটিস্, তাহা বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। অথচ তাহা না চিনিতে পারিলেও চিকিৎসা যথাযথভাবে করা যায় না।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল্ মেনিঞ্জাইটিস্ ব্যতীত আরো পাঁচ প্রকারের মেনিঞ্জাইটিস্ আমরা দেখিতে পাই, যথা :—(১) যক্ষ্মারোগের মেনিঞ্জাইটিস্ (tubercular)। (২) নিউমোনিয়ার মেনিঞ্জাইটিস্ (pneumococcal)। (৩) ষ্ট্রেপটোকক্কাস্ জনিত মেনিঞ্জাইটিস্ (streptococcal)। (৪) টাইফয়েড বা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গস্বরূপ মেনিঞ্জাইটিস্ (typhoid and influenzal)। (৫) সিফিলিস্-ঘটিত মেনিঞ্জাইটিস্ (syphilitic)।

মেনিঞ্জাইটিস্ পৃথক করিয়া চিনিয়া লইতে এই নির্দ্দেশগুলি স্মরণ করা আবশ্যক :—

( ) সেরিব্রো-স্পাইন্যাল্ মেনিঞ্জাইটিসে যেরূপ ঘাড় শক্ত হইয়া থাকে এবং মাংসপেশীগুলি কঠিন হইয়া থাকে, অন্য মেনিঞ্জাইটিসে তাহা হয় না।

(২) কার্নিগ্ চিহ্নাদি অন্য কোনো মেনিঞ্জাইটিসে প্রায়ই পাওয়া যায় না। তবে রোগী অল্পবয়স্ক শিশু হইলে এ চিহ্নের কোনো স্থিরতা নাই।

(৩) যক্ষ্মা-বীজাণুর মেনিঞ্জাইটিসে এবং টাইফয়েড মেনিঞ্জাইটিসে শ্বেতকণিকার সংখ্যা ২০,০০০-এর অনেক নীচে থাকে, উহার উপরে কখনই যায় না।

(৪) নিউমোকক্কাস্-কর্তৃক মেনিঞ্জাইটিসে কিছু না কিছু নিউমোনিয়ার চিহ্নও বুকে থাকা সম্ভব। সিফিলিস্-ঘটিত মেনিঞ্জাইটিস্ সাধারণতঃ ক্রনিক্ প্রকৃতির হয়। অন্যান্য রোগের মেনিঞ্জাইটিসে উহার সহিত তদনুযায়ী অন্য-প্রকার লক্ষণগুলিও স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান থাকিবে।

(৫) মেনিঞ্জাইটিস্ যে-কোনো প্রকারেরই হউক, উহাতে **লাম্বার পাংচারের** (lumbar puncture) ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ঐ পাংচারের দ্বারা যে জল বাহির হয় তাহা পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায় উহা কোন-জাতীয় মেনিঞ্জাইটিস্। যদি সেরিব্রো-স্পাইন্যাল্ হয়, তবে উহার জলে পলিনিউক্লিয়ার কণিকার সংখ্যা অনেক বেশী হইবে এবং তাহারই অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক মেনিঙ্গোকক্কাস্ জোড়ে জোড়ে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যাইবে। যদি নিউমোকক্কাস্-জনিত হয়, তবে উহাদিগকে কেবল কণিকার

বাহিরেই দেখা যাইবে। যদি যক্ষ্মা-বীজাণুর হয়, তবে স্বতন্ত্র পরীক্ষার দ্বারা তাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। কেবল মাইক্রোস্কোপ-পরীক্ষাই যথেষ্ট নয়, সম্ভব হইলে ঐ জলের কাল্‌চার করিয়াও দেখা প্রয়োজন। আসল মেনিঞ্জাইটিস হইলে লাম্বার পাংচারের জলটি চোখে দেখিলেও অনেকটা বুঝা যায় ; উহা প্রায়ই ঘোলাটে হয় এবং কখনো কখনো পুঁজ-রক্ত মিশ্রিত হয়।

চিকিৎসা

প্রথমতঃ রোগীকে একটি নির্জ্জন ঘরে স্বতন্ত্রভাবে রাখা উচিত। তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া যখন-তখন উত্যক্ত করা উচিত নয়। মাথার চুল কামাইয়া দিয়া সর্ব্বদা মাথায় এবং ঘাড়ে দুইটি বরফের ব্যাগ লাগাইয়া রাখা উচিত। উঁচু বালিশের উপর মাথা রাখা ঠিক নয়, বালিশটি যথাসম্ভব নরম এবং নীচু হওয়া দরকার। রোগীকে খাটের উপর না শোয়াইয়া মেঝেতে বিছানা করিয়া শোয়ানো উত্তম, কারণ খাট হইতে হঠাৎ কখনো পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ; যদি খাটে শোয়ানো হয় তবে উহাতে রেলিং দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রোগীকে কোনোমতে উঠিয়া বসিতে দেওয়া উচিত নয়। সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিয়া তাহার রীতিমত পরিচর্য্যা করা প্রয়োজন। মুখের ভিতর ও বাহির যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নিয়মিত সময় অন্তর পথ্যাদি দেওয়া প্রয়োজন ; রোগী প্রায়ই স্বইচ্ছায় পথ্য গ্রহণ করে না, অতএব সময়ে সময়ে জোর করিয়া পথ্য খাওয়াইতে হয়। যে স্থলে তাহাও অসম্ভব সে স্থলে নাকের মধ্য দিয়া নলের দ্বারা পথ্য (nasal feeding) দিবারও প্রয়োজন হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা এই রোগে স্বাভাবিক, সুতরাং প্রত্যহ বা একদিন অন্তর পিচকারী দিয়া বা ডুশ্ (enema) দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কোনো কোনো রোগী প্রস্রাব করিতে অসমর্থ হওয়ায় উহাদের মূত্রাশয় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তখন ক্যাথিটারের দ্বারা মধ্যে মধ্যে প্রস্রাব করাইয়া দিবার আবশ্যক হয়। এই সকল সাধারণ ব্যবস্থা প্রত্যেক রোগীর পক্ষেই প্রয়োজন।

গরম জলের স্পঞ্জিং করা এই রোগের পক্ষে অতি উত্তম ব্যবস্থা। অধিকাংশ বিজ্ঞ চিকিৎসক ইহার অনুমোদন করেন। স্পঞ্জিং

করিবার জল অল্পমাত্র উষ্ণ হইলে চলিবে না,—যতটা পর্য্যন্ত সহ্য করা যায় সেইরূপ রীতিমত গরম জলে স্পঞ্জিং করা আবশ্যক। প্রত্যহ দুইবার করিয়া এইরূপ গরম জলে ১০ মিনিট যাবৎ গা মোছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে মস্তিষ্ক কিছু স্নিগ্ধ হয়, কারণ ইহার দ্বারা মস্তিষ্ক হইতে কতকটা রক্ত নীচে নামিয়া আসে; সেইজন্য ইহাতে রোগীর অস্থিরতা কমায় এবং জরও কিছু নরম পড়ে। শিশুদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। সুবিধা হইলে শিশুদের একটি গরম জলের বাথের মধ্যে (hot bath) গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ১০।১৫ মিনিটকাল রাখা যাইতে পারে। বাথের জল প্রথমে অল্প গরম রাখিয়া ক্রমে ক্রমে গরম জল মিশাইয়া সহ্যমত উহার তাপ বৃদ্ধি করিতে হয়। মস্তিষ্করোগ মাত্রেই গরম জলের বাথ দেওয়া বিশেষ উপকারী।

ঔষধাদির দ্বারা এই রোগে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ অধিকাংশ স্থলেই নিয়মিত ঔষধ খাওয়ানো অসম্ভব হয়। কেহ কেহ ইহাতে **টিঞ্চার বেলেডোনা** ৪ ফোঁটা ও **লাইকার হাইড্রার্জ পারক্লোরাইড্** ৩০ ফোঁটা,—একত্রে মিশাইয়া একটি মিকশ্চার তিন ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করেন। কেহ কেহ ইহাতে অধিক মাত্রায় **ইউরোট্রোপিন্** দিবার (দৈনিক ৬০ গ্রেন) ব্যবস্থা করেন। শুনা যায় এই ঔষধ মুখ দিয়া খাওয়াইলেও অনেক সময় মেনিঞ্জিস্ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায়। কেহ কেহ বলেন ঘাড়ে হাইড্রার্জের মলম মালিশ করিলে (Hydrarg. oleate 5% in Lanoline) ইহাতে কিছু উপকার হয়। কেহ বা ইহাতে **ইউরোট্রোপিন্** ইন্ট্রাভেনাস্ ইন্জেকশন (40% 5 c.c.) দিয়া থাকেন, কেহ বা **ট্রাইপাফ্লেভিন্** ইন্ট্রাভেনাস্ ইন্জেকশন (½% 5 c.c.) দিয়া থাকেন। ট্রাইপাফ্লেভিন্ও রক্ত হইতে মেনিঞ্জিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে, তাহার প্রমাণ এই যে ইন্জেকশন দিবার পর মেরুদণ্ডের ভিতরকার জল উহার দ্বারা রঙীন হইয়া যায়।

কেহ কেহ ইহার সূত্রপাতে **সোয়ামিন** ইন্জেকশন (২ গ্রেন মাত্রায়) প্রয়োগ করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন, প্রথম হইতে সোয়ামিন দিলে ইহা বেশী বাড়িতে পারে না।

এই রোগে মাথার এবং ঘাড়ের যন্ত্রণায় রোগী প্রায়ই অতিশয় অস্থির হইয়া পড়ে, সুতরাং চিকিৎসকের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে উহার কিছু উপশম করা যায়। এ জন্য **ব্রোমাইড্** (Pot. Bromide) ও **ক্লোর্যাল্** (Chloral Hydras) একত্রে প্রয়োগ করা উত্তম ব্যবস্থা। গুডল্ (Goodall) নিম্নলিখিত প্রেস্ক্রপ্শনটির বড় সুখ্যাতি করেন—

পটাস্ ব্রোমাইড্ (Pot. Bromide)—	১২০ গ্রেন
ক্লোর্যাল্ হাইড্রেট্ (Chloral Hydras)—	১২০ গ্রেন
ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা (Cannabis indica)—	১ গ্রেন
হায়োসিয়েমাস্ (Hyoscyamus)—	১ গ্রেন
সিরাপ্ (Syrup)—	উপযুক্ত পরিমাণ
জল (Aqua)—	১ আউন্স

এই ঔষধের মাত্রা ৩০ ফোঁটা করিয়া। একটি চামচে অল্প জল লইয়া উহাতে ৩০ ফোঁটা ঔষধ মিশাইয়া প্রথমে অর্দ্ধঘণ্টা বা একঘণ্টা অন্তর উহা উপর্য্যুপরি খাওয়াইতে থাকা উচিত, যতক্ষণ না যন্ত্রণার নিবারণ হয়। পুনরায় কষ্ট হইলে পুনরায় উহা প্রয়োগ করিতে হয়। শিশুদের পক্ষে উহা ১০ ফোঁটা হইতে ১৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত মাত্রায় দেওয়া যায়।

যাহাকে ঔষধ খাওয়ানো অসম্ভব এবং যে রোগী অতিমাত্রায় উত্তেজিত, তাহাকে **লুমিন্যাল্** (Luminal) ইন্জেকশন দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা। ইহাতে রোগী অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। এই ইন্জেকশন প্রত্যহ দুইটি পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। যতদিন রোগের অবস্থা প্রবল থাকে ততদিন পর্য্যন্ত ইহা দিতে পারা যায়।

অতি অল্প মাত্রায় **মর্ফিয়া** ইন্জেকশন দিলেও ইহাতে কষ্টের এবং উত্তেজনার উপশম হয়। কেহ কেহ বলেন মর্ফিয়ার সহিত **আর্গট্** (Aseptic Ergot) মিশাইয়া দিলে উহার ফল অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। আর্গট্ হার্টকেও সবল করে। তবে রক্তের চাপ (blood pressure) বেশী থাকিলে ইহা দেওয়া উচিত নয়। অতিরিক্ত শিরঃপীড়ার জন্য ললাটের পার্শ্বে **জোঁক** বসাইয়া দিলেও কিছু উপকার হয়।

লাম্বার পাংচার (Lumbar puncture)—মেনিঙ্গাইটিস মাত্রেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা লাম্বার পাংচার করিয়া মেরুদণ্ডের জল বাহির করা এবং সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া মেরুদণ্ডের ভিতর উপযুক্তরূপ সিরাম প্রয়োগ করা। মেনিঙ্গাইটিস্ হইয়াছে বুঝিলে কালবিলম্ব না করিয়া সর্ব্বাগ্রে ইহারই ব্যবস্থা করা উচিত। এই রোগে যত সত্বর সিরাম প্রয়োগ করিতে পারা যায় ততই রোগীর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা থাকে, যত বিলম্ব হয় ততই সে সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

শিক্ষা না থাকিলে লাম্বার পাংচার করিতে পারা যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কিছুই কঠিন নয়। কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিখিয়া লইলে, এবং দুই-একবার চেষ্টা করিলে সকলেই এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারেন। ছুঁচটি কোন স্থানে প্রবেশ করাইতে হইবে, কোন দিক লক্ষ্য করিয়া তাহা চালনা করিতে হইবে, এবং কতদূর পর্য্যন্ত তাহা চালিত করা প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধে ধারণা জন্মিয়া গেলেই ইহা অনায়াসে করা যাইতে পারে। আজকাল মেনিঙ্গাইটিসের প্রকোপ যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে চিকিৎসক মাত্রেরই এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লওয়া উচিত, নতুবা পল্লীগ্রামে যদি এই রোগ হয় এবং চিকিৎসক যদি উহার ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তবে রোগী উপযুক্ত চিকিৎসা পাইবে না।

মেরুদণ্ডের ভিতর একটি স্থূল আবরণের মধ্যে স্পাইন্যাল্ কর্ডটি (সুষুম্না) শিথিলভাবে অবস্থিত। উহার চতুর্দ্দিকের ঐ আবরণের মধ্যে কিছু জলীয় পদার্থ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু মেনিঙ্গাইটিস্ হইলে সেই জল অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া যায়। ঐ অতিরিক্ত জলের চাপ স্পাইন্যাল্ কর্ডে এবং মস্তিষ্কের উপরে গিয়া পড়াতে নানারূপ উত্তেজনার লক্ষণ ঘটিতে থাকে, এবং উহার পরিমাণ কমাইয়া দিলে রোগীর সাময়িক উপকার হইতে পারে। বিশেষতঃ ঐ জল যখন বীজাণুকর্ত্তৃক প্রদাহের ফলেই সৃষ্ট, তখন কিছু জল বাহির করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যদি তথায় বীজাণুনাশক সিরাম প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে বীজাণুসকল ধ্বংস হইয়া প্রদাহেরও নিবৃত্তি হইতে পারে। এই সকল কারণেই লাম্বার পাংচার করা প্রয়োজন।

লাম্বার পাংচারে তিনরূপ উপকার একসঙ্গে হয়; ইহাতে মস্তিষ্কের

উপরকার চাপ কমাইয়া রোগীর উপস্থিত কষ্টের লাঘব করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে রোগটি মেনিঙ্গাইটিস্ কি না এবং উহা কি প্রকারের মেনিঙ্গাইটিস্ তাহাও চিনিতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত ইহার দ্বারা মেরুদণ্ডের মধ্যে সিরাম ইন্‌জেকশন করিয়া রোগের বিশিষ্টরূপ চিকিৎসাও করা হয়।

মেরুদণ্ড পৃথক পৃথক কশেরুকা বা ভার্টিব্রার (vertebræ) দ্বারা গ্রথিত এবং উহার প্রত্যেকটির অন্তরালে কিছু ফাঁক আছে। ঐ ফাঁকের মধ্য দিয়া মেরুদণ্ডের ভিতর ছুঁচ ঢুকাইয়া দিলে উহা স্পাইন্যাল কর্ডের আবরণ ভেদ করিয়া যে স্থানে জল জমিয়াছে (sub-arachnoid space) তথায় পৌছিতে পারে। সুষুম্না বা স্পাইন্যাল্ কর্ডটি মস্তিষ্ক হইতে লম্বমান হইয়া ১ম লাম্বার-ভার্টিব্রা পর্য্যন্ত পৌছিয়া সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু উহার আবরণটি আরো অনেক নীচে পর্য্যন্ত শূন্যভাবে লম্বমান। সুতরাং মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রদেশে (lumbar region) ছিদ্র করিলে স্পাইন্যাল্ কর্ডকে আঘাত করিবার কোনো আশঙ্কা নাই, অথচ জল নিকাশ করা অনায়াসেই সম্ভব। সেইজন্য ৩য় ও ৪র্থ, বা ৪র্থ ও ৫ম লাম্বার-ভার্টিব্রার মধ্যবর্ত্তী ফাঁকে ছুঁচ প্রবেশ করাইয়া লাম্বার পাংচার করা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

লাম্বার পাংচার করিবার জন্য স্বতন্ত্র ছুঁচ আছে। উহা সাধারণ ইন্‌জেক্‌শনের ছুঁচ অপেক্ষা অনেক মোটা এবং লম্বা। এই ছুঁচের ভিতর দিয়া যে নালিপথ আছে তাহার মধ্যে একটি শলাকা (stilette) ঢোকানো থাকে। ছুঁচ উপযুক্ত স্থানে প্রবেশ করিলে ভিতরের শলাকাটি খুলিয়া লওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নালিপথ দিয়া জল গড়াইয়া বাহির হয়। ব্যবহারের পূর্ব্বে ছুঁচটি জলে ফুটাইয়া লওয়া প্রয়োজন।

রোগী অতিরিক্ত উত্তেজিত বা চঞ্চল হইলে তাহাকে অজ্ঞান না করিয়া লাম্বার পাংচার করা কঠিন। অচৈতন্যবৎ বা শান্ত অবস্থায় থাকিলে অথবা দুই-তিন জনে চাপিয়া ধরিলে তাহার আবশ্যক হয় না। রোগীকে কাতভাবে শোয়াইয়া তাহার কোমরটি বিছানার এক প্রান্তে সরাইয়া আনিতে হয়। অতঃপর উহার পিঠ ধনুকের ন্যায় যথাসম্ভব মুড়িয়া দেওয়া দরকার, কারণ পিঠ কুব্জ হইলে ভার্টিব্রার হাড়গুলি কতকটা ফাঁক হয়। এইজন্য মাথাটি যথাসম্ভব বুকের দিকে ঝুঁকাইয়া দিয়া পা দুটি পেটের কাছে গুটাইয়া ধরিতে হয়। তৎপরে যেখানে ছুঁচ ঢুকাইতে হইবে সেই স্থানটি চিহ্নিত করিতে হয়।

কোমরের দুই পার্শ্বে দুইখানি বড় বড় বস্তির হাড় উঁচু হইয়া আছে, তাহার সর্ব্বোচ্চ সীমা-রেখা দুইটি (iliac crests) পিঠের দিক হইতে পরিষ্কার দেখা যায়;

আমরা যাহাকে কটিরেখা বলি তাহা উহার কিছু উপরে অবস্থিত। দুইদিকের ঐ দুইটি হাড়ের উপরপ্রান্ত একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা যুক্ত করিয়া ঐ রেখার নীচে ছুঁচ ঢোকানো নিয়ম। উহার অব্যবহিত নীচে মেরুদণ্ডের দুইখানি ভার্টিব্রার spine-এর মাঝে একটি ফাঁক দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ৩য় ও ৪র্থ লাম্বার ভার্টিব্রার অন্তরাল স্থান। ঐ ফাঁকের ঠিক মধ্য দিয়াই ছুঁচ ঢোকানো উচিত নয়,—উহার ½″ ইঞ্চি তফাৎ হইতে ছুঁচ ঢুকাইয়া অগ্রসর হইবার কালে তাহা ক্রমে ক্রমে মধ্যরেখায় লইয়া আসা উচিত; কিন্তু শিশুদের পক্ষে ঠিক মাঝখানেই ছুঁচ প্রবেশ করাইতে হইবে, কারণ উহাদের পক্ষে ছুঁচ অধিকদূর যাইবে না। ছুঁচের গতি হইবে কিছু তির্য্যক্‌ভাবে ভিতরের দিকে এবং উপরের দিকে (inwards and upwards). বয়স্থদের পক্ষে উহা ৩″ ইঞ্চি হইতে ৩½″ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করিবে, এবং শিশুদের পক্ষে ১½″ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। ছুঁচ প্রবেশ করাইবার সময় প্রথমে
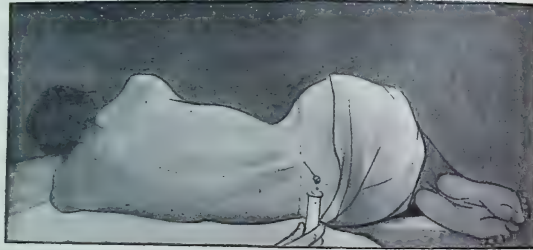
একবার অনুভব হইবে উহা মাংসমধ্যে কিছু বাধা পাইতেছে, তৎপরে হঠাৎ যেন মুক্তস্থানে গিয়া পৌঁছিল এরূপ অনুভব করিলেই বুঝিতে হইবে যে উহা জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যদি ছুঁচটি কিছুদূর গিয়া হাড়ে ঠেকিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে ভুল পথে গিয়াছে, তখন উহা ঈষৎ টানিয়া লইয়া পুনরায় কিছু ভিন্নপথ অনুভব করিয়া চালনা করিতে হইবে। এইরূপে নির্দ্দিষ্টস্থানে প্রবেশ করিলেই তারের শলাকাটি টানিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জল বাহির হইয়া আসিবে। জলের চাপ যদি অধিক থাকে তবে উহা ধারা দিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইবে, নতুবা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে থাকিবে। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে এই জল প্রতি সেকেণ্ডে এক ফোঁটা করিয়া পড়ে, কিন্তু এ-স্থলে যথাসম্ভব জল

কমাইয়া দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া যতক্ষণ না উহা প্রতি ৪ সেকেণ্ডে একফোঁটা পড়ে ততক্ষণ জল বাহির হইতে দেওয়া দরকার। মেনিঞ্জাইটিস হইলে প্রতিবারের পাংচারে প্রায় দুই আউন্স হইতে চার আউন্স পর্য্যন্ত জল বাহির হইতে দেখা যায়। জল বাহির হইয়া গেলেই অধিকাংশ রোগীকে সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে দেখা যায়, ভুলবকা নিবৃত্ত হয়, এবং কিছু কিছু জ্ঞান ফিরিয়া আসে। যতদিন না রোগের কিঞ্চিৎ লাঘব দেখা যায় ততদিন প্রত্যহ একবার করিয়া লাম্বার পাংচার করা উচিত। অতিরিক্ত মাথার যন্ত্রণা, ভুলবকা ও বমি দেখিলেই বুঝিতে হইবে লাম্বার পাংচার করা প্রয়োজন।

সিরাম প্রয়োগ—প্রয়োজন মত জল নিষ্কাশনের পর ছুঁচটি বাহির না করিয়া উহার মধ্য দিয়া **অ্যাণ্টিমেনিঙ্গোকক্কাস্ সিরাম** মেরুদণ্ডের ভিতর (intrathecal) প্রয়োগ করা উচিত। ইহাই বর্ত্তমানে মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের একমাত্র বিশিষ্ট-চিকিৎসা। আমেরিকায় ১৯০৭ সালে ফ্লেক্সনার (Flexner) এই রোগের সিরাম আবিষ্কার করিয়া জগতের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই রোগের মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৮০ %। বর্ত্তমানে সিরাম-চিকিৎসার গুণে তাহা ৩১ %-এ দাঁড়াইয়াছে। অতএব মেনিঞ্জাইটিস্ মাত্রেই সিরাম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই সিরাম স্বয়ং বীজাণুগুলির বিরুদ্ধেই ক্রিয়া করে, উহার বিষের বিরুদ্ধে নয় (antibacterial in action, not antitoxic). ইহার দ্বারা মেনিঙ্গোকক্কাই-এর সংখ্যা অনেক কমিয়া যায় এবং অনেকগুলি বিকৃত দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে শ্বেতকণিকাগুলির পক্ষে উহা গ্রাস করিবার সুবিধা হয়। এই সিরামের দ্বারা শ্বেতকণিকার সংখ্যাও অনেক বাড়িয়া যায়, সেইজন্য একবার সিরাম দিবার পর দ্বিতীয়বার লাম্বার পাংচারে যে জল নির্গত হয় তাহা প্রায়ই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘোলা দেখায়।

পাংচারের ছুঁচের মুখে রবারের নল লাগাইয়া পিচকারীর সহিত তাহা যুক্ত করিয়া সিরামটি তন্মধ্যে ঢালিয়াই হউক, অথবা পিচকারীতে ভরিয়া লইয়া তাহা একেবারে ছুঁচের মুখে যুক্ত করিয়া দিয়াই হউক, সুবিধাজনক ব্যবস্থার দ্বারা সিরামটি অতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইতে হইবে। তাড়াতাড়ি সিরাম প্রবেশ করাইয়া দিলে বিপদ ঘটিতে পারে। প্রতি মিনিটে প্রায় ১ সি. সি. পরিমাণ হিসাবে সিরাম মেরুদণ্ডের মধ্যে সঞ্চালিত করিতে হইবে।

যতটা জল বাহির করা হইয়াছে, সিরামের মাত্রা তাহা অপেক্ষা কিছু কম থাকা দরকার। সাধারণতঃ প্রতিবারে ২০।২৫ সি. সি. সিরাম দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রোগ কঠিন হইলে এককালীন ৪০ সি. সি. পর্য্যন্ত দিতে হয়। শিশুদিগের মাত্রাও প্রতিবারে ২০ সি. সি.। এইরূপে যতদিন না আরোগ্য লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যহ সিরাম প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ **চারদিন হইতে ছয়দিন পর্য্যন্ত** উপর্য্যুপরি সিরাম দেওয়াই ফ্লেক্সনারের বাঁধা নিয়ম, কিন্তু প্রয়োজন হইলে আরো বেশীদিন দিতে কোনো বাধা নাই। কয়েকদিনে সর্ব্বসমেত ১০০ সি. সি. পর্যন্ত সিরাম মেরু-দণ্ডের মধ্যে অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে, এবং কোনো কোনো স্থলে ২০০ সি. সি. প্রয়োগের পর রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইন্‌জেকশন দিবার পূর্ব্বে সিরামটি আম্পুলসমেত গরম জলের মধ্যে বসাইয়া কিছু গরম করিয়া লওয়া উচিত। সিরাম দিবার সময় সাধারণতঃ বিশেষ কিছু বিপত্তি ঘটে না, কিন্তু যদি দেখা যায় যে রোগী হঠাৎ নিতান্ত অস্থির বোধ করিতেছে, দ্রুতবেগে শ্বাস লইতেছে, অথবা অজ্ঞান হওয়ার মত ভাব দেখা যাইতেছে, তবে তৎক্ষণাৎ সিরাম দেওয়া বন্ধ করা উচিত। তখন রোগীর মাথার দিক উঁচু করিয়া পায়ের দিক নীচু করিয়া দিতে হইবে, এবং তেমন প্রয়োজন দেখিলে তৎক্ষণাৎ অ্যাড্রেনেলিন ও অ্যাট্রোপিন একত্রে মিলাইয়া চর্ম্মনিম্নে বা শিরার মধ্যে ইন্‌জেকশন করিতে হইবে। এরূপ প্রয়োজন দৈবাৎ হইলেও তাহার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

রোগের প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র মেরুদণ্ডে সিরাম প্রয়োগ করাই যথেষ্ট নয়, কখনো কখনো উহার সঙ্গে রক্তশিরার মধ্যেও (intravenous) স্বতন্ত্র ভাবে সিরাম দেওয়া প্রয়োজন হয়; ইহার কারণ প্রথম অবস্থায় কিছু কিছু বীজাণু রক্তের মধ্যেও অবস্থান করে। বিশেষতঃ সেপ্‌টিসিমিয়ার লক্ষণ যদি কিছুও থাকে (গায়ে লাল লাল র‍্যাশ্ ও গাঁঠে ব্যথা দেখিলে), তবে এইরূপ অতিরিক্ত ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশন প্রয়োগ করা নিশ্চয় কর্ত্তব্য। ইহা রোগের প্রথম অবস্থাতেই প্রয়োজন, পরবর্ত্তীকালে ইহার আবশ্যক হয় না। মেরুদণ্ডের ইন্‌জেকশনের (intrathecal) মাত্রা অপেক্ষা ইন্‌ট্রাভেনাস ইন্‌জেকশনের মাত্রা অধিক দিতে হইবে। উহা এককালীন ৪০ সি. সি. পর্য্যন্ত

প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সেপ্‌টিসিমিয়া-যুক্ত রোগ হইলে ইন্‌ট্রাভেনাস সিরাম মোটের উপর ৪০০ সি. সি. পর্য্যন্তও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সিরামঘটিত বিপত্তি (anaphylaxis) নিবারণের জন্য ঐ সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে ক্যাল্‌সিয়াম প্রভৃতি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কোন নির্দ্দিষ্ট সিরামটি কাহার পক্ষে উপকারী হইবে তাহা বলা যায় না, কারণ মেনিঙ্গোকক্কাস্ নানা টাইপের আছে এবং কোন সিরামের মধ্যে কোন টাইপ্‌টির বিরুদ্ধশক্তি বলবান তাহা বলা যায় না। অতএব একই কোম্পানীর সিরাম নিত্য ব্যবহার করিতে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত, প্রদত্ত সিরামে কোনো উপকার হইতেছে কি না। যদি উপকার হয় নাই বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ উহা বদল করিয়া অন্য কোম্পানীর সিরাম ব্যবহার করা আবশ্যক। কোনটিতে কাহার উপকার হইতেছে তাহা দুই-এক ইন্‌জেকশনেই বুঝিতে পারা যায়। দেশী সিরাম অপেক্ষা বিলাতী সিরাম যে ভাল এ কথাও বলা যায় না, কারণ দেশী সিরামের দ্বারাও এই রোগ অনেক আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। কোথাও কোথাও দেশী সিরামে ভাল ফল হইয়াছে, কোথাও বা বিলাতী সিরামে ভাল ফল হইয়াছে। দেশী সিরাম অপেক্ষাকৃত টাট্‌কা পাওয়া যায়, সুতরাং প্রথমে তাহাই প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত।

পোলিওমায়েলাইটিস্

Acute Anterior Poliomyelitis

এই রোগ কেবল শিশুদেরই হয়। ইহাতে এমন এক নির্দ্দিষ্ট প্রকার জর হয় যাহার অব্যবহিত পরেই একটি বা একাধিক অঙ্গ বিকল এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত (paralysis) হইয়া যায়। ইহাও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মত সংক্রামক রোগ এবং নাকের মধ্য দিয়াই ইহার সংক্রমণ প্রবেশ করে। এ রোগ আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে ছিল না, ১৯০৬ সাল হইতে ইহা লক্ষিত হইতেছে, এবং ১৯১৬ সাল হইতে ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। তবে অন্যান্য দেশে ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও দেখা গিয়াছে।

ইহা অত্যন্ত অল্পবয়স্কদের ব্যাধি। দুই বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যেই এ রোগ হইয়া থাকে, তবে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্তও ইহা কখনো কখনো দেখা যায়। প্রায় গ্রীষ্মকালের শেষভাগে ইহা উপর্য্যুপরি কয়েক স্থানে ঘটিতে দেখা যায়, কিন্তু শীঘ্রই ইহার সংক্রমণ আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়।

ফ্লেক্সনার (Flexner) ইহার বীজ আবিষ্কার করিয়াছেন। কাল্‌চারে ইহার কলোনির (colony) চিহ্ন লক্ষিত হইলেও মাইক্রোস্কোপের দ্বারা এই বীজ দেখা যায় না। রোগীর নাকের মধ্য হইতে রস লইয়া তাহা বানরের মস্তিষ্কে অথবা নাকে লাগাইয়া দেওয়াতে তাহারো এই রোগ জন্মিতে দেখা গিয়াছে। এ রোগ জীব-জন্তুর মধ্যেও ঘটিয়া থাকে, তাহার ফলে উহাদের পিছনের পা চিরকালের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। বয়স্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ইহা ঘটিতে পারে না, কারণ তাহাদের নাকে এমন কোনো প্রতিরোধী পদার্থ আছে যাহাতে ইহার বীজ নষ্ট হয়। ইহার বীজ প্রথমে নাক হইতে স্নায়ুর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া মস্তিষ্কের piamater-এ প্রদাহ উপস্থিত করে, এবং তথা হইতে স্পাইন্যাল কর্ডের মধ্যেও প্রবেশ করে।

লক্ষণাদি

এই রোগের পর্য্যায়ক্রমে তিনরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে :—

(১) ইহার প্রথম লক্ষণ হঠাৎ জর, মাথার যন্ত্রণা, এবং সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। পীড়িত শিশুকে ছুঁইতে গেলেই চীৎকার করিয়া কাঁদে, এমন কি দূর হইতে কাহাকেও আসিতে দেখিলে নাড়াচাড়ার ভয়ে কাঁদিয়া ওঠে। কাহারো কাহারো প্রথম অবস্থায় কিছু সর্দ্দির বা উদরাময়ের লক্ষণও দেখা যায়। ইহাতে জর অবস্থাতেও প্রচুর ঘাম হইতে থাকে। জর ১০৩° বা ১০৪° পর্য্যন্তও ওঠে এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে লাগিয়া থাকে। কিন্তু কাহারো কাহারো সামান্যই জর হয় এবং উহা বিশেষ লক্ষিত হয় না।

(২) জর হইবার ৩।৪ দিনের মধ্যেই কিছু কিছু মস্তিষ্ক-লক্ষণ (meningitic stage) প্রকাশিত পাইতে দেখা যায়। রোগী হাত-পা খিঁচাইতে থাকে, ঘাড় শক্ত করিয়া থাকে, অসাড়ে মলমূত্রও ত্যাগ করে, এবং কখনো কখনো অচৈতন্যবৎ থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এই ভাব কাটিয়া যায়।

(৩) প্রায় এক সপ্তাহ পরে জর ও অন্যান্য লক্ষণ কমিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষিত হয় যে অকস্মাৎ একটি বা একাধিক অঙ্গ অবশ হইয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত (flaccid paralysis) হইয়াছে। শিশু সেই অঙ্গটি ইচ্ছামত আর চালনা করিতে পারে না। ঐ অঙ্গের চেষ্টাবহা (motor) স্নায়ু বিকল হইয়া তথাকার মাংসপেশীর আকুঞ্চন শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় (loss of tendon-reflex)। সাধারণতঃ অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা নিম্ন অঙ্গই এই প্রকারে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়, এবং পায়ের নীচের দিক অপেক্ষা উরুদেশই অধিকাংশ স্থলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। পক্ষাঘাত হইবার কিছুদিন পরে ঐ অঙ্গে আর কোনো ব্যথা থাকে না, উহা অবশের মত পড়িয়া থাকে। মলমূত্র বহুদিন পর্য্যন্ত অসাড়ে ত্যাগ হইতে থাকে। ক্রমে ঐ অঙ্গটি শুকাইয়া গিয়া (atrophy) অবশেষে শক্ত হইয়া মুড়িয়া যায়, তখন উহা টানিয়া সোজা করা যায় না। চেষ্টা করিলে অনেকের এই পক্ষাঘাত আরোগ্য হয়, অনেকের হয় না। চিকিৎসায় উন্নতি যাহা হইবার তাহা ছয়

মাসের মধ্যেই হয়, ছয় মাস কাটিয়া গেলে আর কিছু উন্নতির আশা করা যায় না।

এই রোগে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটে না, তবে বক্ষের মাংসপেশীসকল আক্রান্ত হইলে নিঃশ্বাসরোধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যুও হইতে পারে। রোগীর বয়স যত বেশী হয় মৃত্যুসম্ভাবনা তত অধিক।

ইহাতে মুখের স্নায়ুবিশেষ (facial nerve) আক্রান্ত হইয়া কখনো কখনো মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত (facial paralysis) হয়, কখনো বা চোখের স্নায়ুবিশেষ (sixth nerve) আক্রান্ত হইয়া রোগী টেরা হইয়া যায়।

প্রথম অবস্থায় এই রোগকে প্রায়ই রিউম্যাটিক্ ফিবার বলিয়া ভ্রম হয় অথবা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাও মনে হইতে পারে।

চিকিৎসা

আমেরিকায় পোলিওমায়েলাইটিসের বীজ হইতে সিরাম প্রস্তত করাইয়া তাহার ইন্‌জেকশন দিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে এবং পক্ষাঘাত নিবারণ করা সম্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশে এরূপ কোনো সিরাম এখনও পাওয়া যায় নাই। ফ্লেক্স্‌নার দেখাইয়াছেন যে এই রোগে ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছে এমন কোনো শিশুর শিরা হইতে রক্ত লইয়া উহার সিরাম (১০ সি. সি.) যদি আক্রান্ত রোগীকে প্রথম অবস্থা হইতে ইন্‌জেকশন করা যায় তবে উহাতে পক্ষাঘাত নিবৃত্ত হইতে পারে।

ঔষধ হিসাবে অধিক মাত্রায় **ইউরোট্রোপিনই** ইহার পক্ষে উত্তম। শিশু ছোট হইলেও ৭৷৷০ গ্রেন মাত্রায় উহা ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়। তবে প্রস্রাব যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত, এবং **অ্যাল্‌কালাইন মিকশ্চার** প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া উচিত। উহার সহিত **সোডা স্যালিসিলেট্** বা **স্যালিসিন্** (Salicin) দেওয়া যায়।

ব্যথার জন্য প্রথম হইতে অঙ্গটিকে স্প্লিণ্ট্ (splint) দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলেই ভাল হয়, কারণ বিশ্রাম পাইলেই উহার ব্যথা কমে। তদ্ব্যতীত

কখনো কখনো অল্প মাত্রায় অ্যাস্‌পিরিন দেওয়া যায়। ঘুমের জন্য ব্রোমাইড ও ক্লোর‍্যাল্ হাইড্রেট্ একত্রে দিতে হয়। কেহ কেহ ইহাতে **লাম্বার পাংচার** করিয়া থাকেন, তাহাতেও যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইতে পারে।

পক্ষাঘাতের সূত্রপাত হইতেই নির্দ্দিষ্ট অঙ্গটিকে স্প্লিণ্টে বাঁধিয়া রাখা দরকার; যতদিন ব্যথা না কমে ততদিন ইহা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। এ রোগে পা মুড়িয়া গিয়া ভবিষ্যতে বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা, সেইজন্য উহা সোজা করিয়া (Long Thomas splint দিয়া) বাঁধিয়া রাখাই আবশ্যক। এ-সময় মালিশ ইত্যাদি করা উচিত নয়। প্রত্যহ একবার করিয়া গরম লবণ-জলে অঙ্গটি কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা উত্তম। ব্যথা একেবারে দূর হইলে মালিশ দিতে হয় এবং প্রত্যহ স্প্লিণ্ট্ হইতে খুলিয়া লইয়া অঙ্গটিকে কিছুক্ষণ চালনা (passive exercise) করিতে হয়। মালিশের সঙ্গে Radiant heat-রশ্মি প্রয়োগ করা উত্তম ব্যবস্থা। আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতেও কিছু উপকার হয়।

এন্‌কেফালাইটিস্

Epidemic Encephalitis ;
Encephalitis Lethargica.

এই রোগটিও পূর্ব্বে জানিত ছিল না, ১৯১৮ সাল হইতেই ইহা প্রথম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঐ বৎসরের প্রবল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিকের সময় ইউরোপে ইহা প্রথম লক্ষিত হয়; ভিয়েনার জনৈক চিকিৎসক (Von Economo) ইহার প্রথম উল্লেখ করেন এবং ইহার নামকরণ করেন। তৎপরে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা দেখা যাইতেছে; আমাদের দেশেও অনেকে ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। রাঁচি মেণ্ট্যাল্ হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ ধাঞ্জিভাই (Dhunji-bhoy) বলেন যে এই রোগ হইতে মানসিক বিকারপ্রাপ্ত হইয়া অনেক রোগী বাংলা দেশ হইতেও তাঁহার হাঁসপাতালে গিয়াছে।

আপাতঃ-দৃষ্টিতে এই রোগ অনেকটা মৃদুভাবের ক্রনিক মেনিঞ্জাইটিসের অনুরূপ, কিন্তু ইহাতে রোগীর মানসিক বৃত্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া জড়-ভরতের মত হইয়া যায়, সেইজন্যই ইহার ঐরূপ নাম। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বহুদিন পর্য্যন্ত ভুগিয়া যদিও আরোগ্য লাভ করে, তথাপি উহার কিছু মস্তিষ্ক-বিকৃতির চিহ্ন অধিকাংশ স্থলেই চিরদিনের জন্য থাকিয়া যায়।

ইহার কোনো বীজাণু অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি বোঝা গিয়াছে যে ইহা কোনো প্রকার অদৃশ্য ভাইরাস্ বা রোগবীজ কর্ত্তৃক উৎপন্ন একরূপ সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগে মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্কের সামান্য অংশ লইয়া উহা অস্ত্রোপচারের দ্বারা বানরের মস্তিষ্কের সহিত সংস্পর্শ করাইয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে বানরেরও ঐ রোগ জন্মায়।

মস্তিষ্কের মধ্যভাগই (midbrain and pons) এই রোগে বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা ১০ বৎসর বয়সের পর হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে অধিক হইতে দেখা যায়, এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষই ইহাতে বেশী আক্রান্ত হয়।

বৈজ্ঞানিকগণের অনুমান যে এই রোগের বীজও নাসিকা-পথে সংক্রামিত হয়। তাঁহারা বলেন সর্দ্দির দ্বারা নাসিকাঝিল্লী পূর্ব্ব হইতে ক্ষত হইয়া থাকিলে ইহার বীজ তথায় সহজে উপ্ত হইতে পারে।

লক্ষণাদি

ইউরোপের তুলনায় আমাদের দেশে এখনও এ-রোগ যথেষ্ট কম। তথাপি যদি বা কখনো দেখা যায় তখন এই রোগ বলিয়া উহাকে প্রথমে বুঝিতেই পারা যায় না। প্রথম অবস্থায় ইহা চিনিতে পারা সম্ভব নয়। প্রারম্ভে যেরূপ মৃদুভাবে সূত্রপাত হয় তাহাতে ইহাকে কোনো কঠিন রোগ বলিয়া মনেই হয় না। ইহার প্রথম লক্ষণ মাথা-ধরা ও সেই সঙ্গে অল্প অল্প জর। তদ্ব্যতীত বমির লক্ষণ, গায়ে ব্যথা, গলায় ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, এবং কিছু কিছু সর্দ্দিও উহার সহিত দেখা যায়। তখন দেখিলেই মনে হয় ইহা সম্ভবতঃ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা টাইফয়েড হইবে। এইপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেলে জর ছাড়িয়া যায়, কিন্তু তাহার পর এমন কয়েকটি অদ্ভুত লক্ষণ দৃষ্ট হইতে থাকে, যাহাতে বোধ হয় রোগীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিতেছে। একটি লক্ষণ ক্রমশই স্পষ্টতর হইয়া ওঠে, তাহা আলস্যজড়িত একপ্রকার নিশ্চেষ্টতার ভাব (lethargy)। রোগী কিছুমাত্র নড়িতে চায় না, অনেকক্ষণ একইভাবে মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে। সে খাইতে চায় না, কোনো কথা বলে না, চাহিয়াও দেখে না, সর্ব্বদা চিৎ হইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া নিস্পন্দের মত অবস্থান করে। মনে হয় ঘুমাইতেছে,—কিন্তু ডাকিলে সাড়া মেলে, প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর মেলে, জোর করিয়া খাইতে বলিলে নির্ব্বিকার ভাবে খায়, এবং পুনরায় চোখ বুজিয়া ঘুমায়। পুনরায় ডাকিলে পুনরায় জাগে, হয়তো চোখ মেলিয়াই হাসে, এমন ভাব দেখায় যেন পরম সন্তুষ্ট, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘুমায়। ইহা ঠিক ঘুম নয়, একপ্রকার মোহের অবস্থা। ইহাই এ রোগের প্রধান লক্ষণ।

ইহাতে কাহারো কাহারো হিক্কা হইতে দেখা যায়। এই হিক্কা শেষ পর্য্যন্ত আরোগ্য করা কঠিন হয়। এই রোগেও রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়।

রোগ বাড়িতে থাকিলে রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখন আর ডাকিয়াও তোলা যায় না। কাহারো কাহারো হঠাৎ কিছু বিপরীত ভাব দেখা যায়। তখন সে কখনো বা হাসে, কখনো অনর্থক চীৎকার করে। কখনো বা ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে অবশেষে নিস্তেজ হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। এই সকল রোগীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে তাহারা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া চীৎকার করে এবং পরে সমস্তদিন পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায় (inversion of the normal sleep rythm)।

রোগীর মুখের আকৃতিও ক্রমশঃ একপ্রকার নির্ব্বিকার ভাবশূন্যবৎ (masked) হইয়া পড়ে। চোখের উপরকার পাতা প্রায়ই ফুলিয়া (ptosis) থাকে, সেইজন্য ভালরূপে চোখ মেলিয়া চাহিতে পারে না। কখনো কখনো চোখ অর্দ্ধনিমীলিত অবস্থায় থাকে। তদ্ভিন্ন চোখের স্নায়ু বিকল (3rd.-nerve paralysis) হওয়াতে দুই তারকার দুইদিকে দৃষ্টি, ও তজ্জন্য এক বস্তুর দুইটি প্রতিবিম্ব দেখা (diplopia) এবং টেরা ভাবও (squint) লক্ষিত হয়। দৃষ্টিশক্তিও ইহাতে কমিয়া যাইতে দেখা যায়।

রোগ মৃদু হইলে অচৈতন্য অবস্থা ক্রমে ক্রমে কাটিয়া যায়। কিন্তু কঠিন হইলে দুই এক মাস পর্য্যন্ত রোগী ঐ ভাবেই পড়িয়া থাকে, তৎপরে অনেকেরই মৃত্যু হয়। ইহার মৃত্যুসংখ্যা শতকরা প্রায় কুড়ি।

যাহারা আরোগ্য হয় তাহারা রোগের কোনো কথাই স্মরণ করিতে পারে না। আরোগ্যের পর রোগীর উচ্চারণের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে প্রায়ই দেখা যায়। সে বাধিয়া বাধিয়া এক-একটি কথা উচ্চারণ করে, একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলিতে পারে না; কথাগুলিও স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না, কিছু বাঁকা বাঁকা জড়ানো ভাব থাকে। তদ্ব্যতীত আরোগ্যের পরে কেহ বা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠে, কাহারো বা চিরদিনের জন্য মস্তিষ্কবিকৃতি অথবা অঙ্গহানি থাকিয়া যায়।

কখনো কখনো এমনও হয় যে প্রথম জ্বরের সময় উহার সহিত মস্তিষ্ক-রোগের কোনোই চিহ্ন থাকে না, এবং দুই তিন সপ্তাহ সাধারণ ভাবে জ্বর ভোগ হইয়া উহা আরোগ্য হইয়া যায়। তখন উহা অন্য কোনো সাধারণ ব্যাধিরূপেই ধার্য্য করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু তাহার ছয় মাস বা এক বৎসর পরে

মস্তিষ্কবিকৃতি ও উন্মাদ রোগের লক্ষণ সকল প্রথম দেখা দিতে থাকে এবং নানারূপ বিকলাঙ্গতার লক্ষণও তৎসঙ্গে বর্ত্তমান থাকে।

পার্কিন্‌সোনিয়ান্ সিন্‌ড্রোম্—এন্‌কেফালাইটিস্ রোগের পরিণতিতে কাহারো কাহারো যে একপ্রকার বিশিষ্টরূপ বিকৃতি ঘটে, তাহাই ঐ নামে উক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তিষ্ক-বিকৃতি তো হয়ই, সেই সঙ্গে শরীরও বিচিত্রভাবে বিকলাঙ্গ হইয়া যায়। উহার মুখের ভাবটাই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র। মুখে যেন বুদ্ধিমত্তার কোনো আভাস মাত্র নাই, সর্ব্বদাই মুখের উপর তেল চক্‌চক্ করে, ঠোঁট দুটি পৃথক হইয়া থাকে, এবং কষ্ দিয়া অনবরত লালা ঝরিতে থাকে। তদ্ব্যতীত শরীর সর্ব্বদা নুইয়া থাকে, ঘাড় এক দিকে হেলিয়া থাকে, হাতদুটি নিত্যই সুমুখের দিকে আড়ষ্টবৎ কঠিন হইয়া থাকে, রোগী পা শক্ত করিয়া মাটিতে ঘষিয়া বাধাগ্রস্তের মত থামিয়া থামিয়া চলে, এবং এইরূপ বিকৃতি চিরকালের জন্য থাকিয়া যায়। ইহারই নাম Parkinsonian syndrome।

চিকিৎসা

এ রোগের এখনও কোনো বিশেষ চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নাই। **ইউরোট্রোপিন** অধিক মাত্রায় খাইতে দেওয়া এবং ইন্‌জেকশন দেওয়াই উপস্থিতমত উহার প্রচলিত চিকিৎসা। হাতের ও পায়ের খিঁচুনি থাকিলে **ম্যাগ্ সাল্‌ফ্** (4 c. c. of 25% solution, intramuscular) প্রত্যহ ইন্‌জেকশন দিতে হয়। ইহা ব্যতীত লক্ষণানুযায়ী অন্যান্য চিকিৎসাও করিতে হয়। মাথায় সর্ব্বদা বরফ দেওয়া উচিত। রোগীকে প্রত্যহ (২ বার করিয়া) গরম জলের বাথ্ দেওয়া উচিত, এবং মুখ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। পুষ্টিকর পথ্য বলপূর্ব্বক খাওয়ানো প্রয়োজন। অস্থিরতা থাকিলে ব্রোমাইড দেওয়া উচিত।

এই রোগের পরবর্ত্তী চিকিৎসা হিসাবে অঙ্গ-শৈথিল্যাদির জন্য **টিঞ্চার বেলেডোনা** উত্তম ঔষধ। প্রতি মাত্রায় ১৫ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ ইহা ৪৫ ফোঁটা পর্য্যন্তও দেওয়া চলে। শেষ আরোগ্যের মুখে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি উপকারী।

পার্কিনসোনিয়ান্ অবস্থার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিকিৎসা **হায়োসিন্ হাইড্রোব্রোমাইডের** (Hyoscine hydrobrom.) প্রাত্যহিক ইন্‌জেকশন। ধাঞ্জিভাই বলেন ইহা এই অবস্থার পক্ষে স্পেসিফিক্ ঔষধ। প্রথম কয়েক দিন ১/১০০ গ্রেন মাত্রায় দিয়া তৎপরে ইহা ১/৫০ গ্রেন মাত্রায় একটি করিয়া ইন্‌জেকশন প্রত্যহ প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধের দোষ কাটাইবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে সপ্তাহে একটি করিয়া **পাইলোকার্পিন নাইট্রেট** ১/১০ গ্রেন মাত্রায় ইন্‌জেকশন দিতে হয়। এইরূপ নিয়মে ছয়মাস কাল ইন্‌জেক্শন দিলে এই অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। ইহা দিতে দিতে রোগীর মুখের ভাব ফিরিয়া আসে এবং শরীরও কতকটা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রত্যহ আহারের পর এই ইন্‌জেকশন দেওয়া উচিত।

বর্ত্তমানে এ রোগ আমাদের দেশে কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে বলিয়া এস্থলে ইহার উল্লেখ করা হইল।

বসন্ত রোগ

Small Pox

(বসন্ত রোগ সম্বন্ধে এই অধ্যায়টি স্বর্গীয় ডাঃ লালবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের লেক্চার অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল, এবং তিনি জীবিতকালে ইহা স্বয়ং দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।)

আমাদের দেশে অনেকের বদ্ধমূল ধারণা যে বসন্ত প্রভৃতি রোগ ডাক্তারি চিকিৎসার গণ্ডীর বাহিরে। বসন্তের গুটিকা যেই দেখা দেয় অমনি ডাক্তার

স্বর্গীয় ডাঃ লালবিহারী গাঙ্গুলী

ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহার কি কোনো চিকিৎসা নাই? পৃথিবীর সকল দেশেই এ রোগ হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বত্র

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই তাহার চিকিৎসা করা হয়। কেবল আমাদের দেশেই তাহার ব্যতিক্রম কেন, আর চিকিৎসকরাও নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রশ্রয় দেন কেন? বর্ত্তমান যুগে ঐ সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই রোগ সম্বন্ধেও যে নানারূপ বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে তাহা সকলকে জানানো উচিত ও তদ্দ্বারা মানুষকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে সাধ্যমত রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহা চিকিৎসকেরই কাজ।

এই ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বদেশে মহামারীর সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহা 'মসূরিকা' নামে খ্যাত; মহর্ষি আত্রেয় ইহাকে "জনপদোধ্বংসন্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও "প্রদুষ্ট পবনোদক" হইতে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চীনদেশে এবং আরবদেশেও খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ইহার প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া জানা যায়। সম্ভবতঃ পূর্ব্বদেশ হইতে ইহা ক্রমশঃ পশ্চিমদেশে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে। ইউরোপে পূর্ব্বে Great Pox বলিলে উপদংশ রোগ বুঝাইত, এবং বসন্তের গুটিকা দেখিতে তাহার অনুরূপ বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হয় Small Pox।

এরূপ সর্ব্বব্যাপী প্রাচীন সংক্রামক ব্যাধি বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিগুলির আচরণ লক্ষ্য করিলে সাধারণতঃ দেখা যায় যে দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বাচন বিষয়ে প্রত্যেকটির কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে, কিন্তু বসন্ত রোগের কোনোরূপ বাচ-বিচার নাই। ইহা দেশ ও পাত্র নির্ব্বিশেষে সংক্রামিত হইয়া থাকে। তবে ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট কাল আছে; শীতের শেষভাগে এবং বসন্তাগমনের সঙ্গে ইহার প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়, সেইজন্যই চলিত কথায় ইহাকে বসন্ত-রোগ বলা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য সময়ে যে মোটেই ইহা দেখা যায় না এমন নয়।

এই রোগ সর্ব্বব্যাপী হইলেও সকল স্থানে এবং সকল বৎসরে ইহার প্রকোপ (virulence) সমান হয় না, প্রায়ই যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়। কোথাও বা ইহা মৃদু, কোথাও বা অতি প্রবল। ইউরোপের অধিকাংশ স্থলে ইহার প্রকোপ এখন অতি মৃদু। জার্ম্মানির কঠোর পাহারা (quarantine)

এবং টীকা দেওয়ার অলঙ্ঘনীয় আইনকানুনের ফলে তথায় এ রোগ এখন একেবারে নাই বলিলেই চলে। দক্ষিণ আমেরিকাতে ইহা এতই নিস্তেজ যে ইহাতে মৃত্যু মোটেই নাই, এবং ইহার প্রকৃতিও তথায় অন্যরূপ; এমন কি নামের অমর্য্যাদা হয় বলিয়া তথায় অন্যরূপ নাম দিয়া ইহাকে alastrium বা 'দুধে বসন্ত' বলা হয়। কিন্তু আফ্রিকাতে এবং আমাদের দেশে ইহার প্রকোপ সময়ে সময়ে অতিশয় ভয়ানক। কেহ কেহ বলেন সূর্য্যের তাপ যে দেশে যত প্রখর, বসন্ত রোগের তেজও সে দেশে তত প্রখর। ওস্‌লার (Osler) বলেন, সাদা চামড়া অপেক্ষা কালো চামড়ার পক্ষেই ইহা অধিক মারাত্মক, কারণ তিনি দেখিয়াছেন যে আমেরিকায় ইহাতে শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষা কৃষ্ণাঙ্গদের মৃত্যুসংখ্যা অধিক। যাহা হউক, এই সকল নানারূপ তারতম্যের কারণ কি তাহা বলা কঠিন। আসল কথা রোগের প্রকোপ বীজের শক্তি ও রোগীর প্রতিরোধ-শক্তির উপর নির্ভর করে।

বসন্তের বীজ বা ভাইরাস্

বসন্ত রোগের বীজ আছে এ কথা আমরা সকলেই জানি এবং ইহার দ্বারা আমরা টীকাও লই, কিন্তু ইহা যে কি বস্তু সে সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছুই জানি না। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, ইহার বীজ এত সূক্ষ্ম যে তাহা অনুবীক্ষণেরও অগোচর (ultramicroscopic), এবং যে-সকল সূক্ষ্ম ছাঁকুনিযন্ত্রের দ্বারা বীজাণু প্রভৃতি ছাঁকা যায় তাহার দ্বারাও বসন্তের বীজ ছাঁকিয়া ধরা যায় না; সেইজন্য উহাকে বলা হয় 'ফিল্‌টার-পাসিং ভাইরাস্' (filter passing virus)। বসন্ত গুটিকার রস পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কোনো কোনো কোষের মধ্যে কেবল এক নূতন প্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম দেওয়া হয় Guarnieri bodies। বসন্ত ভিন্ন অন্য কোনো ব্যাধিতে এগুলি দেখা যায় না, কিন্তু ইহা কি বস্তু তাহাও ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে এক-একটি বসন্তবীজ কোনো কারণে বর্দ্ধিতায়তন হওয়াতে ঐরূপ অনুবীক্ষণ-গোচর আকারে পরিণত হইয়াছে, আবার কেহ কেহ বলেন যে বসন্ত রোগের ফলে কোনো কোনো কোষের মধ্যেই কিছু বিকৃতি ঘটিয়া এই নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

বসন্ত-বীজের সাক্ষাৎ পরিচয় না জানিলেও ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই জানি। বসন্ত-গুটিকার রসে এই অদৃশ্য বীজ নিশ্চয়ই বহু পরিমাণে থাকে,—তাহার প্রমাণ এই যে ইহার সামান্য মাত্র লইয়া কাহারো রক্তের সহিত কোনোরূপে মিশাইয়া দিলেই কালে তথায় অনুরূপ বসন্ত-গুটিকার উদ্গম হয়। এই রস কোনো খরগোসের চোখের ভিতরে সামান্য মাত্র প্রয়োগ করিলে দুই দিনের মধ্যে তথায় একটি বসন্ত গুটিকা উঠিতে দেখা যায়।

কিন্তু এই বীজ যে কেবল গুটিকাতেই আবদ্ধ থাকে তাহা নয়, রোগীর নাকের ভিতর এবং মল-মূত্র প্রভৃতিতেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, ইহা পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে। এই কারণে বসন্তের গুটিকা বাহির হইবার পূর্ব্বেও, অর্থাৎ প্রথম অবস্থা হইতেই ইহা সংক্রামক, এবং রোগী আরোগ্য হইয়া গেলেও যে পর্য্যন্ত গায়ের শেষ খোসাটি ঝরিয়া না যায় সে পর্য্যন্ত তাহার সংক্রামকতা দূর হয় না। গুটিকার ছাল শুষ্ক হইলেও তাহা বীজে পরিপূর্ণ থাকে। এই সকল শুষ্ক ছাল গুঁড়া গুঁড়া হইয়া বাতাসে সঞ্চালিত হয়। সেই গুঁড়া কাপড়ে চোপড়ে অদৃশ্যভাবে লাগিয়া নানা রকমে বহু লোকের সংস্পর্শে আসে এবং নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতি রন্ধ্রপথ দিয়া সহজেই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই শুষ্ক ছালের তেজ বড় কম নয়। ডাক্তার গুলব্রেড পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই শুষ্ক ছাল রোগীর শরীর হইতে খসিয়া পড়িবার একমাস পরেও তাহার তেজ নষ্ট হয় নাই, এবং তখনও ইহার দ্বারা যাহাকে টীকা দিয়াছেন তাহারই টীকা উঠিয়াছে।

অন্যান্য সংক্রামক বীজাণুর ন্যায় বসন্ত-বীজেরও সংক্রামকতা সম্বন্ধে একপ্রকার বিশেষত্ব আছে। সকলেই জানেন যে অধিকাংশ সংক্রামক জাতীয় রোগ একবার কাহারো হইলে পুনর্ব্বার আর সহজে হয় না, কারণ তাহার শরীরে তখন হইতে সেই রোগের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি (immunity) সঞ্চিত হইয়া থাকে। রোগ বিশেষে বা অবস্থা বিশেষে এই শক্তি হয়তো চিরস্থায়ী হইয়া থাকে, অথবা কিছুকাল পরে লোপ পায়। বসন্ত রোগও যাহার একবার হইয়াছে, তাহার আর কখনো হয় না, কিংবা হইলেও তাহা অতি মৃদু প্রকৃতির হইয়া থাকে।

বসন্ত রোগের এই প্রকার কতকগুলি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায় কোনো একরূপ নির্দ্দিষ্ট বীজই ইহার হেতু। যদিও চাক্ষুষ তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তথাপি মার্ভিন গর্ডন (Dr. Mervyn Gordon F. R. S.) সেণ্ট বার্থলোমিউ হাঁসপাতালের পরীক্ষাগারে গুটিকারস হইতে বীজ লইয়া নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দৃঢ় প্রামাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৈজ্ঞানিক সমাজে তাহা অবিসম্বাদি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। চাক্ষুষ দেখা অসম্ভব জানিয়া ইনি প্রামাণিক উপায়ের দ্বারা ইহার বীজের অস্তিত্ব এবং চরিত্র উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। খরগোসের গায়ে কতকটা স্থান লোমশূন্য করিয়া তথায় বসন্ত গুটিকার বীজ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বপন করিয়া ইনি পর্য্যায়ক্রমে তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিতে থাকেন, এবং এইরূপে পুনঃপুনঃ পরীক্ষায় খরগোসের দেহে রোগ জন্মাইতে হইলে ইহার কতটা পরিমাণ বীজ আবশ্যক তাহার একটি মাত্রা নির্দ্ধারণ করেন;—অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন কতটুকু মাত্রা প্রয়োগ করিলে বসন্তের একটি গুটিকা খরগোসের দেহে নিশ্চিত উঠিবে তাহা আগে স্থির করিয়া লন। এই মাত্রাকে M. V. D. অর্থাৎ minimum virulent dose বলা হয়। রোগসৃষ্টির মাত্রা ধার্য্য হওয়াতে অতঃপর তিনি এই বীজ লইয়া নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা বহু তথ্য আবিষ্কার করেন। সেগুলি মোটামুটি ভাবে এখানে বিবৃত হইল :—

(১) তিনি প্রমাণ করেন যে এই বীজের দ্বারা কোনো খরগোসের গায়ে টীকা দিলে তাহার রক্তের মধ্যে এমন একপ্রকার অ্যাণ্টিবডির (specific antibody) সৃষ্টি হয় যাহা ঐ-জাতীয় নূতন বীজকে পরে বহু পরিমাণে বিনষ্ট করিতে পারে। টীকা দিবার কিছুদিন পরে খরগোসটির রক্তের সিরাম (serum) বাহির করিয়া লইয়া তাহার সহিত কিছু নূতন বীজ মিশাইবামাত্র লক্ষিত হয় উহা দৃশ্যভাবে জমাট বাঁধিয়া তলানির মত নীচে পড়িয়া যায় (agglutination),—কিন্তু অন্য কোনো সাধারণ খরগোসের সিরাম লইয়া এরূপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহাতে ঐরূপ বীজ-জমানো শক্তির কোনো পরিচয় নাই। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে মানুষের শরীরে এইরূপে

টীকা দিয়া কৃত্রিম বসন্তের অবতারণা করিলে তাহার রক্তের মধ্যেও অতঃপর এই শক্তির আবির্ভাব হয়, এবং সেইজন্য ভবিষ্যতে সংক্রমণ ঘটিলেও তাহাকে আর এই রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। যদিও এই শক্তি চিরস্থায়ী থাকে না, তথাপি ইচ্ছামত উহার বীজপ্রয়োগের দ্বারা রোগেরও অবতারণা করা যায় এবং প্রতিরোধী শক্তিও জন্মানো যায়। সুতরাং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হইলেও নির্দ্দিষ্ট রোগের সহিত নির্দ্দিষ্ট বীজের কার্য্য-কারণ সম্পর্ক নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হয়।

(২) ইনি দেখিয়াছেন যে টীকা-দেওয়া-খরগোসের শরীর হইতে কিছু রক্ত লইয়া টীকা-বিহীন-খরগোসের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে প্রথমটির ন্যায় দ্বিতীয় খরগোসটিও তদ্দ্বারা প্রতিরোধশক্তিসম্পন্ন হইয়া ওঠে। ঐ রক্তের বীজনাশী শক্তিরও সুনির্দ্দিষ্ট মাত্রা আছে, অর্থাৎ এইরূপ শক্তিসম্পন্ন রক্তের কতটুকু পরিমাণের দ্বারা কত মাত্রার বীজ বা ভাইরাস্ নিষ্ক্রিয় হইতে পারে তাহাও নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে (1 c. c. of immune serum would protect an animal against 100 M. V. D. of the virus)।

(৩) ইনি আরো প্রমাণ করিয়াছেন যে, গো-বসন্ত (Vaccinia) এবং মনুষ্য-বসন্তে (Variola) বীজ হিসাবে কোনো প্রভেদ নাই। অর্থাৎ—প্রথমতঃ, গোবীজের টীকা দিলে রক্তে যে নির্দ্দিষ্ট শক্তি আসে, তাহার দ্বারা গো-বসন্তের বীজ এবং মনুষ্য-বসন্তের বীজ দুইই সমান ভাবে জমাট বাঁধিয়া যায় (agglutinated);—এবং দ্বিতীয়তঃ, কোনো অকৃত্রিম বসন্ত রোগীর রক্তের সিরাম পৃথক করিয়া লইয়া তাহার সহিত এই দুই প্রকার বীজ বিভিন্ন ভাবে মিশাইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, তাহা দুই প্রকার বীজকেই সমানভাবে জমাট বাঁধিয়া ফেলে। এই উভয়বিধ পরীক্ষার সাহায্যে আরো প্রমাণ করা হইয়াছে যে আসল বসন্ত (Small Pox) এবং পানি-বসন্ত (Chicken Pox) দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাধি, এবং আসল বসন্তের সিরামের সহিত পানি-বসন্তের বীজ, বা পানিবসন্তের সিরামের সহিত আসল বসন্তের বীজ মিশাইলে কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় না।

(৪) বসন্ত রোগের সংক্রমণ প্রবেশ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ কোথায়,

তাহা জানিবার জন্য ইনি বসন্ত-বীজ লইয়া বিভিন্ন খরগোসের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন রন্ধ্রস্থানে প্রয়োগ করেন এবং তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়া দেখেন যে, ইহা নাকের ও চোখের অক্ষত ঝিল্লী অতি অনায়াসে ভেদ করিতে পারে। রক্তের সহিত না মিশাইয়া দিলেও চোখের বা নাকের ঝিল্লীগাত্রে স্পর্শমাত্র করাইলেই ইহা তথা হইতে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং তাহার ফলে ৭/৮ দিনের মধ্যে প্রথমে তাহার অত্যন্ত সর্দ্দির লক্ষণ দেখা যায়; এই সর্দ্দির রসেও বহু পরিমাণ বীজ থাকে। ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার চোখে বা অন্যান্য স্থানে বসন্তের গুটিকা বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, আমাদের শরীরেও সম্ভবতঃ নাক অথবা মুখ দিয়াই এই রোগ বায়ুর সহিত সংক্রামিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নাসারন্ধ্রই উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ।

(৫) বসন্ত বীজের নাসিকা-ঝিল্লীর উপর এই প্রকার ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া ইনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইনফ্লুয়েঞ্জার বীজের সহিত ইহার কোনোরূপ জাতিগত সম্পর্ক আছে।

(৬) কোন্ ঔষধ এই বীজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিষাক্ত তাহাও দেখিবার জন্য ইনি নানা ভিন্নরূপ অ্যান্টিসেপ্টিক (antiseptic) ঔষধ লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই নির্দ্দিষ্ট বীজের পক্ষে পটাস্ পার্মাঙ্গানেট্ (Potassium Permanganate) সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর, এমন কি Corrosive Sublimate অপেক্ষাও এ বিষয়ে অধিক শক্তিমান।

বসন্ত রোগের প্রচ্ছন্ন কাল
(Incubation period)

বসন্ত রোগের প্রচ্ছন্ন-কাল বা incubation period প্রায় **১২ দিন**। এইটি আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। যদি কেহ কখনো রোগীর সংস্পর্শে আসে বা এমন কোথাও যায় যেখানে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তবে উহার quarantine period ১২ দিন; অর্থাৎ ঐ সময় অতীত হইয়া গেলে বলা যাইতে পারে যে সে এই রোগের সংক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। আরো এক কথা,—যে কেহ

বসন্তের সংস্পর্শে আসুক না কেন, সে যদি তাহার ২।৩ দিনের মধ্যে টীকা লয়, তবে আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট সময় তাহার হাতে থাকে। এই ১২ দিন অতীত হইবার পূর্ব্বেই যদি টীকা সফল হইয়া উঠিয়া পড়ে (টীকা উঠিতে ৫।৬ দিন লাগে), তবে আর তাহার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না, কারণ বীজ শরীরে প্রবেশ করিলেও রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে টীকা উঠিলেই তাহা বিনষ্ট হয়।

সাধারণ লক্ষণাদি

প্রচ্ছন্নকাল অতীত হইলে রোগের লক্ষণ সকল ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই রোগের কয়েকটি বিভিন্ন অবস্থা দেখা যায় এবং তদনুসারে যথাক্রমে লক্ষণগুলির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়,—অতএব সম্পূর্ণ রোগটিকে কয়েকটি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) **প্রথম অবস্থা** (Initial stage)—ইহাতে প্রথমেই অকস্মাৎ কম্প দিয়া প্রবল জ্বর আসে (১০৪ বা ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত)। ইহার সহিত নানা অঙ্গে এবং **কোমরে দারুণ ব্যথা ও মাথাধরা** থাকে। জ্বরের কষ্ট অপেক্ষা তখন যেন কোমরের ব্যথাই অধিক কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় কাহারো কোমরে ব্যথার সহিত জ্বর হইলে বসন্তের কথাই আগে সন্দেহ করিতে হয়। জ্বরের সঙ্গে কখনো কখনো বমন হইতে থাকে, আবার অত্যধিক পেট কামড়ানিও কাহারো কাহারো থাকিতে দেখা যায়। ক্রমে সর্ব্বশরীরে দারুণ ব্যথা, জিহ্বার শুষ্কতা, দুর্নিবার তৃষ্ণা, প্রভৃতি লক্ষণের সহিত চক্ষু দুইটি ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া ওঠে। এইরূপ অবস্থা দুই তিন দিন যাবৎ সমানভাবে চলিতে থাকে। এ সময়ে বসন্তের কোনো গুটি উঠিতে দেখা যায় না, কিন্তু ক্বচিৎ জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার হামের মত রক্তিমাভা (initial rash) কাহারো কাহারো শরীরে দেখা দেয়, আবার শীঘ্রই তাহা মিলাইয়া যায়। বসন্তের প্রকৃত গুটিকার সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

(২) **গুটিকার তরুণ অবস্থা** (Papular stage)—২।৩ দিন জ্বর ভোগ করিবার পর **তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে** গুটিকা প্রকাশ হইতে

থাকে। বসন্তের গুটিকা একটি একটি করিয়া ক্রমশঃ দেখা দেয় না, সমস্ত গুটিকা ঝাঁকে ঝাঁকে প্রায় ১২ ঘণ্টার মধ্যেই একযোগে সর্ব্বাঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে,—সঙ্গে সঙ্গে তখন কয়েকদিনের জন্য যন্ত্রণারও লাঘব হয়, জ্বরও কমিয়া যায়। তবে কাহারো কাহারো সমগ্র গুটিকা প্রকাশ পাইতে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত
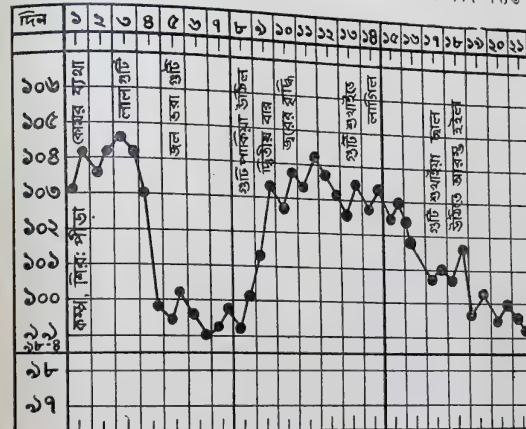
সাধারণ বসন্ত রোগীর টেম্পারেচার চার্ট

বিলম্বও ঘটিতে পারে, এবং এইরূপ স্থলে জ্বর ও যন্ত্রণার উপশম হইতেও কিছু দেরী লাগিতে পারে। গুটিকাগুলি প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আল্‌পিনের মাথার মত আকারে লাল ফুসকুড়ি বা papular অবস্থায় থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে এগুলি মশার কামড়ের চিহ্ন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার উপর মৃদুভাবে হাত বুলাইয়া অনুভব করিলে শক্ত দানার মত ঠেকে। এইরূপ দানা প্রথমে মুখে ও মাথায় প্রকাশ পায়, তাহার পর অতি শীঘ্র যথাক্রমে হাতের কব্জিতে, বাহুতে, পিঠে, বুকে, উরুতে, অবশেষে পায়ে বাহির হইয়া পড়ে। রোগের তীব্রতা অনুসারে এগুলি সংখ্যায় কম-বেশী হয়, সুতরাং কাহারো

বা অসংখ্য, কাহারো বা অল্প কয়েকটি গুটিকা উঠিতে দেখা যায়। কিন্তু মোট সংখ্যায় যতগুলিই উঠুক, তাহা এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া থাকে না। শরীরের বিভিন্ন অংশ অনুসারে গুটিকা সাজানোর একরূপ বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। উহার এই **বিশিষ্ট বিন্যাসের ধারা** দেখিয়াই বসন্তরোগ অভ্রান্তরূপে চিনিতে পারা যায়। বসন্তের গুটিকার নিয়ম এই যে সেগুলি **কেন্দ্রাপসারী** (centrifugal) ভাবে সজ্জিত হইবে ; সুতরাং শরীরের মাঝের দিকে—অর্থাৎ বুকে ও পেটে তাহা কম সংখ্যায় থাকিবে, এবং কেন্দ্র হইতে দূরে—অর্থাৎ মুখে, মাথায়, ও হাত-পায়ের প্রান্তভাগে খুব বেশী সংখ্যায় থাকিবে। রোগ সামান্য হউক বা ভীষণ হউক, এ নিয়মের কখনো ব্যতিক্রম হয় না। বসন্তের গুটিকা সাধারণতঃ **মুখে, হাতের কব্জিতে** এবং **পায়ের গোছেই** সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ওঠে। ঐ সকল অংশই উহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান। আরো এক নিয়ম এই যে,—শরীরের যে সকল অংশ সচরাচর অনাবৃত থাকে সেখানে গুটিকার সংখ্যা অধিক, এবং যে সকল অংশ সচরাচর কাপড়ে ঢাকা থাকে সেখানে গুটিকার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। পানি-বসন্তের গুটিকা সাজানোর নিয়ম ইহার ঠিক বিপরীত; পানি-বসন্তের গুটিকা কেন্দ্রাভিমুখী (centripetal) ভাবে বিন্যস্ত হয়,—অর্থাৎ শরীরের মধ্যদেশেই তাহার সংখ্যাধিক্য এবং প্রান্তভাগে তাহার সংখ্যা তুলনায় অধিক কম। রোগ চিনিবার সময় এ নিয়মটি মনে রাখা উচিত।

প্রকাশ হইবার পর বসন্তের গুটিকাগুলি ক্রমশঃ শক্ত ও উঁচু হইয়া স্পষ্টরূপে ভাসিয়া ওঠে এবং ক্রমশঃ উহার বর্ণ গাঢ়তর হইয়া আকারেও একটু বর্দ্ধিত হয়। এই দানার মত অবস্থা দুইদিনের অধিক থাকে না।

(৩) ফোস্কা বা জল-ভরা অবস্থা (Vesicular stage)—গুটিকা বাহির হইবার দুইদিন পরে তৃতীয় অবস্থার সূত্রপাত হয়। কঠিন দানাগুলি ক্রমে ফাঁপিয়া জলে ভরিয়া উঠিতে দেখা যায় এবং শীঘ্রই এগুলি ফোস্কার মত পাতলা চামড়ার আবরণের ভিতর পরিষ্কার জল লইয়া টল্‌টল্‌ করিতে থাকে। কিন্তু জলে ভরা হইলেও ফোস্কাগুলি দেখিতে নিটোল গোল হয় না, অধিকাংশেরই শীর্ষভাগে অল্প একটু **টোল্ খাইয়া** (umbilication) সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এই টোল্‌-খাওয়া চেহারাটি বসন্ত-গুটিকার

বিশেষত্ব। আসল-বসন্ত ব্যতীত পানি-বসন্তের গুটিকা এরূপ টোল-খাওয়া হয় না। এ অবস্থা অতিক্রম করিতেও দুইদিন সময় লাগে। এ সময়ে রোগীর জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গসকল অল্পই থাকে, এবং লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে রোগী হয়তো অল্পেই অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু ইহার পরের অবস্থাতেই রোগটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া ওঠে।

(৪) পাকা অবস্থা (Pustular stage)—রোগের সূত্রপাত হইতে গণনা করিলে প্রায় **ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে** গুটিকা পাকিতে আরম্ভ হয়; উহার ভিতরের জল ক্রমশঃ অস্বচ্ছ ও গাঢ় হইয়া পূঁজে পরিণত হইতে থাকে এবং প্রত্যেক গুটিকার চতুর্দ্দিকে কতকটা স্থান ঘেরিয়া প্রদাহে লাল হইয়া ওঠে। ফোস্কাগুলি পাকিতে আরম্ভ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে রোগীর জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং কষ্টদায়ক লক্ষণ সকল নূতন করিয়া দেখা দিতে থাকে। শরীরের বহিরঙ্গ যেমন পাকা-গুটিকাতে ভরিয়া যায়, অভ্যন্তরস্থ সমস্ত ঝিল্লীগাত্রেও তদ্রূপ অবস্থা হয়। বসন্তের গুটিকা পাকিবার সময় এককালীন উহা সর্ব্বত্রই পাকে, সুতরাং মুখের ও গলার ভিতর, পাকস্থলী ও অন্ত্রের ভিতর, সর্ব্বত্রই এককালীন প্রদাহ হইতে থাকে। ইহার ফলে কাহারো স্বরভঙ্গ ও শ্বাসকষ্ট হয়, কাহারো বা দুধ পর্য্যন্ত গিলিতে অসহ্য কষ্ট হয়। এই কঠিন অবস্থা কাটিয়া উঠিতে ২।৩ দিন সময় লাগে, এবং তাহার পর হইতে সমস্ত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। সূত্রপাত হইতে গণনা করিলে **দশম বা একাদশ দিবস পর্য্যন্ত** এই রোগের সম্পূর্ণ ভোগ থাকে। রোগ মারাত্মক হইলে এই সময়ের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে, নতুবা এই সময়টুকু অতিক্রান্ত হইয়া গেলে জ্বর কমিয়া যায় এবং রোগী অনেকটা সুস্থ হয়।

(৫) শুকাইবার অবস্থা (Stage of dessication)—অতঃপর গুটিকা ক্রমশঃ শুকাইতে থাকে। ইহার মধ্যে কতক কতক চুঁইয়া যাওয়ার মত সঙ্কুচিত হইয়া যায়, আর কতকগুলি ছিঁড়িয়া ঘা হইয়া তাহার উপর হলুদ রঙের ছাল বা মামড়ি (crust) পড়িয়া যায়। শুকাইবার সময় শরীরে অত্যন্ত কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয় এবং রোগী অনেক সময় তাহা সম্বরণ করিতে না পারিয়া কোথাও কোথাও চুলকাইয়া ঘা করিয়া ফেলে, ও তাহার

ফলে ঐ সকল স্থানে গভীর গর্ত্ত থাকিয়া যায়। যাহা হউক, শুষ্ক ছালগুলি এখন হইতে ক্রমশঃ খসিয়া পড়িতে থাকে। প্রথমে মুখ হইতে ছাল উঠিতে আরম্ভ হয়, সর্ব্বশেষে হাতের ও পায়ের তলা হইতে ছাল উঠিয়া যায়। গণনা করিয়া দেখিতে গেলে সাধারণতঃ **১৪ দিন হইতে** ছাল ওঠা সুরু হয় এবং **একুশ দিনের মধ্যে** সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়। অবশ্য রোগ কঠিন হইলে সকল দিকেই কিছু বিলম্ব হয়, এবং সমস্ত ছাল উঠিয়া যাইতে আরো দুই এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সময় লাগে।

বসন্ত রোগের সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সময়টিকে মোটামুটি এই ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—প্রচ্ছন্ন কাল ১২ দিন+পূর্ব্ব অবস্থা ৩ দিন+দানা অবস্থা ২ দিন+ফোস্কা অবস্থা ২ দিন+পাকা অবস্থা ৩ দিন+শুষ্ক অবস্থা ১২ দিন। অতএব **১২—৩—২—২—৩—১২,** এইরূপ অঙ্কপাতের সঙ্কেত স্মরণ রাখিবার পক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক।

বসন্ত কয়রূপ

দেশীয় মত অনুসারে বসন্তের ৬৪ প্রকার বৈচিত্র্যের কথা শোনা যায় এবং গুটিকার আকৃতি অনুসারে গ্রাম্য কথায় নানা নামে ইহার বৈচিত্র্য জ্ঞাপন করা হয়; যথা,—মসুর, মুগ, মাষকলাই, পোড়ামসুরে, কুলে, পুকুরে, পাথুরে, হাওয়া-বসন্ত ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন যে বসন্তে গুটিকা সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া যায় তাহাকে 'চর্ম্মদল বসন্ত', ও যাহাতে রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং গুটিকার মধ্যে রক্তসঞ্চয় হয় তাহাকে 'রক্তজ বসন্ত' বলা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতে মোটামুটি ইহাকে চারি প্রকার বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(১) মৃদু বা নিস্তেজ বসন্ত (Modified form)

বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনো কোনো লোকের বসন্ত হইলেও তাহা অতি সামান্য আকারেই হয়। উহাতে কোনো কষ্টই প্রায় থাকে না, অথবা থাকিলেও তাহা যৎসামান্য মাত্র। পূর্ব্বে টীকা লওয়া সত্ত্বেও যাহাদের বসন্ত হয়, তাহাদেরই সাধারণতঃ

এই প্রকার নিস্তেজ বসন্ত হইয়া থাকে। বসন্ত-রোগের নিয়মিত লক্ষণের সহিত ইহার লক্ষণের অনেক বৈষম্য থাকে। প্রথমতঃ, ইহাতে রোগের সূত্রপাত অবস্থায় জ্বর সামান্যই থাকে এবং গুটিকা হয়তো অতি শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়ে, নির্দ্দিষ্টমত চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে না। গুটিকার সংখ্যাও ইহাতে অতি অল্প হয়; সময়ে সময়ে উহা এত অল্প হয় যে তাহাকে বসন্ত বলিতে দ্বিধা বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, গুটিকাগুলি আকারেও ছোট হয় এবং ফোস্কা অবস্থায় টোলখাওয়া হয় না। তৃতীয়তঃ, এগুলি কখনো বা ফোস্কা না হইতেই শুকাইয়া যায়, কখনো বা ফোস্কা অবস্থাতেই শুকাইয়া যায়, কাজেই পাকিবার সুযোগ থাকে না। আর যদি বা পাকে তবে হয়তো তাহাও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুকাইয়া যায়। জ্বর অনেকের মোটেই হয় না, কাহারো বা অল্প হইলেও প্রথম দুই-তিন দিনের পর আর থাকে না; ইহাতে পাকিবার সময়েও জ্বর থাকে না, অথবা অতি সামান্য জ্বরভাব মাত্র অনুভূত হয়।

তবে রোগ যতই মৃদু হউক, তাহার বীজ কখনো নিস্তেজ নয়। কঠিন বসন্তের রোগী শয্যাশায়ী অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কাজেই অন্যান্য সকলে সহজে রোগ চিনিয়া তাহার সঙ্গ পরিহার করে। কিন্তু এই সকল অল্পক্লিষ্ট রোগী লোকের অজ্ঞাতসারে অবাধে সকলের সহিত মেলা-মেশা করে এবং ইহাদের দ্বারাই লোকসমাজে রোগ অজানিতভাবে সংক্রামিত হয়। এইরূপ মৃদু বসন্তে রোগীর নিজের কোনো অনিষ্ট হয় না বটে, কিন্তু পরের অনিষ্ট ইহার দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

(২) সরল বিক্ষিপ্ত বসন্ত (Discrete form)

ইহাকেই প্রকৃত 'মসূরিকা' বলে। ইহাতে গুটিকাগুলি পরস্পর অসংলগ্ন হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে ছড়াইয়া থাকে। ইহাতে বসন্তরোগের পূর্ব্বাপর সমস্ত লক্ষণগুলি সঠিক মিলিয়া যায়। প্রথমে সর্ব্বদেহে ব্যথা ও প্রবল জ্বর ভোগ করিবার পর চতুর্থ দিনে গুটিকা দেখা যায়, এবং ২৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত গুটিকা বাহির হইয়া পড়ে। গুটিকা অবস্থায় ২ দিন কাটিবার পরে ফোস্কা হয়; অধিকাংশ ফোস্কা টোল

থাইয়া থাকে। এই অবস্থায় ২।৩ দিন কাটিয়া গেলে তখন সেগুলি পাকিতে থাকে। অতঃপর ২।৩ দিন যাবৎ পাকিয়া সে গুলি শুকাইতে আরম্ভ হয়। এইরূপ নিয়মিত অবস্থা-পারম্পর্য্যের কোনো ব্যতিক্রম ইহাতে হয় না। কিন্তু এই প্রকার সরল বসন্তে অন্য মারাত্মক উপসর্গ প্রায় থাকে না এবং অধিকাংশ রোগী যথাসময়ে আরোগ্য হইয়া যায়।

(৩) **লিপ্ত বসন্ত** (Confluent and Semiconfluent form)

যে বসন্তে গুটিকাগুলি পৃথক না থাকিয়া পরস্পর গায়ে গায়ে জুড়িয়া যায়, তাহাকেই এই নাম দেওয়া হয়। দেশী মতে ইহাকে 'চর্ম্মদল বসন্ত' বলে। অবশ্য শরীরের সর্ব্বত্রই গুটিকাগুলি একত্রে লেপিয়া না থাকিতেও পারে। এমনও হইতে পারে যে উহা কোথাও বা পৃথক পৃথক এবং কোথাও বা লিপ্ত ভাবে আছে। এইরূপ অবস্থাকে semi-confluent বলা হয়। এই অবস্থায় রোগটিকে সাধারণ বসন্ত বলিব, না confluent বা চর্ম্মদল-জাতীয় বলিব, এইরূপ দ্বিধা কখনো কখনো উপস্থিত হইতে পারে। ইহার মীমাংসা করিবার জন্য কেবলমাত্র **মুখ ও হাতের কব্জির কাছে** বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে গুটিকা কেমন ভাবে তথায় বিন্যস্ত আছে। এই দুই স্থানে যদি গুটিকাগুলি পরস্পর জুড়িয়া গিয়া থাকে, তবে আর কোথাও তাহা না থাকিলেও রোগটি confluent বা চর্ম্মদল-জাতীয়। আর ঐ দুই স্থানে যদি গুটিকা পৃথক পৃথক হইয়া থাকে তবে উহা সাধারণ বসন্ত।

চর্ম্মদল বা confluent বসন্ত সাধারণ বসন্ত অপেক্ষা বহুগুণে মারাত্মক। Confluent বসন্তে শতকরা প্রায় ৫০ জনের, এবং semi-confluent হইলে শতকরা প্রায় ২০ জনের মৃত্যু ঘটে। ইহার পূর্ব্বলক্ষণগুলি সাধারণ বসন্তেরই মত, তবে জ্বর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রণাসকল অপেক্ষাকৃত প্রবল, এবং গুটিকা কিছু শীঘ্র প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ গুটিকা বাহির হইয়া গেলেও জ্বর সম্পূর্ণরূপে ছাড়ে না, সামান্য কিছু কমে মাত্র। পরে ফোস্কা অবস্থার সূত্রপাতের সঙ্গে গায়ে অত্যন্ত দাহ হইতে থাকে। অনেকেই তখন হইতে ঢোক গিলিবার সময় গলায় অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করে। ইহার পর যখন গুটিকা

পাকিতে আরম্ভ হয় তখনই ঐ গুলি পরস্পর মিলিয়া এক হইয়া যায়, জ্বরটি সঙ্গে সঙ্গে আরো বাড়িয়া যায়, চোখ লাল হইয়া ওঠে, রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে এবং প্রলাপ বকিতে থাকে। মুখের গুটিকা পাকিয়া ও লেপিয়া যাওয়াতে মুখ অত্যন্ত ফুলিয়া চোখ দুটি প্রায় বুজিয়া যায় এবং চোখ দিয়া ক্রমাগত জল ও পুঁজ গড়াইয়া পড়িতে থাকে। ঠোঁটগুলিও ফুলিয়া দুই কষ্ বহিয়া লালা গড়াইতে থাকে। এইভাবে মুখের স্বাভাবিক রূপ বিকৃত হইয়া উহা অতি বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করে, মুখ দেখিয়া মানুষ চিনিবার উপায় থাকে না। জ্বর খুব প্রখর, ১০৪ হইতে ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ওঠে, নাড়ীর বেগ অতি দ্রুত, এবং ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে। সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ অবস্থা হইতেও কেহ কেহ আরোগ্যলাভ করে। অবস্থা অনুকূল হইলে ২।৩ দিন পরে এই সকল ফুলা ক্রমশঃ কমিয়া মুখের আকার আবার স্বাভাবিক হইয়া আসে, এবং নানারূপ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া রোগী অল্পে অল্পে আরোগ্য লাভ করে; কিন্তু ক্ষতচিহ্নগুলি চিরকালের জন্য মুখের সৌন্দর্য্য বিকৃত করিয়া দেয়। রোগ কঠিন ভাব ধারণ করিলে জ্বর ক্রমশঃ আরো বাড়ে, নাড়ী আরো দ্রুত ও অনিয়মিত ভাবে চলে, প্রলাপ বাড়িতে থাকে, ক্রমে পাকা অবস্থার শেষের দিকে মৃত্যু ঘটে।

(৪) **রক্তজ-বসন্ত** (Hæmorrhagic type)

এই মারাত্মক বসন্ত কোনো কোনো মহামারীর প্রারম্ভে, অথবা নিতান্ত অকালে যখন বসন্ত-রোগের কোনো এপিডেমিক্ নাই,—এমন সময় অকস্মাৎ দুই এক জনের হইতে দেখা যায়। এই-জাতীয় বসন্ত সাক্ষাৎ যমের দোসর, যে ইহাতে ভুগিয়াও অব্যাহতি লাভ করে সে নিতান্তই ভাগ্যবান। ইহা দুইরূপ প্রকৃতির হইয়া থাকে :—

(ক) **ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্** (Malignant)—ইহাতে রোগের প্রথম সূত্রপাত হইতেই, অর্থাৎ গুটিকা নির্গমনের সময় হইবার পূর্ব্বেই চামড়ার নীচে রক্তপাত হইয়া থাকে। ইহা নিতান্তই সাংঘাতিক বলিয়া ইহাকে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্ (malignant) কিম্বা Black-pox অর্থাৎ কাল-বসন্ত

নাম দেওয়া হয়। প্রবল জর ও আক্ষেপের সহিত ইহা ঝড়ের মত আসিয়া রোগীকে একেবারে হতচেতন করিয়া ফেলে এবং প্রথম ২৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই অকস্মাৎ কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত দেহে চামড়ার নীচে রক্ত জমিয়া সিঁদুরের মত ঘোর লাল হইয়া ওঠে (prodromal rash)। এই অবস্থা দেখিতে কতকটা ইরিসিপেলাসের মত, এবং অধিকন্তু ইহাতে স্থানে স্থানে কাল্‌সিটা পড়ার মত কতকগুলি কালো কালো দাগ (petechiæ) দেখিতে পাওয়া যায়। চামড়ার এইরূপ রক্তিমাভা সর্ব্বপ্রথমে কেবল মাত্র **তলপেটে ও জঙ্ঘাতে** (bathing drawers' area) প্রকাশ পায়। ক্রমে ইহা পেট ও বগলের দিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং লাল হইতে ক্রমশঃ উহা কালিমাপ্রাপ্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু তৎপরেই সহসা উহা একেবারে মিলাইয়া যায়। এ দিকে প্রবল জ্বরের সঙ্গে শ্বাসবৃদ্ধি, জিহ্বার অতিরিক্ত শুষ্কতা, চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়া, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, প্রভৃতি সন্নিপাতের লক্ষণসকল (typhoid state) অতিমাত্রায় প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত প্রায়ই ইহাতে চোখের কোলে রক্ত জমে ও মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে। এই অবস্থা ঘটিলে রোগী ৩।৪ দিনের মধ্যেই মারা যায়, বসন্তের আসল গুটিকা (real rash) নির্গত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত প্রায় বাঁচে না। যদি কয়েকদিন টি কিয়া থাকে তবে এক্ষেত্রে অতি বিলম্বে, প্রায় ৬।৭দিন জরভোগের পরে গুটিকা বাহির হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটে। তখনও যদি রোগী বাঁচিয়া থাকে তবে অতঃপর গুটিকার মধ্য হইতে রক্তপাত হইতে থাকে, এবং রক্ত প্রস্রাব, রক্তবমন, যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব, চোখের ভিতর রক্তপাত প্রভৃতি হইতে হইতে মৃত্যু ঘটে। এইরূপ বসন্ত প্রথম অবস্থায় চেনা কঠিন, কারণ ইহা প্রায় অসময়েই দেখা দেয়, আর তলপেটের চামড়া লাল হওয়া ব্যতীত বসন্ত রোগের কোনো প্রকার চিহ্নই ইহাতে পাওয়া যায় না। বসন্তের স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই অধিকাংশ রোগী মারা যায়, সুতরাং রোগ চিনিবার অবকাশও পাওয়া যায় না। কেবল রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিলে এইমাত্র দেখা যায় যে উহাতে শ্বেতকণিকার সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে (total W. B. C. about 20 to 30 thousands per cmm.) এবং লার্জ-মনোনিউক্লিয়ার কণিকার

আধিক্য ঘটিয়াছে (increase of large mononuclear cells, plasma cells and myelocytes)।

(খ) **বিলম্বিত রক্তজ** (Late hæmorrhagic)—এই প্রকার রক্তজ বসন্ত প্রথম অবস্থায় সাধারণ বসন্তেরই সমান, তবে ইহার জর ও আনুষঙ্গিক উপসর্গ প্রথম হইতেই কিছু অস্বাভাবিক রকমের দেখা যায়। পরে গুটিকা বাহির হইয়া, যখন ফোস্কা বা পাকা অবস্থায় আসে তখন সেগুলি নীলবর্ণ হইয়া ওঠে এবং তাহার মধ্যে রক্তসঞ্চার হয়। ইহার পরে একে একে দাঁতের গোড়া দিয়া ও নাক দিয়া রক্তপাত, মুখ দিয়া রক্ত ওঠা, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, মলের সহিত রক্তস্রাব, এইরূপে নানা পথ দিয়া শরীর হইতে কেবল রক্ত নির্গত হইতে থাকে। এই সকল উপসর্গ যদি বসন্ত পাকিবার পর বিলম্বে দেখা দেয় ও আনুষঙ্গিক বিকার কিছু না থাকে, তবে উহা সত্ত্বেও আরোগ্য লাভের কিছু সম্ভাবনা থাকে। সেরূপ হইলে অবস্থা বিশেষে এই প্রকার রক্তস্রাবী বসন্ত হইতেও শতকরা ২০ জন আরোগ্য হয়। কিন্তু যদি পাকিবার পূর্ব্বে রক্তপাত আরম্ভ হয় ও জ্বরের সহিত সন্নিপাতের লক্ষণ (toxæmic symptoms) থাকে, তবে ইহা একেবারেই মারাত্মক। ইহাতে প্রায় ৮।১০ দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

রোগ চিনিবার উপায়

গুটিকা প্রকাশের পূর্ব্বে—বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় যদি কাহারো অকস্মাৎ কোমরে ব্যথার সঙ্গে জর হয়, প্রবল শিরঃপীড়ার সহিত দুই এক বার বমন হইয়া থাকে, এবং অনুসন্ধান লইয়া জানা যায় যে রোগীর টীকা লওয়া হয় নাই বা বহুকাল পূর্ব্বে হইয়াছিল, তবে উহা বসন্ত বলিয়াই সন্দেহ করিতে হইবে। অবশ্য গুটিকা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। চতুর্থ দিনের মধ্যেই বসন্তের গুটিকা প্রকাশ হইবার কথা, অতএব এই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। পঞ্চম দিবসেও যদি গুটিকা না দেখা যায় (এবং রক্তজ বসন্তের কোনো লক্ষণ না থাকে) তবে উহা বসন্ত নয়। রক্তজ বসন্তে পাঁচ দিনের মধ্যেও গুটিকা না উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাতে রক্তপাতের লক্ষণ, তলপেটের চামড়া লাল হওয়া, প্রভৃতি কিছু-

না-কিছু নির্দ্দেশক চিহ্ন নিশ্চয় প্রকাশ পাইবে। তবে জ্বরের সঙ্গে গায়ের চামড়া কোথাও লাল হইয়া উঠিলেই তাহা রক্তজ বসন্ত মনে করা ঠিক নয়। **ইরিসিপেলাসেও** চর্ম্মের অংশবিশেষ লাল হয়—কিন্তু তাহার ধারে ধারে স্পষ্ট সীমারেখা থাকে, উহা দেখিলেই চেনা যায়। **হামেতেও** সর্ব্বাঙ্গ লাল হইয়া ওঠে—তবে তাহা কেবল তলপেটটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, এবং তাহার সহিত সর্দ্দি-কাসির সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকে। **ডেঙ্গুজ্বরেও** কোমরে ব্যথা হয় এবং কখনো কখনো চামড়া পর্য্যন্ত লাল হইয়া ওঠে,—তবে তাহা কেবল হাতে পায়ে ও মুখে সীমাবদ্ধ, তলপেটে কিছু হয় না। **মেনিঞ্জাইটিস্** রোগে (Cerebro spinal fever) অথবা **সেপ্‌টিসিমিয়া** রোগে (Streptococcal septicæmia) চামড়ার নীচে রক্ত জমিয়া স্থানে স্থানে লাল লাল দাগ (petechiæ) দেখা যায়,—কিন্তু এ দাগ বসন্তের রক্তিমাভার মত কেবল তলপেটেই সামাবদ্ধ নয় এবং দেখা দিয়াই আবার অকস্মাৎ মিলাইয়া যায় না।

গুটিকা প্রকাশের পর—গুটিকা দেখিয়া বসন্ত চেনা অতি সহজ, কিন্তু কখনো কখনো ইহা এমন ছদ্মবেশে থাকে যে সাবধানী লোকেরও চিনিতে ভুল হয়। সাধারণ 'মসূরিকা'-জাতীয় বসন্ত চেনা কঠিন নয়, কিন্তু অসাধারণ-মৃদু বা অসাধারণ-উগ্র অবস্থায় ইহার নানারূপ বৈচিত্র্য ঘটে, সেইগুলিই চেনা কঠিন। তবে আপাতঃ-দৃষ্টিতে যতই বৈচিত্র্য থাকুক, ইহার কতকগুলি অভ্রান্ত চিহ্ন ও বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে,—সেইগুলি স্মরণ রাখিয়া বিচার করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বসন্ত চিনিবার বিশিষ্ট নির্দ্দেশগুলি এস্থলে বিবৃত করা গেল :—

(১) সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে হইবে গুটিকা শরীরের মধ্যে **কোথায় বেশী এবং কোথায় কম**। এ জন্য রোগীর সমস্ত দেহ অনাবৃত করিয়া তন্ন তন্ন রূপে দেখা উচিত। বসন্তের গুটিকা সর্ব্বত্র সমান অনুপাতে থাকে না। ইহা মুখে হাতে (বিশেষতঃ কব্জির কাছে) ও পায়ের গোছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী থাকে। বসন্তের গুটিকা সর্ব্বদাই কেন্দ্রচ্যুত বা কেন্দ্রাপসারী (centrifugal) ভাবে সাজানো থাকে,—অর্থাৎ শরীরের মাঝের দিকে যতগুলি, প্রান্তের দিকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। যদি সর্ব্বশরীরে

মাত্র কুড়িটি গুটিকা থাকে, তথাপি মুখে ও হাতেই থাকিবে হয়তো ১৫।১৬টি, আর অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিয়া ৫।৬টি থাকিবে মাত্র। ইহার আরো একটি বিশেষত্ব, শরীরের অনাবৃত অংশেই (parts exposed to external friction) গুটিকার বাহুল্য হয়। এই জন্য ইহা

পানি-বসন্ত (Chicken-Pox) আসল বসন্ত (Small Pox)

দুই প্রকার বসন্তে গুটিকা-সংস্থাপনের কি প্রভেদ তাহা এই চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

বাহুমূল অপেক্ষা হাতে অধিক, উরুদেশ অপেক্ষা পায়ে অধিক, পেট অপেক্ষা পিঠে অধিক, এবং বগলে বা তলপেটে অতি কম সংখ্যায় থাকে। মুখেও লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে চোয়ালের সমুন্নত অংশে যত অধিক হয়, চোখের বা নাকের কোলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম থাকে। তদ্ব্যতীত কটিদেশে কাপড়-পরার বা বেল্ট্ বাঁধার দাগে দাগে, গলায় বোতামের দাগের উপর, এবং মোজার গার্ডারের দাগে দাগেও বসন্তের গুটিকার আধিক্য হয়।

(২) বসন্তের গুটিকা যখন বাহির হয় তখন সবগুলি সমবেত ভাবে **২৪ ঘণ্টার মধ্যেই** বাহির হইয়া পড়ে, পানি-বসন্তের মত কয়েকদিন প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া বারে বারে (in successive crops) বাহির হয় না। গুটিকাগুলি এককালীন সর্ব্বাঙ্গে দেখা দেয়, এককালীন সবগুলি ফোস্কায় পরিণত হয়, আবার একসঙ্গেই সবগুলি পাকে। এইজন্য যে কোনো সময়েই রোগীকে পরীক্ষা করা হউক না কেন, প্রত্যেক গুটিকার সর্ব্বত্র একই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে, পরস্পরের মধ্যে অবস্থার কোনো বৈষম্য থাকিবে না। কিন্তু পানি-বসন্তের গুটিকা ক্রমশঃ প্রকাশ পায় বলিয়া সেগুলিকে নানারূপ বিভিন্ন ও পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় এবং ছোট বড় বিভিন্ন আকারে দেখিতে পাওয়া যাইবে (polymorphism) ; অর্থাৎ উহাতে একই সময়ে কোনো গুটিকা হয়তো পাকিয়া শুকাইয়া যাইতেছে এবং কোনো গুটিকা হয়তো সদ্য জলে ভরিয়া উঠিতেছে, এইরূপ দেখা যাইবে।

(৩) ফোস্কা অবস্থায় গুটিকার **মাঝখানে টোল** খাওয়া (umbilication) বসন্তের একটি বিশিষ্ট চিহ্ন ; পানি বসন্তে তাহা হয় না। সকল গুটিকাই যে টোল খাওয়া হইবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই, তবে অধিকাংশই হয়।

(৪) বসন্তের গুটিকার আকারেও কিছু বিশেষত্ব আছে। ফোস্কা এবং পাকা অবস্থাতে এ গুলি **নিখুঁৎ গোলাকার** এবং আয়তনে একটির সহিত অপরটির অসামঞ্জস্য নাই। আর বসন্তের গুটিকার প্রত্যেকটির চারিদিকে কতকটা স্থান গণ্ডীর মত ঘেরিয়া লাল হইয়া ফুলিয়া থাকে (inflammatory areola)। পানি-বসন্তে এরূপ গণ্ডীও থাকে না এবং তাহার গুটিকার আকৃতিও নানাপ্রকার হয়, অর্থাৎ কোনোটি গোল, কোনোটি আঁকাবাঁকা, কোনোটি বহু-কোণ বিশিষ্ট।

(৫) বসন্ত পাকে, কিন্তু পানি-বসন্ত পাকে না। কেবল কোনো কোনো পানি-বসন্তের গুটিকার মধ্যে বাহিরের পুঁজোৎপাদক বীজাণু (cocci) সংক্রামিত হইলে সেইগুলি দৈবাৎ পাকিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরোগ্যের পর বসন্তের গুটিকা শুকাইয়া গেলে তথায় স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন থাকিয়া যায়, কিন্তু পানি-বসন্তের গুটিকার সেরূপ কোনো চিহ্ন থাকে না।

(৬) এই সকল সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়াও সন্দেহ থাকিলে তাহার সুমীমাংসা করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, গুটিকা হইতে এক ফোঁটা রস লইয়া খরগোসের চোখে প্রয়োগ করা। যদি আসল বসন্ত হয়, তবে ইহাতে খরগোসের চোখে বসন্তের গুটিকা নিশ্চয় বাহির হইবে।

কি কি রোগের সহিত ইহার ভুল হয়

(১) **পানি-বসন্ত**—ইহাকে আসল-বসন্ত বলিয়া প্রায়ই ভ্রম হয়। দুইপ্রকার রোগের গুটিকার মধ্যে যে পার্থক্য আছে ইতিপূর্ব্বে তাহা উক্ত হইল। পানি-বসন্তের অন্যান্য লক্ষণও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার। উহাতে জ্বর দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রথম দিন হইতেই একেবারে জলভরা গুটিকা বাহির হইতে থাকে। তাহার পর প্রত্যহ কিছু কিছু নূতন গুটিকা উঠিতে থাকে, সেই সঙ্গে জ্বরও ওঠানামা করিতে থাকে। এগুলি অতঃপর জলভরা অবস্থা হইতেই শুকাইয়া যায়।

(২) **হাম**—অনেক সময়ে হামকেও বসন্তের প্রথম অবস্থা বলিয়া ভুল হয়। তবে হামের প্রারম্ভে সর্দ্দির লক্ষণের সহিত চোখ এবং নাক দিয়া জল ঝরিতে থাকে, এবং প্রায়ই গালের ভিতর কষের দাঁতের নিকট ঘায়ের মত একটি সাদা দাগ দেখা যায় (Koplik's spot, opposite 2nd molar tooth)। তদ্ভিন্ন হাম কেবল মুখে, গলায়, বুকে ও পেটেই অধিক পরিমাণে উঠিয়া থাকে ; ইহাতে গলার গ্রন্থিগুলি স্ফীত হইয়া ওঠে। রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যা ইহাতে বাড়ে না, বরং কমে।

(৩) **উপদংশ** (Secondary syphilis)—ইহাতেও সময়ে সময়ে বসন্তের মত সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া এত গুটিকা বাহির হয় (এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও থাকে) যে প্রথম দৃষ্টিতে উহাকে বসন্ত বলিয়াই ভ্রম হয়। সিফিলিস্ বহুরূপী রোগ, কখন কিরূপ মূর্ত্তি ধরে তাহার কোনো স্থিরতা নাই। কখনো কখনো সদ্যোজাত শিশুর শরীরে ইহা বসন্তের এমন অবিকল নকল রূপে প্রকাশ পায় যে বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও হার মানাইয়া দেয়। তবে উত্তমরূপে সন্ধান লইলেই ইহার আসল পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। বয়স্ক রোগীর সম্বন্ধে এরূপ কোনো সন্দেহ হইলে তাহার লিঙ্গস্থান পরীক্ষা করা উচিত ; উপদংশ হইলে

উহার আদি ক্ষতের (primary sore) চিহ্ন তথায় দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কুঁচকির গ্রন্থি স্ফীত হইয়া থাকে। উপদংশের গুটিকা মুখে খুবই কম বাহির হয়, এবং নানাধরণের (polymorphic) গুটিকা একসঙ্গে থাকিতে দেখা যায়।

(৪) **ইরিসিপেলাস্** (Erysipelas)—ইহা শরীরের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশবিশেষ লইয়া প্রকাশিত হয়। প্রথমে যে-কোনো স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা ক্রমবর্দ্ধনশীল গণ্ডীরেখা লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী গ্রন্থিসকল স্ফীত হয়, কিন্তু বসন্তে কোনো গ্রন্থি স্ফীত হয় না। আর ইহাতে জ্বর প্রকাশ পায় চামড়া লাল হইয়া উঠিবার পরে,—উহার পূর্ব্বে নয়।

(৫) **মেনিঞ্জাইটিস্** (Cerebro-spinal fever)—ইহার প্রথম সূত্রপাত অনেকটা বসন্তের অনুরূপ, এবং কখনো কখনো ইহাতে শরীরের বহু স্থানে একপ্রকার রক্তিমাভা (petechiæ) বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটির মত উঠিতেও দেখা যায়, তাহাতে ইহা বসন্তের পূর্ব্বাভাস বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। তবে ইহাতে ঘাড় শক্ত হইয়া থাকা, কার্নিগ্ চিহ্ন (Kernig's sign), প্রভৃতি মস্তিষ্ক রোগের সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি দেখিয়া সহজেই চিনিতে পারা যায়।

(৬) **ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু** প্রভৃতিকেও প্রথমে বসন্ত বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু রোগের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই এ ভুল সংশোধিত হয়।

বসন্তরোগের অন্যান্য উপসর্গ

সাধারণতঃ সরল বসন্তে অন্য কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। রোগ যখন জটিলভাব ধারণ করে তখনই নানারূপ উপসর্গ উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে—

(১) **চোখওঠা এবং চোখের ঘা** (corneal ulcer) প্রায়ই হয়। ইহাতে চক্ষু অনেক সময় একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য প্রত্যেক বসন্ত রোগীরই চোখ সম্বন্ধে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

(২) প্রকৃত নিউমোনিয়া না হইলেও **ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া** ইহাতে নিতান্ত বিরল নয়। উহা দেখা দিলে রোগীর আরোগ্যলাভ করা কঠিন হইয়া পড়ে। স্বরভঙ্গ, লেরিঞ্জাইটিস্ প্রভৃতি উপসর্গও প্রায়ই হয়, এবং কচিৎ শ্বাসনালী বদ্ধ হইয়া শ্বাসরোধেরও আশঙ্কা থাকে।

(৩) শিশুদের বসন্তে অতিসার, তড়্কা প্রভৃতি উপসর্গগুলি প্রায়ই দেখা যায়।

(৪) রোগের শেষের দিকে **সর্ব্বাঙ্গে ফোড়া** (multiple boils) হইয়া অনেক সময় রোগী কষ্ট পায়।

(৫) কখনো কখনো ইহাতে ছেলেদের **গাঁঠ ফুলিয়া** উহার মধ্যে পূঁজের সঞ্চার হয়। দেখা গিয়াছে যে এই-জাতীয় উপসর্গ প্রায় ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্ কর্ত্তৃক ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা

আগন্তুজ ও সংক্রামক ব্যাধিগুলির চিকিৎসা সাধারণতঃ দুই রূপ প্রণালীতে করা যায়। যে সকল রোগের বিশিষ্টরূপ ঔষধাদি (specific treatment) আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার চিকিৎসা ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট প্রকার ঔষধাদির দ্বারা গতানুগতিক ভাবে করা যাইতে পারে। কিন্তু এমন কতক গুলি রোগ আছে যাহার এইরূপ বিশিষ্ট কোনো চিকিৎসা নাই। এই সকল রোগে শরীরের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করিয়া, এবং যেখানে যেটুকু ত্রুটি হইতেছে সেখানে যথাসম্ভব উহার সংশোধন করিয়া নানারূপ উপায়ে কেবল অবস্থানুযায়ী চিকিৎসা করিতে হয়। এই প্রকার চিকিৎসা সময়-সাপেক্ষ, এবং ইহার উদ্দেশ্য, রোগের যতদিন মেয়াদ ততদিন কোনোরূপে রোগীকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখা, কারণ মেয়াদ ফুরাইলে রোগী নিজেই সুস্থ হইয়া ওঠে। টাইফয়েড প্রভৃতি বহু রোগে আমরা এইরূপ চিকিৎসা করিয়া থাকি। এই প্রকার চিকিৎসাতে চিকিৎসকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আজকাল যদিও দুই-এক প্রকার নূতন চিকিৎসার কথা শুনা যাইতেছে, তথাপি এ পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে বসন্ত রোগের কোনো বিশিষ্ট (specific)

চিকিৎসা কোনো দেশের কোনো শাস্ত্রেই আবিষ্কৃত হয় নাই। অদ্যাবধি সকল দেশেই লক্ষণানুযায়ী ইহার চিকিৎসা করা হয়। আমাদের দেশে কবিরাজ মহাশয়েরা যে সকল পাঁচন ব্যবস্থা করেন তাহা নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, পল্‌তা, কট্‌কি, শ্বেতচন্দন, বেনামূল, আমলকি, বাকস, দুরালভা প্রভৃতি ভেষজ একত্রে জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার কোনোটি বা উত্তাপ-নিবারক (febrifuge), কোনোটি বা কফ-নিঃসারক (expectorant), কোনোটি বায়ুনাশক (carminative), কোনোটি রেচক (laxative), কোনোটি মূত্রবর্দ্ধক (diuretic), এবং কোনোটি তেজবর্দ্ধক (bitter tonic)। ইহার মধ্যে কোনো দ্রব্যই স্পেসিফিক্ নয়, অর্থাৎ বসন্ত রোগের নিশ্চিত আরোগ্যকারী স্বতন্ত্র ঔষধ নয়। সবগুলিই অন্যান্য রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কবিরাজী শাস্ত্রে ইহার জন্য নানারূপ প্রলেপের ব্যবস্থা আছে। তাহাও উপকারী, কিন্তু নিশ্চিতরূপে আরোগ্যকারী নয়।

অন্যান্য দেশের সম্বন্ধে সন্ধান লইলে দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে কেবল আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহার চিকিৎসা করা হইয়া থাকে, এবং ঐ সকল দেশের মৃত্যুসংখ্যা আমাদের দেশের অপেক্ষা কম। কলিকাতাতেও ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে বসন্ত রোগীদের জন্য এইরূপ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা আছে। সেখানে কত রোগী চিকিৎসিত হয় ও মৃত্যুসংখ্যা কত তাহার একটি বাৎসরিক বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	রোগীর সংখ্যা	মৃত্যুসংখ্যা	মৃত্যুর হার
১৯২০	১২৩১	৪৫৯	৩৭%
১৯২১	৫৪	১৭	৩১%
১৯২২	২৬৫	৯৬	৩৬%
১৯২৩	৭৩	২১	২৮%
১৯২৪	১৪০	৩৮	২৭%
১৯২৫	১৪৯৮	৫১৭	৩৪%
১৯২৬	৫০৬	১৫২	৩০%
১৯২৭	৯৬১	৩৪২	৩৫%

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে তথাকার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় বসন্ত রোগের মৃত্যুসংখ্যা শতকরা গড়ে ৩০-এর বেশী নয়। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে এদেশের হাঁসপাতালে রোগী প্রায় গুরুতর অবস্থাতেই যায়। লোকে সাধ্যপক্ষে কখনই হাঁসপাতালে যাইতে চায় না, রোগ নিতান্ত মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে দেখিলে তখন হাঁসপাতালের আশ্রয় লয়। সেইজন্য সহরে ১৫।২০ হাজার লোকের বসন্ত হইলেও হাঁসপাতালে ভর্ত্তির সংখ্যা অনেক কম, এবং সেগুলি সহরের বাছাই করা রোগী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ সাঙ্ঘাতিক অবস্থার রোগীদের মধ্যেও যেখানে শতকরা ৭০ জনের প্রাণ রক্ষা হয়, সেখানকার চিকিৎসাবিধি নিন্দনীয় বলা চলে না।

এই রোগে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার নীতি তাড়নশীল (offensive) নয়, সম্পূর্ণ রক্ষণশীল (defensive), অর্থাৎ লক্ষণনিবৃত্তি-মূলক (symptomatic)। কেবল ঔষধের দ্বারা নয়, নানা উপায়ে রোগীকে যতপ্রকার প্রাকৃতিক সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহার স্বাভাবিক আরোগ্যশক্তিকে উত্তেজিত করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্তর্গত। পর্য্যায়ক্রমে সেই সকল ব্যবস্থার কথা বিবৃত হইল।

বায়ু—

যাহাতে রোগী যথেষ্ট বাতাস পায় এজন্য ঘরের জানালা-দরজা সর্ব্বদা উন্মুক্ত করিয়া রাখা উচিত। স্পষ্টই দেখা যায় যে বাতাস পাইলে রোগের বিষম লক্ষণগুলি (toxic symptoms) অনেক কম থাকে। বসন্ত রোগীর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন নিতান্ত আবশ্যক। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ (Vaughan) ১৯০৯ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে বসন্ত রোগে অক্সিজেনের উপকারিতা সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে বসন্ত রোগে অষ্টম বা নবম দিন হইতে প্রায়ই শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া দ্রুততর হইতে থাকে, এবং উহা নাড়ীর গতির সহিত উচিতমত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে না; অর্থাৎ যখন নাড়ীর গতি মিনিটে ১২০, তখন হয়তো নিঃশ্বাসের গতি প্রায় ৪০ বার হইতে থাকে, অথচ বুক পরীক্ষা করিয়া ফুসফুসে কোনো দোষ পাওয়া যায় না। আরো

দেখা গিয়াছে, যে-রোগীর নিঃশ্বাসের গতি তদপেক্ষা বাড়িয়া মিনিটে ৬০ অথবা ততোধিক হয়, সে রোগী দুই-এক দিনের মধ্যে নিশ্চয় মারা যায়। অতএব রোগের প্রথম হইতেই এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়, এবং নিঃশ্বাসের মাত্রা মিনিটে ৩৫ বা ততোধিক দেখিলেই উহা বিপদের সঙ্কেত (danger signal) বুঝিয়া প্রতিকারের উপায় করিতে হয়। তিনি দেখিয়াছেন যে এই সময় একাদিক্রমে ২।৩ ঘণ্টা যাবৎ **অক্সিজেন** (oxygen inhalation) দেওয়া হইলে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায় এবং শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। পুনরায় উহা দ্রুত হইলে পুনরায় এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উপায় অবলম্বন করিতে থাকিলে নিঃশ্বাসের বেগ আর বাড়িতে পারে না। কেবল এই ব্যবস্থার দ্বারা অনেক রোগী মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে বসন্ত রোগীর পক্ষে অক্সিজেন কিরূপ প্রয়োজনীয়। রোগের প্রথম হইতে যদি ইহার অপ্রতুল না থাকে তবে পরে কৃত্রিম অক্সিজেনের প্রায়ই কোনো প্রয়োজন হয় না।

মশারি—

বাতাস সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা, আলোক সম্বন্ধে তাহা নয়। শরীরের অনাবৃত অংশেই বসন্তের অত্যধিক প্রভাব। এইজন্য রোগীর দেহ সর্ব্বদা আবৃত রাখা উচিত, এবং বায়ু সঞ্চালনের বাধা না দিয়া যাহাতে ঘর যথাসম্ভব অন্ধকার করিয়া রাখা যায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। হাঁসপাতালে প্রত্যেক রোগীকে সর্ব্বদা মশারির ভিতর রাখা হয়, এ ব্যবস্থা উত্তম। ইহাতে কতক পরিমাণে আলোক নিবারিত হয়, মশা মাছি আসিয়া রোগীকে কষ্ট দিতে পারে না, এবং রোগের বীজ উড়িয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইতেও পারে না।

নির্জ্জনতা—

রোগীর ঘর নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন হওয়া উচিত। শুশ্রূষাকারী ব্যতীত অন্য কাহাকেও তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়। ঘরে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি আসবাব ছাড়া অন্য সকল বাহুল্য দ্রব্য ও বস্ত্রাদি স্থানান্তরিত করিয়া দেওয়া উচিত।

শুশ্রূষা—

রোগীর শুশ্রূষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। যদি সম্ভব হয় তবে আত্মীয়দের উপর এই ভার না দিয়া সুদক্ষ নার্স নিযুক্ত করাই ভাল। এই রোগের উচিতমত সেবা করা বড়ই কঠিন, এবং আত্মীয়দের দ্বারা তাহা হওয়া সর্ব্বত্র সম্ভব নয়। শিক্ষিত নার্সদের কোনো বিকার বা ঘৃণাবোধ থাকে না, এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞানও শিথিল হয় না। সেইজন্য তাহারা সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচর্য্যা করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ বাঙালীর ঘরে নার্স নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা কচিৎ সম্ভবপর হইতে পারে। সুতরাং অভাব পক্ষে বাড়ীর সুস্থ ও সবল ব্যক্তিদেরই এ ভার দেওয়া উচিত। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের টীকা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কিছুকাল পূর্ব্বে টীকা লওয়া থাকিলেও তাঁহাদের তখন পুনরায় লওয়া প্রয়োজন।

চুল ছাঁটা—

রোগীর (স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েরই) মাথার চুল প্রথম হইতে যথাসম্ভব ছোট করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত। ইহা ভবিষ্যতের জন্য উপকারী,—কারণ চুল বড় থাকিলে পরে উহা পুঁজে ও রসে অত্যন্ত জড়াইয়া যায়, তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা হয় ও মাথার মধ্যে একরূপ দুর্গন্ধ হয়; তৎপরে আরোগ্যের সময় চুলের গোড়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত টান পড়ায় গোড়া আল্‌গা হইয়া ঘন ঘন চুল উঠিতে থাকে, এবং তথায় আবার চুল জন্মাইতে অনেক বিলম্ব হয়। প্রথম অবস্থাতেই মাথার চুল নেড়া করিয়া বা ছাঁটিয়া দিলে গুটিকা উঠিবার সময় কষ্টের যথেষ্ট লাঘব হয়, অথচ পরে চুল বাড়িয়া উঠিতে বিলম্ব হয় না।

পরিচ্ছন্নতা—

পরিচ্ছন্নতা বসন্ত রোগীর পক্ষে যে কত প্রয়োজনীয় তাহা বোধ হয় বলিতে হইবে না। আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতিতেও এ রোগে অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা আছে। শুদ্ধ ও পবিত্র না হইয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবার কাহারো অধিকার নাই। রোগীর গৃহে দেবতার অধিষ্ঠান বোধে উহা মন্দিরের মত পরিষ্কার রাখা হয়, নিত্য ধূপধুনা জলে,

এবং অশুদ্ধ ভাবে কেহ রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না। এ ব্যবস্থা বড়ই ভাল, কারণ এই সকল সাবধানতার উপর রোগীর জীবন নির্ভর করে। যাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, একটু অসাবধান হইলে বাহিরের নানারূপ বিষাক্ত বীজাণু আসিয়া অনায়াসে তাহার ক্ষতস্থান সংক্রামিত করিতে পারে। এইজন্য রোগীকে পৃথক ভাবে রাখিয়া পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উচিত। গৃহে কোথাও কোনো আবর্জ্জনা না থাকে, বিছানা নিত্য পরিষ্কার থাকে,— এবং রোগীর চোখ, নাক, দাঁত, মুখ প্রভৃতি অবয়ব নিয়মিতরূপে প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়া পরিষ্কার করা হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত।

জল—

বসন্ত রোগেও যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। রোগী যতই জল পান করিবে ততই ক্লেদপদার্থ ধৌত হইয়া নিষ্কাশিত হইয়া যাইবে। তবে নিত্য নিত্য জলপান করিতে রোগীর অনিচ্ছা হইতে পারে, সেইজন্য নানারূপ পানীয়ের ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে কোনোরূপে যথেষ্ট জলীয় পদার্থ পেটে যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা উচিত। এজন্য ডাবের জল, চা, ফলের রস, সোডা, লিমনেড, মিছরির সরবৎ, ঘোল, গ্লুকোজ, বার্লির জল, ছানার জল, প্রভৃতি বারে বারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

স্নান—

স্নান করানো বসন্ত চিকিৎসার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। রোগের প্রথম অবস্থায় যদি গুটিকা বাহির হইতে বিলম্ব হয় এবং চতুর্থ দিনের পরেও জ্বরের উপশম না হয়, তখন গরম জলে স্নান করাইলে বা গরম জলে তোয়ালে ভিজাইয়া গা মুছিয়া দিলে (tepid sponging) এবং গরম পানীয়ের ব্যবস্থা করিলে শীঘ্র গুটিকা বাহির হইয়া পড়ে ও যন্ত্রণার লাঘব হয়। তদ্ভিন্ন এই রোগের সকল অবস্থাতেই জ্বরের উত্তাপ অধিক হওয়া মাত্র স্নানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রীতিমত স্নান করাইয়া দিলে অথবা উত্তমরূপে গা ধোয়াইয়া দিলে বসন্ত রোগীর যত উপকার হয়, কোনো ঔষধে তাহা হয় না। স্নান করাইবামাত্র জ্বরের তাপ কমিয়া যায়, গাত্রদাহ দূর হয়, নানারূপ আক্ষেপ ও প্রলাপ প্রভৃতি বিষলক্ষণ (toxic symptoms) নিবারিত হয়,

শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক হইয়া আসে, সুনিদ্রা হয়, এবং হৃদ্‌পিণ্ড সবল হইয়া নাড়ীর অবস্থার উন্নতি হয়। স্নান সম্বন্ধে কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, ইহা একদিনের মধ্যে চার-পাঁচবারও চলিতে পারে। যখনই জ্বর বাড়িয়া উঠিবে তখনই স্নান করাইয়া দেওয়া উত্তম। রোগের বাড়ের মুখে এইরূপে কয়েকবার স্নান করাইয়া দিলে লক্ষণগুলির অনেক উপশম হয়, এবং রোগ বক্রভাব ধারণের অবকাশ পায় না। এইজন্য স্নানের উপযুক্ত এক টব জল ও অন্যান্য আয়োজন সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখা উচিত, যাহাতে প্রয়োজন হইবামাত্র রোগীকে কিছুক্ষণের জন্য গলা হইতে পা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখা যাইতে পারে। এরূপ আয়োজনের সুবিধা না হইলে রোগীকে অয়েল-ক্লথের উপর শোয়াইয়া বড় বড় তোয়ালে বা কাপড় ভিজাইয়া সমস্ত শরীরে জড়াইয়া দিয়া এবং **পুনঃ পুনঃ** তাহা বদল করিয়া ১০।১৫ মিনিট পর্য্যন্ত রাখার পর শুষ্কবস্ত্রে গা মোছাইয়া দেওয়া চলিতে পারে। অবশ্য এ সময় ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রাখা উচিত, নতুবা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। স্নান শেষ হইলে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক কাপড় গায়ে ঢাকা দিতে হয়। রোগের শেষের দিকে যখন গুটিকা পাকিয়া ঘা হইবার উপক্রম হয়, তখন টবের জলে কিছু পটাস্ পার্ম্মাঙ্গানেট (Pot. Permanganate) গুলিয়া তাহাতে স্নান করানো অতি উত্তম। ইহাতে ঘায়ের যথেষ্ট উপকার হয় এবং দুর্গন্ধ দূর হয়। গুটিকা শুকাইতে থাকিলে ও জ্বর ছাড়িয়া গেলেও প্রত্যহ গরম জলে স্নান করানো উচিত। ইহাতে মরা ছাল শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া যায়।

চোখের সেবা—

রোগের প্রথম অবস্থা হইতেই চোখের বিশেষ যত্ন লওয়া এবং নিত্য চোখ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। এ বিষয়ে সাবধান না হইলে শীঘ্রই চোখে ঘা (corneal ulcer) হয় এবং চিরকালের জন্য চোখ নষ্ট হইয়া যায়। এই রোগে প্রথম হইতেই **মেথিলিন ব্লু** (Methylene Blue $\frac{1}{2}$% to 1% solution, অর্থাৎ ২ গ্রেন হইতে ৫ গ্রেন মাত্রায় উহা এক আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া লোশন প্রস্তুত করিয়া) প্রত্যহ ২।৩ বার নিয়মিতরূপে চোখের

ভিতর প্রয়োগ করিলে চোখ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। চোখে একবার ঘা হইয়া গেলে তাহা আরোগ্য করা কঠিন। তখন **বিন্‌-আইওডাইড লোশন** (Hyd. Biniodide lotion) দিয়া চোখ ধোয়াইয়া তদ্দ্বারা ঘন ঘন সেঁক (compress) দিতে হয়, বা electric cautery দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

তৈল লেপন—

গুটিকা পাকিবার পর উহার যন্ত্রণা নিবারণের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় গুটিকাগুলির উপর পুনঃ পুনঃ তৈল লেপন করিয়া স্নিগ্ধ রাখা। এই তৈলের মধ্যে যন্ত্রণা-নিবারক কয়েকপ্রকার ঔষধ মিশাইয়া দিলে কষ্টের আরো লাঘব হয়। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে নিম্নলিখিত তৈল ব্যবহার করা হয়ঃ—

Thymol (থাইমল্)—	ʒiii
Menthol (মেন্থল্)—	ʒii
Eucalyptol (ইউক্যালিপটল্)—	ʒiv
Boric Acid (বোরিক অ্যাসিড)—	℥fs
Salicylic Acid (স্যালিসিলিক্ অ্যাসিড)—	℥fs
Aqua Calcis (চুণের জল)—	℥fs
Amylum (ষ্টার্চ)—	℥iii
Olive oil (ওলিভ অয়েল)	ad—℥xvi

এই তৈল এতই আরামদায়ক যে রোগীরা ইহা চাহিয়া চাহিয়া গায়ে মাখে। ইহা কষ্টও নিবারণ করে এবং দুর্গন্ধও নাশ করে। সর্ব্বদা ইহা মাখানো থাকিলে বাহিরের কোনো বীজাণু ঘায়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, এবং ঝাঁজ থাকে বলিয়া মশা মাছিও গায়ে বসিয়া বিরক্ত করিতে পারে না। ইহা রোগের সংক্রমণও যথেষ্ট নিবারণ করে, কারণ গায়ের চামড়া তৈল-নিষিক্ত থাকিলে গুটিকা শুকাইবার সময় তাহার ছালগুলি গায়ের সহিত জুড়িয়া থাকে, সুতরাং উড়িয়া গিয়া সর্ব্বত্র রোগ ছড়াইতে পারে না।

ঔষধাদি—

বসন্ত রোগে ঔষধ সম্বন্ধে কোনো বিশেষ বিধি বা নিষেধ নাই,—প্রয়োজন অনুসারে সকল প্রকার ঔষধই দিতে পারা যায়। সাধারণতঃ ইহাতে প্রথম অবস্থা হইতে এমন ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে প্রচুর প্রস্রাব ও ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া তদ্দ্বারা ক্লেদবস্তু কতক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। এজন্য যথেষ্ট অ্যাল্‌কালাইন ঔষধ—যথা, লাইকার অ্যামন্ অ্যাসিটেট্ (Liqr. Ammon Acetatis), পটাস্ সাইট্রেট (Pot. Citras), সোডা বাইকার্ব (Soda Bicarb), স্পিরিট ঈথার নাইট্রোসাই (Spirit Ether Nitrosi), প্রভৃতি প্রয়োগ করা উচিত। এই সঙ্গে প্রয়োজনমত হৃদ্‌পিণ্ডের বলকারক ঔষধ—যথা, স্পিরিট অ্যামন্ অ্যারোম্যাটিক্ (Spirit Ammon Aromat.), টিঞ্চার ষ্ট্রোফ্যান্‌থাস্ (Tinct. Strophanthus) প্রভৃতি, এবং স্বতন্ত্রভাবে কিছু ব্রাণ্ডিদেওয়াও চলিতে পারে। সাধারণ বসন্তে এই সকল ঔষধই ব্যবহার করা হয় এবং অন্যান্যরূপ উপসর্গ না থাকিলে ও জ্বর কমিয়া আসিলে শেষের দিকে কিছু কুইনিন, টিঞ্চার ষ্টীল্ প্রভৃতি দেওয়া যায়। কিন্তু কোনো উপসর্গ থাকিলে তদনুসারে তাহার বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা করা আবশ্যক হয়।

উপসর্গ চিকিৎসা—

প্রথম দুই-একদিন কোমরে ও গায়ে ব্যথা অথবা মাথাধরা অতিরিক্ত হইলে—Aspirin, Genasprin, Cafiaspirin, Phenalgin, Novalgin, Veramon, Gardan, প্রভৃতির যে কোনোটি কয়েকমাত্রা পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যায়। জ্বরের প্রবল অবস্থায় পাইরামিডন্ (Pyramidon) কয়েকদফা ১ গ্রেন মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহাতে জ্বর এবং রোগের যন্ত্রণার কিছু লাঘব হয়। তবে এ সকল ঔষধ বেশী দেওয়া উচিত নয়। প্রয়োজন হইলে স্থানবিশেষে মর্ফিয়া-ঘটিত ঔষধও ব্যবহার করা যায়। ঘুম না হইলে ব্রোমাইড প্রভৃতি দেওয়া চলে। এই সকল নানাবিধ উপায়ে রোগীর যন্ত্রণার উপস্থিতমত যতটা লাঘব করিতে পারা যায় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

পরবর্ত্তী বাড়াবাড়ি অবস্থায় রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়িলে ব্রাণ্ডি, মৃগনাভি, ষ্ট্রীকৃনিন্, অ্যাড্রেনেলিন্, পিটুইট্রিন্, ষ্ট্রোফ্যানথিন্, কার্ডিয়াজল, প্রভৃতি যথাবিধি প্রয়োগ করা আবশ্যক। বিকার ও অন্যান্য বিষাক্ত লক্ষণ সকল (toxæmic symptoms) দেখা গেলে গ্লুকোজ-সহযোগে অধঃত্বাচিক সেলাইন (Normal saline with 5% Glucose, subcutaneous) দিলেও উপকার হয়। ইন্ট্রাভেনাস্ গ্লুকোজও (20 to 50 c.c. of 25% solution) ইহাতে দেওয়া যাইতে পারে।

রক্তজ বসন্তে শরীরের নানাস্থান হইতে রক্তক্ষয় হইতে থাকিলে ক্যাল্সিয়াম্ ল্যাকটেট্ Calcium Lactate) ১০ গ্রেন মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেওয়া হয়। উহাতে অ্যাড্রেনেলিন ইন্জেক্শন দিলেও কখনো কখনো উপকার হয়। অত্যধিক রক্তপাত হইলে ঘোড়ার রক্ত হইতে প্রস্তুত নর্ম্যাল সিরাম বা হিমোপ্ল্যাস্টিন্ প্রভৃতি ইন্জেকশন দিলে উপকার হইতে পারে।

অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে মুখের ভিতর ঘা হইয়া অথবা কোনোরূপে অপরিষ্কার হইয়া থাকিলে **গ্লিসিরিন-বোরাক্স** (Borax and glycerine) প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া মুখের ভিতর উত্তমরূপে লাগাইয়া দিতে হয়।

নাকের ভিতর ঘা হইলে অথবা ময়লা জমিয়া নাক বন্ধ হইয়া গেলে তুলি দ্বারা **গ্লাইকো থাইমোলিন্** প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া সাবধানে নাক পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। গলায় ব্যথা হইলে **ক্লোরিটোন্ ইন্হেল্যান্ট্** (Chloretone inhalant) বা ঐ-জাতীয় ঔষধ অ্যাটোমাইজারের দ্বারা গলার ভিতর স্প্রে (throat-spray) দিলে যথেষ্ট আরাম পাওয়া যায়। গলার ব্যথা অত্যন্ত বেশী হইলে বা ঢোক গিলিতে কষ্ট হইলে সমান ভাগ কোকেন সলিউশন (Cocaine Hydrochlor. grs. 30 in Distilled Water 1 oz.) ও অ্যাড্রেনেলিন সলিউশন একত্রে মিশ্রিত করিয়া গলার ভিতরে তুলির দ্বারা বারকয়েক প্রয়োগ করিলে ব্যথা অনেক কমিয়া যায়। হাতের তেলোয় বা পায়ের তলায় পুরু চামড়ার ভিতর গুটিকা উঠিলে এক প্রকার যন্ত্রণা হয়; ঐ সকল স্থানে ঘন ঘন গরম সেক (compress) দিলে তাহার নিবৃত্তি হয়। উদরাময় দেখা দিলে বিস্‌মাথ (Bismuth) ও ট্যানিজেন (Tannigen) প্রভৃতি ধারক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

বিশিষ্ট চিকিৎসা—

জনৈক হেল্থ-অফিসার (ডাক্তার এ. দাসগুপ্ত) এক নূতন প্রকার চিকিৎসার কথা বলিয়াছেন। কয়েকটি রোগীকে তিনি **আইওডিন** ইন্ট্রামাস্কুলার (intramuscular) ইন্জেকশন দিয়া বিশেষ উপকার পান এবং সর্ব্বত্র একথা প্রচার করেন। তবে এইরূপ ইন্জেকশনের জন্য সাধারণ টিঞ্চার আইওডিন ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ উহাতে স্পিরিট (alcohol) থাকে; উহার পরিবর্ত্তে জল দিয়া **লাইকার আইওডিন** প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিত (আইওডিন ১২ গ্রেন, পটাস্ আইওডাইড ১২ গ্রেন, ও ডিস্টিল্ড্ জল ১ আউন্স)। এই লাইকার আইওডিন টাটকা প্রস্তুত করিয়া লওয়াই ভাল, কারণ বেশীদিন থাকিলে ইহার গুণ কমিয়া যায়। সকলেই ইহা অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পারেন। এই **লাইকার আইওডিন দুধের সহিত মিশাইয়া** ইন্জেকশন দিতে হয়। প্রথমে কিছু টাট্কা গোদুগ্ধ ১৫ মিনিট যাবৎ অগ্নিতে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইতে হয়। পরে শীতল করিয়া উহার সহিত লাইকার আইওডিন মিশাইয়া (ষ্টেরিলাইজ করা টেষ্ট্ টিউব বা পিচকারীর মধ্যে লইয়া উহা মিশ্রিত করা উচিত) ইন্জেকশন দিতে হয়। ইন্জেকশনের মাত্রা,—৫ সি.সি. পরিমাণ দুধে ৫ ফোঁটা লাইকার আইওডিন হইতে আরম্ভ করিয়া,—১০ সি. সি. দুধে ১০ বা ১৫ ফোঁটা লাইকার আইওডিন পর্য্যন্ত। বয়স ও রোগের অবস্থা অনুসারে ,মাত্রাটি স্থির করিয়া লইতে হয়। এই ইন্জেকশন পাছার বা বাহুর মাংসপেশীর গভীরতম প্রদেশে প্রয়োগ করিতে হয়। একদিন বা দুইদিন অন্তর দুই তিনটির অধিক ইন্জেকশন দিবার প্রয়োজন হয় না। দেখা গিয়াছে যে রোগের প্রথম অবস্থাতেই, অর্থাৎ গুটিকা বাহির হইবার পূর্ব্বেই যাহাদের ইন্জেকশন দেওয়া হইয়াছে,—তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের গুটিকা না উঠিয়াই রোগ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। বাকী যে ৫০ জনের গুটিকা উঠিয়াছিল, তাহা পরিমাণে সামান্য, এবং উহাদের মধ্যে কেহই মরে নাই। রোগের পরিণত অবস্থায় যাহাদের এই চিকিৎসা আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে কয়েকজন মরিয়াছে। এই

চিকিৎসা সকলেই অনায়াসে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পারেন। যিনি এই প্রকার ইন্‌জেকশন দিতে অনিচ্ছুক হইবেন, তিনি লাইকার আইওডিন বা সাধারণ টিঞ্চার আইওডিন ৫।৬ ফোঁটা মাত্রায় অল্প দুধের সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া খাইতে দিয়াও দেখিতে পারেন। আইওডিন দুধের সহিত মিলাইয়া খাইতে দেওয়াই বিধেয়, কারণ দুধের সহিত মিশিয়া ইহা Iodo-caseine compound প্রস্তুত করে, তাহা থাইরয়েড্ গ্রন্থিকে উত্তেজিত করিয়া শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধী শক্তি বাড়াইয়া দেয়।

আরো একপ্রকার চিকিৎসা আছে সাল্‌ফার্সিনল্ (Sulfarsenol) ইন্‌জেকশন। ইহা আর্সেনিক হইতে প্রস্তুত, এবং আমরা সিফিলিস বা উপদংশ রোগে ইহা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার সুবিধা এই যে ইহা শিরার মধ্যে ইন্‌জেকশন দিবার প্রয়োজন হয় না, চামড়ার নীচে যেখানেই হউক দেওয়া চলিতে পারে এবং তাহাতে ব্যথাও অধিক হয় না। বসন্তরোগে এই ঔষধ অল্প মাত্রায় (6 ctgrm.) ডিস্‌টিল্‌ড্ জলের সহিত গুলিয়া ইন্‌জেকশন দিতে হয়। 12 ctgrm.-এর বেশী মাত্রা দিবার প্রয়োজন নাই, এবং ২।৪ দিন অন্তর ২।৩টির বেশী ইন্‌জেকশন দিতে হয় না।*

---

* সম্প্রতি ভিজগাপটম হইতে ডাঃ গোবিন্দ নায়ার (J. I. M. A., July 1935) বসন্তরোগের একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রকার চিকিৎসার কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই রোগে **লিভার-এক্স্‌ট্রাক্ট** ইন্‌জেকশন দিলে আশ্চর্য্য ফল হয়। গুটিকা বাহির হইবার পূর্ব্বে দিলে উহা অনেক সময় প্রকাশই পায় না, এবং গুটিকা উঠিবার পরে দিলেও তাহা আর পাকে না, জলভরা অবস্থাতেই শুকাইয়া যাইতে দেখা যায়। কেবল তাহাই নয়, ভালরূপে পাকিতে পায় না বলিয়া উহা আরোগ্য হইবার পর কোনো দাগও থাকে না। অদ্যাবধি এমন কোনো ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা বসন্তের দাগ (pitting) নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু শুনা যাইতেছে লিভার-এক্স্‌ট্রাক্ট্ ইন্‌জেকশন দিলে তাহাই হয়। আরো উত্তম কথা, এই ইন্‌জেক্শন দিতে আরম্ভ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে রোগের অনেক কষ্ট উপশম হইয়া যায়, অর্থাৎ জ্বরও কমিয়া যায় এবং উপসর্গ গুলিও দূর হইয়া যায়। কিরূপে ইহা বসন্তরোগে এত উপকার করে তাহা বলা যায় না, তবে

পথ্য—

পথ্যের মধ্যে দুধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বার্লি, সাগু, গ্লুকোজ, ফলের রস, শাক-সবজীর ঝোল, চা, কোকো, মিছরীর সরবৎ, অর্দ্ধ-সিদ্ধ ডিম প্রভৃতি নানারূপ পথ্যের ব্যবস্থা ইহাতে অবস্থা মত করা যাইতে পারে। বরফ-জল পান করিতে দেওয়া বা বরফের টুকরা চুষিতে দেওয়া ভালই,—তাহাতে গলার ব্যথা কমে, মুখ পরিষ্কার রাখে এবং রোগীও আরাম বোধ করে।

রোগী একটু সারিয়া আসিলেই তাহাকে উঠিতে এবং বসিতে দেওয়া উচিত, কিন্তু যতদিন না সমস্ত ছালগুলি একেবারে পরিষ্কার হইয়া পড়িয়া যায়, ততদিন ঘরের বাহিরে যাইতে বা কাহারো সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নয়।

ক্ষতচিহ্ন নিবারণ—

বসন্তরোগ আরোগ্য হইয়া গেলে মুখে এবং অন্যান্য স্থানে চিরকালের জন্য একপ্রকার গভীর ক্ষতের চিহ্ন থাকিয়া যায়; যে গুটিকা গাত্রচর্ম্মের যত গভীরতর স্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহার চিহ্নও তত গভীর হয়। রোগের প্রথম হইতে মুখে আলোক লাগিতে না দিলে, সর্ব্বদা গ্লিসিরিন ও বরফজলে লিন্ট্ ভিজাইয়া মুখমণ্ডলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিলে (মুখ চোখ নাক বাদ দিয়া), এবং পাকা অবস্থায় নিত্য তেলে ভিজাইয়া রাখিলে দাগ কিছু কম হইতে পারে। মিশর দেশের কোনো খ্যাতনামা চিকিৎসক এই চিহ্ন নিবারণের আরো একটি উপায় বলিয়াছেন। তাঁহার মতে

সম্ভবতঃ ইহার দ্বারা রোগীর স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়া যায়, সেইজন্য সময়মত প্রয়োগ করিলে রোগের গতি প্রতিরুদ্ধ হয়। লিভার এক্স্‌ট্রাক্ট রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে সেইজন্য ইহা রক্তজ বসন্তেও উপকারী। ইহার ইন্‌জেক্শন প্রত্যহ একটি করিয়া দিতে হয়, এবং সর্ব্বসমেত ৮।১০টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম দুইদিন কেবল ৫ সি. সি. মাত্রায় দিয়া পরবর্ত্তী মাত্রাগুলি ২ সি. সি. করিয়া দিতে হয়। রোগ কঠিন না হইলে ২ সি. সি. করিয়া মাত্রাই যথেষ্ট। ডাঃ নায়ার **ক্যাম্পোলোন** (Campolon) অথবা বেঙ্গল কেমিক্যালের **লিভার-এক্সট্রাক্ট** দিতে বলেন। তাঁহার মতে বসন্তের ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা।

গুটিকা প্রকাশ হইবার পরেই ২০ গ্রেন পটাস পার্ম্যাঙ্গানেট এক আউন্স জলে গুলিয়া (5% solution of Pot. Permanganate) উহার দ্বারা তুলা ভিজাইয়া প্রত্যহ তিনবার করিয়া মুখে হাতে এবং পায়ে মাখাইয়া দিতে হয়। এইরূপ প্রত্যহ লাগাইতে থাকিলে ৭।৮ দিনের পর ঐ সকল স্থানে পার্ম্যাঙ্গানেটের একটি কালো ছোপ পড়ে। তাহার পর আর ইহা লাগাইবার আবশ্যক হয় না। রোগ আরোগ্য হইয়া গেলে ক্রমশঃ ঐ স্থানের ছালটি অল্পে অল্পে উঠিয়া যায় এবং তাহার অন্তরাল হইতে যে নূতন মসৃণ চামড়া দেখা দেয় তাহাতে চিহ্ন অতি অল্পই থাকে।

কালাজ্বরে যে এন্টিমনি-টার্টারেট্ ইন্‌জেকশন ব্যবহৃত হইত, উহা অতি অল্পমাত্রায় কয়েকটি ইন্‌জেকশন দিলেও বসন্তের দাগ অনেকটা মিলাইয়া যায়। এক্স্‌রে, আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি প্রভৃতির দ্বারাও দাগ কিছু কমিতে পারে।

বসন্তরোগ নিবারণের উপায় (Prevention)

আরোগ্য হওয়া অপেক্ষা নীরোগ থাকা শ্রেয়, একথা রোগমাত্রের পক্ষেই সত্য বটে, কিন্তু বসন্তরোগের পক্ষে একথা সর্ব্বাপেক্ষা সত্য। এ রোগের মত যন্ত্রণাও অল্প রোগেই আছে, এরূপ জীবনব্যাপী কুৎসিত চিহ্নও কোনো রোগ রাখিয়া যায় না।

সাধ্যপক্ষে এ রোগের নিবারণ করাই উচিত, এবং তাহার একমাত্র উপায় সকলের একযোগে টীকা লওয়া। অবশ্য এ বিষয়েও নানা জনের নানারূপ মত আছে। কিন্তু মানুষের মতভেদ সকল বিষয়েই, এবং উহা চিরকালই থাকিবে। যদি ইহা অবশ্যগ্রহণীয়রূপে সকলকেই লইতে বাধ্য করা হয়, তখন আর ঐ সকল মতভেদের অবকাশ থাকে না। জার্ম্মানিতে অলঙ্ঘ্য আইন অনুসারে সকলকেই শিশু অবস্থায় (দুই বৎসর বয়স অতিক্রম হইবার পূর্ব্বে) একবার, কৈশোরে (স্কুলের পড়া শেষ করিবার সময়) একবার, এবং যৌবনে (সৈন্যদলে যোগ দিবার সময়) একবার টীকা লইতে হয়। ইহারই ফলে ১৮৪৪ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বিপুল জার্ম্মান সৈন্যের ভিতর একজনেরও বসন্ত হয় নাই। বিদেশীদের পক্ষেও তথায় নিয়মের ব্যতিক্রম নাই; টীকা না লইলে কাহাকেও সে দেশের সীমানার মধ্যে

প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এইরূপ সাবধানতার ফলে বসন্তরোগ ঐ দেশ হইতে প্রায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে; টীকার উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ থাকিতে পারে? আর ঐ দেশের অবস্থার সহিত আমাদের দেশের অবস্থার একবার তুলনা করিয়া দেখুন। এখানে কত বড় বড় পরিবার যে বসন্তরোগে একেবারে উজাড় হইয়া যায় তাহা এখনও চোখের উপর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

টীকার ইতিহাস—

টীকা দিবার উদ্দেশ্য বসন্তের বীজ সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করাইয়া কৃত্রিম ভাবে এমন বসন্ত রোগের অবতারণা করা,—যাহাতে জীবনের অনিষ্ট না করিয়া উহা সামান্য মাত্র জন্মায়, এবং তদ্দ্বারা শরীরে ইমিউনিটি সঞ্চিত হয়। পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে বসন্ত-বীজ যখন শ্বাস বায়ুর সহিত শরীরে প্রবেশ করে তখন রোগটি রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়; কিন্তু বায়ুর সহিত না গিয়া উহা যদি রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরে প্রবেশ করে, তখন রোগের প্রকাশ অতি মৃদু হয়। এই অভিজ্ঞতা হইতেই রক্তের সহিত বীজ মিশাইয়া টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

প্রাচ্যদেশে পূর্ব্বে বসন্ত রোগীর গুটিকা হইতে বীজ লইয়া সরাসরি সুস্থ ব্যক্তির শরীরে টীকা দেওয়ার প্রথা ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা টীকার উপকারিতা সম্বন্ধে অতি স্পষ্টভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। ধন্বন্তরি প্রণীত শাক্তেয় গ্রন্থে একটি শ্লোক আছে, তাহার ভাবার্থ এই—"মানুষের গায়ে বা গরুর বাঁটে যে গুটিকা হয়, তাহার রস ছুরির ফলকের দ্বারা সংগ্রহ করিয়া যদি অন্য কাহারো রক্তের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহার ফলে জর হয় এবং অনুরূপ গুটিকা বাহির হয়।" সে কালে বৈদ্যেরা বসন্ত-রোগীর তেজস্বী বীজ লইয়া টীকা দিতেন, সেই টীকা উঠিলে তাহার গুণ বহুকাল যাবৎ নষ্ট হইত না। কিন্তু সেই বীজ অতি তীব্র, সুতরাং অধিকাংশ স্থলে উহাতে আসল বসন্ত রোগের মত প্রবল লক্ষণ সকল দেখা দিত। সেই জন্য টীকা লওয়াকে তখন লোকে বড়ই ভয় করিত। টীকা লওয়ার নামে সেই ভয় আমাদের দেশে এখনও অনেক স্থলে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

গোবসন্তের বীজ যে মনুষ্য-বসন্তের বীজ অপেক্ষা অনেক মৃদু, এবং গোবীজের টীকা লইলেও যে প্রকৃত বসন্ত-রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, এ রহস্য পাশ্চাত্য দেশে ১৬৮০ সালে জেনার (Jenner) প্রথম আবিষ্কার করেন। মানুষের মত গো মহিষাদিরও বসন্ত-রোগ হয়, কিন্তু তাহা মারাত্মক নয়, আর তাহাতে বহুসংখ্যক গুটিকাও হয় না, উহাদের বাঁটে ও তলপেটেই মাত্র কয়েকটি গুটিকা বাহির হইতে দেখা যায়। এই গুটিকা দেখিতে অবিকল বসন্তের গুটিকার মত। গরু দোহন করিবার সময় এই গুটিকার রস কোনো উপায়ে লাগিয়া বিলাতে গোয়ালাদের হাতের উপর মধ্যে মধ্যে এইরূপ গুটিকা দেখা দিত, এবং তাহাদের কখনো বসন্ত-রোগ হইত না। এই জন্য তাহাদের মধ্যে ধারণা ছিল যে গো-বসন্ত হইলে আর আসল বসন্ত হইতে পারে না। জেনারের যখন ছাত্রাবস্থা, তখন এক গোয়ালিনীর নিকট এই কথা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন যে ইহা যদি সত্য হয় তবে সকলের পক্ষেই মনুষ্য-বসন্তের টীকার পরিবর্ত্তে গোবসন্তের টীকা দিয়া বসন্ত রোগের প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। অতঃপর কিছু কাল পরে এক বালিকার হাতে গোবসন্ত হওয়াতে তাহার বীজ লইয়া তিনি একটি ছেলের হাতে টীকা দেন। ফলাফল পরীক্ষার নিমিত্ত ইহার এক মাস পরে মনুষ্য-বসন্তের বীজ লইয়া আবার তাহাকে টীকা দেন, কিন্তু এ টীকা আর উঠিল না। গো-টীকার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শীঘ্রই সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল। তখন হইতেই গোবীজের টীকা দেওয়া সর্ব্বদেশে প্রচলিত হইয়াছে।

টীকার উপকারিতা—

আমেরিকাতেও গোবীজ লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে। বারোটি ছেলেকে গোবীজের টীকা দিয়া কিছুকাল পরে মনুষ্য-বসন্তের বীজ তাহাদের শরীরে ইন্‌জেক্‌শন করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কাহারো বসন্ত হইল না। অথচ ঐ বীজই অপর দুইটি ছেলের (unvaccinated) শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল এবং দুইজনেরই বসন্ত দেখা দিল। এই দুই ছেলের গুটিকার বীজ লইয়া পূর্ব্বোক্ত বারোজনের দেহে আবার তাহা প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু উহাতেও তাহাদের কিছু হইল না। পুনঃ পুনঃ

এই সকল পরীক্ষার দ্বারা গোবীজের নিশ্চিত উপকারিতা সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

পরীক্ষার দ্বারা ইহাও দেখা গিয়াছে যে গরুর তলপেটে আসল বসন্ত-বীজ লইয়া টীকা দিলে তথায় মানুষের মত বসন্ত না হইয়া গোবসন্তই হয়, এবং ঐ বীজের তেজ অনেক কমিয়া যায়; আবার ঐ গুটিকারই রস মানুষের শরীরে টীকা দিলে তখন কেবল গো-টীকার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। অর্থাৎ একই বসন্তের বীজ এক মানুষের শরীর হইতে অন্য মানুষের শরীরে সঞ্চারিত হইলে একই প্রকার রোগ প্রকাশ করে, কিন্তু একবার গরুর শরীরের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া আসিলেই উহা রূপান্তরিত হইয়া যায়, এবং আর কখনও তাহা আসল বসন্তের পূর্ব্বতেজ ফিরিয়া পায় না। এই রূপান্তরিত গোবীজ যথেষ্ট নিস্তেজ, অথচ ইহার গুণ এই যে যদিও ইহার টীকা দেওয়াতে কেবল একটি মাত্র গুটিকা বাহির হয় এবং শরীরের কষ্টও কম হয়, তথাপি ইহা বসন্তের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে সকলকে রক্ষা করিতে পারে। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হওয়াতে বিলাতের British Medical Association হইতে এক তদন্ত-কমিশন নিযুক্ত করা হয় (Royal Commission, 1896)। এই কমিশন হইতে ইহার সাফল্য ও নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহার ফলে গোবীজের টীকা সকলের গ্রহণীয় এবং আসল বসন্তের টীকা লওয়া আইনতঃ নিষিদ্ধ অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহার পর আমাদের দেশেও ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গোবীজের টীকার প্রচলন করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে দেশী টীকা দেওয়া আইনতঃ অপরাধ বলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য বর্ত্তমানে দেশী টীকা দেওয়া উঠিয়া গিয়াছে এবং সাধারণের সুবিধার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ হইতে প্রচুর গোবীজ প্রস্তুত করিয়া বিনাব্যয়ে দেশের সর্ব্বত্র টীকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

টীকার বিপক্ষে যুক্তি—

টীকা লওয়ার বিপক্ষে যুক্তি আছে এই যে টীকা লওয়া সত্ত্বেও কাহারো কাহারো বসন্ত হইতে দেখা যায়, সুতরাং টীকা লইলে যে সকলেই বসন্ত

হইতে নিশ্চিত নিষ্কৃতি পাইবে তাহা বলা যায় না। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে ১৯২৫ সালে যতগুলি রোগী ভর্তি হইয়াছিল (মোট ১৪৯৮) তন্মধ্যে ৬৩৭ জনের একবার করিয়া টীকা লওয়া হইয়াছিল,—তবু ইহাদের বসন্ত হইল এবং ইহাদের মধ্যেও ১১৯ জন মারা গেল। তদ্ভিন্ন যাহারা ২।৩ বার করিয়া টীকা লইয়াছে এমন ৫২টি রোগীর মধ্যেও ৭ জন মারা গেল। অতএব এই সকল লোককে টীকা দেওয়া সত্ত্বেও রক্ষা করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে টীকার এই প্রকার নিষ্ফলতার অনেক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যথা—(১) টীকা লইলেই যে ফলতঃ তাহার গুণ নিশ্চয় শরীরের মধ্যে স্থায়ীভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে এমন নাও হইতে পারে। (২) টীকার বীজ নিত্য বরফের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে এবং ২।১ দিনের অধিক কাল বাহিরে পড়িয়া থাকিলে তাহার গুণ থাকে না। তদ্ব্যতীত বীজ প্রস্তুতকালীন দৈবাৎ কোনো কিছু ত্রুটি হইলে তাহা নিষ্ক্রিয় হইতে পারে। ঐ প্রকার বীজ হইতে টীকা দিলে তাহার ফল স্থায়ী হয় না। (৩) টীকা দিবার সময়ও অসাবধানতা বা অন্যমনস্কতার ফলে নানা দোষ ঘটিতে পারে। সুতরাং টীকা লইলেই যে তাহা সন্তোষজনক হইল এ কথা বলা যায় না। ছুরির আঁচড় দিয়া অধিক রক্ত নির্গত হইলে বীজ তাহাতে ধুইয়া যাইতে পারে; টিঞ্চার আইওডিন বা অন্য কোনো তেজী ঔষধ দিয়া চামড়া পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর টীকা দিলে বীজ মরিয়া যায়; টীকা দিবার পূর্ব্বে ছুরি পোড়াইয়া লইয়া গরম থাকিতে থাকিতে টীকা দিলে তাহার উত্তাপেও বীজ মরিয়া যাইতে পারে। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত টীকা সফল ভাবে উঠিতে না দেখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত টীকা লওয়া হইয়াছে বলিয়া উহা গণ্য হইতে পারে না। (৪) টীকা সফল হইলেও তাহার ইমিউনিটি সকলের পক্ষে সমানকাল স্থায়ী হয় না। সাধারণতঃ টীকার গুণ ৪।৫ বৎসর যাবৎ সতেজ থাকিলেও কাহারো কাহারো পক্ষে ৪।৫ মাসের মধ্যেই টীকার ইমিউনিটি নিঃশেষ হইয়া যায়, এবং তখন আর তাহার শরীরে রোগ জন্মিতে বাধা থাকে না।

বিলাতে একদল বিরুদ্ধবাদী আছেন, তাঁহারা টীকা লওয়াতে দুই প্রকার বিপত্তির কথা বলেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে জেনারের আবিষ্কারের

পূর্ব্বে যখন টীকা লওয়ার বহু প্রচলন ছিল না, তখন রোগটি এখনকার মত মৃদু আকারে হইতে পারিত না, সুতরাং এখনকার মত অজানিত ভাবে সমাজের মধ্যে উহার সংক্রমণ প্রবেশ করিতে পারিত না। এইজন্য তাঁহারা জেনারের নামে দোষ দিয়া বলেন—"To Jenner we owe the chief of these difficulties. Through him Small Pox has become a different disease, easier to suffer but harder to distinguish." অর্থাৎ জেনার বসন্ত রোগের প্রকৃতি বদলাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে রোগভোগ সহজ হইয়াছে বটে কিন্তু উহাকে চেনা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

বিরুদ্ধবাদীদের দ্বিতীয় কথা এই যে বসন্তের বীজের সহিত অন্য রোগের বীজ প্রবেশ করিয়া নানারূপ স্বতন্ত্র ব্যাধির সৃষ্টি করিতে পারে। এমন কি যক্ষ্মা, উপদংশ, কুষ্ঠ, প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিও এইরূপে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এ যুক্তি আজকাল আর টিঁকিতে পারে না। এখন বিশুদ্ধ গো-বীজ সংগ্রহ করিবার জন্য বহু বীজাগার (Vaccine Depot) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে গো-বীজ গ্লিসিরিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক এক মাত্রায় কাচের নলের মধ্যে ভরিয়া তাহার দুই মুখ বন্ধ করিয়া বরফের মধ্যে রাখা হয়, এবং প্রয়োজন মত প্রত্যহ উহা সরবরাহ করা হয়। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র টিউব হইতে টাট্‌কা বীজ ব্যবহার করা হয়। গ্লিসিরিনের সহিত বীজ মিশাইলে তাহা সহজে নষ্ট হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন যে সকল গরু হইতে বীজ সংগ্রহ করা হয়, সেগুলির শরীরে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের কোনো চিহ্ন আছে কিনা তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। গরুর কখনও উপদংশ বা কুষ্ঠরোগ হয় না। সুতরাং ঐ সকল রোগের সম্বন্ধে কোনো কথাই উঠিতে পারে না। বস্তুতঃ সাবধানতার সহিত টীকা দিলে কেবল মাত্র টীকা ওঠা ছাড়া অপর কিছু দুর্ঘটনা ঘটা সহজে সম্ভব নয়।

অবশ্য টীকা দিবার সময় কোনোরূপ ত্রুটি হইলে বিপদের আশঙ্কা নিশ্চয়ই আছে। টীকা দিবার সময় হাতের চামড়া উত্তমরূপে শোধিত ও পরিষ্কৃত না করিলে, ছুরির ধার নষ্ট হইবার ভয়ে উহা না পোড়াইয়া লইলে, ভাঙা বা ফাটা টিউব হইতে বীজ ব্যবহার করিলে, সদ্য টীকার উপর মাছি বসিতে বা ময়লা জামার সংস্পর্শ ঘটিতে দিলে, গায়ে যদি খোস-পাঁচড়া থাকে তবে তাহার রস

টীকার উপর মাখামাখি করিলে, ময়লা নখ দিয়া টীকা চুলকাইয়া ফেলিলে, পাকা টীকা ছিঁড়িয়া ফেলিলে বা তাহার উপর ধূলা বালি জমিতে দিলে,—এইরূপ নানা অসাবধানতায় টীকা বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে এবং টীকার স্থানে প্রদাহ ও পূঁজের সঞ্চার, বিষ-ফোড়া, সেলুলাইটিস্ (Cellulitis), ইরিসিপেলাস (Erysipelas), গ্যাংগ্রিন (Gangrene), প্রভৃতি নানাবিধ নূতন রোগ জন্মিতে পারে। তদ্ভিন্ন আরো কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে যাহা সাবধানতারও অতীত। ইহার জন্য টীকার কোনো দোষ দেওয়া যায় না। সহস্র সহস্র সাফল্যের মধ্যে কয়েকটি ব্যতিক্রম ঘটিতেই পারে। তথাপি টীকা লওয়ার দ্বারা যত লোক অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়, তাহার তুলনায় দুর্ঘটনার সংখ্যা অত্যন্ত কম।

টীকা দিবার প্রণালী—

ছোট ছেলেদের **প্রথম টীকা** (primary vaccination) দিতে হইলে পূর্ব্বকালে তাহাদের প্রত্যেক বাহুমূলে দুইটি করিয়া চারিটি টীকা দেওয়াই বিধি ছিল। কিন্তু আজকাল খুব ছোট শিশুকে একটি পয়েন্টের বেশী টীকা দেওয়া হয় না, কারণ তাহাতে জ্বর অধিক হইয়া শিশু কষ্ট পায়, এবং অন্যান্যরূপ নানা বিপদ ঘটিতে পারে। ইহার পর যাহারা **পুনরায় টীকা** (revaccination) লইবে, তাহাদের বাম প্রকোষ্ঠের উপর দুইটি মাত্র টীকা দিলেই যথেষ্ট। যেখানে টীকা দেওয়া হইবে সেখানকার চামড়া উত্তমরূপে সাবান দিয়া ধুইয়া পরে কতকটা তুলাতে স্পিরিট কিংবা অ্যাল্‌কোহল (absolute alcohol) ভিজাইয়া তাহার দ্বারা ঘষিয়া ঐ স্থানটি পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। (এত আয়োজনের কারণ এই যে প্রত্যেকের গায়ে নিত্যই ধূলাবালি লাগিতেছে এবং চর্ম্মসংলগ্ন বহু প্রকার বীজাণু টীকার আঁচড়ের সহিত রক্তমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। স্পিরিট শুকাইয়া গেলে তাহার পর টীকা দিতে হয়। পূর্ব্ব হইতে ছুরির অগ্রভাগটুকু আগুনে স্পর্শ করাইয়া লইতে হয়। ছুরি শীতল হইলে বীজের টিউবের দুই মুখ ভাঙ্গিয়া তাহার একদিকের মুখ হইতে দুই বিন্দু বীজ পরিষ্কৃত অঙ্গের দুই স্থানে দুই ইঞ্চি পরিমাণ ব্যবধানে স্থাপন করিয়া ছুরির ফলকের দ্বারা একটির

পর একটি বিন্দুর উপর ধীরে ধীরে আঁচড় টানিয়া দিতে হয়। এমন ভাবে আঁচড় দিতে হয় যাহাতে রক্ত বাহির না হইয়া ঈষৎ রক্তিমাভ রস মাত্র বাহির হয়। ছুরির আঁচড় জোরে দিবার আবশ্যক নাই, কেবলমাত্র মুনছালটুকু ভেদ করিলেই যথেষ্ট। একটির অধিক আঁচড় দিবারও প্রয়োজন হয় না, একটি মাত্র আঁচড় নিয়মমত ভাবে দিলেই উহা সফল হয়। ছুরির (lancet) অভাবে সাধারণ ছুঁচ পোড়াইয়া লইয়াও তদ্দ্বারা এইরূপ আঁচড় দেওয়া চলিতে পারে। পরে আঁচড়ের উপর ছুরির ফলকের বা ছুঁচের পিঠ দিয়া ঘষিয়া ধীরে ধীরে বীজটুকু তথায় মাখাইয়া দিতে হয়।

এরূপ নিয়মে টীকা দিলে তাহা প্রায়ই নিষ্ফল হইতে পারে না। টীকা লইবার এক ঘণ্টার মধ্যে উহা শুকাইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অংশ অনাবৃত রাখিতে হয় এবং একটু সতর্ক থাকিতে হয় যাহাতে ঐস্থানে কোনো ধূলা না পড়ে, মাছি না বসে, জলে না ধুইয়া যায়, বা কাপড়ে না মুছিয়া যায়। ইহার পর আর কিছু করিবার নাই। ভিজা কাপড়ের পটি বাঁধা বা চন্দন প্রভৃতি লাগানো অনাবশ্যক। ময়লা কাপড় দিয়া বাঁধা অপেক্ষা বরং কিছু না বাঁধাই ভাল। টীকা লওয়ার পর মাছ মাংস খাইবার সম্বন্ধেও কোনো নিষেধ নাই, কাহাকে স্পর্শ করিতেও নিষেধ নাই, কোনো প্রকার বিচারেরও প্রয়োজন নাই।

টীকা ওঠা—

টীকা লওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কাহারো বা টীকা চুলকায়, সড়্ সড়্ করে, এবং কাহারো বা উহার চতুর্দ্দিকে অল্প আমবাতের মত ফুলিয়া ওঠে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের এসব কিছু হয় না। ইহার পর দুই দিন পর্য্যন্ত টীকা উঠিবার কোনো প্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। প্রায় **তৃতীয় দিনে** টীকার উপর ছোট ছোট দানা দেখিতে পাওয়া যায় ও তাহার চারিদিকের চামড়া অল্প লাল হইয়া ওঠে। এই দানা আকারে বড় হইতে থাকে এবং আন্দাজ **চতুর্থ দিন** হইতে জ্বর দেখা দেয়। সেই জ্বর ৪।৫ দিন যাবৎ থাকে; এই সঙ্গে যে হাতে টীকা হইয়াছে সেই দিকের বগলের গ্রন্থিগুলি স্ফীত ও আড়ষ্ট হইয়া ওঠে এবং মাথাধরা, গাত্রদাহ, অনিদ্রা প্রভৃতি নানারূপ

অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়। এ সময় রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে শ্বেত-কণিকার সংখ্যাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্রমে ৪।৫ দিনের মধ্যেই টীকাগুলি এক একটি বসন্ত-গুটিকায় পরিণত হইয়া ওঠে। **ছয় দিনের** মধ্যে এগুলি ফোস্কা হয়, এবং **অষ্টম দিনে** আরো বড় হইয়া অবিকল বসন্তের গুটিকার মত মাঝখানে টোল খাইয়া যায়। **দশম দিনে** টীকা পাকিয়া ওঠে। তখন উহার চারিদিকে অনেকটা স্থান শক্ত হইয়া সিঁদুরের মত লাল হইয়া ওঠে এবং ব্যথায় টন্ টন্ করিতে থাকে। জেনারের ভাষায় বলিতে গেলে উহা তখন যেন গোলাপের পাপ্‌ড়ির উপর একটি মুক্তার দানার মত (a pearl upon a rose-petal) দেখায়। দশম দিনের পর জ্বর থাকে না এবং রক্তিমাভা কমিয়া গিয়া টীকা তখন হইতে শুকাইতে আরম্ভ হয়। টীকা লওয়ার পর ১৪।১৫ দিনের মধ্যে শুকাইয়া তাহার উপর ছাল পড়ে ও তৃতীয় সপ্তাহের শেষে এই ছাল উঠিয়া গিয়া ক্ষতচিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

নূতন টীকা (primary vaccination) এইরূপ ভাবে একবার উঠিয়া গেলে, পরে যখন পুনর্ব্বার টীকা (re-vaccination) লওয়া হয় তখন যদি তাহা ওঠে তবে উহা আকারে অতি ক্ষুদ্র হয়, এবং তাহার সহিত জ্বর বা অন্যান্য কোনো লক্ষণ থাকে না।

প্রথম টীকার সময়—

প্রথম টীকা শিশুকে **৬ মাস হইতে এক বৎসর বয়সের মধ্যে** দেওয়া উচিত। ইহার অধিক বিলম্ব করিলে অনর্থক বিপদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অনেকে ছেলেদের টীকা দিতে নানারূপ ইতস্ততঃ করেন। যেখানে এইরূপ অবহেলা সেখানে বাছিয়া বাছিয়া কোথা হইতে কেমন করিয়া বসন্ত রোগ আসিয়া অকালে ছেলের প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যায়। সহর অঞ্চলে যাঁহাদের বাস, তাঁহারা এ বিষয়ে অবহেলা করিলেই ঠকিবেন। সাধারণতঃ এক বৎসর বয়স অতিক্রম হইবার পূর্ব্বেই টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি বাড়ীতে বা বাড়ীর কাছে কাহারো বসন্ত হইয়া থাকে তবে অন্যান্য সকলের সহিত নবপ্রসূত শিশুকেও তৎক্ষণাৎ টীকা দিবার ব্যবস্থা করিতে

হইবে। এ সময়ে তাহা না করিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। অনেক সময় দেখা যায় যে সদ্যোজাত শিশুর রক্তের স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি এত প্রখর যে সহজে তাহাদের টীকা ধরে না, অর্থাৎ টীকা দিলেও ওঠে না। যদি তাহা হয় তবে অধিক দিন বিলম্ব না করিয়া তাহাকে পুনরায় টীকা দিতে হইবে। এইরূপে একবারে না হউক, দুই-তিন বার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই টীকা উঠিবে; শিশুর স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি থাকিলেও উহা ক্ষণস্থায়ী, এবং শীঘ্রই তাহা লোপ পায়। সুতরাং টীকা না ওঠা পর্য্যন্ত কোনো শিশু বিপন্মুক্ত হইল না বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে।

পুনর্ব্বার টীকা (Re-vaccination)—

অনেকে মনে করেন যে টীকা একবার লইলেই যথেষ্ট, ইহার পর আর না লইলেও চলিতে পারে, এবং পুনঃ পুনঃ টীকা লইবার জন্য সকলকে যে বাধ্য করা হয় এটা কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্ত বাড়াবাড়ি। কিন্তু এ ধারণা নিতান্তই ভুল। জন্মের পর শিশুকে টীকা দেওয়াও যেমন অত্যাবশ্যক, ছেলে বড় হইয়া উঠিলে তাহাকে পুনর্ব্বার টীকা দেওয়াও তেমনি অত্যাবশ্যক। প্রথম টীকা লওয়ার কত দিন পরে আবার টীকা লওয়া উচিত? এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া কিছু বলা যায় না। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর অন্তর বসন্তের প্রকোপ বাড়ে। অতএব একটা হিসাব করিয়া যে বৎসরে অত্যধিক প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা, সেই বৎসর শীতকালে একবার করিয়া পরিবারস্থ সকলকে টীকা দেওয়া খুবই ভাল। এরূপ ব্যবস্থা করিলে বসন্ত রোগের সম্ভাবনা থাকে না। টীকা উঠুক বা না উঠুক, ইহাতে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। যখন বাড়ীর কাছে বসন্তের মহামারী হইতেছে এবং সেই সময় টীকা লইয়া তাহা উঠিল না, তখন যদি মনে কোনো সন্দেহ থাকে বা টীকার কিছু দোষ আছে বলিয়া মনে হয়, তবে আবার একবার টীকা লওয়াই ভাল,—কারণ একবার দিলেই যে তাহা ঠিক দেওয়া হইল একথা সব সময় বলা যায় না।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার করিয়া টীকা লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা এতটা করিতে নারাজ, তাঁহারা যেন অন্ততঃ ছেলেদের প্রথম টীকার পর ১২।১৪ বৎসর

বয়সের সময় একবার, এবং ২০।২১ বৎসর বয়সের সময় আর একবার টীকা দিবার ব্যবস্থা করেন।

টীকা লওয়া সম্বন্ধে কাহারো পক্ষে কোনো নিষেধ নাই, কেবল যে ব্যক্তির শরীরে ঘা-ফোড়া আছে তাহাকে উহা সাবধানে দেওয়া কর্ত্তব্য। গর্ভবতী স্ত্রীলোককে টীকা দিতে কোনো নিষেধ নাই, বরং গর্ভস্থ শিশুর পক্ষেও তাহা মঙ্গলজনক হইতে পারে।

ফাইলেরিয়ার জ্বর ও ফাইলেরিয়াসিস্
Filarial Fever and Filariasis

ফাইলেরিয়াসিস্ রোগটি আমাদের দেশে অতি পুরাতন কাল হইতে বর্ত্তমান। ফাইলেরিয়া-ঘটিত জ্বর এ দেশে খুবই দেখা যায়। লক্ষণ ও প্রকৃতি অনুসারে ইহাকে সাধারণ কথায় 'বাতশিরার জ্বর,' 'পাক্ষিক জ্বর,' 'কোটালের জ্বর,' 'বাতিকের জ্বর', প্রভৃতি নানারূপ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই রোগের পরিণামে যে অঙ্গস্ফীতি হয়, তাহা আয়ুর্ব্বেদে শ্লীপদ-রোগ নামে অভিহিত। নিদান-রচয়িতা মাধবকর বলিয়াছেন, উক্ত রোগের প্রথম অবস্থায় জ্বরের সহিত বঙ্খণ-স্থানে (কুঁচ্‌কিতে) বেদনাযুক্ত শোথ হইয়া ক্রমশঃ উহা পাদে গিয়া উপস্থিত হয়। এই শোথ অধিকাংশই পায়ে হয় বলিয়া সম্ভবতঃ ইহা শ্লীপদ (শিলাবৎ পদং) নামে অভিহিত, কিন্তু ইহা শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও যে হইতে দেখা যায়, এ কথাও নিদান গ্রন্থে উক্ত আছে। তবে কাইলিউরিয়া (chyluria) প্রভৃতি যে সকল অন্যান্য বৈচিত্র্য ইহাতে ঘটিয়া থাকে, সেগুলিকে আয়ুর্ব্বেদে পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ব্যাধিরূপে বিবেচনা করা হইত; কাইলিউরিয়াকে একপ্রকার মেহ বিবেচনায় তাহার নাম ছিল 'পিষ্টমেহ'। বর্ত্তমানে একই রোগ হইতে এই সকল বিভিন্ন অবস্থার উৎপত্তি জানিতে পারায়,—অর্থাৎ প্রদাহযুক্ত জ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, কোষবৃদ্ধি, গণ্ডস্ফীতি, শ্লীপদ বা অঙ্গবিশেষের আয়তন বৃদ্ধি (elephantiasis), কাইলিউরিয়া, প্রভৃতি যাবতীয় পীড়া একই রোগের বিভিন্নরূপ অবস্থান্তর মাত্র ইহা বুঝিতে পারায়,—মূল রোগটিকে এখন এক কথায় বলা হয় **ফাইলেরিয়াসিস্**।

এই রোগ শীতপ্রধান দেশে হয় না। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অনেক গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে ইহার প্রাদুর্ভাব। উত্তর আমেরিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, জাপান এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও এই রোগ অতি প্রচুর। ভারতবর্ষে ইহার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব থাকিলেও তাহা সকল স্থানে নয়। উচ্চভূমিতে ফাইলেরিয়ার ব্যাধি হয় না। নিম্নভূমিতেই ইহার অধিক প্রকোপ দেখা

যায়। বড় বড় নদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়া যেখানে ব-দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে সেই সকল স্থানে এ রোগ যথেষ্ট আছে। ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশেই ইহা অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, তবে পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব্বভাগেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উড়িষ্যার পুরী ও কটক প্রভৃতি স্থান এই রোগের জন্য বিখ্যাত। কলিকাতাতেও এ রোগ যথেষ্ট আছে। জনসাধারণের মধ্য হইতে বহুলোকের রক্ত পরীক্ষা করিয়া একবার দেখা হইয়াছে যে কলিকাতাবাসী শতকরা ১০ জনের রক্তে ফাইলেরিয়ার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। মশাই এই রোগের বাহন, সুতরাং যেখানে মশার আধিক্য সেখানেই এই রোগের বাহুল্য।

ফাইলেরিয়ার পরিচয়

ফাইলেরিয়া একপ্রকার মেটাজোয়া (Metazoa), অর্থাৎ বহুকোষবিশিষ্ট চক্ষুগোচর জীব। জীব-রাজ্যের মধ্যে ইহারা একপ্রকার হেল্‌মিন্থ (Helminth) বা ক্রিমি। ঐ ক্রিমিগোষ্ঠির এক বিশেষ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাদের নিম্যাটোড্ (Nematode) বলা হয়; কিন্তু ইহারা রক্তাশ্রয়ী ক্রিমি, অন্ত্রাশ্রয়ী নয়।

১৮৭৩ সালে লুইস্ (Lewis) কলিকাতায় জনৈক রোগীর রক্তের মধ্যে ফাইলেরিয়ার শাবক (মাইক্রো-ফাইলেরিয়া) প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং উহার নাম দেন Filaria sanguinis hominis। উহারা কেবল রাত্রিকালেই রক্তের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইজন্য ঐ নামের সহিত nocturna-শব্দ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর ১৮৭৬ সালে ব্যাংক্রফ্‌ট (Bancroft) পরিণত এবং চক্ষুগোচর ফাইলেরিয়া-ক্রিমি মানুষের লিম্ফ্যাটিক্ শিরার মধ্য হইতে আবিষ্কার করেন, সেইজন্য ইহার নাম হয় **ফাইলেরিয়া ব্যাংক্রফ্‌টাই** (Filaria bancrofti)।

১৮৭৮ সালে ম্যানসন্ (Manson) আবিষ্কার করেন যে বিশিষ্ট প্রকারের স্ত্রী-মশাই ফাইলেরিয়া-শাবকদিগের বাহন, এবং মশার পেটের মধ্যে তিনি উহাদের পূর্ব্বাপর জীবনধারা প্রত্যক্ষ করেন। পরে আরো প্রমাণ হয়

যে ঐ সকল ফাইলেরিয়া-শাবক মশার কামড়ের সঙ্গে প্রথমে মানুষের রক্ত হইতে মশার পেটে প্রবেশ করে, আবার তথা হইতে কিছু পরিবর্ত্তিত আকার লইয়া পুনরায় উহার দংশনের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে,—এবং এই মধ্যবর্ত্তী আশ্রয়দাতা (intermediate host) স্ত্রী-মশার শরীরের মধ্য দিয়া একবার ঘুরিয়া না আসিলে কোনো শাবক ক্রিমিরূপে পরিণত হয় না। ম্যান্‌সন কর্ত্তৃক এই আবিষ্কার হইতেই মশার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, এবং তাহাতেই ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ সম্বন্ধে আবিষ্কারের প্রথম সূচনা হয়।

ফাইলেরিয়ার জীবনচক্র—রোগীর রক্তে যে জীবগুলি আমরা মাইক্রোস্কোপ-পরীক্ষার দ্বারা দেখিতে পাই উহা আসল ফাইলেরিয়া নয়, অর্থাৎ পরিণতি প্রাপ্ত ফাইলেরিয়া-ক্রিমি নয়,—উহা মাইক্রো-ফাইলেরিয়া, অর্থাৎ ফাইলেরিয়ার অপরিণত শাবক মাত্র। এই সকল শাবক প্রথমে মানুষের শরীরের ফাইলেরিয়া হইতে জন্মলাভ করে, পরে মশার পেটে গিয়া দ্বিতীয় অবস্থান্তর গ্রহণ করে, তৎপরে পুনরায় মানুষের দেহে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই উহারা পরিণত হয়। সুতরাং পরিণতিপ্রাপ্ত ফাইলেরিয়া মনুষ্যদেহে খুব অধিক-সংখ্যায় থাকে না। যে কয়টি মশার দংশনের সহিত আসিয়া উপস্থিত হয়, মাত্র সেই কয়টিই পরিণতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের ক্রিমি-অবস্থা প্রাপ্ত হইতে অনেক সময় লাগে। অধিকাংশই মরিয়া যায়, যেগুলি জীবিত থাকে তাহারা কোনো লিম্ফ্যাটিক্ গ্রন্থি (glands) বা শিরার মধ্যে একস্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের লিঙ্গভেদ পরিস্ফুট হয়। প্রায় ছয়মাস বা বৎসরাধিককাল পরে পরিণত স্ত্রী-ফাইলেরিয়াগুলির গর্ভসঞ্চার আরম্ভ হয়, এবং তখন হইতে যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে ততদিন পর্য্যন্ত উহারা ডিম্ব জন্মাইয়া শাবক প্রসব করিতে থাকে। ঐ সকল নূতন মাইক্রোফাইলেরিয়া জন্মলাভ করিয়া মানুষের শরীরে একই অবস্থায় থাকে এবং শীঘ্রই তাহাদের পরমায়ু শেষ হয়, কেবল তন্মধ্যে যেগুলি মশার পেটে যায় সেইগুলিই পরিণত হইতে সুযোগ পায়।

পরিণত ফাইলেরিয়া—পরিণত ফাইলেরিয়া-ক্রিমি চোখে দেখা যায়। ইহারা দেখিতে চুলের মত সরু এবং শ্বেতবর্ণ। পুং-ফাইলেরিয়াগুলি প্রায়

১½" ইঞ্চি লম্বা। স্ত্রী-ফাইলেরিয়াগুলি পুরুষ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ (২" হইতে ৪" ইঞ্চি) এবং আয়তনেও বৃহৎ। ইহারা কখনও রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে না, ফোড়ার পূঁজের মধ্যে কিংবা লিম্ফ্যাটিক গ্রন্থি ও লিম্ফ্যাটিক শিরার মধ্যে (abscess cavities and lymphatic channels) সচরাচর দুই বা ততোধিক পুরুষ ও স্ত্রী-ক্রিমি একত্রে পরস্পর জড়াইয়া থাকে, কখনো বা অনেকগুলি একত্রে মিলিয়া তাল পাকাইয়া থাকে। সুতরাং

ফাইলেরিয়ার স্বাভাবিক চক্ষুগোচর মূর্ত্তি (চিত্রখানি ডাক্তার সুন্দর রাও-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ইহাদের দেখিতে হইলে রোগীর ফোড়া বা স্ফীত লিম্ফ্যাটিক-গ্রন্থি প্রভৃতি কাটিয়া তন্মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়। ইহাদের পরমায়ু বহুবর্ষব্যাপী, এবং বংশ বৃদ্ধি করিবার শক্তিও অফুরন্ত। স্ত্রী-ক্রিমি যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন তাহার জরায়ুর মধ্যে অসংখ্য ডিম্বের (eggs) সৃষ্টি হইতে থাকে, এবং সময়ান্তরে তাহা ফুটিয়া এম্ব্রায়ো (embryos) বা শাবক সমূহ উহার যোনিদ্বার দিয়া অজস্র ধারে নির্গত হইতে থাকে।

মনুষ্যরক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়া—ফাইলেরিয়ার শাবকগুলি আয়তনে অতি ক্ষুদ্র এবং মাইক্রোস্কোপের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইজন্য ইহাদের নাম মাইক্রো-ফাইলেরিয়া। মাইক্রোস্কোপে (লো-পাওয়ারে) দেখিতে ইহারা বক্রদেহবিশিষ্ট সর্পের মত, এবং জীবিতাবস্থায় অতিশয় চঞ্চল। অত্যন্ত পাতলা একটি খোলসের দ্বারা ইহাদের দেহ শ্লথভাবে আবৃত থাকে, এবং উহা দেহ অপেক্ষা কিছু অধিক লম্বা। ইহাদের পরমায়ু অধিক নয়। লেন্ (C. A. Lane) বলেন ইহারা প্রত্যহ জন্মিয়া প্রত্যহ মরিয়া যায়। প্রসবের পর ইহারা লিম্ফ্যাটিক নালীর ভিতর হইতে একেবারে রক্তপ্রবাহের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং তাহার পর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত একই অবস্থাতে রক্তের মধ্যে থাকিয়া যায়। সেইজন্য রোগীর রক্ত লইয়া মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়

মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলি চঞ্চলভাবে নড়িতেছে এবং রক্ত কণিকাগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দিবাভাগে কোনো রোগীর রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যে ইহাদের দেখা যায় না। দিবাভাগে ইহারা শরীরের গভীরতম প্রদেশে ফুস্ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্রের রক্তের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লয়, এবং রাত্রিকালে বাহিরের দিকে আসিয়া চর্ম্মের নিকটস্থ সূক্ষ্মধমনীগুলিতে অবস্থান করে। সেইজন্য ইহাদের সন্ধান করিতে হইলে রাত্রিকালেই রক্ত লইয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। ফাইলেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে রাত্রি যত অধিক হয়, রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়ার সংখ্যা তত বাড়িতে থাকে, এবং মধ্যরাত্রে উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়; আবার রাত্রি যত ভোর হইতে থাকে ততই উহাদের সংখ্যা কমিতে থাকে।

ইহাদের এরূপ অদ্ভুত রাত্রি-বিচরণের কারণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে ইহারা অম্লজান পিপাসু, সেইজন্য দিবাকালে ইহারা ফুস্ফুসের নিকট যায়, এবং রাত্রিকালে বিশ্রাম হেতু চর্ম্মস্থ ধমনীতে অম্লজানের পরিমাণ বর্দ্ধিত হওয়ায় তখন ইহারা তথায় বাহির হইয়া আসে। কেহ কেহ আবার বলেন যে দিনের বেলা অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, সেই জন্য মাইক্রোফাইলেরিয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু রাত্রে বিশ্রামকালে পুনঃপ্রসারিত হইলে ঐ সকল ধমনীতে তাহারা অবাধে যাতায়াত করে। আবার লিঙ্ক্ প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন যে তাহা নহে, বরং মধ্যরাত্রে বিশ্রামের পর অবসাদগ্রস্ত ক্ষুদ্র ধমনীগুলি আপন স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) প্রাপ্ত হয়, এবং সঙ্কুচিত হইয়া ফাইলেরিয়া-শাবক গুলিকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে বলিয়া রক্তের মধ্যে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখান যে নাইট্রোগ্লিসিরিন্ (ধমনী-প্রসারক) $\frac{1}{100}$ গ্রেন মাত্রায় ইন্জেকশন দিলে রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়ার সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়, এবং পিটুইট্রিন (সঙ্কোচক) ইন্জেকশন দিলে তাহাদের সংখ্যা বহুপরিমাণে বাড়িয়া যায়।

ম্যানসন-বার (Manson-Bahr) বলেন যে সাধারণ জীবধর্ম্ম অনুসারেই

উহারা এইরূপ আচরণ করে। মানুষের শরীরে জন্মলাভ করিয়াই মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলির মশার পেটে যাওয়া আবশ্যক, এবং তথা হইতে পুনরায় মানুষের শরীরে আসা আবশ্যক, নতুবা উহাদের পরিণতি নাই। মশা রাত্রিকালে মানুষকে কামড়াইতে আসে, সেইজন্যই নূতন মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলি তাহার সন্ধানে রাত্রিকালে চর্ম্মের নিকটস্থ ধমনীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা প্রাকৃতিক যোগাযোগের সংঘটন।

মশার পেটে মাইক্রোফাইলেরিয়া—মশার পেটে গিয়াই ইহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই ইহারা খোলস (sheath) ছাড়াইয়া বাহির হইরা পড়ে, এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মশার পেটের থলি ভেদ করিয়া উহার মাংসপেশীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইখানে ইহাদের শরীরের নূতন গঠন হইতে থাকে (larval form), এবং আকারেও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৪০ গুণ বড় হইয়া ওঠে। ১২ দিন হইতে ২০ দিনের মধ্যে ইহাদের নূতন গঠন সম্পূর্ণ হয়, এবং তখন ইহারা মশার মস্তকের দিকে অগ্রসর হইয়া জোড়ে জোড়ে হুলের মুখে (labium) আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া

ধূসরবর্ণ সাধারণ কিউলেক্স্ স্ত্রী-মশা। মশার মস্তক চিরিয়া মাংসের ভিতর ও হুলের নিকট মাইক্রোফাইলেরিয়া দেখা যাইতেছে। (ডাক্তার সুন্দর রাও-এর সৌজন্যে চিত্র দুইখানি প্রাপ্ত)

দেখা গিয়াছে যে ইহারা কখনও বিজোড় অবস্থায় অগ্রসর হয় না। অতঃপর

মশা যখন মানুষকে দংশন করে সেই অবসরে ইহারা গাত্রচর্ম্মের উপর আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু দংশনের ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অক্ষত চর্ম্ম স্বয়ং ভেদ করিয়া রক্তমধ্যে প্রবেশ করে। তখন হইতে পুনরায় ইহাদের নূতন জীবন আরম্ভ হয়।

কিউলেক্স্ (Culex), এনোফিলিস্ (Anopheles) ও ষ্টেগোমায়া (Stegomya), এই তিনপ্রকার মশার দ্বারাই ফাইলেরিয়ার সংক্রমণ ঘটিতে পারে, তবে কিউলেক্স্ মশাই ইহার সাধারণ বাহন।

রোগের কারণ

কেবল ফাইলেরিয়াই ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের সমূহ কারণ নয়। অর্থাৎ দেহের মধ্যে কেবল ফাইলেরিয়া উপস্থিত থাকিলেই রোগ জন্মায় না, উহার সঙ্গে আরো কিছু স্বতন্ত্র কারণ যুক্ত হইলে তবেই রোগ-লক্ষণ জন্মায়। এদেশে সুস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় দশজন লোকের রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়া আছে,—অথচ তাহাদের দেহে রোগের কোনো চিহ্নই নাই। অপরপক্ষে ফাইলেরিয়াসিসের সুনিশ্চিত লক্ষণ-সম্পন্ন রোগীদের রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যে অনেকের রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায় না। পুরীতে ৫৭১ জন সাধারণ ব্যক্তিকে লইয়া এ সম্বন্ধে একবার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গেল যে উহাদের মধ্যে শতকরা ২৮ জনের রোগলক্ষণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের রক্তেই মাইক্রোফাইলেরিয়া মিলে নাই; অথচ শতকরা যে ২৭ জনের রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়া পাওয়া গেল,—তন্মধ্যে অনেকেই সম্পূর্ণ সুস্থ। অন্যান্য দেশেও পরীক্ষার দ্বারা অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। অতএব রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়া থাকিলেই ফাইলেরিয়াসিস্ হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তির রক্তে উহা পাওয়া গেল না তাহার ফাইলেরিয়াসিস্ হয় নাই,—এমন কথা এই রোগ সম্বন্ধে কখনই বলা চলে না। বরং যে দেশে ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব, সে দেশে অনেক সুস্থব্যক্তির রক্তেই মাইক্রোফাইলেরিয়া দেখা যায়, এবং রোগলক্ষণ উপস্থিত হইলে তখন রক্তের মধ্যে মাইক্রোফাইলেরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া যায়, এই কথাই সকলে বলেন।

ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের নিদান সম্বন্ধে অনেক তথ্যই সন্দেহপূর্ণ। তবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে যাহার ফাইলেরিয়াসিস্ রোগ হইয়াছে, তাহার শরীরে নিশ্চয় ফাইলেরিয়া আছে বা ছিল। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কোনো লিম্ফ্যাটিক্ গ্রন্থি বা স্ফোটক প্রভৃতি কাটিয়া অনুসন্ধান করিলে হয়তো দেখা যাইবে তাহার ভিতর পরিণত ফাইলেরিয়া-ক্রিমি জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় রহিয়াছে। রোগীর রক্তে মাইক্রো-ফাইলেরিয়া দেখিতে পাওয়া গেল না বলিয়া যে শরীরে কোথাও ফাইলেরিয়া নাই, এ-কথা মনে করা ভুল।

ফাইলেরিয়া হইতে কিরূপে ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের সূত্রপাত হয় এ-সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেন স্ত্রী-ফাইলেরিয়া ডিম্ব প্রসবকালে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর একপ্রকার জরোদ্দীপক বিষ (pyrogenetic toxin) উদ্গীরণ করে। কিন্তু এ-কথা ঠিক নয়, কারণ উহাদের যদি কিছু বিষ থাকিত তবে যাহাদের শরীরে ফাইলেরিয়া আছে তাহাদের সকলেরই রোগলক্ষণ দেখা যাইত। ম্যানসন-বার বলিয়াছেন যে মাইক্রোফাইলেরিয়া-গুলিও সম্পূর্ণ নির্ব্বিষ ও নিরীহ। উহাদের দ্বারা কোনো রোগের সৃষ্টি হইতে পারে না।

ফাইলেরিয়ার সহিত কোনো স্বতন্ত্র বীজাণু আনুষঙ্গিক রূপে যোগ না দিলে ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের সূত্রপাত হয় না, এই কথা ১৯১০ সালে প্রথমে বলেন ওয়াইজ্ (Wise)। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে ফাইলেরিয়াসিস্ রোগীর লিম্ফ্যাটিক গ্রন্থি প্রভৃতির মধ্যে প্রায়ই কিছু ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্ ও ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্-জাতীয় বীজাণু পাওয়া যায়। কিরূপে এই সকল বীজাণু তথায় গিয়া উপস্থিত হয় তাহাও বর্ত্তমানে জানা গিয়াছে। যে সকল পরিণত স্ত্রী-ফাইলেরিয়া লিম্ফনালী ও গ্রন্থির মধ্যে বাস করে, তাহারা প্রসব করিবার সময় অতিরিক্ত চঞ্চল হইয়া স্থানীয় রসস্রোতের অবরোধ করে, এবং পুনঃপুনঃ আঘাতের দ্বারা (acting as an irritating foreign body) ঐ স্থানে ক্ষত করিয়া দেয়। শরীরের কোথাও ষ্ট্রেপ্টো ও ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্ প্রভৃতি বীজাণু পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকিলে তখন যদি কোনো সুযোগে তথায় গিয়া উপস্থিত হয়, তবে উহারা সেই ক্ষতকে সংক্রামিত করিয়া প্রদাহ জন্মায়। ঐ সকল বীজাণুর দ্বারা

সংক্রামিত না হইলে কোনো প্রদাহের সৃষ্টি হইতে পারে না। সেইজন্য দেখা যায়, যে ব্যক্তির শরীরে বহুদিন হইতে ফাইলেরিয়া আছে অথচ রোগের লক্ষণ নাই,—তাহার শরীরে ঘা, ফোড়া, চুলকানি, পাঁচড়া, প্রভৃতি সামান্য কোনো চর্ম্মরোগ হইবার পরেই ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের সূত্রপাত হইয়া যায়।

বস্তুতঃ ফাইলেরিয়াসিস্-রোগীর শরীরে অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই কোনো-না-কোনো প্রকারের ক্ষত বা ঘা-চুলকানি (অর্থাৎ বীজাণুর আশ্রয়) দেখিতে পাওয়া যাইবে। অ্যাক্টন্ এবং সুন্দর রাও প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে অধিকাংশ রোগীর শরীরেই হয় চর্ম্মরোগ, না হয় অন্ত্রক্ষত (আমাশা), না হয় দাঁতে পুঁজ, না হয় টন্‌সিলাইটিস্, এইরূপ কোনো একটি স্বতন্ত্র প্রকারের রোগ লাগিয়া থাকে, এবং কাল্‌চার করিলেই তথা হইতে ষ্ট্রেপ্টো ও ষ্ট্যাফিলোকক্কাই আবিষ্কৃত হয়। কেবল তাহাই নয়, ঐ ষ্ট্রেপ্টো এবং ষ্ট্যাফিলোকক্কাই-এর ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করিয়া ইন্‌জেকশন দিতে থাকিলেই তাহাদের ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের লক্ষণগুলি দূর হয়। সুতরাং বীজাণুই এই রোগের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ (exciting cause), এবং ফাইলেরিয়া তাহার নৈমিত্তিক কারণ মাত্র (only predisposing factor)। এই দুই কারণের একত্র সমাবেশে রোগটির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

রোজ্ (F. G. Rose) বলেন যে গত যুদ্ধের সময় ১৭ জন রোগলক্ষণ-যুক্ত সৈনিকের দেহ হইতে স্ফীতিপ্রাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থিসকল কাটিয়া বাহির করা হইয়াছিল এবং সেগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তন্মধ্যে কেবল পাঁচটি গ্রন্থিতে ফাইলেরিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু পনেরোটির মধ্য হইতে ষ্ট্রেপ্টোকক্কাই আবিষ্কৃত হয়। ঐ সকল ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্-এর সংমিশ্রণে ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করিয়া অতঃপর যে কয়েকটি ফাইলেরিয়াসিস্ রোগীকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করে।

দক্ষিণ আমেরিকার বৃটিশ গায়েনা প্রদেশে এই রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব; উহার সম্যক তথ্য নির্ণয় করিতে ১৯২১ সালে লণ্ডন স্কুল

অফ ট্রপিক্যাল্ মেডিসিন হইতে কয়েকজন চিকিৎসকের সমন্বয়ে একটি ফাইলেরিয়া-কমিশন তথায় প্রেরিত হয়। তাঁহারা বহু অনুসন্ধানের পর সকলে একমত হইয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করেন :—"Practically ⅕th of the population harbour filaria. Filaria alone produces no symptoms. All the pathological manifestations are due to secondary infection by pyogenic organisms. The clinical manifestations due to secondary infection can be treated with effect by antiseptic measures and specific vaccine." অর্থাৎ—তথাকার পঞ্চমাংশ অধিবাসীর শরীরে ফাইলেরিয়া আছে, কিন্তু কেবল ফাইলেরিয়ার দ্বারা কোনো রোগ জন্মায় না। পূঁজোৎপাদক বীজাণুর দ্বারা আনুষঙ্গিক সংক্রমণ ঘটিয়াই রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সকল লক্ষন ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করিলেই দূর হয়।

ফাইলেরিয়ার অবর্ত্তমানে যে কেবলমাত্র বীজাণুর দ্বারাও পুনঃপুনঃ প্রদাহের ফলে অবিকল ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের মত চর্ম্মবৃদ্ধি ও মাংসবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব, ইহার প্রমাণ আছে। যে সকল দেশে ফাইলেরিয়ার অস্তিত্বের কোনোই সম্ভাবনা নাই, তথায়ও পুরাতন চর্ম্মরোগ হইতে ক্রমে এক প্রকার গোদের অবস্থা জন্মিতে দেখা যায়, তাহাকে বলে Elephantiasis nostras। সেই জন্য রজার্স বলেন যে গোদকে ফাইলেরিয়াসিস্ না বলিয়া বীজাণুঘটিত ব্যাধিবিশেষ বলিলেও কোনো অযুক্তি হয় না।

এই সকল কারণে এখন সকলেরই এই মত যে ফাইলেরিয়াসিস্ নামক রোগে ফাইলেরিয়া কেবল নিমিত্তমাত্র, উহার প্রকৃত সৃষ্টিকারী ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্ প্রভৃতি বীজাণু।

কিন্তু এই রোগে যে অনেকের প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ের অন্তরে এবং বিশেষ করিয়া পূর্ণিমা অমাবস্যা প্রভৃতি বিশিষ্ট তিথিগুলিতেই জ্বর ও প্রদাহ হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ কি?

এ কথার সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। ১৯১৯ সালে রজার্স একবার ফাইলেরিয়াগ্রস্ত জেল-কয়েদীদের লইয়া এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। প্রত্যহ

রাত্রিকালে তাহাদের রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় উহাতে মাইক্রোফাইলেরিয়ার দৈনিক সংখ্যা কমিতেছে কি বাড়িতেছে। এতদ্দ্বারা তিনি দেখিতে পান যে প্রতি একমাস অন্তর একসময়ের জন্য সকলেরই রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়ার সংখ্যা হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। তাঁহার মত এই যে ফাইলেরিয়া-ক্রিমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তরে একবার করিয়া অত্যধিক মাত্রায় সন্তান প্রসব করে। এই সময় যদি মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলি বিনা বাধায় রক্তে গিয়া প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে কোনো রোগের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যদি কোনো কারণে পরিণত ফাইলেরিয়াদিগের দ্বারা লিম্ফপ্রণালী অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, অথবা বহুসংখ্যক সদ্যপ্রসূত মাইক্রোফাইলেরিয়া একত্রিত হওয়াতে অবাধ নির্গমনের পথ না পায়,—তাহা হইলে উহাদের চাঞ্চল্যজনিত আঘাতে ঐ স্থানের কোষগুলির জীবনীশক্তি কমিয়া যায় এবং তাহা হইতেই প্রতিবারে প্রদাহের সৃষ্টি হয়, ও তৎসঙ্গে জ্বর প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য তথায় ষ্ট্রেপটোকক্কাস্ বা অন্য কোনো প্রদাহকারী বীজাণু সময়মত গিয়া প্রবেশ করা বা পূর্ব্ব হইতে উপস্থিত থাকাও আবশ্যক। তবে যতক্ষণ এইরূপ দুর্ব্বল অবস্থার সুযোগ না পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বীজাণু উপস্থিত থাকিলেও প্রদাহ জন্মাইতে পারে না। সম্ভবতঃ মাসান্তে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে একবার করিয়া অত্যধিক মাত্রায় মাইক্রোফাইলেরিয়া প্রসব হওয়াতে যখন ঐ সুযোগ একবার করিয়া উপস্থিত হয় তখনই প্রদাহাদির অভিব্যক্তি হইতে থাকে।

ফাইলেরিয়া-সংক্রামিত দেশে যাহাদের রোগ নাই তাহাদের রক্তেই বা মাইক্রোফাইলেরিয়া পাওয়া যায় কেন, এবং রোগ হইলেই বা রক্ত পরীক্ষায় উহার সাক্ষাতের সম্ভাবনা কমিয়া যায় কেন,—ইহার কারণ এখন সহজেই অনুমেয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলি রক্তের মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে ততক্ষণ রোগ হয় না, যখন উহাদের গতি অবরুদ্ধ হয় তখনই রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। সুতরাং যাহাদের ফাইলেরিয়াসিস্ রোগ জন্মিয়াছে বা গোদ প্রভৃতি দেখা দিয়াছে তাহাদের রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়া না দেখিতে পাওয়াই স্বাভাবিক।

লক্ষণাদি

এই রোগ কুড়ি বৎসর বয়সের নীচে কম হয়, উহার ঊর্দ্ধতন বয়স্কদিগের মধ্যেই ইহা অধিক, এবং স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদের মধ্যেই ইহা অধিক সংখ্যায় দেখা যায়।

শরীরের আক্রান্তস্থানভেদে ও রোগভোগের অবস্থা অনুসারে এই রোগের এত বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য আছে যে সকলগুলি একত্রে বিবৃত করা অসম্ভব। তবে সাধারণতঃ ক্রমবিকাশ অনুসারে সম্পূর্ণ রোগটিকে মোটামুটি তিনটি অবস্থায় বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) তরুণ অবস্থায়—পুনঃপুনঃ স্থানীয় প্রদাহ ও জ্বর।
(২) মধ্যবর্ত্তী অবস্থায়—লিম্ফ্যাটিকগুলির স্ফীতি ও বিদারণ।
(৩) শেষ অবস্থায়—শ্লীপদ বা গোদ।

পর্য্যায়ক্রমে এই তিনরূপ অবস্থায় রোগের লক্ষণসকল ও তাহার নিদান (প্যাথোলজি) বর্ণিত হইল।

(১) প্রদাহ ও জ্বর

প্রদাহের জন্যই এই রোগে জ্বর হয়। এই প্রদাহ সাধারণতঃ কেবল লিম্ফ্যাটিক্ শিরা উপশিরা বা গ্রন্থিবিশেষের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়।

প্রদাহ—যদি কেবল সূক্ষ্ম চর্ম্মশিরাগুলির মধ্যে প্রদাহ হয়,—তবে সেগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকায় স্থানীয় চামড়াটি ফুলিয়া সিঁদুরের মত লাল হইয়া ওঠে এবং দেখিতে কতকটা ইরিসিপেলাসের মত বোধ হয়, কিন্তু উহার কোনো স্পষ্ট সীমারেখা থাকে না। প্রদাহের জন্য নালীগুলি বুজিয়া লিম্ফরসের গতিরোধ হয়, সেই জন্য ঐ স্থান ফুলিয়া শক্ত হইয়া ওঠে। শরীরের যে-কোনো অংশে এইরূপ প্রদাহ জন্মানো সম্ভব হইলেও কোষ-চর্ম্মেই ইহা অধিকাংশ লোকের হইতে দেখা যায়, এবং বারংবার এইরূপ প্রদাহের ফলে স্থানীয় চামড়া ক্রমে পুরু ও শক্ত হইয়া ওঠে।

যদি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি মাত্র লিম্ফ্যাটিক্ শিরাতে প্রদাহ হয়,—তবে উহা ফুলিয়া দড়ির মত শক্ত হইয়া ওঠে এবং চামড়ার উপর উহার

অনুগামী হইয়া একটি সিঁদুরবর্ণ রেখা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; চলতি কথায় ইহাকে বলে 'সুতালি উঠিয়াছে'।

লিম্ফ্‌নালীতে না হইয়া—গ্রন্থির মধ্যেও এই প্রকার প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে। শরীরের বিভিন্ন সঙ্গমস্থলে যে সকল গ্রন্থি (glands) দেখা যায়, তাহারই একটি বা একাধিক গ্রন্থি ইহাতে হঠাৎ স্ফীত হইয়া অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। এইরূপে অণ্ডবৃদ্ধি অথবা কুঁচ্‌কির গ্রন্থিগুলির (inguinal glands) প্রদাহ অনেকেরই হইতে থাকে। অধিকাংশ একশিরা রোগ (গনোরিয়া-কর্ত্তৃক ব্যতীত) এইরূপেই জন্মায়। পুনঃপুনঃ একশিরার (orchitis) সহিত জ্বর হইতে থাকিলে তাহাকে চলতি কথায় বাতশিরার জ্বর বলে। ইহা কোষবৃদ্ধি (hydrocele) হইবারও এক অন্যতম কারণ; উপর্য্যুপরি কয়েকবার একশিরা হইলে ক্রমে কোষের মধ্যে জল জমিয়া যায়। এই জন্য যে দেশে ফাইলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, সেই দেশে কোষবৃদ্ধির সংখ্যা এত অধিক।

কিন্তু যে সকল স্থানে পূঁজোৎপাদক বীজাণু অধিকতর সুযোগ পায়,—তথায় কেবল মাত্র প্রদাহের দ্বারা উহারা ক্ষান্ত হয় না, স্ফীতি ও প্রদাহের স্থলে ক্রমে বিস্ফোটকের সম্ভাবনা হয়।

ফাইলেরিয়ার প্রদাহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও কখনো কখনো দেখা যায়। শরীরের বাহ্যভাগে কোথাও হইলে তাহা সহজে ধরিতে পারা যায়, কিন্তু আভ্যন্তরিক প্রদেশের কোথাও হইলে তাহা ধরা অত্যন্ত কঠিন। কখনো কখনো পেটের ভিতরকার সুদূর লিম্ফ্যাটিকের মধ্যে এইরূপ প্রদাহের সৃষ্টি হইয়া প্রবল শূলবেদনা উপস্থিত হয়, এবং তৎসহ জ্বর, বমন, হিক্কা, পেটফাঁপা, এবং মলমূত্ররোধ পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। ইহাকে তখন পেরিটোনাইটিস্ বা বিষম উদরপ্রদাহ (acute abdomen) বলিয়া ধারণা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সেপ্‌টিসিমিয়া (septicæmia) পর্য্যন্তও উপস্থিত হইতে পারে, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারাত্মক অবস্থা ঘটিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া পেটের ভিতরকার লিম্ফ্‌নালীতে ফাইলেরিয়া পাওয়া গিয়াছে এবং নিকটস্থ গ্রন্থির মধ্যে ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ফুস্‌ফুসের নালীতেও প্রদাহ হইয়া কোনো কোনো স্থলে কাসির সহিত রক্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে এবং তাহা যক্ষ্মা বলিয়াই ভ্রম হইয়াছে।

জ্বর—ফাইলেরিয়াসিস্ রোগে প্রদাহ সামান্য হইলে জ্বর নাও হইতে পারে, কিন্তু তদ্ব্যতীত প্রায় প্রতিবারেই প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কম্প দিয়া প্রবল জ্বর হয়, ও উহার সহিত শিরঃপীড়া, বমন, প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। এই জ্বর কয়েক ঘণ্টা মাত্রও থাকিতে পারে, অথবা দুই চারিদিন ভোগের পরেও ছাড়িতে পারে। জ্বর ছাড়িবার সময় প্রচুর ঘাম হইতে থাকে। এই জ্বর অবিকল ম্যালেরিয়ার জ্বরের মত, কিন্তু আনুষঙ্গিক লিম্ফ্যাটিক প্রদাহ ও গ্রন্থিস্ফীতি প্রভৃতির লক্ষণ উপস্থিত থাকাতে এবং মাসে মাসে বা নির্দ্দিষ্টকাল অন্তর অনুরূপ প্রদাহের সহিত উহার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে ফাইলেরিয়াসিস্ বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কুইনিনের দ্বারা এই জ্বরের নিবৃত্তি হয় না। রক্ত পরীক্ষায় মাইক্রোফাইলেরিয়া পাওয়া গেলে তো কথাই নাই, কিন্তু না পাওয়া গেলেও সন্দেহস্থলে শ্বেতকণিকার সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া ও বিশেষতঃ ইওসিনোফিল্-কণিকার সংখ্যার যথেষ্ট বৃদ্ধি (Eosinophilia) দেখিয়া ইহা সহজেই চিনিতে পারা যায়।

এই প্রকার জ্বর অঙ্গস্ফীতির সহিত হয় বলিয়া ম্যানসন্-বার ইহাকে 'এলিফ্যাণ্টয়েড্ ফিবার' (Elephantoid fever) আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু লিম্ফ্যাটিক্ প্রদাহ ও গ্রন্থিস্ফীতি প্রভৃতি ব্যতিরেকেও এই জ্বর কখনো কখনো হইতে দেখা যায়; উহাতে জ্বর ব্যতীত ফাইলেরিয়াসিসের অন্যান্য কোনো সুস্পষ্ট লক্ষণ নাও মিলিতে পারে। সম্ভবতঃ পেটের ভিতরকার বা কোনো গভীর প্রদেশের লিম্ফ্যাটিক আক্রান্ত হইয়াই এইরূপ জ্বর হয়, বাহির হইতে তাহা জানা যায় না। এই প্রকার লক্ষণবর্জ্জিত জ্বরেও এণ্ডারসন্ (Anderson) কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিয়াছেন যে ষ্ট্রেপটোকক্কাস্ কর্ত্তৃকই উহা ঘটিয়া থাকে।

ফাইলেরিয়াসিসের জ্বর কখনো কখনো দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। এই প্রকার দীর্ঘদিনব্যাপী জ্বর কাহারো বা প্রত্যহ ছাড়িয়া যায় এবং প্রত্যহ আসে, আর কাহারো বা উহা অবিরাম জ্বরে পরিণত হয়। এই জ্বরে এক প্রকার সেপ্‌টিসিমিয়া (septicæmia) উপস্থিত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরের স্বাভাবিক বিরোধীশক্তি (resistance) প্রবল না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ জ্বর আরোগ্য করা কঠিন। এই জ্বর ও উহার সেপ্‌টিসিমিয়ার

অবস্থা অতিরিক্ত হইলে কোনো চিকিৎসাতেই তাহা আরোগ্য হয় না। উহাতে ষ্ট্রেপটোকক্কাস্-এর সংক্রমণ লিম্ফ্যাটিক্ প্রণালীকে অতিক্রম করিয়া রক্তস্রোতের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়।

(২) লিম্ফ্যাটিক্ নালীর স্ফীতি ও বিদারণ

কিছুকাল যাবৎ জ্বর-প্রদাহাদির পুনঃপুনঃ ভোগ হইবার পর উহা ক্রমে স্থগিত হইয়া যায়, তখন রোগের দ্বিতীয় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম অবস্থায় ক্ষণিক লিম্ফস্রোত অবরুদ্ধ হওয়াতে স্থানীয় লিম্ফ্যাটিক শিরা ও উপশিরাগুলি কিছুদিনের জন্য ফুলিয়া ওঠে, আবার স্রোত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কিন্তু পুনঃপুনঃ এইরূপ হইতে থাকিলে ক্রমে লিম্ফ্যাটিক্ নালীসকল স্থায়ীভাবে স্ফীত হইয়াই থাকিয়া যায় এবং উহার স্থানে স্থানে গাঁঠপড়ার মত স্ফীতোদর অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বলে **লিম্ফ্যাটিক্ ভ্যারিক্স** (lymphatic varix)।

অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কোষের উপরিস্থ চামড়াতে প্রায়ই এইরূপ স্ফীত বক্রনালী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে **লিম্ফ্-স্ক্রোটাম্** (lymph scrotum) বলে। এই সকল স্ফীত নালী সময়ে সময়ে বিদীর্ণ হইয়া তথা হইতে লালাবৎ রস নির্গত হইতে থাকে।

যদি মূত্রাশয়ের (bladder) বা মূত্রনালীর (ureter) ভিতরে উহার গাত্রসংলগ্ন কোনো লিম্ফ্যাটিক এইরূপভাবে ফাটিয়া যায়, তবে গাঢ় দুগ্ধবৎ কাইল্ (chyle) অথবা লিম্ফ্ মূত্রের সহিত মিশিয়া নির্গত হইতে থাকে। উহাকে **কাইলিউরিয়া** (chyluria) বা **লিম্ফিউরিয়া** (lymphuria) বলা হয়। আয়ুর্ব্বেদে উহাকে পিষ্টমেহ (পিঠে গোলার মত প্রস্রাব), দুগ্ধমেহ, প্রভৃতি বলা হয়। কাইলিউরিয়াতে প্রস্রাবের সহিত কখনো কখনো রক্তও থাকিতে পারে। এই অবস্থায় রোগীর রাত্রিকালের প্রস্রাব সংগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান করিলে তাহার মধ্যে মাইক্রোফাইলেরিয়াও পাওয়া যাইতে পারে, দিনের প্রস্রাবে প্রায়ই তাহা পাওয়া যায় না। এইরূপ দুগ্ধবৎ প্রস্রাব কয়েকদিন দেখা দিবার পর ক্রমে আপনিই উহা বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু একবার যে স্থান ফাটিয়া গিয়াছে পুনরায় তাহা

ফাটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং অনেকের পুনঃপুনঃ এই অবস্থা দেখা দিতে থাকে। ইহাতে জীবনের কোনো অনিষ্ট হয় না বটে কিন্তু রোগীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য করিয়া ফেলে। স্ত্রীলোকদিগের একবার কাইলিউরিয়া হইলে গর্ভাবস্থায় বা সন্তান প্রসবের পর তাহা পুনঃপ্রকাশের সম্ভাবনা থাকে।

যদি অন্ত্রনালীর মধ্যে কোনো লিম্ফ্যাটিক্ শিরা ফাটিয়া যায়,—তবে উহাতে কাইল্‌মিশ্রিত শ্বেত-অতিসার (chylous diarrhœa) দেখা দেয়। যদি পেরিটোনিয়ামের গাত্রে ফাটে,—তবে তাহাতে কাইল্‌ঘটিত উদরী (chylous ascitis) সৃষ্টি হয়। যদি কোষের অভ্যন্তরে কোনো লিম্ফ্যাটিক ফাটে,—তবে তথায় কাইল জমিয়া কোষবৃদ্ধির মত অবস্থা (chylocele) ঘটে।

লিম্ফনালী ফাটিয়া যাওয়াতে তথায় বিস্ফোটক জন্মিবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা। কেবল লিম্ফের অবরোধ হইয়া নয়, হঠাৎ তথায় আঘাত লাগিলেও উহা ঘটিতে পারে। আবার ফাইলেরিয়া উহার মধ্যে মরিয়া গেলে তাহা পচিয়া উঠিয়া প্রদাহের সৃষ্টি করিতে পারে। তখন ঐ নালীতে পূঁজের সঞ্চার হয় এবং তাহা আপনিই ফাটিয়া যায় অথবা অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক হয়। এই সকল বিস্ফোটক প্রায় ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্-জনিত। অনুসন্ধান করিলে উহার পূঁজের মধ্যে কখনো কখনো মাইক্রোফাইলেরিয়াও পাওয়া যাইতে পারে।

(৩) গোদ বা শ্লীপদ

ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের ইহাই শেষ অবস্থা। প্রথম হইতে প্রদাহের প্রতিকার করিতে না পারিলে কালক্রমে অনেকেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শীঘ্র ইহার সূত্রপাত হয় না, কিছুকাল ভুগিবার পর ক্রমে ক্রমে ইহা দেখা দেয়। ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্ এবং ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্ কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি প্রদাহ হইতে থাকাই ইহার কারণ। যাহাদের একস্থানে বহুবার প্রদাহ হয়, তাহাদেরই অবশেষে গোদ জন্মায়।

নূতন প্রদাহে অংশবিশেষ ফুলিয়া ওঠে এবং প্রদাহ দূর হইলেই উহা পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কিন্তু একস্থানে নিত্য প্রদাহ ঘটিলে

তথায় ক্রমশঃ একটু শোথভাব থাকিয়া যায়। স্থানীয় লিম্ফ-স্রোতের অপ্রবাহ হেতু তখন অনন্যগতি লিম্ফ্‌রস নালীগাত্র হইতে চুঁইয়া বাহির হইয়া এইরূপ শোথের সৃষ্টি করে, তদুপরি বীজাণুদিগের দ্বারা নিত্য প্রদাহ হইতে থাকায় ঐস্থান ক্রমে নিস্তেজ ও জীবনীশক্তিহীন (kataphylaxia) হইয়া পড়ে। পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় ঐ স্থানে তখন স্বাভাবিক জীবকোষগুলির পরিবর্ত্তে অসার তন্তুময় পদার্থের (fibrous tissue) সৃষ্টি হইতে থাকে। একবার এই তন্তু-পদার্থের সৃষ্টি আরম্ভ হইলে আর বিরাম নাই, প্রকৃতি অনবরত কেবল ইহাই সৃষ্টি করিতে রত থাকে। তখন উহার দ্বারা কেবল যে শিরাগুলি স্থূল এবং রুদ্ধ হইয়া যায় তাহা নয়, উহার নিকটস্থ মেদ মাংস প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, একে একে তাহা সমস্তই তন্তুপদার্থে পরিণত হয়। সেইজন্য চামড়া হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মাংস পর্য্যন্ত সমস্তই উহার দ্বারা একাকার হইয়া যায়, বিশ্লেষণ করিলে তখন দেখা যায় যে ঐ গোদ-পিণ্ডের মধ্যে তন্তুপদার্থ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। উহার উপরকার চামড়াটি পর্য্যন্ত একেবারে বৃষস্কন্ধের মত কঠিন হয়, টিপিয়া দাগ বসানো যায় না।

এই গোদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে হয়তো ফাইলেরিয়ার কোনো চিহ্নও তখন পাওয়া যায় না। উহারা হয়তো বহুকাল পূর্ব্বে মরিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, অথবা অন্যত্র কোথাও সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি তন্তুপদার্থের সৃষ্টিও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে এবং বীজাণুর কার্য্যও চলিতে থাকে। গোদের ভিতরকার রক্তস্রোত স্বভাবতঃই মন্দগতি, সুতরাং এখানে বীজাণুদের ক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা। উহারা ভিতরে ভিতরে নিত্য প্রদাহের সৃষ্টি করিতে থাকে এবং সুবিধা পাইলেই বিস্ফোটক জন্মায়। গোদের উপর এইরূপ বিস্ফোটক হওয়া এতই সাধারণ যে তাহা আমাদের দেশে প্রবাদবাক্য রূপে কথিত হইয়া থাকে।

গোদ শরীরের যে কোনো অংশে হইতে পারে, তবে আমাদের দেশে পায়ের গোদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ উড়িষ্যা দেশে ও পুরীতে নানারূপ পায়ের গোদ পথে ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল দেশে তাহা নয়। ফিজি দ্বীপে পা অপেক্ষা হাতের গোদই বেশী

হয়। সামোয়াতে গোদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেখানে প্রত্যেক দুইজন অধিবাসীর মধ্যে একজনের অঙ্গে গোদ আছে।

পায়ের গোদ

পায়ের গোদ সচরাচর হাঁটু হইতে নীচের দিকেই হইয়া থাকে। ইহাতে প্রথমে পায়ের চেটো ফুলিতে আরম্ভ হয়। ক্রমে তথাকার চামড়া শক্ত হইতে আরম্ভ করে এবং চামড়ার উপর খাঁজ্ পড়িতে দেখা যায়। ক্রমশঃ ফোলা উপরে উঠিতে থাকে এবং হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়া থামিয়া যায়। ঐ গোদ তৎপরে আয়তনে স্ফীত হইতে থাকে এবং অবশেষে বিপুল আকার ধারণ করে।

পায়ের গোদ ব্যতীত সাধারণতঃ আরো দেখা যায় কোষচর্ম্মের গোদ। চলিত কথায় ইহাকে কুরণ্ড বলে। কুরণ্ডের উপরকার চামড়া অত্যন্ত রুক্ষ হয় এবং অনেক সময় ভিতরে জল জমিয়া থাকাতে (hydrocele) উহা

আরো বৃহদাকার হয়। আয়তন কিছু বৃহৎ হইলেই চর্ম্মের টানে ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায় এবং মূত্রত্যাগ কালে তাহা গড়াইয়া কুরণ্ডের উপর পড়িতে থাকে। কাহারো কাহারো কুরণ্ড অসাধারণ আকার ধারণ করে এবং উহার গুরুভার বহন করিয়া তাহারা অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করে। কলিকাতায় এইরূপ এক ব্যক্তি পথের ধারে বসিয়া কুরণ্ডটিকে টেবিলের মত ব্যবহার করিত এবং তাহার উপর কাগজ রাখিয়া চিঠিপত্র মুসাবিদা করিত। অস্ত্রোপচারের দ্বারা সহজে এইরূপ কষ্টকর অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে।

ইহা ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানেও গোদ হয়। স্তনেও গোদ দেখা যায় এবং পুরুষের বা স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের উপরকার চর্ম্ম আক্রান্ত হইলেও তথায় গোদ জন্মায়। পা, হাত, কোষচর্ম্ম, এবং এই কয়েকটি স্থানেই সাধারণতঃ গোদ জন্মিতে দেখা যায়।

রক্ত পরীক্ষায় মাইক্রোফাইলেরিয়া

রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়ার সন্ধান করিবার জন্য দুইরূপ ভাবে উহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একরূপ পরীক্ষা তরল রক্তের (fresh film) মধ্যে,—তাহাতে রাত্রে রক্ত লইয়া উহা তরল থাকিতে থাকিতে পরীক্ষা করিতে হয়। আর একরূপ পরীক্ষা শুষ্ক রক্তের (dry film) মধ্যে,—উহাতে রাত্রে রক্ত লইয়া শুকাইয়া রাখিয়া পরে তাহা সময়মত পরীক্ষা করা যাইতে পারে। দুইপ্রকার পরীক্ষাতেই মাইক্রোফাইলেরিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তরল রক্তে তাহা জীবন্ত দেখা যায় এবং শুষ্ক রক্তে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। তাহাতে পরিচয়ের কোনো অসুবিধা হয় না, কারণ যে অবস্থাতেই হউক মাইক্রোফাইলেরিয়া দেখিলেই তাহা চিনিতে পারা যায়।

তরল রক্তের মধ্যে জীবন্ত মাইক্রোফাইলেরিয়া দেখিতে হইলে গভীর রাত্রে রোগীর আঙুল হইতে বড় এক ফোঁটা রক্ত কাচের স্লাইডের উপর লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উপর একটি পাতলা কাচের কভার-স্লিপ্ (cover slip) চাপা দিতে হয়, তাহাতে রক্তটি দুই কাচের মধ্যে সমতলভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং শীঘ্র শুকাইতে পারে না। অতঃপর স্লাইডখানি মাইক্রোস্কোপে

বসাইয়া অল্পশক্তি (low power) লেন্সের সাহায্যে অনুসন্ধান করিলেই রক্তমধ্যে মাইক্রোফাইলেরিয়া চঞ্চল অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। যদি ঐ স্লাইড কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা করা আবশ্যক হয়, তবে কভার-স্লিপের ধারে ধারে অল্প ভ্যাসেলিন (vaseline) লাগাইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দিতে হয়, তাহাতে উহার মধ্যে আর বায়ু প্রবেশ করে না এবং রক্তটি শীঘ্র শুকাইয়া যায় না। মাইক্রোফাইলেরিয়ার সন্ধানের জন্য এইরূপ একটি মাত্র স্লাইড পরীক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, উপর্য্যুপরি ৫।৬ খানি স্লাইড পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

শুষ্ক-রক্ত (thick-film) পরীক্ষার প্রণালী অন্যরূপ। উহার জন্য রাত্রিকালে রোগীর আঙুল হইতে একটি স্লাইডের উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত লইয়া তাহা ছুঁচের দ্বারা স্লাইডের কতকটা স্থান ব্যাপিয়া পুরু ভাবে (ম্যালেরিয়া দেখিবার পুরু ফিল্মের মত) মাখাইয়া দিতে হয়, এবং উহা কোনো

(শুষ্ক রক্তের ফিল্মে মাইক্রোফাইলেরিয়া লো-পাওয়ার মাইক্রোস্কোপে এইরূপ দেখা যায়)

আবৃত স্থানে শুকাইবার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। পরদিন ঐ শুষ্ক রক্তের ফিল্মের উপর কতকটা ডিস্টিল্ড্ ওয়াটার ঢালিয়া দিয়া রক্তটিকে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে লোহিত রক্তকণিকা সকল ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার ভিতরকার হিমোগ্লোবিন ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায়, এবং স্লাইডের উপর লাল রক্তের পরিবর্ত্তে কেবল একটি সাদা স্তরের মত পড়িয়া থাকে। ঐ স্লাইড হইতে তখন উপরকার জলটি ঝরাইয়া ফেলিয়া ভিজা

অবস্থাতেই উহা মাইক্রোস্কোপে দেখিতে হয়। ইহাতে এককালীন অনেকটা রক্ত লওয়ায় এবং রক্তকণিকাগুলি প্রায় অদৃশ্য হইয়া যাওয়ায় মৃত মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলি স্পষ্টভাবে এবং বহুসংখ্যায় একত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়ার সংখ্যা গণনা করিতে চান অথবা উহার হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করিতে চান, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের রক্ত লইয়া এইরূপেই পরীক্ষা করেন। এজন্য প্রত্যেকবার ২০ বর্গ মিলিমিটার (20 cmm.) রক্ত লওয়া প্রয়োজন। যে-কোনো চিহ্ননির্দ্দিষ্ট পিপেটের দ্বারা এই পরিমাণ রক্ত মাপিয়া লওয়া যায়।

চিকিৎসা

দুই রূপ ভাবে ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের চিকিৎসা করা যাইতে পারে। একরূপ চিকিৎসা ফাইলেরিয়ার বিরুদ্ধে, আর একরূপ চিকিৎসা বীজাণুর বিরুদ্ধে।

ফাইলেরিয়ার বিরুদ্ধে—ফাইলেরিয়ার সংক্রমণ সমূলে দূর করিবার উপযুক্ত কোনো ঔষধই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। দুইটি মাত্র রাসায়নিক (inorganic) পদার্থ হইতে উৎপন্ন নানাপ্রকার ঔষধ ইহার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—তন্মধ্যে একটি এন্টিমনি (Antimony) এবং অপরটি আর্সেনিক (Arsenic)।

এন্টিমনির প্রয়োগে রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়ার সংখ্যা কমিয়া যায় এ-কথা সকলেই স্বীকার করেন, এবং রোগলক্ষণের উপশম হয় তাহাও অনেকে বলেন। কিন্তু সকল স্থানে ইহার ফল সমান নয়। রজার্স বলেন যে ২% সোডা-এন্টিমনি-টার্ট্রেট্ সলিউশন (2% solution of Sodium Antimony Tartrate) যদি ২ সি. সি. হইতে ৫ সি. সি. পর্য্যন্ত মাত্রায় একাদিক্রমে প্রাত্যহিক প্রয়োগের দ্বারা সর্ব্বসমেত ২৬টি ইন্ট্রাভেনাস ইন্জেকশন দিতে পারা যায়, তবে রোগলক্ষণেরও উপশম হইতে পারে এবং রক্তে মাইক্রোফাইলেরিয়ার সংখ্যাও যথেষ্ট কমিয়া যায়। ব্রিটিশ গায়েনা ফাইলেরিয়া কমিশনের তরফ হইতে লাইপার (Leiper)

অনেক রোগীকে ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন,—তিনি বলেন যদিও ইহাতে মাইক্রোফাইলেরিয়ার সংখ্যা কমে বটে কিন্তু তাহাতে রোগের বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। অন্যান্য কয়েকজন বলেন ইহাতে কাহারো কাহারো রোগলক্ষণও একেবারে দূর হয় এবং গোদ হওয়াও নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সকলের নয়। অতএব এণ্টিমনির উপকারিতা সন্দেহজনক; সর্ব্বত্রই যে ইহাতে ফল পাওয়া যাইবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না।

আর্সেনিক লইয়াও অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। অনেক সময়েই ইহার দ্বারা রোগলক্ষণ দূর করিবার পক্ষে উত্তম ফল পাওয়া যায়, তবে ইহার দ্বারা ফাইলেরিয়া দূর হয় না এ কথা নিশ্চয়। **সোয়ামিন** (Soamin) ইন্‌জেকশন এই রোগে অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং প্রথম অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে অনেকের রোগ একেবারে নিবারিত হইতেও দেখা যায়। ইহা ব্যতীত **নিওস্যালভারসান** (Neosalvarsan), **নোভার্সিনোবিলন্** (N. A. B.), **সাল্‌ফার্সিনল** (Sulfarsenol), প্রভৃতিও অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ম্যাক্-নটন্ এইগুলির বিশেষ পক্ষপাতী, তিনি বলেন ইহাতে মাইক্রোফাইলেরিয়ারও বিনাশ করে। সোয়ামিনের মাত্রা ২ গ্রেন হইতে ৫ গ্রেন পর্য্যন্ত, উহা ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটারে গুলিয়া একদিন বা দুইদিন অন্তর চর্ম্মনিম্নে অথবা ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন দিতে হয়। নিওস্যাল্‌ভারসান প্রভৃতির মাত্রা সাধারণতঃ ০·৩ গ্রাম্ হইতে ০·৬ গ্রাম্ পর্য্যন্ত। আজকাল **সোলিউ-স্যালভারসান্** (Solu-salvarsan) নামে যে ঔষধটি পাওয়া যাইতেছে তাহাও ১ সি. সি. হইতে ৬ সি. সি. পর্য্যন্ত মাত্রায় সপ্তাহে একটি করিয়া ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন দেওয়া যাইতে পারে। অনেকেরই এই মত যে আর্সেনিক-ঘটিত ঔষধগুলি এণ্টিমনি অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক।

আর্সেনিক হইতে প্রস্তুত **ট্রাইপার্সামাইড্** (Tryparsamide) নামক ঔষধটি বিশেষ করিয়া কেবল কাইলিউরিয়াযুক্ত রোগের পক্ষেই উত্তম, চোপ্‌রা এবং সুন্দর রাও এই কথা বলেন। ইহা যে কাইলিউরিয়া নিবারণ করিতে সক্ষম তাহা অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে। কিরূপে ইহা ক্রিয়া করে তাহা বিশেষ জানা নাই, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে দুগ্ধবৎ প্রস্রাব যাহাদের কিছুতে বন্ধ হয় না, তাহাদের এই ঔষধের ইন্‌জেকশনে শীঘ্রই উহা আরোগ্য

হয়। এই ঔষধটি সাধারণতঃ সিফিলিস্-ঘটিত স্নায়ুরোগের (neuro-syphilis) জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাইলিউরিয়াতে ইহার মাত্রা ২ গ্রাম্ হইতে ৩ গ্রাম্ পর্য্যন্ত। ইহা প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশন হিসাবে সর্ব্বসমেত ৩।৪টি দিলেই উত্তম ফল হয়। ফাইলেরিয়াসিস্ রোগে যাহার কাইলিউরিয়ার লক্ষণ দেখা গিয়াছে কেবল তাহাকেই ইহা বিশেষ করিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

ফাইলেরিয়ার বিরুদ্ধে অন্য কোনো ঔষধ এতাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। ফাইলেরিয়া অবিনশ্বর নহে, কিন্তু উহারা যে সকল সুদূর লিম্ফ্যাটিক্ শিরা ও গ্রন্থির মধ্যে আশ্রয় লইয়া থাকে তথায় সহজে কোনো ঔষধ প্রবেশ করানো দুঃসাধ্য, এবং যে সকল বিষাক্ত ঔষধের দ্বারা উহাদের বিনাশ করা সম্ভব তাহা প্রয়োগ করিলে রোগীর শরীরের অনিষ্ট হইতে পারে।

বীজাণুর বিরুদ্ধে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ফাইলেরিয়ার বর্ত্তমানে তদনুবর্ত্তী কক্কাই-জাতীয় বীজাণুর সংক্রমণের দ্বারাই নানারূপ রোগ-লক্ষণের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত পক্ষে যদি কোনো মতে সেইগুলি দূর করিতে পারা যায় তখন শরীরে ফাইলেরিয়া একক থাকিলে কোনো ক্ষতি নাই। অতএব উপস্থিত রোগটি নিবৃত্ত করিতে হইলে ফাইলেরিয়াকে ছাড়িয়া প্রথমে বীজাণুকেই আক্রমণ করা আবশ্যক। ইহার জন্য অন্যবিধ কোনো চিকিৎসা অপেক্ষা ষ্ট্রেপটো ও ষ্ট্যাফিলোকক্কাসের **মিশ্রিত ভ্যাক্সিন** প্রয়োগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ওয়াইজ্, রোজ্, রজার্স, অ্যাকটন, এবং ব্রিটিশ গায়েনা ফাইলেরিয়া কমিটির সদস্যগণ, সকলেই এই রোগে ভ্যাক্সিন চিকিৎসার সুখ্যাতি করেন। ফাইলেরিয়াসিস্ রোগীর বিস্ফোটকের মধ্যে যে ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস ও ষ্ট্যাফিলোকক্কাস পাওয়া যায়, তাহা হইতেই এই ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করিলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ফল হয়। ইহার প্রথম মাত্রা—ষ্ট্রেপ্‌টো ১০ মিলিয়ন + ষ্ট্যাফিলো ১০০ মিলিয়ন। পরে ঐ মাত্রা যথাক্রমে বাড়াইয়া ২০ + ২০০, ৩০ + ৩০০, এইরূপ অনুপাতে ১০০ + ১০০০ মিলিয়ন পর্য্যন্ত শেষ মাত্রায় গিয়া পৌছিতে হয়, এবং উহাই অতঃপর আরো কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথম প্রথম ২।৩ দিন অন্তর কয়েকটি ইন্‌জেকশন দিতে হয়, পরে মাত্রা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে এবং রোগলক্ষণ উপশম হইলে ক্রমশঃ উহা এক সপ্তাহ অন্তর

দিতে হয়। একবারের চিকিৎসা সম্পূর্ণ করিতে ১২টি হইতে ২০।২৫টি পর্য্যন্ত ইন্‌জেক্‌শনের প্রয়োজন হইতে পারে। এই ভ্যাক্সিনের দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই জর ও প্রদাহের লক্ষণ দূর হয় এবং রোগী উপস্থিত পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করে। ইহার দ্বারা গোদ হওয়াও নিবারণ করা সম্ভব। তবে সকলকার পক্ষে এক দফা ভ্যাক্সিন প্রয়োগেই চিরদিনের জন্য রোগটি নিবারিত হয় না। অনেক স্থলে বীজাণুসকল কিছুকালের জন্য দমিত থাকে, কিন্তু পুনরায় উহারা আত্মপ্রকাশ করে, তখন পুনরায় উহাদের দমন করা আবশ্যক হয়। এইরূপে কয়েকবার ভ্যাক্সিন চিকিৎসার প্রয়োগে রোগটি এক সময় নির্ম্মূলও হইয়া যাইতে পারে। যাহাদের গোদের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাদের উহার সূত্রপাত হইতেই ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করিতে হয়।

ফাইলেরিয়াসিস্ রোগের জন্য উপযুক্ত ষ্ট্রেপ্‌টো এবং ষ্ট্যাফিলোকক্কাসের মিশ্রিত দেশী-ভ্যাক্সিনও আজকাল যথেষ্ট কিনিতে পাওয়া যায়। বেঙ্গল ইমিউনিটি, বেঙ্গল কেমিক্যাল, ক্যালকাটা রিসার্চ্চ অ্যাসোসিয়েশন, প্রভৃতি অনেক দেশী কোম্পানি এই ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং ইহার সহিত কেহ কেহ অন্যান্য রাসায়নিক ঔষধও মিশ্রিত করিয়া থাকে। এইগুলি **ফাইলেরিয়া ভ্যাক্সিন** নামে বিক্রীত হয়। উপরন্তু ষ্ট্রেপ্‌টো এবং ষ্ট্যাফিলোকাস্-ভ্যাক্সিনের সহিত কেহ বা আর্সেনিক মিশ্রিত করিয়া থাকে, কেহ বা টাইফয়েড-বীজাণুর ভ্যাক্সিন মিশ্রিত করিয়া দেয়। টাইফয়েডের সহিত এই রোগের কোনো প্রকার সম্পর্ক না থাকিলেও টাইফয়েড-বীজাণুর মিশ্রিত ভ্যাক্সিনে কখনো কখনো এই রোগে আশ্চর্য্য উপকার হইতে দেখা যায়।

ভ্যাক্সিন নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোনো বিধি নাই। কাহার পক্ষে কোন ভ্যাক্সিনটি উপকারী হইবে তাহা বলা যায় না। অতএব এক প্রকার ভ্যাক্সিনে ফল না হইলে উহা বদল করিয়া অন্য ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত। শীঘ্র ফল না হইলে হতাশ হওয়া উচিত নয়, ধৈর্য্য ধরিয়া অধিকমাত্রা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ভ্যাক্সিনে যে সর্ব্বত্রই উপকার হইবে এ কথা বলা যায় না।

যখন ভ্যাক্সিনে কিছু উপকার না দেখা যায়, তখন উহা বন্ধ করিয়া একদফা এন্টিমনি, আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধগুলি ব্যবহার করিয়াও স্থানবিশেষে ফল পাওয়া যাইতে পারে। উহা ব্যতীতও কয়েকটি অন্য উপায় আছে, স্থানবিশেষে যথাক্রমে সেগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নন্‌-স্পেসিফিক্ প্রোটীন্ চিকিৎসা (Non-specific protein therapy)—আজকাল অনেক প্রকার কক্কাই-সম্পর্কিত রোগে এই চিকিৎসার প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং ফাইলেরিয়াসিস্ রোগেও ইহাতে সময় বিশেষে উপকার পাওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ যাহাদের পূর্ব্বোক্ত ভ্যাক্সিনে ফল হয় না তাহাদের পক্ষে একবার ইহা প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইহা নূতন প্রদাহ জন্মাইয়া পুরাতন প্রদাহ তাড়াইবার এক প্রকার পদ্ধতি।

এই চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বিশদ ভাবে বলা আবশ্যক। জৈব প্রকৃতির মধ্যে এমন এক অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যদ্দারা কোনো বিজাতীয় পদার্থ তন্মধ্যে উপস্থিত হইলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যান করে। এই শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া তাহার সাহায্য লইবার জন্য কয়েক প্রকার রোগে কোনো বিজাতীয় মৃত-বীজাণু অথবা কোনো বিজাতীয় প্রোটীন-পদার্থ ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশনের দ্বারা রক্তের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়, তাহাতে তৎক্ষণাৎ রোগীর শরীরে এক প্রকার তীব্র প্রতিক্রিয়ার (physiological reaction) অবতারণা হয়, এবং তদ্দারা উহার উপস্থিত রোগটি আরোগ্য হইয়া যায়। ইচিওয়াকা (Ichiwaka) প্রভৃতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক টাইফয়েড সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণা করিতে করিতে টাইফয়েড-ভ্যাক্সিনের ক্রিয়া দেখিবার জন্য উহা বিভিন্নপ্রকার রোগে প্রয়োগ করিয়া অকস্মাৎ এই ব্যাপার লক্ষ্য করেন যে এক বীজাণুর রোগে অন্য স্বতন্ত্র বীজাণুর ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করিলে তাহাতেও রোগীর শরীরে একরূপ আরোগ্যজনক প্রতিক্রিয়া হয়; এবং কেবল ভ্যাক্সিনেই নয়, বীজাণুসম্পর্কশূন্য অন্যান্য কয়েক প্রকার প্রোটীন পদার্থ (protein and proteose substances) ইন্‌জেকশন দিলেও তাহা হইতে পারে। রোগের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সম্পর্কশূন্য বিজাতীয় পদার্থের দ্বারা এইরূপ মঙ্গলকারী রি-অ্যাক্‌শন (reaction) বা

প্রতিক্রিয়ার উদয় হয় দেখিয়া উহার প্রয়োগকে নন্-স্পেসিফিক্ চিকিৎসা বলা হয়। ইহাকে কেহ কেহ প্রোটীন্-শক্ (protein shock) বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে বিজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে শরীরের রক্তমাংসাদি অভ্যস্ত নয় তাহা অকস্মাৎ প্রবেশ করাতে জৈবপ্রকৃতি যেন 'শক্' পায়, এবং এই আঘাতে তাহার প্রতিরোধী-শক্তি অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া ওঠে; উহাই তখন তাহার উপস্থিত রোগটির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে থাকে।

এইরূপ প্রোটীন-পদার্থগুলি ইন্জেকশন করিলে দেখা যায় যে উহাতে রোগীর প্রথমে খুব কম্প হইয়া প্রবল জ্বর উপস্থিত হয়, এবং কিছুক্ষণ যাবৎ ভোগের পর উহা ঘাম দিয়া ছাড়িয়া যায়। এই সময় পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহাতে রক্তে প্রথমে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমিয়া গিয়া লিউকোপিনিয়া (leucopenia) উপস্থিত হয়, তৎপরেই কিন্তু উহার সংখ্যা বাড়িয়া যায় (leucocytosis), এবং অ্যাণ্টিবডির সংখ্যাও তৎসঙ্গে বাড়িয়া যায়। সম্ভবতঃ শ্বেতকণিকা ও অ্যাণ্টিবডির সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়াতেই উপস্থিত রোগ জয় করিতে প্রকৃতি যথেষ্ট সাহায্য পায়।

পুরাতন বাতরোগে (arthritis) এবং কয়েকপ্রকার রক্তদুষ্টিতে (sepsis) এই চিকিৎসা কখনো কখনো বেশ উপকার করে। গনোরিয়াতে এবং অন্যান্য রোগেও কেহ কেহ ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। উপযুক্ত স্থলে সাবধানে ও বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা কয়েক প্রকার রোগে চিকিৎসার এক অন্যতম উপায়।

এইরূপ চিকিৎসার জন্য সাধারণতঃ **মিশ্রিত-টাইফয়েড ভ্যাক্সিন** (T. A. B. Vaccine) ব্যবহৃত হয়। উহার মাত্রা ৩০ মিলিয়ন হইতে ১০০ মিলিয়ন পর্য্যন্ত। ফাইলেরিয়াসিস্ রোগেও উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে, অথবা উহার পরিবর্ত্তে ষ্ট্রেপ্টো এবং ষ্ট্যাফিলোকক্কাসের ভ্যাক্সিন অথবা তৎসহ কোলাই মিশ্রিত ভ্যাক্সিনও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঐ ভ্যাক্সিন চর্ম্মনিম্নে দিলে নির্দ্দিষ্ট রোগে তাহার ক্রিয়া একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট বা স্পেসিফিক (specific) ভাবে হয়, কিন্তু এই সকল রোগে উহা রক্তের মধ্যে (ইন্ট্রাভেনাস্) প্রয়োগ করিলে উহার প্রোটীনের দ্বারা অনুরূপ ভাবে নন্-স্পেসিফিক্ (non-specific) ক্রিয়ার দ্বারা প্রত্যাশিত উপকার হইয়া থাকে।

দুধের ইন্জেকশন—ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্জেকশনরূপে সাধারণ গো-দুগ্ধ প্রয়োগ করিলেও উক্ত প্রকার নন্-স্পেসিফিক্ ক্রিয়া হয়। ফাইলেরিয়াসিস রোগের পুরাতন প্রদাহে ইহাতে কোথাও কোথাও উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। আজকাল Aolan, Lactolan, প্রভৃতি নানা নামের দুগ্ধ-প্রোটীনযুক্ত ইন্জেকশনের ঔষধ এইজন্য ব্যবহৃত হইতেছে। তদ্ভিন্ন টাটকা দুধ উত্তমরূপে বহুক্ষণ (অন্ততঃ আধঘণ্টা) ফুটাইয়া লইয়াও অনেকে ইন্জেকশন দেন। অধিকক্ষণ ফুটিলে গাঢ় হইয়া যায় বলিয়া উহা কতক পরিমাণ ডিস্টিল্ড্ জলের সহিত মিশাইয়া ফুটাইতে হয়, তাহাতে কিছুক্ষণ পরে সেই জলটুকু মরিয়া যায়। ঐ দুধ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে পিচকারীর ছুঁচের দ্বারা উপরকার সরের স্তর ভেদ করিয়া ভিতরকার দুধ টানিয়া লইতে হয়। এই দুধ প্রথমে অল্প মাত্রায় (২ সি. সি.) প্রয়োগ করা উচিত, ক্রমে উহার মাত্রা ১০ সি. সি. পর্য্যন্ত বাড়ানো যায়। এই ইন্জেকশন দুই-তিন দিন অন্তর সর্ব্বসমেত ৬টি হইতে ১২টি পর্য্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন।

অন্যান্য চিকিৎসা—এই রোগে খাইবার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তেমন বিশেষ উপকার হয় না। কেহ কেহ বলেন ম্যাংগ্রোভ ছালের ক্বাথ (decoction of Mangrove bark) ব্যবহার করিলে ইহাতে উপকার হয়। কেহ কেহ লোধ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুনঃ পুনঃ জ্বর হওয়া বন্ধ করিবার জন্য অনেকে ইহাতে কুইনিন, সিনকোনা, এবং আর্সেনিক প্রভৃতিও প্রয়োগ করেন।

রোগের অন্যান্য উপসর্গগুলির জন্যও প্রয়োজনমত চিকিৎসা করা আবশ্যক। প্রদাহযুক্ত স্থানে সেঁক-তাপ দেওয়া উচিত, এবং অত্যন্ত বেদনা ও ফুলা থাকিলে কোথাও বা গুলার্ড লোশন, কোথাও বা ইক্থিয়ল বেলেডোনা ও গ্লিসিরিন সমান ভাগে মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দেওয়া উচিত। কোষের ফুলা দীর্ঘস্থায়ী হইলে স্কট্স্ অয়েণ্টমেণ্ট (Scott's ointment) মাখাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ভাল হয়। সাময়িক কোষবৃদ্ধি হইলে ল্যাঙোট্ বা সাস্পেণ্ডার ব্যবহার করিতে হয়, এবং দৌড়াদৌড়ি করা নিষিদ্ধ। পায়ে কিংবা হাতে শ্লীপদের বা শোথের প্রথম লক্ষণ দেখা দিলে কিছুকাল যাবৎ সর্ব্বদার জন্য ঐ স্থানে ইল্যাস্টিক ব্যাণ্ডেজ

(elastic bandage) দিয়া বাঁধিয়া রাখা উচিত, বা ইল্যাস্টিক মোজা ব্যবহার করা উচিত। পরিশ্রমের কার্য্য তখন না করাই ভাল। যাহাদের পায়ে শোথের সম্ভাবনা তাহাদের বসিবার স্থান অপেক্ষা সর্ব্বদা কিছু উঁচুতে পা রাখা উচিত। তদ্ব্যতীত রীতিমত মালিশ ও মর্দ্দনের ব্যবস্থাও সময়বিশেষে উপকারী।

প্রস্রাবের সহিত দুগ্ধবৎ কাইল (chyluria) নির্গত হইলে অধিক মাত্রায় সোডা সাইট্রেট, ইউরোট্রোপিন প্রভৃতি খাইতে দেওয়া উচিত।

সময়মত ইল্যাস্টিক্ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলে এবং ভ্যাক্সিন প্রভৃতি প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ রোগী শ্লীপদের ন্যায় বীভৎস অঙ্গহানি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। কিন্তু ইহার একবার সূত্রপাত হইলে তাহা নিবারণ করা বড়ই দুঃসাধ্য। প্রথম অবস্থায় ফাইব্রোলাইসিন (Fibrolysin) ইন্জেকশন দিয়া কখনো কখনো উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু রীতিমত গোদ হইলে কোনো চিকিৎসাতেই তাহা আরোগ্য করা যায় না। তবে শরীরের অল্প স্থান অধিকার করিলে তাহা অস্ত্রোপচারের দ্বারা কাটিয়া বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ

কি উপায়ে এই রোগ হওয়া নিবারণ করা সম্ভব তাহাও বিবেচ্য। পল্লীগ্রামে ইহা অধিক না হইলেও কলিকাতা প্রভৃতি শহর অঞ্চলে ইহার প্রাদুর্ভাব নিতান্ত অল্প নয়। তাহার কারণ ফাইলেরিয়াবাহী কিউলেক্স মশার তথায় যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। উহারা কেবল স্থির জলেই ডিম্ব প্রসব করে; সুতরাং ঘরে ঘরে গৃহস্থের নানাবিধ জলাধারে,—যেমন চৌবাচ্ছা, কলসী, জালা, হাঁড়ি, বালতী, ঘটি, অথবা পয়ঃপ্রণালী ও আবরণবিহীন ট্যাঙ্ক প্রভৃতির মধ্যে—যেখানেই কিছু খোলা জল পায় সেখানেই ডিম্ব প্রসব করিয়া উহারা সারা বৎসর যাবৎ আপনাদের বংশবৃদ্ধি করে। অতএব প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য কোথাও জল খোলা অবস্থায় অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত না রাখা। চৌবাচ্ছা প্রভৃতি সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখাই ভাল, এবং বাসি হইতে না দিয়া প্রত্যহ দুইবেলা জল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। কলসী,

জালা প্রভৃতি জলাধারের মুখ সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা উচিত, কিন্তু অল্প লোকেই তাহা করে। গৃহপ্রণালীতে জল জমিতে দেওয়া কোনো মতেই উচিত নয়। বাড়ীর উঠানে বা গোয়াল প্রভৃতি স্থানে খানা ডোবা রাখা অনুচিত, কারণ ঐ সকল স্থানে প্রায়ই জল জমে। লোকে বলিয়া থাকে যে কলিকাতা শহর এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—চতুর্দ্দিকে কোথাও ডোবা নালা নাই, জঙ্গল নাই,—তবু এত মশার দৌরাত্ম্য কেন? বলা বাহুল্য ইহার অধিকাংশই কিউলেক্স মশা, এবং প্রত্যেক গৃহস্থের অসংখ্য জলাধার-গুলি হইতেই উহাদের নিত্য বংশবৃদ্ধি চলিতে থাকে। যদি খোলা জলের বিষয়ে সকলে একটু সাবধান হয় তবে মশার সংখ্যা নিশ্চয় কমিয়া যায়। কেবল ফাইলেরিয়াসিস্ রোগ নিবারণের জন্য নয়, মশার দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য প্রত্যেক শহরবাসী গৃহস্থের এ বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত।

ইহা ব্যতীত শীত গ্রীষ্ম সকল সময়েই রাত্রে মশারি ব্যবহার করা উচিত। ধূপ, ধুনা প্রভৃতির দ্বারাও কিছু মশক নিবারণ হয়। শয়ন-গৃহে বহু আসবাবপত্র ও আবর্জ্জনা জমাইয়া রাখা উচিত নয় এবং দুয়ার-জানালা সর্ব্বদা মুক্ত রাখা উচিত,—যাহাতে বায়ুনির্গমনের সহিত মশাও নির্গত হইয়া যায়, এবং অন্ধকার গৃহকোণে বা কাপড় চোপড় ও বাক্স আলমারীর অন্তরালে উহারা জমিয়া থাকিতে না পারে।

ব্রিটিশ গায়েনা ফাইলেরিয়া কমিশন মশককুলের ধ্বংসসাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

(১) মশারি ব্যবহার করিবে।

(২) জল কখনো অনাবৃত রাখিবে না।

(৩) গৃহপ্রণালী হইতে অতি শীঘ্র জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখিবে।

(৪) অবিচলিতভাবে মশক নিবারণের নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিবে, এবং ফাইলেরিয়াপ্রধান দেশে অধিককাল বাস করিবে না।

(৫) জনসাধারণকে এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে।

ইঁদুর-কামড়ানোর জ্বর

Rat-bite Fever ; Sodoku

মানুষকে বিশিষ্ট প্রকারের সংক্রামিত ইঁদুরে কামড়াইলে কখনো কখনো একপ্রকার পৌনঃপুনিক জ্বর হইতে দেখা যায়, চিকিৎসিত না হইলে এই জ্বর ২৷৩ দিন অন্তর ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসে, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত উহার ভোগ হইতে থাকে। ইংরেজীতে এই জ্বরকে বলে র‍্যাট্-বাইট্ ফিবার, এবং জাপানে বলে 'সোডোকু' ('সো' অর্থে ইঁদুর, আর 'ডোকু' অর্থে বিষ)।

র‍্যাট্-বাইট্ ফিবার বা ইঁদুর-কামড়ানোর জ্বর 'রিল্যাপ্সিং-ফিবার'-জাতীয় একপ্রকার সংক্রামক রোগ। প্রকৃত রিল্যাপ্সিং-ফিবার এ অঞ্চলে বড় দেখা যায় না; পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যথেষ্ট রিল্যাপ্সিং ফিবার হয় বটে, কিন্তু বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে উহা একেবারেই নাই। কিন্তু এই ইঁদুর-কামড়ানোর জ্বর সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে এবং এ দেশেও ইহা যথেষ্ট আছে।

পুস্তকাদিতে দেখা যায় যে এই জ্বর পূর্ব্বে কেবল জাপানেই হইত, সম্প্রতি ইহা ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে দেখা যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কথা সত্য নয়। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামেও এই রোগ বহু দিন হইতে পরিচিত। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোথাও কোথাও ইহাকে 'ছুঁছুরের জ্বর' নামে অভিহিত করা হয়। যে ইঁদুরকে নাকি একবার সাপে ধরিয়াছে এবং সাপের মুখ হইতে যে পলাইয়া আসিয়াছে তাহাকেই লোকে 'ছুঁছুর' বলে। লোকের বিশ্বাস ঐ-জাতীয় ছুঁছুর যাহাকে কামড়ায় তাহারই এই প্রকার বিষাক্ত জ্বর হয়। পল্লীগ্রামের রোজারা ইহার নানারূপ টোট্কা চিকিৎসা করে। তাহারা বলে ইহা আরোগ্য করা বড় কঠিন; সাপের বিষ বরং নামানো যায় কিন্তু 'ছুঁছুরের' বিষ সহজে নামে না। বলা বাহুল্য এই সকল কিম্বদন্তির মূলে কোনো সত্য নাই।

মাদ্রাজ অঞ্চলে এই রোগ সম্বন্ধে অন্যপ্রকারের ধারণা আছে। তথাকার লোকে বলে দুই ইঁদুরে যখন ঝগড়া করে তখন উহারা পরস্পর একপ্রকার বিষ উদ্গীরণ করে। ঐ ইঁদুর যদি রাগতঃ অবস্থায় মানুষকে গিয়া কামড়ায় তবে মানুষের শরীরে সেই বিষ প্রবেশ করে, এবং তাহাতেই জ্বরের সূত্রপাত হয়। বলা বাহুল্য এই বিশ্বাসও ভ্রান্ত। যে ইঁদুর বিশিষ্টপ্রকার স্পাইরোকীট দ্বারা সংক্রামিত, কেবল তাহারই দংশনে এই রোগ জন্মিতে পারে, নতুবা অন্য ইঁদুরের দ্বারা ইহা জন্মানো সম্ভব নয়।

বর্ত্তমানে এদেশে যে কিরূপ পরিমাণে এই রোগটি দেখা যাইতেছে, চিকিৎসকদিগের মধ্যে অনেকেরই হয়তো সে সম্বন্ধে ধারণা নাই। সন্ধান লইলে দেখা যাইবে যে ইহা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প হয় না। গত ১৯৩৫ সালে কেবল কলিকাতা ট্রপিক্যাল হাঁসপাতালে ২৫০টি রোগী ইঁদুর-দংশনের জন্য চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৩০টি প্রকৃত র‍্যাট্-বাইট্ ফিবার। ইহা হইতেই অনুমান করা যাইবে জনসাধারণের মধ্যে আরো কত ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে। ইহার অধিকাংশই সময়মত ধরা পড়ে না, কারণ ইঁদুর প্রায়ই নিদ্রাবস্থায় লোকের অজ্ঞাতসারে কামড়ায়, অথবা জ্ঞাতসারে কামড়াইলেও এই সামান্য ঘটনা অনেকে বিস্মৃত হয়। উহার বহুদিন পরে রোগীর বারে বারে জ্বর হইতে থাকে এবং চিকিৎসক তাহার কোনো কারণ উপলব্ধি করিতে পারেন না। এইরূপে বহুকাল যাবৎ ভুগিয়া রোগীর শরীর দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য হইয়া পড়ে এবং যথোপযুক্ত চিকিৎসা না হওয়াতে কাহারো কাহারো শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

র‍্যাট্-বাইট্ ফিবারের বীজাণু

এই রোগের নির্দ্দিষ্টরূপ স্পাইরোকীট প্রথমে কার্টার (Carter) ১৮৮৭ সালে বোম্বাই শহরে ইঁদুরের শরীর হইতে আবিষ্কার করেন এবং উহার নাম দেন **স্পিরিলাম্ মাইনাস্** (Spirillum minus)। পরে জাপানী বৈজ্ঞানিক ফুটাকি (Futaki) ১৯১৬ সালে উহা মানুষের শরীরের ক্ষত হইতে প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং উহার নাম দেন Spirochæta morsus muris। কিন্তু এখন স্পিরিলাম্ মাইনাস্ নামটিই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে রাও (Row) প্রথমে আবিষ্কার করেন যে এই রোগ এবং ইহার স্পাইরোকীট্ ভারতবর্ষেও যথেষ্ট বর্ত্তমান, এবং নোল্‌স্ ও দাসগুপ্ত দেখিতে পান যে কলিকাতাতেও এই রোগ আছে ও তাহার স্পাইরোকীট্ এখানেও যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে।

এই স্পাইরোকীট্ দেখিতে বক্ররেখা সর্পের মত এবং আকারে অতি ক্ষুদ্র। ইহার দেহে দুইটি হইতে ছয়টি পর্য্যন্ত বক্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দুই প্রান্তে দুইটি সূক্ষ্মতম লেজ (flagella) থাকে। রোগীর রক্তের মধ্যে থাকিলেও ইহাদের খুঁজিয়া পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। দংশিতস্থানেও ইহাদের সহজে খুঁজিয়া মেলে না, অনেক অনুসন্ধান করিতে হয়। কিন্তু রোগীর রক্ত লইয়া ইঁদুরের বা গিনিপিগের বাচ্ছার শরীরে উহা ইন্‌জেকশন
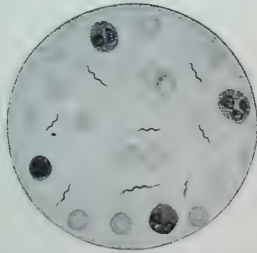
ইঁদুরের রক্তে স্পিরিলাম্ মাইনাস্
(প্রফেসর এম্, এন্, দের Bacteriology পুস্তক হইতে সংগৃহীত)

করিয়া দিলে নানাস্থানের গণ্ড ফুলিয়া কয়েক সপ্তাহ পরে উহারা মরিয়া যায়। তখন উহাদের রক্ত বা প্লীহারস প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যে প্রচুর স্পাইরোকীট্ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য কোথাও না পাওয়া গেলে উহাদের পেরিটোনিয়ামের রসের মধ্যে (peritoneal exudate) নিশ্চয় উহা পাওয়া যায়। এই পরীক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারিতরূপে রোগটি চিনিতে পারা যায়। এইরূপ পরীক্ষা পূর্ব্বে কেবল সাদা ইঁদুরের দেহেই করা হইত; কিন্তু ইঁদুরের দেহে এই স্পাইরোকীট্ স্বাভাবিকরূপেও

(spontaneous infection) বর্ত্তমান থাকা সম্ভব, সেই জন্য এখন তৎপরিবর্ত্তে গিনিপিগের বাচ্ছার শরীরে উহা প্রয়োগ করা হয়। গিনিপিগের দেহে এই স্পাইরোকীট্ স্বভাবতঃ কখনও থাকে না।

এই স্পাইরোকীটের দ্বারাই যে র‍্যাট্-বাইট্ ফিবার উৎপন্ন হয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। ১৯১৭ সালে সলোমন (Solomon) স্পাইরোকীট-পূর্ণ ইঁদুরের রক্ত মানুষের শরীরে ইন্‌জেকশন করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে উহার র‍্যাট্-বাইট্ ফিবার জন্মিয়াছে।

শুনা যায় জাপানে শতকরা তিনটি ইঁদুরের শরীরে এই-জাতীয় স্পাইরোকীট্ আছে। আমাদের দেশেও যে উহা নিতান্ত কম আছে তাহা নয়। নোল্‌স্ এবং দাসগুপ্ত কলিকাতার কয়েকটি ইঁদুর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তন্মধ্যে শতকরা ২১টি ইঁদুরের শরীরে স্পাইরোকীট্ বর্ত্তমান। কেবল ইঁদুর নয়, কাঠবিড়ালীর দেহেও এই স্পাইরোকীট্ থাকিতে পারে। ইহা ইঁদুর-জাতীয় জন্তুর (rodents) শরীরে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান থাকে, উহাদের দংশনে দৈবাৎ তাহা মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়।

লক্ষণাদি

ইঁদুরে কামড়াইলেই যে র‍্যাট্-বাইট্ ফিবার হইবে তাহা নয়। ইঁদুরের দংশনে সাধারণ ক্ষতের ন্যায় অন্যান্যরূপ বিষাক্ত প্রদাহও জন্মিতে পারে। যদি উহার দাঁতে কোনো কক্কাই-জাতীয় বা অন্য কোনো প্রকার বীজাণু থাকে তবে দংশিত স্থানটি উহার দ্বারা বিষাইয়া (sepsis) উঠিতে পারে এবং তখন তাহার তথোপযুক্ত চিকিৎসারই আবশ্যক হয়। কিন্তু র‍্যাট্-বাইট্ ফিবার স্বতন্ত্র রোগ, ইঁদুরের দংশনের সহিত উহার নির্দ্দিষ্ট-প্রকার স্পাইরোকীটের সংক্রমণ না প্রবেশ করিলে উহা হইতে পারে না।

উক্তরূপ সংক্রামক ইঁদুর কামড়াইলে উহার ক্ষত প্রথমে দুই একদিনের মধ্যেই শুকাইয়া যায়। অতঃপর দুই সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোগের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, সুতরাং জ্ঞাতসারে দংশন হইলেও সে কথা রোগী ভুলিয়া যায়। পরে দুই সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহ গত

হইলে দংশিত স্থানে একটি ক্ষুদ্র ফোস্কার মত ক্ষত দেখা যায় ; ক্রমে উহার চতুষ্পার্শ্ব লাল হইয়া ফুলিয়া ওঠে, ঐ স্থান হইতে কতকগুলি লিম্ফ্যাটিক্ শিরা সুতালির মত দৃশ্যমান হইয়া ওঠে, এবং নিকটস্থ গণ্ডগুলি (glands) ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া ওঠে। দিন কয়েক পরে উহা আপনি আরোগ্য হইয়া যায়।

পায়ের আঙুলে র‍্যাট্-বাইট ফিবারের স্থানীয় ক্ষত

স্থানীয় ক্ষত দেখা দিবার পর একদিন হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসে। জ্বরের সহিত শিরঃপীড়া থাকে, সর্ব্ব অঙ্গে বাতের মত ব্যথা হইতে থাকে, এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ হয়। জ্বরটি প্রত্যহ অল্প অল্প বাড়িতে থাকে এবং তৃতীয় দিনে উহা সর্ব্বোচ্চ সীমায় ওঠে ; তখন প্রায় ১০৩ বা ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত টেম্পারেচার হয়। জ্বরের সময় অন্যান্য কয়েকটি উপসর্গও দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা গাঁঠের ব্যথা, বমি, উদরাময়, ইত্যাদি। তিনদিন পরে জ্বরটি হঠাৎ কমিয়া যায় এবং শীঘ্রই উহা একেবারে ত্যাগ হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উপসর্গই দূর হয় এবং রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করে। কিন্তু এইরূপ বিজ্বর অবস্থায় দুই-তিন দিন মাত্র কাটে। উহার পরে,—অর্থাৎ প্রথম জ্বর আসিবার ঠিক ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে,—পুনরায় ঐরূপভাবে কম্প

দিয়া জ্বর আসে, পুনরায় সমস্ত পূর্ব্ব উপসর্গগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়, পুনরায় তৃতীয় দিনে উহার বৃদ্ধি হয়,—তৎপরে জ্বর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সমস্ত লক্ষণগুলি দূর হইয়া যায়।

এইরূপ জ্বরের পালা নিয়মিত সময় অন্তর মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরাবধিও আবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রত্যেকবার জ্বরের সময় শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ইওসিনোফিলের সংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পায় (Eosinophilia)। রোগী ইহাতে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং চিকিৎসিত না হইলে শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুও ঘটা সম্ভব। কিন্তু কোনো কোনো স্থলে দুই এক মাস ভোগের পর জ্বর উত্তরোত্তর মৃদু হইয়া আসে এবং অবশেষে রোগটি আপনিও আরোগ্য হইয়া যাইতে পারে। শুনা গিয়াছে জাপানে এই রোগে শতকরা দশজনের মৃত্যু ঘটে।

রোগ নির্দ্ধারণ

দংশনের কথা না জানিলে ইঁদুর-কামড়ানোর জ্বর চিনিতে পারা প্রায়ই কঠিন। ইঁদুরের দংশনের কথা প্রায়ই লোকে মনে রাখে না, এবং অনেকে উহা জানিতেও পারে না। তবে জ্বরের সহিত বিশিষ্টরূপ ক্ষত দেখিলে, এবং নিয়মিত পর্য্যায়ক্রমে ২।৩ দিন করিয়া বিরাম এবং ৩।৪ দিন করিয়া জ্বরভোগ হইতেছে শুনিলে ইঁদুর-কামড়ানোর জ্বর সহজে চেনা যাইতে পারে।

কিন্তু কখনো কখনো অনেক বিলম্বে এই রোগ ধরা পড়ে।

লক্ষণ দেখিয়া প্রথমে ইহাকে **ম্যালেরিয়া** মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বহুদিন কুইনিন দিয়াও যখন কিছু ফল হয় না, তখন ইহাকে **কোলাই বীজাণুর জ্বর** বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। তদ্ভিন্ন **কালাজ্বর** মনে করাও সম্ভব, কারণ বহুদিন ভুগিলে ইহাতে একটু প্লীহার বৃদ্ধিও দেখা যায়।

এইরূপ সন্দেহ স্থলে জ্বরের একটি চার্ট (chart) প্রস্তুত করিয়া উহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে রোগনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হয়। যদি জ্বরটি রিল্যাপ্সিং-ফিবার-জাতীয় হয় তবে চার্ট দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। প্রতি পালায় জ্বরটি যে কয়দিনই ভোগ হউক,

ট্রপিকাল হাঁসপাতালে চিকিৎসিত জনৈক রোগীর টেম্পারেচার চার্ট।
ইহার নিকট ইঁদুর-দংশনের কথা শুনা যায় নাই, কিন্তু চার্ট দেখিয়া সন্দেহ হয় এবং রোগীর রক্ত গিনিপিগে ইন্‌জেকশন করিয়া স্পিরিলাম মাইনাস্ পাওয়া যায়।
(কর্ণেল নোল্‌স্ এবং ডাঃ দাস গুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)
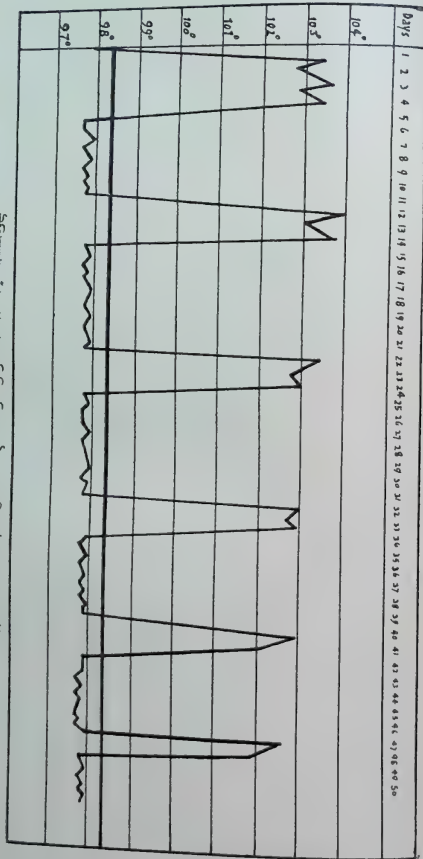
এবং উহার অন্তরালবর্ত্তী বিজ্বর অবস্থা যে কয়দিনই থাকুক,—উহা ইঁদুর-কামড়ানোর জ্বর হইলে প্রত্যেক পালা আসিবার ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে দেখা যাইবে পুনরায় একটি জ্বরের পালা আসিতেছে। এই নিয়ম যদি প্রতিবার অবিচলিত ভাবে বজায় থাকে তবেই উহা ইঁদুর-কামড়ানোর রিল্যাপ্সিং জ্বর, নতুবা নয়। রিল্যাপ্সিং-ফিবার মাত্রই এই প্রকার জ্বর ও বিজ্বরের একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে।

ল্যাবরেটরি-পরীক্ষার দ্বারা এই রোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে পারা যায়। রোগীর জ্বরকালীন রক্ত লইয়া উহা গিনিপিগ্-বাচ্ছার শরীরে ইন্‌জেকশন করিয়া দিলে দিনকতক পরে সন্দেহের নিশ্চিত মীমাংসা হইতে পারে।

চিকিৎসা

নিওস্যালভারসান্, বা **নোভার্সিনোবিলন্** ইন্‌ট্রাভেনাস্ ইন্‌জেকশনই ইহার একমাত্র চিকিৎসা। উহার প্রথম মাত্রা ০·৪৫ গ্র্যাম, দ্বিতীয় মাত্রাও তাহাই অথবা তদপেক্ষা কিছু অধিক। প্রায় দুইটি ইন্‌জেকশনেই এই রোগ আরোগ্য হয়, তৃতীয় ইন্‌জেকশনের প্রয়োজন হয় না। ইন্‌জেকশনগুলি জ্বর ছাড়িবার পর না দিয়া প্রত্যেকবার জ্বরের প্রথম মুখে দেওয়াই ভাল।

রোগ নিবারণের জন্য,—ইঁদুর কামড়াইবামাত্র দংশিত স্থান কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন দংশনের পর হইতে কয়েকদিন **ষ্টোভারসল্** (Stovarsol) খাইলে ইঁদুর-কামড়ানোর জ্বর হওয়া নিবৃত্ত হইতে পারে।

তাত-লাগা বা হীট-স্ট্রোক্

Heat Stroke ; Heat Fever.

কোনোরূপ বীজাণু প্রভৃতির সংক্রমণ না ঘটিয়াও কেবলমাত্র প্রাকৃতিক উত্তাপের আতিশয্য হইতে যে একপ্রকার আকস্মিক জ্বরের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়, অতঃপর তাহাই আলোচিত হইতেছে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ মাত্রেই প্রতি বৎসর গরমের সময় তাত লাগিয়া এই প্রকার জ্বর হইতে দেখা যায়; উহাতে শরীরের টেম্পারেচার হঠাৎ ১০৭ বা ১০৮ ডিগ্রী বা ততোধিক পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়, এবং তাহা হইতে মৃত্যুও ঘটে। প্রাকৃতিক উত্তাপ সহ করিবার অক্ষমতাই এই জ্বরের কারণ। কেবল আমাদের দেশে নয়, যেখানেই গ্রীষ্মের আধিক্য উপস্থিত হয়, সেখানেই ইহা উপর্য্যুপরি কয়েকজনের ঘটিতে দেখা যায়। আমেরিকাতেও ইহা প্রতিবৎসর যথেষ্ট হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলে ইহাকে 'লু লাগা'-র জ্বর বলে। ইংরেজীতে চলিত কথায় ইহাকে sunstroke বলে। কিন্তু কেবল রৌদ্র লাগিয়া বা গরম বাতাস লাগিয়াই এই প্রকার জ্বর হয় না; রৌদ্রে না গিয়া ঘরের মধ্যে থাকিতেও ইহা হইতে পারে, এবং জাহাজে আগুনের কাজ করিতে করিতে stokers-দিগেরও এই প্রকার জ্বর হইতে দেখা যায়। কোনোরূপ উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া কাহারো শরীর উহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে অসমর্থ হইলে তখনই এই পীড়া উপস্থিত হয়।

তাত লাগার ফলে সাধারণতঃ দুই প্রকার অসুস্থতা ঘটিতে দেখা যায়। এক প্রকার অসুস্থতা হয় মূর্চ্ছার ভাব, যাহাকে আমরা চলিত কথায় বলি **'সর্দ্দি-গর্ম্মি'** (Heat exhaustion) ; আর এক প্রকার হয় **তাত-জ্বর** (Heat fever)।

'সর্দ্দি-গর্ম্মি' (Heat exhaustion) উপস্থিত হইলে উহাতে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ মূর্চ্ছাহতের মত অবস্থা (shock)

প্রাপ্ত হয়, টলিতে টলিতে হঠাৎ একস্থানে শুইয়া পড়ে, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া ওঠে, মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হইয়া যায়, গা বমি করিতে থাকে, নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ হইয়া যায়, শরীরের উত্তাপ কমিয়া হিমাঙ্গ (subnormal) হইয়া যায়, এবং সর্ব্ববিষয়ে কোল্যাপ্সের (collapse) মত লক্ষণসমূহ উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ পরে সে ভাব কাটিয়া গিয়া রোগী আপনি সুস্থ হইয়া ওঠে, কিন্তু তৎপরে অত্যন্ত দুর্ব্বল অনুভব করে। ইহাতে হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইয়া দৈবাৎ মৃত্যুও উপস্থিত হইতে পারে। এই অবস্থা প্রায়ই অতিরিক্ত রৌদ্র লাগার ফলে হয়, সুতরাং ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে 'সান্-ষ্ট্রোক্' বলা যাইতে পারে।

তাত-জ্বর বা **হীট-ষ্ট্রোক্** আর এক বিভিন্ন অবস্থা। ইহাতে শরীরের উত্তাপ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া ওঠে (Heat hyperpyrexia)। ইহার কারণ বাহিরের তাপের সহিত শরীরের আভ্যন্তরিক তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার অক্ষমতা।

তাত-লাগার কারণ

আমাদের শরীরের সঞ্চালনাদি নানারূপ ক্রিয়ার দ্বারা ভিতর হইতে নিত্যই তাপ জন্মিতেছে, এবং উদ্বায়ন (evaporation) প্রভৃতি কয়েক প্রকার উপায়ে নিত্যই উহা শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। কেবল তাহাই নয়, ঐ সকল স্বাভাবিক উপায়ে বাহিরের আবহাওয়ার সহিত ভিতরকার তাপের আদানপ্রদানের দ্বারা শরীর আপন উত্তাপের সমতা নিয়তই রক্ষা করিয়া চলিতেছে, এবং মস্তিষ্কের তাপ-নির্দ্ধারক কেন্দ্রের (heat-regulating centre) দ্বারা এই প্রক্রিয়া সর্ব্বদা সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে। যতক্ষণ বাহিরের আবহাওয়া আমাদের শরীরের উত্তাপ অপেক্ষা শীতল থাকে ততক্ষণ ইহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। কিন্তু বাহিরের উত্তাপ শরীরের উত্তাপ অপেক্ষা অধিক হইলে তখন কেবলমাত্র উদ্বায়ন-ক্রিয়ার (evaporation) দ্বারাই সামঞ্জস্য রাখিতে হয়, তদ্ব্যতীত অন্য উপায় থাকে না। এই জন্যই তখন শরীর হইতে প্রচুর ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে; ঘর্ম্ম যতই উদ্বায়িত হয় ততই শরীরের উপরকার চর্ম্ম

শীতল হয়,—এবং চর্ম্মস্থ শিরা হইতে শীতল রক্ত ভিতরে গিয়া উত্তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু এইরূপ একটি মাত্র প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক মাত্রায় হইলে অধিককাল অবধি চলিতে পারে না, কারণ মস্তিষ্কের তাপকেন্দ্র এক সময় অতিরিক্ত চেষ্টায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; তখন ঘর্ম্ম নির্গমন বন্ধ হইয়া যায় এবং শরীরের উত্তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সুতরাং মনুষ্য-শরীরের বাহ্যতাপ সহ্য করিবার একটা সীমা আছে, ঐ সীমা অতিক্রম করিলেই শরীরের তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হাল্‌ডেন্ (Haldane) নানাপ্রকার উত্তাপের আবহাওয়ার মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তিকে রাখিয়া এ সম্বন্ধে নানারূপ এক্স্‌পেরিমেণ্ট্ করায় এই কয়েকটি তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে :—

(১) একভাবের অধিক উত্তাপের মধ্যে কাহাকেও রাখিলে কিছুক্ষণ সময় অতীত হইবার পর তাহার শরীরের টেম্পারেচার স্বাভাবিক অপেক্ষা বাড়িতে আরম্ভ হয়। সেই উত্তাপ যত অধিক হয় ততই উহা শীঘ্র হয়, এবং যত অল্প হয় তত উহা বিলম্বে হয়।

(২) আবহাওয়া যদি শুষ্ক হয় তবে অধিক উত্তাপও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সহ্য করা যায়, কিন্তু বায়ু যদি আর্দ্র (humid) হয় তবে অল্প উত্তাপও অধিকক্ষণ সহ্য করা যায় না। তাহার কারণ শুষ্ক বায়ুতে উদ্বায়ন-ক্রিয়া উত্তম হয়, আর্দ্র বায়ুর দ্বারা তাহা হয় না।

(৩) যদি তথায় বায়ু চলাচল থাকে তবে ঐ প্রকার উত্তাপ অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত সহ্য করা যায়, কিন্তু বায়ু যদি স্থির হইয়া থাকে তবে অল্পক্ষণেই সহ্যসীমা অতিক্রম করে। তাহার কারণ বায়ু স্থির থাকিলে উদ্বায়নের সম্ভাবনা অতি অল্প।

(৪) পরীক্ষিত ব্যক্তি যদি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তবে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তাপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে, কিন্তু অল্প কিছু পরিশ্রম করিলেই তাহা পারে না।

পরীক্ষায় যাহা জানা গিয়াছে বাস্তবক্ষেত্রেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের আধিক্য হইলেই হীট-ষ্ট্রোক্ হয় না। গ্রীষ্ম অত্যন্ত অধিক হইলেও যদি উহা দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে প্রশমিত হয়

তবে এই অবস্থা কাহারো হয় না। কিন্তু যে সময় দারুণ গ্রীষ্ম তিন-চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত একভাবে স্থায়ী হইয়া থাকে, সে সময় উহার শেষভাগে উপর্য্যুপরি কয়েকটি হীট্-ষ্ট্রোকের আক্রমণ এপিডেমিকের মত হইতে দেখা যায়।

হীট-ষ্ট্রোকের সম্ভাবনা কখন

আবহাওয়ার টেম্পারেচার ৮৫ ডিগ্রীর (ফারেন্‌হাইট্) উপর না উঠিলে কখনো হীট-ষ্ট্রোক্ হয় না; আর ৯৫ ডিগ্রি হইতে ১০০ ডিগ্রী টেম্পারেচারের মধ্যে কেবল বায়ুর আর্দ্রতা অধিক থাকিলে হীট-ষ্ট্রোক্ হইতে পারে, নতুবা উহা হয় না। কিন্তু টেম্পারেচার ১০৫ ডিগ্রী বা উহার অধিক হইলে বায়ুর আর্দ্রতা অতি অল্প থাকিলেও এইরূপ পীড়া যথেষ্ট হইতে দেখা যায়।

অধিকাংশ হীট-ষ্ট্রোক্ বৈকালের দিকে অর্থাৎ সমস্ত দিনের উত্তাপটুকু সহ্য করিবার শেষে হয়। রজার্স হীট-ষ্ট্রোকের কাল নিরূপণের জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে শতকরা ৭৪টি হীট-ষ্ট্রোক্ বেলা ১২ টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে ঘটিয়াছে, এবং অবশিষ্ট ঘটিয়াছে রাত্রি ৮ টা হইতে ১২ টার মধ্যে। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে কাহারো হীট-ষ্ট্রোক্ হইতে দেখা যায় নাই।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, এবং ভাদ্র মাসে অনেক হীট-ষ্ট্রোক্ হয়। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম ভাগে প্রায় উহা হয় না; সে সময় অতিরিক্ত গরম পড়িলেও বায়ু শুষ্ক থাকায় সহজে উহা হইতে পারে না। তবে লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ প্রভৃতি যে সকল দেশে উত্তাপ ১১০ ডিগ্রীর উপর উঠিয়া যায় এবং উহা অধিক দিন পর্য্যন্ত এক ভাবে স্থায়ী থাকে, তথায় বায়ু শুষ্ক থাকিলেও হীট-ষ্ট্রোক্ হয়। আর যে সকল দেশে উত্তাপ এত অধিক ওঠে না, তথায় গরমের সময় কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়িবার পর হঠাৎ উহা কিছুকালের জন্য বন্ধ হইয়া গেলে তখন কয়েকটি হীট-ষ্ট্রোক্ হইতে দেখা যায়। এই জন্য কলিকাতা অঞ্চলে আষাঢ় মাসে এবং ভাদ্র মাসে উহা আমরা কখনো কখনো দেখিতে পাই। গ্রীষ্মের সময় কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়িয়া অকস্মাৎ থামিয়া গেলে একরূপ অস্বাভাবিক

'গুমোট' ভাব হয়, তখন উত্তাপ ১০০ ডিগ্রীর নীচে থাকিলেও বায়ু আর্দ্র এবং নিশ্চল হইয়া থাকে, ইহা হীট-ষ্ট্রোকের পক্ষে উপযুক্ত সময়। এইরূপ গুমোট ভাব যদি তিন-চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে তবে অনেকেই এই পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

যাহাদের রৌদ্রে ঘুরিয়া পরিশ্রম করিতে হয় তাহাদের হীট-ষ্ট্রোক্ হইবার অধিক সম্ভাবনা বটে, তবে ঘরের ভিতর থাকিয়াও ইহা হইতে পারে।

যাহাদের বয়স ত্রিশ বৎসরের উপর, তাহাদেরই ইহা সচরাচর হয়, নিম্নবয়স্কদের বড় বেশী হয় না। পুরুষরাই ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়, স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইহা বেশী দেখা যায় না।

এই পীড়ার এক বিশেষত্ব লক্ষিত হয় এই যে মদ্যপায়ীরাই ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হয় ('Heat fever picks out the alcoholics')। যাহারা কখনও মদ্যপান করে না তাহাদের ইহা হইবার সম্ভাবনা খুব কম।

কোনো সৈন্যবাহিনী যদি প্রখর রৌদ্রের সময় অধিকদূর পর্য্যন্ত মার্চ্চ করিয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে উহার মধ্যে দেশী সৈনিক অপেক্ষা ইউরোপীয় সৈনিকরাই হীট-ষ্ট্রোকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয়। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ তাহারা গরম সহ্য করিতে অভ্যস্ত নয়; দ্বিতীয়তঃ তাহারা মদ্যপায়ী; তৃতীয়তঃ তাহারা মাংসাশী, তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ শরীরে যথোচিত বায়ুসঞ্চালন হইতে দেয় না, এবং তাহাদের শরীরের আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

স্থূল ব্যক্তিরা ইহাতে শীঘ্র পীড়িত হয়, কারণ তাহাদের শরীরের যেরূপ ওজন সেই অনুসারে তাহাদের শরীরের আয়তন কম; যতটা পরিমাণ উত্তাপন তাহাদের পক্ষে আবশ্যক, ততটা পরিমাণ চর্ম্মের পরিসর নাই। যাহারা গুরুপাকদ্রব্য ভোজন করে, জামা কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখে, এবং কম পরিমাণে জল পান করে, তাহাদের এই পীড়ার সম্ভাবনা অধিক। যাহাদের ঘাম বেশী হয় তাহাদের ইহা সহজে হয় না। তদ্ভিন্ন ম্যালেরিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া যাহাদের শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে তাহারা সহজেই ইহাতে আক্রান্ত হইতে পারে।

হীট-ষ্ট্রোকের লক্ষণাদি

ইহাতে ক্রমান্বয়ে তিন প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখা যায় :—

(১) **প্রথম সূত্রপাতের অবস্থা**—ইহার সূত্রপাতে কয়েকদিন যাবৎ মাথা-ঘোরার লক্ষণ দেখা দেয়, মাথা ধরিয়াও থাকে, ক্ষুধামান্দ্য হয়, তৃষ্ণার মাত্রা বাড়িয়া যায়, একপ্রকার আলস্যভাব আসে; পরে ঘর্ম্মরোধ উপস্থিত হয়, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক হইয়া একপ্রকার জ্বালা অনুভব হইতে থাকে, অল্প মাত্রায় বারে বারে প্রস্রাব হইতে থাকে, এবং চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হয়। ঘর্ম্মরোধ এবং বারে বারে প্রস্রাবের বেগ হওয়া ইহার সূত্রপাতের বিশিষ্ট লক্ষণ; অতিরিক্ত গরমের সময় যদি কাহারো এই লক্ষণগুলি দেখা দেয় তবে অবিলম্বে তাহার সাবধান হওয়া উচিত এবং বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত স্নানাদির ব্যবস্থা করা উচিত। সময়মত সাবধান হইলে সহজে এই দুর্ঘটনা নিবারিত হইতে পারে।

(২) **জ্বর ও উত্তেজনার অবস্থা**—ঐরূপ পূর্ব্বলক্ষণের পর অকস্মাৎ একদিন প্রবল জ্বর হয়, উহা একেবারে ১০৭ ডিগ্রীর কাছাকাছি বা তাহার উপরেও উঠিয়া যায়। উহার সহিত অসহ্য শিরঃপীড়া এবং মস্তিষ্ক-উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায়। রোগী অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক হইয়া আগুনের মত উত্তপ্ত হইয়া ওঠে, চক্ষু অতিশয় রক্তবর্ণ হয়, নাড়ীর বেগ দ্রুত ও অনিয়মিত হয়, এবং রোগী মাঝে মাঝে সশব্দে নিঃশ্বাস লইতে থাকে (stertorous breathing)। এই সময় পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে **নী-জার্ক** (knee jerk) বা হাঁটুর স্পন্দন-চিহ্ন একেবারে নাই; এই রোগের ইহা এক বিশিষ্ট লক্ষণ। যতক্ষণ ঐ চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ রোগটি বিশেষ গুরুতর নয়, কিন্তু ঐ চিহ্ন অবর্ত্তমানে অবস্থা গুরুতর বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় প্রস্রাব পরীক্ষা করিলে উহাতে অ্যালবুমেন পাওয়া যায়।

(৩) **পরবর্ত্তী অজ্ঞান অবস্থা**—পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসার বিলম্ব ঘটিলে শীঘ্রই এই অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন টেম্পারেচার আরো বাড়িয়া ১০৮ হইতে ১১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে, এবং কখনো কখনো উহা বারে বারে অকস্মাৎ কমিতে বাড়িতে দেখা যায়। রোগী

এই সময় অজ্ঞানবৎ হইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে ও মধ্যে মধ্যে মৃগীরোগীর মত হাত-পা খেঁচিতে থাকে। গাত্রচর্ম্ম এই অবস্থায় প্রায় আর্দ্র ও অপেক্ষাকৃত শীতল থাকিতে দেখা যায়, এবং মুখের ভাব ফ্যাকাশে হইয়া যায়। এ অবস্থায় নী-জার্ক্ও পাওয়া যায় না এবং চোখের ভিতর আঙুল দিলে উহাও কুঞ্চিত হয় না (loss of corneal reflex)। এই সময় নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে থাকে এবং অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ হইতে থাকে।

এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে শতকরা ২৫ জনের মৃত্যু ঘটে। অজ্ঞান হইবার অনতিকাল পরে যদি চিকিৎসা আরম্ভ করা যায় তবে উহা আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা, যত বিলম্ব হয় ততই মৃত্যুসম্ভাবনা অধিক। রজার্স লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে যাহারা অজ্ঞান হইবার তিনঘণ্টা পরে চিকিৎসিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহই বাঁচে নাই, যাহারা একঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা পাইয়াছে তাহারা সকলেই বাঁচিয়াছে।

টেম্পারেচারের তারতম্যের উপরেও আরোগ্যসম্ভাবনা কতক নির্ভর করে। গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে যাহাদের টেম্পারেচার ১১০ ডিগ্রীর কাছাকাছি উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা ৬৯·২%। যাহাদের টেম্পারেচার ১০৭ হইতে ১০৯ ডিগ্রীর মধ্যে উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা ১৯·২%। যাহাদের টেম্পারেচার ১০৭ ডিগ্রীর নীচে ছিল, তাহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা ৮·৩%।

হীট্-ষ্ট্রোকে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের, চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে আর বিশেষ ভয় নাই। তৎপরে আরো দুই-চারিদিন পর্য্যন্ত অল্প অল্প জ্বর থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ জ্বরে ভয়ের কোনো কারণ নাই।

যাহাদের জ্বর ১০৮ ডিগ্রীর নীচে থাকে তাহারা শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া ওঠে, কিন্তু যাহাদের জ্বর উহার উপরে উঠিয়া যায় তাহারা আরোগ্য হইবার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত নানারূপ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ভোগ করে। তাহারা অল্পেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, মধ্যে মধ্যে শিরঃপীড়া হইতে থাকে, একটুও গরম সহ্য করিতে পারে না, এবং কেহ কেহ রুক্ষ স্বভাবাপন্ন হইয়া পড়ে।

তাত-লাগার অন্যান্য লক্ষণ—হীট-ষ্ট্রোক্ ব্যতীত তাত লাগিবার ফলে অন্যান্য কয়েক প্রকার অসুস্থতাও ঘটিতে পারে। যথা:—

(১) **হৃৎপিণ্ডের দোষ**—যাহাদের হৃৎপিণ্ড পূর্ব্ব হইতে দুর্ব্বল থাকে, তাহাদেরই এরূপ হয়। ইহাতে বুকে হঠাৎ দারুণ যন্ত্রণা উঠিয়া রোগী হার্টফেল হইয়া মারা যাইতে পারে।

(২) **পেটের দোষ**—অধিকদিন যাবৎ উত্তপ্ত আবহাওয়ায় থাকিলে যকৃতের ক্রিয়া বিকল হইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ উহাকে বলে ট্রপিক্যাল্ লিভার (tropical liver)। তদ্ভিন্ন কখনো কখনো তাত-লাগার ফলে কলেরার মত দারুণ উদরাময় হইতেও দেখা যায়।

(৩) **ফুস্ফুসের দোষ**—অত্যধিক তাত লাগিয়া বুকে শ্লেষ্মা জমিতেও দেখা যায়; ফুস্ফুসের মধ্যে রক্ত জমিয়াই এরূপ অবস্থা হয়।

(৪) **মস্তিষ্ক দোষ**—অত্যধিক উত্তাপের মধ্যে অধিককাল থাকিলে বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিতে পারে, এবং স্বভাব রুক্ষ হইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ উহাতে হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া (run amok) পথে বাহির হইয়া পড়ে। কাহারো বা নানারূপ স্নায়ুদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। এই সকল অবস্থাকে ট্রপিক্যাল্ নিউর্যাস্থিনিয়া (Tropical neurasthenia) বলা হয়। কোনো শীতল দেশে বায়ুপরিবর্ত্তন করিলেই ইহা শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যায়।

(৫) **রৌদ্র পীড়া**—অনাবৃত মস্তকে রৌদ্রে অধিকক্ষণ ঘুরিলে তাহাতেও এক প্রকার মূর্চ্ছার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজীতে ইহাকে বলে sun-traumatism। ইহাতে অত্যন্ত মাথা ধরে এবং কখনো কখনো জ্বরও হইতে দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

দারুণ গ্রীষ্মের সময় অথবা গুমোট গরমের সময় হঠাৎ কাহারো অত্যধিক মাত্রায় জ্বর হইতে দেখিলে হীট-ষ্ট্রোক্ সন্দেহ করা উচিত, কারণ ১০৬ ডিগ্রীর উপর জ্বর ম্যালেরিয়া ব্যতীত অন্য কোনো রোগে সাধারণতঃ হয় না। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে ম্যালেরিয়াতে ভুগিতে ভুগিতেও উপরন্তু হীট-ষ্ট্রোক্ হইতে পারে। অতএব অতিরিক্ত গ্রীষ্মের সময় যে জন্যই

এরূপ প্রবল জ্বর হউক, তাহাতে হীট-ষ্ট্রোকের মতই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে যে উহা ম্যালেরিয়া বা অন্য কোনো রোগ হওয়া সম্ভব কি না।

হীট্-ষ্ট্রোক্ কি ম্যালেরিয়া, তাহা রক্তপরীক্ষায় এবং পরবর্ত্তী লক্ষণ হইতে শীঘ্রই ধরা পড়িয়া যায়।

রোগী অজ্ঞান অবস্থায় প্রথম লক্ষিত হইলে হীট্-ষ্ট্রোক্ এবং ম্যালেরিয়া ছাড়া আরো কয়েকটি রোগের সন্দেহ হইতে পারে।

মেনিঞ্জাইটিস্ হইলে ঘাড় উঠাইয়া পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন মেনিঞ্জাইটিসে টেম্পারেচার এত অধিক হয় না।

ইউরিমিয়া (Uræmia) অথবা **ডায়েবিটিসের কোমা** (Diabetic coma) হইলে প্রস্রাব পরীক্ষা করিলেই তাহা জানা যায়।

অ্যাপোপ্লেক্সি (cerebral apoplexy) হইলে রোগী অজ্ঞান হইবার কিছুকাল পরে জ্বর হয়, কিন্তু হীট-ষ্ট্রোকে পূর্ব্বে জ্বর হইয়া পরে রোগী অজ্ঞান হয়।

চিকিৎসা

রোগী যেখানে যে অবস্থায় থাকুক, কালবিলম্ব না করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রাথমিক চিকিৎসা করা প্রয়োজন। তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মাথায় ও দেহে জল ঢালিতে হইবে এবং প্রবল বেগে বাতাস করিতে হইবে।

যদি কেবল **সর্দ্দিগর্ম্মি** হইয়া থাকে তবে বারে বারে মুখের উপর এবং বুকের উপর সজোরে জলের ঝাপ্টা দিতে হইবে এবং স্মেলিং সল্ট্ (অ্যামোনিয়া) আঘ্রাণ করাইতে হইবে। **স্পিরিট অ্যারোমেটিক অ্যামোনিয়া** (৩০ ফোঁটা) এই সময় একমাত্রা খাওয়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতেই রোগী সাধারণতঃ পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। অবস্থা বিপজ্জনক হইলে **পিটুইট্রিন্ ও অ্যাড্রেনেলিন্** (½ সি. সি. করিয়া একত্রে) ইন্‌জেক্‌শনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কিন্তু যদি **তাত-জ্বর** হয় তবে উহার উত্তাপ কমাইবার জন্য রীতিমত

জলচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জলচিকিৎসাই হীট-ষ্ট্রোকের একমাত্র চিকিৎসা।

জলচিকিৎসা কি প্রকারে করিতে হইবে সে সম্বন্ধে নানাজনে নানাপ্রকার অভিমত ব্যক্ত করেন। কেহ বলেন বরফের জলের বাথের মধ্যে রোগীকে ডুবাইয়া রাখ, কেহ বলেন প্রথমে ঈষৎ গরম জলে শরীর ডুবাইয়া ঐ জল ক্রমে ক্রমে বরফের মত শীতল করিয়া দাও, কেহ বলেন মাথায় বরফের টুপি লাগাইয়া গায়ে সাধারণ ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দাও, আবার কেহ বলেন গায়ে ভিজা কাপড় জড়াইয়া তাহার উপর বরফ ঘষিতে থাক। ইহার মধ্যে কোন ব্যবস্থাটি সর্ব্বোত্তম তাহাই বিবেচ্য।

জলচিকিৎসার বিভিন্নরূপ প্রক্রিয়াতে উপকারিতার তারতম্য কিরূপ তাহার রীতিমত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমেরিকাতে একবার ৫২০ জন ব্যক্তি এককালে হীট-ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৩২ জনের মৃত্যু হয়। ইহারা চারিটি বিভিন্ন হাঁসপাতালে বিভিন্নরূপে চিকিৎসিত হইয়াছিল। যে হাঁসপাতালে (Brooklyn Hospital) গরম জলে রোগীকে বসাইয়া ক্রমে উহা ঠাণ্ডা করিবার ব্যবস্থা হয় তাহাতেই মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। যেখানে (BellevueHospital) কেবল বরফজলে বাথ দেওয়া হয় সেখানে মৃত্যুসংখ্যা তদপেক্ষা কম হয়। যেখানে (Flower Hospital) মাথায় বরফের টুপি দিয়া গায়ে ঠাণ্ডা জল সিঞ্চন করিয়া দেওয়া হয় সেখানে মৃত্যুসংখ্যা আরো কম হয়। কিন্তু উহা সর্ব্বাপেক্ষা কম হয় সেণ্ট্ ভিন্সেণ্ট্ হাঁসপাতালে (St. Vincent Hospital);— সেখানে রোগীর গায়ে ভিজা কাপড় জড়াইয়া উহার মাথার উপর বরফযুক্ত জল ছয় ফুট উঁচু হইতে দুই-চার মিনিট অন্তর বারে বারে ঢালিতে থাকা হয়, এবং টেম্পারেচার ১০৩ ডিগ্রীর নীচে নামিলে তাহাকে কম্বলে জড়াইয়া পায়ের কাছে গরম জলের বোতল রাখা হয়।

এখানে বুঝিতে হইবে যে এই পীড়াতে কেবল শরীরের উত্তাপ কমানোই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কারণ, ইহাতে কেবল তাপেরই বৃদ্ধি হয় না, ইহাতে তাপনিয়ামক কেন্দ্রের অকর্ম্মণ্যতা হেতু চর্ম্মস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপশিরা সকল নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে (vasomotor collapse)। এ সময় অকস্মাৎ রোগীকে বরফজলে ডুবাইয়া দিলে ঐগুলি কুঞ্চিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ত রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে উপস্থিত হইয়া অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু কিছুক্ষণ অন্তর করিয়া যদি বরফজলের বা শীতল জলের ধারা দেওয়া যায় তবে শিরাগুলি একবার কুঞ্চিত হইয়া পুনরায় প্রসারিত হইবার অবসর

পায়, তাহাতে শীতল রক্ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে উষ্ণ রক্ত ভিতর হইতে বাহিরে আদান প্রদানের সুযোগ থাকে। কেবল তাহাই নয়, সজোরে ধারা দিতে থাকিলে চর্ম্মস্থ স্নায়ুসকল চঞ্চল হইয়া মস্তিষ্ককেন্দ্রকে উত্তেজিত করে, তাহাতে স্তম্ভিত কেন্দ্রগুলি সজাগ হইয়া পুনরায় ক্রিয়াশীল হয়। কেন্দ্র কর্ম্মক্ষম হইলে শরীরের রক্তপ্রবাহ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াও স্বাভাবিক হয়। সেইজন্য ধারাস্নানই এস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা।

জল চিকিৎসার প্রণালী—প্রথমতঃ রোগীকে বিছানার একপার্শ্বে অয়েলক্লথের উপর অথবা মেঝের উপর দেয়ালের ধারে হেলান দিয়া বসাইয়া দাও এবং গলা হইতে পা পর্য্যন্ত ভিজা চাদর বা ভিজা গামছার দ্বারা আবৃত করিরা দাও। তৎপরে ছয় ফুট উপর হইতে বালতি বা কলসী করিয়া মাথায় ও গায়ে মধ্যে মধ্যে শীতল জলের ধারা ঢালিতে থাক। ইলেক্ট্রিক্ পাখার ব্যবস্থা থাকিলে এই সময় অনবরত তাহা সবেগে চালিত করিতে হইবে অথবা দুই দিক হইতে দুইজন পাখা লইয়া রোগীকে সজোরে বীজন করিতে থাকিবে। তাহাতে ভিজা কাপড় বা গামছার জল নিত্য উদ্বায়িত হইতে থাকিবে, সুতরাং সর্ব্বদা রোগীর অঙ্গ যথাসম্ভব শীতল থাকিবে। এইরূপে কয়েক মিনিট অন্তর শীতল জল ঢালিতে ঢালিতে কিছুক্ষণ পরে উত্তাপ কমিয়া আসিবে এবং রোগী সুস্থ বোধ করিবে।

যেখানে বরফজল পাইবার উপায় নাই সেখানে সাধারণ শীতল জলে ধারা-স্নান করাইলেও চলিবে, তবে তাহাতে উপকার পাইতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে।

জ্বরের উত্তাপ কমিয়াছে কি না তাহা বগলে থার্ম্মোমিটার লাগাইয়া এ সময় জানিবার উপায় নাই, অতএব মলদ্বারের মধ্যে থার্ম্মোমিটার দিয়া রেক্ট্যাল্ টেম্পারেচারই (rectal temperature) দেখা উচিত। রেক্ট্যাল্ টেম্পারেচার যতক্ষণ ১০২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত না নামে ততক্ষণ ধারাস্নান চলিবে। ১০২ ডিগ্রীতে নামিলে রোগীর গা মোছাইয়া পাতলা কম্বল অথবা মোটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিবে এবং মাথায় বরফের টুপি দিয়া রাখিবে। স্নানের পর কম্বল বা চাদর ঢাকা দিবার উদ্দেশ্য এই

যে তাহাতে রোগীর ঘাম হইতে থাকিবে, এবং একবার ঘাম আরম্ভ হইয়া গেলে আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকিবে না। কিন্তু স্নান করাইয়া দিবার পর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না,—প্রত্যেক ১৫ মিনিট অন্তর রেক্ট্যাল টেম্পারেচার লইয়া দেখিতে হইবে উহা কমিতেছে কি বাড়িতেছে। কিছু কমিয়া গেলে উত্তম, কিন্তু যদি উহা অত্যন্ত কমিয়া যাইতে থাকে তবে হাতে ও পায়ে গরম জলের বোতল বা ব্যাগ লাগাইয়া দিবে, এবং হস্ত পদাদি অঙ্গ সজোরে ঘর্ষণ (massage) করিতে থাকিবে। যদি কিছুক্ষণ পরে টেম্পারেচার পুনরায় বাড়িয়া যাইতে থাকে, তবে পুনরায় ভিজা কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া দিবে এবং প্রয়োজন হইলে পুনরায় ধারাস্নানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপে প্রথম চব্বিশঘণ্টা কঠোর পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন, এবং টেম্পারেচার কমিলে অথবা বাড়িলেই তৎক্ষণাৎ তাহার সমুচিত প্রতিকারের প্রয়োজন, নতুবা পুনরায় পূর্ব্বের মত প্রবল জ্বর উঠিয়া যাইতে পারে এবং তাহা কমাইতে বিস্তর বেগ পাইতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে পারিলে আর বিপদের আশঙ্কা নাই।

বরফ পাওয়া সম্ভব হইলে **মাথায় এবং কুঁচ্‌কিতে** (groin) বরফ দিবার ব্যবস্থা করা উত্তম। কুঁচ্‌কির নিকট বরফ প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই টেম্পারেচার কমিয়া যায়। তদ্ভিন্ন মলদ্বারে **বরফ জলের ডুশ্** (iced enema) দিবার ব্যবস্থা অতি উত্তম, ইহাতেও অতি শীঘ্র টেম্পারেচার কমাইয়া দেয়। বিশেষতঃ যদি হাত-পা খেঁচুনির লক্ষণ থাকে তবে বরফ জলের ডুশে খুব উপকার হয়। ঐ জলে যদি কিছু **সোডা বাইকার্ব** (১ পাইণ্ট জলে ২ ড্রাম) গুলিয়া দেওয়া যায় তবে আরো উত্তম, উহাতে শীঘ্রই খেঁচুনি নিবৃত্ত হয়।

এই সকল প্রাথমিক ব্যবস্থা করিবার পর সন্দেহস্থল মাত্রেই রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত এবং ম্যালেরিয়া আছে কি না তাহা দেখা উচিত। যদি পরীক্ষার কোনো উপায় না থাকে এবং জ্বরটি স্নানাদির পরেও পুনরায় বাড়িতে দেখা যায়, অথবা কোনো কারণে ম্যালেরিয়া বলিয়া কিছুমাত্র সন্দেহ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ ১০ গ্রেন মাত্রায় একটি কুইনিন ইন্‌জেকশন করিয়া নিরাপদ হওয়া কর্ত্তব্য।

বিলম্ব হেতু যাহাদের অত্যন্ত কঠিন অবস্থা এবং জলচিকিৎসার দ্বারা কিছু উপকার দেখা যায় না,—তাহাদের শিরা হইতে প্রথমে কিছু **রক্তমোক্ষণ** (blood-letting) করিয়া তন্মধ্যে **ইন্‌ট্রাভেনাস্ সেলাইন্** ও **গ্লুকোজ** ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু এস্থলে হাতের শিরা না কাটিয়া পায়ের গোছের পশ্চাৎভাগের শিরা (internal saphenous vein) হইতে রক্ত বাহির করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তথায় সেলাইন (৬০ ডিগ্রী উত্তাপে) প্রয়োগ করা উত্তম। ইহাতে সেলাইনটি লিভারের মধ্য দিয়া (through portal blood) যাওয়াতে অধিক উপকার হইতে পারে।

প্রবল জ্বর অধিকক্ষণ একভাবে থাকিলে প্রায়ই নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া যায়, সুতরাং তখন ষ্টিমুল্যাণ্ট ঔষধসকল ইন্‌জেকশন দিবার আবশ্যক হয়। কিন্তু এই পীড়ায় ষ্ট্রিক্‌নিন্ ব্যবহার করা উচিত নয়, তৎপরিবর্ত্তে **ডিজিটেলিস্** (অধিক মাত্রায়) ব্যবহার করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন **ক্যাম্ফর ও ঈথর** একত্রে (Camphor in Ether) ইন্‌জেকশন দিলে খুব উপকার হয়। কেহ কেহ **কার্ডিয়াজল্** (Cardiazol) দিতে বলেন।

শ্বাস-কেন্দ্র বিকল হওয়াতে যাহাদের নিঃশ্বাস অতি বিলম্বিত ভাবে (মিনিটে হয়তো ৮।১০ বার) বহিতেছে এবং শীঘ্রই শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, এরূপ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ একটি **লোবেলীন্** (Lobeline) বা **আইকোরাল** (Icoral) ইন্‌জেকশন দেওয়া বিশেষ ফলপ্রদ। এই ইন্‌জেকশন দিয়া মুখে ও বুকে সজোরে বরফ জলের ঝাপটা দিতে হয় এবং নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস করাইবার জন্য নানারূপ কৃত্রিম প্রক্রিয়া (artificial respiration) নিয়োগ করিতে হয়।

রোগী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে এবং মুখ দিয়া কিছু খাইতে পারিলে তাহাকে বারে বারে দুই এক চুমুক করিয়া ঠাণ্ডা সরবৎ খাইতে দেওয়া উচিত। ঔষধ হিসাবে **সোডা বাইকার্ব** ৩০ গ্রেন মাত্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

আরোগ্য হইবার পর কিছু কাল পর্য্যন্ত রোগীকে বাহিরে যাইতে দেওয়া বা অধিক চলাফেরা করিতে দেওয়া উচিত নয়। কিছু কালের জন্য

তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে জোলাপ দিয়া তাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা উচিত এবং লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত।

তাত-লাগা নিবারণ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভারতীয়দিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের সহজে তাত লাগে, কারণ তাহারা অধিক গরম সহ্য করিতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু তথাপি স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকের তাত-লাগার পীড়া হইতে দেখা যায়। এমন কি যাহারা স্বভাবতঃ অনায়াসে উত্তাপ সহ্য করিতে পারে তাহাদের মধ্যেও হঠাৎ সময় বিশেষে হীট্-ষ্ট্রোক হইতে দেখা যায়। অতএব অধিক উত্তাপের সময় সকলেরই সাবধানে থাকা উচিত। প্রকৃত হীট্-ষ্ট্রোক্ না হইলেও অধিক তাত লাগিলে অন্যান্য প্রকারে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে। সুতরাং উত্তাপ হইতে শরীরকে সাধ্যমত রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে তাত-লাগা নিবারণের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে। এ দেশের বাসগৃহ সাধারণতঃ খড় দিয়া ছাওয়া হয়, উত্তাপের সময় উহা জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে যথেষ্ট তাপ-নিবারণ হয়। প্রশস্ত দাওয়া অথবা বারান্দাযুক্ত খোলার বা খড়ের চালের বাড়ী পাকা গাঁথনির অট্টালিকা অপেক্ষা তাপ নিবারণের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। পূর্ব্বকালে রাজারা তাপের সময় জলটুঙ্গিতে বাস করিতেন। এখনও দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় রাজপ্রাসাদের অন্দর হইতে সুবৃহৎ কূপের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গপথ চলিয়া গিয়াছে এবং কূপের ভিতর চতুষ্পার্শে সারি সারি গোল বারান্দা। শোনা যায় সেকালের বেগমরা অতিরিক্ত গরমের সময় তথায় গিয়া আশ্রয় লইতেন।

আজকাল ধনী ব্যক্তিদের গৃহে সাধারণতঃ খস্‌খসের ব্যবহার হইতে দেখা যায়। গৃহের জানলা-দরজায় খস্‌খসের টাটি টাঙাইয়া দেওয়া হয় এবং উহা সর্ব্বদা জলসিক্ত করিয়া রাখা হয়। ইহাতে বাহিরের বায়ু তন্মধ্য দিয়া শীতল হইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করে।

বর্ত্তমানে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার প্রচলন হওয়াতে উদ্বায়ন ক্রিয়ার পক্ষে

যদিও অনেকটা সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রাকৃতিক উত্তাপ প্রশমিত হয় না; উহাতে কেবলমাত্র ঘর্ম্মের উদ্বায়নের দ্বারা শরীর শীতল রাখা হয়; ঘর্ম্ম শুকাইয়া গেলে শরীর কিছুক্ষণ পরে আর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। তাপ লাগা প্রকৃতপক্ষে নিবারণ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে। অতিরিক্ত শীতের সময় যেমন লেপ চাপা দিয়া ফল হয় না, বাসগৃহ গরম করিয়া রাখা আবশ্যক হয়, অতিরিক্ত গ্রীষ্মের সময় তেমনি বাসগৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু ঠাণ্ডা করিয়া রাখা আবশ্যক।

আবহাওয়া শীতল রাখিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গৃহের মধ্যে নিত্য শীতল হাওয়া চালনার (aircooling) ব্যবস্থা করা, যেমন আজকাল কলিকাতায় কয়েকটি বায়স্কোপগৃহে, ট্রপিক্যাল স্কুলে, হাইজীন ইনষ্টিট্যুটে, ও অন্যান্য কয়েকটি বৃহৎ ল্যাবরেটরিতে দেখা যায়। তথায় ব্যবহার্য্য গৃহের পার্শ্বে একটি স্বতন্ত্র শীতল বায়ুর ঘর (cooling chamber) থাকে, তন্মধ্যে ইলেক্ট্রিক রেফ্রিজারেটিং প্ল্যান্ট্ (refrigerating plant) বসানো থাকে, এবং বৈদ্যুতিক পাখার দ্বারা তাড়িত বায়ু উহার মধ্য দিয়া শীতল হইয়া তৎপরে তাহা উক্ত গৃহের মধ্যে চালিত হয়। গৃহের উপরদিকে বায়ু নির্গমনের ব্যবস্থা থাকে, ভিতরকার বায়ু নিত্য সেই পথে বাহির হইয়া যায়। এইরূপে সর্ব্বদা সেই গৃহে শীতল হাওয়া সরবরাহ হইতে থাকে, অথচ চতুর্দ্দিক বন্ধ থাকায় মশা মাছি প্রভৃতি প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা বহুব্যয়সাধ্য হইলেও ধনীব্যক্তিদের গৃহে এবং আফিস আদালতে ইহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত অসম্ভব নয়।

উহা অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়েও অনুরূপ একপ্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে। একটি সুদীর্ঘ বাসগৃহের অন্যান্য দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া কেবল দুইপ্রান্তে দুইটি দরজা উন্মুক্ত রাখিতে হয়। উহার একটি দরজাতে ঐ মাপের খস্‌খসের টাটি উত্তমরূপে আঁটিয়া দিয়া তাহা জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হয়, এবং একটি সিরোক্কো ইলেক্ট্রিক্ পাখা (sirocco fan) উহার নিকট এমন ভাবে লাগাইতে হয়, যাহাতে তাহা হাপরের মত খস্‌খসের মধ্য দিয়া হাওয়া টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে চালিত করে। অপর দিকের দরজায় আর একটি পাখা একরূপভাবে লাগাইয়া দিতে হয় যাহা ঘরের ভিতরকার বায়ু টানিয়া

লইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিতে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলেও গৃহের ভিতর নিত্য শীতল হাওয়ার চলাচল হইতে থাকে।

এই সকল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা অল্প স্থলেই সম্ভব, কিন্তু সাধারণের জন্য বিনাব্যয়ে তাপ নিবারণেরও নানারূপ উপায় আছে। প্রথমতঃ অনাবৃত মস্তকে রৌদ্রে বাহির হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আজকাল ছাতার ব্যবহার প্রায় অনেকেই করে না, কিন্তু আমাদের দেশে ছাতা ব্যবহার করা নিতান্তই প্রয়োজন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মস্তক আবৃত রাখার জন্য কিছু না কিছু পরিচ্ছদ আছে, কিন্তু বাঙালীর কোনো শিরস্ত্রাণ নাই। সুতরাং বাঙালীর পক্ষে ছাতা বর্জ্জন করা সুযুক্তি নয়। পশ্চিম দেশে গিয়া কোনো কোনো বাঙালীকে কাপড় পরিয়া মাথায় পাগড়ী কিংবা সোলার টুপি লাগাইতে দেখা যায়। ইহা হাস্যাস্পদ দেখাইলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী সন্দেহ নাই। সোলার টুপিতে মাথা বেশ ঠাণ্ডা রাখে; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও ছাতা অনেকাংশে উপকারী। উহা শরীরের সমস্ত উপরার্দ্ধস্থান রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করে। কালো ছাতা অপেক্ষা সাদা ছাতা আরো ভাল। দুই পুরু কাপড় দিয়া ছাতা ছাইয়া লওয়া উত্তম,—উহার উপর দিকে সাদা কাপড় এবং ভিতরে সবুজ কাপড় থাকিবে। রৌদ্রে বহুদূর যাইতে হইলে ছাতা জলে ভিজাইয়া লইয়া মাথায় দিলে রৌদ্রকষ্ট অনেকটা নিবারিত হয়।

আমাদের দেশে মাথায় তৈল প্রদানের যে নিয়ম আছে, তাহাও তাপনিবারণের পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা। তৈলের স্তর ভেদ করিয়া সূর্য্যের আল্ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মিও প্রবেশ করিতে পারে না, এবং রৌদ্রের উত্তাপও তাহাতে যথেষ্ট বাধা পায়।

যে সকল দেশে রৌদ্রতেজ প্রখর, তথায় দ্বিপ্রহরে গৃহের বাহির না হওয়াই উচিত। এই জন্য ঐ সকল স্থানে আফিস, আদালত, স্কুল প্রভৃতি প্রাতঃকালেই বসে এবং দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা।

গ্রীষ্মের সময় পরিধেয় বস্ত্রাদির বাহুল্য যথাসম্ভব বর্জ্জন করা আবশ্যক। জামা যত পাতলা ও ঢিলা হয় ততই ভাল। তবে দেহ একেবারে অনাবৃত রাখা বিধেয় নয়, তাহাতে বাহিরের উত্তাপ সরাসরি গায়ে

আসিয়া লাগে। গরমের সময় কেবল সাদা রঙের জামা ব্যবহার করা উচিত, তাহাতে উত্তাপ অনেকটা প্রতিরোধ করে। জামা ঢিলা রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে উহার অন্তরাল দিয়া অনায়াসে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে এবং ঘর্ম্মের উদ্বায়নের দ্বারা অঙ্গ শীতল করিতে পারে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে জামার ব্যবহার ছিল না, কিন্তু তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রথা ছিল উত্তরীয় ব্যবহার। তখন সকলেই যথাসম্ভব সূক্ষ্ম বস্ত্রের শ্বেত উত্তরীয় ব্যবহার করিত, তাহাতে উত্তাপও নিবারিত হইত এবং শরীরের চতুর্দ্দিকে বায়ু প্রবেশের জন্যও যথেষ্ট ফাঁক থাকিত। আজকাল আমরা অনেকে টাইট্ জামা পছন্দ করি, কিন্তু এদেশে যে সকল ইউরোপীয় আসিয়া বাস করে তাহারাও ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ঢিলা পোষাক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেখানে যাহা আবশ্যক তাহাই করা কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে যাহাদের বাধ্য হইয়া ইউরোপীয় পোষাক পরিতে হয় তাহাদেরও ঐ প্রকার পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

গ্রীষ্ম কালে রৌদ্রে পথে বাহির হইতে হইলে অনেকে কালো চশমা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চোখের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। রৌদ্রের মধ্যে যে আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থাকে তাহা অধিকক্ষণ চোখে লাগিলে অক্ষিপটের (retina) অনিষ্ট করিতে পারে। যে-কোনো প্রকার কাচের আবরণ চোখের উপর রাখিলেই উহা নিবারিত হইতে পারে, কারণ কাচের মধ্য দিয়া আল্ট্রা-ভায়োলেট্ রশ্মি ভেদ করিতে পারে না। তবে কালো রঙের কাচ দিবার উদ্দেশ্য এই যে উহাতে রৌদ্রের ঝাঁজ চোখে লাগিতে পারে না। রৌদ্রতাপ হইতে চক্ষু বাঁচাইতে চশমাতে কোনো বিশিষ্ট প্রকারের বহুমূল্য কাচ দিবার আবশ্যক নাই, যে-কোনো সাধারণ কাচের দ্বারাই তাহা হইতে পারে।

গ্রীষ্মের সময় রেলপথযাত্রা অতীব কষ্টদায়ক। বিশেষতঃ পশ্চিম প্রদেশের দুরন্ত রৌদ্রে রেল-গাড়ীর ভিতর বসিয়া যাত্রীদের বড়ই কষ্ট হয়। ঐ সকল দেশে এ সময় রেল-গাড়ীর মধ্যে অনেকেরই হীট্-ষ্ট্রোক্ হইতে দেখা যায়। গরমের সময় উপযুক্ত পরিমাণ জল সঙ্গে না লইয়া কখনই রেলে যাত্রা করা উচিত নয়। সম্ভব হইলে মধ্যে মধ্যে রেলগাড়ীর মেঝেতে জল ঢালিয়া দিয়া

উহা সিক্ত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। অতিরিক্ত গরম হইলে গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিয়া তোয়ালে বা গামছা ভিজাইয়া কেবল বুক ও পেট ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ তাহার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু উহা আঁটিয়া জড়াইতে নাই, ভিজা কাপড়ে কেবল শ্লথ ভাবে শরীর আচ্ছাদন করিতে হয়। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে আর হীট্-ষ্ট্রোক্ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অনেকে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে ভিজা কাপড় গায়ে জড়াইতে নিষেধ করেন, কিন্তু শুষ্ক রৌদ্রের উত্তাপে ভিজা কাপড়েও ঠাণ্ডা লাগিবার কোনো আশঙ্কা নাই,—যেহেতু উহাতে অধিকক্ষণ গায়ে জল বসিতে পায় না, বায়ু বহিতে থাকিলে শীঘ্রই তাহা শুষিয়া লয়।

গ্রীষ্মের সময় সূর্য্যাস্তের পর উত্তাপ কিছু কমিয়া যায় বটে, কিন্তু তখন গৃহের ভিতরকার উত্তাপ বাহির অপেক্ষা অনেক ডিগ্রী বেশী থাকে, এবং সন্ধ্যার পরেও অনেক রাত্রি অবধি তাহা শীতল হয় না। এই জন্য অতিরিক্ত গরমের সময় অনেকেই ঘর ছাড়িয়া রাত্রে বাহিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে গিয়া শয়ন করে। যতদিন পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য থাকে এবং বর্ষার সমাগম না হয়, তত দিনের জন্য ইহা উত্তম ব্যবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সময় বায়ু শুষ্ক থাকে, সুতরাং সুস্থ শরীরে ঠাণ্ডা লাগিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। যাহারা ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় করে তাহারা একেবারে মুক্ত প্রাঙ্গনে না শুইয়া ঢাকা-বারান্দায় শুইতে পারে। পশ্চিম দেশের প্রায় প্রত্যেকেই এ সময় খাটিয়া পাতিয়া বাহিরে শুইয়া থাকে।

গরমের সময় ডাবের জল বা ঠাণ্ডা সরবৎ প্রভৃতি পান করা উত্তম। কেহ কেহ বলেন তখন গরম চা পান করা ভাল, কিন্তু এ-কথা ঠিক নয়। গরম পানীয় ঘর্ম্মের উদ্রেক করে, সুতরাং তেমন ঘর্ম্মের উদ্রেক করাইবার আবশ্যক হইলে উহা পান করা যাইতে পারে। কিন্তু শীতল পানীয় শরীরকে স্নিগ্ধ করে এবং ভিতরকার তাপ কমাইয়া দেয়। পশ্চিম দেশে গরমের সময় আমপোড়ার সরবৎ অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকে। আমপোড়ার সরবতে যে শরীর শীতল করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নয়, পশ্চিম দেশে কাহারো তাত লাগিলে তাহাকে পদ্মপত্রের উপর শায়িত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে আমপোড়া মাখাইয়া দিতেও দেখা যায়। ইহা ব্যতীত অনেকে

জীরাভাজার গুঁড়া দিয়া তেঁতুলের সরবৎ প্রভৃতি পান করিতে দেয়। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে গরমের সময় অনেকে পান্তাভাত বা জল-দিয়া-ভিজানো ভাত খাইয়া থাকে, তাহাতেও শরীর স্নিগ্ধ থাকে।

যে সময় অতিরিক্ত গরম অধিক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী রহিয়াছে দেখা যাইতেছে, সে সময় সকলেরই বিশেষ সাবধান হইয়া থাকা প্রয়োজন। এ সময় খাদ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া চলা আবশ্যক। এ সময় গুরু-ভোজন করা বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। অল্প পরিমাণে লঘুভোজন করা ও মধ্যে মধ্যে প্রচুর জল পান করা অতি উত্তম। গরমের সময় মদ্যপান করা একেবারে নিষিদ্ধ। মদ্যপায়ীদের যত হীট্-ষ্ট্রোক্ হওয়ার সম্ভাবনা এমন আর কাহারো নয়।

প্রস্রাবের মাত্রা অকস্মাৎ কমিয়া গিয়া ঘন ঘন মূত্রবেগ হইতে থাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা হীট্-ষ্ট্রোকের পূর্ব্বাভাস। এই সকল লক্ষণ দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নানারূপ উপায়ে উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত। এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে অনেক হীট্-ষ্ট্রোক্ পূর্ব্ব হইতে নিবারিত হইতে পারে।

পরিশিষ্ট

মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার

আজকাল রোগ চিনিতে মাইক্রোস্কোপের কি প্রয়োজন, তাহা বর্ত্তমান কালের চিকিৎসক মাত্রেই যে জানেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

নোল্‌স্ (Knowles) বলিয়াছেন— "A microscope is more essential to the medical man in the tropics than a stethoscope",—অর্থাৎ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ডাক্তারদের পক্ষে ষ্টিথোস্কোপ অপেক্ষাও মাইক্রোস্কোপ অধিক প্রয়োজনীয়। তিনি উপমা স্বরূপ বলেন যে সমুদ্রে কম্পাস ব্যতীত নাবিকের অবস্থা যেরূপ হয়, চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাইক্রোস্কোপ ব্যতীত ডাক্তারের অবস্থাও সেইরূপ। এ সকল কথা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। অবশ্য মাইক্রোস্কোপ ব্যতীত যে ডাক্তারি করা যায় না তাহা নয়। এমন অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক আছেন যাঁহারা জীবনে মাইক্রোস্কোপ স্পর্শ করেন নাই। তবে সময়ে সময়ে তাঁহারাও যে ভুল করিয়া থাকেন তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তাঁহারা নিজেই স্বীকার করেন যে সময়মত মাইক্রোস্কোপের সাহায্য লইতে পারিলে তাঁহাদের অনেক ভুল সংশোধিত হইতে পারিত।

রোগ চিনিতে মাইক্রোস্কোপের সাহায্য লইলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা অভ্যাস রাখিলে নিত্য নূতন শিক্ষা পাওয়া যায় এবং নিত্য নূতন আনন্দ পাওয়া যায়। যে রোগটি মনে মনে অনুমান করিয়া লইলাম, মাইক্রোস্কোপ-পরীক্ষায় যদি দেখা যায় তাহা ভুল হইয়াছে, তবে কিরূপ শিক্ষা পাওয়া যায়,—অথবা যদি দেখি পরীক্ষার ফলের সহিত তাহা মিলিয়া গিয়াছে তবে কিরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, ইহা যিনি এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন।

অদৃশ্য বস্তুকে চোখে দেখিবার আগ্রহাতিশয্য হইতেই মাইক্রোস্কোপের সৃষ্টি হইয়াছে। ছোটো জিনিষকে বড় করিয়া দেখিবার জন্য পরকলার (magnifying glass) ব্যবহার বহুকাল হইতেই ছিল। ১৫৯০ সালে হল্যাণ্ডের জ্যানসেন (Zaccharius Jansen) নামক একজন চসমাওয়ালা

দৈবাৎ একটি টিউবের মধ্যে ২।৩-টি পরকলা একত্রে ভরিয়া দিয়া দেখিতে পায় যে, টিউবের ভিতর কতকটা শূন্য অন্তরাল-স্থান রাখিয়া তাহার দুইপ্রান্তে লেন্সের সংযোগ করিলে উহার বিবর্দ্ধন-শক্তি আরো অনেকগুণ বাড়িয়া যায়। ইহার পর টেলিস্কোপের আবিষ্কারক ইটালীয় পণ্ডিত গ্যালিলিও (Galilio) ১৬০৯ সালে এক মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত উহার সমুচিত উপকারিতা বুঝিতে পারা যায় নাই। অতঃপর বীজাণু-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা লিউভেনহোয়েক্ (Anton Leeuwenhoek) ১৬৭৬ সালে অনেকগুলি লেন্সের সংযোগে স্বহস্তে একটি উত্তম যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন এবং প্রথম উহার নাম দেন 'মাইক্রোস্কোপ'। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি মানুষের মল-মূত্রাদির মধ্যে কয়েকপ্রকার সূক্ষ্ম প্রাণী দেখিতে পান এবং 'little animals' বলিয়া উহাদের বর্ণনা করেন। এই সকল সূক্ষ্মপ্রাণীর (ব্যাকৃটিরিয়া ও প্রোটোজোয়া) নিখুঁৎ বর্ণনা করিয়া ও ছবি আঁকিয়া তিনিই ১৬৭৬ সালে লণ্ডন রয়েল্ সোসাইটিতে প্রথম উহাদের অস্তিত্বের কথা প্রকাশিত করেন।

লিউভেনহোয়েকের আবিষ্কারের পর আড়াইশত বৎসরের অধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। অল্পে অল্পে এই যন্ত্রের এখন কল্পনাতীত উন্নতি ঘটিয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে প্রকার নূতন মাইক্রোস্কোপের সৃষ্টি হইয়াছে, পুরাতন মাইক্রোস্কোপের সহিত তাহার তুলনাই হয় না। এই সকল উন্নতির জন্য অনেকের মধ্যে অ্যাবের (Ernest Abbe) নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইনি লেন্স প্রস্তুত প্রণালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইমার্শান-লেন্স্ (immersion lens), অ্যাপোক্রোম্যাটিক্ অবজেকৃটিভ (apochromatic objectives), এবং অ্যাবে-কণ্ডেন্সার (Abbe condenser) নামক বিশিষ্ট অংশগুলির তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করেন।

এখনকার যে-কোনো মাইক্রোস্কোপে দৃশ্যবস্তু আয়তনে ১৪০০-গুণ পর্য্যন্ত বড় করিয়া (effective magnification up to 1400 diameters) দেখা যাইতে পারে, অথচ তাহাতে প্রতিবিম্বের বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটে না। যে সকল সূক্ষ্মপ্রাণী দেখিতে এত বিবর্দ্ধনের আবশ্যক, তাহা এই যন্ত্রে কেবলমাত্র মৃত অবস্থাতেই দেখা যায় না, ডার্ক-গ্রাউণ্ড নামক উপায়ের দ্বারা (by dark-ground illumination) উহাদের জীবিত অবস্থাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই যন্ত্রের দামও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। আজকাল ৪০০ টাকাতে চিকিৎসকের উপযোগী অংশগুলি সমেত একটি মাইক্রোস্কোপ পাওয়া যায়, এবং ৫০০ টাকা খরচ করিতে পারিলে অতি উৎকৃষ্ট মাইক্রোস্কোপ মিলিতে পারে। এখনও পর্য্যন্ত অনেক চিকিৎসক বিনা মাইক্রোস্কোপে কার্য্য চালাইতেছেন এবং অপরের ল্যাবরেটরির সাহায্য লইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন প্রত্যেক চিকিৎসককে একটি করিয়া নিজস্ব মাইক্রোস্কোপ রাখিতে হইবে এবং রক্তাদির সাধারণ পরীক্ষাগুলি স্বয়ং করিয়া লইতে হইবে।

মাইক্রোস্কোপ পরিচয়

সাধারণতঃ দশপ্রকার মাইক্রোস্কোপ আজকাল বাজারে প্রচলিত। তন্মধ্যে চারি প্রকার বিলাতী, চারিপ্রকার জার্ম্মান, ও দুই প্রকার আমেরিকান। বিলাতী প্রস্তুতকারকদিগের নাম,—বেক্ (Beck), সুইফ্ট্ (Swift), ওয়াটসন্ (Watson), এবং বেকার (Baker)। জার্ম্মান প্রস্তুতকারকদের নাম—সাইস্ (Zeiss), ভিন্কেল-সাইস্, Winkel-Zeiss), লাইট্স্ (Leitz), ও রাইকার্ট (Reichart)। আমেরিকান প্রস্তুতকারকদের নাম—স্পেন্সার (Spencer), ও বশ্ এণ্ড লম্ব্ (Bausch and Lomb)। বলা বাহুল্য ইহাদের সকলেই আধুনিক পদ্ধতিতে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সুতরাং সকলের মাইক্রোস্কোপই ভাল, এবং দামও প্রায় সকলেরই সমান। তবে জার্ম্মান মাইক্রোস্কোপগুলির লেন্স অপেক্ষাকৃত উত্তম।

মাইক্রোস্কোপের প্রত্যেক অংশগুলির পরিচয় জানা আবশ্যক এবং ইহা ব্যবহার করিতে রীতিমত শিক্ষা আবশ্যক। ইহা সামান্য ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস নয় যে চোখে লাগাইয়া দেখিলেই দৃশ্যবস্তু বড় করিয়া দেখা যাইবে। ইহার উদ্দেশ্য, অত্যন্ত ক্ষুদ্র পদার্থকে অত্যন্ত বড় করিয়া অথচ একেবারে যথাযথভাবে দেখা, সুতরাং ইহাতে নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ইহার নানাবিধ অংশের সুসংস্থান করিয়া

প্রত্যেকটিকে যথারীতি নিয়োগ করিতে পারিলে প্রথমে দৃশ্যবস্তু উজ্জ্বলরূপে আলোকিত (critical illumination) হইয়া তৎপরে উহার নিখুঁত প্রতিবিম্বটি (critical image) দেখিতে পাওয়া যাইবে। মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারের ইহাই একমাত্র নিয়ম, এবং প্রত্যেকবার পরীক্ষায় যাহাতে উহার সুবিধাটুকু সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়, প্রথম হইতেই তাহা অভ্যাস করিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় ডাক্তারি স্কুল বা কলেজে অন্যান্য সমস্ত যন্ত্র সম্বন্ধেই শিক্ষার্থীকে বিশদ ভাবে পরিচিত করা হইলেও এই যন্ত্রটির বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবহেলা দৃষ্ট হয়। তাহাতে অল্প শিখিয়াই শিক্ষার্থীরা মনে করে মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার শিখিয়া লইয়াছে। তৎপরে কার্য্যস্থলে গিয়া উহা স্বহস্তে ব্যবহার করিতে হইলেই নানারূপ অসুবিধা হইতে থাকে, এবং পুনরায় তখন উহা নূতন করিয়া শিখিতে হয়। সাধারণ চিকিৎসকদিগের মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারে অনাসক্ত হইবার ইহাও এক কারণ। এই অত্যাবশ্যক যন্ত্র সম্বন্ধে প্রথম হইতেই ছাত্রদিগকে এরূপ বিশদ ভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে তাহারা ইহার ব্যবহারে ব্যর্থকাম না হইয়া বরং আনন্দ পায়।

মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র কতকগুলি বিভিন্ন অংশ লইয়া নির্ম্মিত, এবং এই সকল অংশের সমন্বয়েই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ। প্রত্যেক অংশের কার্য্যকারিতা স্বতন্ত্র, এবং বিভিন্ন অংশগুলিকে যথাক্রমে নিয়োগ করিলে তবেই অবশেষে দৃশ্যবস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্নরূপ পরীক্ষার জন্য এই অংশগুলির বিভিন্নরূপ সংস্থান করিতে হয়, এবং যে যেমন দৃশ্য বস্তু সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লেন্স্ ব্যবহার করিতে হয়, বিভিন্ন রূপ আলোকের সংযোজনা করিতে হয়, এবং দৃশ্যবস্তু দৃষ্টিভূত হইলে ফোকাসের চাকা ঘুরাইয়া নানারূপ ভাবে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়।

মাইক্রোস্কোপের প্রত্যেক অংশের কি পরিচয় এবং উহার দ্বারা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহা অগ্রে স্বতন্ত্রভাবে জানা আবশ্যক।

(১) **ফুট্ বা পায়া** (Foot)—যাহাতে যন্ত্রটি অল্প আঘাতে উল্টাইয়া না পড়ে এই জন্য উহার নীচে লোহার ভারী পায়া দেওয়া থাকে। পূর্ব্বে তেপায়ার (tripod) মত পায়া ছিল, আজকাল প্রায় অশ্বক্ষুরের মত পায়া

লাগানো হয়। এই পায়ার উপর মোটা ধাতুনির্ম্মিত একটি শরীর-দণ্ড মাইক্রোস্কোপের অন্যান্য অঙ্গ সমেত খাড়া ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

(২) **বডি ও হ্যাণ্ডেল্** (Body and handle)—শরীর-কাণ্ডের পশ্চাতে সুবৃহৎ হ্যাণ্ডেল বা হাতলটি বল্টু দিয়া আঁটা। উহার সম্মুখভাগে মাইক্রোস্কোপের লম্বা বডি-টিউব লাগানো থাকে। যাহাতে উক্ত টিউবকে ইচ্ছামত উঠানো বা নামানো যায় এই জন্য বডির গায়ে দুই জোড়া কর্‌করাযুক্ত চক্র দুইদিকে দেওয়া আছে। ঐ টিউবের নীচেই মাইক্রোস্কোপের প্রশস্ত ষ্টেজ্ বা দৃশ্যমঞ্চ থাকে। প্রয়োজন হইলে পায়া স্থির রাখিয়া ষ্টেজ ও হ্যাণ্ডেল সমেত মাইক্রোস্কোপটি পিছনের দিকে হেলানো যায়, তাহাতে পরীক্ষকের পক্ষে চক্ষু প্রয়োগ করিয়া দেখিবার সুবিধা হয়।

যন্ত্রটি স্থানান্তরিত করিতে হইলে কেবল এই হ্যাণ্ডেল ধরিয়াই উঠানো উচিত, অন্য কোনো অংশ ধরিয়া উঠাইলে যন্ত্রের অনিষ্ট হইতে পারে।

(৩) **ষ্টেজ্ বা দৃশ্যমঞ্চ** (Stage)—ইহা টিউবের নীচে সমতলভাবে অবস্থিত এবং উহার মধ্যদেশে কতকটা ফাঁক। দৃশ্যবস্তু একটি কাচের স্লাইডে লইয়া ষ্টেজের এই ফাঁকটির অব্যবহিত উপরে স্থাপন করিতে হয়; তাহাতে নীচে হইতে আয়নার দ্বারা আলোক প্রতিফলিত হইয়া ঐ ফাঁকের মধ্য দিয়া দৃশ্যবস্তুতে আসিয়া পড়ে, এবং উপর হইতে টিউবের মধ্য দিয়া উহা দৃষ্টিগোচর হয়।

(৪) **মেক্যানিক্যাল্ ষ্টেজ্** (Mechanical stage)—ইহা কাচের স্লাইডটিকে নিপুণভাবে ধরিয়া অতি ধীরে ধীরে একপাশ হইতে অন্যপাশে ও সম্মুখ হইতে পশ্চাতে সরাইবার এক স্বতন্ত্র যন্ত্র। ডাক্তারি পরীক্ষাগুলির পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক। রোগীর রক্তাদি কাচের স্লাইডে লইয়া তন্মধ্যে কোনো বিশিষ্ট বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইলে মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগাইয়া এই যন্ত্রের সাহায্যে স্লাইডখানিকে ইচ্ছামত সরাইয়া উহার প্রত্যেক অংশ তন্নতন্নরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়। এইজন্য যন্ত্রসংলগ্ন মেক্যানিক্যাল্ ষ্টেজ্ (built-in mechanical stage) সমেত মাইক্রোস্কোপ ক্রয় করাই উচিত, কারণ স্বতন্ত্র ভাবে লাগাইয়া লইলে উহা কয়েক বৎসর ব্যবহারের পর আল্‌গা হইয়া যাইতে পারে।

(৫) **মিরর্ বা আয়না** (Mirror)—মাইক্রোস্কোপে দৃশ্যবস্তু এতগুণ বার্দ্ধিত করা হয় যে যথেষ্ট আলোকপাত ভিন্ন তাহার সূক্ষ্মাংশগুলি দৃষ্টিভূত হয় না। ঐ প্রকার আলোকসম্পাতের জন্য ষ্টেজের নীচে কিছু দূরে একটি ফ্রেমের দুই পৃষ্ঠে দুটি ছোট ছোট আয়না লাগানো থাকে, তন্মধ্যে একটি আয়না সমতল (plane), এবং অন্যটি নতোদর (concave)। সমতল বা প্লেন মিররের দ্বারা যে আলোকরশ্মিগুলি প্রতিফলিত হইবে তাহা সমান্তর রেখায় (parallel rays) দৃশ্যবস্তুতে গিয়া পড়িবে,—এবং নতোদর বা কন্‌কেভ মিরর হইতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলি শঙ্কুর মত একত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া (concentric rays) দৃশ্যবস্তুতে পড়িবে। সুতরাং দুইরূপ আয়নার দুইরূপ প্রয়োগ আছে। আয়না দুটি যেদিকে ইচ্ছা ঘোরানো যাইতে পারে, এবং সম্মুখে বা পশ্চাতে বা পাশাপাশি সরাইয়া দিতেও পারা যায়। মাইক্রোস্কোপে কিছু দেখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আয়নাটি যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত—উহার দ্বারা দৃশ্যবস্তুতে আলোক আসিয়া উত্তমরূপে প্রতিফলিত হইতেছে কি না।

(৬) **ডায়াফ্রাম্ বা ছিদ্রপট** (Diaphragm)—আয়নার কিছু উপরে একটি গোল ফ্রেমের মধ্যে ডায়াফ্রাম সংলগ্ন। কয়েকটি পাতলা ইস্পাতের পাত গায়ে গায়ে সাজাইয়া চক্ষুতারকার অক্ষিবিরণের অনুকরণে উহা প্রস্তুত, সেইজন্য উহার নাম আইরিস্-ডায়াফ্রাম (iris diaphragm)। ঐ পাতগুলি ধারের দিকে গুটাইয়া লইলেই ছিদ্রপট বিস্তৃত হইয়া যায়, এবং সেগুলি মধ্যদিকে প্রসারিত করিয়া দিলেই ছিদ্রপট সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ফ্রেমের একপাশে একটি লিভার (lever) বা কীলক থাকে, তাহা ধরিয়া চালিত করিলেই ছিদ্রপট প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হইতে পারে। আলোকরশ্মিগুলিকে ইচ্ছামত কমবেশী করিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন। যেখানে অত্যন্ত সূক্ষ্মবস্তু দেখিতে হইবে সেখানে অধিক আলোকের আবশ্যক, কিন্তু যেখানে দৃশ্যবস্তু কিঞ্চিৎ স্থূল সেখানে অল্প আলোকের আবশ্যক। কোন বস্তু কতটা আলোতে স্পষ্ট দেখাইবে, তাহা পরীক্ষক ডায়াফ্রামের ছিদ্র কমাইয়া ও বাড়াইয়া স্থির করিয়া লইবেন।

(৭) **কণ্ডেন্‌সার** (Condenser)—আবিষ্কারকের নামে ইহাকে অ্যাবে-কণ্ডেন্‌সার (Abbe condenser) বলা হয়। ইহা ডায়াফ্রামের

উপরে একটি স্বতন্ত্র ফ্রেমের মধ্যে লাগাইতে হয়। এই কণ্ডেন্‌সার ২।৩টি লেন্সের সংযোগে প্রস্তুত। আয়না হইতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলিকে উত্তমরূপে কেন্দ্রগত (converge) করিয়া দৃশ্যবস্তুকে প্রয়োজনমত প্রতিভাত করিবার জন্য ইহার আবশ্যক। ইহাকে ষ্টেজের কাছে বা দূরে লইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র পিনিয়ন (pinion) আছে, উহা ঘুরাইলেই কণ্ডেন্‌সার ওঠানামা করে। অভিপ্রেত রূপে আলোকের ফোকাস্ (focus) করিবার জন্য তাহা আবশ্যক। দৃশ্যবস্তুকে যে অনুপাতে বড় করিয়া দেখিতে যতটা আলোকের প্রয়োজন কণ্ডেন্‌সারকে সেই অনুপাতে ষ্টেজের নিকটবর্ত্তী আনা ও ডায়াফ্রামকেও সেই অনুপাতে অধিক খুলিয়া দেওয়া দরকার। ইহার ব্যবহারের নিয়ম এই যে সূক্ষ্মবস্তু অধিক পাওয়ারে দেখিতে যখন উজ্জ্বল আলোকের প্রয়োজন তখন ডায়াফ্রামের ছিদ্র সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হয় এবং কণ্ডেন্‌সার যথাসম্ভব নিকটে লইয়া আসিতে হয় ;—কিন্তু স্থূলবস্তু অল্প পাওয়ারে দেখিতে যখন অল্প আলোকের প্রয়োজন, তখন ডায়াফ্রামের ছিদ্রও সঙ্কুচিত করিয়া দিতে হয় এবং কণ্ডেন্‌সারটিও যথাসম্ভব নীচে নামাইয়া দিতে হয়।

এ-পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা কেবল মাইক্রোস্কোপের নীচেকার অংশ অর্থাৎ উহার ষ্টেজ ও তন্নিম্নস্থ সাব্-ষ্টেজ্ সম্বন্ধে। অতঃপর উহার উপরের যে সকল অংশের সাহায্যে দৃশ্যবস্তুকে চক্ষুগোচর করিতে হয় সেইগুলির কথা উল্লেখ করা হইবে।

(৮) **বডি-টিউব** (Body-tube)—মাইক্রোস্কোপের সম্মুখভাগে যে লম্বা টিউব দেখা যায় উহাই বডি-টিউব। ইহার ভিতর দিয়াই দৃশ্যবস্তু দেখিতে হয়। ইহার সমস্তটাই ফাঁক ; কিছু দেখিবার সময় ইহার উপরের মুখে এক প্রস্ত লেন্স যোজনা করিতে হয়, তাহার নাম আইপীস্ (eye piece),—এবং নীচের মুখে আর একপ্রস্ত লেন্স্ যোজনা করিতে হয়, তাহার নাম অবজেক্‌টিভ (objective)। কিন্তু দুই প্রকার লেন্সের মাঝে এতখানি লম্বা ফাঁকা টিউব রাখার কারণ কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহাই হল্যাণ্ডের জ্যান্‌সেন নামক চসমাওয়ালা দৈবাৎ আবিষ্কার করে যে দুইদিকে দুইটি লেন্স্ দিয়া মাঝে কতকটা টিউবের ব্যবধান রাখিলে প্রতিবিম্ব অনেক বড় দেখা যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, এইরূপ একটি টিউব থাকাতে নীচেকার

অব্‌জেকটিভের লেন্সের দ্বারা কতকটা বড় হইয়া দৃশ্যবস্তুর একটি অমূর্ত্ত প্রতিবিম্ব প্রথমে টিউবের মধ্যে কোনো-একস্থানে আসিয়া পড়ে, পরে আইপীসের দ্বারা আরো বড় হইয়া ঐ অদৃশ্য প্রতিবিম্বেরই একটি মূর্ত্ত প্রতিবিম্ব চোখে আসিয়া পড়ে। ইহাতে বিবর্দ্ধনের মাত্রা যোগ না হইয়া গুণ হয়, এবং তাহাতে দৃশ্যবস্তুর আয়তন অনেকগুণ বাড়িয়া যায়। এই জন্যই ঐ টিউবের প্রয়োজন। লেন্সের শক্তি হিসাবে টিউবের দৈর্ঘ্য স্থির করিতে হয়। বিলাতী লেন্সগুলি ৮⅘ ইঞ্চি টিউব-দৈর্ঘ্য হিসাবে (tube-length of 200 mm.) নির্ম্মিত, কিন্তু জার্মান লেন্সগুলি ৬⅓ ইঞ্চি টিউব-দৈর্ঘ্য হিসাবে (tube-length of 160 mm.) নির্ম্মিত। যাহাতে এক যন্ত্রে ইচ্ছামত নানারূপ লেন্স ব্যবহার করা যায় এবং টিউবের দৈর্ঘ্য কমানো-বাড়ানো যায়, সেজন্য বাহিরের টিউবের ভিতরে আরো একটি গা-টিউব (draw-tube) দেওয়া আছে ; উহা টানিয়া বাহির করিলেই টিউবের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া যায় এবং উহার গায়ে চিহ্নিত অঙ্কগুলি দেখিয়া তাহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ বুঝা যায়। টিউবের দৈর্ঘ্য যত বাড়ানো যায়, প্রতিবিম্বও তত বড় দেখায়, তবে উহা অধিক বাড়াইলে দৃশ্যবস্তু অস্পষ্ট দেখা যায়।

(৯) **কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট ও ফাইন-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট** (Coarse and fine adjustments)—ইতিপূর্ব্বে বডির বর্ণনায় দুইজোড়া কর্‌করাযুক্ত চাকার (pinion heads) কথা বলা হইয়াছে। উপরের চাকা জোড়ার নাম কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট, ও নীচের জোড়ার নাম ফাইন-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট। এই পিনিয়ন বা চাকাগুলি সম্মুখদিকে (clockwise) ঘুরাইলে আইপীস্ ও অব্‌জেকৃটিভ সমেত বডি-টিউবটি নীচের দিকে নামিতে থাকে, এবং উল্টাদিকে (counter-clockwise) ঘুরাইলে উহা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগাইয়া একহাতে চাকা ঘুরাইয়া এইরূপে টিউবটিকে উঠাইলে-নামাইলে এক সময় দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব দৃষ্টিপটের ফোকাসের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন উহা আমরা দেখিতে পাই। ইহাকেই বলে ফোকাস্ (focus) করিয়া দেখা। দুই প্রকার অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট থাকার উদ্দেশ্য এই যে তাহাতে দুইরূপ বিভিন্ন গতিতে টিউবটি ওঠানামা করিতে পারে। কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্টের চাকা

ঘুরাইলে অতি শীঘ্র টিউবটি চালিত হইয়া ফোকাসের সীমার মধ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। পরে আরো সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট ভাবে ফোকাস্ করিতে হইলে ফাইন-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট নিয়োগ করিতে হয়; ইহার চাকা অনেকটা ঘুরাইলেও টিউবটি ঈষৎ মাত্র নড়ে, সুতরাং কেবল অতি সূক্ষ্ম বস্তুকে নিখুঁৎ ভাবে দেখিবার সময় ইহা ব্যবহার করা আবশ্যক। যাঁহারা মাইক্রোস্কোপ পরীক্ষায় দক্ষ তাঁহারা অয়েল-ইমার্শান লেন্সের দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বীজাণু প্রভৃতি দেখিবার সময় ব্যতীত আর কখনও ইহার বিশেষ ব্যবহার করেন না। তাঁহাদের হাত এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্টের দ্বারাই তাঁহারা ফাইন-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্টের কাজ করিতে পারেন। কিন্তু উত্তমরূপে দক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সে সাহস করা উচিত নয়। তাহার কারণ, ফোকাস্ হইবার পূর্ব্বক্ষণে অব্‌জেকৃটিভের লেন্স দ্রষ্টব্য স্লাইডখানির অত্যন্ত কাছাকাছি আসে। এ সময় খুব সাবধানে টিউব চালনা করা আবশ্যক, নতুবা কিঞ্চিৎমাত্র অধিক অগ্রসর হইলেই অব্‌জেকটিভের আঘাতে স্লাইড ভাঙিয়া যায় এবং লেন্সেও আঁচড় লাগিয়া উহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

অনেকে কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্টের দ্বারা ফোকাস্ খুঁজিয়া না পাইলে মনে করেন ফোকাসের সীমা হয়তো দ্রুতগতি পার হইয়া যাইতেছে, অতএব ফাইন-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্টের দ্বারাই একবার ফোকাস খুঁজিয়া দেখা যাক। কিন্তু তাহা কখনই করা উচিত নয়। কারণ প্রথমতঃ ফাইন-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্টের গতি এতই অল্প যে উহার চাকা একবার সম্পূর্ণ ঘুরিয়া গেলে বডি-টিউবটি মাত্র ০·১ মিলিমিটার পরিমাণ (এক ইঞ্চির ২৫০ ভাগের ১ ভাগ) স্থানচ্যুত হয়, সুতরাং উহার দ্বারা ফোকাস্ করিতে হইলে চাকাটি যে কতবার ঘুরাইতে হইবে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু তাহাতেও হয়তো ফোকাসের সন্ধান পাওয়া যাইবে না ; কারণ ফাইন-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্টের গতি উপরে ও নীচে দুইদিকেই অল্পস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক মাইক্রোস্কোপের গায়ের এক পাশে দুইটি রেখার দ্বারা ইহার গতিসীমা চিহ্নিত করা আছে। ঐ দুই রেখার ব্যবধানে একটি তীর বা বিন্দু অঙ্কিত থাকে ; ফাইন অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্টের ওঠানামার সহিত ঐ তীর বা বিন্দুও উক্ত সীমার

মধ্যে ওঠানামা করে; সীমানির্দ্দিষ্ট স্থানের যে-কোনো প্রান্তে উহা আসিয়া উপস্থিত হইলেই ফাইন-অ্যাড্জাষ্টমেন্টের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ সীমাবদ্ধ অ্যাড্জাষ্টমেন্টের দ্বারা ফোকাস খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়, উহা কেবল স্থূল ফোকাস্কে সূক্ষ্মতর করিবার সময়েই প্রয়োজন। প্রত্যেক স্থলে কোর্স-অ্যাড্জাষ্টমেন্টই প্রথমে ফোকাস্ করিবার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে, তৎপরে উহার আরো কিছু উন্নতি করিবার জন্য ফাইন-অ্যাড্জাষ্টমেণ্ট নিযুক্ত হইবে।

(১০) **নোজ্পীস বা রিভল্ভার** (Nose-piece or revolver) —ইহা বডি-টিউবের নীচে আঁটা একটি বৃহত্তর গোলাকার ফ্রেম। ইহাতে তিনটি বা চারটি পাশাপাশি গর্ত্ত করা আছে, এবং গর্ত্তগুলির ধারে পেঁচ কাটা আছে। এই গর্ত্তগুলির পেঁচে এক একটি অব্জেকৃটিভ আঁটিয়া দিতে হয়। অতঃপর নোজ্পীস ঘুরাইলেই ইচ্ছামত যে কোনো অব্জেকটিভ বডি-টিউবের নীচের গর্ত্তের সহিত এক লাইনে সংযুক্ত করা যায়, সুতরাং প্রয়োজনের সময় এক একটি অব্জেকটিভ প্রত্যেকবার বদল করিয়া বডি-টিউবের গর্ত্তের মধ্যে পরাইয়া দিবার আবশ্যক হয় না। ব্যবহারের পর অব্জেকটিভগুলি খুলিয়া লইতেও পারা যায়, অথবা নোজপীসে তাহা লাগাইয়া রাখিতেও পারা যায়।

(১১) **অব্জেকৃটিভ** (Objectives)—মাইক্রোস্কোপের মধ্যে এইগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান, কারণ ইহাতে অত্যন্ত দামী লেন্স লাগানো থাকে। উহার লেন্স একটি মাত্র নয়, প্রত্যেক অব্জেকটিভে ৩।৪-টি করিয়া লেন্স থাকে।

অব্জেকৃটিভের কার্য্য দৃশ্যবস্তুকে বড় করিয়া প্রতিবিম্বিত করা। উহা সামান্য পরিমাণে বিবর্দ্ধিত করিতে হইলে একটি মাত্র উন্নতোদর (convex) লেন্সের সাহায্যেই তাহা চলিতে পারিত; কিন্তু অনেকগুণ বড় করিয়া দেখিতে হইলে অব্জেক্টিভের অল্পস্থানের মধ্যে লেন্সগুলির যে পরিমাণ উন্নতোদর হওয়া আবশ্যক, তাহাতে প্রতিবিম্বে নানারূপ বিকৃতিদোষ আসিয়া পড়ে। তন্মধ্যে একটি দোষ হয় গোলাপেরণ (spherical aberration),—ইহাতে দৃশ্যবস্তু বড় দেখাইলেও ঝাপ্সা দেখায়, একটি বিন্দুকে মনে হয় একটি বৃত্ত, একটি রেখাকে মনে হয় কতকগুলি

গোল গোল বৃত্তের সমষ্টি। আর একটি দোষ হয় বর্ণাপেরণ (chromatic aberration),—তাহাতে দৃশ্যবস্তু বহু বর্ণচ্ছটা-সমাকুল হইয়া (in different colours of spectrum) দেখা যায়। আর একটি দোষ হয় এই যে দৃশ্যবস্তু সর্ব্বত্র সমান ভাবে (in flatness of field) দেখা যায় না, অর্থাৎ উহার মধ্যস্থলে যদি ফোকাস্ হয় তো পাশে হয় না, এবং পাশে হয় তো মধ্যস্থলে হয় না। তদ্ভিন্ন অত্যধিক বিবর্দ্ধন করাতে আরো এক দোষ আছে এই যে দৃশ্যবস্তুর সূক্ষ্মতম অংশগুলিকে পৃথক করিয়া দেখিবার শক্তি (resolving power) উহাতে নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল দোষকে সংশোধন করিবার জন্য শক্তিশালী অব্জেকটিভ মাত্রেই অনেকগুলি বিপরীত-ধর্ম্মী লেন্সের একত্র সংযোজনা আবশ্যক। উহাতে উন্নতোদর লেন্সের দোষ নতোদর (concave) লেন্সের দ্বারা, এবং সোজা লেন্সের দোষ উল্টা লেন্সের দ্বারা সংশোধিত করিতে হয়। এইরূপে কয়েক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন লেন্সের সহযোগে একটি নির্দ্দোষ অব্জেকৃটিভ নির্ম্মিত হয়।

অল্পশক্তিশালী অব্জেকটিভের দোষ কাটানো বিশেষ কঠিন নয়, কিন্তু অত্যধিক বিবর্দ্ধনশক্তিযুক্ত "অয়েল-ইমার্শান অব্জেকটিভের" দোষ কাটাইয়া নির্ম্মাণ করা অত্যন্ত কঠিন। আগেকার অ্যাক্রোম্যাটিক্ (achromatic) ইমার্শান-লেন্সে বর্ণাপেরণ দোষ যথেষ্ট থাকিত, কিন্তু আজকাল অ্যাপোক্রোম্যাটিক (apochromatic) লেন্সের সৃষ্টি হওয়ায় উহা একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। তবে দৃশ্যবস্তুর সূক্ষ্মতম অংশগুলিকে যথাপ্রকৃতরূপে পৃথক (resolve) করিয়া দেখিবার জন্য উহার মধ্যে উপযুক্ত প্রকারে আলোক প্রবেশের পথ (the maximum angle at which light can enter) বা নিউমারিক্যাল আপার্চার (numerical aperture or N. A.) স্থির করিয়া দিতে হইয়াছে।

ইমার্শান-লেন্স ব্যবহার করিতে হইলে দৃশ্যবস্তুর উপর একবিন্দু তৈল দিয়া লেন্সের মুখ তাহার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া ফোকাস্ করিতে হয়। ইহার কারণ ফোকাসের জন্য লেন্স ও দৃশ্যবস্তুর মধ্যে যতটুকু ব্যবধান থাকে তাহার ফাঁক দিয়াই প্রতিফলিত আলোকরশ্মি কতকটা বিচ্যুত হইয়া পড়ে এবং লেন্সের পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম বিচারের শক্তি (resolving power) তাহাতে কমিয়া যায়।

এই ব্যবধানস্থান বিশিষ্ট প্রকার তৈলের দ্বারা (Cedarwood oil) পূরণ করিয়া দিলে সেই শক্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।

সচরাচর তিনটি অব্জেক্টিভ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। একটি লো-পাওয়ার (low power dry objective),—একটি হাই-পাওয়ার (high power dry objective),—আর একটি অয়েল-ইমার্শান (oil immersion objective)। 'লো-পাওয়ার' অব্জেক্টিভের দ্বারা দৃশ্যবস্তু মাত্র আটগুণ বিবর্দ্ধিত হয়, এবং ইহার ফোকাল্-লেঙ্থ (focal length) $\frac{২}{৩}$ ইঞ্চি। (সেইজন্য জার্ম্মান অব্জেক্টিভে বিবর্দ্ধন অনুসারে চিহ্ন দেওয়া থাকে ৮, এবং বিলাতী অব্জেক্টিভে ফোকাল-লেঙ্থ অনুসারে চিহ্ন থাকে $\frac{২}{৩}$।) 'হাই-পাওয়ার' অব্জেকটিভের দ্বারা দৃশ্যবস্তু ৪০-গুণ পর্য্যন্ত বিবর্দ্ধিত হয়, উহার ফোকাল্-লেঙ্থ $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি। আর অয়েল-ইমার্শান লেন্সের দ্বারা দৃশ্যবস্তু ৯০-গুণ বিবর্দ্ধিত হয়, উহার ফোকাল্ লেঙ্থ $\frac{১}{১২}$ ইঞ্চি। এতদ্ব্যতীত ১২০-গুণ পর্য্যন্ত বড় করিবার উপযুক্ত অবজেকৃটিভও পাওয়া যায়, সেগুলিতে আমাদের কোনো প্রয়োজন হয় না। বলা বাহুল্য অব্জেক্টিভের দ্বারা দৃশ্যবস্তু প্রথম একদফা বিবর্দ্ধিত (primary magnification) হয় মাত্র, তৎপরে আইপীসের দ্বারা উহাই আরো কয়েকগুণ পুনর্বিবর্দ্ধিত হইয়া দৃশ্যমান হয়।

(১২) **আইপীস্** (Eye piece)—চক্ষু প্রয়োগ করিয়া দেখিবার জন্য যে লেন্স্‌যুক্ত স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রাকার টিউব বডি-টিউবের উপর দিকে লাগানো হয় তাহাই আইপীস্। ইহাও দুইদফা লেন্সের সংযোগে প্রস্তত। এই আইপীস্‌গুলিও বডি-টিউবের একরূপ ক্ষুদ্র সংস্করণ, কারণ উহারও দুইমুখে লেন্স্ আঁটা থাকে এবং মাঝে থাকে ফাঁক। আইপীস্‌ও নানারূপ বিভিন্ন পাওয়ারের হইয়া থাকে ; ইহার বিবর্দ্ধন-শক্তির অঙ্ক গুণিতক চিহ্নের দ্বারা লিখিত হয়, কারণ ইহা অব্জেক্টিভের প্রতিবিম্বকে গুণের অনুপাতে বাড়ায়। আজকাল ×৪ হইতে আরম্ভ করিয়া ×১৫ পর্য্যন্ত নানা নম্বরের আইপীস্ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি ×৪ বা ×৫, এবং একটি ×১০ নম্বরের আইপীস্ রাখিলেই আমাদের কাজ চলিয়া যায়। একটি লো-পাওয়ার অব্জেক্টিভের সহিত ×১০ নম্বর আইপীস্ লাগাইলে দৃশ্যবস্তু ৮×১০= ৮০ গুণ বড় হইয়া যায়। একটি হাই-পাওয়ারের সহিত উহা লাগাইলে

দৃশ্যবস্তু ৪০×১০=৪০০ গুণ বড় হইয়া যায়। যাঁহারা মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারে অভিজ্ঞ তাঁহারা অনেকেই ছোট আইপীস্ ও লো-পাওয়ার অব্জেক্টিভ সাধারণ কাজের জন্য ব্যবহার করেন। কিন্তু সকলের চক্ষু সমান নয়, কেহ কেহ বড় আইপীস্‌ই পছন্দ করেন। যাঁহারা প্রথম শিক্ষার্থী তাঁহারা প্রায় কিছু বড় করিয়াই দেখিতে চান। ইহাতে কিছু দোষ নাই, আজকালকার উৎকৃষ্ট অব্জেক্টিভগুলির সহিত ×১০ নম্বরের আইপীস্ পর্য্যন্ত অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মাইক্রোস্কোপের সংযোজনা

কোন প্রকার পরীক্ষার জন্য মাইক্রোস্কোপের বিভিন্ন অংশগুলি কিরূপ ভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক, অতঃপর তাহাই জানিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সকল প্রকার দ্রব্য দেখিতে একইরূপ লেন্সের সংযোজনা করা চলিতে পারে না, দৃশ্যবস্তুর আয়তন অনুযায়ী উহাকে বিবর্দ্ধন করিয়া লইতে হয়। দৃশ্যবস্তু যদি অপেক্ষাকৃত বড় হয়, তবে উহাকে ৪০০-গুণ বড় করিয়া দেখিতে গেলে উহা তখন মাইক্রোস্কোপের দৃষ্টিপরিধি (field of vision) অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। আবার তাহা যদি খুব ছোট হয়, তবে ৮০-গুণ মাত্র বড় করিয়া দেখিলে তাহার পরিচয় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। অতএব কোন বস্তু কতটা বড় করিয়া দেখিলে তাহা চিনিবার উপযোগী হইবে এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক।

চিকিৎসা কার্য্যের প্রয়োজনে আমরা সাধারণতঃ মাইক্রোস্কোপের দ্বারা নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি করিয়া থাকি :—(১) মল পরীক্ষা, (২) মূত্র পরীক্ষা, (৩) রক্তপরীক্ষা, (৪) গয়ার পরীক্ষা, (৫) বীজাণু অনুসন্ধানের জন্য রোগীর শরীরের নানারূপ রস এবং পুঁজ পরীক্ষা, ও (৬) বীজাণু প্রভৃতির কাল্‌চার পরীক্ষা। এই সমস্ত পরীক্ষাগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মল ও মূত্র পরীক্ষার জন্য মাইক্রোস্কোপের কম পাওয়ারগুলি ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ উহা ৪০-গুণ হইতে আরম্ভ করিয়া ২০০-গুণ পর্য্যন্ত বড় করিয়া দেখা যাইতে পারে, তাহার অধিক বিবর্দ্ধন কর্ত্তব্য

নয়; ইহাকে অপেক্ষাকৃত স্থূল পরীক্ষা বলা যাইতে পারে। বাকী শেষোক্ত পরীক্ষাগুলির জন্য খুব বেশী পাওয়ারের আবশ্যক—উহাতে সাধারণতঃ ৪০০-গুণ হইতে আরম্ভ করিয়া ৯০০-গুণ পর্য্যন্ত বিবর্দ্ধনের আবশ্যক। ইহাকে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম পরীক্ষা বলা যাইতে পারে।

মল ও মূত্রের মধ্যে যে সকল দৃশ্যবস্তু থাকে তাহা স্বভাবতঃই কিছু বৃহৎ। মলের মধ্যে যে সকল খাদ্যাবশিষ্ট দ্রব্য থাকে, অথবা এমিবা প্রভৃতি কয়েকপ্রকার প্রোটোজোয়া থাকে, কিংবা নানারূপ ক্রিমির ডিম থাকে, সে গুলি অল্প বিবর্দ্ধনের দ্বারা লো-পাওয়ারের সাহায্যে দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। কিন্তু রক্তের মধ্যে যে সূক্ষ্ম কণিকাসকল থাকে সেগুলিকে দেখিয়া উত্তমরূপে চিনিতে,—অথবা ঐ কণিকার অভ্যন্তরে যে অতি সূক্ষ্ম জীবাণু প্রবেশলাভ করে, কিংবা রোগীর গয়ারের মধ্যে যে যক্ষ্মা-বীজাণু থাকে, পূঁজের মধ্যে যে কক্কাই প্রভৃতি নানারূপ বীজাণু থাকে, কাল্‌চারের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বীজাণুসকল জন্মায়, সেই গুলিকে দেখিয়া যথাযথ ভাবে চিনিয়া লইতে হইলে মাইক্রোস্কোপের সর্ব্বোচ্চ শক্তির প্রয়োগ করা প্রয়োজন, অর্থাৎ তথায় অয়েল-ইমার্শান অব্‌জেক্‌টিভ ব্যবহার করা আবশ্যক।

মল-মূত্রাদির পরীক্ষায় প্রথমে খুব লো-পাওয়ার ব্যবহার করিতে হইবে। তাহাতে যদি এমন কিছু পদার্থ মেলে যাহা দেখা গেলেও স্পষ্ট চেনা যাইতেছে না, তবে লো-পাওয়ার পরিবর্ত্তন করিয়া হাই-পাওয়ার অব্‌জেক্‌টিভ লাগাইলেই তাহা চিনিতে পারা যাইবে। বীজাণু ব্যতীত যে কোনো বস্তুই উহাতে থাকুক, এই দুইরূপ পাওয়ারের দ্বারা তাহা উত্তমরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মল-মূত্রাদি পরীক্ষার নিয়ম এই যে তাহা অতি অল্প পরিমাণে লইয়া একটি কাচের স্লাইডের উপর স্থাপন করিয়া তাহার উপর আর একটি পাতলা কাচের কভার স্লিপ্ (cover slip) চাপা দিতে হয়। দৃশ্যবস্তু তরল না হইলে কিছু সেলাইন-জল মিশাইয়া অগ্রে উহা যথেষ্ট তরল করিয়া লইতে হয়। তাহার উপর কভারস্লিপ্ চাপা দিবার উদ্দেশ্য এই যে তাহাতে দৃশ্যবস্তু এক স্থানে জমাট না বাঁধিয়া চারিদিকে সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে। কোনো বস্তু উঁচু-নীচু ভাবে বিন্যস্ত থাকিলে তাহা ফোকাস্ হইবে না, এবং যথেষ্ট

আলোকভেদ্য না হইলেও তাহা মাইক্রোস্কোপে দেখা যাইবে না। পরীক্ষার সময় এ কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখা আবশ্যক। কভার-স্লিপ্ দিয়া আবৃত করিবার আরো উদ্দেশ্য এই যে ফোকাসের সময় অসাবধানে মল-মূত্রাদি অবজেক্‌টিভের লেন্সের গায়ে লাগিয়া যাইতে পারিবে না।

রক্তাদি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিবার জন্য একেবারেই অয়েল-ইমার্শান অব্‌জেক্‌টিভ ব্যবহার করা যাইতে পারে। রং করিয়াই (by staining) দেখা হউক, অথবা রং না লাগাইয়াই দেখা হউক, অয়েল-ইমার্শান লেন্স্ ব্যতীত উহা সন্তোষজনকভাবে দেখা যাইবে না। কেবল জীবন্ত বীজাণুর নড়াচড়া (motility) দেখার সময় ব্যতীত অন্যান্য সকল সময়ে দৃশ্যবস্তু স্লাইডের উপর যথাসাধ্য পাতলা করিয়া মাখাইয়া উহা শুকাইয়া লইয়া (অথবা যদি রং করা হয়, তবে রং করার পর উহাকে শুকাইয়া)—তৎপরে উহার উপর তেল দিয়া এই অব্‌জেক্‌টিভের দ্বারা দেখা আবশ্যক।

লো-পাওয়ারে দেখিতে, হাই-পাওয়ারে দেখিতে, এবং অয়েল-ইমার্শানের দ্বারা দেখিতে মাইক্রোস্কোপের সমস্ত অংশগুলির যেরূপ স্বতন্ত্র প্রকার সংযোজনা করিতে হয়, অতঃপর তাহা নির্দ্দেশিত হইল।

লো-পাওয়ারে দেখিতে—

যাঁহারা মাইক্রোস্কোপ প্রথম ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা অগ্রে লো-পাওয়ারে দেখিতেই অভ্যাস করিবেন। প্রথম দুই এক সপ্তাহ হাই-পাওয়ারগুলি ব্যবহার করিতে চেষ্টা করাই উচিত নয়। লো-পাওয়ারের দ্বারা দেখা অভ্যাস হইয়া গেলে তখন অন্যান্য পাওয়ারগুলি ব্যবহার করিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

মাইক্রোস্কোপ-পরীক্ষার জন্য উপযোগী একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত। প্রথমতঃ যন্ত্রটি এমন স্থানে বসাইতে হইবে যাহাতে উহা ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়িবার বা পড়িয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষকের বসিবার স্থানটি এমন হইবে যাহাতে মাইক্রোস্কোপের উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া অথবা ঘাড় অত্যন্ত উঁচু করিয়া উহার

ভিতর দৃষ্টিপাত করিতে না হয়। তৃতীয়তঃ মাইক্রোস্কোপের সম্মুখে উপযুক্ত আলোকের প্রয়োজন। আলোকের উপর সমস্তই নির্ভর করে। দিনের উন্মুক্ত আলোক ইহার পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু রৌদ্রালোক নয়। দর্পণের দ্বারা রৌদ্র প্রতিফলিত হইলে তাহাতে কিছুই দেখা যাইবে না। সুতরাং ছায়াযুক্ত উন্মুক্ত জানালার সম্মুখে বসিয়া পরীক্ষা করা উচিত। উত্তরমুখী জানালাই ইহার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, কারণ উত্তর দিক হইতে সমস্তদিন সমান পরিমাণে আলোক পাওয়া যায়, অথচ রৌদ্র আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। অনেকে দিনের আলো অপেক্ষা বাতির আলো পছন্দ করেন। যেখানে ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর ব্যবস্থা আছে সেখানে মাইক্রোস্কোপ-পরীক্ষার জন্য একরূপ স্বতন্ত্র আলোক (electric microscope-lamp) ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যেখানে সেরূপ সুযোগ নাই সেখানে সাধারণ বাতির আলোর চতুর্দ্দিক আচ্ছাদন করিয়া এবং একদিক মাত্র উন্মুক্ত রাখিয়া তাহার সম্মুখে ঘষা-কাচের পর্দ্দা দিয়া মাইক্রোস্কোপের উপযুক্ত আলোক প্রস্তত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কৃত্রিম আলোকের এক অসুবিধা এই যে তাহা দিনের আলোর মত সাদা হয় না। সেইজন্য কৃত্রিম আলোকের সম্মুখে নীল রঙের কাচের পর্দ্দা দিতে হয়; অথবা কৃত্রিম আলোতে মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করিবার সময় ডায়াফ্রামের নীচে একটি নীল রঙের কাচ লাগাইয়া সাধারণ বাতির দ্বারাই উত্তমরূপে কাজ চলিতে পারে।

আলোকের ব্যবস্থার পর যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে সংযোজনা করিয়া লইতে হইবে। প্রথমে কণ্ডেন্‌সার ও ডায়াফ্রাম যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে, নোজ্‌পীসের গর্ত্তগুলিতে তিনটি অব্‌জেক্‌টিভ পাওয়ার-অনুযায়ী পরে পরে লাগাইতে হইবে, লো-পাওয়ার অব্‌জেক্‌টিভখানি নোজ্‌পীস সমেত ঘুরাইয়া বডি-টিউবের নীচে আনিয়া স্থাপন করিতে হইবে,—এবং সর্ব্বশেষে বডি-টিউবের উপরের দিকে একটি কম পাওয়ারের আইপীস্ (×৪ বা ×৫) লাগাইতে হইবে। এখন মাইক্রোস্কোপটি সম্পূর্ণরূপে সংযোজিত হইল। অতঃপর পরীক্ষোদ্দিষ্ট পদার্থ সমেত স্লাইডখানি ষ্টেজের উপর লইতে হইবে। এখন নতোদর আয়নাটি (concave mirror) আলোকমুখী করিয়া উহা নানারূপ ভাবে স্থাপনা করিয়া দেখিতে হইবে তদ্দ্বারা ষ্টেজের উপরকার

দৃশ্যবস্তুতে যথেষ্ট আলোক আসিয়া প্রতিফলিত হইতেছে কিনা। আলোক আসিয়া পড়িলে তখন আইপীসে চোখ লাগাইয়া কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট ঘুরাইয়া ফোকাস্ করিতে হইবে।

ফোকাস্ করিবার নিয়ম উপর হইতে নীচে নয়, নীচে হইতে উপরে। অর্থাৎ প্রথমে অব্‌জেক্‌টিভ স্লাইডের খুব কাছাকাছি লইয়া গিয়া পরে আইপীসে চোখ লাগাইয়া উহা কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্টের দ্বারা ধীরে ধীরে উপরে উঠাইতে হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃশ্যবস্তু গোচর না হয়। অব্‌জেক্‌টিভ নীচের দিকে নামাইয়া ফোকাস্ করিতে চেষ্টা করিলে অন্যমনস্কে স্লাইডখানি ভাঙিয়া যাইতে পারে।

দৃশ্যবস্তু দৃষ্টিগোচরে আসিলেই ফোকাস্ সম্পূর্ণ হইল না। অতঃপর যাহাতে উহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দৃশ্যবস্তুর বিভিন্নতা অনুযায়ী উপযুক্তরূপে উহাতে আলোকপাত (critical illumination) করাই সেই ব্যবস্থা। যে বস্তুটি আকারে যত বড় বা ছোট, যেরূপ ঘন অথবা যত পাতলা, এবং যে বস্তু যতটা আলোকে উত্তমরূপে দেখা যাইতে পারে, সেই অনুসারেই উহাতে আলোকপাতের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে হয়। সেজন্য কণ্ডেন্‌সার ও ডায়াফ্রামের সদ্ব্যবহার করা এই সময়েই প্রয়োজন। অত্যন্ত স্তিমিত বা অনুপযুক্ত আলোকে যেমন দৃশ্যবস্তু অস্পষ্ট দেখায়, আলোক অধিক হইলেও উহা সেইরূপ সূক্ষ্মপরীক্ষার পক্ষে প্রতিকূল হয়। কণ্ডেন্‌সার ও ডায়াফ্রামের ছিদ্রপথে যে আলো আসে তাহা দৃশ্যবস্তুর ঠিক মাপসই হওয়া চাই, যাহাতে উহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলি যথেষ্ট সুস্পষ্ট হয়, অথচ অধিক তীব্র আলোকে সেগুলি যেন বিলুপ্তপ্রায় না হয়। অতএব ফোকাস্ অবস্থায় চক্ষু লাগাইয়া কণ্ডেন্‌সার যথাসম্ভব নীচের দিকে নামাইয়া এবং ডায়াফ্রামের ছিদ্র কমাইয়া দেখিয়া লইতে হয় কতটা পর্য্যন্ত আলোক কমাইয়া দেওয়াতে উহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আলোকের ঔজ্জ্বল্য যত কম হইবে, লো-পাওয়ারে ততই স্পষ্ট দেখা যাইবে। আলোক সম্বন্ধে এইরূপ উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইলে পুনরায় কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্ট্‌মেণ্ট ঘুরাইয়া দৃশ্যবস্তুকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

ডায়াফ্রামের ব্যবহার বিশেষ সাবধানতার সহিত করা আবশ্যক।

উহার লিভার (lever) বা কীলকটি কোনদিকে ঘুরাইলে ডায়াফ্রাম খুলিয়া যায় এবং কোন দিকে ঘুরাইলে বন্ধ হইয়া যায় তাহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা আবশ্যক, নতুবা জোর করিয়া একদিকে অধিক ঘুরাইতে গেলে যন্ত্রটি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

কোন পাওয়ারের অব্জেকৃটিভের জন্য কতটা ডায়াফ্রাম খুলিয়া রাখা বা বন্ধ করা উচিত, ইহা অনেকে স্থির করিতে পারেন না। এরূপ সন্দেহের স্থলে প্রত্যেক অব্জেকৃটিভের জন্য কতটা লিভার খুলিতে হইবে তাহা একবার আবিষ্কার করিয়া লইয়া উহা ফ্রেমের গায়ে চিহ্নিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। প্রথমে লো-পাওয়ার অব্জেকৃটিভ লাগাইয়া এবং আইপীস্ খুলিয়া রাখিয়া বডি-টিউবের মধ্য দিয়া দেখিতে হয় কিরূপ আলোক আসিতেছে। উহার লেন্সটি যত বড়, টিউবের মধ্য দিয়া তত বড় একটি আলোকবৃত্ত দেখা যাইবে। এখন ডায়াফ্রাম ক্রমশঃ বন্ধ করিলেই ঐ আলোকবৃত্ত সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে থাকিবে। লেন্সের পরিধি যত বড়, উহার আলোকবৃত্তের পরিধি তত বড় রাখা উচিত নয়, উহা অপেক্ষা কিছু ছোট রাখিতে হয় ($\frac{3}{4}$th of the lens opening)। এইরূপ অনুপাতে ডায়াফ্রাম বন্ধ রাখিলে উহার লিভার কোথায় পৌঁছায়, তাহা দেখিয়া লইয়া সেইস্থানে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধা হয়। হাই-পাওয়ার অব্জেকৃটিভের জন্যও এই প্রকারে একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন করিয়া লইতে হয়। কিন্তু অয়েল-ইমার্শান লেন্সের জন্য এ-সকল আবশ্যক নাই, কারণ উহার ব্যবহারকালে সর্ব্বদাই ডায়াফ্রাম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

মাইক্রোস্কোপ উচিতমত ব্যবহার করিলেও প্রথম দিনেই সমস্ত বস্তু নিখুঁৎভাবে দেখা নূতন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা দ্রষ্টব্য, প্রথম শিক্ষার্থী তাহার অর্দ্ধেক দেখিতে পায় কি না সন্দেহ। দেখা এক জিনিষ, এবং পর্য্যবেক্ষণের অভ্যাস আর এক জিনিষ। শিক্ষিত পরীক্ষক যাহা একবারমাত্র চোখ লাগাইয়াই দেখিতে পায়, অন্যব্যক্তিকে তাহা বলিয়া দিলেও সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া তাহা দেখিতে পায় না। এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি আয়ত্ত করা আবশ্যক, এবং চক্ষুকেও মাইক্রোস্কোপ পরীক্ষায় অভ্যস্ত করা আবশ্যক। কিন্তু ইহা কিছুই কঠিন নয়, কয়েকদিনমাত্র অভ্যাস করিলেই উহা

আয়ত্ত হইতে পারে। নূতন পরীক্ষকের সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা হয় এই যে একটি চোখ যখন মাইক্রোস্কোপ দেখিতে নিযুক্ত তখন আর একটি চোখকে কিরূপে দৃষ্টিবিরত রাখা হইবে তাহা স্থির করা যায় না। সকলেই প্রথমে মনে করে যে অপর চক্ষুটি সর্ব্বক্ষণ বুজিয়া রাখিয়া একচক্ষু হইয়া দেখাই ভাল। কিন্তু তাহাতে চোখের উপর অত্যাচার হয়। দুই চক্ষু খুলিয়া রাখিয়াই মাইক্রোস্কোপ দেখা অভ্যাস করিতে হয়, তাহাতে চক্ষুদুইটি এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে একচক্ষু নিযুক্ত থাকা কালীন অপর চক্ষু খোলা থাকিলেও কিছু দেখে না। অভ্যাস না থাকিলে কয়েকদিন পর্য্যন্ত আইপীসের গায়ে একটি কাগজের পর্দ্দা লাগাইয়া রাখিলে অপর চক্ষুর দৃষ্টি তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে। পরে অভ্যাস হইয়া গেলে তাহার আর প্রয়োজন হয় না।

আজকাল দ্বি-নল (binocular) মাইক্রোস্কোপ হওয়াতে এই সকল অসুবিধা হয় না, অধিকন্তু তাহাতে দৃশ্যবস্তুর উঁচুনীচু অংশগুলির পরিপ্রেক্ষিত রূপ (in perspective relief) আরো সুস্পষ্ট দেখায়। যাঁহারা অধিক অর্থব্যয় করিতে সমর্থ তাঁহারা এইরূপ দ্বি-নল মাইক্রোস্কোপ ক্রয় করিলে কোনো চক্ষুপীড়া সহ্য করিতে হয় না।

হাই-পাওয়ারে দেখিতে—

যে বস্তু প্রথমে লো-পাওয়ারে দেখা যায়, তাহাই আরো বড় করিয়া দেখিয়া উত্তমরূপে চিনিয়া লইবার জন্য হাই-পাওয়ারের প্রয়োজন হইতে পারে। রক্তকণিকাদির সংখ্যা গণনা করিবার জন্যও হাই-পাওয়ারের আবশ্যক। মলে ক্রিমির ডিম দেখিতে বা রক্তে ফাইলেরিয়া দেখিতে লো-পাওয়ারই যথেষ্ট, কিন্তু এমিবা প্রভৃতি কয়েকপ্রকার মলাশ্রিত প্রোটোজোয়া বা উহার সিষ্ট্গুলি (cysts) চিনিবার জন্য হাই-পাওয়ার আবশ্যক। লো-পাওয়ারে ঐগুলিকে দেখিয়া কেবল সন্দেহমাত্র করা যায়, কিন্তু হাই-পাওয়ারে না দেখিলে উহাদের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি বিচার করা যায় না। লো-পাওয়ারের সুবিধা এই যে উহাতে একদৃষ্টিতে অনেকটা স্থান পর্য্যন্ত জুড়িয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য প্রথমে লো-পাওয়ারে অনুসন্ধান করিলে কৌতূহলোদ্দীপক বস্তুগুলি শীঘ্রই দৃষ্টিপথে আসিয়া

উপস্থিত হয়। পরে উহা হাই-পাওয়ারে দেখিয়া বিশিষ্টভাবে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে।

লো-পাওয়ারের যে প্রকার সংযোজনার ব্যবস্থা, হাই-পাওয়ারে দেখিতে তাহার অল্প কিছু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয়। তখন হাই-পাওয়ার অব্‌জেক্টিভখানি (বিলাতী ১/৬ ইঞ্চি কিংবা জার্ম্মান ৮০ নম্বরের অব্‌জেক্টিভ) নোজ্‌পীসে সংলগ্ন অবস্থায় বডি-টিউবের নীচে আনিয়া বসাইতে হইবে,—কণ্ডেন্‌সারটি লো-পাওয়ারের সময় যতটা নীচে নামানো ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উপরে অর্থাৎ ষ্টেজের অপেক্ষাকৃত সন্নিকটে তুলিয়া দিতে হইবে,—এবং ডায়াফ্রাম যেটুকু খোলা ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে খুলিয়া দিতে হইবে। আলোক সংযোজনা সম্বন্ধে ইহাই নিয়ম যে,—পাওয়ার যত কম হইবে, কণ্ডেন্‌সার তত নামিয়া যাইবে, এবং ডায়াফ্রাম তত বন্ধ করিতে হইবে; পাওয়ার যত অধিক হইবে, কণ্ডেন্‌সার তত উপরে উঠিবে, এবং ডায়াফ্রাম তত উন্মুক্ত হইবে।

ইহাতেই হাই-পাওয়ারে দেখার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট ঘুরাইয়া ফোকাস্ করিতে হইবে, এবং তৎপরে সূক্ষ্মভাবে দেখিবার জন্য ফাইন-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট্‌ও ব্যবহার করা আবশ্যক হইবে। ইহাতে আইপীস্ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। তবে যে বস্তু ইহাতে ২০০ গুণ বড় দেখায়, তাহা আরো বড় করিয়া অর্থাৎ ৪০০ গুণ বিবর্দ্ধিতরূপে দেখিতে ইচ্ছা হইলে ×৫ নম্বরের আইপীস্ বদল করিয়া ×১০ নম্বরের আইপীসটি লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অয়েল-ইমার্শান লেন্সে দেখিতে—

ইহার জন্য পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র-সংযোজনার নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। যথা—(১) অয়েল-ইমার্শান্ লেন্সটি (বিলাতী নম্বর ১/১২ ইঞ্চি অথবা জার্ম্মান নম্বর ৯০) নোজপীসে সংলগ্ন অবস্থায় বডি-টিউবের নীচে বসাইতে হইবে। (২) সমতল বা প্লেন আয়নাটির (plane mirror) দ্বারা ষ্টেজে আলোকপাত করিতে হইবে, কারণ কন্‌কেভ আয়নার দ্বারা এখানে কাজ চলিবে না। (৩) কণ্ডেন্‌সারটি সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠাইয়া একেবারে ষ্টেজের গায়ের সহিত লাগাইয়া

দিতে হইবে। (৪) ডায়াফ্রামের ছিদ্র একেবারে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিতে হইবে। (৫) স্লাইডখানি সম্পূর্ণ শুষ্ক হওয়া চাই, ভিজা স্লাইডের উপর এই লেন্স ব্যবহার করা চলিবে না। (৬) আলোকপাতের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আয়োজন যথারীতি সম্পূর্ণ হইলে স্লাইডের উপর এক ফোঁটা সিডার-উড্ তৈল (Cedar-wood oil) স্থাপন করিতে হইবে।

অতঃপর কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট ঘুরাইয়া ধীরে ধীরে ইমার্শান্ অব্‌জেক্টিভ যথাসম্ভব স্লাইডের নিকট নামাইয়া আনিয়া তেলের সহিত উহার লেন্সের সংযোগ ঘটাইতে হইবে। তেলের সহিত লেন্স্‌টি উত্তমরূপে ঠেকিয়া গেলে তখন কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট অল্পপরিমাণে উল্টাদিকে ঘুরাইয়া লেন্সটি আবার ঈষৎ উপরে উঠাইয়া লইতে হইবে, কিন্তু উহা এত বেশী উপরে না উঠিয়া যায় যাহাতে লেন্সের সহিত তেলের সংযোগ ছিন্ন হয়। যখন লেন্স্‌টি তেলের সহিত অল্প একটু লাগিয়া আছে কিন্তু ছাড়িয়া যায় নাই, তখন আইপীসে চোখ লাগাইয়া কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট সাবধানে ঘুরাইয়া টিউবটি আবার অত্যন্ত ধীরে নীচের দিকে নামাইয়া ফোকাসের সন্ধান করিতে হইবে। এই লেন্সের ফোকাস্ করিবার নিয়ম নীচে হইতে উপরে নয়, উপর হইতে নীচে। কিন্তু এতই সাবধানে ফোকাস্ করিতে হইবে যাহাতে স্লাইডের সহিত অব্‌জেক্টিভের সংঘর্ষ না হয়। এই লেন্সের নিউমারিক্যাল্ অ্যাপার্চার অধিক বলিয়া ইহার ফোকাসের সীমা (working distance) স্লাইডের অত্যন্ত নিকটে থাকে, সুতরাং সাবধানতার এখানে যথেষ্টই প্রয়োজন। দৃশ্যবস্তু অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইবামাত্র এস্থলে কোর্স-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট ছাড়িয়া দিয়া বাকী ফোকাস্‌টুকু ফাইন-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্টের দ্বারা করিয়া লইতে হয়। যদি একবারে ফোকাস্ না হয় তবে অধিক প্রয়াস না করিয়া পুনরায় একবিন্দু তেল দিয়া প্রথম হইতে চেষ্টা করিতে হয়।

অতঃপর উত্তমরূপে ফোকাস্ হইয়া গেলে ডান হাতে মেক্যানিক্যাল ষ্টেজের চাকা ঘুরাইয়া স্লাইডখানি সরাইয়া উহার বিভিন্ন অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, এবং বাম হাতে ফাইন-অ্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট অনবরত এদিক

ওদিক ঘুরাইয়া উহার ফোকাস্ ঠিক রাখিতে হয়। অল্পেতেই এই লেন্সের ফোকাসের সীমার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, সেইজন্য নিত্যই এস্থলে ফাইন-অ্যাড্জাষ্টমেণ্ট ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। যদি হঠাৎ ফোকাস্টি দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যায়, তবে আবার একবার কোর্স-অ্যাড্জাষ্টমেণ্ট ঈষৎ এদিক ওদিক ঘুরাইলেই তাহা দৃষ্টিগোচরে আসিয়া পড়ে।

এই লেন্সের সাহায্যে দৃশ্যবস্তু সাধারণতঃ ৪৫০ গুণ হইতে ৯০০ গুণ পর্য্যন্ত বিবর্দ্ধিত করিয়া দেখা যায়। ইহার উপরেও আইপীসের শক্তি বাড়াইলে দৃশ্যবস্তু ১৩০০ গুণ পর্য্যন্ত বড় করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে উহা কিছু অস্পষ্ট দেখায়। ইহাতে কেবল বড় করিয়া দেখার কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে মাত্র, কিন্তু সাধারণ কাজের জন্য এত অধিক বিবর্দ্ধনের কোনো প্রয়োজন নাই।

কেনো কোনো অয়েল-ইমার্শান অব্জেকটিভের মধ্যে একটি ডায়াফ্রাম (iris diaphragm) সংলগ্ন করা থাকে। উহা ডার্ক-গ্রাউণ্ড পরীক্ষার (darkground examination) জন্য আবশ্যক। ঐরূপ পরীক্ষায় জীবন্ত বীজাণু এবং স্পাইরোকীট প্রভৃতির স্বাভাবিক গতিবিধি প্রত্যক্ষ করা যায়। উহার জন্য স্বতন্ত্র প্রকার কণ্ডেন্সারের (darkground condenser) আবশ্যক, তাহার উপরেও একদফা তৈলসংযোগ করা আবশ্যক, এবং কৃত্রিম আলোকের দ্বারা যথেষ্ট তীব্র আলোকপাতের আবশ্যক। সাধারণ পরীক্ষার জন্য উহার কোনো প্রয়োজন হয় না, অতএব ঐ বিষয়ে বিস্তারিত লিখিবার এস্থলে প্রয়োজন নাই।

অয়েল-ইমার্শান লেন্সের ব্যবহার শেষ হইয়া গেলেই তৎক্ষণাৎ সিল্কের কাপড়ে মুছিয়া উহার তেলের দাগ উঠাইয়া লইতে হয়। কিন্তু সেজন্য লেন্সের উপর ঘষাঘষি করা অনুচিত, তাহাতে লেন্স্ দাগী হইয়া যাইতে পারে। সাবধানে একবার মাত্র মুছিয়া লইলেই তেলটুকু উঠিয়া যায়। পরে জাইলল্ অথবা বেন্জিন্ (Xylol or Benzine) কয়েক ফোঁটা সিল্কের রুমালে লাগাইয়া উহার দ্বারা একবার মাত্র মুছিয়া লইলেই তেলের চিহ্ন নিঃশেষে উঠিয়া যায়। তখন পুনরায় একবার শুষ্ক সিল্কের দ্বারা লেন্স্টি মুছিয়া লওয়া আবশ্যক।

মাইক্রোস্কোপের যত্ন

(১) মাইক্রোস্কোপ কখনও খোলা অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে নাই। ধূলা লাগিলে উহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক দিন কেবল কাজের সময় উহা বাহির করিতে হইবে, এবং কাজ শেষ হইলে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। বেল্-জার (Bell-jar) দিয়া উহা উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখা যায়। তাহার অভাবে যন্ত্রটি বাক্সের মধ্যে ভরিয়া অথবা কাপড় জড়াইয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত।

(২) প্রত্যেক দিন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারের আরম্ভে একবার ও শেষে একবার উহা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। এ জন্য একটি স্বতন্ত্র সিল্কের কাপড় রাখা আবশ্যক।

(৩) মাইক্রোস্কোপ অধিকদিন অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে নাই; উহা মধ্যে মধ্যে খুলিয়া ব্যবহার আবশ্যক, এবং মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করা আবশ্যক। যদি নিত্য ব্যবহার না হয় তবে অব্জেক্টিভ ও আইপীস্গুলি খুলিয়া লইয়া স্বতন্ত্র কেস্-এর মধ্যে উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া রাখা উচিত, নতুবা লেন্সে ধূলাবালি পড়িয়া বা ছাতা পড়িয়া শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। আয়নাগুলিও মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করা আবশ্যক, নতুবা উহাতেও ছাতা পড়িতে পারে।

(৪) লেন্সের উপর কখনো সাধারণ কাপড় দিয়া ঘষিতে নাই। সিল্কের কাপড়ে অল্প মুছিয়া দিলেই উহা পরিষ্কার হয়। লেন্সে কোনো ময়লা লাগিয়া থাকিলে রুমালে অল্প জাইলল্ দিয়া তদ্দ্বারা দুই-একবার মাত্র মুছিলেই উহা উঠিয়া যায়। যদি তাহাতেও লেন্স পরিষ্কার না হয় তবে মাইক্রোস্কোপ বিক্রেতাদের নিকট লইয়া গেলে তাহারা উহা পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে। নিজে সমস্ত লেন্স খুলিয়া পরিষ্কার করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ট

ঠ

ড

ত

থ

শ

ষ

স